"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc kabirul.dmc@gmail.com

তৃতীয় বর্ষ

১৩৪০ সাল

কার্ত্তিক -

~~বৈশাখ~~ হইতে চৈত্র সংখ্যা

প্রতিষ্ঠাত্রী

শ্রীলীলাবতী নাগ এম্-এ

সম্পাদিকা

শ্রীবীণাপাণি রায় এম

কার্য্যালয়—২ নং ওয়ার

[সিক সডাক—৫৲]

চয়ন

রাজা রামমোহন রায়

তৃতীয় বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৪০ | সপ্তম সংখ্যা

মরীচিকা

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

সহসা কি কলোচ্ছ্বাসে মুক্ত করি দ্বার
প্রথম জোয়ার এল জীবনে আমার,
উচ্ছ্বসিত চিত্ত মাঝে ভাসে মুগ্ধ সুর
যা কিছু বেদনা ছিল বাজিল মধুর
যাহা কিছু দূরে, হ'ল তারি তরে আশা।
প্রথম আলোতে কাটে রাতের কুয়াশা
যেন মোর উন্মাদিনী শ্রাবণের নদী
ভাঙ্গি দীর্ঘ বালুতট ছোটে নিরবধি
দিকে দিকে মুক্ত শাখা খুঁজে ফেরে পথ
উচ্ছ্বসিত জলোচ্ছ্বাস তবু মনোরথ
কভু নাহি হয় পূর্ণ, কিছু নাহি জানে
কোথায় চলিতে হবে কিসের সন্ধান।
উদ্বেলিত চিত্ত মাঝে উন্মাদিনী সুর
কাণে শুধু বাজে এক বাঁশরী মধুর।

কিছু আর অর্থ নাই কিছু নাই ভাষা
যা কিছু দুর্লভ শুধু তারি তরে আশা ;
কী সুতীব্র ক্ষুধা কাঁদে, মুগ্ধ মনোময়
তারে চায় কাটিবারে যা আমার নয়—
স্বপ্ন সম আশা নিয়ে ছুটে যেতে চায়
দুরন্ত জয়ের লোভে নূতন মায়ায়।
মোহমুক্ত চিত্তপরে বাজে মুগ্ধ ধ্বনি
যে শৃঙ্খল সত্য তারে মিথ্যা বলে গণি।
উচ্ছ্বসিত চিত্তে সেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সুখ
যা কিছু সুলভ তারে করিতে বিমুখ।
ঝরে প্রভাতের আলো ছিন্ন করি মেঘে
উন্মোচিত অক্ষিপুটে দুরন্ত আবেগে।
আপনারে কেড়ে নিতে জাগে অভিমান।
যে গান গাহিতে পারি গাব না সে গান,

মনে হয়, জীবনের চির সার্থকতা
যে কথা কহিতে পারি না কয়ে সে কথা
সূর্য্যসম দীপ্ত এক রুদ্ধ অহঙ্কার
উদ্বেলিত হয়ে ওঠে হৃদয়ে আমার।
ছিন্ন হয়ে যেতে চাই নিত্য স্রোত হ'তে
সে দিন জানিনা এত বাধা আছে পথে
এত মিথ্যা হবে এই আনন্দ আকুল
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গর্ব্ব হবে সর্ব্বাপেক্ষা ভুল।
এই ক্ষণিকের আশা ক্ষণিকের জয়
জীবনের স্বপ্ন মম চির সত্য নয়
এই আলো যাবে নিভে আঁধারিবে পথ,
সম্মুখে অচল হবে বিশাল পর্ব্বত।
উচ্ছ্বসিত জলস্রোত যেন থেমে যায়
বিশাল মরুর মাঝে তপ্ত বালুকায়।

চিরসত্য হয়ে রবে অন্ধকার রাত
তারি মাঝে ক্ষণিকের মধুর প্রভাত,
যাবে যবে স্বপ্ন হয়ে হতাশা আকুল
যতকিছু পেয়েছিনু সবি হবে ভুল।
ব্যর্থ চিত্ত মাঝে রবে ক্রন্দনের ধ্বনি
আমার জীবন মাঝে আধার রজনী
গাঢ় হবে।
নিরন্তর কঠিন শৃঙ্খল
তখন শুধাবে মোরে কোথা তোর বল ?
তখনো কোথাও যদি কোনও বন্ধু মোর
এমনি মধুর স্বপ্নে হয়ে থাক ভোর
ক্ষণিকের তরে তবে কোর এক পাপ
একটী কহিও মিথ্যা। তীব্র অভিশাপ
শীর্ণ করে দেবে যবে এই আলো-শিখা
তাই মোরে বলো সত্য, যাহা মরীচিকা।

তর্প

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১৩)

অরুণের মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া অপরাজিতা বলিল, "বড় রোগা হয়ে গেছ অরুণদা, তোমায় দেখে যেন আর চেনা যাচ্ছে না।"

অরুণ একটু হাসিল, বলিল, "তুমি কেবল চেহারার দিকটাই দেখ্‌ছ, অপরাজিতা,—"

অপরাজিতা বলিল, "কি কর্‌ব বল, অন্তর্দৃষ্টি শক্তিটা থাকলে না হয় ভেতরে কি আছে সেটাও দেখ্‌তে পেতুম ; তা তো নেই—কাজেই কেবল বাইরের দিকটাই চোখে পড়ে।

অরুণ গম্ভীর মুখে অন্যমনস্ক হইয়া অন্যদিকে তাকাইয়া রহিল।

অপরাজিতা জিজ্ঞাসা করিল, 'শুনলুম নাকি কাজ ছেড়ে দিচ্ছ, চল্‌বে কি করে সেটা ভেবেছ ?'

অরুণ হাসিয়া বলিল, "এতে বোঝা যাচ্ছে, আমার সম্বন্ধে রীতিমত খোঁজটাও রাখো, আগে অনেকগুলো পত্র লিখ্‌লেও একটা উত্তর পাওয়া যেত না। মনে হোয়েছে, গরীব ইস্কুল-মাষ্টারের পয়সা সস্তা আর ধনী জমিদারের কাছে তিন পয়সা খরচ করে একখানা কার্ড যোগাড় করাও শক্ত।"

অপরাজিতার সুগৌর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে বলিল, "তোমার খবর নেওয়ার জন্যে আমার তো উৎকণ্ঠার শেষ নেই। কথা অনেকই কাণে ভেসে আসে অরুণদা, কথা শুনবার জন্যে কাঁন বাড়িয়ে দিতেও হয় না। তারপর পয়সা খরচ করার কথা বলছ,—ইচ্ছে হয় না বলেই পত্র দেই নে এর জন্যে কৈফিয়ৎ দেওয়ার দরকারও তো নেই।"

অরুণ বলিল, "যাক্ গিয়ে ও সব কথা, কাজের কথা জিজ্ঞাসা করছিলে না? কাজ রইল না, সেই জন্যেই কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। তবে কাজ থাক্‌লেও আর যে করতুম তা মনে হয় না।"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া অপরাজিতা বলিল, "তার মানে?"

অরুণ নিশ্চিন্তভাবে বলিল, "দিন কত দেশভ্রমণে যাব ভাব্‌ছি।"

পরিহাসের সুরে অপরাজিতা বলিল, "লোটা কম্বল যোগাড় করে দেব নাকি?"

গম্ভীরমুখে অরুণ বলিল, "ঠাট্টা নয়, সত্যি কিছুদিনের মত আমি বার হব, অপরাজিতা।"

তাহার গম্ভীরভাব দেখিয়া অপরাজিতা থতমত খাইয়া গেল, বলিল, "কিন্তু এ সংসার-বৈরাগ্যের কারণটা কি বল দেখি? বউদি দেওঘর চলে গেছে,—আসে নি বলে রাগ হয়েছে বুঝি?"

অরুণ মাথা নাড়িল, বলিল, "না, সে জন্যে মোটেই নয়। তুমি তো সবই জানো অপরাজিতা, বরং সে যাওয়ায় আমি নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছি।"

"আমি জানি—" একটা নিদারুণ আঘাত পাইয়া অপরাজিতা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। তখনই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "তুমি এক কাজ কর অরুণদা, বউদির ঠিকানাটা আমায় দাও, তুমি তো লিখ্‌বে না, আমিই না হয় তাকে আস্‌বার জন্যে পত্র দেই। তোমরা দুজনেই রাগ করে থাকবে, কেউ কাউকে পত্র দেবে না, অথচ দূরে থেকে এ রকম কষ্ট পাও। কেন বাপু, ওরকম ভাবে কষ্ট পাও, তার চেয়ে—"

অরুণ মাথা দুলাইয়া বলিল, "কিন্তু সে কষ্ট লাঘব করবার উপায় আর খুঁজে পাবে না অপরাজিতা, তুমি যত পরিশ্রমই কর না, সব ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

অপরাজিতা জিজ্ঞাসুনেত্রে তাহার পানে তাকাইল, "তোমার কথা বুঝ্‌তে পারলুম না অরুণ দা।"

স্বাভাবিক সুরেই অরুণ বলিল, "অর্থাৎ লীলা যে জায়গায় গেছে, সেখানে মানুষ জীবন্ত অবস্থায় যেতে পারে না। লীলা পৃথিবীতে নেই, সে অনন্তের পথে যাত্রা করেছে।"

অপরাজিতা কথাটা বিশ্বাস করিল না, রাগ করিয়া বলিল, "কি যে বল অরুণ দা, আশ্চর্য্য যে এসব কথা বল্‌তে তোমার মুখে এতটুকু আটকায় না।"

অরুণ বলিল, "সত্যি কথা বল্‌তে আটকাবার কোন কারণ থাকে না। বাস্তবিকই আমি খবর পেয়েছি, লীলা মারা গেছে।"

তাহার মুখের ভাব দেখিয়া অপরাজিতা এবার আর কথাটা অবিশ্বাস করিতে পারিল না। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কেবলমাত্র বলিল, "অভাগিনী—"

অরুণ বলিল, "অভাগিনী কি করে হল অপরাজিতা, আমার সংসার করতে পেলে না বলে? ভুল বুঝেছ—সে বেঁচে থাকলে তাকে বরং অভাগিনী বলা যেত, কিন্তু সে মৃত্যুকে বরণ করে সকল দুঃখ কষ্টের হাত এড়িয়েছে,—সে বেঁচেছে। এই যে তার পরম সৌভাগ্য অপরাজিতা, বেঁচে থেকে সে যে দুঃখ যন্ত্রণা পেয়েছিল, তুমি তো তার বার্ত্তা পাও নি। আমার সংসারে থেকে একটা দিনের জন্যে সে সুখ পায় নি, শান্তি পায় নি, একটা দিন সে হাসতে পারে নি।"

অপরাজিতা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সুখ শান্তি পায়নি, হয় তো সে হাসে নি, কিন্তু সে তার মনের দোষ, সে আর কারও দোষ নয় অরুণ দা। কিম্বা হয় তো কোনদিন বড় দুঃখ কষ্ট পেয়ে মুখ ফুটে একটা কথা বলেছে তাতেই তুমি ধারণা করে নিয়েছ, সে কোনদিনই সুখশান্তি পায় নি।"

অরুণ বলিল, "তুমি তো তাকে আমার চেয়ে বেশী চিনতে পারনি, তুমি তো জানো না স্বেচ্ছায় সে আমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছিল কি না, স্বেচ্ছায় সে আমার ঘরের গৃহিণী হয়েছিল কিনা। ওর সঙ্গে আমারই এক বন্ধুর বিয়ের কথা হয়েছিল, বিয়ে হতোও যদি না সে ইংলণ্ডে পালিয়ে যেত। লীলা মুখে কোন দিন তার নাম না আনলেও আমি তো বুঝতে পেরেছিলুম—সে তাকেই ভালোবাসত।"

অপরাজিতা বলিল, "তোমার স্ত্রী হয়ে সে যে অপরকে ভালোবাসত, এ কথা বুঝেও সহ্য করতে পেরেছিলে, অরুণ দা?"

অরুণ হাসিয়া উঠিল, "পাগল, ভালোবাসা কখনও কেউ মুছে দিতে পেরেছে? আমি ভালোবাসা কি তা জানি, সেই জন্যে জেনে শুনেও তার ভালোবাসার অপমান করতে চাই নি। আমায় সে তার অন্তরে স্থান দিতে পারে নি, তাতে আমার এতটুকু কষ্ট হয় নি; বরং তাতে আমি আনন্দই পেয়েছিলুম—যে সে তার ভালোবাসার মর্য্যাদা রাখতে পেরেছে।"

অপরাজিতা অন্যমনস্কভাবে বাহিরের আকাশটার পানে তাকাইয়া রহিল।

অরুণ বলিল, "আমি কি ভাবতুম জানো? ভাবতুম সেই লোকটার কথা, যে অনেক দূরে থাকলেও এর ভালোবাসা অক্ষয় বর্ম্মের মত তাকে ঘিরে থাকত। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবতুম, বন্ধু, তুমিই সুখী। তুমি যেখানে যে অবস্থাতেই থাকো, একটী নারীর নির্ম্মল বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকারী তুমি, এ কথা তোমার মনে প'ড়ে তুমি নিশ্চয়ই এতটুকু শান্তি পাবে।"

অপরাজিতা মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা এ মেয়েকে কোনদিনই সতী বলে স্বীকার করবেন না অরুণ দা—"

অরুণ বলিল, "তা জানি, কিন্তু প্রেম তো সে কথা বোঝে না, ও যে অন্ধ, তাই বাইরে

হাজারই গণ্ডী দাও না ভেতরে সে চিরমুক্ত। দেহটাকে যে কোন রকমে বাঁধিতে পারা যায়, মন কেউ কোন দিন বন্ধ করতে পেরেছে কি? মানুষের চিন্তা শৃঙ্খলের মধ্যে আটক থাকতে পারে না একথা বোধ হয় জানো?"

অপরাজিতা শুষ্ক হাসিল, বলিল, "তবু বলি—ওর মরাই উচিত ছিল অরুণ দা—বিয়ের পরে নয়—বিয়ের আগে। ধরলুম, আদর্শ সে মানতে রাজি ছিল, তবু দেহটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা তার পক্ষে উচিত হয় না যে সত্যিই কোনদিন কাউকে ভালোবাসতে পেরেছে। দেহ আর মন এই দুটোই তো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে, একটা ছাড়া আর একটার কাজ চলতে পারে না। সে যখন সত্যিই একজনকে ভালোবেসেছিল, সেই ভালোবাসাকে সে মরতে দেয়নি, তার খোরাক জুগিয়ে তার স্মৃতি বাঁচিয়ে রেখেছিল,—তখন পরের কথা ভেবে দেহটাকে বাঁচানো-ও উচিত ছিল। দেহটাকে যখন তোমার হাতে তুলে দিলে, মন তার কতখানি তফাতে সে রাখতে পারলে বল দেখি? তুমি আজকালকার নভেলের মত প্রেম প্রণয় ভালোবাসার কথাগুলো আর বলো না,—আমি ওগুলোকে কোন মতেই উচ্চাসন দিতে পারিনে, ও সব নেহাৎ বাজে কথা বলেই মনে হয়। তোমার স্ত্রী আজ নেই, কিন্তু সে যদি বেঁচে থাকত, তার প্রণয়ী যদি ফিরে এসে তাকে পেতে চাইত, সে তখন নিশ্চয়ই তোমায় ছেড়ে চলে যেত, সেই ধর্ষিত দেহটাই আজ উপহার দিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করত না। আর তুমিও প্রকৃত প্রেমের মর্য্যাদা রাখতে তাকে ছেড়ে দিতে নিশ্চয়ই—"

অরুণ নিঃশব্দে শুধু হাসিতে লাগিল।

অপরাজিতা বলিল, "হেসে উড়িয়ে দিতে চাও, কিন্তু সব সময় সব কিছুই উড়ানো চলে না তা জানো নিশ্চয়ই।"

অরুণ হাসি বন্ধ করিয়া বলিল, "ছেড়ে দাও ও সব কথা, একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। স্বামী-স্ত্রী, পাপ-পুণ্য, সতীত্ব এ সব বিচার করার শক্তি আমার হয় তো আজও আছে, কিন্তু প্রবৃত্তি আর নেই অপরাজিতা। অনর্থক শক্তিটা আর ও সব মিথ্যে ব্যাপারে ব্যয় করতে চাইনে।"

অপরাজিতা মুখ নীচু করিয়া একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল।

(১৪)

এক সময় হঠাৎ মুখ তুলিয়া বিনা ভূমিকায় অপরাজিতা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ওখানে থাকবে অরুণ দা?"

অরুণ জানালাপথে বাহিরের পানে তাকাইয়া ছিল। সে যেন এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল, বলিল, "জমিদারীর কাজ দেবে তো? কি কাজ—? পাইক না গোমস্তা?"

অপরাজিতার, মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। তাহার নিকট হইতে উত্তর না পাইয়া অরুণ মুখ ফিরাইল; হাসিয়া বলিল, "অমনি রাগ হয়ে গেল? নাঃ, তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে আসাই ঝকমারি, পান হতে চুনটুকু খসলে আর নিস্তার নেই! সত্যি বল, আমায় দিয়ে তোমার আর কি

কাজ হতে পারে; বড় জোর ওই পাইকের কাজটা বেশ পারব, তুমি ধরে আনতে আদেশ দিয়ো—আমি বেঁধে নিয়ে আস্‌ব, এটা তো অন্যায় কথা বলি নি তুমি বরং মনে বুঝে দেখ।"

অপরাজিতা মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া বলিল, "যদি কোনদিন তোমাকে আমার কাছে পাই, সেদিন তোমায় জমিদারির কোন কাজে দেব না, সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকো অরুণদা; কেন, আমার জমিদারীতে আর কি কোন কাজ নেই, ওই গোমস্তা পাইকের কাজ ছাড়া?"

অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাছে?"

অপরাজিতা, বলিল, "আমার স্বামী একটা স্কুল করে গেছেন, সেইটাতে—"

অরুণ মাথা নাড়িল, রক্ষে কর, ছেলে ঠেঙ্গানো কাজে আর নয়, তার চেয়ে ভিক্ষে করে খাওয়াও ভালো বলে মনে করি। আর এটাই জেনো তোমার ওখানে আমার না থাকাই উচিত, একদিন আমায় নিয়ে যাওয়া নিয়েই তোমায় অনুতাপ করতে হবে বড় কম নয়, সে কথা মনে করো।"

মুহূর্ত্ত মাত্র নীরব থাকিয়া হাসিয়া উঠিয়া সে বলিল, "গ্রহদোষ মানো?—রাশি, চক্র, জন্ম, অশ্লেষা, মঘা আর ত্র্যহস্পর্শ? মানো না? সর্ব্বনাশ, একেবারে পূরো নাস্তিক যে। না, আমি কিন্তু অস্থিমজ্জা দিয়ে মানি, সেই জন্যে এই সব দেবতাদের শান্ত রাখ্‌তেই চাই। আজ না মানো, কোনদিন তোমায় মান্‌তে হবে আর সেদিন তোমায় অনুতাপও কর্‌তে হবে বড় কম নয়।"

অপরাজিতা জিজ্ঞাসুনেত্রে অরুণের পানে তাকাইয়া রহিল। অরুণ বলিল, "লোকের কথা মানো অপরাজিতা?"

একমুহূর্ত্তে ঘোলাটে ভাব কাটিয়া গিয়া সব পরিষ্কার হইয়া গেল।

অপরাজিতা সবেগে মাথা দুলাইয়া বলিল, "জানি, লোকের কথাকে তোমরা ভয় কর। এ কথাও জানি অরুণদা, লোকে কেবল আজই কথা বল্‌ছে না, যুগে যুগে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নামে অজস্র কথা বলে আস্‌ছে, আর বল্‌বেও, কিন্তু তাতে আমার কি? আমি জানি সত্য যা তা চিরদিনই সত্য, সে স্বতোজ্জ্বল; আসুক না তার পরে ধূলোর বন্যা, ঝেড়ে নিলেই তার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ফুটে বার হবেই।"

অরুণ হাসিতে গেল, হাসি ফুটিল না, সে ভাবিতে লাগিল।

সে বলিল, "আসল কথাটা তো হল না, কেবল অবান্তর কথাটাই এসে পড়্‌ছে। আমি যার জন্যে এসেছি, দয়া করে সে কথাটা শুন্‌বে কি?"

অপরাজিতা কথাটা বুঝিয়াও না বুঝিবার ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?"

তাহার ভাণ অরুণের চোখ এড়াইল না, সে বলিল, "যে মানুষ জেগে ঘুমোয় তাকে জাগানো চলে না এ কথা খুব সত্যি,—এর প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। আমি এখানে আসা

মাত্র তুমি বুঝেছ আমি কেন এসেছি, তবু ও জিজ্ঞাসা কর্‌ছ। ভালো,—আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি শোন। আমি তোমায় পত্রে এক কথা বলেছিলুম—"

অপরাজিতা মুখ ফিরাইল।

অরুণ বলিল, "যদি বুঝে থাক শুভ্রার মা আমায় তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, সে বোঝা তোমার ভুল। আমি নিজে তাঁদের হয়ে তোমার কাছে চাচ্ছি, তাঁরা ভিক্ষা চান না—আইন অনুসারে পেতে চান।"

"আইন"—অপরাজিতা মুখ টিপিয়া হাসিল।

অরুণ স্থিরকণ্ঠে বলিল, "তা ছাড়া শুভ্রার মায়ের একখানা দলিল তোমার স্বামীর কাছে ছিল, সেখানা ওঁরা ফিরে পেতে চান।"

অপরাজিতা আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

অরুণ বলিল, "হ্যাঁ, একখানা দলীল। তুমি হয়তো জানো না—শুভ্রার মা—"

বাধা দিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে অপরাজিতা বলিল, "হ্যাঁ, আমি সে সব জানি অরুণদা, কেবল জানি নে—কেন তিনি আমায় বিয়ে করেছিলেন।"

সে দুই হাতের মধ্যে মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

তাহার পর মুখ তুলিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সত্যি কথা আজ বলি অরুণদা, আজ আমার সমস্ত মন সেই হারানো ছোট বেলাটাকেই ফিরিয়ে পেতে চাই। আঃ, সে কি দিনগুলোই না গেছে অরুণদা, তখন তো স্বপ্নেও ভাবি নি তারই স্মৃতি সারামনটা এমন করে জুড়ে থাক্‌বে। আমার এই রাণীর ঐশ্বর্য্য অহঙ্কার মনে হয় তীব্র বিদ্রূপ, আমার জীবনটাকে কেবল মিথ্যায় ছেয়ে রাখ্‌লে, সত্যের বিকাশ হতে পার্‌লে না, আমার "আমি" ধ্বংস হয়ে গেল। আজ ভাবি যদি সেই দিনটাই ফিরে পেতুম—"

সে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল—

অরুণ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া খানিকটা নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

"সে দিনটাকেই অবিকৃতভাবে না পাওয়া যাক্, অপরাজিতা, এ দিনটাকেও তো তুচ্ছ করে এড়িয়ে দেওয়া চলে না। এই দিনে তুমি তো অনেক কাজ কর্‌তে পার, তোমার সে সুবিধা সে সুযোগ যথেষ্ট আছে।"

অপরাজিতার মুখের উপর মৃদু হাসির রেখা ভাসিয়া উঠিল।

"হ্যাঁ তা আছে। এক ক্ষমতা ভগবান আমায় দিয়েছেন, আমি তাই তারই সদ্ব্যবহার করে যাচ্ছি, নিজের খুসিমত চল্‌ছি। কিন্তু এসব কথা আজও থাক্, আমার ঢের কাজ আছে। আজই সকালে মাত্র এখানে এসেছি, জিনিসপত্র কোথায় কি পড়ে আছে কিছুই তোলা হয় নি। আর একদিন বরং এসো, সেদিনে এ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা বল্‌ব। আর

ওদের বলো—দলীলের কথা আমি কিছুই জানি নে, সে সব রাজা বাহাদুর কি করেছেন কে জানে। আমি শুনেছি, রাজা বাহাদুর দিনরাত ওখানেই থাক্‌তেন—আমার বিয়ের পর পর্য্যন্ত। কাজেই ওরা তাঁকে দলীল দিয়েছে আর সেই দলীল তিনি বাড়ী এনে রেখেছেন এ-কথাটা বলা মানে উল্টো চাপ দেওয়া মাত্র, তা আমি বুঝি।"

দুই পা অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, "পরের কথা ছেড়ে দাও, নিজের কথা খানিকটা ভাব। সন্ন্যাসী হওয়ার সময় জীবনে ঢের পাবে, সে জন্যে এখনই লোটা কম্বল যোগাড় করার দরকার নেই। বল্‌ছ, স্ত্রীকে ভালোবাসতে পারো নি, তবু সে মরেছে খবর পেয়ে সংসার ত্যাগ করে বীর হতে চাও, এর মূলে উদ্দেশ্য তা হলে লোকের কাছে প্রশংসা অর্থাৎ সাধুবাদ নেওয়া,—তাই নয় কি? মেয়েটীকে এখন শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুল্‌বার চেষ্টা করা,—সে কত বড় হল বল দেখি?"

অরুণ উত্তর দিল, "নেহাৎ ছোট নয়, বেশ বড় হয়ে উঠেছে, পাঁচ ছয় বছরের হল।"

অপরাজিতা হিসাব করিয়া বলিল, "ধরলুম ছয় বছর,—আর গোটা দুই তিন বছর পরেই তো সে তোমার ভার কতকটা নিতে পার্‌বে। পার্‌বে না—বল কি? একজন ইংরেজ অতটুকু মেয়েকে বেবি বলে উড়িয়ে দেয়, কিন্তু আমাদের বাঙ্গালীর ঘরে আট নয় বছর বয়সেই মেয়ে পাকাগিন্নি হয়ে পড়ে—বিশেষ মা মরা মেয়ে আরও বেশী অভিজ্ঞতা লাভ কর্‌বেই।"

"আচ্ছা, অরুণ দা, আমাদের ঘরের মেয়েরা বিধবা হয়ে বেঁচে থাকে কি করে একবার ভাব—তুমিও না হয় তেমনি করে হবিষ্য কর—তবু বেঁচে থাক। হ্যাঁ, আমিও ঠিক তাই চাই, ব্রহ্মচর্য্য কথাটা বেশ গালভরা, করে যাও দেখি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে, যথেষ্ট পুণ্য লাভ করবে।"

অরুণ শুষ্ক হাসিল—"পুণ্য, কিন্তু পুণ্যের ওপর লোভ তো আমার এতটুকু নেই অপরাজিতা?"

অপরাজিতা ফিরিয়া আসিয়া অরুণের সাম্‌নে দাঁড়াইল, দৃপ্ত দুইটী চোখের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "ও কথাটা মুখে যে আন্‌ছ কি করে অরুণ দা, আমি তাই ভাবি। তোমার শুধু নয়, সকলেরই মনের অতলতলে এতটুকু পুণ্যের স্পৃহা জেগে আছেই, এ কথা অস্বীকার করলেও আমি মান্‌ব না। দানের জন্যেই দান করে এমন মহানুভব লোক কোন দেশে কোন ধর্ম্মে, কোন সমাজে নেই। ফিরে পাওয়ার আশায় মানুষ সবই করে। বল্‌বে আমরা অর্থাৎ ভারতবাসীরা জন্মান্তর স্বর্গ নরক মানি, তাই পরলোকের আশায় দান করি, কাজ করি। কিন্তু পাশ্চাত্যের অনেকেই এ সব কিছু মানেন না, তাঁরা তবে দান করেন কেন,

ফিরে পাওয়ার আশা তাঁরা করেন না তো, কেননা তাঁদের ইহকালই আছে পরকাল নেই। এর উত্তর, তাঁরা তাঁদের পুণ্যের স্পৃহা অর্থাৎ যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা এখানেই পরিতৃপ্ত করে নিচ্ছেন, তাঁরা যা প্রার্থনা করেন সেটা অনাগত ভবিষ্যতের জন্যে নয়, যে বর্ত্তমান এসে পড়েছে তারই জন্যে। পাওয়ার ইচ্ছা সবারই থাকে, সবারই আছে অরুণদা, তাই বলি এতখানি মিথ্যাকথা প্রকাশ নাই করলে।”

অরুণ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

নিত্য নূতনভাবে যে অপরাজিতাকে সে দেখিতেছে তাহাকে সে কল্পনাতেও কোন দিন আঁকিতে পারে নাই। সে যে অপরাজিতাকে একদিন দেখিয়াছিল, তাহার সহিত ইহার আকাশ পাতাল ব্যবধান।

অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, “আমার কথা ছেড়ে দিই, তোমার কথাই জিজ্ঞাসা করি, অপরাজিতা তুমি কিসের জন্যে সঞ্চয় করছ?’

‘সঞ্চয়?’

অপরাজিতা হাসিল, ‘গোড়াতেই ভুল করেছ অরুণদা, অপরাজিতা জগতে সঞ্চয় করতে আসে নি, এসেছে সব ক্ষয় করে ফেলতে। আমার জন্যে সঞ্চয় রইল মানুষের চোখের জল, দীর্ঘশ্বাস, চলার পথ, ওই চোখের জলে পিছল হবে, দীর্ঘশ্বাস প্রবল ঝড়ের আকার নিয়ে আমায় পেছন হতে ঠেলা দেবে। আমার পথের সম্বল ওই—এখানেই উত্তর আর এখানেই শেষ। জীবনটার পরে আর এক রাজ্য আছে সেটা মানিনে। আমার জীবন জগতের আলোর রাজ্য বেয়ে চলছে—যেখানে অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে ওই ঠাণ্ডা দেশের প্রান্তে গিয়েই জমাট বেঁধে যাবে। যার যা বিশ্বাস অরুণদা, কেউ বা আঙ্গুল গুণে এ জগতের বাসটা সংক্ষিপ্ত করতে চায়, কেউ বা না গুণে বাসের সময়টা দীর্ঘ করতে চায়, আমি শেষের দলে।’

অরুণ কি বলিতে যাইতেছিল, অপরাজিতা হঠাৎ ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িল, বলিল, “আর নয় আমি চললুম। আর একদিন এসো, অরুণদা, তোমার সঙ্গে তর্ক করব।”

সে আর দেরী করিল না, বাহির হইয়া গেল। অরুণও উঠিয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

পত্রালি

শ্রীইন্দ্রাণী দেবী

মাননীয়াসু,

আপনার চিঠিখানি বড়ই আনন্দ দিয়াছে। দেবী কোন্‌খানে কি রকম স্কুল করিয়াছেন, তাহার নাম কি ইত্যাদি জানিতে ইচ্ছা করি। সুখের বিষয় কলিকাতায় শিক্ষিত মহিলারা অনেকেই এখন এইভাবে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া মেয়েদের শিক্ষাদানব্রত গ্রহণ করিতেছেন। মেয়েদের অবস্থার পরিবর্ত্তন ও উন্নতির জন্য শিক্ষাই যখন সব চেয়ে বেশী দরকার তখন ইঁহার খুবই আবশ্যক ও মূল বিষয়েই হাত দিয়াছেন, সন্দেহ নাই। দেশের সমস্ত ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে অন্ততঃ, মেয়েদের উচ্চশিক্ষা প্রসারিত হইলেই শিক্ষিতারা এতদিনের মত সঙ্কীর্ণ, গণ্ডীবদ্ধ ও জাতীয় জীবনের সহিত বিচ্ছিন্ন না হইয়া সবলতা, সজীবতা লাভ করিবেন আশা করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এসব চেষ্টা প্রায় কলিকাতা ও ঢাকার মধ্যেই আবদ্ধ। মফঃস্বলে কি বাঙ্গলার বাহিরে যেখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা কম নয়, সেখানেও বাঙ্গালী মেয়েদের শিক্ষার অবস্থা এখনও শোচনীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানকার কথাই বলিতে পারি। এমন একটী স্বাস্থ্যকর স্থান, যেখানে ছাত্রী-নিবাস-সমন্বিত মেয়েদের কলেজ হওয়াও উচিত (আমাদের মেয়েদের স্বাস্থ্যের কথা ত জানেনই ; আর বাঙ্গলা বা তাহার কাছাকাছি কোন স্বাস্থ্যকর স্থানেই কলেজ নাই) সেখানে একটী হাইস্কুলও নাই। আর একটী কথা জানিতে ইচ্ছা, এতগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিদ্যালয় অপেক্ষা উহার কতকগুলি একত্রে মিলিয়া এক একটী উৎকৃষ্টতর বিদ্যালয় দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হইলেই ভাল হয় কিনা ? না, এইরকম নানা আদর্শের পৃথক পৃথক বিদ্যালয়েই সকল শ্রেণীর অভাব বেশী মিটিতে পারে ? মেয়েদের নিজেদের উদ্যম, যত্নে স্থাপিত এই বিদ্যালয়গুলি হইতেই বা কেমন ? পাঞ্জাবে ও রাজপুতানায় কি মেয়েরা ব্যক্তিগত ভাবে নিজ নিজ আদর্শানুসারে বিদ্যালয় গঠন করিতেছেন ? না, সাধারণ প্রতিষ্ঠিত বড় বড় বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে ? এ বিষয়ে এক যশো (স্বর্ণ ?) দেবীর কথা কাগজে দেখিয়াছিলাম। তিনি ঠিক কোথাকার লোক মনে পড়িতেছে না। ওরকম উদ্যোগ, কর্ম্মশীলতা অবশ্য আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় না। মেয়েদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসিল। এ বিষয়ে আপনার অভিমত জানিতে ইচ্ছা করি। আমার কিন্তু পরিকল্পনাটী একেবারেই ভাল বোধ হয় না। উহাতে শিক্ষা সঙ্কীর্ণ ও একপেশে হওয়ার সহিত তাহার মান বা স্তর নামিয়া যাওয়াও প্রায় অবশ্যম্ভাবী। আদর্শটী ঠিকও নয়, অস্বাভাবিকও। তবে এত বড় দেশে নানা মত নানা শ্রেণীর জন্য পুনায় একটী সভা হইয়াছে। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানটী অপেক্ষা উহার প্রচারকল্পে লিখিত "Scientific Basis of Women's Education" নামে একখানি বই যে একবার হাতে পড়িয়াছিল তাহাতে আপত্তি ও প্রতিবাদের বিষয় খুবই বেশী। এই ত মুস্কিলও। অনেক সময় যে কাজগুলি হয় ত তেমন খারাপ

নয়, তাহার সূত্র ধরিয়াই এমন ক্ষতিকর মতবাদ প্রচারিত হয়, আর দেশের সংস্কারবদ্ধতা ও রক্ষণশীলতার সংশ্রবে আসিয়া এমনই জ্বলিয়া উঠে, যে অনেক চেষ্টায় যেটুকু সংস্কার, মনের পরিবর্ত্তন মেয়েদের সম্বন্ধে আনা যায় তাহাও ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। এসব বিষয়ে সতর্কতা তাইত এত আবশ্যক।

সহশিক্ষা আপনার কেমন বোধ হয়? প্রাথমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় অন্ততঃ ত তাহা খুবই চলিতে পারে। আমাদের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার এ ছাড়া হইবারও আশা নাই, কারণ ইহাতে খরচ কম! মেয়েদের সম্বন্ধে সংস্কারবদ্ধতাও ইহাতেই কমিতে পারে আর দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষালাভের সুযোগও তাহা হইলে তাঁহারা পান কারণ শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক শিক্ষার সর্ব্বোত্তম আয়োজন, এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ও ছেলেদের বিদ্যালয়েই মিলে। তবে সাবধানতা, ছেলেমেয়েদের প্রতি দৃষ্টি ত রাখিতেই হইবে। ভাল আদর্শ, আবহাওয়া আরোই বেশী আবশ্যক। তাহা হইলে মধ্যশিক্ষা বা হাইস্কুলের শিক্ষাও সফল না হইবার কারণ নাই। আমেরিকায় যে সব গল্পদের কথা সহ-শিক্ষার সংশ্রবে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সেখানকার সমাজ, সাহিত্যের বিকৃত ও অহিতকর আদর্শ এবং মতবাদের ফল। সহ-শিক্ষার সহিত তাহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ কিছুই নাই। শিক্ষালয়ের সম্পর্ক ছাড়াও তাহা যথেষ্টই ঘটিয়া থাকে। যে বিষ সর্ব্বত্র সঞ্চারিত সুবিধা পাইয়া বিদ্যালয়েও তাহাই আত্মপ্রকাশ করে মাত্র। দুঃখের বিষয় আর কিছু যত হউক আর না হউক ঐ ধরণের তৈরীকেনা (ready-made) মতবাদগুলি আমাদের দেশে বেশ আসিয়া জুটিতেছে।

ছাত্রীনিবাসগুলির অবস্থাও ত অনেক স্থলেই সন্তোষজনক নয়, আর সেজন্য মেয়েদের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার কথাও খুবই শোনা গিয়াছে। এখন ইহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি? এদিকেও মেয়েদের ভালরকম মনোযোগ দেওয়া দরকার। কারণ কলিকাতায় মফঃস্বল হইতে ছাত্রীও অনেক আসিয়া থাকে। তাহাদের সকলের উপযুক্ত সুগঠিত ছাত্রীনিবাস আছে কিনা জানি না। এইরকম এক একটী দিক দেখিতে গেলেই জানিবার তথ্য সংগ্রহের বিষয়ই কত যে পাওয়া যায়। আমরা ত দেশের বিষয়ে এমন কি মেয়েদের বিষয়ের ঠিকমত খবর কিছুই পাইও না, রাখিও না। খবরের কাগজ নিতান্তই যাহা সম্মুখে আনিয়া ধরে, তাহাতেই শুধু চোখ বুলাইয়া যাই মাত্র। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে সব বিষয়ই জানিবার জন্যও কত চেষ্টাই না হইতেছে। সেখানে যে কোন বিষয়ের তথ্যসম্বলিত মূল্যবান পুস্তকাদিও যেমন পাওয়া যায়; কত লোকেই (মেয়েরাও অনেকে) বৈজ্ঞানিক ভাবে নানা তথ্য সংগ্রহে নিযুক্তও রহিয়াছেন। এইজন্যই অবশ্য এত বিষয়ের পুস্তক লিখিতও হইতে পারিতেছে আর চারিদিকে সব বিষয়ের জ্ঞানও বিস্তৃত হইতেছে। সম্প্রতি ওয়েব দম্পতির "Methods of Social Study" বইখানি পড়িয়া একথা আরোই মনে আসিল। আমাদের দেশে এসব সংগ্রহ অবশ্য আরো অনেক কঠিনও মেয়েদের পক্ষে ত কথাই নাই। বিশেষতঃ দেশে কোন

বিবরণ সংগ্রহ করিতে গেলে সাহায্য দূরে থাকুক, কেবল সরকার নয়, কেহই তাহা পছন্দ করেন না, সন্দেহের চক্ষে দেখেন। কোন প্রতিষ্ঠানের বিষয়ও কর্ত্তৃপক্ষ অনেকস্থলেই কিছু জানাইতে অনিচ্ছুক। সকলে হয়ত অবশ্য ভাল উদ্দেশ্যে জানিতে চাহেনও না। এদিকেও আমাদের দেশের লোকের বিশেষ দোষ, অজ্ঞতা আছে। যাই হোক তবু দেশের ও মেয়েদের নানাবিষয় হাতে কলমে জ্ঞানলাভের কাজেও মেয়েদের মনোযোগ আসা দরকার। অনেকে ইহাতে কাজের ক্ষেত্রও পাইতে পারেন।

মেয়েদের সম্বন্ধে মুক্তমত গঠন ও প্রচারের জন্য পত্রিকা আর সমিতির আবশ্যকতাও খুবই বেশী। আপনার পরিচিত মহিলাদের মধ্যে ইহার গুরুত্ব বুঝাইতে পারিলে ভাল হয়। "জয়শ্রী"র উদ্দেশ্য বুঝাইয়া যোগ্য মহিলাদের উহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া তাহার সাহায্যে আনিতে পারিলে হয়। কেহ বা লেখা দিয়া, কেহ বা গ্রাহক ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহাদি দ্বারা অর্থবিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন। যাঁহারা কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত আছেন, তাঁহারা উহার বিবরণ পাঠাইলেও কাজ হয়, অথচ তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের প্রচারও হয়। মেয়েদের কাগজ আরো আছে বলিয়াও অনেকে "জয়শ্রী"র আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন না। ইহার পার্থক্যের বিষয় বুঝাইয়া দিলেও হয় ত কেহ কেহ "জয়শ্রী"র অনুরাগী হইতে পারেন। "জয়শ্রী" শিক্ষিতসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেই হয়। তাই লোকপ্রিয়তার জন্য কোনরকমেই তাহাকে খর্ব্ব করা ভাল বোধ হয় না। এই একখানি কাগজও যদি মেয়েদের মুক্তমত বহন করিতে পারে, তাহা হইলেও আমাদের কতটা বলই বৃদ্ধি পায়। সর্ব্বসাধারণ মেয়েরাও আপনিই তাহা হইলে অনেক কিছু জানিতে বুঝিতে পারিবেন। সব বিষয়ের প্রথম কথাই হইতেছে যোগ্যতা ও সাফল্য। আমরা যে পরিমাণে কাগজখানির উৎকর্ষ্য সাধন করিতে পারিব, সেই পরিমাণেই প্রতিষ্ঠালাভও আপনিই হইবে। আর তাহা না পারিলেই যত অন্যায় অযৌক্তিক হউক, ঠাট্টা বিদ্রূপ বিরুদ্ধতাই সহিতে হইয়া থাকে। আপনার লেখাটী দয়া করিয়া "জয়শ্রী"তেই দিবেন। উহাকে নিম্নাধিকারী হইতে দিতে চাই না দেখিতেই পাইতেছেন। আমাদের দারিদ্র্য, অপ্রতিষ্ঠার জন্য ভুগিতে হইলে কি আর করা যাইবে?

সমিতি মেয়েদের যেগুলি হইয়াছে ও হইতেছে তাহার উন্নতি, প্রসারও সুখের বিষয় হইলেও মেয়েদের বিষয়ে মুক্তমত গঠন ও প্রকাশের উপযুক্ত সমিতির আবশ্যকতাও খুবই রহিয়াছে। বাংলার মধ্যে ঢাকার "দীপালি সঙ্ঘ"ই অনেকটা এই ভাবের বলিয়া বোধ হয়। মাদ্রাজের Women's Indian Association এ বিষয়ে আমাদের আদর্শ হইতে পারে। আপনি যে নানাস্থানের মেয়েদের মধ্যে আলাপ, পরিচয়ের কথা বলিয়াছেন, এইভাবের সমিতি হইতেই উহার সুবিধা হওয়ায় সম্ভাবনা। স্কুল কলেজের ছাত্রীদের সব বিষয়ে ঠিকমত আদর্শ দিবার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানও বিশেষ আবশ্যক। তাহাদের ভালভাবে গঠিত করিতে পারিলেই সত্য কাজ হয়। সমভাবীদের একত্র সঙ্ঘবদ্ধ করা ছাড়া নূতন আদর্শ বয়স্কাদের দেওয়া কঠিন। নবীনারাই তাহা গ্রহণ

করিয়া জীবনে কাজে লাগান সম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনকার ছেলেদের মধ্যের একজাতীয় নব্যাদর্শে তাঁহারাও বিপথচালিত হইতেছে না এমন নয়। এই অপচয় নিবারণ দরকার। বলাবাহুল্য এই নবীনদের ঠিকমত গঠনের উপরেই দেশের ভাগ্য প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে। উপযুক্ত শিক্ষিতা নবীনারাই সব সংস্কারবদ্ধতা, বিদ্বেষের বিরুদ্ধে জীবন্ত সাক্ষ্য হইতে পারে। কলিকাতায় এরকম কোন প্রচেষ্টা হইতেছে কিনা জানিতে ইচ্ছা করি। একটী ছাত্রীসঙ্ঘের কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা কি ভাবের বা কতটা সফলতা লাভ করিয়াছে জানি না।

নিঃ
শ্রীইন্দ্রাণী দেবী

গল্প—গল্প নয়!

শ্রীবেলা দেবী

ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে কি একটা বিরাট জল্‌সা উপলক্ষে অনেক লোক সমাগম হইয়াছিল, শোনা যায় স্বয়ং আচার্য্যদেব পর্য্যন্ত সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কোনও প্রদেশের বন্যাপীড়িতের সাহায্যকল্পে এই অভিনব আয়োজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেখানে হেমেন গিয়াছিল দর্শক হিসাবে। এই দুর্দ্দিনেও সে দশটাকা ব্যয় করিয়া একখানি টিকিট ক্রয় করিয়াছিল। শুধু আমোদের জন্য নয়, অন্য উদ্দেশ্যও ছিল, সে কথা বোধকরি এখানে ভালো করিয়া না বলিলেও চলে।

তাহার পাশের আসনে যিনি উপবেশন করিয়াছিলেন, তিনি একজন বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা অন্ততঃ চেহারা ও পোষাকে কতকটা অনুমান করা যায়। শেষে অনুসন্ধানে জানা গেল যে সত্যই তাই! মেয়েটির নাম বীণা, অনেক সংবাদ পত্রের স্তম্ভে সঙ্গীতের রাগরাগিনী সম্বন্ধে নাকি এঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্যাপার যাহাই হোক না কেন, হেমেনের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গিন হইয়া দাঁড়াইল। ক্ষণিকের দৃষ্টিতে বীণাও কি একরকম অস্বাভাবিক ভাবে হেমেনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কি-যেন ভাবিতেছিল।

ঐক্যতান বাদন সুরু হইয়া গেছে, সেদিকে দু'জনের লক্ষ্য নাই, কেবল মুখ চাওয়া-চায়ি, আর যেন একটা চেনা-চেনা ভাব, অথচ কেহ কাহাকে সহজে চিনিতে পারিতেছে না! বীণা তখন দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া অধোবদনে কি জানি কি ভাবিতেছিল,. তাহার ভাবনার কূল-কিনারা ছিল না! বীণা আর একবার মুখ তুলিয়া হেমেনকে বোধ করি সহসা কোন প্রশ্ন করিবে কিনা ভাবিতেই, তাহার আয়ত চোখদুটি অন্য দিকে ফিরিয়া আসিল। পাশেই বসিয়াছিলেন মীরাদেবী, হাসিয়া কহিলেন, ভালো লাগ্‌ছে না তোমার? কি হয়েছে বলোত, প্রেমেন আসেনি বলে মন ভালো নেই বুঝি?

মুচ্‌কি হাসিয়া বীণা জবাব দিল, না মীরাদি এখন কিছু বলতে পার্‌ব না, পরে তোমায় বলব—এবং মীরার কাণের কাছে মুখ আগাইয়া ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কহিল, 'আমার পাশে যিনি বসে আছেন, এঁর কথা তোমাকে বল্‌ব! সেই যে ঢাকার হেমেন বাবু। মনে নেই তোমার,—বাঃ রে,...' জলসার মঞ্চোপরি কে একজন গায়ক তখন জলদ গম্ভীর স্বরে ভাটিয়াল সুরে গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

* * * * *

হেমেনের মনে তখন বহুদিন পূর্ব্বের এক দৃশ্য ভাসিয়া উঠিয়াছে—সন্ধ্যা তখন হয় হয় প্রায়। আকাশে মেঘের লেশমাত্র ছিল না, ফুরফুরে হাওয়া বইতেছিল, 'আফগান' ষ্টীমারখানি হেলে দুলে পদ্মার বিশাল বুকে দাগ এঁকে ভেসে যাচ্ছিল! অদূরে ধূসর গাঁয়ের দিগন্তরেখা ঢেউএর উপর ঢেউ, কেমন সুন্দর, মহান্‌ দৃশ্য সে। হেমেন রেলিঙে ভর করে দূরের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দাঁড়িয়েছিল। এক ষ্টীমারভরা লোক। দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনে লোকজনের অন্ত নাই, প্রথম শ্রেণীতে যাঁরা ছিলেন, তারা সবাই এসে বাইরে পায়চারি কোর্‌ছেন। শিল্পীর নিখুঁত আঁকা, কবির কল্পনার মতো একটি তরুণী স্নিগ্ধ চোখদুটি বিস্ময়ে ভরে নদীর শোভা সন্দর্শনে মগ্ন ছিলেন। উদাস হাওয়া এসে তার ভ্রমর-কালো চুলগুলিকে হাতে নিয়ে খেলা করছিল,—এই সেই বীণা!

হেমেন সে প্রতিমাখানি দেখে মুগ্ধ এবং বিস্মিত হোল! জগতের চির-সৌন্দর্য্যের উপাসক সে! সে ভালোবাসে নীল আকাশ,সবুজ শ্যামলিমা, বনের জয়শ্রী, ফুল্ল জ্যোছনা, রঙিন পাখী, নয়নাভিরাম আরো কত সুন্দর দেশ, বন, উপবন।

হেমেন বীণাকে দেখে ভাব্‌লে, দুনিয়ার সেরা সৌন্দর্য্য বুঝি এইখানে, বীণাও তার চোখের পলক না ফেলে হেমেনের দিকে চেয়ে রইল। হেমেন চলে গেল একটু দূরে,—আর ফিরে এলনা! কেবিনে গিয়ে বাঁশের বাঁশী হাতে নিয়ে বাজাতে লাগলো, শেষে বাঁশীটি বুকের ওপর রেখে দিয়ে সে চোখের জলে নিরুদ্দেশের পানে চেয়ে রইল জানালা দিয়ে। হেমেন মাঝে-মাঝে অমনিই কাঁদে। ওর প্রাণে যে কত বেদনা, ব্যথার আলোড়ন ঘুরে ফিরে যাচ্ছে কেউ জানেনা তা'। বেচারী জীবন প্রভাতে হারিয়ে ফেল্লে বাবা, ভাই, বোন,—আপন বল্‌তে ওর কেউ নেই। নীল আকাশে শরতের মেঘ ভেসে উঠ্‌লেই ওর মনের কোণেও কি জানি কেন মেঘ দেখা দেয়। জ্যোৎস্না রাতে সে শুধু বসে কাঁদে আর গান গায়!

বীণাকে দেখে বোধ করি ওর কারও কথা মনে পড়ে থাক্‌বে। বীণাও হেমেনকে দেখা অবধি কেমন-জানি এক আন্‌মনা ভাব হোয়ে গেল। হেমেনের তাতে লক্ষ্য নেই।

রাত্রি তখন সাতটা বেজে গেছে। আকাশের এক কোণে কালো মেঘের বুকে বিদ্যুৎ ঠিক্‌রে যাচ্ছিল।

ষ্টীমারের সারেঙ আকাশের দিকে চেয়ে একবার ষ্টীমারের গতি তীরের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে কূল ধরে গোয়ালন্দের দিকে ষ্টীমার খানিকে ধাবিত করলে। দূরে দূরে ছোট ছোট নৌকা গুলির মৃদু আলো জোনাকীর মত মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল।

গাঙের বুকে তখন মৃদু ঢেউ উঠেছে। সহর ছেড়ে যারা বাইরে খুব কম যান, তাদের অন্তরাত্মা বোধ করি তখন থেকেই কেঁপে উঠল। এখন আর তারার চিহ্ন মাত্র নেই, মেঘেরা দল বেঁধে কোন দেশ হতে চোখের নিমিষে এসে সেখানে পৌছে গেল।

সবারি মুখে একটা গভীর বিষণ্ণ ভাব, যেমন প্রকৃতি, তেমনি জগতের বুকেও। ঐ যে হাওয়া উঠেছে,—কে একজন চীৎকার কোরে উঠতেই সবারি মনে একটা আচমকা শিহরণ খেলে গেল। এক ষ্টীমার যাত্রী, পূজোর ছুটীর মাঝ খানে এঁরা যাওয়া আসা কোরছেন,.........

তারপর বৃষ্টি এল মুষল ধারায়, ঢেউগুলি সব চৌচির হয়ে ফেটে পড়তে লাগল, ষ্টীমারের গায়ে, আকুল গর্জ্জনে, ফেনিল জলোচ্ছ্বাসের উন্মাদনায় আরোহীদের বুকে বিষম ভীতির সঞ্চার হল।

ঝড়-মাতনের সাথে পাল্লা দিয়ে হল্লা করে 'আফগান' আজ বিজয় কেতন উড়িয়ে চলেছে, আর বুঝি সে এগুতে পারছে না। সারেঙ নিজে হাল ধরে, খালাসীরা ষ্টীমারের চারিদিকে দাঁড়িয়ে লোকজনকে আশ্বস্ত করছে। কে কার কথা শোনে? ষ্টীমারে তখন বিষম হৈ-চৈ সুরু হয়ে গেছে! যাত্রীরা সব কাপড় জামা ছেড়ে তৈরী হয়ে রয়েছেন। এই বুঝি জাহাজ ডোবে ডোবে, এমনি ভাব সবার মনে!

মেয়েরা গায়ের গহনা পত্র সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, ছেলেরা বিস্ময়-ভরা চোখে দাঁড়িয়ে মায়ের কোলের কাছে, বৃদ্ধরা হরিনামের মহিমা প্রচার কোরছেন—"হরিবল, হরিবল," সমবেত কণ্ঠের সেই আকুল আর্ত্তনাদ বোধকরি দেবতাদের কাছে গিয়ে পৌঁছে থাকবে। প্রিয়জনের পাশে স্থির ধীরভাবে দাঁড়িয়ে তরুণরা মৃত্যুর অপেক্ষা কোরছেন, তাদের চোখে মুখে উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই।

ঢেউএর উপর ঢেউ, এক একবার ষ্টীমারখানি অসীম শূন্যে উঠে আবার পাতাল পুরীর দিকে যাত্রা কোরছে, দোদুল দোলায় নৃত্য দেখে আকাশের চোখেও আজ আর অশ্রুর বিরাম নেই, একী বিষাদের ধারা না পুলক-উৎস কে জানে!

ষ্টীমারখানি ছুটে চলেছে অসীম বেগে, এখন আর দিক নেই, লক্ষ্য নেই, যেদিকে সে পথ পায়, সবাই করুণ কণ্ঠে হেঁকে উঠছে, তীরের দিকে, তীরের দিকে! কোথায় তীর, কোন দিকে, কে জানে!

কেবিনে ভয়ে কেউ বসে থাকেনি, সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে কখন-কি-হয় দেখবার জন্য ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা কোরছে! বীণা, রমা, রাগিনী, মায়া, এরা সবাই বাইরে দাঁড়িয়েছিল। হেমেন একটা "বয়া" নিয়ে আর এক দিকে চুপ করে বসে আছে, ওর না ছিল ভয়, না দুঃখ, কয়েক জন

চরের মুসলমান অদূরে বসে অদ্ভুত ভাবে আলাপ কোরছে,……ভয়ে, দুঃখে তাদের প্রাণ বুঝি আগেই দেহ ছেড়ে চলে গেছে! আবোল তাবোল বকছে শুনে হেমেন সহসা বলে উঠ্‌লে, ভয় নেই তোমাদের, আমরা তীরের দিকে যাচ্ছি; দু-একজন তাড়াতাড়ি এসে তার গা' ঘেঁষে বস্‌ল। আজ আর টিকিট চেকারের উৎপাত নেই! যে যেখানে সুবিধা পেয়েছে, সেখানেই আস্তানা নিয়েছে।

ঝড়ের বেগ এবার আরো বেড়ে গেল! এবার যে মরণ নিশ্চিত, সে কথা বুঝ্‌তে বোধ করি আর কারও বাকী রইল না। মেয়েরা ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে হুলুধ্বনি করে উঠ্‌লেন! অন্যান্য আরোহীদের, "মা ও মা" রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হতে লাগ্‌ল, তবুও ভগবানের আসন নড়-চড় হ'লনা। নীচের ডেকের ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌লো, আর সে কি ঝাঁকুনি,—আরোহীরা যে-যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সবাই স্থির না থাক্‌তে পেড়ে হোচট্‌ খেয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। প্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হেমেনের মন প্রাণ এক মুহূর্ত্তের জন্য কেঁপে উঠ্‌ল। চোখ ভরে জল এল জন্মভূমির উদ্দেশ্যে, হয়ত মনে পড়ল, তার সোণার গাঁয়ের শ্যামল ছবি খানি, ছোট ভাইবোনগুলি তারই আগমন প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে!

পিছন ফিরে চেয়ে দেখে কে যেন তার পাশে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে, সে ফিরিয়া চাহিল, দেখিল, সে—বীণা,! ষ্টীমারে তখন কে কার খোঁজ খবর নেয়! বাতিগুলি নিবু-নিবু প্রায়! সহসা একটা পাহাড়ের মত উচু ঢেউ এসে ষ্টীমার খানিকে কাৎ করে ফেলে দিলে, শুধু শোনা গেল, ক্ষীণ কোলাহল, যাত্রীর আর্ত্তনাদ, প্রচণ্ড জল কম্পনের বিরাট উচ্ছ্বাস-ধ্বনি, আর কিছু একটা বড় দেখা গেল না। হেমেন "বয়া"টিকে প্রাণ পণে জড়িয়ে ছিল, পাশে তার অজানা সাথী, তাকেও বয়ার সাহায্যে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে নিয়ে অকূল সাগরে ভাস্‌তে ভাস্‌তে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিলে, সে কথা কেউ জান্‌লেনা!

বয়া ধরে আরো কেউ কেউ ভেসেছিলেন বটে, কিন্তু দলে-দলে ডুবে যেতে লাগ্‌ল! শেষ অবধি কি হয়েছিল সে কথাই বল্‌তে গিয়ে আজ অনেক কথা মনে পড়ে! সারারাত্রি কী ভাবে কেটে গেল, তার বর্ণনার ভাষায় নেই, স্বচক্ষে না দেখা অবধি এর বাস্তবতা কেউ সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন না!

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করেনা। ভোরের আলো উঁকিঝুকি দিতেই হেমেন জেগে উঠল। ধরণীর বুকে প্রলয়ের শেষ চিহ্নটুকু সবারই প্রাণে বিষম ভীতির সঞ্চার কর্‌ল বটে, কিন্তু শরতের সেই সুনীল, স্নিগ্ধ আকাশ দেখে ধীরে ধীরে জড়িমা ভেঙে গেল। পুলকের বান ডেকে গেল জলে স্থলে! কে তখন বিশ্বাস কোরবে যে এই নদীরই বুকে কাল প্রলয়ের তাণ্ডবনৃত্য সংঘটিত হয়ে গেছে।

আকাশে রৌদ্র মেঘের লুকোচুরি খেলা সুরু হয়ে গেল। গ্রাম থেকে দলে দলে লোক

এসে তীরের কাছে দাঁড়াল। 'আফগানে'র শেষ চিহ্নটুকু অদূরে বালুচরে পড়ে আছে। ঝড়ের হাওয়ায় ষ্টীমারের ছাদ, রেলিং, যাত্রীদের কে যেন কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে, এ যেন দস্যুরা ভারতের বুক থেকে অসংখ্য মণি মুক্তা কোথায় ছিনিয়ে নিয়ে দেশের বুকে এক প্রলয়োল্লাস জাগিয়ে দিয়ে গেল।

হেমেনের সর্ব্বাঙ্গে অসহ বেদনা, বীণার সংজ্ঞা এক একবার ফিরে আস্‌ছে আবার, "মেজদি" "মা," "বড়দি," বল্‌তে বল্‌তেই জ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌ছে।

গাঁয়ের লোকেরা মৃতের স্তূপ থেকে মাত্র এ দুজন লোককে বের করে নিয়ে শুশ্রূষা কোরতে লাগ্‌ল। কত বড় বড় গাছ পথের আশে পাশে পথরোধ করে পড়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। ষ্টীমারের অন্যান্য আরোহীদের কথা এবং মাঝিমাল্লার খবর পরে পাওয়া গিয়েছিল। জন পনরো নরনারী মৃত্যুর দ্বারে অতিথি হোয়েছিল আর বাকী সব অর্দ্ধমৃত ভাবে দূরে বালুচরে পড়েছিল।

চার পাঁচ দিন পরে বীণা সুস্থ ও সবল হোয়ে উঠ্‌ল, হেমেন কোনমতে চলাফেরা কোরত।

বীণা জিজ্ঞাসা কোরলে,—এখানে কোন টেলিগ্রাফ অফিস নেই! একটা খবর দেবেন, না হলে যে আমি আজই মরে যাব!

হেমেন হেসে জবাব দিলে, কেন বীণা, আমিই তোমায় দিয়ে আসব। তোমার কোন ভয় নেই!

সে তো আমার অজানা নেই! মরণের বুক থেকে যখন ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন, তখন বাকীটুকু কি আর আপনি শেষ না করে যাবেন?

হেমেনের চোখে তখন আনন্দাশ্রু উপচে উঠছে!

কোলকাতায় হেমেনের কাছে ষ্টীমার ডুবির কথা শোন্‌বার জন্য বীণার আত্মীয়েরা উৎকণ্ঠ চিত্তে কাল যাপন করেছিল! বীণার মেজদি মীরার হেমেনকে বড় ভালো লেগেছিল! সারাদিন বসে গল্প শোনায় মীরার বিশ্রাম ছিল না। খবরের কাগজে ষ্টীমার-ডুবির কথা, হেমেনের ও অন্যান্য যাত্রীদের দুরবস্থার কথা সবাই পড়েছিল,—ওকে নিয়ে সবাই আনন্দ পায়। মায়াদি একদিন কথায় কথায় বল্‌লে, বীণার সাথে ওর বিয়ে হোয়ে গেলে মন্দ হয় না, মীরা, তুই একদিন বলে দেখনা দু'জনকে। তোর কথা ওরা দুজনেই মেনে নেবে। আহা বড় দুঃখ হোল, হেমেনের কথা শুনে, ওর বাবা-ভাই-বোন সবাই নাকি চলে গেছেন এ সংসার থেকে! ছেলে মানুষ, একা পড়েছে জগতের বুকে, তবু ওর ঠোঁটে যেন হাসিটুকু লেগেই আছে। আর কি মিষ্টি কথা বলে। মীরা একটু খানি হেসে বল্‌লে,... ও আবার লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা গান লিখে। বীণা বল্‌লো, বিক্রমপুরে যখন ওরা ছিল, ভোর বেলা বসে ও কবিতা আর গান লিখ্‌ত, একদিন নাকি ধরা পড়ে গেছল বীণার কাছে, আর ওসব গেঁয়ো-গান, ভারি মিষ্টি। মা তো হেমেন বল্‌তে অজ্ঞান, হেমেনকে তার এত ভালো লাগে।

মানুষের জীবন কবিতা নয়,—অন্ততঃ দূর থেকে তাই মনে হয়। কবি গান গায় উদাসকরা পূরবী সুরে, দুনিয়ার বুকে জাগে তার ঢেউ, কিন্তু দোদুল দোলায় কারও প্রাণ নেচে ওঠে না। নদীর কুহক মানুষের মনে কত কথা ডেকে আনে। হেমেনের বুকে খেলা করে অসীম সাগরের শাদা ঢেউগুলি, বালুর বেলায় ঘুমিয়ে থাকে ক্ষণিক স্মৃতি, ক্ষণিক মোহ, তবু ক্ষণকালের আনন্দ নিয়েই সে এমনি ভাবে মানুষের বুকে জেগে ওঠে।

একদিন কলেজ ফেরত বীণা এসে চুপ করে বসে আছে। হেমেন আজ চলে গেছে কত দিন। কোন খোঁজ খবর তার নেই! একটা নিঃশ্বাস ফেলে বীণা দূরের পানে চেয়ে দেখল লাল, সাদা, শুধু উঁচু বাড়ীগুলি দাঁড়িয়ে আছে ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বভরে। চোখে বুজে সে দেখে দূরে,—বহু দূরে ঢেউ-জাগা-নদী, তীরে তার শ্যামল গায়ের স্মৃতি। সে ভুলে যায়, পদ্মার তীরে, না যোঁড়াসাঁকোর বিশাল হর্ম্মের প্রকোষ্ঠে হেমেনের চিন্তায় মগ্ন! বীণা আজ উদাস কবি, সে গান গায়, কবিতা লেখে হেমেনের কবিতা, গান যে সব কাগজে বেরোয়, সে কলেজের কমনরুমে বসে সেগুলি নিজের নোটবুকে টুকে নেয়। বড় ভালো লাগে তার সেই গানগুলি।

বীণা মাসিক পত্রিকা অফিসগুলিতে হেমেনের ঠিকানার খোঁজ খবর নেয়, সে ঠিকানায় চিঠি দিলে মাসখানেক পরে ডেডলেটার আফিস থেকে চিঠি ফেরত আসে।

তবু বীণা তাকে চিঠি লেখে। বীণার চিঠি কত দেশ, কত নদী, কত গাঁয়ের স্মৃতি বুকে করে ফিরে আসে, বেদনায় ও অসহ দুঃখে বীণার তরুণ মন সহজেই ভেঙ্গে পড়ে। শত হ'লে ও সে তো ছেলে-মানুষ। মীরা এসে মাঝে মাঝে সান্ত্বনা দেয়, হেমেন বোধ করি ইহজগতে নেই...... বীণার চোখ দুটি সহসা ছল ছল করে ওঠে, অমনি বলে ওঠে, বিদেশ থেকে একবার ঘুরে আস্‌ব ভেবেছি! কোথা যাবে? সুইজারল্যাণ্ডে? নগেনদা' এখন ইয়োরোপে আছেন, লিখ্‌ব চিঠি তার কাছে?

হেমেনের সাথে তার যে আর দেখা হবেনা, এ কথা সে কোন দিন বিশ্বাস করেনি। তাদেরই কলেজে মণিকা বলে একটি মেয়ে পড়ত, দেশ বিক্রম পুরে, আই-এ পাশ করেছিল বরিশাল কলেজ থেকে! সে নাকি হেমেনকে জানে। কথায় কথায় একদিন বল্‌লে, হেমেনকে সে দেখে এসেছে দার্জিলিঙে, সাথে তার স্ত্রীও নাকি ছিলেন,...এমনি-কি-একটা কথা শোনা অবধি বীণার মুখে হাসি তামাসা বহুদিন কেউ দেখেনি!

বাদলের শেষে আকাশ যখন গাঢ়নীল হয়ে ওঠে, পল্লীর আনাচে কানাচে শেফালি ফুট্‌তে সুরু করে, সাদা মেঘের ভেলার পাশ দিয়ে দূরে,-অতি দূরে বলাকার সারি,···সারি গান গেয়ে ভেসে যায়, কাশের বনে ঢেউ জেগে ওঠে,···বীণার আকুল, অধীর প্রাণ আরো অসহ ব্যথায় ভরে ওঠে! কত বার সে বিদেশে যাবার জন্য কাকুতি-মিনতি করেছিল মা-বাবা কিছুতেই রাজী হননি!

প্রেমেনের সাথে তার বিয়ে হ'বার পরও এমনি দু'একবার শরতের ফোটা ফুল দেখে সে অধীর হয়ে উঠেছে!

* * * *

কিন্তু মানুষের মন লইয়া যিনি নিত্য ছিনিমিনি খেলা খেলিতেছেন, তাহাকে উপেক্ষা করা মানুষের দুঃসাধ্য; একমাত্র কালপ্রবাহের আলোড়নে মানুষের স্বপন-স্মৃতি ভেসে থাকে, এবং এই টুকু না থাক্‌লে বোধহয় এতদিনে বিশ্বের সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যেত!

দুনিয়ার এই রঙিন খেলার লুকোচুরি কোন অনাদি কাল থেকে ভেসে আবহমান কালের কপালে ডুবে যাচ্ছে, মানুষ তার খবর জানে না!

এখন ও মানুষের দ্বারে শরত অতিথিরূপে দেখা দেন, আগমনে তার জলে স্থলে আনন্দের আলিপনা এঁকে দেয় বিধাতার মানসী কন্যা প্রকৃতি দেবী! জ্যোৎস্না নিজের মনেই হাসে, আবার চোখের জলে বিদায় নেয় ধরণীর কাছে! চোখের জল তার জমে থাকে সবুজ ঘাসের বুকে, বনের ফুলে, গাছের পাতায় পৃথিবীর আনাচে কানাচে, মানুষ জানেনা, এ নিত্যকার অশ্রু কার এবং কেন বৃথা ঝরে যায়··· ··· ··· ···!

আজিকে তোমায় পেয়েছি

শ্রীননীবালা সরকার

আজিকে তোমায় আপন ভাবে
পেয়েছি হৃদয় মাঝে;
নব রাগিণীতে বীণাখানি তব
আমার অন্তরে বাজে।
তব প্রেমে আমি হয়েছি মগন,
হেরেছি তোমায় তৃষিত নয়ন,
ললাটে আমার পুণ্য আলোকে
বিশ্ব প্রেমের জ্যোতিঃ রাজে।
স্বরগ, নরক সব কিছু আজি
তোমাতে পেয়েছে লয়—
বিশ্বখানি দেয় অনুক্ষণ
বিশ্বরাজ্যের পরিচয়।

'উঁচু আর 'নীচু' মিথ্যারি রচনা,
সবে সমজ্ঞান সত্যের প্রেরণা,
বিশ্ব ব্যাপিয়া রয়েছে সবাই
নিয়োজিত তব কাজে।
চিনেছি তোমারে, পেয়েছি এবার,
ভুলিব না এ জীবনে;
ভুল ভ্রান্তি সব ছুটে গেছে মোর,
নব জ্ঞান জাগে মনে—
সবাই আমার, আমি সবাকার,
একেলা আমি যে অতীব অসার,
জগতের সনে এক হ'য়ে আমি
সাজিব বিরাট সাজে॥

দুই নারী

শ্রীআশালতা দেবী

(৫)

যেদিন ওরা চিত্রায় গেছিল, তার পরে সপ্তাহ খানেক হয়ে গেচে। সুধীরা নীরেনের কাছে দোষ স্বীকার করেচে। সুজাতার বাড়ীতে ওকে নামিয়ে দিয়ে মোটরটা রাস্তায় পড়্তেই, সুধীরা নীরেনের একটা হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে বল্লে, 'আমাকে মাপ কর। আজ তোমাকে অনেক শক্ত কথা বলেচি। কী যে আমার হয়েছিল তা নিজেই বুঝতে পার্‌চিনে।'

নীরেন গম্ভীর হয়ে বললে, 'তুমি না পারো, আমি পেরিচি। আজ তোমার রীতিমত ঈর্ষা হয়েছিল। ছিঃ সুধীরা, তুমি এত সাধারণ! এত ছোট! আমি যে তোমাকে কল্পনায় অনেক বাড়িয়েছিলুম।'

সুধীরা আবদ্ধ হাতটা ছেড়ে দিয়ে বল্লে, 'কখখনোনা। আমার হয়েচে ঈর্ষা! আমি অত নীচ নই। যে যেমন সে অপরকে তেমনই করে দেখে।'

বলাবলির পর দু'জনেই চুপ্। রাত্রি প্রায় দশটা বাজে। গাড়ীটা ল্যান্স ডাউন রোডের মোড়ে ঘুরল। নীরেন মুখ বাড়িয়ে ড্রাইভারকে বল্লে, 'লেক্ হয়ে ঘুরে চল, সোজা বাড়ী যাবার দরকার নেই। কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি। মেঘলেশহীন ইস্পাতের মত কালো লক্‌লকে আকাশে তারাগুলি অত্যন্ত দীপ্ত হয়ে ফুটেচে। সুধীরা শক্ত হয়ে এককোণে বসেছিল। নীরেন বল্লে, "সুধীরা, আমাকে ভুল বুঝ্‌ছ কেন? আমি আদর্শবাদী মানুষ। আমার প্রেমের আদর্শ অনেক বড়। আমি যদি ছোট কিছু চাইতাম, তা'হলে তোমার আজকের ব্যবহার অনায়াসেই ক্ষমা করে ফেল্তাম। হয়ত বা আমার চোখেও পড়্ত না। মনে নেই তোমার যেদিন আমাদের বাড়ীর ছাদে বসে, তোমাকে গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দির ফারসাইথ্ সাগার ভালো ভালো জায়গাগুলো পড়ে শোনাচ্ছিলুম। আইরিণার স্বামী সোম্‌স্‌য়ের কথা শুনে তুমি ঘৃণায় কণ্টকিত হয়ে উঠেছিলে, বলেছিলে, পরস্পরের মাঝে ভালোবাসায় এই কর্ত্তৃবাচ্যের পদটা উঠিয়ে দেওয়া চাই-ই। যেখানে ভাবের আর ভালোবাসার সম্বন্ধ সেখানে অহরহ এই সন্দিগ্ধতা, নিজের সীমায় গণ্ডী দিয়ে ঘিরে রাখ্‌বার অসহ্য নীচতা কিছুতেই সহ্যকরা চল্‌বেনা।"

"সুধীরা, সেদিনও ত আমিই তোমার পাশে বসেছিলুম। সেদিন তোমার কথা শুনে আনন্দে, গর্ব্বে আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলুম। সে রাত্রিতে তোমাকে আমি কি বলে ভাব্‌ছিলুম, মনে মনে কতো বাড়িয়েছিলুম……", সুধীরা স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্লে, 'কিন্তু ভেবে দেখ, কথা বলা আর জীবনে তাকে মেনে চলা, এদুটোর মধ্যে একটা মহাদেশগত ব্যবধান।'

'তার মানে?'

'মানে আর কি, যেদিন তোমার আর আমার কথা গুলো খুব বড় বড় আর ভালো

ভালো কথা ছিল। কিন্তু কথার কতটুকু দাম? যতক্ষণ না জীবনের আগুনে তার পরীক্ষা হোল? অবশ্য কথাটা তুমি তুল্‌লে তাই বললুম। আমার আজকের ব্যবহারের কৈফিয়ৎ হিসেবে বলিনি। আজকের আচরণ আমার খুবই 'impulsive' হয়েচে স্বীকার করচি। আর তার জন্যে তোমার কাছে মাপ চেয়েছি, আজকের ব্যবহারের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খাড়া করে তোমার সঙ্গে বাদানুবাদ করব। তত ইতর বোধকরি আমি নই।... ......' হঠাৎ ওর গলার আওয়াজটা একেবারে বদ্‌লে গেল। স্নেহে বেদনায় যেন তা সার্দ্র হয়ে উঠ্‌ল, "কিন্তু নীরেন যত অপরাধই হয়ে থাক, আমার সেকি কেবল তোমায় জন্যেই নয়?" নীরেন হঠাৎ চম্‌কে উঠল। সুধীরা অনেকদিন পর আজ এই প্রথম ওকে নাম ধরে ডাকলে। ইদানিং পারত পক্ষে সে তাকে আর নামধরে ডাকেনা, নীরেন তাই নিয়ে সুধীরাকে কত ঠাট্টা করেচে, বলেচে, 'সুধীরা যতই আধুনিক হবার চেষ্টা কর মেয়েমনের সংস্কার যাবে কোথায় সে সর্ব্বত্রই এক। কিন্তু এখনও ত পূরোপূরি তোমার মালিকানা সত্ব পাইনি—যে নাম ধরে ডাকলেই অদৃশ্য কোতোয়ালকে হাঁক পাড়্‌ব!'

সুধীরা বলেচে, 'তাই বইকি, তোমার ভয়ে ত আমি দিবারাত্র মরচি। আসলে কি জান যাকে ভালো বাসি তার নাম মনে মনে থাক্‌বার জিনিষ। লোকের সুমুখে হাটের গোলমালে বার বার তাকে বলে তার মাধুর্য্য নস্ট করব কেন?'

আজ কতদিন পরে আবার ওর এই নাম ধরে ডাকায় হয়ত লুকিয়ে আছে কত প্রচ্ছন্ন অভিমানের বেদনা। নীরেনের কাছে যে অধিকার পেয়ে সুধীরা তার নামকে অনুচ্চারিত আবেগে আপন মনে ব্যাপ্ত করে রেখেছিল, কোন প্রয়োজনেই বাইরে তা ব্যবহার কর্‌তে ওর বাধত—সেই নাম ধরে আজ আবার ডাকার মধ্যে ও কা কথা প্রকাশ করতে চায়! ওকি মনে করেচে, নীরেনের ওপরে ওর আর সে পূর্ব্বতন অধিকার নেই?

নীরেন সুধীরার হাত দুটি ধরে ফেলে বল্‌লে 'অপরাধ তোমার কিছুই হয়নি, সুধীরা। কিন্তু তোমার ব্যবহার আমি ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারচিনে। তুমি নিজেইত বার বার জিদ কর্‌তে সুরু করলে তোমার বান্ধবীকে সঙ্গে নেবার জন্যে। তাছাড়া······সুজাতা······'

সুধীরা ওকে থামিয়ে দিয়ে বল্লে, 'যেতে দাও ওকথা, ছিছি, আমি কি তোমাকে শেষে তাই মনে করব যে তুমি কোন সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে দু'ঘণ্টা একত্রে বায়স্কোপ দেখেই তার সঙ্গে ফ্লার্ট করতে সুরু কর্‌চ!'

নীরেন অভিমান করে বল্‌লে, 'কিন্তু তাইত মনে করেচ তুমি। আর তাইত এতক্ষণ ধরে যা নয় তাই বলে আমাকে বিঁধলে।'

'না—না তা নয়। আমি কাঁদছিলুম আমার আপন কান্না। তাতে তোমাকে জড়াবার আমার লেশমাত্র ইচ্ছা নেই।'

'কিন্তু কান্নার হেতুটা কি শুন্‌তে পাইনে?'

'বল্‌ব না। তবে আমার বড্ড ভয় হয় মাঝে মাঝে, আমি যে তোমাকে বাঁধলুম, কিন্তু তোমাকে বাঁধবার আমার এমন কী যোগ্যতা আছে। তাইত সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকি। একটুতেই সমস্ত মন কেঁপে ওঠে।' নীরেন সুধীরার হাতটা ছেড়ে দিয়ে বল্‌লে, আবার সেই বাঁধাবাঁধির কথা, অসহ্য! মেয়েরা চিরকালই এক। বাইরে যতই পালিশ দাও তোমাদের গোড়াকার কথা, সব জায়গায় সকল ক্ষেত্রেই এক।'

সুধীরা বিবর্ণ মুখে বল্‌লে, 'তাহবে। তুমি ঠিকই ধরেচ, আমি ভয়ানক অসহিষ্ণু, আমি তোমার অযোগ্য। ইচ্ছা হয়ত আমাকে ঘৃণা ক'র।'

যাকে ভালো বাসি তাকে ঘৃণা করার অপবাদ দেওয়া অসহ্য। নীরেন বল্‌লে, 'সুধীরা, আমাকে কষ্ট দিয়ে তোমার কী লাভ হবে বলো ত? আমি করব তোমাকে ঘৃণা! আরও তোমার হাতে কোন নিষ্ঠুর কথার বাণ নেই? থাম্‌লে কেন? এরই মধ্যে থাম্‌লে কি চলে? বলোনা আরও যদি কিছু বল্‌বার থাকে।'

সুধীরার সমস্ত অভিমান নিমিষে গলে গিয়েছে। কিন্তু এমন মধুর শাসন, একে সংবরণ করবার লোভ থামিয়ে রাখাও যে দুঃসাধ্য। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে মৃদুকণ্ঠে বল্‌লে, 'সত্যইত তোমাকে দেবার মত আমার কী আছে? সুজাতা দেখ্‌তে আমার চেয়ে ঢের সুন্দরী!' নীরেন হেসে উঠে বললে, 'আর আমি যদি বলি ওপাড়ার রামবাবু দেখ্‌তে আমার চেয়ে অনেক ভালো'

'রাম বাবুর কথা আলাদা, সে তুমিও জান আর আমিও জানি। কিন্তু সত্যি করে বলো ত আজ সুজাতাকে দেখে তোমার মনে মনে আফশোষ হচ্ছে না? মনে হচ্ছে না যে এককালে একবার মুখের কথায় হাঁ বললেইত একে পেতে পারতুম।'

নীরেন একটু গম্ভীর হয়ে বললে, ক্ষমাকর সুধীরা, একবারও এমন লোভ মনে হয় নাই। কোন মেয়ে মানুষের রঙ একটু ফর্সা কার নাক একটু টিকালো তাই নিয়ে যদি মিনিটে মিনিটে পছন্দ বদল করে হাহুতাশ কর্‌তে হয়, তা'হলেও জীবনের কোন অর্থই হয় না।' খানিকক্ষণ থেমে এবারে গাঢ় সুরে বল্‌লে, 'তা' ছাড়া ওঁর সামনে এসব কথা মনে ওঠ্‌বার অবকাশই পাওয়া যায় না। ওঁর মুখে এমন একটি দুঃখের প্রশান্তি, সকরুণ ধৈর্য্যের মহিমা……'

সুধীরা অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল, কোন রকম করে প্রসঙ্গান্তরে যেতে পার্‌লেই যেনও বেঁচে যায়। তাই নীরেনের কথাটা শেষ হবার পূর্ব্বেই বাধা দিয়ে বললে, 'আঃ—এতক্ষণে একটু আরাম পাওয়া গেল। যাই বলো আজকে যতক্ষণ টকি দেখেছি, আমার একটুও ভালো লাগে নি। এত গরমে মানুষের মাথার ঠিক থাকে।'

নীরেন হেসে ফেলে বল্‌লে, 'আজ তোমার কেন এত গরম লাগ্‌চে সুধীরা? চিত্রায় আমাকে নিয়ে কি টানাটানিটাই না কর্‌লে বলোতো! খেয়াল হোল অমনি বলে বস্‌লে, সোডা ফাউণ্টেনে যাও। যেন সোডা ফাউণ্টেনে যাওয়া মুখের কথা চিত্রা থেকে!'

সুধীরা লজ্জাপেয়ে বল্‌লে, 'আসলে আমার ভারি ইচ্ছে ছিল, তুমি আর আমি দু'জনে একসঙ্গে বসে ছবি দেখি।'

নীরেন চাপাহাসি ভরা কণ্ঠস্বরে বল্‌লে, 'তাহত দেখেছিলুম।'

'তাই বলি কি।'

নীরেন হেসে উঠে বল্‌লে, 'তা'হলে আমার যা দুঃখ তোমারও তাই। আর আমি বুঝেছিলুমও ঠিক, যে গরমের ভণিতা তোমার অছিলা মাত্র। চতুরিকার আসল মনের ধারা বইচে, এসব তুচ্ছ কথার থেকে আরও অনেক...অনেক দূর দিয়ে।'

'যাও—কী যে বলো!'

'যা বলেছি, ঠিকই বলেচি। কিন্তু দোষটা কার বলো ত?' 'কেন তুমি অমন সময়ে আমাকে চিত্রার যাবার অনুরোধ কর্‌লে? ভদ্রতাবলেও ত একটা জিনিষ আচে, অন্ততঃ তার খাতিরেও সুজাতাকে আমাদের সঙ্গে আস্‌বার অনুরোধ করা উচিত।'

নীরেন মিষ্টিকরে বল্‌লে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, পরাজয় স্বীকার করলুম। কিন্তু সুধীরা এইটুকু মনে রেখো লোকের সঙ্গেই থাকি আর তোমার সঙ্গেই থাকি আমি যার তারই। বুঝেচ? এই কথাটা যদি মনে রাখ্‌তে পার তা'হলে দেখ্‌বে সমস্ত ভুল কথাই পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

ততক্ষণে ওদের মোটরটা সুধীরাদের বাড়ীর গেটের কাছে দাঁড়িয়েচে, নীরেনের দিকে একবার গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে সুধীরা নেমে গেল।

সুধীরা নেমে যাওয়ার পরে নীরেন অন্যমনস্ক হয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। এতক্ষণ হাল্কা মিষ্টি কথাবার্ত্তা বেশ লাগ্‌ছিল; অভিমান ভাঙ্‌বার পালা শেষে মনটা শ্রান্ত লাগ্‌ছে। এইসব হাল্কা রস তুচ্ছ ব্যথাকে অতিক্রম করে ওই দূর আকাশের তারা যেন কার স্থির বেদনাহত দৃষ্টির মত অনিমেষে চেয়ে আছে।

অনেকদিন পর নীরেনের আজ নিজেকে একলা লাগ্‌চে। মনে হচ্ছে যাকে পাওয়ার তাকে পাওয়া হোল না। সমস্ত টুকরো টুকরো কথা, হাসি, স্পর্শ মান-অভিমানের খেলা এ সমস্তকেই ছাপিয়ে মনের একটা চিরায়মান দিক বল্‌চে, যে আমার চিরকালের প্রিয়া, রাত্রির অন্ধকারে যার সঙ্গে মন জানাজানি; সমস্ত হৃদয় মনকে গভীর রসে সিক্ত করে দেবার প্রেয়সী নারীকে কোথায় খুঁজে পাব? এমনি ধরণের এক একটা অপূর্ণতার আভাস, নিঃসঙ্গতার ভার মনে জেগে ওঠে কখনো কখনো।

নীরেন মোটর থেকে নেমে অন্যমনা হয়ে তার শোবার ঘরে যেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে যখন চুপ করে চৌকিতে বস্‌ল, তখন তার মনটা এমনি ভাসা ভাসা একটা অনির্দ্দেশ বেদনায় পীড়িত হচ্ছিল।

রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা টেনে নিয়ে পড়্‌তে বসল, ভালো লাগ্‌ল না। প্রিয়লেখক

কারো কারো রচনা থেকে কিছু পড়্‌বার চেষ্টা করল, মন বসল না। সিগারেটটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে, দুই হাতের মধ্যে মাথা রেখে ভাবলে, কত অল্পই থাকে। জীবনের এবং মনের উচ্ছ্বসিত অবস্থায় যা নিয়ে সহজেই বাড়াবাড়ি করি, যতটুকু পেয়ে মনে করি পাওয়ার বুঝি বা সীমাপরিসীমা নেই, এমনই সঙ্গহীন হৃদয়ের গভীরতম আকুতির মুহূর্ত্তে তাদের কত অল্প লাগে।

মনে হয় কত অল্পই টিঁক্‌ল। সত্যের আগুনে সমস্ত স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়ে চোখে পড়ল, বুঝিবা। কিন্তু এসব মুহূর্ত্ত ক্ষণকালের। সে রাত্রির পরে প্রভাতের সুস্থ জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের তুচ্ছ লীলার অপরূপ মাধুর্য্যে নীরেন আবার নেমে এসেচে। কিন্তু একটা অভাবের বেদনা তাকে মাঝে মাঝে বিঁধ্‌তে থাকে এবং উতলা করে দেয়। তারসঙ্গে মুখোমুখী বোঝাপড়াকে ও ভয় করে। হয়ত বা সকল সময়ে টেরও পায় না। দিন যাচ্ছে কেটে এবং দিনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েচে আমাদের আর্টিস্‌ট্‌ নীরেন। সুধীরার সঙ্গে পূর্ব্বরাগের পালায় এমন বন্যমধুর অভাব ঘটে নি। তবে যদি কখনো সিগারেট খেতে খেতে, বাইরের শুক্লজ্যোস্নার দিকে চেয়ে ও মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, সুধীরার অসহিষ্ণু প্রেমোত্তাপকে ছাড়িয়েও ওর মন আর কারো স্বপ্নদেখে সেটা বোধকরি হৃদয়ের অবাধ্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

* * *

সেই ওদের চিত্রায় যাবার দু'দিন পরে সকালে সুজাতা বেড়াতে এসেচে। জানালার গরাদে মাথা রেখে বল্‌লে, সুধীরা, যে আমাকে একটা গান শোনাবে ?

কোন জবাব এলনা। সুধীরার মুখ-ভাব কঠোর। এইত সেদিন চিত্রাথেকে ফিরে আসতে আসতে মোটরেও নীরেনকে কত বোঝালে যে সুজাতার প্রতি ওর লেশমাত্র বিরাগ নেই, বিদ্বেষ নেই, ঈর্ষা নেই। কেবলমাত্র বোধকরি গ্রীষ্মাধিক্যের জন্যই সেদিন তার মনটা অকস্মাৎ অমন বিকল হয়েছিল। কিন্তু আজ আবার সেই সুজাতার সঙ্গে মুখোমুখি বসেই ওর মন বিমুখ হয়ে উঠ্‌ল। সমস্ত সূক্ষ্মতম চুলচেরা যুক্তিকে ও পরাস্ত করে জেগে উঠল তার বিরুদ্ধে একটা বিতৃষ্ণার ভাব। মেয়েমনের আশঙ্কা বুঝি বলা যেতে পারে একে। সুমুখে সাদা চোখে কিছুই দেখা যাচ্ছেনা তবু এক একটা ব্লাড্‌হাউণ্ড মাটিতে একটু আঘ্রাণ নিয়েই যেমন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে......প্রতীক্ষা করে থাকে একটা আসন্ন বিপদের। সুধীরা বিংশ শতাব্দীর প্রেমের দীক্ষিতা মেয়ে, ইব্‌সেন গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি পড়া মেয়ে যে অনায়াসেই নীরেনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বল্‌তে পারে, প্রেমের আঙ্গিনায় আমার বেদনা দিয়ে তোমাকে বেঁধে রাখব ! তাওকি হয় প্রিয়তম ! প্রেমের চেয়ে মুক্তি বড়। আর সেই মুক্তির স্বাদই তোমাকে আমি দেব।' এমন বড় বড় আইডিয়া যে উচ্চারণ করতে পারে কালচারের পালিশে ঝক্‌ঝকে সেই মেয়ের মনেও ব্লাড হাউণ্ডের মত একটা ইনষ্টিংটিভ্‌ যুক্তিহীন ভয় জেগে উঠ্‌ল। তাই সুধীরা অনুরোধমাত্রই বাজনার কাছে যেয়ে গান সুরু করবার চেয়ে বিরস মুখে চুপ করে বসে রইল। কিন্তু কী আশ্চর্য্যমেয়ে এই সুজাতা। ওর

বিষণ্ণ মধুর হাসি দিয়ে, সুধীরার মনের মেঘকে ও টুকরো টুকরো করে ভাসিয়ে দিলে। বল্‌লে, ভাই সুধীরা, একটা গান করতে তোমার আপত্তি কী? তুমিত জানোনা তোমার গান আমি কত ভালোবাসি! জীবনের নানা ক্লেশে যে সব জিনিষে আমি আশ্রয় পেয়েচি, তার মধ্যে গান একটা ......এবং বিশেষ করে তোমার গান ..।'

সুধীরা বাজনার ডালাটা খুলে, একটা মীরার ভজন গাইলে—

মীরাকে প্রভু গহির গম্ভীরা।
হৃদয়ে রহোজী ধীরা ॥
আধিরাতে প্রভু দরশন দীইহে।
প্রেম নদীকে তীরা ॥'

গাইতে গাইতে ওর নিজের মনেও একটা সজল শান্তি জেগে উঠ্‌ল। গান শেষ হয়ে গেছে, সুধীরা আলস্য করে তখনও বাজনার ডালা বন্ধ করেনি। রীডের উপর হাত রেখে অন্যমনস্ক হয়ে বসে রয়েচে, সুজাতা ডাক্‌লে, 'সুধীরা।'

সুধীরা, একটু চমকে উঠে ওর দিকে চাইলে 'কি বলচ?' 'সুধীরা, তুমিত আমাকে 'সুজাতাদি' বলেই ডাক।'

'কেন? তাতে কি হয়েচে?'

'কিছুই হয়নি। কিন্তু ওটা কি কেবলমাত্র একটা মুখের ডাক সুধীরা।'

সুধীরা জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে রইল। চোখ দুটি ছল ছল।

'তুমি কি মনে কর জানিনে ভাই, কিন্তু তোমার মুখের এই ডাককে সত্য করে তুল্‌তে যে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে ভাব্‌তে হচ্চে। আমি কি সত্যি তোমার দিদি হতে পারিনে—সুধীরা?' বলার সঙ্গে সঙ্গে ও সুধীরার হাত দু'টি নিজের হাতে তুলে নিলে।

'আমাকে নিয়ে তোমাদের মাঝে, লেশমাত্র ভুল বোঝা হয় সে যে আমার পক্ষে মর্ম্মান্তিক ভাই। তোমাদের জন্যে আমার মনের যে কল্যাণকামনা যে শুভেচ্ছা তা সূর্য্যের আলোর মত স্বচ্ছ সাদা। তোমরা ভুলেও যেন এতে কোন রঙ্গীন আলোর জটিলতা এনোনা। এই টুকুই কেবল তোমাদের কাছে আমার প্রার্থনা।'

এর পরে সুধীরার পক্ষে চুপকরে থাকা অসম্ভব। ওর আবেগ শতধা হয়ে পড়্‌ল। সুজাতার ওপরে অবিমিশ্র শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় ও ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল। এবং নিজেকে মনে মনে খুব কড়া করে শাসন কর্‌লে যে সত্যিই সে নীরেন বা সুজাতার যোগ্য নয়। এদের উদার মনের কাছে সে খুব ছোট। ওরা গভীরতর স্বপ্নে ভরপুর। ওদের তুলনায় সে কী। এর পরে আর ওর দ্বিধার অবকাশ রইল না। সুজাতা ওর স্নেহময়ী বন্ধু হয়ে উঠ্‌ল এবং নীরেনের উপর থেকেও অভিমানের কুয়াসা গেল কেটে। নীরেন আজকাল প্রায়ই একসঙ্গে সুধীরা আর সুজাতাকে পায় এবং একলা সুধীরাকে কদাচিৎ কখনো পায়। অথচ প্রেমিক সুলভ নিঃসঙ্গতার

জন্যে ওর মনে মনে যৎপরোনাস্তি কাতর হয়ে উঠেচে সে কথাও হলফ্ করে বলা যায়না। বরং ওর যেন বেশ ভালোই লাগ্চে। নীরেন যদি এত বেশি উচ্ছাসিত হোত, জীবনের লীলায় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে বুদ্বুদ ফেটে পড়ে, ক্ষণকালের সেই অনির্ব্বচনীয়তার মধ্যে নিঃশেষে ডুবে যাবার ক্ষমতা যদি ওর এত অপর্য্যাপ্ত না থাকত। মানে বর্ত্তমানের হৃদয়াবেগকে উজান বেয়ে যেতেও, যদি ওর নিজেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচার কর্বার ক্ষমতা থাকত ; তাহলে ও নিশ্চয়ই ধর্তে পারত, ওর মানসিক জগতের পরিবর্ত্তন। বুঝ্তে পারত যে ওর জীবনের আকাশে আর একটা নক্ষত্র উঠেচে। আগেকার তারা এখনো অস্ত যায় নি বটে। কিন্তু সে ম্লান। নীরেন সাহিত্যিক কিন্তু সিনিক নয়। যে স্রোত বেয়ে ও চলেচে মনে মনে সেই চলমান স্রোতোবেগ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেয়ে দেখ্বার যে আত্মবিশ্লেষণ ক্ষমতা তা ওর নেই। তাই ও নিমিষেই বিচলিত হয়। উপস্থিত মুহূর্ত্তে সমস্ত মন প্রাণ নিয়ে আকণ্ঠ ডুবে যাওয়া—এতই সহজে, সে নীরেনই পাবে। ও লিখ্বে। হাঁ ও লিখ্বে বই কি। হয়ত আমরা বছর দুই পরে একখানা আন্কোরা নতুন খাঁটি মনস্তত্ত্ব-মূলক উপন্যাস হাতে পাব। নীরেন্দ্রনাথ সেনের লেখা হয় ত তার নাম হবে—'দুই নারীর প্রভাব বা এম্নি একটা কিছু। কিন্তু এখন তার দেরী আছে। যেদিন নীরেন, মিলিয়ে যাওয়া জীবনের তট রেখাকে কূলে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট তন্ন তন্ন করে দেখ্তে পাবে ; এখনও তার দেরী আছে।

৬

বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে, নীরেন ওর মামীমাকে উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্লে, 'বাস্তবিক কাল সন্ধ্যেবেলায় এমন একজন মেয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ হবে, যে সাধারণ মেয়েদের মত নয়। তাদের চাইতে ঢের উঁচুতে। তার মনের গভীরতা তার মনের করুণ শান্তি তাকে সকলের চেয়ে আলাদা করেচে। এমন কি তাকে দেখলেই সে নিজেকে চিনিয়ে দেবে। এক নিমিষের জন্যেও ভুল হতে দেবে না, সকলের সঙ্গে তাকে এক করে দেখ্তে।'

মামীমা হাসি চেপে জিজ্ঞেস করলেন ; 'কে ··· সেই মেয়েরে ?'

'তাকে তুমি শুক্রবার সন্ধ্যেয় নিশ্চয় দেখ্তে পাবে। তার সঙ্গে কাল তোমার প্রথম আলাপ হবে, মনে করে তোমায় ওপরে আমার দস্তুরমত ঈর্ষা হচ্চে।'

মামীমা নীরেনেরই প্রায় সমবয়সী। তাই ওঁকে সম্ভ্রম করে কথা বলার চাইতে, নীরেন সমবয়সীর মতই মনখুলে কথা বলে। কখনো কখনো দুটো একটা হাসি তামসা ও যে না করে তা নয়। তিনি আঁচ্ করে বল্লেন, 'সেই মেয়েটি, আমাদের সুধীরার বন্ধু সুজাতা নয় ত ?'

নীরেনকে স্বীকার করতেই হোল যে তাঁর আন্দাজ করবার শক্তি আছে। সেই বটে। মামীমা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ওদের সঙ্গে এত মেলা মেশা কেন নীরেন ?'

'কেন ? কেন ওদের অপরাধ ? বাঙালীর মেয়ে ডাইভোর্স কর্বার মত সাহস প্রায়ই রাখে না। এই মাত্র কি ওর অপরাধ ? তা যদি হয় তবে তোমার কথার কোন মানেই হয় না।'

মাসীমা একটা নিঃশ্বাস চেপে, আর কথা না বাড়িয়ে সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। কর্ম্মান্তরে যেয়ে কি ভাবতে ভাবতে, তাঁর মুখে ঈষৎ হাসি ফুটে উঠ্‌ল। কথাটা after all তা'হলে ঠিকই। পরকীয়া না হতে পারলে প্রেম জমে না। যে 'সুচিরা রাধা' কবে কোন যুগের বৈষ্ণব কবিদের আমল থেকে আরম্ভ করে হাল আমলের কবিতার অবধি খোরাক্ জোগাচ্ছেন। তাঁর এই অফুরন্ত প্রেরণায় মূলত ওইখানেই রয়েচে। তাঁর প্রেম যদি পরকীয়া না হতো তবে তাকে নিয়ে কবিতায়, কত মর্ম্মান্তিক অভিমান কত অফুরন্ত বিরহ .....সে সব কোথা থেকে আসত। রাধার যে প্রেমের কাহিনী থেকে যুগে যুগে কত কবি কাব্যের প্রেরণা পেলে সে প্রেম তা হলে কিসে দাঁড়াত। কীই বা দাঁড়াতে পারত? বড় জোর সৌরীন বাবুর কোনো বইর মত—পাতার পর পাতা ধরে স্বামী স্ত্রীর মিষ্টি মান অভিমান আর মধুর ঘরকন্নার কাহিনী এবং তার পরের যুগের মেলিন্সফুড, অয়েলক্লথের পর্য্যায়েই তাকে শেষ হতে হো'ত। না হয় ধরা যাক্, আজকালকার ছেলেরা কষে 'বার্থ কণ্ট্রোলের' বই পড়েচে। তারা হয়েচে চতুর। জীবনে রোমান্সের পাটকে আর চট্ করে তুলে দিতে চায় না। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের করে যদ্দূর পারা যায় রোমান্সকে টেনে টুনে জীইয়ে রাখে। আচ্ছা, না হয় ধরাই গেল। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে, মেলিন্সফুডের যুগ আরম্ভ হবার আগের দৃশ্যই না হয় একটু তুলে দেওয়া যাক্। ক্ষতি কি!'

'সন্ধ্যের থেকে একজন আলমারী উজার করে সাজ কর্‌চে। পছন্দই আর হয় না! অবশেষে পরলে এক নীল শাড়ি। যৌবনদীপ্ত দেহ যেন পাখায় ভর করে ঘরের মধ্যে পদচারণা করতে লাগল। যেন সে নীলসমুদ্রের এক একটি তরঙ্গ। কিন্তু ঘড়ী! উঃ, horrible ঘড়ীর কাটা যে আর চল্‌তে চায় না! How long, O Lord, how long! আমি যখন প্রতীক্ষায় চলচঞ্চলা, তখন আর একজন কী করচে? You can imagine, কী করতে পারে? হয়ত ব্রীজটুর্ণামেণ্টে খেলতে বসে, ফ্রী নো ট্রাম্পস্ ডেকেচে, হয়ত লিমন্ স্কোয়াশের গেলাসে এক চুমুক দিয়েচে সবে। অবশেষে ক্লাব-ফেরত, আর একজন ঘরে ঢুকল দশটা পাঁচ মিনিটে।

"আমি আজ বায়োস্কোপ যাব। অনেকক্ষণ থেকে তৈরী হয়ে রয়েচি।"

"আজ আর যেয়ে কী কর্‌বে সাড়ে ৯টার শো অনেকক্ষণ আরম্ভ হয়ে গেচে।"

"আমি যাবই।"

"আচ্ছা, চলো তা হলে।"

"আজ বড্ড ভালো ফিল্ম আছে গো। সেই জন্যেই তোমার বারণ শুন্‌তে পারচিনে। বুঝেচ?"

"আচ্ছা, ত'হলে একটা ট্যাক্সি ডেকে আন।" (চাকরকে ডেকে)

"যাবেই তা হলে শেষ পর্য্যন্ত?"

"বাঃ—আমি কি জানি! তুমিইত জিদ করেছিলে।"

"হ্যাঁ, আমিই কর্‌ছিলুম বই কি!"

"আশ্চর্য্য ! নারীনাং চরিত্রং ...... তুমি বলোনি যে—" "বেশ বেশ আমিই বলেছিলুম। ইডিয়েট্, শুধু ব্রীজ খেলতেই শিখেচ। আর কী কিছু শেখোনি ?"

কিন্তু এইটুকুই যথেষ্ট। মামীমার মুখে ভাব্তে ভাব্তে একটু হাসি ফুটে উঠল। দেখতেই ত পারো চোখের সুমুখে নীরেনের কাণ্ডটা। সুজাতার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে ওর মা কত চেষ্টা করেছিলেন। কত জিদ্ কত অশ্রুবর্ষণ। তখন কিছুতেই ছেলের মন টল্ল না। এখন আবার সেই মেয়েকে নিয়ে একটা নাটক না গড়ে তুললে বাঁচি। তবুও ওর মামীমা একালের লেখাপড়া জানা মেয়ে। মনে মনে তিনি নীরেনের ভাগ্যফল চিন্তা করে একটু উদ্বিগ্ন হলেন বটে, কিন্তু ব্যাপারটাকে কষে গালাগালি দিতে পারলেন না। এটাই যে স্বাভাবিক। জীবননাট্যে রস জমিয়ে তুল্তে হলেই তাকে আস্তে হবে নেমে নানা বিবাদী সুরের মাঝে। কাব্য, সাহিত্য, নাটক সব জায়গাতেই যে আমরা দেখতে পাই, বিরোধী ঘটনা পরম্পরা, নইলে তার গড়নই হয় না। জীবনও তাই।

এতদিন জীবনটাকে সরল করে রাখ্বার জন্যে সতর্কতার অন্ত ছিল না। কিন্তু সরলতার মাঝে যে সুখ নেই। সরলতা চায় কে ? এইটে না বুঝেইত লোকে যারপর নাই গোলমাল বাধায়। তাইত রাশিয়ার নবনীতি সম্বন্ধে আমাদের কত আপত্তি। মানুষের দুঃখকষ্ট নির্য্যাতনের ইতিহাস যাই হোক জটিলতা আর বৈচিত্র্য না হলে সে যে মরে যাবে। আগা গোড়া চষে এক করে দিলে, সামাজিক বিধান সম্বন্ধে যতই সুবিচার হোক, মানুষের মন যে উপবাসী থাকচে। আর মন যদি উপবাসী থাকে তাহলে হাজার উদরপূর্ত্তিতেই বা সুখ কী! তাইত মহাত্মা গান্ধীর জীবন যাত্রায় সরলতার লেক্চার এ যুগের ছেলেদের মন ভেজাতে পার্লে না। তারা একবার চোখ বুলিয়েই চট্ করে বুঝে নিলে তিনি যার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেচেন—তাঁর প্রদর্শিত পথটা সেই জিনিষেরই একটু সোজা সংস্করণ মাত্র। আজকালকার যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধেই তোলা রয়েচে তার সব চেয়ে বড়ো অভিযোগটা কিন্তু যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে আমাদেরও সকলের চেয়ে বড় অভিযোগ যে সে সমস্ত মানুষকে Standardise করে ছেড়ে দিচ্ছে। তার ঝুলি থেকে সস্তা ছাপাখানা, ওয়্যারলেস্ টেলিফোন, ট্রেণ, মোটর বার করে সে মানুষে মানুষে দেশকাল পাত্রগত সমস্ত ব্যবধান ঘুচিয়ে দিলে। যদি শুধু দূরত্ব ঘোচাত তা হলে দুঃখ ছিল না। কিন্তু দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে দেশে দেশে মনের অসাধারণ বৈচিত্র্য অপরিসীম জটিলতা, অনন্ত সম্ভাবনা সমস্তকে ধুয়ে পুঁছে একটা বিশাল সাদা মাঠা জিনিষ তৈরী কর্লে। তার প্রধান দোষ যে সে সরল। তার মধ্যে জটিলতা নেই, নীরেনকে দোষ দিলে কী হবে। যাদের মধ্যে মানুষের চঞ্চল মন রয়েচে—সেই সরলতাকে আন্তরিক ঘৃণা করে। ইতিমধ্যে নীরেন এসে একবার তাড়া দিয়ে গেল :—মামীমা কাল সন্ধ্যে বেলায়, ওঁকে আমাদের বাড়ী আস্বার জন্যে একটা নিমন্ত্রণের চিঠি লিখে দাও। আমার বাদবাকী বন্ধুদের আমি নিজেই করেচি। কিন্তু মেয়েদের ব্যাপার। কী সব ফর্ম্মালিটি রয়েচে। ওঁকে তুমিই নিমন্ত্রণ কর।

ক্রমশঃ

নাৎসিনেতা হিট্‌লার

শ্রীজ্যোৎস্না চন্দ বি. এ

এই যুগে ইউরোপের দেশে দেশে যত আন্দোলন দেখা দিয়াছে, তার মধ্যে 'নাৎসি'র সমকক্ষ বোধকরি আর কোন আন্দোলন নাই। অল্পসময়ের মধ্যে এই আন্দোলন যে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। এতদিনে যেন মহাযুদ্ধের পরাজয়ের কালিমা ঘুচাইয়া জার্ম্মাণীর পুনরুত্থান সূচিত হইয়াছে এবং তাহা 'নাৎসি'র কল্যাণে। ভার্সাইয়ের সন্ধির পর জার্ম্মাণীকে যে, হীনতা মানিয়া লইতে হইয়াছিল, নাৎসি অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল যে, সেই দেশ পুনরায় এমন করিয়া জাগিয়া উঠিবে।

ভার্‌সাইয়ের সন্ধির উদ্দেশ্য জার্ম্মাণীকে একেবারে পঙ্গু করিয়া দেওয়া ছিল কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু একথা সত্য যে, জার্ম্মাণীর স্কন্ধে গুরুভার চাপাইয়া তা'র পীড়নে ঐ দেশকে ক্লিষ্ট করা সেই সন্ধির অভিপ্রেত ছিল। এই সন্ধি জার্ম্মাণজাতির মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত করিয়াছিল এবং যে আঘাত জার্ম্মাণী পাইয়াছিল সেই বেদনাতেই 'নাৎসি'র জন্ম এই সন্ধির বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ জার্ম্মাণজাতি ঘোষণা করিয়াছে সেই বিদ্রোহে মূর্ত্তিমান বিগ্রহ হইলেন হিট্‌লার। তাঁহা হইতে 'নাৎসি' উদ্ভূত। নাৎসি মতবাদ তাঁহারই সৃষ্টি। তাঁহার ধ্বজার নীচে আজ ধনিক, শ্রমিক একসূত্রে যুক্ত।

ভার্‌সাইয়ের সন্ধির চাপে ক্লিস্ট ধনিক সম্প্রদায়, তাঁহার মধ্যে যেমন নেতা পাইল, তেমনই দেশের বিরাট বেকার সমস্যার তাড়নায় নিম্নশ্রেণীর লোকও ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁহারই শরণ লইল। জার্ম্মান জাতির সকল সুপ্ত স্বপ্ন যেন হিট্‌লারের কোন্ মন্ত্রবলে সার্থকতায় পরিণত হইবে, সকলেরই মনে এমন ভাব। হিসাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ১৫,০০০,০০০ সংখ্যক লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। জার্ম্মাণ মহাসভায় বিগত সভ্য নির্ব্বাচন কালে 'নাৎসি' আন্দোলনের শক্তির সম্যক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

হিট্‌লার এক বিরাট সৈন্যদল ও গঠন করিয়াছেন, তার সংখ্যাও কয়েক লক্ষ। সতর বৎসর হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক লোকেরা ঐ সৈন্যদলভুক্ত। সমগ্র আন্দোলনটি জার্ম্মাণ যুবশক্তির এক মহান্ কীর্ত্তি বলা যাইতে পারে। হিট্‌লারের বয়স চল্লিশের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে। যে দেশে চল্লিশ বৎসর অতীত হইলে কবিরা "যৌবন বিদায়" বলিয়া গান করেন, সেই অকাল, জরামৃত্যুর দেশে হিট্‌লার অবশ্য বিগতযৌবন। কিন্তু তাঁহার নিজ দেশে তাঁহাকে কেউ বৃদ্ধও ভাবে না অথবা তিনি নিজেও বোধ করি নিজেকে তেমন ভাবেন না।

তাঁহার জন্মস্থান জার্ম্মাণীর সীমান্তপ্রদেশে ব্রৌনাও নামক স্থানে। তাঁহার পিতা শুল্কবিভাগে কাজ করিতেন এক লিন্তনডিঙ্‌ নামক স্থানে তিনি যখন অবসর গ্রহণ করিয়া বসবাস আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার অবস্থা অস্বচ্ছল ছিল না।

গ্রামের পাঠশালায় হিট্‌লারের লেখাপড়ার সূচনা হয়। পাঠশালায় মেধাবী ছাত্র বলিয়া তাঁহার তেমন সুখ্যাতি ছিল না। তিনি খেলাধূলার প্রতি স্বভাবতঃ আকৃষ্ট ছিলেন। কিন্তু বিশেষ করিয়া যে খেলার দিকে তাঁহার শিশুমন ধাবিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সূত্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়। খেলাচ্ছলে তিনি সখের সৈন্যদল গড়িয়া তার নেতৃত্ব করিতে ভালবাসিতেন। নিজে খুব জোরালো ছিলেন না কিন্তু উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতাদ্বারা তাঁহার তাঁহার সখের সৈন্যদলকে উদ্বুদ্ধ করিতেন! কখনো কখনো আবার নিরালায় বসিয়া বক্তৃতাও অভ্যাস করিতেন। 'Child is the father of the man' একথা সকল ক্ষেত্রে সত্য না হইলেও হিট্‌লারের পক্ষে পূর্ণভাবে প্রযোজ্য।

পাঠশালা ত্যাগের পর গ্রাম হইতে প্রায় দেড়ক্রোশ দূরে একটি মধ্যবিদ্যালয়ে তিনি প্রবিষ্ট হন। এই দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া আসা যাওয়া করিতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বাধ্য করিতেন। এই অভ্যাসেই বোধ করি, তাঁহার বর্ত্তমান শারীরিক দৃঢ়তার ও কষ্টসহিষ্ণুতার ভিত্তি। ঐ বিদ্যালয়ে অঙ্কন বিদ্যা ব্যতীত আর কোনদিকেই তাঁহার পারদর্শিতা প্রকাশ পায় নাই।

শৈশবে হিট্‌লার কিঞ্চিৎ খেয়ালী ও ক্ষেপাটে ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার হাবভাব দেখিয়া অনেকেই তাঁহাকে পাগল আখ্যা দিয়াছিল। পুত্রের এই ধরণের খ্যাতি প্রচারে তাঁহার পিতা অবশ্য তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁহাকে অত্যন্ত কঠোর শাসনে রাখিতেন। এমনকি তাঁহাকে হাতখরচের জন্য এক পয়সাও দিতেন না। কিন্তু যাহার অন্তরে বিদ্রোহবহ্নি ভগবানই জ্বালাইয়া দিয়াছেন মানুষের কঠোরতায় সেই বহ্নি কখনো নির্ব্বাপিত হইতে পারে না। ফলে, দাঁড়াইল এই পিতা পুত্রের মধ্যে বিরোধ ক্রমেই ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল।

হিট্‌লারের এক বিমাতা ছিলেন। কিন্তু বিমাতা বলিতে যাহা বোঝায় তাঁহার বিমাতা সেই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না। হিট্‌লারের প্রতি তাঁহার অন্তরে অসীম স্নেহ ছিল এবং পিতাপেক্ষা এই মহিলার সহিতই হিট্‌লারের প্রাণের যোগ ছিল বেশী। পিতার মৃত্যুর পর, এজন্যই বোধকরী তিনি বিমাতার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত হিট্‌লার তাঁহার পার্শ্বেই ছিলেন।

তারপর আঠার বৎসর বয়সে তিনি জগতে একেলা বাহির হইয়া পড়েন। হিট্‌লারের অন্তরগত বাসনা ছিল, ভিয়েনায় যাইয়া অঙ্কনবিদ্যার অনুশীলন করেন। কিন্তু তাঁহার অর্থের সংস্থান ছিল না বলিয়া, কোন এক চিত্রকরের সামান্য সহকারীর কাজ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার ভিয়েনা জীবন সম্বন্ধে চমকপ্রদ কোন সংবাদ এখনো প্রকাশ পায় নাই। তিনি বোধকরি তাঁহার সম-অবস্থার আর দশজনের মতনই দুঃখে দৈন্যে জীবন কাটাইতেন।

১৯১২ সালে তিনি ম্যুনিকে যান। এখানেও তাঁহার জীবন যে বিভিন্ন ভাবে কাটিয়াছিল তার কোন পরিচয় আমরা পাই না। নীরবে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, দীনহীন ভাবে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করিবার শক্তি তিনি তখন সঞ্চয় করিতেছিলেন কিনা কে জানে! ১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ব্যাভেরিয়ার কোন এক সৈন্যদলভুক্ত হইয়া তিনিও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

হিট্‌লার এখনো অবিবাহিত। নারীজাতির প্রতি তিনি বিদ্বেষভাবাপন্ন এমন কথা কখনো কখনো প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার বিমাতার প্রতি ও তাঁহার ভগ্নীর প্রতি তাঁহার যে ভাব লক্ষিত হয়, তাহাতে তো মনে হয় না যে, হিট্‌লার নারীবিদ্বেষী। একথাও সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাঁহার বিমাতা তাঁহাকে যে সামান্য সম্পত্তি দিয়া যান, তিনি ভগ্নীকে তাহা দান করিয়াছেন।

হিট্‌লার যে মতবাদ প্রচার করিয়া থাকেন অথবা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বন করেন, সকল সময়ে, তার সমর্থন সম্ভব হয় না। কিন্তু তাঁহার স্বদেশের পক্ষে তাঁহার অনুষ্ঠিত পথই শ্রেষ্ঠ কিনা তাহা বিচার করিতেও আমরা অক্ষম। একথাও অস্বীকার করা অসম্ভব যে, তিনি যে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা তাহার মাতৃভূমিকে গরীয়ান ও মহীয়ান করিয়া তুলিতে প্রয়াসী ও জার্ম্মাণীর দিকে দিকে তার সূচনা পরিলক্ষিত হইতেছে।

শুভরাত্রি

শ্রীরেণুপ্রভা দাস

লজ্জানতা বধূ,
বুক-ভরা মধু,
রক্ত-রাঙা চেলী;
মুকুতার শেলী,
তাবিজ চিকণ,
জড়োয়া কাঁকণ;
মুকুতার চূড়,
পায়েতে নূপুর,

কাণে শোভে দুল
ঝুম্‌কার ফুল।
সিঁথী শোভে মাথে;
কবরীর সাথে,
সোণা দিয়ে মোড়া
বেলফুল জোড়া।
মীনা করা হার,
গলায় বাহার;

নয়ন উজলে
সুরভি কাজলে,
বসি আছে বালা;
পঞ্চ-দীপ জ্বালা;
নববধূ সাজি;
শুভরাত্রি আজি।
বাজিছে সানাই,
রহি রহি তাই।

অগুরু সুবাস,
মাতে চারিপাশ ;
রেশমের ভেল,
ফুলেলিয়া তেল,
বাতাসে উড়ায়
সুবাস বিলায় ।
ফুলের মালিকা,
পরায় বালিকা,
বসি ছিল দলে ;
আলাপের ছলে
শুধাল' তাহারে,
"লজ্জা এত কারে",
খোঁপায় করবী,
বড়ই গরবী,
তরুণ কিশোরী
কহিলা, "আমরি !
মুখ্‌টি তোলনা,
দেখিব গহনা ।"
সখী তার কয়,
"আজ আর নয় ;
তোরঙটা খুলে,
দেখো কুতুহলে,
যত অলঙ্কার,
খুঁটিনাটি আর ;
ফ্যাসানের সাড়ী,
জামা জরিদারী,
কাল নিরিবিলে
মোর সাথে মিলে ।"
প্রাচীনা একটি,

বাড়ায়ে দীপ্‌টি
দেখিলা বধূরে ;
কহিলা মধুরে,
"বেশ বউ বটে ।"
ধীরে ধীরে রটে
সুনাম বধূর ;
অধর বিধুর ।
ছোট মেয়ে এক,
বছর পাঁচেক,
দুবাহু বাড়ায়ে,
গলাটি জড়ায়ে,
আনতা বধূরে
কহে মিঠে সুরে,
' কি সুন্দর বউ,
দেখেছ কি কেউ !
হাতে চুড়ি ভরা,
লাল সারি পরা ;
মুকুতার চুর,
পায়েতে নূপুর,
মীনা করা হার,
গলায় বাহার ;
সোণার সিঁথীটি,
অগুরু কতকি !
তোমার কোলেতে
সাধ হয় যেতে ;
লওনা আমারে
কোলেতে মালারে"।
বধূ শুনি কানে,
বালিকার পানে,
চাহে আঁখি খুলি ;

দুটি বাহু তুলি,
বুকের মাঝারে,
জড়ায়ে তাহারে,
চুমিলা অধরে,
বসাল আদরে
আভরণ হীনা
বালিকা মলিনা ।
ছুটি গেল লাজ,
খুলি তার সাজ,
স্বর্ণ আভরণ
তাবিজ চিকণ
মুকুতার চুর,
পায়েতে নূপুর,
পরাল শিশুরে ;
যেন স্বপ্ন পুরে
হেরে বসি আজ,
বালিকার সাজ ।
প্রাচীনারা কহে,
'এতো ভাল নহে ;
অঙ্গ আভরণ
খোল কি কারণ ?'
বধূ কয় হাসি,
'বাজে এত বাঁশী
জ্বলে কত আলো
উৎসবের দিনে
আভরণ বিনে
ওই বালিকাই ;
খুলে দিনু তাই
শুভরাত্রি সাজ ।
ধন্য মানি আজ ।'

শিল্প সম্বন্ধে লেনিন

শ্রীসুলতা কর

লেনিন ভাব্তেন—শিল্প নিপীড়িত জনসাধারণের সম্পত্তি। শিল্পকে পৌঁছে দিতে হবে, অন্ত মূক সহস্র বৎসরের দাসত্বক্লিষ্ট রাশিয়ার কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের কাছে, তাদের অন্তরের নিদ্রিত শিল্পীকে জাগ্রত কর্তে হবে, তবেই হবে শিল্প সার্থক।

রাষিয়ার ভাগ্যনিয়ন্তা যুগপ্রবর্ত্তক লেনিনের জীবনের সকল শক্তি, সাধনা, স্বপ্ন নিয়োজিত হয়েছিল ধনীর বিরুদ্ধে শ্রমিকের উত্থান প্রচেষ্টায়। তাই তিনি সেইটুকুই শিল্পের মর্ম্মগ্রহণ করতে পেরেছিলেন, যেটুক তাঁকে এই প্রচেষ্টায় সাহায্য কর্তে পারে। সুতরাং তিনি রাজনৈতিক হিসাবে শিল্পের যেটুকু দাম অর্থাৎ প্রচারের দিক্‌দিয়া শিল্প যেটুকু কাজে লাগ্‌তে পারে তার অধিক শিল্পকে দাম দিতেন না। ১৯০৫ তে তিনি লিখেছেন "যে সাহিত্য আমাদের দলের বিরোধী তার ধ্বংস হোক্, অবাস্তব সাহিত্যেরও ধ্বংস হোক্।"

শিল্পসচিব লুনাকার্স্কি বলেছেন যে ১৯১৮ তে লেনিন তাঁকে আজ্ঞা দেন যে শিল্পকে দুইটী কাজে লাগাতে হবে, প্রাচীর এবং গৃহগুলির গাত্রে বিপ্লবী বাণী খোদাই কর্তে হবে, এবং খ্যাতনামা বিপ্লবীদের মর্ম্মর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কর্তে হবে। এদুটী কল্পনাই বাস্তবে পরিণত করা হয়েছিল, এবং কিছুদিনের মধ্যেই লেনিনগ্রাডের গৃহগুলিকে লিপিস্তম্ভের মত দেখ্‌তে হয়েছিল।

একবার লেনিন একটী প্রদর্শনীতে গিয়াছিলেন, সেখানে তাঁর কল্পনা অনুযায়ী একটী মূর্ত্তি প্রস্তুত করা হয়েছিল, লেনিন সেই মূর্ত্তির দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে বল্‌লেন, "আমি এর মধ্যে কোন সৌন্দর্য্য খুঁজে পাচ্ছিনা।" তিনি লুনাকারস্কিকে মত জিজ্ঞাসা করাতে, লুনাকারস্কি যখন উত্তর দিলেন যে "এ মূর্ত্তি প্রস্তুত না হলেই ভাল হ'ত", তখন তিনি খুব সন্তুষ্ট হলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে লেনিন নিজের শিল্পজ্ঞানের উপর মোটেই আস্থাবান্ ছিলেন না। লেনিনের শিল্পজ্ঞানের অভাবের জন্য বলা যেতে পারে যে তিনি জীবনের খুব অল্পসময়ই শিল্পের জন্য দিতে পেরেছিলেন। ১৯০৫ তে যখন প্রথম বিপ্লব হয় সে সময় তিনি একদিন তাঁর এক বন্ধুর বাড়ীতে কতকগুলি মনোগ্রাম দেখেছিলেন। পরদিন সকালে তিনি বল্‌লেন "কাল আমি সারারাত্রি ঘুমাতে পারিনি, কেবলই ভেবেছি যে আমি এমনই হতভাগ্য যে এমন অপরূপ সৌন্দর্য্য চর্চ্চা করার সুযোগ আমার জীবনে ঘট্‌ল না।" কিন্তু এসব কথা বলা সত্বেও শিল্প সম্বন্ধে তাঁর বেশ একটা সুনিশ্চিত মতামত ছিল, প্রশংসা এবং নিন্দা কর্তে তিনি খুবই পটু ছিলেন।

সেই সময়ের বিপ্লবী রাষিয়ান্ সাহিত্যের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। লেনিনের পত্নী নাভেজ্ভাক্রুপস্কিয়া তাঁর স্বামীর সাহিত্যে রসগ্রাহিতার সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা জানিয়েছেন। যখন তাঁরা সাইবেরিয়ায় ছিলেন তখন লেনিনের বিছানায় সর্ব্বদাই হেগেলের, লারমন্টোভের, নেক্রোসোভের, পুস্কিনের লেখা বই থাকত। এই সব লেখকদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে ভক্ত ছিলেন পুস্কিনের।

লেনিন টল্‌ষ্টয়ের সামাজিক এবং নৈতিক মতবাদ খুব মনোযোগ দিয়া পড়েছিলেন, এবং তার থেকে তাঁর এই ধারণা হয়েছিল যে টল্‌ষ্টয়ের মতবাদ যতই রাষিয়ায় বিস্তৃতি লাভ করবে, ততই রাষিয়ার দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে উঠ্‌বে। ১৯০৮ তে তিনি 'প্রোলিটার' নামক সাপ্তাহিকে লিখেছিলেন "বিপ্লবের সঙ্গে টল্‌ষ্টয়ের নাম যুক্ত করে দেখলে এটা আশ্চর্য্য লাগে যে এত বড় একজন আর্টিষ্ট বিপ্লবের ধারা মোটেই বুঝ্‌তে পারেননি, কিংবা ইচ্ছা করেই বিপ্লবের যে মূলবাণী তাকে অগ্রাহ্য করেছেন।"

লেনিন আরও বলেছেন যে তাঁহার প্রথম বৈপ্লবিক চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে টল্‌ষ্টয়ের অহিংস মতবাদ প্রচারের ফলে। রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক ক্ষেত্রে টল্‌ষ্টয়ের মতবাদ ব্যর্থ, শুধু ব্যর্থ নয়, সশস্ত্র বিদ্রোহের বিরুদ্ধে তাঁর মতবাদ বাস্তবক্ষেত্রে মহা অনিষ্টকর।

কিন্তু শিল্পী হিসাবে লেনিন টল্‌ষ্টয়কে আন্তরিক শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিয়েছেন। টল্‌ষ্টয়ের কোন না কোন বই সব সময়ই তাঁর ডেস্কে থাকত।

লেনিন একদিন গর্কিকে বলেছিলেন "যদিও আজ আমি সারাদিন ব্যস্ত থাকব, কিন্তু আজ রাত্রে আমি নিজেকে টল্‌ষ্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড্ পিসের' মধ্যে ডুবিয়ে ফেলব।" উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে, আবেগে চক্ষু মুদ্রিত করে তিনি পুনরায় গর্কিকে বল্‌লেন "বন্ধু, টলষ্টয় কি আশ্চর্য্য শিল্পী, কি অপূর্ব্ব শক্তিমান। সাহিত্যজগতে রাষিয়ান কৃষকের যথার্থ মূর্ত্তি প্রথম অঙ্কিত হ'ল টল্‌ষ্টয়ের অমর তুলিকায়। সবচেয়ে আশ্চর্য্য যা সে হচ্ছে তাঁর চিন্তাধারায় যথার্থ রাশিয়ান্ কৃষকের চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে, তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়া রাষিয়ান্ কৃষকের কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। কৃষক শ্রমিকের দুঃখ দারিদ্র্যের অরূপমূর্ত্তির সন্ধানী এই টল্‌ষ্টয়।"

ভাবময় চক্ষু তুলে তিনি বলে যেতে লাগ্‌লেন "বন্ধু, ইউরোপ কি কোনদিন টল্‌ষ্টয়ের মত শিল্পীর সৃষ্টি কর্‌তে পারবে? কখনই না।"

লেনিনের সমসাময়িক সাহিত্যে বিতৃষ্ণার সম্বন্ধে লুনাকার্‌স্কি বলেন যে "লেনিন যদিও শ্রমিক কবিদের মূল্য একেবারে অস্বীকার কর্‌তেন না, কিন্তু তিনি বিপ্লববাদীদের সাহিত্য মোটেই পছন্দ কর্‌তেন না। তাঁর এই সব সাহিত্যে মন দেবার সময়ই ছিলনা।"

লেনিনের সবচেয়ে বেশী বিতৃষ্ণা ছিল সেই সময়ের অভিনয় প্রণালীর উপর। তিনি কোন অভিনয় শেষ পর্য্যন্ত দেখার ধৈর্য্য রাখ্‌তে পার্‌তেন না। তিনি যে শেষ অভিনয়

দেখেছিলেন সেটা হচ্ছে মস্কো আর্ট থিয়েটার কর্ত্তৃক অভিনীত ডিকেন্সের বিখ্যাত নাটক ক্রিকেট্ অন্ দি হার্ক।' এই অভিনয়টীর ভাবের ব্যাকুলতা তাঁর কাছে অসহ্য মনে হয়েছিল। গর্কির 'নাইট্ রিফিউজ্' ও তাঁর মোটেই ভাল লাগেনি। কিন্তু পুরাতন নাটকের অভিনয় যেমন হফটম্যানের 'ফারম্যান্', টলস্টয়ের 'লিভিং কর্প্স' ইত্যাদি তাঁকে মুগ্ধ করত।

লেনিনের শিল্প সম্বন্ধে মতামত এবং বর্ত্তমান বল্‌শেভিক মনোভাবের প্রতি মন্তব্য সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয়েছে, জার্ম্মান কমিউনিষ্ট ক্লেরার সঙ্গে আলোচনায়।

তিনি ক্লেরাকে বলেছিলেন "আমরা কেন নূতন শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদি চাই, কেবল-মাত্র নূতন বলেই কি? তা যদি হয় তবে বল্‌তে হবে সেটা একেবারেই বোকামী। তবে আমি একথা বল্‌তে একটুও কুণ্ঠিত হবনা যে আমি আধুনিক শিল্প এবং সাহিত্য একটুও বুঝিনা, এবং এসব আমায় একটুও আনন্দ দেয় না।

কিন্তু একথাও সত্য যে শিল্প সম্বন্ধে আমাদের মতামতের কোনই মূল্য নাই। আমাদের মনে রাখা উচিত যে শিল্প জনসাধারণের সম্পত্তি, এর দ্বারা তাদের ভাব, চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তি জাগ্রত ও সুসংবদ্ধ হ'লে, তবেই হবে শিল্প সার্থক। সুতরাং জনসাধারণ যাতে শিল্পের মর্ম্মগ্রহণ কর্‌তে সক্ষম হয়, সেজন্য আমাদের সর্ব্বপ্রথম প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃতির জন্য চেষ্টা করা উচিত। বল্‌শেভিকরা ক্ষমতা পাওয়ার পর থেকে যাহা কিছু শিক্ষা সম্পর্কীয় কাজ হয়েছে, তার প্রতি সাধারণের অতি আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। কেবলমাত্র পেট্রোগ্রাডে নয়, প্রত্যেক গ্রাম এবং নগর থেকে শিক্ষার জন্য জনসাধারণের প্রচণ্ড দাবী আমরা অহরহ শুনতে পাচ্ছি।

হয়ত আজ আমরা মস্কোতে দশহাজার এবং আগামী কাল আর ও দশহাজার ব্যক্তিকে অভিনয় দেখিয়ে আর্ট শিক্ষা দিলাম, কিন্তু এর পশ্চাতে যে কোটী কোটী লোকের সাধারণ গণিত ও অক্ষর পরিচয়ের আর্ট শিখ্‌বার তীব্র আগ্রহ লুকিয়ে রয়েছে, পৃথিবী যে গোল' এই সাধারণ জ্ঞানটুকু জানাবার আকাঙ্খা লুকিয়ে রয়েছে, তাকে আমরা কেমন করে অগ্রাহ্য কর্‌ব?"

ক্লেরা প্রতিবাদ করে বল্‌লেন "নিরক্ষরতার জন্য এত বেশী অভিযোগ আন্‌বেন না। এরই জন্য আপনার বিপ্লব অত সহজ হয়েছিল।"

লেনিন উত্তর দিলেন "এ কথা সত্য বটে, কিন্তু কেবলমাত্র বিপ্লবের সময়টুকুর পক্ষেই সত্য। তুমি কি ভাব আমরা কেবল ধ্বংসের জন্যই ধ্বংস করেছি, একটা নূতন সুন্দর সৃষ্টি গড়্‌বার জন্য কি ধ্বংস করিনি?"

লেনিন বিশ্বাস কর্‌তেন যে সাধারণের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত কমিউনিষ্টিক ভাবে সমাজ গড়ে তোলা অসম্ভব। তিনি বল্‌তেন প্রত্যেক বল্‌শেভিকের যেমন বিপ্লববিরোধী দলকে দমন করা কর্ত্তব্য, তেমনি নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কেননা যতদিন পর্য্যন্ত দেশে নিরক্ষরতা পূর্ণোদ্যমে চল্‌বে ততদিন পর্য্যন্ত সাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞানের বিকাশ হতে

পারে না। যে লোক লিখ্‌তে পড়্‌তে জানে না, এ, বি, সি, পর্য্যন্ত চেনে না, রাজনীতির সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ থাকা সম্ভব নয়। ঠিক্ এই একই কারণে তিনি বল্‌তেন যে নূতন বল্‌শেভিক শিল্পের পতন অবশ্যম্ভাবী। যতদিন পর্য্যন্ত না কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিল্পজ্ঞানের প্রচার হবে, ততদিন পর্য্যন্ত নূতন শিল্প টিঁকতে পার্‌বে না।

যদিও লেনিন শিল্প এবং সাহিত্যকে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনের অধিক দাম দিতেন না, এবং জগতে 'অনৈসর্গিক সৌন্দর্য্য' বলে যে কিছু আছে তাহা স্বীকারই কর্‌তেন না, কিন্তু তবুও তিনি সঙ্গীতের ঐন্দ্রজালিক মোহ কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেন নি। গানের সুর তাঁর বাস্তববাদী মনকে এতদুর আত্মহারা করে দিত, যে তিনি নিজের কাণে মোম ঢেলে সুরের হাত হ'তে আত্মরক্ষা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তেন। লুনাকার্‌স্কি বলেছেন যে 'একসময় আমি বিখ্যাত গায়কদের নিমন্ত্রণ করে, কয়েকটী সঙ্গীতসভার আয়োজন করেছিলাম। এর যে কোন একটী সভায় উপস্থিত থাক্‌বার জন্য আমি লেনিনকে অনেক অনুরোধ কর্‌লাম, কিন্তু লেনিন একদিনও উপস্থিত থাক্‌তে পারলেন না। অবশেষে তিনি একদিন আমার কাছে সত্যকথা স্বীকার করে বল্‌লেন "যদিও গান শোনার মত আনন্দ আর কিছুই নাই, কিন্তু আমি এটা সহ্য কর্‌তে পারি না। গান শুন্‌লে আমার সমস্ত মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।"

আর একবার তিনি বিটাফোনের গান শুনে গর্কিকে বলেছিলেন যে গানের সুরে তাঁর মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছিল, এবং তিনি পাগলের মত প্রলাপ বকে ছিলেন।

যুগমানব লেনিন এমনই সব বিভিন্ন ভাবের মিশ্রণে গঠিত ছিলেন।

জাতীয় জীবনে নারী

শ্রীগৌরী নিয়োগী

রাজ্য-শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে নারী-আন্দোলন কতদূর উন্নতিলাভ করেছে এ জানা ছাড়াও দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে নারী প্রগতির উৎকর্ষ অনুধাবন ও বিশেষ লক্ষ্যযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারীর কল্যাণ এবং নূতন জীবনের উপলব্ধি করার জন্য কতরকম সুব্যবস্থা করা সম্ভব, ভারতবর্ষ আজ তাতে সচেষ্ট। মহিলাবিষয়ে প্রধান সংবাদই হচ্ছে, কোন্ প্রকার সু-শিক্ষা তাকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য উপযুক্ত করে তুল্‌বে, এবং কি প্রকারে ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি এবং কল্যাণের পক্ষে প্রধান অঙ্গস্বরূপ হবে নারী।

জনসমাজে এবং নরনারীর তুল্যাধিকারে জাতীয় আন্দোলন নারী-প্রগতির প্রয়োজন স্বীকার করেছে। নারীর বন্ধন মোচন যাঁদের বিশেষ কাম্যবস্তু তাঁদের সহানুভূতি এবং প্রচেষ্টা নারীর স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা-দান বিষয়ে সমাজে আন্দোলন আরম্ভ করেছে। নারীজাগরণের সর্ব্বপ্রকার আন্দোলন ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান স্বরূপ। শিক্ষিতসমাজে নারী তার সম্যক্ স্থান অধিকার না করা পর্য্যন্ত জগতের মধ্যে ভারতের ইপ্সিত স্থান সুদূর পরাহত।

ভারতে নারী-জাগরণের ক্রমবিকাশ

স্পষ্টরূপে এবং ব্যাপকভাবে নারীজাগরণকে বুঝ্‌তে চাইলে উহা দুইভাগে ফেলা যায়—প্রথমতঃ, বিশিষ্ট ব্যক্তির অথবা বিভিন্ন সঙ্ঘের সামাজিক উন্নতির জন্য খণ্ড খণ্ড ভাবে গত যুদ্ধের পূর্ব্বেকার প্রচেষ্টা। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের পরে সংহত এবং নির্দ্দিষ্টরূপে নারী আন্দোলনের দ্রুতগামিতা এবং কার্য্যকারিতা।

যুদ্ধের পরে নারী-স্বাধীনতা আন্দোলন ভারতবর্ষেও বিশেষরূপে আত্ম-প্রকাশ কর্‌তে আরম্ভ করলো। ১৯১৭ সালে মাদ্রাজে প্রথম 'ভারতীয় মহিলাসমিতি' নামে নারীসমিতি গঠিত হয়। যদিও শিক্ষা বিস্তারই ইহার উদ্দেশ্য ছিল প্রধান কিন্তু 'রিফর্ম বিল' (Reform Bill) পাশকরার সপক্ষে আগ্রহই প্রমাণকরে দিল যে নারীর ভোটাধিকার বিষয়ে ও সমিতি বিশেষ ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এখন উহা 'সমগ্র ভারত সঙ্ঘ' নামে পরিচিত এবং সত্তরটি শাখায় বিভক্ত হচ্ছে। বেশীর ভাগ দক্ষিণ ভারতে কিন্তু উত্তরে লাহোর এবং লেস্কর পর্য্যন্তও বিস্তৃতি লাভ করেছে।

* এ, আর, কেটন্‌লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ।

সমাজে নারীর কাজ

ইংলণ্ডের মতো ভারতেরও বিভিন্নস্থানে, বিশেষতঃ বাংলায়, মাদ্রাজে ও পাঞ্জাবে বয়স্কনারীর শিক্ষার জন্য আন্দোলন চলছে। জাতীয় জীবনে আন্তর্জাতিক ভাব সমূহ আদান প্রদানের প্রয়োজন অনুভব করে গ্রাজুয়েট মহিলা সমিতির (Association of women Graduates) সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগ্র নারী পরস্পর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হলো। আজ পর্য্যন্ত পাঁচটি প্রাদেশিক মহিলা সমিতি গড়ে উঠেছে। সর্ব্বজাতির মহিলাদের নিয়েই এদের অস্তিত্ব ; এদের উদ্দেশ্য কাজ করা, নারীর উন্নতি সাধন করা। এই সমস্ত সমিতি শিক্ষাপ্রসারের জন্য এবং সমাজের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ সাধনের জন্য বিশেষ বিশেষ পন্থা অবলম্বন করে থাকে।

১৯২৫ সালে প্রাদেশিক মহিলা সমিতি এবং আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের সংযোগ স্থাপনই ছিল ইহার উদ্দেশ্য! নারী আন্দোলনে যত কিছু কাজ হয়েছে তার মধ্যে 'সর্ব্বভারত মহিলা পরিষদ্' (All India women conference) দ্বারা শিক্ষা-সংস্কারই (Educational Reform) হচ্ছে প্রধান। প্রত্যেক বৎসর তিন চারদিন ধরে কনফারেন্স হয়ে এর কার্য্যপ্রণালী গঠিত হয়। কনফারেন্সের প্রধান উদ্দেশ্য নারীর মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার এবং শিক্ষার প্রধান বাধা স্বরূপ বাল্য-বিবাহ এবং পরদা সংক্রান্ত বিষয়ে গভীর আলোচনা। কিন্তু ১৯২৯ সালে পাটনায় যে অধিবেশন হয়েছিল তাতে সামাজিক পরিবর্ত্তনের চেষ্টা গৌণ কার্য্যের মধ্যে ধার্য্য হয় এবং ভবিষ্যতে 'সর্ব্বভারত-শিক্ষা সম্বন্ধীয় (All India Women's Educational) এবং সমাজসম্বন্ধীয় (Social) কনফারেন্স নামে অভিহিত হবে। বহুদুর থেকে সকল শ্রেণীর এবং সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী মহিলা এই বাৎসরিক অধিবেশনে যোগদান করেন। প্রতি বৎসরের কার্য্যাবলী রিপোর্টে বাহির হয় এবং ১৯৩০ সালের বোম্বাইর ৪র্থ অধিবেশনের রিপোর্ট ইংরেজী, হিন্দি ও উর্দ্দুতে বাহির হয়েছিল। ১৯৩০ সালে বোম্বাই অধিষ্ঠিত কনফারেন্সের পূর্ব্বে বত্রিশটি শাখার অধিবেশন হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকটির সঙ্গে কনফারেন্সের সংযোগ রক্ষিত হয়েছিল। কনফারেন্সের উদ্দেশ্য ছিল সর্ব্ব ভারত শিক্ষা মূলধনের প্রতিষ্ঠা করা এবং চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের সময় টাকার পরিমাণ ছিল ৮০,০০০৲ টাকা। এইটাকা দিয়ে সেণ্ট্রাল টিচারস্ ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠা কর্বার প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন প্রচলনের জন্য কনফারেন্সের গৃহীত প্রস্তাব প্রশংসনীয়। কনফারেন্সের সামাজিক অনুষ্ঠানে লিপ্ত যে অংশ বা সম্পত্তিতে নারীর আইনগত অনধিকার হেতু কতগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করে এ্যাসেম্ব্লিতে পাশ করার চেষ্টা করেছিল।

কনফারেন্সের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নীচে দেওয়া গেল। শিক্ষাসম্বন্ধীয় ব্যাপারে লিপ্ত যে কাজের ধারা—(১) বালিকাদের জন্য প্রাথমিক এবং দ্বিতীয় স্থানীয় শিক্ষার বিধান, (২) মহিলা শিক্ষয়িত্রী নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দান, (৩) পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ণের জন্য উন্নত বিধান

আবিষ্কার, (বালিকাদের জন্য উন্নত পাঠ্যব্যবস্থা শারীরিক ব্যায়াম সম্বলিত ও (৫) শিক্ষাক্ষেত্রে মহিলা নিয়োগ।

সমাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে—

(১) বাল্যবিবাহ নিবারণ ও অসমান বিবাহ রদ করা, (২) পরদাপ্রথা নিবারণ (৩) সম্পত্তিতে সমধিকার (৪) বহুবিবাহ নিরোধকরণ, (৫) বিধবাবিবাহ প্রচলন (৬) নীতিবাদে পুরুষ ও স্ত্রীর সমানাধিকার, নাগদান নিরোধ ও দেবদাসী প্রথা উঠাইয়া দেওয়া, (৭) ব্যবস্থাপক সভায় নারী সভ্য, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় ও নারীর অধিকার ও স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত ব্যপারে ও মহিলা সভ্য গ্রহণ।

যদিও মহিলা সভ্য সংখ্যা প্রচুর নয় তবুও মহিলাসংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার প্রশ্ন-মীমাংসার চেষ্টাতে "সর্ব্ব-ভারত কনফারেন্স" সচেষ্ট।

জাতীয় জীবনে নারীকে উপেক্ষা করার অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়, এবং এ চেতনা যে দেশে জাগরণ পেলো সেখানে সব রকম বাধা বিপত্তির হাত থেকে মুক্তি অর্জ্জন করে নারী তার কল্যাণের জন্য জীবনপণ করে বস্‌বে এ ধ্রুব সত্য।

"শুধাতে এলে দু'আঁখি মেলে"

শ্রীমমতা মিত্র

শুধাতে এলে দু'আঁখি মেলে
আমার দুটি নয়ন পরে
গোপন প্রাণের বাণী,
যে কথা বাজে হিয়ার মাঝে,
বাইরে তারে কেমন করে
উজ্জল আলোয় আনি ?
এখন হেথা লোকের মেলা,
দীপ্ত রবি করছে খেলা,
সরম লাগে দিনের বেলা
খুল্‌তে হৃদয় খানি ;
ঘুমিয়ে আছে বুকের কাছে
আমার প্রাণের বাণী।

জাগিয়ো নাক ভিতরে রাখো
হৃদয় পুরে যে কথা মম
আছে এখন সুপ্ত,
চিত্ততলে যে মণি জ্বলে
আঁধার ঘরে আলোক সম,
রাখো গো তারে গুপ্ত।

নগ্ন এই আলোর মাঝে
বল্‌তে কথা মরি লাজে,
হিয়ার বাণী হিয়ায় বাজে
বাইরে অবলুপ্ত,
অন্তরেতে শয়ন পেতে
রয়েছে কথা সুপ্ত।

দিনের শেষে রজনী এসে
উপুড় করে রজত ডালা
ঢাল্‌বে কিরণ ধারা,
বিভল সুখে গগন বুকে
বিণা সূতায় রচিয়া মালা
দুল্‌বে সকল তারা।

যূথীর গন্ধ অনুক্ষণ
তুল্‌বে ভরে দোঁহার মন,
সেই কথাটি কব তখন
হ'য়ে আপন হারা,
আকাশ হ'তে অঝোর স্রোতে
ঝরবে কিরণ ধারা।

সাত সাগরের পারে

কুমারী অমলা নন্দী

৫ই মে (১৯৩১) সকাল থেকে সুইজরল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় পর্ব্বত, বন, প্রস্রবন, নদী, হ্রদের শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিকাল সারে চারটায় আমাদের ট্রেন ফরাসী রাজ্যের মধ্যে এসে পৌঁছল। এর পর থেকে অনেকটা সমতল ক্ষেত্রের আরম্ভ।

রাত্রি সাড়ে দশটায় প্যারিস পৌঁছে আমরা Hotel de Concordia নামক একটী হোটেলে স্থান নিলাম। ভোরে উঠেই দেখলাম চতুর্দ্দিকে বড় বড় বাড়ী, সম্মুখেই দুধারে বৃক্ষশ্রেণী-ময় সুপ্রশস্ত রাস্তা; আমাদের পাশেই বাড়ী ঘরের উপর দিয়ে একটী রেলপথে দু'তিন মিনিট অন্তর ট্রেন যাতায়াত করছিল। বেশ একটু 'প্যারিস' বলেই মনে হচ্ছিল। বাবা আট বছর আগে একবার প্যারিসে এসেছিলেন। বাবা আমাকে জানিয়ে দিলেন—যে সব যায়গার জন্য প্যারিস পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যময় নগর বলে বিখ্যাত, এ স্থানটী কিন্তু তেমন কিছু নয়।

সকাল বেলাই আমরা 'ইণ্টারণ্যশন্যাল্ কলোনিয়াল একজিবিশন' দেখতে গেলাম। পূর্ব্বেই বলেছি এই এক-জিবিশন উপলক্ষেই আমরা প্যারিসে এসেছি। ট্রামে করে অল্পক্ষণ মধ্যেই আমরা এক-জিবিসনের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। সেই দিনই সকাল ন'টায় Opening Ceremony. ফরাসী প্রেসিডেণ্ট স্বয়ং মহাসমারোহে দ্বার উদ্ঘাটন করলেন। বহু অশ্বারোহী ও পদাতিক জাতীয় পতাকাহস্তে শ্রেণীর পর শ্রেণী, একজিবিসনে প্রবেশ করল। আমরাও প্রবেশ করলাম, দেখলাম জগতের বিভিন্ন জাতির প্রত্যেকেই এক একটা বিরাট্ বাড়ী প্রস্তুত করেছে। আমাদের ভারতীয় বিভাগের জন্য Pavilion de Hindoustan নামে বৃহৎ বাড়ী হয়েছে। সে দিন আর বেশী কিছু দেখলাম না, দুপুরেই হোটেলে ফিরলাম।

The Congress Hall.—Paris Fair.

বিকালে আমরা Indian Students' Association-এ গিয়ে উপস্থিত হলাম। প্রায় তিরিশ চল্লিশটী ভারতীয় ছাত্র আছেন ; তার মধ্যে বাঙ্গালী দশ বার জন। তাঁরা আমাদের স্থায়ী বাসের জন্য Association-এর বাড়ীতেই তেতলায় একটা ভাল ঘরের ব্যবস্থা করে দিলেন। এর ঠিকানা —17, Rue du Sommerard. পরদিন ভোরে উঠেই আমরা সহর দেখবো স্থির করলাম। সকালকার আহার শেষ করে Thomas Cook & Son এর ব্যাঙ্কে গিয়ে আমাদের আবশ্যক মত ফরাসী মুদ্রা নিলাম। নিকটেই বিখ্যাত "ম্যাদেলিন" (Madeline) নামক গীর্জ্জা। প্যারিসে অনেক বিখ্যাত গীর্জ্জা আছে। তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধানটীর নাম 'নতর্ দাম' (Notre Dame) এবং দ্বিতীয় এই ম্যাদেলীন (Madeline)। আমরা

মেডেলাইনের প্রবেশ পথ।

গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। ভিতরে সর্ব্বপ্রধান মূর্ত্তিটী স্বর্গদূতবেষ্টিত। মাতামেরী মূর্ত্তির উভয় পার্শে বড় বড় মোমবাতী জ্বালা রয়েছে। বহু দর্শক ঘুরে ফিরে দেখছে। স্থানে স্থানে দু'এক জন ধ্যানে মগ্ন হয়ে বসে রয়েছে।

একটু পরেই দেখলাম প্রায় পঞ্চাশটা ছোট ছোট মেয়ে শ্বেত পরিচ্ছদে আবৃত হয়ে গীর্জ্জায় প্রবেশ করল। মাথায় সাদা মুকুট। সাদা পোষাকের উপর সাদা মুকুট—সাদা পোষাকের উপর সাদা ওড়না—সবই সাদা। বড়ই পবিত্র দৃশ্য। জিজ্ঞাসা করে জানলাম তের বৎসর বয়সে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান মেয়েরা ধর্ম্ম গ্রহণ করে। এবং এই দিন ইচ্ছামত নূতন নাম গ্রহণ করে। এ অনেকটা আমাদের দেশের দীক্ষা গ্রহণ করবার মত। তারপর খানিকক্ষণ ভিতরে ঘুরে দেখে শুনে বেরিয়ে পড়লাম। Madeline থেকে Place de la concord পর্য্যন্ত সুপ্রশস্ত রাস্তা। রাস্তাটী খুবই জমকালো। Place dela concord অতি বিখ্যাত স্থান। ফরাসীবিপ্লবের সময় দেশবাসী রাজদ্রোহীগণ রাজগণকে এইখানে হত্যা করেছিল। সেই সময় থেকে ফরাসী দেশে রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে সাধারণ তন্ত্র পরিচালনের ব্যবস্থা হয়। রাজগণের হত্যার স্মৃতির স্বরূপ এখানে একটা প্রকাণ্ড স্তম্ভ করা হয়েছে। এই স্থানটীর দক্ষিনে

সীণ নদী, উত্তরে Madeline, পূর্ব্বে বিচিত্র উদ্যান এবং পশ্চিমে প্যারিসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাস্তা—এভিনু্য দে সাঁজে লিঁজে (Avenue des champs-Elysees)। চতুর্দ্দিকে গাড়ী ও জনতার তো কথাই নাই। আমরা অবাক হ'য়ে সেই Concord-এর দৃশ্য দেখছিলাম, আর ভাবছিলাম, হ্যাঁ প্যারিস বটে!
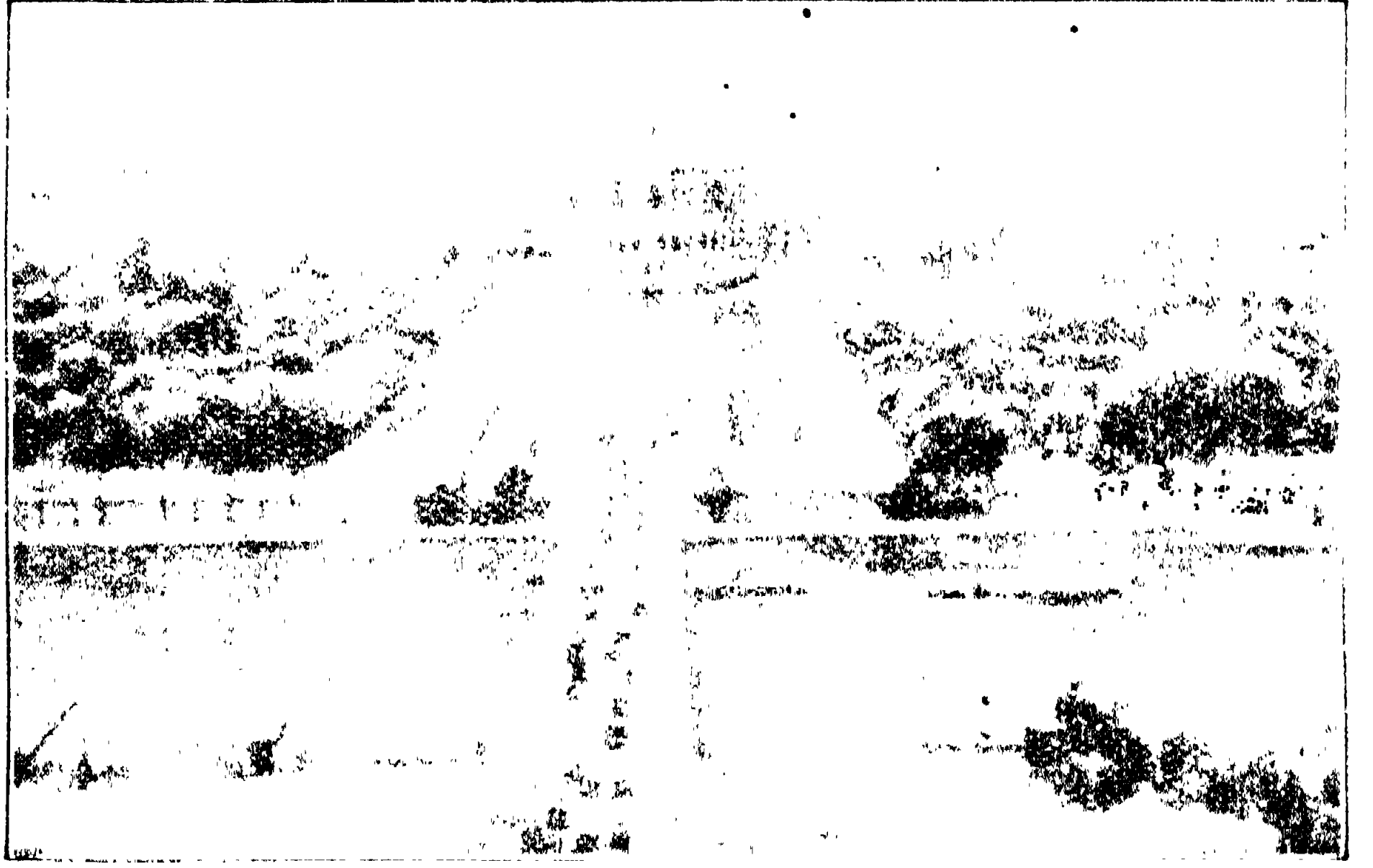
ট্রোকাডেরো ও সীন নদীর তীরে উদ্যান। সীনের উপর সেতু।

তারপর আমরা সেই অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যময় রাস্তা দিয়ে চলতে আরম্ভ করলাম। রাস্তার দু'পাশে বৃক্ষশ্রেণী ও সুবিস্তৃত ফুটপাথ্; তার পরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকাশ্রেণী। বাড়ীগুলি প্রায়ই পাঁচ-তলা—ধূসর বর্ণের। এই রাস্তায় ট্রাম বা বাস চলবার ব্যবস্থা নাই, শুধু ট্যাক্সি মোটরে ভরপুর। দু'পাশে ফুটপাথের উপর দিয়ে বড় বড় রেস্তোঁরা। সে সব রেস্তোঁরা প্যারিসের ধনী লোকদিগের আহার বিহারের জন্য।

পরে আমরা সেই রাস্তা দিয়েই বারটা রাস্তার কেন্দ্র স্থলে এসে উপস্থিত হ'লাম। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! যায়গাটার নাম Place de la Etoile. এই স্থানে বিগত মহাযুদ্ধের অজ্ঞাত মৃত সৈন্যদের জন্য একটী স্মৃতি তোরণ আছে। তার নীচে সর্ব্বদাই আগুন জ্বলছে। দর্শকগণ প্রত্যেকেই সেখানে গিয়ে সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করে। পুরুষেরা মাথার টুপি খোলে।

সেখান থেকে আমরা সোজা সীন নদীর ধার দিয়ে চলতে লাগলাম। প্রায় আড়াই বা তিন শত হাত অন্তর সীনের উপর এক একটা পোল। প্রত্যেকটাই ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। নদীতে ষ্টীমারে চলা ফেরা করবার বন্দোবস্ত আছে। যদিও আমরা সেদিন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তথাপি গাড়ীতে চলা ফেরা করবার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের হেঁটে দেখবার সখটাই বেশী ছিল। সন্ধ্যার আগেই আমরা হোটেলে ফিরলাম। সেদিন ভাত খেতে বড় ইচ্ছা করছিল। অনুসন্ধানে জানলাম, ইণ্ডোচীন রেস্তোঁরাতে গেলে ভাত পাব। আমাদের এই অঞ্চলটাতে বিভিন্ন দেশবাসীর বসবাস খুব বেশী। আমরা একটা ইণ্ডোচীন রেস্তোঁরাতে গিয়ে ভাত, বাঁধা কপির তরকারী, ডালের বড় বড় অঙ্কুরের ঘণ্ট পেলাম। [illegible] শুধু তরকারী। রান্না অনেকটা

আমাদের দেশের মত, তবে তাতে ঝাল দেওয়া নাই। কি একটা চাট্‌নী দিল, বিশ্রী গন্ধ। আমার ভয় হচ্ছিল টিকটিকি কি আরশোল্লার চাটনী না হয়। তাই সেটা খাইনি।

পরদিন দুপুরে আমরা বিখ্যাত "নত্‌র দাম" (Notre Dame) অর্থাৎ মাতামেরীর গীর্জ্জা দেখতে গেলাম। এই "নত্‌রদাম"কে কেন্দ্র করেই প্যারিস নগর গঠিত। এটী ফরাসী জাতির বড় গর্ব্বের জিনিস। দু'ধারে সীন নদী বিভক্ত হয়ে প্যারিসের মধ্যকেন্দ্রে একটী দ্বীপ উৎপন্ন করেছে। এই দ্বীপের উপরেই এই গীর্জ্জা। দেখ্‌লাম দরজার গঠন অনেকটা তাজমহলের দরজার মত। তাতে পৌরাণিক খৃষ্টভক্তদের মহিমময় মূর্ত্তি খোদিত। ভিতরে প্রবেশ করলাম। এদেশের সমস্ত গীর্জ্জাই রোমাণক্যাথলিক খৃষ্টানদের। এটীও তাই। ভিতরে প্রবেশপথে দেওয়ালের গায় প্রস্তরপাত্রে পবিত্র জল রাখা হয়, প্রত্যেকেই প্রবেশের সময় একটু হাতে করে মাথায় ও বুকে দেয়। আমরাও এ রীতি পালন করলাম। জানি না, এ আমাদের দেশের চরণামৃতের স্থানীয় কি না। আমরা মাতা মেরীর মূর্ত্তি খুব ভক্তির সহিত দেখ্‌লাম। তারপর চারিদিক ঘুরে দেওয়ালের গায়ের কারুকার্য্য দেখে ফরাসী জাতির চিত্রশিল্পের মর্য্যাদা অনুভব করলাম।

এরপর আমরা পর পর প্যারিসের অনেক দর্শনীয় বিষয় দেখেছি। মাত্র কয়েকটী বিষয় বর্ণন করে এবারকার লেখা শেষ করব।

Place de la Bastilla of Paris.

একদিন আমরা মিউজি গ্রেভঁা (Musee grevin) দেখ্‌লাম। এখানকার দেখবার বিষয়—মোমের মূর্ত্তি, একটা আশ্চর্য্য রকমের আলোক ধাঁধাঁর ঘর এবং যাদু বিদ্যা। আমরা প্রথমে গিয়েই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের প্রতিমূর্ত্তি দেখ্‌তে পেলাম। দুয়ারের সম্মুখেই বিশ্ববিখ্যাত নর্ত্তকী আনা প্যাভলোভার একটী নৃত্যভঙ্গিমাময় সুন্দরমূর্ত্তি দেখতে পেলাম। আর একটী কোণে থামের আড়ালে জগদ্বিখ্যাত চলচ্চিত্রনায়ক চার্লি চ্যাপলিনের মূর্ত্তি। সিনেমায় তাঁকে দেখেছি, কিন্তু এদিন তাঁকে সত্যই দেখলাম বলে মনে হল। এ ছাড়া হিট্‌লার, হিণ্ডেণ বুর্গ, মহাত্মা গান্ধী, মুসোলিনী প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের যাঁর যে অবস্থায় মানায় তাঁর সেই অবস্থার মূর্ত্তি স্থাপিত।

খদ্দরের চাদরে দেহাবৃত উপবিষ্ট মহাত্মার হাতে একখানা গীতা দেওয়া রয়েছে। প্রত্যেক্ মূর্ত্তিটীর পার্শ্বে নানা ভাষায় পরিচয় লেখা রয়েছে। আমরা একটা সোফায় গিয়ে বসলাম ; পার্শ্বে দেখি একজন বৃদ্ধ একখানি খবরের কাগজ হাতে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমের ঘোরে তার কাগজখানি একদিকে মাথাটী আর একদিকে ঢলে পড়েছে। আমরা অনেকক্ষণ তাকে একই অবস্থায় দেখলাম। লোকটী ঠিক আমার পাশেই ছিল। অনেক্ষণ পরে জানতে পেলাম সেটী মোমের তৈরী। আর এক সিঁড়ির কোণে একটী মেয়ে পায়ের মোজা ঠিক্ করছিল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখি সেটাও মোমের। এই রকম কোন্‌টী সত্যি আর কোন্‌টা মিথ্যা তা আর ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। আমাদের ঠিক মাথার উপর একটী বারান্দা থেকে একটী স্ত্রীলোক ও একটী পুরুষ ঝুঁকে কি যেন দেখ্‌ছিল। গিয়ে দেখি—হায়রে, সে-দুটীও পুতুল। এবার ভাবলাম যে আর ঠকবনা—সত্য মিথ্যা বুঝতে পারব। একটী দরজার পাশে দুটী প্রহরী রয়েছে দেখে আমরা কথা বলতে গিয়ে দেখি যে তার একটি সত্যি মানুষ অপরটী মোমের তৈরী। তারপর বাড়ীর নিচের কত কৃত্রিম ঝরণার পাশ দিয়ে, কত কৃত্রিম পাহাড়ের সুড়ঙ্গ দিয়ে আমরা নানা রকমের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। একটা পাহাড়ের ওপর ক্রুশবিদ্ধ যীশু পদতলে শোকাতুরা মাতা মরিয়ম, নেপোলিয়নের দরবার, রোমের কলোসিয়ামের দৃশ্য, চতুর্দ্দশ লুই-এর (Luis XIV) থিয়েটার দেখতে যাওয়া ইত্যাদি।

তারপর আমরা একটী ঘরের ভিতর ঢুকলাম, সেটী একেবারে অন্ধকার। একসঙ্গে পঁচিশ তিরিশ জন লোককে প্রবেশ করতে দেওয়া হল। প্রথমে আমরা গিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না, পরে হঠাৎ ঘরটী আলোকময় হয়ে উঠল, কী সুন্দর দৃশ্য। কারুকার্য্যময় প্রকাণ্ড ঘর, তার প্রত্যেক থামের চারিপাশে নানাদেশীয় সুন্দর সুন্দর মেয়েদের মূর্ত্তি। আর চারিদিকে যতদূর চোখ যায় ঐ রকম। আমরা প্রথমে ঠিক করতে পারলাম না যে এত বড় ঘর হতে পারে। একটু পরে আবার অন্ধকার হয়ে আর একটী দৃশ্য হ'ল সেটী একটী উদ্যান, ঠিক আগেরকার মতই যতদূর

টুলারী উদ্যান ও লুভ মিউজিয়াম।

দেখা যেতে পারে তাতে সুন্দর প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। আমার মনে হচ্ছিল যে একটি প্রজাপতি গিয়ে ধরি কিন্তু সবই ধাঁধাঁ। সে দৃশ্যটা বদ্‌লে গিয়ে একটা রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর এল। তারও থামের কারুকার্য্য ও ছাতের নক্সা প্রভৃতি চমৎকার। আলো জ্বালতেই দেখলাম সমস্ত ঘরের দেওয়ালটা আর্শীতে ঢাকা। কাজেই কয়েকটা জিনিষ থাকলেই ছায়া পড়ে অনেক দেখায়। আর একটা যায়গায় কয়েকটা যাদুখেলা দেখাল—সেগুলি অনেকটা আমাদের দেশেরই মত। প্রায় পাঁচ ঘণ্টায় আমাদের সমস্ত দেখা শেষ হ'ল।

আর একদিন আমরা প্যারিসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। এটার নাম লুভ্‌ (Louvre)। এটা পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ লুই-এর বাস-ভবন ছিল, এখন মিউজিয়াম হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ দেখতে নাকি এক সপ্তাহের বেশী সময় আবশ্যক। আমরা সেদিন গিয়ে শুধু ছবির বিভাগটা দেখে এলাম। পৃথিবীর প্রাচীন শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের বিখ্যাত বিখ্যাত ছবিগুলি এখানে রয়েছে। আমাদের তিন চার ঘণ্টা লাগল শুধু ছবির বিভাগটা দেখতে। আর এক দিন গিয়ে আমরা মূর্ত্তির ঘরগুলি দেখে এলাম। গ্রীশ, ইটালী প্রভৃতি দেশ হইতে সংগৃহীত সমাধির দেওয়াল ও মোগল আমলের পাথরের কাজ ইত্যাদি নানা রকমের। আমাদের দেশের একটা বাঙ্গালা সাধুর মূর্ত্তিও দেখলাম। বাইরে এসে Louvre-এর সামনেই প্যারিসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনোরম বাগান। এটা Louvre-এর সংলগ্ন—'জার্দাঁ তুলারী উদ্যান" (Jirdin de Tuilaries)। তার ভিতর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফোয়ারা, সেই ফোয়ারার জলের ভিতর ছোট ছেলে মেয়েরা খেলনা-জাহাজ ভাসিয়ে দিচ্ছে, আপনা হতেই সেগুলি চলছে। বাগানের বৃক্ষশ্রেণী, ফুলের গাছ ও মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি সত্যই দেখবার জিনিস। বিশ্রামের জন্য চেয়ার ভাড়া পাওয়া যায়। অনেক লোক বেড়াতে আসে। একদিন ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব রাজা চতুর্দ্দশ লুইএর বাড়ী দেখতে গেলাম। সেটা প্যারিসের বাইরে "ভার্সাই" (Varsaills) নামে একটা নগরে। সেদিন রবিবার। কাজেই অনেকেই সেখানে যাচ্ছিল। সকাল আটটায় ট্রেনে রওনা হলাম। পথে
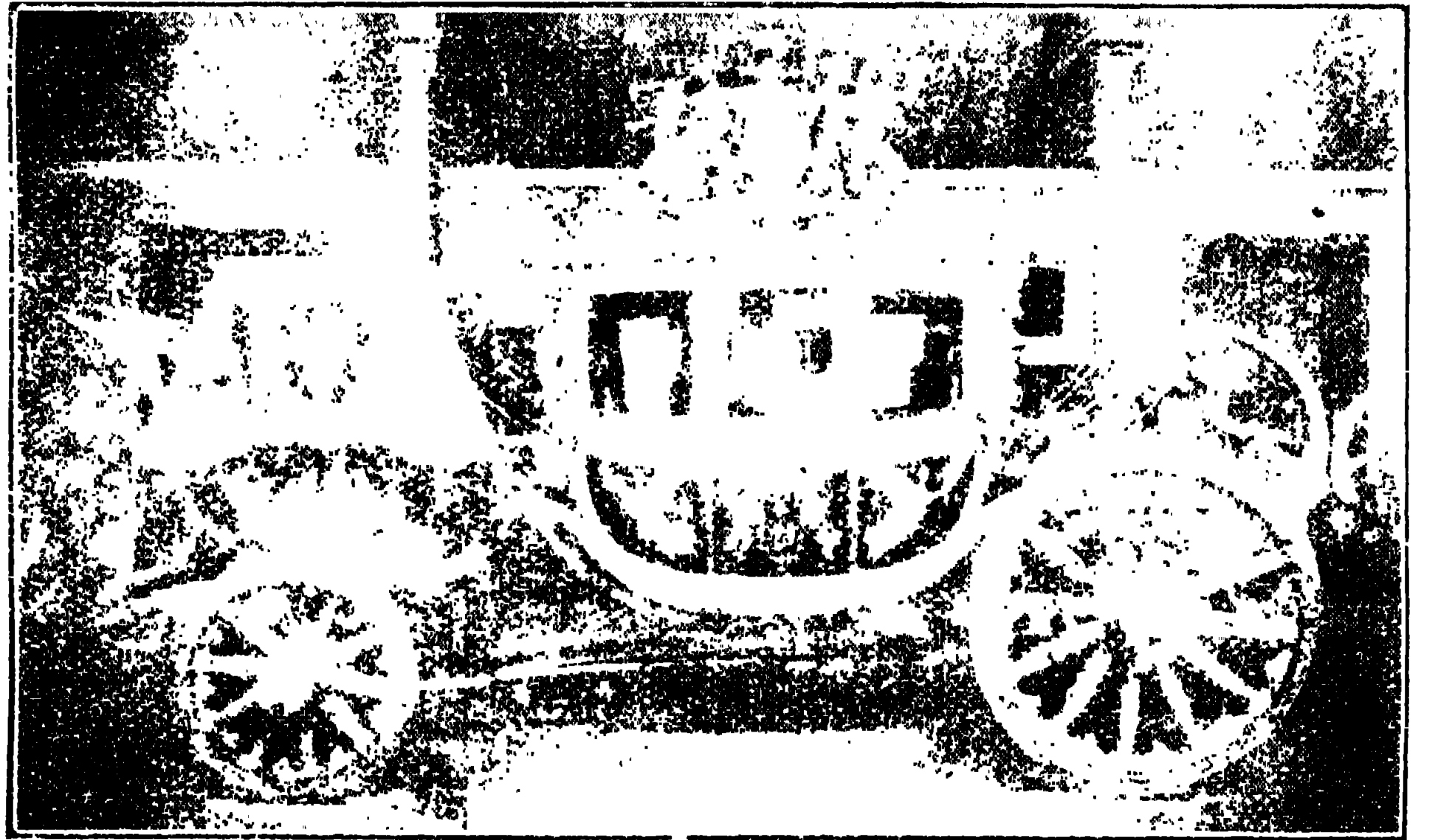
নেপোলিয়ানের ব্যবহৃত শকট।

ছোট ছোট পল্লী ও আশে পাশের পাহাড়গুলি দেখে বেশ ভাল লাগছিল। আমরা ঠিক সান নদার পাশ দিয়েই চলছিলাম। এক ঘণ্টা পরে আমরা পোঁছলাম। খুব লোকের ভীড়। স্টেশন থেকেই রাজপ্রাসাদ দেখা যাচ্ছিল—আমরা সোজা সেখানে গেলাম। অনেক গাইড আমাদের দেখাবে বলে ধরেছিল, আমরা তাদের সাহায্য নিলাম না। প্রাসাদের চারিপাশ দিয়ে প্রহরী। অনবরত লোক দেখবার জন্য ঢুকছে। ভিতরে ঢুকেও অবাক হয়ে গেলাম। সে কী আসবাব পত্র! আর কিইবা তার কারুকার্য্য! প্রত্যেক দেওয়াল খানিতে এক একটা বড় ছবি আঁকা। লুইএর পর ফরাসী বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টিও এই বাড়ীতে বাস করেছিলেন। তাঁর ব্যবহৃত অনেক জিনিসের ছবি রয়েছে। বাড়ীটা লুইএর তৈরী ছিল। তিনি খুব বিলাসী রাজা ছিলেন। ছাতের ও দেওয়ালের গায়ের প্রত্যেক ছবিটিই তাঁর জীবনের ঘটনাপূর্ণ। তখন যে ভাবে সাজান ছিল এখনও সেই ভাবে রয়েছে। নীচের তলায় নেপোলিয়নের ব্যবহৃত কামান, বন্দুক, গোলা ও শকট সমস্তই রয়েছে দেখলাম। তারপর বাইরে রাজোদ্যান। নানা ভঙ্গীর গাছ, ফোয়ারা, সরোবর, গভীর বনের ভিতর কৃত্রিম পর্ব্বতের ঝরণায় স্নান করবার স্থান ও ফুল বাগান দেখে লুই যে কত বড় রাজা ছিলেন তা অনেকটা বোঝা যায়। উদ্যানটা এত বড় যে এক মাইল দূরে গিয়ে গভীর বনের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। আমরা সারাটা দিন ধরে Varsaills দেখে সন্ধ্যার পরে ফিরলাম। এক দিন প্যারিসের ভিতরে "ইভেঁলিদ্" (Invalides) নামক প্রাসাদে নেপোলিয়নের সমাধি দেখলাম। সেখানে একটা War-Museum আছে—সেটাও তাঁরই ব্যবহৃত জিনিসে পূর্ণ। তিন শত বৎসর আগেকার এয়ারোপ্লেন ও নেপোলিয়নের অধিকৃত দেশের পতাকা তাঁর নিজের হাতে সজ্জিত অবস্থায় আছে। একটা কাঁচের বাক্সে তাঁর তরবারি ও মুকুট সযত্নে রক্ষিত হয়েছে।
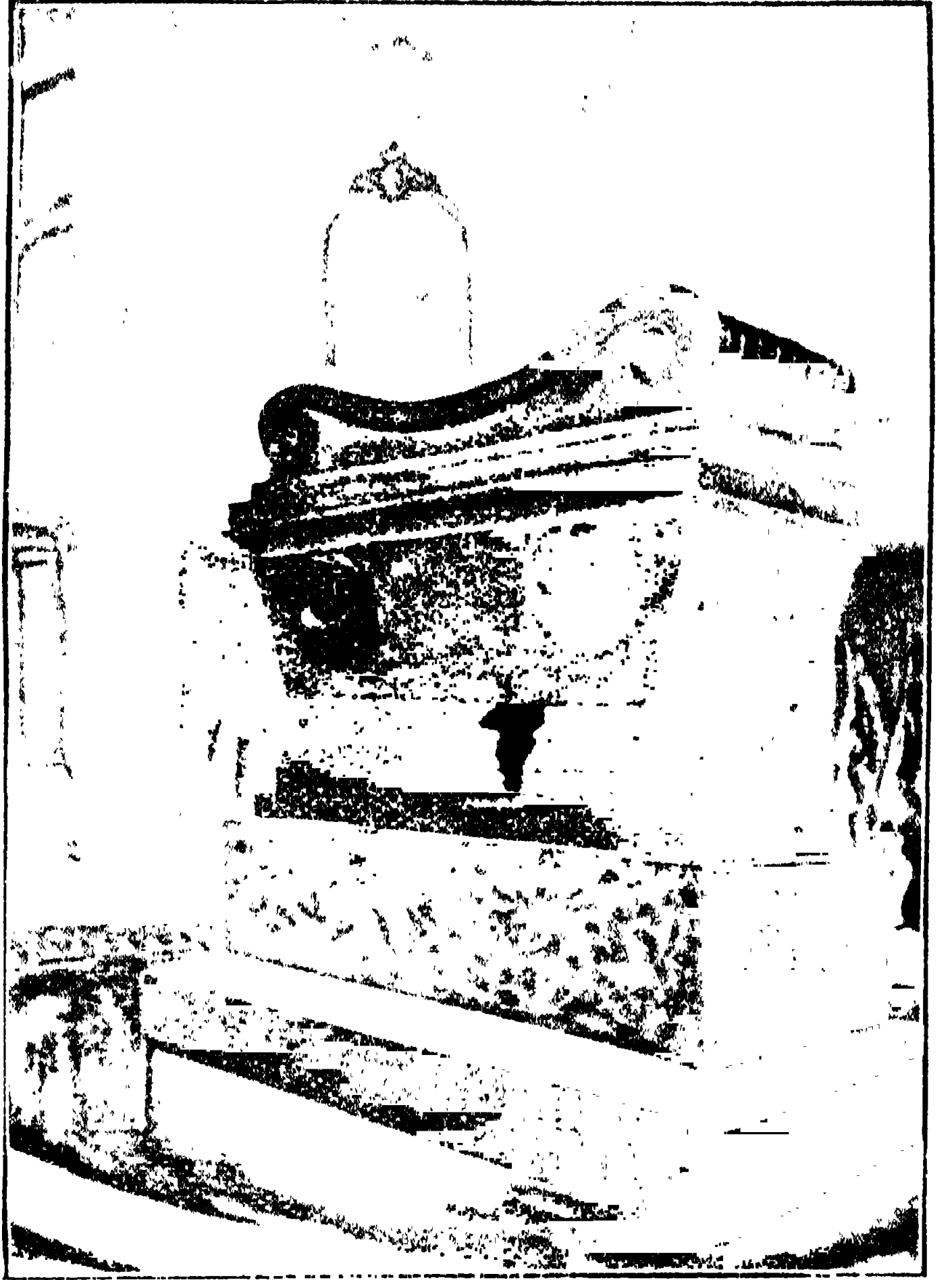
নেপোলিয়নের সমাধি।

প্যারিসের "ইফেল টাওয়ারের" নাম বোধ হয় সকলেই শুনেছেন। এটী লোহা দিয়ে তৈরী —প্রায় হাজার ফিট উঁচু। আমরা এক দিন ইফেল টাওয়ারের উপরে উঠেছিলাম। এখান থেকে প্যারিসের সৌন্দর্য্য সব চেয়ে বেশী অনুভব করলাম। এর উপরে তিনটী তলা। প্রথম তলায় বহু দোকানপাঠ, রেস্তোঁরা, নাচঘর প্রভৃতি রয়েছে। Liftএ করে উঠতে হয়। "ইফেল টাওয়ারে"র উপরে গিয়ে আমরা প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলাম।

অনেক মিউজিয়ামের মধ্যে "ত্রোকাডেরো" মিউজিয়ামটি আমাদের বড় ভাল লেগেছিল। এটী সান নদীর উপরে বুলং উদ্যানের প্রান্তে অবস্থিত। এখানে পৃথিবীর অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষিত হয়েছে। ইণ্ডোচীন বিভাগে আমাদের ভারতীয় বুদ্ধ, বিষ্ণু, দুর্গা, ব্রহ্মা প্রভৃতি কয়েকটী প্রস্তর মূর্ত্তি দেখে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করলাম।

প্যারিসে প্রতি বৎসর জুলাই মাসে একটী প্রদর্শনী হয়। এর নাম প্যারিস ফেয়ার (Foir de Paris). এখানে ফরাসী দেশের শিল্প বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রচুর দ্রব্য প্রদর্শিত হয়। আমরা এক দিন গিয়ে সমস্ত দিনটা ঘুরে দেখলাম। কিন্তু সেখানে বিভিন্ন বিষয়ের এক একটী বিভাগ এতই বড় যে প্রত্যেকটার এক এক প্রান্ত দেখেই কূল পাচ্ছিলাম না। বাবা জুয়েলারী বিভাগসম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তাই তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত এই জুয়েলারী বিভাগটী দেখলেন। জুয়েলারী বিভাগে উপস্থিত হওয়া মাত্রই সেখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী একজন ইংরেজী জানা গাইড আমাদের সঙ্গে দিলেন। গাইডটি সমস্ত দোকানে নিয়ে আমাদের সঙ্গে তাদের এই বলে পরিচয় করে দিল—যে ইনি ভারতবর্ষের কলিকাতা নগরের একজন জুয়েলার। সেখানে আমি একটী সুন্দর brooch উপহার পেয়েছিলাম।
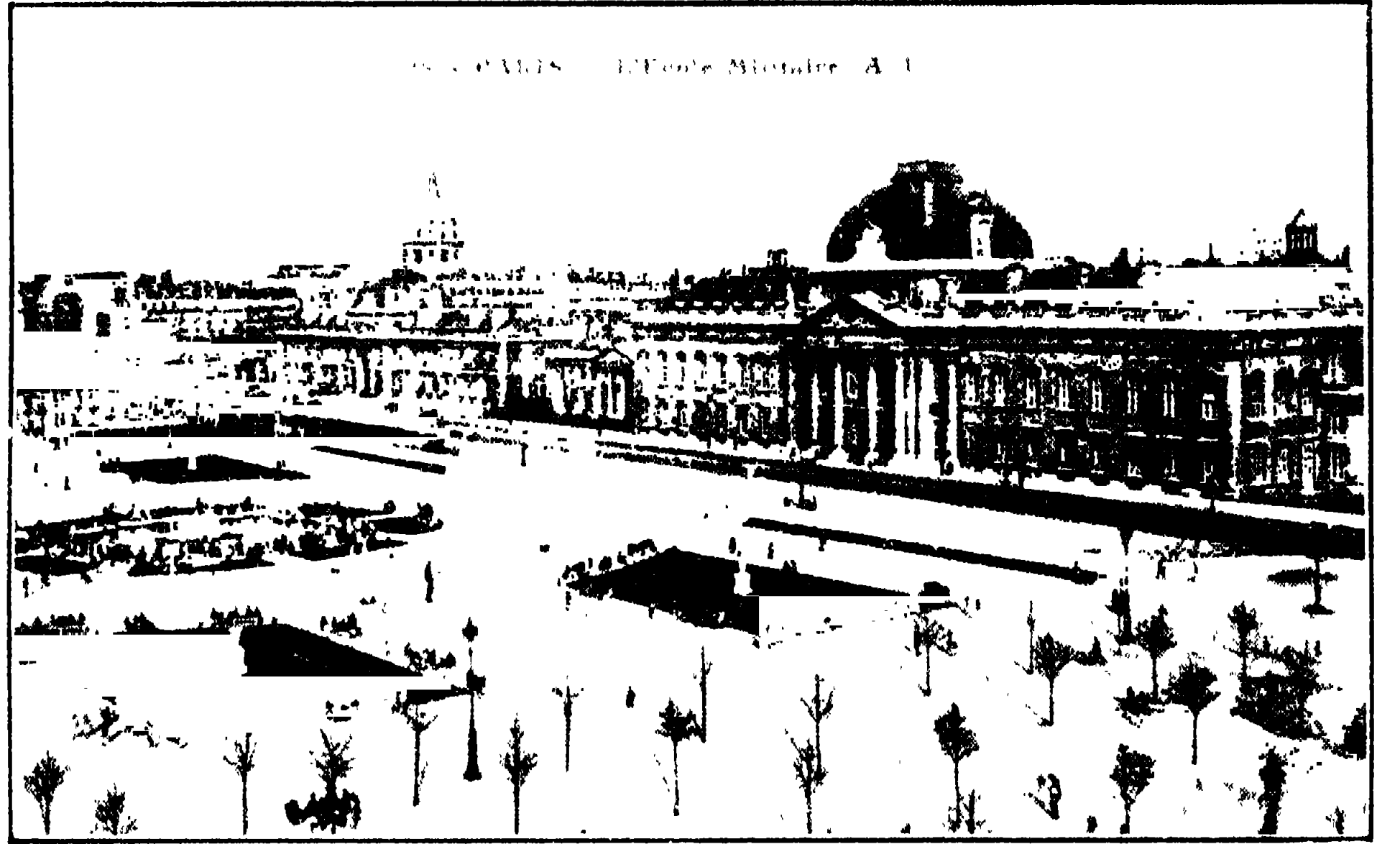
প্যারিসের মিলিটারী স্কুল।

অত্যন্ত অযোগ্যভাবে আমি প্যারিসের দেখাশুনার কয়েকটী বিষয় বর্ণনা করলাম। আগামী বারে 'ইণ্টার ন্যাশন্যাল কলোনিয়াল একজিবিশন" সম্বন্ধে কিছু লেখবার আশা রইল।

চলার পথে

শ্রীমন্দাকিনী মিত্র

ভাগলপুরের দুটী ষ্টেশন পরেই "কহলগাঁও" সেখান হতে গঙ্গা পার হতে "তিন টাঙ্গায়" যেতে হয়। "তিনটাঙ্গা' একটী দ্বীপ বলিলেও চলে। যায়গাটী ছোট্ট। গঙ্গার জল, চারিদিকে বিস্তৃত বালি রাশি; গ্রীষ্মের রুক্ষতাকে রুক্ষতর করে তোলে। নেহাৎই গ্রাম। ছোট লোক, মধ্যবিত্ত ও গাঁয়ের জমিদার নিয়ে বেশ কয় ঘর বসবাস করে। বলাবাহুল্য সবাই বেহারী! গাঁয়ের ছোটলোক বড়লোকে বেশভূষায় কোনই তফাৎ নাই। 'ছাতুখোর' চিরদিনই পরিচ্ছদে বৈরাগী; এক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম নেই। সেই ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়ে ভুঁড়ির বহর বাড়িয়াছে মনে হয়। একটী হাঁসপাতাল এবং তার ডাক্তারটী 'একমেবদ্বিতীয়ম্' নামের সার্থকতা স্বরূপ বাঙ্গালী। দুচার ঘর 'বাহ্মন' গ্রামের কর্ত্তা। এরা চারপুরুষানুক্রমে দিনের বেলায় মোড়লী ও রাত্রে 'লাঠিয়ালি' করে বেড়ায়। রাত ৯টা হতে ১২টা অবধি উঁচু হয়ে বসে; কিঞ্চিৎ 'তাড়ি' ও তামাক সহযোগে ১০।১২ জন মিলে বৈঠক চলে নিয়মিত ভাবে। আলোচনী সভায় গোলটেবিল না থাকলেও আলোচিত বিষয় গুলির গুরুত্ব সমানই যথা—'বোতলমণ্ডলের সম্প্রতি বেশ দু'বিঘা জমীন হওয়াতে বড়ই পায়াভারি হয়েছে; 'মোসমাত' শুখনী কাহারনীর জমিটা হাতাইতে পারিলে জলের ভাগটা তাদেরই জমিতে ফসল ফলাবে, ডাংঙ্গদরবাবুর গরুটী বেমালুম গঙ্গার ওপার না করিতে পারিলে আর রক্ষা নাই। কারণ রাক্ষুসে গরুটীর আধমণ করে দুধ হয়; আর সেই দুধই দুপয়সা সস্তা পাওয়ায় গাঁয়ের বড়লোকরা নিতে সুরু করেছে; সুতরাং বেচারী গোয়ালাদের হায় হায় রব এরা ন্যায়বান্ বিচারক হয়ে কি করে নীরবে শুনতে ও সহ্য করতে পারে, বিশেষ গোয়ালা ভাইয়েরা চাঁদা করে ২০৲ নগদ 'তাড়ি' পিতে দিয়েছে। তাহাদের সেই করুণ সুর 'হুজুর একঠো উপায় কর দিয়া যায় গরীব পরার' এখনও তেওয়ারীর কানে বাজ্‌ছে। এই বিবেচক সমিতির তামাক, খইনি, বিড়ি, তাড়ি সরবরাহ করিতে প্রত্যেক গরীব ও মধ্যবিত্ত ঘর শশব্যস্ত। 'পারি' লাগিয়ে এরা কর্ত্তাদের মনোস্তুষ্টি করে।

২

ঢং ঢং ঢং তিনটে বাজল, ডাক্তার প্রকাশঘোষ খাটের উপর বসে হাই তুল্‌তে তুল্‌তে উঠে পড়ল। তারপরই থাড়া বড়ি থোড়্ থোড়্ বড়ি্ খাড়া; পমরু পকরের হাতের তৈরী তারই সমবর্ণী কৃষ্ণবর্ণ বা মোটা মোটা পুরী; বেগুণের তরকারী এবং যুদ্ধের গোলাগুলীর কথা স্মরণ করার এইরূপ; বেশ মজবুত রসোগোল্লা কোন মতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে গলধঃকরণ করে, আজ তিনবৎসরের চিরাচরিত জীনের প্যাণ্ট ও তার উপর গরদের কোট চড়িয়ে সাইকেলে উঠে বাড়ীর মোড়ের কাছে অদৃশ্য। ঐ গরদের কোটের ইতিহাসটী এখানে বলাই ভাল। প্রায় কুড়ি বৎসর বয়ক্রমের এই কোটটী বিকৃত বর্ণ ও মাত্র পাঁচ যায়গায় ছিদ্রবিশিষ্ট হলেও ডাক্তারের দেহে এখনও বিজয় পতাকা ওড়ায়। এটী প্রকাশের বাপের আমলের; সম্পত্তি হিসাবে সেই এখন কোটটীর উত্তরাধিকারীস্বরূপ। সকালে ভোর পাঁচটায় ঘুমভাঙ্গে, হাঁসপাতালের কাজও খুব বেশী নয়। দিনগুলি নিতান্তই বৈচিত্র্যহীন। প্রথম আসার তিনমাস পরই সে অতিষ্ঠ হয়ে বদলির চেষ্টা করে। বাঙ্গালী বর্জ্জিত তার কাছে বড় একঘেয়ে লাগত কিন্তু দীর্ঘ তিনবৎসর কাটল ও সময়ের গুণে এই জীবনেই সে অভ্যস্ত।

তার ওপর সরকারী ডাক্তারের প্রতিপত্তি ও আয় মন্দ নয়। গ্রাম বলিয়া অনেক জিনিষ দুষ্প্রাপ্য সুতরাং ব্যয়বাহুল্য নাই। তাই প্রকাশ তিন বৎসরে বেশ গুছাইয়া বসে। ব্যাঙ্কে সামান্য ও প্রভিডেণ্ড ফণ্ডে বেশী রাখিয়াছে।

কিন্তু ছাব্বিশবৎসরের বাঙ্গালী যুবা; একটী হিন্দুস্থানী পরিপূর্ণ গাঁয়ে রহড়কেদাল মোটাপুরী দহিবড়া কড়ি পকৌড়ি খাওয়া এবং সঙ্গীস্বরূপ 'কপুরী সাহায়' কে পাওয়া সত্বেও বাঙ্গালী বহুল ভাগলপুরের কথা ভুলতে পারতো না। কপুরীসাহায় কদাচ নবাগত কোন বাঙ্গালী দেখলেই 'হামি বাংগলা মুলুকের লোক আছে, মোশায়ের বাঁসা কোথা?' বলিয়া তিনি যে বাংলা ভাষাভিজ্ঞ তার যথাযথ পরিচয় দিতেন। প্রকাশ ঘোষ ছোট হতেই পিতৃহীন। কাকার কাছে মানুষ হয়। ভাগলপুরে চেষ্টা করিয়াও আই এ পাশ করতে না পারায় এবং মাত্র দুবার ফেল করবার পরই নিজের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় বুঝে দ্বারভাঙ্গা মেডিকেলে চার বৎসর পড়ে পাশ করে। বহু সুপারিশ ও উমেদারীর জোরে এই চাকরী পায়। তিনটাঙ্গাবাসী এহেন সুপাত্র প্রকাশ ঘোষ লোকচক্ষুর আড়াল সত্বেও কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার শ্যেনদৃষ্টি হতে এড়ায়নি। এবং একদিন শুভলগ্নে ডাক্তারের চিরাচরিত সুশৃঙ্খল জীবনে বিশৃঙ্খল ঘটাতে একটী নোলকপরা কচিমুখের পঞ্চদশী সুন্দরীর আবির্ভাব ঘটল। কোথা দিয়ে যে কি ঘটল তা সে কিছু জানে না; খুড়তুতো ভাই এসে তাকে দিয়ে পনের দিনের ছুটীর দরখাস্ত করাল! শুভ দৃষ্টির সময় চারিদিক হতে অভিযোগ অনুযোগের পালা, দুটী ধবধবে গোলালো হাতের ছোঁয়া শুভ্র গোড়েমালা, দুটী সরল চোখের চাহনি এবং মালা পরাবার সঙ্গেই তার মনে অপূর্ব্ব বন্ধনের আনন্দানুভূতি, এই সব মিলে তাকে অভিভূত করে ফেলেছিল।

৩

বিবাহিত দেড়বছরকেটে গেছে। ডাক্তারের জীবনের আগাগোড়া বদল হয়েছে। শ্রীহীন বাড়ীটির এবং মনিবটীর ও লক্ষ্মীর স্পর্শে রং ফিরেছে। এখন মড়ুপর রুটী ও বহরদালের পরিবর্ত্তে ফুল্কো গরম লুচি ও সোণামুগের ডাল। ডাক্তারের নীরস হাঁসপাতালের কাজও আনন্দদায়ক হয়েছে হিন্দুস্থানী পল্লীটিও অত অসহনীয় বোধ হয় না। রাত্রিটুকুর মাধুর্য্য তাকে সারাদিনের কঠোরতা হতে রক্ষা করে। লক্ষ্মী তার মনের মতই স্ত্রী। তার ওপর ডাক্তারের স্নেহের অন্ত নাই, কি লক্ষ্মী ভালবাসিবে, কিসে খুসী হবে, বেশী পরিশ্রম করিলে তাহাকে সাহায্য করা; মোটকথা লক্ষ্মীর সম্বন্ধে প্রকাশ সর্ব্বদাই সচেতন। প্রতি রবিবারে প্রকাশ লক্ষ্মীকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়ায়। পায়ে ধুলা লাগে বলে একজোড়া জরিদার নাগরা কিনে দিয়েছে। মাথার দিব্যি দিয়ে মুরগীর ডিমও খাইতেছে তবে এতকরেও নোলকটীকে ইস্তাফা দেওয়াতে পারে নি। লক্ষ্মীর ওজর 'তাহলে দিদিমা বড় রাগ করবেন, ডাক্তার বলত তুমি আমার নাম করো তাহলে—'মুখে কথা কেড়ে নিয়ে লক্ষ্মী বলত, 'ওমা কি হবে সে আমার ভারি লজ্জা করবে।' ভিতরের কথাছিল, লক্ষ্মী ছোট বেলায় কারমুখে যেন শুনেছিল যে নোলক নাকে দিলে স্বামীর আয়ু বৃদ্ধি হয়। সেদিন গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে ফেরার সময় কাচারীর পথদিয়ে, দুজনে তাড়াতাড়ি ফিরতে গিয়ে, একটা কাঁটাগাছে লক্ষ্মীর শাড়ী আটকে গেল। কাচারীবাড়ীতে উজ্জ্বল আলোয় একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক বসে পড়ছিলেন; তিনি মুখতুলিতেই লক্ষ্মীর বড় দুটী চোখের অবাক চাহনি লক্ষ্য করিয়া মুখনীচু করিলেন। ডাক্তার তখন লক্ষ্মীর আঁচলখানি কাঁটার কবল হতে উদ্ধার করিতেব্যস্ত তখন সন্ধ্যা নামিয়ে গঙ্গার ধারে সূর্য্যের লালিমা গাঢ়তর। দিগন্ত রেখা মাঠের শেষ সবুজ রেখার সঙ্গে মিলে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য পট এঁকেছে। রাত্রির কালো ছায়ার মায়া পৃথিবীকে ঘিরে ফেলেছে লক্ষ্মীর মন কি এক

অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় উদাস হয়ে গেল। স্বামীর দিকে ফিরে লক্ষ্মী ধীরে 'বলিল বাড়ীচলো ' বাঙ্গালী ভদ্রলোকটী মেয়েটিকে এবার লক্ষ্য করিতেছিলেন। তারা অগ্রসর হতেই ভেতরে গেলেন; লক্ষ্মী প্রশ্ন করল "উনি কে ?" প্রকাশ বল্ল আমাদের খাসমহল অফিসার ডেপুটী বাবু। ছোট একটী 'ওঃ' বলে লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি পা ফেলতে লাগল; খোকার সম্বন্ধে তার ভাবনা হচ্ছিল; চাকরের কাছে ছয় মাসের ছেলে ফেলে এসেছে। লক্ষ্মীর গম্ভীর মুখ দেখে প্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, লক্ষ্মী তোমার কি অসুখ করেছে? প্রকাশের ভাবনা ও ভয় লক্ষ্মীর মনে আমোদ জাগায়, কেননা ছোট বেলা হতে এপর্য্যন্ত এত আদর যত্ন সে কখনই পায় নি। স্বামীর ভালবাসাকে মুগ্ধতাকে বা তন্ময়তাকে সে অতি কৃপার চক্ষেই দেখ্‌তো। কিন্তু এই দেড়বৎসর তার জীবনের যেন সবে আরম্ভ। এমন করে পূজা বোধহয় দেবতাকেও কেউ করে না। প্রকাশের ভালবাসার গভীরতা সে পদে পদে অনুভব করতো; বাড়ী পৌছেই প্রকাশ তাড়াতাড়ি লক্ষ্মীর মাথায় ও কপালে জল দিয়ে লোসনদিয়ে পাখা করতে লাগল; লক্ষ্মীকে খাটে শুইয়ে রাখল; সে রাতে উঠতে বা রাঁধতে দিলনা। লক্ষ্মী জেদ করায় তার হাত ধরে প্রকাশ মিনতির সুরে বল্ল—'আজকের রাতটা শুধু বিশ্রাম নাও লক্ষ্মি' খেটে খেটে তুমি কত রোগা হয়ে গেছ।' খোকাকে নিয়ে রাত জাগতে হলে প্রায়ই প্রকাশ স্ব ইচ্ছায় সে ভার নিয়ে তাকে শুতে পাঠাত। লক্ষ্মীকে এই অল্পদিনেই এত নিকটতম করেছিল যে লক্ষ্মীর মনে হত বহুদিন হতে তারা এক সঙ্গেই আছে; যেন তারা কোনদিনই আলাদা ছিলনা। প্রকাশ লক্ষ্মীকে পেয়ে সত্যি মনের সমস্ত দুয়ার খুলে অতি শান্তিতে ও আনন্দে দিন কাটাচ্ছিল। প্রকাশ একদিন লক্ষ্মীকে নিয়ে নৌকায় বেড়িয়ে এল। সেদিন লক্ষ্মী বলেছিল 'কতদিন দিদিমাকে দেখিনি গো একবার চলবে? উত্তরে প্রকাশ অতি করুণ হতাশার সুরে বল্লে, কি করে তোমায় ছেড়ে থাক্‌ব লক্ষ্মী? তবে যদি আবার আমার সাথে ফিরে আস। স্বামীর চক্ষের করুণ চাউনি ও ম্লান ভাবটী লক্ষ্মীকে কাতর করে তুলেছিল সে তাড়াতাড়ি কথা উল্টে বল্লে, 'ওমা মাছরাঙ্গাটা টপ্‌ করে কেমন মাছটাকে ধরলে দেখ। খোকাকে ও প্রকাশকে নিয়ে লক্ষ্মীর জীবনের দিনগুলি বড় উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল।

(৪)

ভাগলপুরে বাঙ্গালী টোলার ভিতরে একটী ঘোড়ার গাড়ী চলিতেছিল, "এই গাড়ীমান, গাড়ীরোক' একটী ইট চুণ খসা জীর্ণ বাড়ি; কঙ্কালের মত উগ্ররূপ গাড়ী হতে হ্যাটকোটধারী বাঙ্গালী সাহেব নাবিলেন। সামনেই বার বৎসরের একটী সুদর্শন বালক জিজ্ঞাসাকরিল"কোথা থেকে আসছেন"প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে"তোমার নাম কি খোকা" বল্‌তে; খোকা সম্বোধনে—কুঞ্চিতভ্রূ ছেলেটী বল্‌লে, 'শ্রীঅনিলকুমার গুপ্ত।' ওঃ—বলিয়া ভদ্রলোক অগ্রসর হতে এক খর্ব্বাকৃতি বিধবা বৃদ্ধা বাহিরে আসিয়া অপ্রসন্ন ভাবে বলিলেন "আপনি কোথা হতে আস্‌ছেন কি দরকারে?" বেলা তখন এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে. গ্রীষ্মের দুপুর আগতপ্রায় গলদঘর্ম্ম সাহেব পরিচ্ছদধারী বৃদ্ধার বিরক্তভাবে একটু দমে গিয়ে বললেন, "আজ্ঞে আমি অনিল গুপ্তের বিধবা ভগ্নীকে তাঁর প্রাপ্য প্রভিডেণ্ডফণ্ডের—" মুখের কথা কেড়ে মুহূর্ত্তেকে সে বিরক্তভাব অপসৃত করে বৃদ্ধা বল্লেন, "ও তা বলতে হয়, এই দুপুরে খাঁ খাঁ রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ঘেমে উঠলেন যে" এবং সেই ছেলেটীর প্রতি, "হ্যাঁরে অনিল কি আক্কেল বলদিকি? ভদ্রলোক এসেছে কোথায় বসাবি তা নয়।"—ঐ রকম দুটাই; হাড়ে নাড়ে জ্বল্‌ছি; এস বাপু ঘরে বস। সামনের ঘরে দুখানি চেয়ার ও টেবিল ভদ্রলোক এক খানিতে বস্‌লেন। "পাখা খানা কোথা" বলিয়া বৃদ্ধা ভিতরে গেলেন পর মুহূর্ত্তেই ফিরে পাখা হাতে চেয়ারে বসলেন। ভদ্রলোকটী তখন 'তাহলে একটা দরখাস্ত চাই অনিলের বোনের; মানে

আপনার—জিজ্ঞাসুভাবে বৃদ্ধার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন; বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ, নাৎনী—লক্ষ্মীর কথা বল্‌ছে তো আমার মেয়ের মেয়ে।" ভদ্রলোকটী তাঁর পকেট হতে একতাড়া কাগজ বার করে "তাঁকে ডেকে আনুন"—দিদি মা বল্লেন, "তুমি বুঝি ডেপুটী! প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের টাকার জিম্বা লাগাতে এসেছ; তা ও টাকা আমাকেই দাও কারণ আমিই ওর একমাত্র অভিভাবক। ছোটবেলা হতেই আমার কাছেই মানুষ; মামড়া মেয়ে। পাঁচ বছরের মেয়ে এনে বাপে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত। আমিই পনের বছরেরটী করে ডাগর মেয়েকে কতধার করে খরচ পত্র করে মেয়ে সৎপাত্রে দিলাম; বাপতো বিয়ের আগে সাক্ষীগোপাল এলেন! বিয়ে সুভালাভালি হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত হয়ে এই পথের কাঁটা"—অনিলকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে "টুকু সঙ্গে কাশীবাস করলাম; ওমা দু বৎসর কাট্‌তে না কাট্‌তেই পোড়া কপালী ফিরে এল, আবার বোঝার ওপর শাকের আঁটী; কোলে ছেলে, হাজারেহোক্ অত সুখ সইবে কেন বল? বলিয়া আত্মীয়তার দৃষ্টিতে ডেপুটীর দিকে ফিরলেন। কিন্তু ডেপুটীর কোন সাড়া না পেলেও নিজের মনেই বল্লেন, নইলে পাঁচ বছরে মাকে শেষ করে আমার ঘাড়ে চাপেন—বাপটা তো লক্ষ্মী ছাড়া"—বৃদ্ধা মৃতা কন্যার উদ্দেশ্যে চোখের জল মুছলেন। ডেপুটী বিশেষ সহানুভূতি না জানিয়েই বল্লেন, আজ্ঞে তাঁকে আমার সাম্‌নে এসে সই করতে হবে। এবং টাকাও তাঁরই হাতে দেব।" দিদিমা আহত হইয়া বল্লেন; হ্যাঁ বাছা, আমার আর তার টাকা নেওয়া একই কথা; কিন্তু ডেপুটী বাবু যখন বিশদরূপে আইন কানুনে দিদিমা দাদাবাবুর কোন বিশেষ স্থান নাই বুঝিয়ে দিল তখন কর্কশস্বরে দিদিমা ডাক্‌লেন লক্ষ্মীকে—"লক্ষ্মী এদিকে আয়।" লক্ষ্মী দোরের পাশে থান কাপড়ের আঁচলটুকু ও চাবির গুচ্ছের ঝন ঝন শব্দটুকু আগমন বার্ত্তা জানাল। ডেপুটী বাবু চোখ নীচু করলেন, যদিও ওপর ওয়ালা ডেপুটী সাহেব বিশেষ করে বিধবার চেহারা দেখে নিতে বলেছিলেন; যে পরে দরকার হলে সনাক্ত কর্‌তে হতে পারে, কিন্তু ভদ্রলোকের মেয়ের দুঃখের দিকে কি চাওয়া যায়? ঘরখানি নিস্তব্ধ, শুধু কাগজের ওপর কলমের আঁচড়ের খস্ খস্ শব্দ; হঠাৎ দিদিমার তীব্রস্বরে ডেপুটী চমকাইয়া উঠিল; কাগজের উপর নত হয়ে মেয়েটী মাথার কাপড় টেনে লিখছিল, হঠাৎ খোকা কোথা হতে সবার অলক্ষ্যে; হামা দিয়ে এসে; মায়ের পিঠ ধরে নাড়া দেওয়ায় হাতের লেখা কেঁপে গেছে। তাই দিদিমার তর্জ্জন—"রাক্ষস ছেলে, একেই যে শ্রীর লেখা; তার ওপর নাড়িয়ে দিল কি দুর্দ্দান্ত ছেলে, বাপের জন্মে এমনটী দেখিনি কো! বলে সশব্দে ছেলের পিঠে এক চড় বসিয়ে দিলেন। ছেলে কাঁদল, বাকি লেখাটুকু যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি শেষ করে মা ছেলেকে বুকে করে দাঁড়াতেই ডেপুটীর দৃষ্টি লক্ষ্মীর উপর পড়ল। মনোযোগের সঙ্গে দেখে সে হঠাৎ চমকে উঠ্‌ল।

তিনটাঙ্গা খাসমহল কাছারীতে সন্ধ্যা ও রাত্রির সমাবেশে সামনের পথটী ও স্বামীস্ত্রীর আঁচলের কাঁটা ছাড়াচ্ছে সেই স্মৃতিতে মন সচেতন হয়ে উঠল। তারপর সেই যুবক ও তরুণী চলে গেল; মেয়েটীর সেদিনের গমনভঙ্গী বিশেষ করে কচিমুখ বড় বড় চোখের সরল চাহনি এবং সর্ব্বাপেক্ষা নমনীয় ভাব ও লজ্জাবনত মুখখানির কথা সবই চলচ্চিত্রের মত চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঠিক সেই মেয়েটীই বটে। ডেপুটী বিস্ময় ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন শুধু চুলগুলি সুবিন্যস্ত নয়, রুক্ষ, বর্ণ ম্লান; চোখ দুটী সজল; এবং সুগোল হাত দুটী অলঙ্কার মুক্ত। থানকাপড়ে বিধবার শুভ্রশুচিতা ও মুখে কারুণ্য ও উদাস ভাব সব মিলিয়ে একটী তীব্র বেদনা ও পবিত্রতার ছাপ দিয়েছে। ঠিক বটে তার নাম ছিল প্রকাশ ঘোষ, এও তো লেখা কাগজে "তিনটাঙ্গার সব-অ্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জেন প্রকাশ ঘোষ। ডেপুটীর মনে প্রচণ্ডটা ধাক্কা লাগল। বেদনায় বুকের ভেতরটা কে যেন মুচড়ে দিল। এই অল্পবয়সের, তরুণী জীবনের সবে আরম্ভ দীর্ঘবন্ধুর পথে সে একা যাত্রী। তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া বৃদ্ধা ও অনিল হাঁ করে চেয়েছিল, প্রায় পনের মিনিট কাট্‌বার পরও সাড়া না পেয়ে দিদিমা বল্লেন, "তা কত

টাকা রেখে গেছে, কবে সেটা পাওয়া যাবে ?” বলিতেই চমক ভাঙ্গিয়া ডেপুটী লজ্জিত অপ্রস্তুত ভাবে বল্লে, ওঃ দেখুন আসল কথাই ভুল ; আপনার নাতনীকে আরেকবার কষ্ট করে এসে টাকা নিয়ে যেতে হবে। বৃদ্ধা লক্ষ্মীকে আবার হাঁক দিলেন। শান্ত ধীরপদে লক্ষ্মী এসে দোরের সামনে দাঁড়ালে লক্ষ্য করে ডেপুটী গলার স্বর সংযত করে বল্লেন, এই একহাজার পঁয়ত্রিশ টাকা তাঁর প্রাপ্য হয়েছিল বলে নোটও টাকা পকেট হতে বের করে উঠে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীর পায়ের কাছে রাখ্‌লেন। লক্ষ্মী টাকা উঠাইয়া দিদিমার হাতে দিল। ডেপুটী বাবু আর একবার লক্ষ্মীর গমনোদ্যত বিষাদ মূর্ত্তি দেখে চোখের জলকষ্টে সম্বরণ করলেন। এইটুকু বয়সে সর্ব্বত্যাগী ; জীবনের বাঁকীদিনগুলি কি করে কাটবে। মাত্র সামান্য সম্বল ও ঐ কোলের ছেলেটুকু ভরসা। এই বয়সেই সংহত, সংযত জীবন। সমাজের নিষ্ঠুর নিয়মের প্রতিবিতৃষ্ণায় মন তিক্ত হয়ে উঠল। সমাজের কঠিন দণ্ডে নিরীহ নিরপরাধী কত শত দণ্ডিতাদের যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে লক্ষ্মী প্রতীক্ স্বরূপ তার চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে ; লক্ষ্মীকে দেখে ডেপুটী তাঁর অন্তঃস্থলে উপলব্ধি করলেন। দিদিমা টাকা পেয়ে খুসী একগাল হেঁসে বল্লেন, ওরে অনিল এই এত রোদ্দুরে কত কষ্ট হয়েছে আসতে, একটু মিষ্টি দিয়ে জল দে ? ডেপুটী তখন অন্যমনস্ক ভাবে বসে ছিল। চোখ উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নাতজামাই কিসে মারা যান ? দিদিমা “কে প্রকাশ ? সে দুঃখের কথা আর বোলনা বাবা, তার সময় হয়েছিল, ভগবানের ডাক পড়ল নইলে রোগ তো একটা উপলক্ষ্য মাত্র ইত্যাদি যা বল্লেন তার সারাংশ উদ্ধার করতে ডেপুটীকে রীতিমত বেগপেতে হল। যাহোক বোঝা গেল টাইফয়েডই মৃত্যুর কারণ। লক্ষ্মীর বয়স সতের বৎসর একটী ছেলেও আছে ; এখন ইহাদের যে দিদিমার সামান্য আয়ের জমিদারী হতেই জীবন ভোর পুষিতে হবে তাহাও বার বার জানাতে ভুললেন না। এমন সময় মিষ্টি ও জল আস্‌ল, বৃদ্ধা “খাও বাবা” বলিতেই ডেপুটীর ধ্যান ভঙ্গ হল। “আজ্ঞে না” বলে স্বপ্নাবিষ্টের মত কাউকে কোনরূপ সম্ভাষণ না করেই গাড়ীতে উঠে বল্ল জোরসে হাঁকো। সামনের ঘড়ি ঘরে তখন ঢং করিয়া একটা বাজিল।

(৫)

ডেপুটীবাবু চলে যাওয়ার পর বৃদ্ধা বেলা যায় দেখে তাড়াতাড়ি ঘরের কাজ সারছিলেন। পাশের ঘরে লক্ষ্মী ছেলে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে গত দু বৎসরের স্মৃতির মালা নিয়ে যেন অতি আদরে গলায় পরেছিল। এখন একমাত্র আনন্দ তার সেই মধুর সঞ্চিত-স্মৃতি। ছোট্টবেলায় মাওড়ামেয়েকে “বাবা” দিদিমার জিম্মেয় রেখে অত্যন্ত সহজ পন্থা বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। তারপর হতে সে দিদিমার কঠিন শাসনেই মানুষ। জমিদারীর সামান্য আয় হতে দিদিমার ভাগীদার জোটাতে দিদিমা এই দুটী শিশুর ওপর বিশেষ খুসী ছিলেন না। লক্ষ্মী সাত বৎসর বয়স হতেই ঘরসংসারের কাজ করা ঘরঝাঁট হতে বাসনমাজা রান্না খাবার ও অবসর সময়ে দিদিমার পদসেবা দ্বারা অবিবাহিতাবস্থায় খুসী রাখিয়াছিল কিন্তু বিধবা হওয়ারূপ অন্যায় কার্য্য ঘটাতে তিনি লক্ষ্মীর উপর মর্ম্মান্তক চটে গিয়েছিলেন। শোকতাপ পাওয়াতে তাঁর স্বভাবও খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল। তাহার বাপের সন্ধান নিয়ে উদযোগী হয়ে প্রকাশের সঙ্গে বিয়ে দেন। লক্ষ্মীর জীবনে একটা বড় পরিবর্ত্তন আসল। সেই আনন্দহীন চিরাচরিত জীবন ধারার সঙ্গে এ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভগবান যেন তাকে পরবর্ত্তী জীবনের কষ্টটুকু দেবার আগে সুখের স্বাদ দিয়েছিলেন। জীবনে কোন দিনই সে এত স্নেহ ভালবাসা পায়নি। জগতে এত মধু তার জন্য লুকান ছিল একথা স্বপ্নেও ভাবেনি। দিদিমার কঠিন স্পর্শে তার মনও কঠিন হয়ে গিয়েছিল এবং প্রকাশের স্নেহ স্পর্শ না অনুভব করলে সে তার গত জীবনের দুঃখ কষ্টকে স্বাভাবিক ও সহজই ভাবতো। এবং

তার জন্যে তার মনে দুঃখানুভূতি আসতো না বা সে কাউকেই দায়ী করত না। অপরিচিত অনাত্মীয় সুখের স্পর্শ যতদিন না পেয়ে ছিল ততদিন সে বেশ সুখী ছিল। সামান্য একটা মেয়ের জন্য প্রকাশ কত স্বার্থত্যাগ করত; ভাল জিনিষ এনে দেওয়া খাওয়ার প্রতি লক্ষ্য, ছেলে কাঁদিলে ঘুমপাড়ান ইত্যাদি ভোরের পাখীর ডাকের সঙ্গে তার স্বামীর আদরের মিষ্ট ডাকটুকু 'লক্ষ্য!' এখনও যেন কাণে বাজে! সন্ধ্যায় রঙ্গিন কাপড় পরিতে মিনতিটুকু এবং বেড়াতে যাবার জন্যে অনুরোধ; রাতে খোঁপায় ফুলের মালা জড়িয়ে দেওয়া এরকম শত শত আদরের আবদারের চিন্তা তাকে আজ নাগপাশের মত বেড়ে ধরেছে। স্বামীর অফুরন্ত ভালবাসা পেয়ে সে নিজেকে ধন্য মনে করেছিল এবং গত চৌদ্দ বৎসরের সংসারের কাঠিন্য অভাব দিদিমার দৃঢ়তা কিছুও তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তারপর আসল আকস্মিক নিদারুণ দুর্দ্দিন; তার সুখের নীড় ভেঙ্গে গেল। যেন ভোরের আবেশময় স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল। নোয়া শাঁখা খোলা থান পরা ম্লান বেশ দেখে দিদিমার কান্না, "ওরে হতভাগী স্বামীকে খেয়ে আবার আমাকে জ্বালাতে এলি"—লক্ষ্মীর অনুভব শক্তি লোপ পেয়ে ছিল। সময় তাকে সান্ত্বনা দিতে পারেনি বটে সে নিজে কাজে ডুবে স্মৃতির বেদনা হতে উদ্ধার লাভের চেষ্টায় থাকত কারণ প্রকাশের স্মৃতি তাকে সময়ে অসময়ে পঙ্গু করে ফেলত এবং ভুল হলেই দিদিমার তাড়ণায় অস্থির বোধ করত। একমাত্র এই আশ্রয় বলে সে সবই নীরবে সহ্য করত। অতি অসহায় বোধ হলে খোকাকে বুকে জড়িয়ে একটু অন্যমনস্ক হ'ত। এই চিন্তার হাত এড়াতে লক্ষ্মী দিন রাত্রি নিজকে কাজে নিযুক্ত রাখত, এই উপায়ে সে স্মৃতির দংশন হতে রক্ষা পেয়ে ছিল। কিন্তু আজ বহুদিন পর দীর্ঘ ছয় মাসের পর তার সযত্নে ভোলা জীবনখানি নতুন আলোছায়ার সমাবেশে আরো সুন্দর আরো স্পষ্ট আরো রঙ্গিন হয়ে চোখের সামনে ভাসতে লাগল। টাকা পাওয়ার কাগজে সই করা ইত্যাদিতে এবং সেই খাসমহল কাছারীতে এই ভদ্রলোককে প্রকাশের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পথে দেখা, এই সব পুরাতন স্মৃতি তাকে নেশার মত পেয়ে বসেছিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা কখন যাচ্ছে সে স্মৃতির জাল বুনে চলেছে। স্বামীর সঙ্গে সম্পদে দেড় বৎসর তার একটা সুখ স্বপ্ন মাত্র যেমন নিবিড় আনন্দদায়ী তেমনি ক্ষণস্থায়ী, কয়টা মুহূর্ত্ত মাত্র—যেমন নিবিড় আনন্দদায়ী তেমনি ক্ষণস্থায়ী। কয়টা মুহূর্ত্ত মাত্র—সম্মুখে দীর্ঘ জীবন, পথ বন্ধুর আনন্দহীন চলার বিরাম নাই সঙ্গীহীন কাঠিন্য—শুধু অন্ধের আলো এই খোকা—.

*   *   *   *

"ওমা কি হবে? এখনও খেতে যাননি? তিনটে বেজে গেল যে; আমার এক ঘুম হয়ে গেল, চারটে বাজে অনিলের জলখাবার করবে কে?" লক্ষ্মী হঠাৎ যেন চমকাইয়া উঠিল। নিজেকে সম্বরণ করিয়া ধীরে বলিল, আজ আর খাবনা দিদিমা - দিদিমা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন "কেন আজ আবার অসুখ করেছে বুঝি জানিনা বাপু; এদিকে তো ভগবান শরীরটা খুব সুখের তৈরী করেছেন, তবে কপালখানা এমন দিলেন কেন?" বলিতে বলিতে পাশের বাড়ী প্রস্থান করিলেন কারণ ক্ষেমিদির বাড়ী একবার না হাজিরা দিলে তাঁর শরীর ভাল যেত না। লক্ষ্মীর অভ্যস্ত কাণদুটী শুনিয়া গেল মুখের নির্লিপ্ত ভাবের বিকৃতি ঘটিল না; অনিলের খাবার করতে উঠে পড়ল। শুধু একটি দীর্ঘনিশ্বাসের গভীরতায় ছোট ঘরখানিও ব্যথিত হয়ে উঠল। খোকা তখন ঘুমের ঘোরে হেঁসে উঠছিল।

বঙ্গসাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব

ব্যষ্টি সম্বন্ধে যে কথা সমষ্টি সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উভয়ের ভিতরে মূলগত কোন প্রভেদ নাই; একটী আর একটীর মহত্তর ও বৃহত্তর বিকাশ মাত্র। ব্যক্তিগত হিসাবে প্রত্যেক মানুষের ভিতরে যে পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই সমষ্টিগতভাবে সমাজের বা জাতির উপরে তাহারই প্রকাশ দেখা যায়। দুই ব্যক্তি পরস্পরের সংস্পর্শে আসিলে যেমন একে অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং প্রবলের শক্তিমানের আধিপত্যের চিহ্ন দুর্ব্বলের উপর সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, তেমনই দুই জাতি বা সভ্যতা পরস্পরের সম্মুখীন হইলে এক জাতির প্রভাব অন্যের উপর পড়িবেই ও সবল জাতি দুর্ব্বলের উপর জয়ের চিহ্ন অঙ্কিত করিবেই। দুর্ব্বল ও বিজিত জাতির উপর প্রবলের প্রভাব অনিবার্য্য। তাহার আহার, বিহার, ধর্ম্ম, সমাজ, আচার, ব্যবহারে শক্তিমান জাতির সভ্যতার সুস্পষ্ট ছাপ পড়ে।

সাহিত্যকেও আমরা এই শ্রেণীর বাহিরে ফেলিতে পারি না। প্রবলের সাহিত্যের বেগ আসিয়া দুর্ব্বলের সাহিত্যের ধারাও বদলাইয়া দিয়া যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গলার যে সাহিত্য সে সাহিত্য অতি ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত। তখনকার শিক্ষিত বাঙ্গালী আর সেই ধর্ম্ম মঙ্গলের গান, প্রাচীন বৈষ্ণবদিগের অন্ধ অনুকরণে রচিত পদাবলী ও ভারতচন্দ্রের কবিতায় তাহাদের মনের তৃষ্ণা মিটাইতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহারা স্বভাবতই ঘর হইতে বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইলেন; পাশ্চাত্য সাহিত্য তাঁহাদের মনের খোরাক জোগাইতে লাগিল। তাই সে যুগে হোমর, ভার্জ্জিল হইতে আরম্ভ করিয়া মিল্টন, বাইরণ, স্কট, টেনিসনের কবিত্বরসে বাঙালী মুগ্ধ ও উন্মত্ত। শুধু পাশ্চাত্য কবিত্বে নয় হর্বর্ট স্পেন্সর, বেন্থাম মিল ও কোঁত্তের আধিপত্যও বাঙ্গালী চিত্তের উপর কিছুমাত্র স্বল্প পরিমাণে ছিল না। ধর্ম্ম বিষয়েও বাইবেল গ্রন্থ, থিয়োডর পার্কার, নিউম্যান প্রভৃতির প্রভাব দেখা যায়। মেকলে ও বেকনের প্রবন্ধাবলী, কারলাইলের ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস ও টডের রাজস্থানের ইতিহাস ইত্যাদি তখনকার শিক্ষিত বাঙ্গালীর অতি আদরের সামগ্রী ছিল। সেকালের প্রতিভাশালী লেখক ও কবিগণ এই পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইঁহাদের পরবর্ত্তীকালের সাহিত্য, যে সাহিত্য ইহাদের হাতে গড়া তাহা যে পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বর্ত্তমান সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের আধিপত্য; ভাব, ভাষা, শব্দ, ছন্দ, রীতি, নীতি সকল বিষয়েই বঙ্গসাহিত্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও প্রবন্ধের উপর পাশ্চাত্য সাহিত্যের সুস্পষ্ট প্রভাব, তাঁহার আদর্শ পুরুষ কৃষ্ণ চরিত্রের বিশ্লেষণ কোঁত্তের আদর্শ মানুষের বিচার পদ্ধতির কথা স্মরণ

করাইয়া দেয়। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের প্রবর্ত্তন মিল্টনের ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের (Blank Verse) অনুকরণে; তাঁহার প্রচুর শব্দাবলী ইউরোপীয় শব্দের অনুকরণে রচিত। রবীন্দ্রনাথের ভাব, ভাষা ও চিন্তাধারার ভিতরে পাশ্চাত্য প্রভাব মিশিয়া গিয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপরে যে পাশ্চাত্যপ্রভাব পড়িয়াছে তাহা বাহির হইতে বোঝা যায় না বটে, কিন্তু এ যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি যে পাশ্চাত্য প্রভাব এড়াইয়াছেন তাহা অসম্ভব; পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব তাঁহার ভিতরেও ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। তাহার পর আজকাল যে বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ একদল অতি আধুনিক লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে পাশ্চাত্য উপন্যাসের (Continental Novels) ছায়া তাঁহাদের অনেক লেখার ভিতরেই দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষার নাটক, গীতি, কবিতা, প্রায় সকলই ইউরোপীয় আদর্শ হইতে নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। বাঙ্গলা উপন্যাস ইউরোপীয় আদর্শেই উদ্ভূত। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াই বাঙ্গালা গদ্যের এরূপ উন্নতি ও বিকাশ দেখা যায়। পূর্ব্বে যে সকল কাব্য ও গীতি কবিতা ছিল তাহার স্থলে নূতন নূতন কাব্য, কবিতা ও সঙ্গীত ইত্যাদি প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রকাশের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন নূতন ভঙ্গিমা ও ঢঙ্গে বাঙ্গালা ভাষা নবতর শোভা সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঙ্গালী কেবল পাশ্চাত্য কবিত্বরসে মজিয়া উঠে নাই, তাহাদের দর্শনে, বিজ্ঞানেও মুগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তাহাদের চিন্তাধারার প্রসারতা ও ভাবের বিভিন্নমুখী গতির স্রোত বহিল। ভারতীয় দর্শন ব্রহ্ম সত্য ও জগতকে মায়া বলিয়া জানিয়াছে, সুতরাং তাহার যে সব বাণী সকলই আধ্যাত্ম জগতকে ঘিরিয়া; তাহা মানুষকে পৃথিবীর আক্ষেপ ও বিক্ষেপ হইতে সরাইয়া লইয়া নিস্তরঙ্গ শান্ত সমুদ্রে ভাসাইতে চায়। ধর্ম্মই এ জাতির মূলে, তাই ধর্ম্মকে আবেষ্টন করিয়া ইহার যত স্তব যত সঙ্গীত, যত কাব্য। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতি বাস্তবমুখী; ধর্ম্ম ইহাদের যাহাই থাকুক ধূলিমলিন এই পৃথিবীকে ইহারা বড় প্রিয় জ্ঞান করে। ভোগের আকাঙ্ক্ষা, ঐশ্বর্য্যের লালসা, ইহাদের অত্যধিক; পৃথিবীতে আসিয়া সর্ব্বভোগস্পৃহাহীন নিরাসক্ত জীবন যাপন করা ইহাদের কাম্য নয়; জীবনকে সকল প্রকারে সুখের ও সম্পদের আগার করিয়া তোলাই ইহাদের উদ্দেশ্য। জাতির যে বাসনা, সাহিত্য তাহারই প্রকাশ; সুতরাং এত বড় ভোগাশক্ত জাতির প্রতিচ্ছবি যে সাহিত্য তাহারও ভিতরে ভোগের কথা, আকাঙ্খার কথা, পার্থিব সুখ ও লালসার বার্ত্তাই পাওয়া যাইবে। এই বিভিন্নমুখী সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া বঙ্গসাহিত্যের ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। যে সকল ভাব পূর্ব্বে ছিল না, তাহাই বঙ্গসাহিত্যে প্রবেশ করিল। জাতির চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের রূপ বদল হইতে আরম্ভ করিল। তাই ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের পরেই বাঙ্গালা সাহিত্য যে নূতন ধারায় বহিয়া চলিল সে স্রোতকে পাশ্চাত্য সাহিত্যেরই প্রভাব বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। পাশ্চাত্য সভ্যতা আসিয়া আমাদের চিন্তাধারায় যেন বিপ্লব বাধাইয়া তুলিল। পূর্ব্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়া বঙ্গসাহিত্য যেন বিশ্ব সাহিত্যে পরিণত হইল।

এ যুগ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যুগ ; সুতরাং সাহিত্যের ভিতরেও তাহার বিকাশের অভাব নাই। নারী ও শূদ্রের বেদপাঠের অধিকার নাই বলিয়া যে নিষেধ, সে নিষেধ উক্তির কোন অর্থ আর স্বীকৃত হয় না। উভয়েই জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে যেমন বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল, সাহিত্যেও সেইরূপ প্রবেশ করিল। ইহা পাশ্চাত্য সাহিত্যেরই প্রভাব। বর্ত্তমান কালের বঙ্গসাহিত্যে নারীর যে দান তাহা প্রতিভাশালী লেখকগণের সমকক্ষতা দাবী করিতে পারে না বটে, কিন্তু একেবারেই অবহেলার বস্তু নয় ; কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ইহাও পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সভ্যতার সংস্পর্শজাত। আজকাল স্বদেশকে আমরা পূজা করি ; স্বাধীনতা আন্দোলন বর্ত্তমান যুগের বিরাট সমস্যা ; সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরচ্চন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যরথীগণ যে সকল স্বদেশ অনুরাগমূলক সাহিত্য রচনা করিয়াছেন তাহা পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে উদ্ভূত। স্বদেশকে, স্বজাতিকে দেবতার মত ভক্তি ও পূজা করা বাঙ্গালী পূর্ব্বে আর কখনও করে নাই। বাল্মীকি একবার শ্রীরামচন্দ্রের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন ঃ—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" ;

কিন্তু তাহারও এত ব্যাপক ও গভীর অর্থ হয় নাই। কিন্তু এখন স্বদেশ ও স্বজাতি ইত্যাদি সাহিত্যের একাঙ্গীভূত। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সমস্ত প্রাণীর ভিতরে ব্রহ্মের স্বরূপ দর্শন করিবার ও আচণ্ডালে প্রেম বিলাইবার বাণী আমাদের সাহিত্যে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্মকে বাদ দিয়া মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখিয়া বিশ্বমানবতার যে সুর বঙ্গসাহিত্যেও দেখিতে পাই তাহা পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব। ফরাসীবিপ্লবের যে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার স্রোত ইউরোপীয় সাহিত্যে বহিয়া গিয়াছিল তাহার ধারা বাঙ্গালা সাহিত্যের উপরেও পড়িয়াছে। বিবেকানন্দের

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

ইত্যাদি পাশ্চাত্য বিশ্বমানবতা বা Humanityর সুর বহন করিয়া আনিয়াছে।

আর একটী নূতন বিষয় বঙ্গসাহিত্যে পাশ্চাত্যসাহিত্যের দান। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালী প্রকৃতিকে এমন করিয়া দেখে নাই, তাহাদের প্রকৃতি জড় পদার্থ, অচেতন। বিষয়বস্তুর অন্তরালে প্রকৃতির বর্ণনা পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে প্রকৃতির কোন স্বাধীনসত্তা ত নাই-ই, এমন কি বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থানও নাই। প্রকৃতি সেখানে আবছায়া কখনও ব্যক্তিবিশেষের রূপ ধারণ করিয়াছে, কখনও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধিত করিতেছে। কিন্তু রোমান্টিক যুগের ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) প্রমুখ কবিগণ প্রকৃতির নূতন রূপ দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা প্রকৃতিকে মানুষের মূর্ত্তি পরিগ্রহ না করাইয়াও তাহার রূপে মুগ্ধ হইলেন। তাঁহারা প্রকৃতির চির রহস্যময়ী ও মহিমাময়ী রূপ দেখিতে পাইয়া কবিতায় তাহারই স্তব গাহিতে লাগিলেন। রোমান্টিক যুগের এই সকল কবিদিগের প্রভাব রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ কবিদিগের উপর বেশী করিয়াই পড়িয়াছে। এমন কি ধর্ম্ম, যাহা বঙ্গসাহিত্যের

মূল প্রাণ তাহার উপরেও পাশ্চাত্য সাহিত্যের ছাপ লক্ষিত হয়। চিরাচরিত প্রচলিত ধর্ম্মনীতির উপর আর কেহ আস্থা স্থাপন করিতে অনিচ্ছুক, ধর্ম্মও বুদ্ধিবৃত্তির (reason) উপর স্থাপিত হইল। এই সকল শিক্ষা পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সভ্যতাজাত। সুতরাং যে জাতির চিন্তাধারা ও ধর্ম্মনীতির উপর পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার ছাপ পড়িয়াছে তাহার সাহিত্যেও যে তাহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহা আর বিচিত্র কি? সকলগুলি বিস্তৃত ও বিশদভাবে আলোচনা করা এখানে সম্ভবপর নয়, আমরা মোটামুটিভাবে দেখিতে পাইলাম যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাব, ভাষা, ছন্দ, রীতি, নীতি প্রকাশের বিচিত্রতর ভঙ্গিমা আমাদের সাহিত্যিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের চিন্তাধারাও নূতনতর ও বিভিন্নতর পথে অগ্রসর হইতেছে।

এখন প্রশ্ন এই যে এমনভাবে যে বঙ্গসাহিত্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে তাহার পরিণাম কি? বঙ্গসাহিত্যের যে চিরন্তন ধারা ছিল তাহার সহিত যে একটা বৈদেশিক ধারা আসিয়া মিশ্রিত হইল তাহা বঙ্গসাহিত্যকে শুভের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে না অশুভকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়াছে? পাশ্চাত্য সভ্যতা বহির্মুখী, ভোগলিপ্সু ও নিত্য নব নব গতির উত্তেজনায় ক্লান্ত, তাহাদের সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমাদের নিকট তাহারা সেই বাণীই বহন করিয়া আনিতেছে। পক্ষান্তরে আমাদের সভ্যতা অন্তর্ম্মুখী ও ত্যাগব্রতধারী; সুতরাং আমাদের সাহিত্যের যে শান্ত উদাস সুর তাহা বৈদেশিক সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। যে ইংরাজ কবি লিখিয়াছিলেন—

'East is east and west is west
And the twin shall never meet''

একদল প্রাচীন পন্থী তাঁহারই সহিত সুর মিলাইয়াছেন। ইহাদের মতে যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সভ্যতা কখনই মিলিতে পারে না, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সকল বিষয়েই উভয় জাতির প্রভেদ অত্যন্ত স্পষ্ট, সুতরাং সাহিত্যেও তাহা থাকা উচিত। ইহার গণ্ডী অতিক্রম করিলে অমঙ্গলের—ক্ষতির সম্ভাবনা। একথা সত্য বটে, এক দেশের সাহিত্যের উপর অন্য দেশের সাহিত্যের প্রভাব পড়ে এবং তাহাতে দুর্ব্বল সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হয় সন্দেহ নাই, ইংরাজী সাহিত্যের উপর ফরাসী ও জর্ম্মন সাহিত্যের প্রভাব পড়িয়া উন্নত হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজ সভ্যতা ও জর্ম্মন্ সভ্যতায় মূলগত কোন প্রভেদ নাই, উভয়ের সাহিত্যের ধারাও বিভিন্নমুখী নয়। যাঁহারা বলেন বৈদেশিক সাহিত্য অমঙ্গলজনক ও অকল্যাণকর তাহাদের মতে পাশ্চাত্য সাহিত্যে আদর্শের অভাব। প্রাচ্য সাহিত্যে আদর্শ চরিত্রের উদাহরণ প্রভূত। সেই সকল আদর্শ চরিত্র অঙ্কণ করিয়া রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ এখনও অক্ষয় অমর হইয়া আছে। প্রাচ্য সাহিত্যে আদর্শ পিতৃভক্ত রাম, ভ্রাতৃপরায়ণ লক্ষ্মণ, সীতার মত সতী, সত্যধর্ম্মী যুধিষ্ঠির ইত্যাদি আদর্শবানের চরিত্র অভাব নাই। মহাকবিগণ ইঁহাদের আদর্শচরিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। এ বিষয়ে কবি নবীন সেনের উক্তি স্মরণীয়।

"বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমবাবু অমর। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে অতি উচ্চ শিল্প ও শিক্ষা আছে, কিন্তু আদর্শ চরিত্র নাই.........বঙ্কিমবাবু এ সকল আদর্শ তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার আঘাতে বরং ভাঙ্গিয়াছেন গড়িতে পারেন নাই। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলি ইউরোপীয় উপন্যাস হিসাবে উৎকৃষ্ট উপন্যাস। ভারতীয় সাহিত্য হিসাবে উৎকৃষ্ট সাহিত্য নয়।" নবীনসেনের পূর্ব্বে রাজনারায়ণ বসুও এদিকে বাঙ্গালী জাতির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভূদেববাবুও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাহিত্যের বিরোধী—যদিও তাঁহার দৃষ্টি সমাজের দিকেই বেশী ছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বৈদেশিক সাহিত্য-বিরুদ্ধতা পাওয়া যায় চিত্তরঞ্জনের রচনায়। তিনি বলেন, "বঙ্গসাহিত্যের সূচনা হইতে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রচনা পর্য্যন্ত যে সুরের ধারা চলিয়া আসিতেছিল, বৈদেশিক সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া সেই সুরটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বীণার তার যে সুরে বাঁধা ছিল সেই তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের যে কৃত্রিমতা, যে বিলাসের আবেষ্টন তাহাতে বাঙ্গালার প্রাণসম্পদ নষ্ট হইয়া গেল।" চিত্তরঞ্জন তাঁহার "কাব্যের কথায়" এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "ইউরোপীয় সাহিত্যে মন ডুবাইয়া দিয়া আমরা কি শেষে বাঙ্গালা কবিতার যে প্রাণ তাহাই হারাইয়া ফেলিব?" তাই চিত্তরঞ্জনপ্রমুখ একদল মনীষী সমগ্র শক্তিকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া বাঙ্গলার প্রাণের প্রাণকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের মতে সাহিত্যে এই পাশ্চাত্য সংস্পর্শ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

আরও একটা কথা, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য ভেদের সৃষ্টি করিয়াছে। বস্তুতঃ বঙ্গসাহিত্যের যে ভাষা বর্ত্তমানযুগে প্রচলিত তাহা সর্ব্বসাধারণের জন্য নয়, জনসাধারণ তাহার ভিতরে প্রবেশ করিবার পথ পায় না। ভারতবর্ষের জনসাধারণের মানসিক গতি এইরূপ যে অতি গূঢ় আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্ব তাহাদের নিকট সহজ সরল। রামায়ণ ও মহাভারতে বা প্রাচীন নানাবিধ বাঙ্গালা গ্রন্থে অনেক বড় বড় সমাসবদ্ধ ও সংস্কৃতবহুল পদ পাওয়া যায়, কিন্তু অশিক্ষিত জনসাধারণ তাহাদের সহিত পরিচিত। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে নানা বিদেশী ভাষা ইত্যাদির সংমিশ্রণে যে ভাষার উদ্ভব হইয়াছে জনসাধারণের পক্ষে তাহার ভিতরে প্রবেশ করা সম্ভবপর নয়। তাহার পর ভাবের বিভিন্নতার দরুণ সর্ব্বসাধারণ বর্ত্তমান সাহিত্যের বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে, অন্তরে পৌঁছিতে পারে না। বৈষ্ণব কবিতার ভাব কিছুমাত্র সহজসাধ্য নয়, এবং ইহা আধ্যাত্মিকতার চরমসীমায় উঠিয়াছে। তবুও রাধিকার আত্মবিসর্জ্জী প্রেম ও চিত্তদীর্ণ ব্যাকুলতার সুর তাহাদের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের

"আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে,
আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।"

কবিতায় জনসাধারণের মনে কি তেমন করিয়া সাড়া দিবে? এ ভাষা এবং প্রকাশের ভঙ্গিমা জনসাধারণের জন্য নয়, ইহা ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে প্রবেশ

করিয়া ঝঙ্কার তুলিবে; কিন্তু জনসাধারণ এখানে নীরব। ভারতীয় দর্শন অতি দুরূহ তথ্যে পূর্ণ ও কঠিন গভীর ভাবের সমষ্টি; কিন্তু ভারতীয়গণের পক্ষে তাহাও সহজসাধ্য বৈদেশীকগণ যে গভীর ভাবের সমাধান করিতে পারে না, সে সকল দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব এ দেশের জনসাধারণের মুখে মুখে বিরাজিত। সুতরাং গভীর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতায় তাহারা অক্ষম নয়। কিন্তু বর্ত্তমান সাহিত্যের ভাষার যে ভঙ্গী, ভাবের যে গতি তাহাতে জনসাধারণ তেমন করিয়া সাড়া দিতে পারে না। সুতরাং যে জাতি বৈষ্ণব কবিতার আধ্যাত্মিকতা ও উপনিষদের দার্শনিকতায় পৌঁছিয়াছে তাহাদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাদি আলোচনা দুর্বোধ্য একমাত্র ভাষার প্রভেদে, প্রকাশের বিভিন্নতায়। সকলেই জানেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বর্ত্তমান সাহিত্য, প্রবন্ধ, আলোচনা ইত্যাদিতে ভারতীয় দর্শনের বাণী প্রচার করিতেছেন, বিদেশের শিক্ষা প্রচার করিতেছেন না, কিন্তু তাঁহার প্রকাশের ভঙ্গিমা এত বিচিত্রতর ও বিভিন্নতর যে আপামর সাধারণ বুঝিতে পারে না। ফলে দেশের ভিতর ভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। দুই রকম ভাষার উদ্ভাবনা—একটা শিক্ষিতের অপরটা অশিক্ষিতের। সুতরাং রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ সাহিত্যমহারথীগণ জনসাধারণের হৃদয় জয় করিতে পারেন নাই। ইহা এক প্রকারে দেশের তথা সমাজের পক্ষে ক্ষতি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমাজের বৃহৎ অংশটাকে বাদ দিয়া সেই মূঢ় মূক জনসমূহের মুখে ভাষা ফুটাইতে না পারিলে সাহিত্যের একদিকের অর্থ প্রায় ব্যর্থ হইয়া যায় না কি? জাতিতে জাতিতে মিলন সংঘটন করা, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ভিতরে একটা ঐক্য আনয়ন করা, ভাবের আদান প্রদান করা যেমন সাহিত্যের অঙ্গ তেমনই এক জাতির বিভিন্ন ছোট বড় অসংখ্য ভেদ গোষ্ঠির ভিতরে একটী ঐক্যের ধারা প্রবাহিত করাও সাহিত্যের অবশ্য করণীয় কার্য্য। যে মিলন সাহিত্যের দ্বারাই সম্ভবপর সে মিলন যদি সাহিত্যের দ্বারাই বিনষ্ট হয়, গণ্ডীদ্বারা যদি দেশের শিক্ষিত সমাজ আবদ্ধ হইয়া থাকে তবে ভেদ দূর করিবার আর উপায় নাই।

কিন্তু একদল উদারপন্থী আছেন—তাঁহারা পাশ্চাত্যসাহিত্যের নিকট বঙ্গভাষার যে ঋণ তাহাকে অত অমঙ্গলকারী ও অশুভ মনে করেন না। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথনাথ প্রভৃতি ব্যক্তি ইহাদের মধ্যে গণ্য। এ বিষয়ে স্বর্গীয় জগদিন্দ্রনাথের অভিভাষণ উল্লেখযোগ্য—"আমাদের মধ্যে অনেকে ভাবেন, যে, যাহা কিছু পুরাতন, যাহা কিছু সাবেক, তাহাই কেবল দেশের জিনিষ। কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ আমাদের দেশের পুরাতন পদার্থ। উত্তরকালে যাহা কিছু হইবে তাহা যদি কৃত্তিবাসী ও কবিকঙ্কণী ছন্দে না হয়, কিংবা তাহার মধ্যে যদি আমাদের আধুনিক শিক্ষার কোন প্রবর্ত্তন দেখা যায় তবে তাহা দেশের হইল না।" ইহার লেখা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে জগদিন্দ্রনাথ বিদেশী সাহিত্যকে শুধু সাদরে আহ্বান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সেই পুরাতন পথ অনুসরণ করিয়া চলিতে নিতান্ত নারাজ। নূতনত্বের উন্মাদনায় চঞ্চলতার আবেগে তিনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন ও তাঁহার মতানুসারে এই গতি বঙ্গসাহিত্যের জড়দেহে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে। "ইউরোপীয় সাহিত্যের সুললিত

ও প্রাণবন্ত ছন্দে আমাদের সাহিত্যও স্পন্দিত হইয়া উঠিবে"—রবীন্দ্রনাথও এই গতিবাদের পরম ভক্ত। তাঁহার "ফাল্গুনী" নামক নাটকের কোন এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন "কিছু করতে পারবো কি-না সে পরের কথা, কিন্তু ডাক শুনে যদি ভিতরে সাড়া না দেয়, প্রাণ যদি না জেগে উঠে, তবে অকর্ত্তব্য হ'ল বলে ভাবনা না, ভাবনা মরেছি বলে।" তাঁহার সাহিত্যসম্বন্ধে মতবাদে এই উপরোক্ত কথা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তিনি স্বয়ং সবুজপত্রে লিখিয়াছিলেন, "এক কথায় আমরা উন্নতিশীল হই আর অবনতিশীল হই, আমরা সকলেই—গতিশীল—কেউ স্থিতিশীল নই। —সুন্দরের আগমনে হীরা মালিনীর ভাঙ্গা মালঞ্চে যেমন ফুল ফুটেছিল, ইউরোপের আগমনে আমাদের দেশে তেমনই সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠেছে।" সুতরাং এক দিকে যেমন বৈদেশিক সাহিত্যের স্পর্শ মাত্রকেই পরিত্যাগ ও পরিহার করার বাণী শোনা গিয়াছে, অপর দিকে তেমনই আবাহনের বিজয়শঙ্খও বাজিয়াছে।

এখন ভারতীয় বৈশিষ্ট্য যাহারা বজায় রাখিতে চান, যাহারা একান্তভাবে পূর্ব ও পশ্চিমের ভিতর মিলন অসম্ভব বলিয়া মনে করেন ও পুরাতন ছাঁচে সাহিত্যকে রাখিতে চান এবং যাহারা বঙ্গসাহিত্যের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহাকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপস্থিত করিতে ইচ্ছুক ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে এক করিতে উৎসুক তাহাদের মধ্যে বিজয়লক্ষ্মী কাহাকে বরমাল্য অর্পণ করিবেন সে বিচার ভবিষ্যৎ কালের। কারণ যদিও পাশ্চাত্য জগৎ আজ ধনে, মানে, ঐশ্বর্য্যে, সম্পদে জগতের শীর্ষস্থানীয়, তবুও তাহার শেষ পরিণতি আজিও নিরূপিত হয় নাই। অপর পক্ষে ভারতবর্ষ এত দুর্দ্দশা দুরবস্থার মধ্যেও আপনার জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে। সুতরাং ভাবী কাল উপযুক্ত বিচারক। তবে একথা ঠিক, চির দিন যেমন সকল বিষয়েই ধর্ম্মে আবার রাজনীতিতে বিদেশীকে আপনার করিয়া নিয়াছে, সাহিত্যেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়াও বঙ্গ সাহিত্য আপনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া নূতনরূপে, নবভাবে শোভাবৃদ্ধি করিবে। অনুকরণ যখন আর অনুকরণ থাকে না, আপনার সৃষ্টি করিবার ক্ষমতায় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠে ও নানাভাবে, নানারূপে তাহার বিকাশ দেখা যায় তখন তাহাতে আর অগৌরব নাই। বর্ত্তমান বাঙ্গলার সাহিত্যের যে প্রগতি তাহাতে মনে হয় সেদিন, সে শুভ মুহূর্ত্ত অনতিদূরে।

"ভ্রমর"।

জাতীয় রাষ্ট্র গঠন

হোস্‌নে আরা বেগম

আধুনিক রাষ্ট্রনেতাগণ বহু অভিজ্ঞতার ফলে একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে একজাতীয় রাষ্ট্রই জগতে কার্য্যকরী রাষ্ট্র। যে দেশে বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান সে দেশে একজাতীয় (mono-national) রাষ্ট্র গঠন সম্ভবপর হয় না, কারণ রাষ্ট্রকে কার্য্যকরী করিয়া তোলার প্রবল আকাঙ্ক্ষা সে দেশবাসীর মনে সাড়া দেয় না। এবং সেই সাড়া-না-দেওয়ার কারণেই চির-নির্য্যাতিত ভারতে বারবার বিদেশীর পদার্পণ সম্ভবপর হইয়াছিল—গ্রীক, তাতার বা বৃটিশের পদানত হওয়ার দুর্ভাগ্য তাহাকে বরণ করিতে হইয়াছিল। ভারত যদি বিভিন্ন জাতির কেন্দ্রভূমি না হইত তাহা হইলে উহাদের জাতীয় ঘনিষ্টতার বন্ধন হয়ত বা এতটা শিথিল থাকিত না। আর ভারত বিভিন্ন জাতি অধ্যুষিত থাকা সত্বেও যদি তাহাদের মধ্যে জাতীয় ঘনিষ্টতার বন্ধন এতটা শিথিল না থাকিত, তাহা হইলে ভারতকে বৈদেশিকগণ পদানত করিয়া রাখিলেও এতকাল ধরিয়া নিশ্চয়ই তাহারা পরাধীনতার কলঙ্ক নীরবে মাথায় করিয়া বহন করিত না। স্বরাষ্ট্র গঠনের অত্যুগ্র কামনায় তাহারা বারবার শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে পরাঙ্মুখ হইত না।

আধুনিক যুগের শাসনতন্ত্রকে জন-গণের কল্যাণ-কার্য্যে নিয়োজিত করার জন্য একজাতীয় (mono-national) রাষ্ট্রই প্রকৃষ্টতম। একজাতীয় রাষ্ট্র যখন জন-গণের কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত হয় তখন আর তাহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দাবীর কোলাহল-কেন্দ্র থাকে না; তখন হয় তাহা সর্ব্বমানবের জীবন-বিকাশের সহায়ক, আর সাধারণ বিধি নিষেধ, আচার ব্যবহারের নিয়ামক ও প্রবর্ত্তক।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবাসী জাতীয়তা (nationalism) কাহাকে বলে বুঝিতে শিখিয়াছে। এবং এই নূতন জিনিষটির সন্ধান পাইয়াই তাহারা ভারতে জাতীয়তার ভিত্তির উপর স্বরাষ্ট্র-সৌধ গঠনের জন্য কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। ভারতকে বৈদেশিক-শাসন-মুক্ত করার চেষ্টা চরিত্রে চলিতেছে; কিন্তু মনে হয় যেন ইহার কোথায় একটা গলদ রহিয়া গিয়াছে। মনে হয় ভারতবাসী যেন অস্ত্র ফেলিয়াই যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রের আহ্বানে সাড়া দিতে ছুটিয়াছে। গলদটা এই যে, ভারতবর্ষকে ভারতবাসীর করার চেষ্টার মধ্যে ভারতবাসীকে একটা অখণ্ড জাতিতে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তার কথা এদেশের রাষ্ট্রবিদগণ হয়ত ভাল করিয়া ভাবিতেছেন না। সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও ধার্ম্মিকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হইতে মুক্ত করিয়া ভারতকে একজাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত করার দায়িত্ব কংগ্রেসের। কংগ্রেস ভারতকে জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু এই জাতীয়তার ভিত্তি কোন্ কোন্ উপাদানে গঠিত হইবে তাহার সন্ধানে রাষ্ট্রনেতাগণকে ব্যস্ত দেখা যায় কৈ? কেবল জাত-বৈশিষ্ট্য ও কালচার লইয়া বড়াই করার দিন বহু পূর্ব্বে ফুরাইয়া যাওয়া উচিত ছিল না কি?

ভারতের কণ্ঠে হয়ত পরাধীনতার শৃঙ্খল আর অধিক দিন ব্যথা দিতে পারিবে না, হয়ত সে রাষ্ট্র-পরতন্ত্রতা হইতে অল্পকালমধ্যেই মুক্তি লাভ করিবে। পরাধীনতার ব্যথা-বিষে জর্জ্জরিত ভারতীয় জনগনের দারুণ দুঃখবোধ হয়ত একদিন ভারতকে শৃঙ্খলমুক্ত করিবে। কিন্তু ভবিষ্যতে এই রাষ্ট্রকে দেশের জনসাধারণের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলার সহায়ক যে একজাতীয়ত্ববোধ তদ্ব্যতীরেকে ভারতের সত্যকার মুক্তি অনেকখানি পিছাইয়া থাকিবে না কি ?

একজাতীয়ত্ব বোধ দেশের মধ্যে না জাগিলেও কার্য্যকরী স্বরাষ্ট্রগঠন সম্ভবপর ইত্যাকার অভিমত যাঁরা প্রকাশ করেন, তাঁরা একটু মন স্থির করিয়া অতীতের ইতিহাসের দুই এক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া গেলে বুঝিতে পারিবেন তাঁহাদের অভিমত কতদূর ভ্রমাত্মক। অবশ্য একথা স্বীকার করিতে বাধা নাই যে, দৈবানুগ্রহে বা বহুকালের ঐকান্তিক সাধনায় সকলই সম্ভবপর। কিন্তু একথাও ভুলিলে চলিবে না যে অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশ ভাগ্যবান নয়। যে কারণে শত শত বৎসর ধরিয়া আর্য্য, মোগল, পাঠান, ইংরেজগণ একের পর একে এদেশকে পদানত করিয়া রাখিয়াছে, সেই কারণেই একজাতীয়তা বোধ ব্যতীরেকে ভারতে স্বরাষ্ট্রগঠন কার্য্যকরী হইবে না। মোগল সম্রাট আকবর ও মহারাষ্ট্র বীর শিবাজী হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার এ-যুগের কবি পর্য্যন্ত ভারতকে এক ধর্ম্মরাজ্যে পরিণত করার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের সে স্বপ্ন কতদূর সার্থক সফল হইয়া উঠিয়াছে ? ভারতের বিভিন্ন বর্ণের বিচিত্র সমাবেশই এই স্বপ্নের সার্থকতার বিরোধী নহে কি ? তুরস্ক, রুশিয়া, গ্রেট বৃটেন প্রভৃতি দেশে বহু জাতির একত্র বসবাস ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে একজাতীয়তা গঠনে কোন কিছুই বাধা হইয়া দাঁড়ায় নাই। কারণ ঐ সকল দেশের পারিপার্শ্বিকতাও দেশের জাতি গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। বহির্দেশ হইতে আগতের মনুষ্যত্ব-মণ্ডিত মুক্তবুদ্ধিকে উহারা উপেক্ষা করে নাই। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ একেত বহু সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণের ফলে জাতীয়তা গঠনের পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, তার উপর অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশে তেমন চিত্তশক্তি ও কর্ম্মশক্তির প্রত্যাশা কোনো দিনই নাই। এদেশের আবহাওয়ায় কূপমণ্ডুক মনোবৃত্তিই সৃষ্টি হয়। এদের চিত্তশক্তি একেবারে অথর্ব্ব। তাহা যদি না হইত তাহা হইলে এত দিনে ভারতে একটি বিরাট ভারতীয় মহাজাতি গড়িয়া উঠিত। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এদেশের অতীত ইতিহাস এরূপ কোনো প্রচেষ্টার সাক্ষ্য দেয় না। বিরাট একজাতীয়তা গঠন এক দিনের, এক বৎসরের, এমন কি এক যুগের সাধনায় সম্ভবপর নয়। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহার জন্য চাই যুগ যুগ ব্যাপি অক্লান্ত সাধনা। এই সাধনার ফলেই রুশিয়া, গ্রেটবৃটেন, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে এক একটি অখণ্ড জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। উহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে কত সহস্র মানুষের স্বার্থত্যাগ, কত শহীদের আত্মাহুতি ! আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে একজাতি গঠন প্রয়াসের সম্মুখে বিরাট প্রতিবন্ধকরূপে আসিয়া দাঁড়ায় এদেশের অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক বর্ণ-বৈষম্য। আবার সব চাইতে বড় বাধা হইয়া দাঁড়ায় ধর্ম্মবৈষম্য। যদি এমন কোন দিন আসে যে দিন ভারতীয় হিন্দু ও

ভারতীয় মুসলমান হিন্দুরাজ বা মুসলিমরাজ পরিকল্পনার মোহ ত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মকে ব্যক্তিগত (private) জিনিষ মনে করিয়া—ধর্ম্মকে বাদ দেওয়া তাদের ধাতে সহ্য হইবে না—জন-গনের কল্যাণ কামনায় রাষ্ট্ররূপ নির্দ্ধারণ করিবেন, সেই দিন হয়ত ভারতীয় মহাজাতি গঠন সহজ সাধ্য হইবে। কিন্তু এই ধর্ম্ম সর্ব্বস্ব জাতি সাধারণের মঙ্গলেচ্ছায় ধর্ম্মকে এতটুকু খাটো দেখিবার মত উদারতা দেখাইতে পারিবে কি ? বোধ হয় কোন দিনই পারিবে না।

বাংলার গীতি কবিতা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র

আধুনিক বাংলা কাব্যে যে একটা উদ্ধত সৌন্দর্য আমাদের রসবোধকে সজাগ ও সহিষ্ণু করিয়া রাখিয়াছে দুই শতাব্দী আগেকার কাব্য-সাহিত্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় নাই। কাল রচনা করিতেছেন কাব্য, সুতরাং গোঁজলা গুঁই এর মত কবিওয়ালার গান,

'আমি দেহ প্রাণ তুমিলো ছায়া
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া'

শুনিয়া অবাক না হওয়াই উচিত। আমাদের জীবন-ছন্দ এক লোক হইতে অন্য লোকে নীত হইয়াছে, এক সুর অন্য সুরকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। এবং একের সমৃদ্ধি অন্যের নিকট নিষ্প্রভ বলিয়া মনে হইতেছে। আধুনিক জীবন মায়া নয়, Problem নয়, ইহা হীরা, মাণিক, লোহার মত যাহাকে পরিপূর্ণভাবে আমরা আমাদের হাতের মুঠার মধ্যে পাইয়াছি, অথবা একটি অসংবদ্ধ গল্পের মত যাহার সুরু ও শেষ এই জীবনেই। এ যুগের কাব্যলোকের দ্বারে হরুঠাকুর, ভবানী বেনের ভীড় করিয়া দাঁড়াইবার অধিকার নাই। সেদিনের দেবী যজ্ঞেশ্বরী, দেবী অপরাজিতার পাশে বসিবার অধিকার পাইবেন না, সে আমি জানি।

আমাদের অন্তরলোকে জীবনদেবতার আসন প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছি, তাই তাঁহার পূজার আয়োজনে রহস্য নাই, স্তব্ধতাও নাই কিন্তু বাংলার আদিম কাব্যযুগে তাঁহারই সন্ধানে কবির চোখের ঘুম গিয়াছে, এবং অশ্রু দিয়া কাব্য সাগর সৃষ্টি হইয়াছে। এই পাওয়া ও না-পাওয়ার দ্বন্দ্বে জন্মলাভ করিয়াছে বলিয়া মিলন বিরহের বেদনা-বোধ বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রাণ; উহাকে আমরা উপেক্ষা না করি। সেদিন মেঘ ডাক দিয়াছে কবিকে, মিথিলার প্রাসাদ-গবাক্ষে দাঁড়াইয়া আমাদের বিদ্যাপতি

'হাম ধনী তাপিনী মন্দিরে একাকিনী
দোসর জন নাহি সঙ্গ'

বলিয়া যে গান রচনা করিয়াছিলেন, চারিশত বৎসর পরে এমনি এক মেঘ মেদুর সন্ধ্যায় নবকৃষ্ণের রাজ সভায় বসিয়া এক কবি সেই অশ্রুরই অর্ঘ্য রচনা করিয়াছেন।

হায়! যদবধি হরি, গ্যাছে মধুপুরী
অনাথিনী করি গোপীগণে।
সেই হোতে হায়, আছি মৃত প্রায়
পরাণ গিয়াছে তাহারি সনে॥

ইঁহাকে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, সে যুগে ইঁহাকে হরুঠাকুর বলিয়া রসিক জনে চিনিত, আসল নাম হরে কৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী!

হরু ঠাকুর কোথায় কোন সালে কাহার গর্ভে জন্ম লইলেন সে খবর ঐতিহাসিক জানেন, কিন্তু আমরা জানি আজ হইতে সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপের পথে পথে যে পাগল প্রেমের বন্যায় বঙ্গভূমি ভাসাইয়া দিয়াছিল, তাহারই একটু ক্ষীণ অনুভূতির স্পর্শ পাইয়া বহুযুগ পরে চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির অনুসরণে এক শতাব্দী ধরিয়া যে কবিকুল ব্যথা ও বিরহের অশ্রুসজল সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন হরুঠাকুর তাঁহাদেরই এক জন। কাব্যে প্রেমকে প্রাণবস্তু বলিয়া অলঙ্কৃত করা হয়। তাই ইহাকে আমাদের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে বাধে! এ যুগে যে প্রেম অপরিমেয় ও অপ্রকাশ্য বলিয়া মনে হয় তাহাকে হরুঠাকুর এমন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যেন তিনি উহার সবখানি জানিয়া লইয়াছেন, উহার অন্তরলোকের কোন কিছু তাঁহার চোখে গোপন নাই। তাঁহার রচিত,

পিরীতি নাহি গোপন থাকে
শুনলো সজনি বলি তোমাকে
শুনেছ কখনো, জ্বলন্ত আগুনো,
বসনে বন্ধনো রাখে।
প্রতিপদের চাঁদ হরিষ বিষাদ,
নয়নে না দেখে উদয় লেখে।
দ্বিতীয়ের চাঁদ কিঞ্চিৎ প্রকাশ।
তৃতীয়ের চাঁদ, জগতে দেখে॥

গানে হয়ত একটু ভার, একটু উগ্রতা আমাদের মনকে আঘাত দেয়, কিন্তু প্রেম বস্তুকে উপলক্ষ্য করিয়া যে একখানি ছল ছল অবনত চোখের কাহিনী, এবং একখানি চঞ্চল হৃদয়ের স্পন্দন আমাদের অন্তর স্পর্শ করে সেই পরম অনুভূতি আমরা এই রচনার মধ্যে হারাইয়া ফেলি নাই। বৈষ্ণব কবির প্রেম, সে শুধু তাঁহাদের প্রাণ নহে, তাঁহাদের আশ্রয়, সুতরাং তাঁহাদের প্রেমের বর্ণনা ছিন্ন ফুল ও শুষ্ক পত্রের বর্ণনা নয়, হয়ত তাহাতে যথেষ্ট মাধুর্য্যের অভাব ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহা অপরূপ প্রাণ-শিখায় প্রদীপ্ত এবং পরিমিত।

চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতিকে বাদ দিয়া ভক্ত রামপ্রসাদ যে যুগে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসীন ছিলেন, সেই যুগ হইতে বাংলার আদি কাব্য আপনার যাত্রারম্ভ করিয়াছে। আমাদের হরে কৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী যে দিন 'বঁড়শী গিলেছে যেন চাঁদে,' সমস্যার সমাধান করিয়া নবীন কবিপ্রতিভার পরিচয় দিলেন সেইদিন হইতে বাংলার কবির গানের আসর পড়িল। যে আসর এখনও হয়ত বাংলার শ্যামল অঙ্গন হইতে অপসারিত হয় নাই, কিন্তু যাহার ক্ষীণ দীপ্তি যাই যাই করিয়াও আজও গত হয় নাই, তাহাই যে এককালে রামবসু ও পরবর্ত্তী অন্ততঃ সপ্তদশ কবির তীক্ষ্ণকাব্য প্রতিভায় উজ্জ্বল ছিল তাহা প্রকাশ থাকা ভাল।

নবকৃষ্ণের রাজসভায় পরাজিত রামবসুকে আমরা প্রথম চিনিলাম,

'ঠাকুর, বাঁচবে না আর বিস্তর দিন।

তোমার চক্ষে ধরেছে পোকা, স্বর্ণ-রেখা অতিক্ষীণ'

এই কবিতার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষ হরুঠাকুরের প্রতি ক্রুদ্ধ কটাক্ষ এবং একখানি সুগম্ভীর মুখ যেন আমাদের সুপরিচিত। রামবসুর অভিমানিনী স্ফুরিতাধরা রাধা যখন গাহিয়াছেন,

শ্যাম যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি
থাক হরি, যথা সুখ পাও।
একবার সহাস্য বদনে, বঙ্কিম নয়নে
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও।
জনমের মত শ্রীচরণ দুটী, হেরিহে নয়নে শ্রীহরি
আর হেরিব আশা না করি।
হৃদয়ের ধন তুমি গোপীকার
হৃদে বজ্র হানি কোথা চলি যাও!

তখন মনে পড়ে মিলন ও মানের শেষ করিয়া একদিন শ্রীহরি গোকুল ছাড়িয়া চলিয়াছেন, কিশোরী রাধার ক্রন্দনের আর অবসান নাই, আপনাকে নিরন্তর ধিক্কার দিতেছেন হায়, ইহারই জন্য কেন গুরুগঞ্জনা উপেক্ষা করিলাম, তখন সহসা কুঞ্জদ্বারে কাহার চরণ-নূপুর বাজিয়া উঠিয়াছে, কাহার একটু ক্ষীণ অস্পষ্ট মধুর আহ্বান কানে আসিয়া বাজিতেছে, সেই পরিপূর্ণ মুহূর্ত্তে শ্রীরাধার সকল ক্রোধ গেল, সকল ধিক্কার লজ্জা পাইল। শুধু রহিল একটু বিচ্ছেদ-বেদনা, একটু ভয়, একটু অভিমান, বিশাল নয়নপ্রান্তে দুই ফোঁটা পরিপুষ্ট অশ্রু। এইখানে বিদ্যাপতির বিরহিনী রাধার ছায়া রামবসুর রাধাকে রূপান্বিত করিয়াছে। ব্যথা আছে, বিরহও আছে, কিন্তু নিন্দা চলিয়াছে আপনার অদৃষ্টকে। 'সে সুখ সায়র দৈবে শুকায়ল, তিয়াসে পরাণ যায়'। রামবসুর রাধা বলিতেছেন—

'আমার কপালে নাই সুখ,
বিধাতা হলো বিমুখ,
আমি সাগর ছেঁচেও মাণিক পেলেম না।'

রামবসুর বিরহকবিতায় যে পরিপূর্ণ কাব্যসৌরভ আমরা উপভোগ করি, বিরহান্তরাল হইতে যেদিন তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী বাহির হইয়া আসিলেন সেদিন তাঁহার সুরে একটা অখণ্ড মিলনানন্দ ধরা পড়িল না, শ্রীরাধার জীবনপ্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়া সহসা তাঁহার মৃত্যু ঘটিল।

বলিয়াছি, বৈষ্ণব সাহিত্য জীবনদেবতার পূজার অশ্রুর অর্ঘ্য রচনা করিয়াছে। যুগ যুগের বিরহী হিয়া সংসারে যে বিষ ও মধু সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে শ্রীরাধার বিরহ উপলক্ষ্য করিয়া তাহাই আজ বৈষ্ণব সাহিত্যে অমর আসন পাইয়াছে। তাই মিলনাঙ্গনে আসিয়া তাঁহাদের বাঁশী ঠিক মত বাজে না, সুর ছিঁড়িয়া যায়, এবং ছন্দবন্ধন অসম হইয়া উঠে। নিত্যানন্দ বৈরাগীর মত কবিওয়ালা, যাঁহার ভাষা ও ছন্দ বাংলায় নব সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিল, যিনি সখীসংবাদে গাহিয়াছেন

'কি হেতু এমন ভাব নিরখি তোমায় রে,
বহিতেছে দুনয়নে শোক নীর ধার রে।
বল তব ধরি করে, প্রাণ যে কেমন করে,
ভাল ত আছেন প্রাণে প্রাণেশ আমার রে ॥'

তিনি শ্রীহরি গোকুলে ফিরিয়া আসিয়াছেন এইটুকু সংবাদ দিয়া সহসা স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

'যাহার লাগিয়ে জাগিয়ে যামিনী
রয়েছ বসিয়ে শ্যাম সোহাগিনী ;
যাহার লাগিয়ে, সুরাগে রাগিয়ে,
(ওগো) সুধামুখী রাই, সোহাগে গলিয়ে,
ত্যজিয়া ভবন, সাজায়েছ আজ নিকুঞ্জ কানন,—

সেই তোমার মনের প্রেমিক আসিয়াছেন, ওগো রাই সাজ সজ্জা কর, কোথায় তোমার নয়নের অঞ্জন, কোথায় তোমার বক্ষের কাঁচলি! ওগো রাই তিনি আসিয়াছেন। নিত্যানন্দ বৈরাগী এইখানে আসিয়া থামিয়াছেন। কবি ভোলা ময়রা এইপথে আর একটু অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু সে লৌকিক মিলনের বর্ণনায় নয়। তিনি বিরহিণী রাধাকে প্রবোধ দিতে গিয়া যে দার্শনিক আবহাওয়ার আশ্রয় নিয়াছেন তাহাতে আমরা আনন্দ না পাইলেও কাব্যরস পাই।

'হেরে অন্তরে কালাচাঁদ, অন্তরের পুরাও সাধ
অন্তর করোনা আর নীলকমল।'

বলিতেছেন ওগো, বিরহ কাতর রাধা, তোমার মঙ্গল মুহূর্ত্ত আসিয়াছে, তোমার বিরহতাপ জুড়াক, তোমার হৃদয় শীতল হোক্, রাধানাথ তোমার অন্তরে চিরজাগ্রত হইয়া থাকুন। তোমার মিলন সুসম্পূর্ণ হোক। এই দিকে ভোলা ময়রা কবির গানে এক বিশিষ্ট পথ দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

ভাবের গভীরতা ও ভাষার কারুকার্য্যের জন্য রামবসু ও নিত্যানন্দ বৈরাগীর জীবনকালে কবির গানে বাংলার রসিক সমাজে পরম সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরে গদাধর মুখোপাধ্যায় ও নীলমণি পাটনীর নাম না করিলেও হয়ত চলিত। পদকর্ত্তা বলিয়া তাঁহারা প্রসিদ্ধ

হন নাই, তাঁহাদের গানে কবিপ্রতিভাও স্বল্প প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু বৈষ্ণবের পরম বিত্ত শ্যামচরণাচঙ্গ উপেক্ষা করিয়া এক নূতন পথে তাঁহারা কবিওয়ালাদের লইয়া চলিয়াছেন। মনে হয় বাংলায় বৈষ্ণব প্রভাব তখন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। তাই গদাধর মুখোপাধ্যায় যদিওবা,

কালি স্বপনে মাধব আমার কুঞ্জে এসেছিল।
রজনীতে, ছিলাম শ্যাম সহিতে, ললিতে গো!

বলিয়া শ্রীরাধার বিরহলালা কীর্ত্তন করিয়াছেন, নীলমণি পাটনী

তারা গো, আজ তারা ধরা ফাঁদ পেতেছি মা,
হৃদয় কাননে॥

বলিয়া পরম ভক্তির পূজা দিয়াছেন। এই পূজার অশ্রু নাই, ব্যথা নাই, বিরহ নাই, শুধু একখানি পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গের সুর ইহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

সেই দিন হইতে কবির দল নব নব পথে কাব্য লক্ষ্মীর সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। রঘুনাথ দাস হইতে দাশরথী রায় পর্য্যন্ত যে একটা ভাবগত সংযোগ আমরা আশা করিয়াছিলাম, তাহা রহিল না। রাম বসুর বিচ্ছেদ ব্যাকুল রাধার সেই চিত্রখানি অন্য কবির কাব্যে ঠিক মত আর ফুটিয়া উঠিল না। বাংলার কবি-মন যেন ধর্ম্ম প্রবণতায় তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সকল যুগে একখানে আসিয়া কাব্যের মৃত্যু ঘটে। কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্যের সখীসংবাদ

'হাদে হে চিকণকালা
রাই দিলে চিকণ মালা'

পর্য্যন্ত নিম্নগ্রামে নামিয়া আসিয়াছে। বাংলার আদি কাব্যকার বিরহের যে বিচিত্র বার্ত্তা বিশ্বভুবনে বিস্তৃত করিবার একান্ত কামনায় ছন্দের পর ছন্দ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা এ যুগের বৈষ্ণব কবি স্মরণ রাখেন নাই তাই বৎসরের পর বৎসর কাহারো ঝঙ্কারহীন ছন্দ, কাহারো সুরহীন সঙ্গীত অথবা সখীসংবাদের ক্ষীণ আবৃত্তি বাঙ্গালার রসবোধকে নিরন্তর ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। কিন্তু রাসু নৃসিংহের সমসাময়িক লালু নন্দলালকে আমরা এই অপরাধে অনুযোগ করিব না, তাহার বাণী যখন শ্যামপ্রেমে পাগল হইয়া বলিতেছেন,

হয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার,
গিয়েছে না যাবে কুল।
ডুবেছি না ডুব দিয়ে
দেখি পাতাল কতদূর।

তখন বিদ্যাপতির অভিসার পর্ব্বের সেই শ্লোকটি বার বার মনে পড়ে।

নব অনুরাগিণী রাধা।
কিছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি করল পয়ান।
পন্থ বিপথ নাহি মান॥

লালু নন্দলালের রচনা আমরা বেশী পাই না, কিন্তু মনে হয় যেদিন বাঙ্গালী কবি, কাব্যলোক হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত হইলেন সেইদিন এই নন্দলালই কাব্য-লক্ষ্মীর দেউল, সঙ্গীত সমারোহে মুখরিত করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা ঘটে নাই, কবির গানের ক্ষীণ সুরটুকুকে বাঁচাইয়া রাখিতে নন্দলাল পারিলেন না, সত্যরায় পারিলেন না, ভবানী বেনেও পারিলেন না। বাংলার এক যুগের কাব্য-প্রতিভা দিনে দিনে নিমীল হইয়া গেল। কিন্তু ইহারই মধ্যে পর্ত্তুগীজ আন্টুণী সাহেব কবি গোরক্ষনাথকে সরাইয়া নিজেই বাংলা গান বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছেন। লালু ঠাকুর 'ব্রহ্মরূপিণী, ব্রহ্মার জননী, ব্রহ্মরন্ধ্রবাসিনী' গান রচনা করিয়া সেকালের বাংলা গানে যে নব ভাবের উদ্দেশ দিয়াছেন, আন্টুনী সাহেব সেই ভাবে সেই সুর সংযোগ করিয়াছেন।

'ওগো শ্যামা সর্ব্বনাশী,
শিবকে করে শ্মশানবাসী,
সন্ন্যাসী তায় সাজিয়েছ'

কিন্তু এই ব্যর্থ সাধনাও আনটুনী সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইয়া গেল।

এইখানে আসিয়া আমরা ডাক দিতেছি ইতিহাসবিদকে। আসুন তিনি। ভোলা ময়রার সমসাময়িক দেবী যজ্ঞেশ্বরী কবির দল করিয়া কি কাব্য রচনা করিলেন তার সন্ধান দিন আমাদের। দাশরথি রায়ের দলকর্ত্রী কবি অক্ষয়া পাটনী বাংলার কোন আসরে কোন গান গাহিয়া অমর হইয়া রহিলেন তাহার ইঙ্গিত দিন। একদিন বৃন্দাবনে যমুনার তীরে যে সুরপ্রবাহ ব্রজাঙ্গনার অন্তরে বিপুল পুলকের সঞ্চার করিয়াছিল, যাহার স্পর্শ আজও আমরা হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেছি, যজ্ঞেশ্বরী দেবী তাহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া একটু অভিমানের ছায়ায় আপনার গানকে জীবন দিয়াছেন।

আমায় বন্দী করে প্রেমে,
এখন ক্ষান্ত হলে ক্রমে ক্রমে
দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে

কিন্তু অক্ষয়া পাটনী আমাদের জানার অন্তরালে অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। তিনি দাশরথী রায়কে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিভা সেদিন অনেক কবির কাব্যে প্রাণ দিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে আর আমরা বাংলার কবির দলে খুঁজিয়া পাইলাম না। ঐতিহাসিক তাঁহার সন্ধান দিন, আধুনিক মহিলা কবিদের তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিনী কবিকে জানিবার সুযোগ দেওয়া হোক্।

যুগ যুগ করিয়া শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজও যখন আকাশে মেঘের সমারোহ হয়, আজিকার সুর-স্বর্গে যখন আমাদের ক্ষুধিত অন্তর সান্ত্বনা খুঁজিয়া ফিরে, তখন হরু ঠাকুরকে মনে পড়ে, যজ্ঞেশ্বরী দেবীকে মনে পড়ে। বর্ত্তমান কাব্যে তাঁহাদের অবদান না ভুলি।

মহিলা-ব্যায়াম-মন্দির

প্রয়াগ মহিলা বিদ্যাপীঠের কর্তাদিগের সঙ্কলিত মেয়েদের ব্যায়াম চর্চার জন্য মহিলা ব্যায়াম মন্দির নামক প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে। এখানে মহিলাগণ এবং অল্প বয়স্কা মেয়েরা ব্যায়াম চর্চা করিতে পারিবে। এই প্রকার প্রতিষ্ঠান দেশের সর্ব্বত্রই অতি আবশ্যক—বিশেষভাবে বাংলা দেশে।

বাংলার শিল্পক্ষেত্রে বাঙ্গালীর পরাজয়

সম্প্রতি বাংলাদেশে মাথাগুন্তি যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায়, বাংলার শিল্পোপজীবীর সংখ্যা কিরূপ কমিয়া গিয়াছে। নিম্নে রিপোর্টে প্রকাশিত ১৯২১ ও ১৯৩১ সালের তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল।

	১৯২১	১৯৩১
কয়লা শিল্প—	৬৭৩১১	৪২১৯৬
বস্ত্র শিল্প—	২২২৩৭৭	১৯২৫৮৯
রেশম শিল্প—	৪৮৭৮৩	৫৬৪২
সূতার মিস্ত্রী—	৪০১৬০৪	১৬১৫৬১
ধাতু শিল্প—	১৯৭৫৯৯	৫২১৭৭
জল যান—	১০৯২২৬	৮২৬৭৪
স্থল যান—	৩২৯০৮৭৭	২৫০৬১৪৯

এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য আজ সমগ্র জাতিকে উদ্যোগী হইতে হইবে।

আইন পরীক্ষায় রাজবন্দীদিগের সাফল্য—

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, বিভিন্ন বন্দীনিবাসের রাজবন্দীদের মধ্যে চার জন ফাইনাল পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন; ৩ জন ইন্টার মিডিয়েট ও ১৭ জন প্রিলিমিনারী পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই হতভাগ্য যুবকগণকে বিভিন্ন পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রদান করিয়া তাঁহাদের উচ্চ শিক্ষালাভের যে সুযোগ দিয়াছেন তজ্জন্য ধন্যবাদার্হ।

মহিলাদের বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব

এ বৎসর ভিয়েনার রেডিয়াম রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটে ডাক্তার বার্তাকারলিন ও এলিজাবেথ রোনা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে (physics) 'হাটিনজার-প্রি' পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহিলাদের মধ্যে ইহারাই সর্ব্বপ্রথম এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

মহিলা অধ্যাপক

ডাক্তার লুসাবিভা মানসেভেরিনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে লেবার লেজিসলেশনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

মহিলা পুরপতি

কাউন্সিলার লেডিবোনী আগামী নবেম্বর হইতে উইমব্লেডনের মেয়রপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং কাউন্সিলার মিসেস্ ক্রেসওয়েলও ওয়ালসলের মেয়র মনোনীত হইবেন।

মহিলা বৈমানিক

দুই জন মহিলা বৈমানিক বিমান-প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। লেডি বেইলি প্রথমবার বিমান যোগে ঘণ্টায় ১২৯.৫ মাইল বেগে পরিভ্রমন করেন। যদিও দ্বিতীয়বার সেইরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। মিসেস্ বাটলার ১৯৩০ সালে বিমান প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এবার তিনি ঘণ্টায় ১৩৬ মাইল পরিভ্রমণ করিয়া ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

ডাক্তার মুথুলক্ষ্মী রেড্ডির আমেরিকা ভ্রমণ

ডাক্তার মুথুলক্ষ্মী জানাইয়াছেন যে, আমেরিকায় তাঁহার বিপুল সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল এবং আমেরিকার নারী-সমাজ ভারত ও ভারতনারীর সকল আন্দোলনে পূর্ণ সহানুভূতি এবং আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহারা মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ এবং সরোজিনী নাইডু' ন্যায় ভারতের মহৎব্যক্তি ও মহিলাদিগকে শ্রদ্ধা করেন।

ডাঃ রেড্ডি লিখিয়াছেন যে, তাহারা তাঁহাকে এরূপ সাদরে গ্রহণ করেন যে, অনেকের সহিত করমর্দ্দনে তাঁহার হাতে ব্যথা হইয়াছিল। আমেরিকা পরাধীন ভারতের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন এবং ভারতের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের প্রতি মানবোচিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

পৃথিবীর বৃহত্তম পুস্তকালয়

ওয়াশিংটনে 'লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস' নামক পুস্তকালয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম পুস্তকালয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ ম্যাপ পাণ্ডুলিপি ব্যতীত পুস্তকালয়ের বাঁধান পুস্তকের মোট সংখ্যা ৫,৪৭ ০৭,৪৩১। এই পুস্তক সাজাইয়া রাখিতে ৮৪ মাইল ব্যাপী তাকের প্রয়োজন। প্রতি বৎসর এই পুস্তকালয়ে ৫০৫ খানি পুস্তক ক্রয় করা হয়।

৮৬৮ বাড়ী বাজেয়াপ্ত

কাউন্সেল অব ষ্টেটে মাননীয় শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ব্যানার্জ্জির প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষের বিবৃতি এইরূপ :—

১৯৩০ সালের ৯নং অর্ডিনান্স অনুসারে নিম্নসংখ্যক বাড়ী ও স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে—বোম্বাই ৫০। বঙ্গ ৪৭। বিহার ও উড়িষ্যা ১। অন্যান্য প্রদেশে হয় নাই। ১৯৩১ সালের ৪নং ও ১০ নং অর্ডিনান্স অনুসারে নিম্নসংখ্যক বাড়ী ও স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে—মাদ্রাজ ২৭। বোম্বাই ১৩৮। বঙ্গ ২৭৫। যুক্ত প্রদেশ ১৯৩। পঞ্জাব ৩। বিহার ও উড়িষ্যা ৯৫। মধ্য প্রদেশ ৭ (একটি বাগান সহ)। আসাম ২০। সীমান্ত প্রদেশ ১। দিল্লী ৪। কুর্গ ২। আজমীর মারাবার ৫।

পশ্চিমবঙ্গ নারী সভা

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণীর সভানেত্রীত্বে হুগলীতে নিখিল ভারত নারী-সম্মেলনের পশ্চিম বঙ্গ বিভাগের মহিলাদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৬ই শত মহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। মিসেস্ পি কে দাস বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিলে, মিসেস্ এস্, এন্, রায় সমবেত মহিলা দিগকে নারী সম্মেলনের কার্য্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করে। তৎপর আগামী নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশনের জন্য প্রত্যেক জেলা হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়।

পৃথিবী পর্য্যটক বাঙ্গালী

শ্রীহট্ট-নিবাসী শ্রীযুক্ত আর, এন, বিশ্বাস ১৯৩০ সালে শিঙ্গাপুর হইতে পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ষ্ট্রেট্ সেটেলমেণ্ট, শ্যাম, মালয় উপদ্বীপ, ইন্দো-চীন, চীন, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া এবং জাপান পরিভ্রমণ করিয়া রেঙ্গুনে পৌঁছিয়াছেন। তথা হইতে তিনি মণিপুর রাজ্যের মধ্যদিয়া আসামের দিকে যাত্রা করিতেছেন। এরূপ উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

দেশবন্ধু চিনি-কল

গত ২০ শে সেপ্টেম্বর ঢাকা জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ মহকুমার কাওরাদি (চরসিন্দুর) নামক গ্রামে উক্ত মিলের প্রতিষ্ঠা-কার্য্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার এই অনুষ্ঠানের সভাপতি হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে আচার্য্য রায় এবং শ্রীযুক্ত সরকার দুইটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বাংলায় চিনির কলের প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা উন্নীত করিবার জন্য একান্ত আবশ্যক। বাংলায় চিনির চাহিদা অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বেশী, অথচ সমস্ত চিনিই আসে বিহার যুক্তপ্রদেশ ও বিদেশ হইতে। এ বিষয়ে বাঙ্গালীকে শুধু স্বদেশী নয়, স্বাবলম্বীও হইতে হইবে। বলাবাহুল্য ইক্ষুর চাষ এদেশে সহজে অল্প খরচে, প্রচুর হইয়া থাকে এবং চিনি তৈরীও এই কারণেই মোটেই কঠিন নয়। আশাকরি, দেশের সর্ব্বত্রই এই আদর্শে চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিবে।

বঙ্গীয় জন-সাহিত্য-সম্মেলন

বিগত ১৬ই এবং ১৭ই সেপ্টেম্বর মৈমনসিংহে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের সভাপতিত্বে এই সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, হেমন্তকুমার সরকার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক সরকার তাঁহার সুদীর্ঘ অভিভাষণে বিশেষভাবে বলেন, বাংলা চলতি কথা ভাষায় প্রচলিত শব্দ সকল যাহাতে সার্ব্বজনীন লেখা ভাষায় গৃহীত হয় তজ্জন্য একটি আন্দোলন আবশ্যক। সভায় এজন্য একটি প্রাদেশিক সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহার ফলে বঙ্গভাষা বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ হইবে। তবে যে সকল শব্দ কালক্রমে সহজে সার্ব্বজনীন হইতে পারে, প্রত্যেক জেলা হইতে সেই সকল শব্দই সুনির্ব্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দেওলীতে ৩০০ রাজবন্দী

৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দেওলী বন্দীশালায় ৩০০শত বাঙ্গালা যুবক অবরুদ্ধ রহিয়াছেন।

মেদিনীপুরে চট্টগ্রামীয় ব্যবস্থা

১৬ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন,—

মিঃ বার্জের হত্যাকাণ্ড সংশ্লিষ্ট ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্তের ফলে সম্যক বিবেচনা করিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিপ্লবীদের কর্ম্মতৎপরতা বন্ধ করিবার জন্য এবং তাঁদের কর্ম্মচারীদের নির্ব্বিঘ্নতার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা আবশ্যক :—

(১) যথারীতি আবশ্যক কর্ম্মচারীদের সহিত মেদিনীপুর সহরে সশস্ত্র পুলিশের সংখ্যা আরও একশতজন বৃদ্ধি করা। ১৮৬১ সালের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ৫ আইনের ১৫ ধারার সর্ত্তানুযায়ী মেদিনীপুর সহরের অধিবাসীদের ব্যয়ে এই সব কর্ম্মচারী এবং পুলিশকে আপততঃ এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত করা হইবে।

(২) মেদিনীপুর নিযুক্ত গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারীদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা।

(৩) বিপ্লব দমন বিধি অনুসারে চট্টগ্রামে যে সব বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত আছে, মেদিনীপুর জেলায় সেগুলি প্রয়োগ করা। ইহাতে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ যদি ইচ্ছা করেন সন্দেহ ভাজন ব্যক্তিদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে এবং যেখানে আবশ্যক লোকজনের চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যখন এবং যেখানে আবশ্যক হইবে সাঁঝবাতির আইনজারী করিতে পারিবেন।

চট্টগ্রামে যেরূপ প্রচারিত হইয়াছে সেইরূপ অধিবাসীদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ের জন্য পরিচয় পত্র ব্যবহারের ব্যবস্থা করিবার প্রশ্ন সম্বন্ধে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বিবেচনা করিতেছেন, এ সম্বন্ধে তাহাদের সুপারিশের অপেক্ষা করা যাইতেছে। অন্যান্য কয়েকটী ব্যবস্থাও বিবেচনাধীন আছে। সেগুলি যদি অবলম্বিত হয় যথা সময়ে ঘোষণা করা হইবে।

মহাত্মা গান্ধী ও সবরমতী আশ্রম

মহাত্মা তাঁহার আশ্রমের সমস্ত সম্পত্তি হরিজন সেবার জন্য উৎসর্গ করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া শ্রীযুত ঘনশ্যাম দাস বিড়লাকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। সবরমতী আশ্রম যে সব উদ্দেশ্য লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, হরিজন সেবা তাহার অন্যতম; সুতরাং মহাত্মাজী মনে করেন যে, সবরমতী আশ্রমে হরিজন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলে, আশ্রমের উদ্দেশ্য পূর্ণরূপেই সিদ্ধ হইবে। মহাত্মাজী প্রস্তাব করিয়াছেন যে 'নিখিল ভারত হরিজন সেবক সঙ্ঘকে' আশ্রমের সমস্ত সম্পত্তি সমর্পণ করা হইবে এবং ইহা একটি সর্ব্ব ভারতীয় প্রতিষ্ঠান হইবে। হরিজনদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা বিস্তার, নানারূপ শিল্প শিক্ষাদান প্রভৃতি কার্য্য এখানে চলিবে কতকগুলি হরিজন পরিবারও এখানে বসতি করিতে পারেন আশ্রমের যে গৃহ আছে তাহাতে হরিজন ছাত্রাবাস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে মহাত্মাজী সবরমতী আশ্রমের সুবৃহৎ গ্রন্থাগার আমেদাবাদ মিউনিসিপালিটির হস্তে দান করিয়া জাতিকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছেন। তাঁহার এই দ্বিতীয় মহৎ অবদানও ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

রাণীর মূল্য

গত সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে পবিত্র কুরুক্ষেত্র সরোবরে স্নানার্থী পাঁচলক্ষের উপর তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। গ্রহণের সময় ধনিব্যক্তিগণ বহু অর্থ ও অলঙ্কারাদি দান করিয়াছেন। এক রাজা তাঁহার কুলপুরোহিতকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সম্পদরূপে তাঁহার রাণী দান করেন। দানশেষে প্রাচীন প্রথামত রাজা রাণীকে ফিরিয়া পাইতে পুরোহিত কি মূল্য চাহেন জিজ্ঞাসা করিলে, উভয় পক্ষে কিয়ৎকাল দরকষাকষি চলে। রাণীও পাল্কীর ভিতর হইতে যোগদান করিয়া বলেন, "আমার মূল্য কি মাত্র দশ হাজার টাকা?" তৎপর তদপেক্ষা উচ্চতর মূল্যগ্রহণে রাণীকে রাজার নিকট প্রত্যর্পণ করা হয়।

বাঙ্গালার নারীদের প্রতি

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী গত ১লা ভাদ্রের "সঞ্জীবনী" পত্রিকার নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছেন :—

'নির্য্যাতিতা নারীর দীর্ঘনিশ্বাস বাংলার আকাশ বাতাস বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। প্রতিদিন বাংলার বুকে অগণিত নারীর লাঞ্ছনা হইতেছে। নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পৎ আজ কামার্ত্ত পিশাচের হস্ত হইতে রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে, পুরুষেরা নারীগণেরই বিপদের বিশেষ কোন প্রতিকার করিতেছেন না। নারী আর কতদিন পুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবেন ?

নারী অপহৃতা বা ধর্ষিতা হইলে পুরুষের যত ক্ষতিই হউক না কেন, নারীর তুলনায় পুরুষের ক্ষতি অকিঞ্চিৎকর। অপহৃতা বা ধর্ষিতা নারীর পিতা সময়ে কন্যার কথা ভুলিয়া যান, স্বামী পুনর্ব্বিবাহ করেন ; কিন্তু অপহৃতা বা ধর্ষিতা নারীকে সমস্ত জীবন লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় ; জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে প্রায়ই দাসীবৃত্তি কিংবা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। নারী নির্য্যাতন সম্পর্কে পুরুষের উদাসীনতা নিন্দনীয় হইতে পারে ; কিন্তু নারীর উদাসীনতা আত্মঘাতী।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে শত শত নারী যোগ দিয়াছেন ও দিতেছেন ; কিন্তু নারী নির্য্যাতন নিবারণের চেষ্টায় নারীকে দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বামীর সহিত সমান অধিকার লাভের জন্য যে স্ত্রী তুমুল আন্দোলন করিতে পারেন তিনি আপন সম্ভ্রম রক্ষার সম্পূর্ণ ভার স্বামীর উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবেন, ইহা কি বিসদৃশ নহে ?

নবজীবন প্রেস

মহাত্মা গান্ধী সমগ্র 'নবজীবন প্রেস' বিক্রয় করিবার জন্য নবজীবন প্রেসের রক্ষক শ্রীযুক্ত জীবনজী দেশাইকে নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। প্রেসের মূল্য প্রায় ৫০ হাজার টাকা। এই পত্রে মহাত্মাজী বলিয়াছেন যে, প্রেসের সকল ট্রাষ্টিই সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই, শেঠ, যমুনা লাল বাজাজ ও মহাত্মা গান্ধী এই প্রেসের ট্রাষ্টী।

আর্থিক সমস্যা সমাধানে নারীর কৃতিত্ব

স্বর্গীয়া ইন্দুমতী দেবী ধানবাদের যশস্বী মোক্তার ৺সারদাপ্রসন্ন চট্টরাজের প্রথমা কন্যা ছিলেন। বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার পাইকর গ্রামের শ্রীযুক্ত তারাসুন্দর মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর পিতার উদ্যোগে তিনি সকল প্রকার পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠের সুযোগ পান ও তাহাতে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। সূচিকর্ম্ম, পাকপ্রণালী, ধাত্রীবিদ্যা, শিশুচিকিৎসা ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিশেষ ভাবেই লাভ করেন। ২১।২২ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার স্বামীর ওকালতির কর্ম্মক্ষেত্র রামপুর হাটে আসেন।

সমাজের উচ্চ নীচ যে কোনও স্তরেরই নারীর সংস্পর্শে থাকুন না, স্বামীর পদমর্য্যাদা হিসাবে গৌরবান্বিতা যে কোন মহিলার সহিত ব্যবহার করুন না, তিনি নারী ও নারীর মধ্যে কোন প্রভেদ জ্ঞান করিতেন না, সকলকেই সমান মর্য্যাদা দিতেন। তিনি রামপুর হাটে স্বর্গীয়া পুণ্যশ্লোকা সরোজনলিনী দত্ত প্রতিষ্ঠিত মহিলা সমিতির বহুকাল ধরিয়া সম্পাদিকা ছিলেন। সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল-সমিতি হইতে শিক্ষয়িত্রী আনাইয়া স্থানীয় সকল শ্রেণীর নারীগণের শিক্ষোন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু স্থানীয় নারী সম্প্রদায় তাহার সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শিশুপালন, আত্মীয় স্বজনের সেবাদি ছাড়াও প্রত্যেক গৃহিনী সদ্দর্ম্মানুযায়ী তাঁহার স্বামীর সাংসারিক

পরিচ্ছদাদির ব্যয়সঙ্কোচ মানসে সেলাই কাট ছাঁট ইত্যাদি কার্য্যে সুশিক্ষিতা হউন, ইহাই ছিল তাঁহার নীতি এবং মহিলা সমিতি সেইভাবে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত ব্যথিতা হইয়াছিলেন। শেষে তাহা ছাড়িয়া দিয়া স্বামীর ছাপাখানার উন্নতির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন।

তাঁহার ছাপাখানার কার্য্য শিক্ষার প্রবৃত্তি আইসে একটা সামান্য ঘটনা হইতে। তাঁহার স্বামী একদিন কাছারী হইতে আসিয়া কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলা দেখিয়া তাহাদিগকে তীব্র ভৎসনা করেন। কর্ম্মচারীগণ একযোগে ধর্ম্মঘট করিয়া কর্ম্মত্যাগ পত্র দাখিল করে। পরদিন তিনিই তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় কার্য্যে লাগাইয়া দেন এবং এইরূপ ধর্ম্মঘটের পথ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সেই দিন হইতেই সকলের অজ্ঞাতে রাত্রিকালে তাঁহার তৃতীয়া কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ছাপাখানায় আসিয়া কিছুদিন মধ্যে একটা নকসা প্রস্তুত করিয়া তিন সপ্তাহ পরে ঘোষণা করেন যে "রাঢ়দীপিকার" (তাঁহার স্বামীর সম্পাদিত সাপ্তাহিক) সমগ্র কম্পোজের কাজ তিনি করিবেন এবং ২ জন কম্পোজিটরকে জবাব দেন। তারপর ২টী পুত্র ও ২টী কন্যা (১০ বৎসর হইতে ১৫ বৎসরের বালক বালিকা) কে কাজ দেখাইয়া ছাপাখানার অধিকাংশ কাজই করিয়া থাকেন। এইরূপে ১০ বৎসর কাল অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া ১৯৩১ সাল হইতে একেবারে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া যান। এই ১০ বৎসরকাল প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া তিনি যে আয় করিয়াছিলেন তাহা না করিলে তারাসুন্দরবাবু ৪টী কন্যার বিবাহ ২টী জামাতার ও ২টী পুত্রের কলেজে অধ্যয়ন ইত্যাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইতেন না। গত ৭ই বৈশাখ পুত্র কন্যা ও পুত্রবধুর অক্লান্ত সেবা যত্নকে ব্যর্থ করিয়া স্বামী, ৪টী পুত্র, ২টী পুত্রবধূ, ৬টী কন্যা ও আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া রাত্রি ১১টার সময় ৪৫ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

স্বর্গীয়া ইন্দুমতী দেবী সাধারণ নারীর মত বিপদের সময় অধীর হইয়া কেবল আর্ত্তনাদ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না, বীর নারীর মত বিপদের সম্মুখীন হইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেন। একটী মাত্র উদাহরণ দ্বারাই তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। তাঁহার বয়স যখন ১৮ বৎসর তখন তাঁহার পিতার পক্ষাঘাত হওয়ায় তিনি অক্ষম হইয়া পড়েন। এক বৎসর পরে আবার তিনি কার্য্যক্ষম হয়েন কিন্তু সঞ্চয়শীল ছিলেন না বলিয়া ঐ এক বৎসর ভয়ঙ্কর আর্থিক দুর্গতি হয়। কোনো কুটীর শিল্প দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া পিতার পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ মানসে তিনি অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া একটা মোজার কল আনান এবং মোজা বিক্রয় দ্বারা পিতার পরিবারবর্গ প্রতিপালন করেন। সে সময় তারাসুন্দর বাবু শিয়ালদহ এক জমিদার আফিসে চাকুরী করিতেন। তিনি কলিকাতায় গিয়া মোজা বুনিয়া সেই মোজা কলিকাতার বাজারে বিক্রয় করিয়া কিছুদিন পিতার পরিবারের ভরণপোষণের আংশিক ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। গত ৭।৮ বৎসর হইতে তিনি রামপুরহাট জেলার অবৈতনিক মহিলা পরিদর্শক ছিলেন।

—বণিক

গ্রন্থ-পরিচয়

জাগৃহি—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত। প্রকাশক—প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দুই টাকা।

যে সমস্যা লইয়া সমগ্র দেশে আজ বিষম চাঞ্চল্য ও আলোচনা চলিয়াছে, ইহা সেই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের সমস্যা লইয়াই লিখিত। লেখিকার নিপুণ লেখনীতে বিষয়টি বেশ মনোজ্ঞ ও জীবন্ত হইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সহায় সম্বল শূন্য দরিদ্র সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ যুবক ঈশান কিরূপে ধীরে ধীরে এই সামাজিক আন্দোলনে একখানি গ্রামকে আলোড়িত করিয়া তুলিল, সে কাহিনী চিত্তাকর্ষক ভাবেই বিবৃত হইয়াছে। শুধু অস্পৃশ্যতা দূর করা নয়, হিন্দু সমাজে যে সকল ভেদ ও বৈষম্য সমাজের বুকে গুরুভার পাষাণের মতো চাপিয়া আছে, যে সকল আবর্জ্জনা জমিয়া সমাজকে ক্ষয়িষ্ণু করিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে নিপীড়িত মূক মানবের যে জাগরণ তাহাও এ গ্রন্থে বড় করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়া বর্ণিত হইয়াছে। সামাজিকতার দোহাই দিয়া মানুষ কত বর্ব্বর কত নিষ্ঠুর, কত হৃদয়হীন, কত অক্ষম ও দুর্ব্বল হইতে পারে তাহা গ্রন্থখানির আদ্যন্ত পরিস্ফুট। নারীর উৎপীড়ন, তথাকথিত ছোট লোকদের নিষ্পেষণ সমাজের নেতাদের ভণ্ডামি ও কলুষতা—হিন্দুকে দিন দিন দুর্ব্বল ও পঙ্গু করিতেছে। গ্রন্থখানি এই শতছিদ্র হিন্দু সমাজের চোখে আঙ্গুল দিয়া তাহার ত্রুটিগুলির পাপগুলি দেখাইয়া দিতেছে। বইখানি সময়োপযোগী এবং যে সমস্যা ইহার আলোচ্য তাহাতে সফল হইয়াছে ইহা বলিতেই হইবে। বইখানি সকলকেই একবার পড়িতে অনুরোধ করি। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই প্রশংসনীয়।

শ্রীসুরমা দাস

মহাপ্রস্থানের পথে—শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল প্রণীত। প্রকাশক—আর্য্য পাব্লিশিং হাউস, কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

ভ্রমণ কাহিনী যে কত সুন্দর হইতে পারে তাহার পরিচয় যারা পাইতে চান তাদের এই বইখানি একবার পড়িতে অনুরোধ করি। হিমালয়ের উপরে সেই দেবীনাথ যাত্রার কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু উহা এমন মনোজ্ঞ, এত মিষ্টি ও মধুর পড়িতে পড়িতে সত্যিই তীব্র ভ্রমণ স্পৃহা জাগ্রত হয়, মন উদাসী হইয়া যায়। ইহার ভাষার মাধুর্য্য, বর্ণনার চারু সৌন্দর্য্য সমস্তই অতুলনীয়। ঘরমুখো বাঙালির হাতে এবই পড়িলে, তাহাকে একবার ছন্নছাড়া করিয়া তুলিবে। উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক এই বইখানি। এমন স্পষ্ট নিখুঁত ভ্রমণ চিত্র অথচ মনোজ্ঞ, বাংলাসাহিত্যে অতি বিরল। বইখানি অতি মূল্যবান আইভরি ফিনিস কাগজে ছাপা এবং চিত্র শোভিত। বাঁধাই ও ছাপা ভাল।

শ্রীসুরমা দাস

জয়যাত্রা—মুহম্মদআবদুল্লাহরসুল প্রণীত। প্রকাশক—সঙ্কল্প আফিস, ৮২।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। নাটিকা ধরণের লেখা—**নারীপ্রগতি** সম্বন্ধীয়। পড়িয়া ভাল লাগিল না। কতকগুলি কথোপকথন বা ডায়ালগ

মাত্র হইয়াছে, নাটিকা হয় নাই। কিন্তু এত নীরস প্রাণহীন শুষ্ক ও সুদীর্ঘ কথাবার্ত্তা মোটেই মনে কোন ছাপ দেয় না, বরং বিরক্তি ধরে। চরিত্রগুলিও নির্জ্জীব, কলের পুতুল।

ঢাকাই সাবান-শিল্প—শ্রীদিগেন্দ্রচন্দ্র দাস বি-এস্‌সি ও শ্রীসত্যরঞ্জন বসু কর্ত্তৃকসংকলিত। মুনলাইট সোপ ফ্যাক্টরী, ১২৬ ঠাঁটারীবাজার, ঢাকা। মূল্য তিন টাকা।

কাপড় কাচা সাবানের মধ্যে ঢাকাই বাংলা সাবান অতি উৎকৃষ্ট ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। শিল্পহিসাবে ইহা এতদিন অশিক্ষিত লোকের হাতেই ছিল। ইদানীং ভদ্রযুবকগণ অনেকে এ বিষয়ে হাত দিতেছেন। ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু বেকার-সমস্যার সমাধানে এবং একটি দেশীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে এই পুথিখানি সাহায্য করিবে। পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি। লেখকদ্বয়ের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। কিন্তু ২৮টি মুদ্রিত পৃষ্ঠার দাম তিন টাকা দেওয়ার সার্থকতা বুঝিলাম না।

উদিতা—শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী। প্রকাশক শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এস্‌সি, ১৫নং কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—২ টাকা বাঁধাই।

ইহা কবিতার বই। বিভিন্ন বিষয়ে লেখা কবিতা সমষ্টি। গ্রন্থকর্ত্তী শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী বঙ্গসাহিত্যের তরুণ মহিলা কবি। ইহা তাঁহার প্রথম কবিতা-পুস্তক। প্রথম লেখা ও তাঁহার বয়সের অনুপাতে কবিতাগুলি অতি চমৎকার হইয়াছে এবং কবিতাগুলির মধ্যে তাঁহার কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতার নূতনত্ব সাবলীলতা ও বৈচিত্র্য সহজেই চিত্তকে মুগ্ধ করে।

তাঁহার এই বিকাশোন্মুখ কবি-প্রতিভা সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া তাঁহাকে বঙ্গ সাহিত্যে যশস্বী করুক ইহাই সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি। বইখানির কাগজ ও ছাপা খুব ভাল। গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় একটি সুন্দর ছবি আছে।

শ্রীরমা দেবী

নন্দিনী—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১॥ টাকা বাঁধাই।

আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার দুইটি নারীর করুণ ও ব্যর্থ জীবন কাহিনী মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের কথা বস্তু এইরূপ—মল্লিকা জমিদার কন্যা পিতৃগৃহে অতি আদর যত্নে প্রতিপালিত; বিবাহ হইল মধ্যবিত্ত গৃহে, স্বামী যোগেন অল্প শিক্ষিত, যাত্রার দলের পাণ্ডা ও অভিনেতা। যোগেন টাকার জন্য সর্ব্বদা স্ত্রী মল্লিকার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিত। মল্লিকা পিতামাতার একমাত্র সন্তান বলিয়া পিতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে এই মনে করিয়া যোগেন সে অর্থ করায়ত্ব করিবার জন্য সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব। তারপর মল্লিকার যখন একটি ভাই জন্ম গ্রহণ করিল তখন যোগেন অর্থলোভে শিশুটিকে হত্যা করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিল, মল্লিকার জননীর কাণে সে কথা গেল, তাহার ফলে কন্যার উপর তাঁহার ঘোরতর সন্দেহ জন্মিল। তারপর অকস্মাৎ মল্লিকার বৈধব্য। ছোট ভাইটিকে আদর করিয়া অন্তরের জ্বালা ভুলিবারও তাহার অধিকার রহিল না—শেষে বড় দুঃখে সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া কোন দেব মন্দিরের সেবিকারূপে বড় দুঃখে জীবন যাপন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় নারীর জীবন কাহিনীও বড় করুণ। শঙ্কর শৈশবে মাতৃহীন হইয়া পিতার আদর যত্নে প্রতিপালিত। মায়ের শিক্ষার অভাবে তাহার বালকসুলভ ডানপিটে ভাব ও অতিরিক্ত চঞ্চলতাই বিকাশলাভ করে। নারীসুলভ কোন ভাবই প্রকাশিত হইতে পারে নাই। বিবাহ যখন হইল তখনও সে ভাব তাহার যায় নাই। ফলে শ্বশুরগৃহে তাহার স্থান হইল না, স্বামী আবার বিবাহ করিল, শঙ্কর যখন তাহার অবস্থা বুঝিল,

তখন তাহাকে শুধু ব্যর্থ ও অভিশপ্ত জীবনেই যাপন করিতে হইল। এই দুইটী প্রধান চরিত্র ব্যতীত ছোটখাট চরিত্র চিত্রণ ও নিখুঁত সুন্দর হইয়াছে।

বাংলার ঘরে ঘরে কত পরিবারে মল্লিকাও শঙ্করীর মত নারী যে ব্যর্থ ও অভিশপ্ত জীবন যাপন কর তাহার সংবাদ আমরা কতটুকু রাখি? তাই এইরূপ গ্রন্থ পড়িলে মন সতই তাদের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া ওঠে। বইখানার ছাপার কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

উর্ব্বশী ও আর্টেমিস্—শ্রীবিষ্ণু দে। প্রকাশ: শ্রীবুদ্ধদেব বসু এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স্।

এখানি কবিতার বই। কবি সাহিত্য জগতে নবপরিচিত হইলেও শীঘ্রই সেখানে একটী স্থায়ী আসন লাভ করিবেন আশা করা যায়। কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বর্জ্জিত হওয়াতে নূতনত্বের আমেজে মনটা খুসী হইয়া ওঠে। সবুজ বসুমতি, সুনীল আকাশ ও কালো জলের ছায়া পড়িয়া কবিতাগুলি যেন স্নিগ্ধ ও সজল হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু কবির ভাষা তাহার অন্তর্নিহিত উদ্দাম ভাব রাশির সহিত ঠিক সমান তাল রাখিয়া চলিতে পারে নাই। ভাষা স্থানে স্থানে কর্কশ ও দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। অনেক অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করাতেও ভাষার সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে। কবিতাগুলি নূতন ছন্দে রচিত। সেই একঘেয়ে মিলের বন্ধনে ধরা দিতে কবি অনিচ্ছুক। তাঁহার এই স্বাধীন ও সবল ভাবটী বেশ ভাল লাগিল। মোটামুটি বইটী বেশ নূতন ধরণের হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই বেশ ভাল। ভাষার সৌন্দর্য্যের দিকে একটু লক্ষ্য রাখিয়া লিখিলে এই তরুণ কবিটী ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই খ্যাতিলাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীবীনা দাস গুপ্তা

বিলাত ভ্রমণ—শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী প্রকাশক শ্রীসুশীলা নন্দী ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস, ২০০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। ২য় সংস্করণ মূল্য দুই টাকা।

অক্ষয়বাবুর 'বিলাত ভ্রমণ' সম্বন্ধে এক কথায় বলতে হলে বলতে হয়—বইখানি অতি প্রয়োজনীয়। সাহিত্যের দিক দিয়ে এ বইয়ের মূল্য হয়ত খুব বেশী নয়, তাছাড়া বাংলাভাষায় অন্য কয়েকখান ভ্রমণ কাহিনীর সাহিত্যিক সম্পদ এর চেয়ে ঢের বেশী; কিন্তু নিরাড়ম্বর ভাষায় লিখিত এই বইখানি সাধারণের উপযোগী, গ্রন্থকার নিজেও বলেছেন সাধারণের জন্যই তাঁর এই প্রচেষ্টা। বাস্তবিকই এমন বহুতথ্যসম্বলিত ভ্রমণকাহিনী বাংলা ভাষায় আর নেই, এইখানিকে বিলাত ভ্রমণের গাইড বল্লে অত্যুক্তি করা হবে না।

শ্রদ্ধেয় নন্দীমহাশয় ব্যবসাদার হিসেবে বিদেশকে দেখেছেন ও বুঝতে চেষ্টা করেছেন সুতরাং ব্যবসাদারের চোখ দিয়ে দেখা বিলাতের কাহিনী আমাদের কাছে নতুন, এ দিক দিয়ে বইখানির বৈশিষ্ট্য আছে। বিটীশ এম্পায়ার একজিবিশনের বিবরণ এই বইয়ের সঙ্গে সংযোজিত হয়ে বইয়ের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়েছে।

বিলাতের অভিনবত্বে গ্রন্থকারের চোখ গিয়েছিল ধেঁধে এবং তারই ছাপ লেগেছে তাঁর লেখায়। বিদেশে তিনি যা দেখেছেন ও শুনেছেন তার সঙ্গে আমাদের দেশ সম্বন্ধে তুলনামূলক মন্তব্য বহুস্থানে করেছেন এবং ও দেশের প্রশংসার অতিশয্যে একাধিকবার তিনি স্বদেশ সম্বন্ধে অন্যায় ও ভুল মন্তব্য করেছেন। যেমন বিলেতে তিনি একদিন সুযোগ থাকাসত্বেও বাস্‌কে ফাঁকি দিতে পারেননি; কিন্তু এদেশে নাকি সেটা অসম্ভব হত না। দুর্ভাগ্য কিংবা সৌভাগ্য জানিনা, আমাদের সঙ্গে কিন্তু এমন স্বদেশবাসীর পরিচয় নেই যিনি ট্রামবাসকে ফাঁকি দেবার মতলবে ঘোরেন। তারপরে অক্ষয়বাবুর হয়ত জানা নেই যে আমাদের দেশেও কয়েকটী সম্প্রদায়ের

মধ্যে শ্রাদ্ধবাসর ও বিবাহসভায় ভোজ ছাড়াও আরও কিছু কিছু অনুষ্ঠানের রেওয়াজ আছে, এমন কি যা আদর্শ হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন সেরকম প্রথাই বিদ্যমান।

ঈকার সম্বন্ধে গ্রন্থকারের এত কার্পণ্য কেন? 'একটা পুরুষ' 'একটা মেয়ে' 'একটা সাহেব' ইত্যাদি আমাদের ভাল লাগেনি।

'বিলাত ভ্রমণের' প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছিলেন "এ রকম বইয়ের আদর হবে", তাঁর কথা মিথ্যা হয় নি, কারণ আমরা সমালোচনা করলাম পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের। ছাপা ভাল, বাঁধাই একটু সেকেলে।

সানন্দা- শ্রীবুদ্ধদেব বসু—প্রণীত। ৪৬।১ রমেশ মিত্র রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

দুষ্ট গ্রহের মত বঙ্গ সাহিত্যের প্রাঙ্গনে বুদ্ধদেব বসু যখন আবির্ভূত হইলেন, সাহিত্য-রথীরদল সমস্বরে তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা-শক্তিকে যদিও সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সাহিত্যের আসরে যাহা পরিবেশন করিতেছিলেন তাহা কেহই ক্ষমা করেন নাই। সাহিত্যের আদর্শ ও প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিতর্ক এখানে উত্থাপন সম্ভব নয়। সুতরাং বিরত রহিলাম। কিন্তু একটা কথা আজ এই উদীয়মান শক্তিশালী সাহিত্যিক গোষ্ঠীকে বিশেষভাবে ভাবিতে অনুরোধ করি তাহা এই হতভাগ্য জাতির অভ্যুদয়ের হৃদস্পন্দন। জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা ভাব ও আদর্শকে অবলম্বন করিয়া বৃহত্তর শাশ্বত সাহিত্য গড়িয়া তোলা কি সম্ভব নয়? বলিনা, এঁরা প্রপাগাণ্ডিষ্ট সাহিত্যিক হোন—আর্টিষ্টিক সাহিত্যে কি জাতীয় জীবনের এত বিরাট জাগরণের হৃদস্পন্দন রূপায়িত করিয়া তোলা একেবারেই অসম্ভব? আমরা এই নব্য সাহিত্যিক গোষ্ঠীর দৃষ্টি এই বিপুল সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি।

এখন সানন্দার কথা। রচনা-নৈপুণ্য, সেকথা বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যে এধরণ একেবারে নূতন। অতিস্পষ্ট, অতি সহজ এর প্রকাশ ভঙ্গিমা। কিন্তু বইখানি পড়িয়া একটা কথা মনকে বিষম পীড়া দেয়, তাহা এই যে, 'সানন্দা'কে নিয়া যেন বড্ড ছিনিমিনি খেলা হইয়াছে। যে পারিপার্শ্বিক থেকে সানন্দা আসিয়াছে, তাহাতে তাহার পক্ষে এরূপ হওয়া অসম্ভব মোটেই নয়। তবু একটি মেয়েকে অমনভাবে নাচিয়ে বেড়ানো মোটেই শোভন নয়। সত্যি দুঃখ হয় বেচারার জন্য। বইখানি বুদ্ধিকে তৃপ্তি দেয়, কিন্তু চিত্তকে রাখে উপবাসী।

ব্যথার দান—কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত। প্রকাশক—মোস্‌লেম পাব্লিশিং হাউস, ৩ কলেজ-স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১।৷০ টাকা।

গ্রন্থখানি এই খ্যাতনামা কবি লেখকের যৌবনের ভালবাসার কতগুলি আলেখ্য। সব কয়টিই চিঠির আকারে আত্মবিবৃতি। বইখানিকে গদ্যকাব্য বলা যায়—কবিতার ন্যায় কোমল, পেলব, নম্র ও রসাল। কাব্যামোদীগণ পড়িয়া তৃপ্তি পাইবেন।

লেখকের উচ্ছ্বাসময় উদ্দাম রচনা-ধারার ইহা অন্যতম পরিচায়ক। বইখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

ঢাকায় পূজা উপলক্ষে সরকারী অনুগ্রহ।

নোটীশ

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে বঙ্গীয় বিপ্লবী অত্যাচার দমন আইনের নিয়মাবলীর ৫ (ক) ধারানুযায়ী ঢাকা মিউনিসিপালিটীর হিন্দু বাসিন্দাগণের প্রতি তাহাদের বাড়ীতে ১৪ হইতে ৩১ বৎসর বয়স্ক কোন পুরুষ আসলে এবং চলিয়া গেলে ভার প্রাপ্ত থানার দারোগার নিকট রিপোর্ট করিবার যে আদেশ ছিল, তাহা গত ১৯৩৩ সনের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে বাতিল করা হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষরিত একটী বিশেষ আদেশ কতিপয় বিশিষ্ট বিশিষ্ট গৃহস্বামীর উপর জারী করা হইয়াছে, তাহাদের বাড়ীতে ১৬ হইতে ৩১ বৎসর বয়স্ক কোনও পুরুষ আসিয়া ২৪ ঘণ্টার অধিক সময় অবস্থান করিলে বা তাহাদের বাড়ী হইতে অন্যত্র যাইয়া ২৪ ঘণ্টার অতিরিক্ত সময় অনুপস্থিত থাকিলে ভারপ্রাপ্ত থানার অফিসারের নিকট অনতি-বিলম্বে রিপোর্ট দাখিল করিবেন। এই আদেশ যে সমস্ত গৃহস্বামীর উপর জারী করা হইয়াছে শুধু তাহাদেরই থানার দারোগার নিকট উপরি নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের গমনাগমনের রিপোর্ট করিতে হইবে। ইতি ৬।১০।৩৩

Arthur Hughes
ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাকা।

বিপ্লব বিভীষিকার অনিষ্টকারিতা।

(Addisional District Magistrate হইতে প্রাপ্ত)

কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলা দেশে কতকগুলি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংঘটনে বাংলার মুখ গভীর কলঙ্ক-কালিমালিপ্ত হইয়াছে এবং তাহাতে বাঙলা ও বাঙ্গালীর নামে বিশেষ দুর্ণাম রটিয়াছে। ইতিমধ্যে কিছু কালের জন্য এই পাপ প্রবৃত্তি প্রশমিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু এইরূপ জঘন্য নিষ্ঠুর নৃশংসতা পুনরায় মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। সেদিন মেদিনীপুরের জনপ্রিয় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্জ্জকে খেলার মাঠে নিষ্ঠুরভাবে গুলির আঘাতে হত্যা করার সংবাদে সমগ্র দেশ স্তম্ভিত হইয়াছে।

গুপ্ত হত্যা কিম্বা ভীতি প্রদর্শননীতি দ্বারা জগতের কুত্রাপিও স্বাধীনতা অর্জ্জন করা যায় নাই। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত দেশের মঙ্গলজনক সংগঠন মূলক কার্য্য করিয়া স্বাধীনতা লাভ করা কল্যাণকর। ব্রিটিশ জাতি সাহসী, সহিষ্ণু ও দৃঢ়চেতা জাতি বলিয়া জগতে পরিগণিত। কতিপয় সরকারী কর্ম্মচারীর গুপ্ত হত্যায় তাঁহারা এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন এরূপ মনে করা বাতুলতা মাত্র।

অতীতেও শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উপেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়, পুলিন বিহারী দাস এবং অন্যান্যের দ্বারা সমর্থিত হইয়া বাংলা দেশে এক বিরাট বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রচেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা এই পথে স্বাধীনতা অর্জ্জন নিষ্ফল জানিয়া হিংসা ও বিপ্লবের পথ ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমানে শান্তিপ্রিয় নাগরিকের মত জীবন যাপন করিতেছেন। এই সমুদয় মুক্তিকামী নেতারা হিংসার পথে দেশের স্বাধীনতা আসিবে না, এই কথা বলিয়াছেন। বারীন্দ্র বাবু বৈপ্লবিক অনাচারের অসারতা বিষয়ে তাঁহার সুদীর্ঘ

অভিজ্ঞতার ফল সংবাদ পত্রে তাঁর ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান ভ্রান্ত যুবকদিগেরও তাঁহাদের দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষালাভ করা উচিত।

জনৈক বিশিষ্ট কংগ্রেসনেতা একদা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে স্বাধীনতা তাহার জন্মগত অধিকার। বস্তুতই ইহা প্রত্যেক মানবের জন্মগত অধিকার এবং ইহা ধ্রুব সত্য যে প্রত্যেকেরই বাচিয়া থাকার এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অন্ততঃ জন্মগত অধিকার রহিয়াছে। খেলার মাঠে গিয়া ফুটবল খেলায় যোগদান করা কি মিঃ বাজের জন্মগত অধিকার ছিল না? স্বাধীনতা সকলেরই কাম্য বটে কিন্তু স্বাধীনতার নামে উশৃঙ্খলতা কেহই চায় না।

বাংলার বিভ্রান্ত যুবকদের হিংসামূলক মনোবৃত্তির মূলে যে কেবল দেশের বর্ত্তমান আর্থিক দুর্দ্দশা দায়ী, একথা মনে করা ঠিক হইবে না। এদেশে বৃটিশদের আগমনের পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ মড়ক দেখা দিত, কিন্তু তখন তো কেহ এরূপ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের কথা শোনে নাই। ঢাকা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার মিঃ ক্যাসেলস টাঙ্গাইলে বন্যাপীড়িত দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকদের অবস্থা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া যখন সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তখনই নিষ্ঠুর আততায়ীর হস্তে গুলির ঘায়ে আহত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান যুগে কতিপয় দায়িত্বজ্ঞানহীন আন্দোলনকারীর অনিষ্টকর প্রচার ও লেখার ফলে জনসাধারণের মনে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ বিষ সংক্রামিত হইয়াছে এবং তাহাতে ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে অসমর্থ যুবকেরা পথভ্রষ্ট হইয়া এই ধরণের খুনা খুনি করিতেছে।

বিপ্লববাদীদের কার্য্যাবলী প্রত্যেক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা দ্বারাই নিন্দিত হইয়াছে, ইহা সত্য বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাদের যতদূর করা উচিত ছিল, ততদূর করা হয় নাই। ভীতিপ্রদর্শনকারীদের কার্য্যের নিন্দা করা ব্যতীত এই বিনাশমূলক অপরাধ প্রশমনকল্পে তাঁহারা এপর্য্যন্ত কিছুই করেন নাই। পক্ষান্তরে কোনও কোনও নেতা দায়ী যুবকদের ত্যাগ স্বীকার ও সাহসের প্রশংসা করিয়াছেন। বৃটিশ গবর্নমেণ্ট যখন ভারতবাসীদিগকে অন্যান্য উপনিবেশের মত ঔপনিবেশিক অধিকার (Dominion status) দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন দেশের যুবকগণ হিংসা মূলক কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, ইহা ক্ষোভের কথা। এই সমস্ত অনর্থমূলক অনাচার দ্বারা আমরা শুধু বৃটিশ জাতির নয়, সমগ্র সভ্য জগতেরই সহানুভূতি হারাইতেছি।

এই সম্প্রদায় হিংসাত্মক কার্য্য এই দেশের প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতার বিরোধী। বাঙ্গলার পুরাতন গৌরব ফিরাইয়া আনিতে হইলে সমস্ত নেতাদেরই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একযোগে এই শ্রেণীর অপরাধ দমন করিবার নিমিত্ত কার্য্য করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেসের অন্যান্য সমস্ত কার্য্য বন্ধ করিয়া এই হিংসামূলক আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিতে হইবে।

বালক বালিকাদের মন গড়িয়া তুলিতে শিক্ষকদিগের দায়িত্ব কম নহে। তাঁহাদিগকে ও বিশেষভাবে এই সমস্ত অপরাধের কার্য্য দমন করিতে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করা আবশ্যক। তাঁহারা ছাত্রদিগের বিশেষ করিয়া অষ্টম হইতে দশম মানের ছাত্রদিগের গতিবিধির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন এবং যাহাতে তাহাদের কার্য্যাবলী বিধি সঙ্গত রূপে পরিচালিত হইয়া তাহারা শুদ্ধ নাগরিক রূপে গড়িয়া উঠিতে পারে তাহার বিশেষ চেষ্টা করা দরকার।

রামমোহন শতবার্ষিকী

২৭শে সেপ্টেম্বর, এই দিনে ঠিক একশ বছর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ভারতের প্রধানতম মানব ইংলণ্ডের এক পল্লীবাসে দেহত্যাগ করেন। আজ সেই মহামানবের মহামরণের পুণ্য স্মৃতিতিথি। এদিন বড় পবিত্র, বড় গভীর ভাবোদ্দীপক। এ তো মহাপুরুষের জন্মোৎসব নয়—এ যে কোটি মানবের মুক্তিতিথি। তাই আজ সারা দেশ জুড়িয়া সেই বিরাট আত্মার তিরোধান তিথি স্মরণ করিবার এত আয়োজন, এত উদ্যোগ। রামমোহনের মতো দৃপ্ত জীবন ও বলিষ্ঠ সঙ্কল্পের আজ যেমন প্রয়োজন, এমনটি জাতীয় জীবনে কোনদিন আর হয় নাই। সমগ্র দেশ যাহাকে প্রবলভাবে অস্বীকার করিয়াছিল, নিগ্রহ ও অত্যাচার পদে পদে যাহার জীবন সংশয় করিয়াছিল, তবু যিনি দৃঢ় চিত্তে ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সেই স্বদেশবাসীর হিতার্থেই জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার পুণ্যজীবন আজ আমাদের অনুপ্রেরণা দিবে, উদ্দীপনা দিবে, জাতির এই তমসাচ্ছন্ন সাময়িক নির্জীবতায় উজ্জ্বল অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করিবে। সেই বিরাটকায় বিরাট পুরুষের অমরাত্মা আজও যেন হুঙ্কার ছাড়িয়া অভয় ও আশা দিতেছে—ভয় নাই ওরে ভয় নাই। আঘাত ও অত্যাচার মাথা পাতিয়া নিয়াই চলিতে হইবে, দুঃখ ও বিপদ পথে পথে অভ্যর্থনা করিবে জানিয়াও অগ্রসর হইতে হইবে। তবু চলিতেই হইবে—সম্মুখে অগ্রসর হইতেই হইবে।

জওহরলালের নূতন বার্ত্তা

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু দীর্ঘকারাবাস হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সম্প্রতি পুণায় মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেশের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বেও তিনি দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যে সকল সমস্যা অধুনা প্রত্যেক চিন্তাশীল স্বদেশহিতৈষীর মনকেই আলোড়িত করিতেছে, সেই সকল বিষয়েই এই অভিমতগুলি। কাজেই এই অভিমতগুলির যথেষ্ট বাস্তবমূল্য আছে। যদিও পণ্ডিত জওহরলাল বা গান্ধীজি কেহই দেশবাসীর সম্মুখে কোন নূতন কর্ম্ম-প্রণালী

উপস্থাপিত করেন নাই, তথাপি এই অভিমতগুলি সেই কর্ম্মপ্রণালী গঠনে সহায়তা করিবে, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ কংগ্রেসের একটি সাধারণ অধিবেশন ব্যতীত একটি নূতন কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করাও সম্ভব নয় এবং সমীচীনও নয়। এক্ষণে পণ্ডিত জওহরলালের বিবৃতির কয়েকটি প্রধান কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাহা এই :—

(১) পূর্ণ স্বাধীনতাই (Complete Independence) আমাদের কাম্য। এবিষয়ে কোন অস্পষ্টতা থাকা অনুচিত। স্বাধীনতা শব্দে সৈন্যবিভাগের আধিপত্য, আন্তর্জাতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বুঝাইয়া থাকে।

(২) এই স্বাধীনতার জন্য মৌলিক অধিকার সমূহের এবং প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। দেশের জনসাধারণের জন্যই স্বাধীনতা; কাজেই বিশেষ অধিকারসমূহ যাহারা এতদিন একচেটিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট, ভারতীয় রাজন্য ও জমিদারবর্গকে তাহাদের অধিকারসমূহ ছাড়িতে হইবে। সব চেয়ে বেশী যারা বঞ্চিত হইয়াছে, সেই সর্ব্বহারার দলকেই তাহাদের ন্যায্য অধিকারসমূহ দিতে হইবে।

(৩) গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের স্বাধিকার অর্জ্জনের পথ একটুও অগ্রসরও হয় নাই, বরং ইহাতে ব্রিটিশ শাসনকে দৃঢ়তর করিবার প্রয়াস হইয়াছে যাহাতে ভাবী জাতীয় ও আর্থিক সংগ্রামের প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে ইহা দাঁড়াইতে পারে।

(৪) আন্তর্জাতিক পরিবর্ত্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের আন্দোলন পরিচালিত করিতে হইবে।

(৫) শ্রীযুক্ত অ্যানি এবং গান্ধীজির নির্দ্দেশে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় নাই। ইহা ভাঙ্গিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। কংগ্রেস পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে, কিন্তু সচল নহে।

(৬) গোপনে কাজ করা কোন কোন বিশেষ অবস্থায় প্রয়োজনীয় হইতে পারে, পূর্ব্বে নোটিশ দিয়া সত্যাগ্রহ করা গান্ধীজির ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে' সাধারণের পক্ষে ইহা স্বতঃই হাস্যকর।

পণ্ডিত জওহরলালের বিবৃতির সঙ্গে গান্ধীজির এক বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে দুই একটি বিষয় ছাড়া গান্ধীজি প্রায় সকল বিষয়েই একমত। সাম্প্রদায়িক মিলন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং খদ্দর ও চরকা প্রচলন এই তিনটিকে গান্ধীজি আন্দোলনের অপরিহার্য্য অঙ্গ মনে করেন, কিন্তু পণ্ডিতজি এবিষয়ে নীরব। এক্ষণে বক্তব্য এই, যাহাতে পূর্ণতঃ জনসাধারণের যথার্থ মুক্তি হয় সেইরূপ স্বাধীনতাই ভারতবাসীর কাম্য। এবিষয়ে করাচী কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহা আরো স্পষ্টীকৃত করা আবশ্যক। কৃষক ও শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ও স্বাচ্ছন্দ্য অব্যাহত রাখিতে হইবে, নইলে উহা মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থসিদ্ধির উপায় মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। বিশেষতঃ ধনবিভাগের ন্যায্য ব্যবস্থা আধুনিক বর্দ্ধিষ্ণু আর্থিক সমস্যায় একান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পণ্ডিত জওহরলালের অন্যান্য মত সম্বন্ধেও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই একমত হইবেন। তারপর কংগ্রেস-সংঘগুলি যে বস্তুতঃ পুনরায় জীয়াইয়া তুলিবার আশার বাণী পণ্ডিতজি শুনাইয়াছেন, তাহা অত্যন্ত বিচক্ষণ ও কার্য্যকরী পন্থা। এবিষয়ে পূর্ব্বেও আমরা লিখিয়াছি। কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া জাতিকে স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে। কিন্তু কার্য্যকরী কর্ম্মধারা সম্বন্ধে এখনও কেহই কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপ্রণালী দেন নাই। বোধ হয়, এইজন্যই গান্ধীজি নিজে একবছরের জন্য নিষ্ক্রিয়ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। ইহা সমীচীন হইয়াছে। জাতির শক্তিকে পুনর্ব্বার যাহাতে বিন্দুমাত্র অপচয় না করিয়া

সম্পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রযোজিত করা যায়, সেই বিষয়েই এক্ষণে যথেষ্ট চিন্তার দরকার। এই সাময়িক বিরতি পরিণামে ক্ষতিকর হইবে না। যাহাতে সর্ব্বপ্রদেশের সর্ব্বশ্রেণীর মত ও প্রতিনিধি লইয়া কংগ্রেসের সাধারণ সভায় একটি সুচিন্তিত ও সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী গঠিত হয়, তাহাই এক্ষণে সর্ব্বপ্রধান করণীয় হইবে।

জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারি কমিটিতে ভারত-নারীর সাক্ষ্য

জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারি কমিটিতে ভারতের নারী প্রতিনিধিরূপে শ্রীযুক্তা ডাঃ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি, মিসেস হামিদ আলি ও রাজকুমারী অমৃত কাউর বিলাতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা লিখিয়াছেন যে উক্ত কমিটী ও ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলিতে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিবার কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই এবং তাঁহারা কমিটিতে সেরূপ সহানুভূতি ও সহায়তা পান নাই।

ভারতনারীর পক্ষ হইতে রাজকুমারী অমৃত কাউর, মিসেস হামিদ ও ডাক্তার মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি জয়েণ্ট কমিটিতে যেরূপ সাহস ও দৃঢ়তার সহিত সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহা শুনিয়া আমরা গর্ব্ব অনুভব করি। চারিদিকের সাম্প্রদায়িক দাবী-দাওয়ার গোলমালের ভিতর মহিলারাই কেবল তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক-কলঙ্ক-মুক্ত মূলদাবীটির প্রতি স্থির ও একনিষ্ঠ ছিলেন।

বর্ত্তমান নারী আন্দোলনের বিশেষত্ব ইহাই যে, ইহা সাহস ও সাধু উদ্দেশ্য লইয়া যথাযথভাবে যথার্থ ভারতীয় আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতেছেন। এই তিন জন মহিলার উপর যে কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছিল তাঁহারা সম্পূর্ণ তাহার উপযুক্ত। তাঁহারা নারী-আন্দোলনের মর্য্যাদা ও সম্মান রক্ষা করিয়াছেন আমরা তাঁহাদের কার্য্যের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

যে দাবী স্পষ্ট, দৃঢ় ও ঐক্যভাবে করা হয় তাহা যদি সরকারী মহলে অবজ্ঞাত হয়, তবে তাহাদের কাজই সমালোচনা যোগ্য। যাহাদের হাতে ক্ষমতা তাঁহাদের কথা ও কাজের ভিতর কোনই সামঞ্জস্য দেখা যায় না। যেন মনে হয় হৃদয় ও মস্তিষ্ক সমান ভাবে চলিতে অক্ষম অর্থাৎ বুদ্ধি যাহা করা উচিত মনে করে, অনুদার সঙ্কীর্ণ অন্তর তাহা কাজে পরিণত করিতে পিছাইয়া যায়। ইহার প্রকৃত ফল এই দাঁড়ায় যে আমাদের আদর্শের সহিত তাহাদের মৌখিক সহানুভূতির ও সম্মতির কথা অনেক শুনি, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাহার পরিচয় অতি সামান্যই দেখি।

যাহা হউক, সত্যের প্রতিষ্ঠা একদিন নিশ্চয় হইবে অন্তরে এই দৃঢ় বিশ্বাস ও উৎসাহ লইয়া আমরা চলিতেই থাকিব। লক্ষ্য স্থানে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের এ চলার শেষ হইবে না।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে ভারতবর্ষে আসিতে দেওয়া হইবে না

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত ভূপৎসিং এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মিত্রের প্রশ্নোত্তরে হেগ সাহেব জানাইয়াছেন যে, ভারতসচিব শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে আসিতে দিতে রাজী নহেন। শৈলেনবাবু এদেশের আইন-কানুন হুবহু মানিয়া চলিবেন এবং এমন কি যদি শাস্তি দেওয়া হয় তজ্জন্যও প্রস্তুত আছেন, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্রের একথার জবাবে শুধু এই উত্তরই হইল—ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট সে সুবিধাও দিতে অরাজী।

. সুতরাং নির্ব্বাসনেই আয়ু শেষ করিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লওয়া ছাড়া হতভাগ্য ঘোষ মহাশয়ের উপায়ান্তর নাই। বর্ত্তমানে ভারতগবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারিতার চরম পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মানবোচিত ব্যবহার আশা করা কোন ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। কৃপাভিক্ষা নয়, ন্যায়ের দাবীই ভারতবাসীর চাহিদা ছিল।

মেদিনীপুর হত্যার পরে

মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্জের হত্যার পরে সহরময় যে খানাতল্লাসীর অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে শুধু উৎপীড়িত ও উপদ্রুতের নয়, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এক বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। বোধ হয় সেই খানাতল্লাসীর আনুষঙ্গিক অত্যাচার এবং সাধারণের মনের আতঙ্ক কথঞ্চিৎ দূর করিবার মানসেই তত্রত্য বিভাগীয় কমিশনর এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে যে সকল অত্যাচারের বৃত্তান্ত ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে, সেই সকল অত্যাচারের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা শ্রীযুক্ত জে. সি. গুপ্ত মহাশয়ের বিবৃতিতে সমগ্র ব্যাপারটি স্পষ্টীকৃত ও যথাযথভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। পড়িয়া নিরুপদ্রব দেশবাসী বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়াছে। বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয়পাদে কোন সভ্যদেশে খানাতল্লাসীর নামে এরূপ অমানুষিক ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহা আমাদের কল্পনার অতীত।

এই সকল ঘটনা আলোচনা করা পত্রিকা-সম্পাদকদের পক্ষে কিরূপ সঙ্কটময় তাহা 'প্রবাসী'র প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন এবং ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"সংবাদপত্র সম্পাদকের উভয় সঙ্কট। তাঁহারা সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসকদের নিন্দা করিলে কপটতার অভিযোগে অভিযুক্ত হন, না করিলে সন্ত্রাসকদের উৎসাহদাতা—ন্যূনকল্পে প্রশ্রয়দাতা বিবেচিত হন।"

সম্প্রতি ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের হোম মেম্বার হেগ সাহেব অহিংসার মূর্ত্তবিগ্রহ গান্ধীজিকে পর্য্যন্ত সন্ত্রাসকদের পরোক্ষ সহায়কারী বলিয়া বর্ণিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সুতরাং অন্যে পরে কা কথা?

মিঃ বার্জের হত্যা উপলক্ষে গান্ধীজি লিখিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টকৃত অন্যায়ের ফলে এ সকল অপরাধের সৃষ্টি। কথাটা কি একেবারে মিথ্যা? তারপর দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিরপেক্ষ সংবাদপত্র অমৃতবাজার পত্রিকা এই ঘটনা উপলক্ষে উক্ত মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য। উহাতে লিখিত হইয়াছে—"If the terrorist commits an outrage it is not for the pleasure of it. He does it because he feels in his heart a grievance, fancied or real, against the Government...... If there is terrorism in the country to-day it is because there is cause for discontent real or imaginary in the land."

অথচ দেশবাসীর মনে যে মূলীভূত অসন্তোষ রহিয়াছে তাহা দূরীকরণের কোন প্রয়াসই গবর্ণমেণ্ট করিতেছেন না।

শুধু দমন-নীতির দ্বারা দেশবাসীর মনের মুক্তিসঙ্কল্প সাময়িকভাবে দমিত হইতে পারে হয়ত, কিন্তু তাহাতে স্থায়ী শান্তি আসিতে পারে না। কংগ্রেসকে দমিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট দেশে একটা নির্জীবতা আনিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতে শান্তি আসে নাই। নির্জীবতা ও শান্তি এক নয়। কাজেই অসন্তোষ তীব্রতরই হইতেছে—রাষ্ট্রিক এবং আর্থিক দুই-ই। অতএব দমননীতির শেষফল শুভ হইতে পারে না—না শাসকের না শাসিতের কাহারো পক্ষেই।

দেশবাসী পুনঃ পুনঃ এই কথাই চীৎকার করিয়া আসিতেছেন, এই অসন্তোষের মূলীভূত কারণ দূর করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন কর। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। বরং তাহারা দিন দিনই

অধিকতর কঠোর হইতেছেন। গান্ধীজির সঙ্গে মীমাংসা ব্যাপারে এবং অধুনা হেগ্ সাহেবের নানা বক্তৃতায় আমরা গবর্ণমেন্টের একগুঁয়ে মনোবৃত্তির সম্যক পরিচয় পাই। বাড়াবাড়ি কোনক্ষেত্রেই সমীচীন নয়। গবর্ণমেন্ট বিপুল জনমত উপেক্ষা করিয়া ভাল করিতেছেন না।

স্বদেশী প্রদর্শনী

মাসাধিক হইল কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বিরাট প্রাঙ্গণে স্বদেশী প্রদর্শনী চলিতেছে। নানাপ্রকার স্বদেশজাত দ্রব্যে এই প্রদর্শনী পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বস্ত্র ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটখাট প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সকলই যে আজকাল দেশের ভিতরে উৎপন্ন হইতেছে ইহা সুখের ও সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। সে সকল একত্রিত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়া প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ ধন্যবাদের যোগ্য হইয়াছেন। নানা আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা, নূতন ও অভিনব সামগ্রী এবং প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালের সৃষ্টিও তাঁহারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রভৃতি নানাপ্রকার জ্ঞাতব্য বিষয়ও তাঁহারা চিত্র যোগে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রদর্শনীটী সুষ্ঠু ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।

মেদিনীপুরে বন্যা

মেদিনীপুর অঞ্চলে ভীষণ বন্যার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই বন্যার প্রকোপে মানুষ ও পশুর দুরবস্থা চরমে উঠিয়াছে। মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথি মহকুমা দ্বিতীয়বার বন্যার কবলে পড়িয়াছে। গ্রামের সমস্ত রাস্তা এবং জেলা বোর্ডের রাস্তাও জলের নিম্নে ডুবিয়াছে। মেদিনীপুরের বন্যা-পীড়িত অঞ্চলের অবস্থা দেখিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চন্দ যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

'সাতদিন ব্যাপী অবিরাম পরিশ্রম করিয়া পটাশপুর ও ভগবানপুরের বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছি। অনেকস্থানে দেখিয়াছি মানুষ ও গরু একত্রে জীর্ণ ভগ্ন বাটীর এককোণে কোন প্রকারে কাল যাপন করিতেছে, দেখিলাম স্ত্রীলোকেরা লজ্জা নিবারণের উপযোগী বস্ত্রের অভাবে গৃহের ভিতর লুকাইয়াছে। মানুষ শাক পাতা প্রভৃতি খাইয়া কোনপ্রকারে বাঁচিয়া আছে, ইত্যাদি এইরূপ বহু মর্ম্মান্তিক দৃশ্য চোখে পড়িয়াছে।"

এই সকল বিবরণ পড়িয়া 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' কথা মনে হয়। মেদিনীপুর অঞ্চলের এই দুরবস্থার আশু প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। উড়িষ্যা অঞ্চলও এইরূপ বন্যা-বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশনের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এরূপ ক্ষুদ্রভাবে ইহার প্রতিকার সম্ভবপর নয়, আমরা গভর্ণমেন্টের ও জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

বাঙ্গলায় প্রথম চিনির কল

গত ৪ঠা আশ্বিন তারিখে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ঢাকা জেলার চরসিন্দুর গ্রামে দেশবন্ধু সুগার মিলের উদ্বোধন করেন। ইহাই বাঙ্গলায় প্রথম চিনির কল। বাঙ্গলা দেশে এই ব্যবসায়ের এই প্রথম উদ্যম, ইতিপূর্ব্বে আর কোন বাঙালী এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন নাই। আরও সুখের বিষয় যে, এই প্রতিষ্ঠানটী সর্ব্বতোভাবে বাঙালীর দ্বারা পরিচালিত।

বাঙ্গলার আর্থিক সমস্যার সমাধান করিতে হইলে স্থানীয় শিল্পসমূহের উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন কিন্তু বাঙ্গালী চিরদিনই ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে পিছাইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তাহার আর্থিক অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। দেশের এই দুর্দ্দিন দূর করিতে হইলে নানাপ্রকার ব্যবসা বাণিজ্য করিতে হইবে, বাঙ্গলার বিভিন্ন জায়গায় কারখানা স্থাপন করা প্রয়োজন। সুতরাং বাঙ্গালীর যে আজ এই দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে তাহা সুখের বিষয়।

এই চিনির কলের উদ্বোধন সভায় আচার্য্য রায় বলেন যে, গত বৎসর শর্করা সংরক্ষণকল্পে গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে যে সকল সুবিধা দেন, তাহাতে এই ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আর্থিক অসুবিধার সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে। কেবল বাঙ্গলা দেশ ব্যতীত যুক্ত প্রদেশ ও বিহার প্রভৃতি ইক্ষু চাষের উপযোগী দেশের ধনিগণ এই সংরক্ষণ-নীতির পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রচুর অর্থ শর্করা উৎপাদনের জন্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। উল্লিখিত শুল্ক-নীতির পরিবর্ত্তনের কালে ভারতবর্ষে ২৪টী চিনি কল ছিল, কিন্তু নূতন শুল্কনীতির পরিবর্ত্তনের পরে ঐ সংখ্যা ৩৩টীতে দাঁড়াইয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও ২৭টী চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে। আগামী বৎসর নূতন ৩৬টী কলের জন্য বিদেশে অর্ডার প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সংরক্ষণ-নীতির প্রবর্ত্তিত হইবার পর দেড় বৎসর অতীত হইতে চলিল, অথচ এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিচালিত একটীও চিনির কলও স্থাপিত হয় নাই।

বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীদের ভবিষ্যৎ কি?

আজ প্রায় চার বৎসর হইতে চলিল, বাংলার প্রায় দুই সহস্র যুবক ও যুবতীকে বিনা-বিচারে বিশেষ অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তন করিয়া অবরুদ্ধ রাখা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরো কতিপয় ব্যক্তি ৩ রেগুলেশন অনুসারে ভারতের দূরতম প্রান্তের বহির্বঙ্গের জেলসমূহে আবদ্ধ আছেন। যাহারা অর্ডিনান্সে আবদ্ধ আছেন তাহারা বাংলার বিভিন্ন জেলে, চারিটি বন্দীনিবাসে এবং রাজপুতনার অন্তর্গত দেওলীদুর্গে অবরুদ্ধ আছেন। ইদানীং বাংলার জেল ও বন্দীনিবাস হইতে দলে দলে বন্দীদিগকে সুদূর দেওলী দুর্গে পাঠান হইতেছে। শেষ সংবাদে জানা যায়, দেওলী দুর্গে বর্ত্তমানে ২৫০ শত রাজবন্দী অবস্থান করিতেছেন। এই হতভাগ্য যুবক ও যুবতীগণ যাহারা স্বাস্থ্য, শক্তি, সম্পদ্, পারিবারিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য, জীবনের উপজীবিকা সমস্ত হারাইয়া একটা অস্বাভাবিক অস্বাস্থ্যকর আবেষ্টনে রুদ্ধ রহিয়াছেন, তাহাদের ভবিষ্যৎ কি? এ প্রশ্ন আজ শুধু বাংলার মা বোনকে নয়, বাংলার জনমতকেও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। এইরূপ সুদীর্ঘকাল এমন অস্বাস্থ্যকর ও অস্বাভাবিক দিনযাত্রা এই তরুণ জীবনগুলিকে যে একেবারে অপদার্থ করিয়া তুলিবে, তাহা ভাবিয়া জাতির মন স্বতঃই শঙ্কিত হইয়া উঠে। আরো কিছুকাল এইরূপ অবরুদ্ধ রহিলে ইহাদের পরিণাম যেরূপ ভয়াবহ হইবে তাহাতে এই আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক বলা চলে না। মানসিক অশান্তি, শারীরিক নির্য্যাতন তদুপরি উৎকট দুরারোগ্য ব্যাধি—ইহাতে জীবনের শেষ রক্তবিন্দুটুকুও ক্ষরিত হইবে। এই যৌবন-ভরা প্রাণগুলি সমাজের ভারস্বরূপ হইবে মাত্র, সমাজকে পুষ্ট ও ঋদ্ধ করিবার সামর্থ্য তাহাদের চিরতরে লুপ্ত হইবে।

আমরা বারবার বলিয়াছি, ইঁহাদের এক্ষণে মুক্তি দেওয়া শুধু মানবোচিত ব্যবহার নয়, রাজনৈতিক কর্ত্তব্যও বটে। দেশের এই শান্ত অবস্থায়ও যদি ইঁহারা মুক্তি না পায়, সমবেত জনমত যদি এখনও অগ্রাহ্য

হয়, তবে বলিব, ইহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সত্য বটে, মেদিনীপুরে আবার ম্যাজিষ্ট্রেট্ হত্যা হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ একক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনাই কি জাতীয় মনের ব্যারোমিটর? আর ইহাই কি গবর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, দেশের কোথাও কোনপ্রকার বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য থাকিবে না? ইহা কি সম্ভব? কোন সুসভ্য দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করিয়া দেখুন, ভারতবর্ষ আজি যেরূপ শান্ত, পৃথিবীর কোন সভ্যদেশ এতটা নির্জ্জীবতা প্রাপ্ত হয় নাই। এই কথাই সেদিন বিলাতের ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানও লিখিয়াছেন। পৃথিবীর সমগ্র মানুষের অন্তরের উন্নতি ও বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত চৌর্য্য, দস্যুতা, পরপীড়ন, লুণ্ঠন, পররাজ্যলিপ্সা, প্রভৃতি কিছুতেই লোপ পাইতে পারে না, সেইরূপ সন্ত্রাসবাদ বল, জাতীয় আন্দোলন বল বা বিপ্লববাদ বা সাম্যবাদ যাহাই বলনা কেন, উহাদের মূলীভূত কারণ পৃথিবী হইতে বিদূরিত না হইলে উহারাও কদাপি লুপ্ত বা রূপান্তরিত হইবে না—ধিকি ধিকি সমাজের বক্ষে জ্বলিতেই থাকিবে ধূমায়িত বহ্নির ন্যায়।

শুধু লক্ষ্য রাখিতে হইবে উহার প্রসারতা বা ক্ষীয়মানতার ওপর এবং সেই মানদণ্ডই আমাদিকে সমস্যার সমাধানে সহায়তা করিবে। সুতরাং এই মতবিশেষ বা কার্য্যবিশেষকে উপলক্ষ্য করিয়া অথবা হেতু সৃষ্টি করিয়া রাজবন্দীদিগকে মুক্তি না দেওয়া, তাহাদিগকে সুদূর দেওলী দুর্গে প্রেরণ করা, অথবা বাংলা-দেশের ভাবী শাসন-ব্যবস্থার সঙ্কোচন করা শুধু অন্যায় নয়, অদূরদর্শিতারও পরিচায়ক। ফাঁকা যুক্তিতে গবর্ণমেণ্ট জাতির সচেতন মনকে ভ্রান্ত করিতে পারিবে না। রাজবন্দীদের মুক্তি—দেশবাসীর করুণা ভিক্ষা নয়, ন্যায্যতার দাবী।

কংগ্রেসের নূতন কর্ম্মপদ্ধতি কি রূপ নিবে?

চল্লিশ বৎসরের তপস্যার মূর্ত্ত প্রতীক জাতীয় কংগ্রেস—গান্ধীজি তাহাকেই ছিন্ন করিলেন স্বহস্তে। পণ্ডিত জওহরলাল জোর গলায় উহার অমরত্ব ঘোষণা করিয়াও উহাকে আর জীয়াইয়া তুলিতে পারিলেন না। তাই আজ প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেসের নূতন দল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। বোম্বাই ও মাদ্রাজে নব দলের সংবাদ পাইয়াছি। বাংলা তো গোড়া থেকেই গান্ধী-বিরোধী। ক্ষুব্ধ বাংলার সে ভাব বর্ত্তমানে অতি তীব্র।

কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ম্মপদ্ধতি অর্থাৎ গান্ধীজির ব্যক্তিগত আইন-অমান্য দেশবাসী গ্রহণ করে নাই। অথচ অন্য কোন কর্ম্মপদ্ধতিও দেশের সম্মুখে কেহ উপস্থাপিত করেন নাই। সকলেই কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ম্মপদ্ধতির নিন্দায় পঞ্চমুখ, কিন্তু নিন্দাবাদ ছাড়িয়া অস্তিত্বমূলক কোন কার্য্যধারা কেহ দিতে পারিতেছেন না। তাহার কারণও দূরবর্ত্তী নয়। বর্ত্তমানে অধিকাংশ নেতা কারারুদ্ধ। এবং এই দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ গান্ধীজির আওতায় থাকিয়া অনেকের স্বাধীন চিন্তাবৃত্তিও হ্রাস পাওয়া অসম্ভব নয়। কারণ যাহাই হোক্, এক্ষণে এই ত্রিশঙ্কুর অবস্থা দূর করিতে না পারিলে জাতীয় জীবন বিষম ক্লিষ্ট ও পীড়িত হইতেই থাকিবে। সুতরাং এ বিষয়ে অবিলম্বে সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যকরী কর্ম্মপদ্ধতির প্রবর্ত্তন অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এই কর্ম্মপদ্ধতি-রচকদের একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, প্রোগ্রামটি যেন প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্ম্মপদ্ধতিই হয়। সামাজিক, আধ্যাত্মিক, জনহিতকর কার্য্য করিবার লোক দেশে ঢের আছে, কিন্তু রাজনৈতিক কার্য্য করিবার সাহস ও সক্ষমতা কম লোকেই মিলে।

ভাবী কর্ম্মপদ্ধতি আলোচনা কালে আমরা তিনটি বিষয়ের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলি :—

১। মজুর ও কৃষক আন্দোলন।

ভাবী-ভারত যে সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তির ওপরে গড়িয়া উঠিবে এ বিষয়ে রাজনৈতিক চিন্তাশীল বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই একমত হইবেন। ইহা কি সাম্যবাদের রূপই নিবে কিম্বা অন্য কোন রূপ নিবে, সে বিষয়ে কিছু হলফ করিয়া বলা চলে না। তবে নিপীড়িত জনগণের ওপর বহু শতাব্দী ধরিয়া এই যে বিপুল শোষণ চলিয়াছে, তাহা রোধ করিয়া সবল সক্ষম ও শক্তিপূর্ণ জাতি গড়িতে হইলে, ইহা ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা আজও জগতে দেখা দেয় নাই। সুতরাং শ্রমিক ও কৃষকদিগের মধ্যে রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক প্রচারকার্য্য ও সংগঠন কার্য্য জোরে চালানো একান্তই আবশ্যক। এ নিমিত্ত শিল্প ব্যবসা জমি প্রভৃতির মৌলিক অধিকার শ্রমিক-কৃষককে দিতেই হইবে। অনেকে এ সমস্যায় এই কারণে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন যে, দেশের ধনিক, বণিক ও জমিদার বা রাজা-মহারাজাদিগকে তাহা হইলে জাতীয় আন্দোলন হইতে বিচ্যুত করা হয় এবং তাহারাও জাতীয় আন্দোলনের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং জাতিকে একদিকে ইংরেজ গবর্ণমেন্ট, অপরদিকে ধনিক-বণিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়। কাজেই ইহাতে অযথা শক্তি ক্ষয় হইবে মাত্র। যাহারা এই প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহারা যদি একটু গভীর ভাবে তলাইয়া দেখেন তবে দেখিবেন, জাতির এই পরিবর্ত্তনময় আন্দোলন যখন যথার্থই দেশের সর্ব্বসাধারণের মুক্তি-আন্দোলন হইয়া ওঠে, তখন এই মুষ্টিমেয় বিশেষ স্বত্বস্বামিত্বশালী ব্যক্তিগণ কখনও উহাতে যোগদান করিবে না। তাহারা প্রচলিত শাসকবর্গের সঙ্গে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং তাহাদের সঙ্গেই যুক্ত রহিবে। সুতরাং সংগ্রামে দুই দলই থাকিবে একটি, শ্রমিক কৃষক বহুল বিরাট্ জনসমষ্টি, অপরটি বিদেশী গবর্ণমেন্ট ও তাহাদের সহায়ক ভারতীয় বিশেষ স্বত্বস্বামিত্ববান্ (privileged classes) ব্যক্তিবর্গ।

বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনকে নিষ্কলুষ করিয়া ইহার অবসাদ দূর করিতে হইলে, ইহাকে সবল, সজীব ও বহুব্যাপক করিতে হইলে, ইহার গতিপথ যথার্থতঃ পূর্ণ স্বাধীনতার অভিমুখী রাখিতে হইলে, জন আন্দোলন একান্ত অপরিহার্য্য।

২। শাসন-পরিষদে প্রবেশ।

আগামী শাসন পরিষদ সমূহ এবং দেশের সমস্ত স্বায়ত্ব শাসন মূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় দলের হস্তগত করা আবশ্যক। ভিতরে এবং বাহিরে সর্ব্ববিধ উপায়ে গবর্ণমেণ্টকে প্রতিবন্ধক প্রদান করা জাতীয় দলের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, জাতির অনেকখানি শক্তি ও দৃষ্টি যেন ইহাতে ব্যয়িত না হয়।

৩। বয়কট বা বর্জ্জন আন্দোলন।

ইহা শুধু অর্থনৈতিক নয়, ইহা শক্তিশালী রাজনৈতিক অস্ত্র। ইহাকে ব্যাপক এবং সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করিতে হইবে যাহাতে বিদেশের এক পাই জিনিষও এদেশের বাজারে না ঢুকিতে পায়।

আমরা অতি সংক্ষেপে ভাবী কর্ম্মপদ্ধতির প্রধান বিষয়ের কাঠামোটি মাত্র দাঁড় করিলাম। জাতির সম্মিলিত প্রতিনিধিগণ এ বিষয়গুলির উপর বিশেষ চিন্তা দিবেন। জাতির জীবনে এই সাময়িক অবসাদে আমরা আশাহীন মোটেই নই। ভাবী-ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে জ্বলন্ত রহিয়াছে—আজি হোক্ কালি হোক্ সে-দিন আসিবেই।

অন্তরীনের রাজবন্দীদের দুর্দ্দশা

সাধারণতঃ অল্পবয়স্ক ছেলেদিগকে কিছু কিছু বর্ত্তমানে স্বগ্রাম বা অন্য কোন দূর পল্লীগ্রামে আবদ্ধ রাখা হইতেছে। স্বগ্রামে বা পিতামাতার কর্ম্মস্থলে ছেলে আবদ্ধ রাখা জেল বা বন্দীনিবাসের চেয়ে ভাল, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল ছেলেকে দূরবর্ত্তী অপরিচিত জেলার পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া জীর্ণ আরণ্যভূমি অথবা লোকালয় বর্জ্জিত সর্পসঙ্কুল দ্বীপভূমিতে নির্ব্বাসিত করিয়া ইহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার কি সার্থকতা? তদুপরি ইহাদের বিরুদ্ধে ইদানীং যে-কয়টি মামলার কথা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে ইহাদের ন্যায্য অভিযোগ গবর্ণমেণ্ট বহু অনুরোধ সত্ত্বেও মিটান নাই! এজন্যই সর্ব্বশেষ বাধ্য হইয়া ইহারা অন্যতর উপায় অবলম্বন করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, রোগের চিকিৎসা হয় নাই, খাওয়া পরার জন্য আর্থিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যথোপযুক্ত হয় নাই, থানায় খবর দিতে হইলে বর্ষাকালে বিশেষভাবে ঢাকা অঞ্চলে নৌকা ব্যতীত গত্যন্তর নাই, সেক্ষেত্রে নৌকাভাড়া দেওয়া হয় নাই, ইত্যাদি কয়েকটী মাত্র উল্লেখ করিলাম।

এইরূপ অবস্থায় সরকারী লালফিতা একটু ঢিলা করিয়া কাজ চালাইলে কাজও ভাল হয়, এই অভাগা যুবকগুলিও রক্ষা পায়। আশা করি, গবর্ণমেণ্ট এই যুবকগুলিকে দূরাদপ্রান্তরে আবদ্ধ না রাখিয়া মাতাপিতার নিকটেই রাখিবেন। বলাবাহুল্য এই স্বাস্থ্যকর ও স্নেহময় আবেষ্টনের ফল ভালই ফলিবে।

মান্দালয় জেলে অনশনে রাজবন্দী

মান্দালয়ে কতিপয় বাঙ্গালী রাজবন্দী দুর্গাপূজায় অনুমতি প্রত্যাখ্যাত হওয়াতে গত ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে অনশন ধর্ম্মঘট অবলম্বন করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মিঃ গঙ্গা সিং এবং মান্দালয়ের ভারতীয় সমিতির প্রেসিডেণ্ট মিঃ আবদুল করিম গত ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেল সুপারিণ্টেণ্ডের নিকট রাজবন্দীদিগকে অনশন ধর্ম্মঘট পরিত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিবার উদ্দেশে আবেদন করেন। তাঁহাদের আবেদনের কোনও উত্তর না আসায় পুনরায় ২৯শে তারিখ আবেদন করেন। কিন্তু ৩০শে তারিখেও উত্তর না পাওয়াতে তাঁহারা ব্রহ্ম সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিবের নিকট টেলিগ্রাম করিয়াছেন। এদিকে অনশনব্রতী রাজবন্দীদিগের কাহারও কাহারও অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন বলিয়া জানা গিয়াছে। মিঃ গঙ্গা সিং প্রভৃতির প্রশ্নে স্বরাষ্ট্র-সচিব যে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে তিনি অনশন ধর্ম্মঘটের কথা অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু প্রকাশ যে ধর্ম্মঘটকারীদিগের সংখ্যা চার, নয় নহে। পূর্ব্বে নয়জন ব্যক্তি ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা গিয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় স্বরাষ্ট্র সচিব মহাশয় সদস্যদিগকে মান্দালয় জেলে প্রবেশ করিয়া বন্দীদিগের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি দেন নাই। তিনি বলেন, ইহাতে কোন উপকার দর্শিবে না, সাক্ষাতের ফলেও ধর্ম্মঘট-কারীরা হয়ত অনশনব্রত ত্যাগ করিবে না। কিন্তু সাক্ষাতের ফলে কি হইবে তাহা আমরা নাই বুঝিলাম, কিন্তু যখন ব্রহ্ম সরকার তাহাদের প্রতি যথাসাধ্য যত্ন দেখাইতেছেন তখন সাক্ষাতে যে কি আপত্তি থাকিতে পারে তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না।

অনশন জেলবাসীর সর্ব্বশেষ অবলম্বন নিরুপায়ের উপায়। তাই অনশনের কথা শুনিলে স্বতঃই মন অজ্ঞাত আশঙ্কায় ভরিয়া ওঠে।

পিঞ্জরাবদ্ধ জীবের প্রতিও মানুষের যে স্বাভাবিক কর্ত্তব্যবোধ, তাহাও আজ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট পাওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই হতভাগাদের মা-বোনেরা এ জন্ম চোখের জল ঢালিয়াই বিদায় নিবে। তাহাতেই বা দুঃখ কি? নবজনমের বেদনা সে তো মায়ের জাতকেই সইতে হইবে সব চেয়ে বেশী।

শিশু পাঠাগার

মানবজাতির কল্যাণ কামনা করিতে হইলে শিশুর শিক্ষাদীক্ষার উপর বিশেষ নজর দেওয়া যে উচিত একথা জগতের সকল সভ্য জাতিই বিশেষভাবে প্রণিধান করিতে পারিয়াছে। সুতরাং তাহাদের শিশুদিগের উন্নতি ও শারীরিক মানসিক বিকাশের জন্য নূতন নূতন পন্থার উদ্ভাবনের বিরাম নাই। কিণ্ডার গার্টেন পদ্ধতি, মণ্টেসরী নীতির কথা সকলেই অবগত আছেন। শিশুদিগের মানসিক বিকাশের জন্য যাহা যাহা দরকার পাঠাগার বা লাইব্রেরী তাহাদের অন্যতম। শিশুদিগের শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্বতন্ত্র পাঠাগার স্থাপন করার প্রয়োজন। কারণ সুকুমারমতি বালকবালিকাগণের মধ্যে যখন পাঠের আকাঙ্খা ও আগ্রহ জন্মে তখন তাহারা অনেক সময়ে পুস্তক নির্ব্বাচনে অক্ষম হইয়া বিপথে চালিত হয়। বড় বড় পাঠাগারে নানাধরণের পুস্তকাদি সংরক্ষিত হয় বটে, কিন্তু বালকবালিকাদিগের সেখানে কোন স্বাধীনতা নাই, পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করার যে সুখ তাহাও তাহারা পায় না। আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার যে ব্যবস্থা ও ক্ষুদ্রায়তন যে সকল পাঠাগার আছে তাহাও বালকবালিকাদিগের উপযোগী নয়। সুতরাং একমাত্র শিশুদিগের জন্যই জনসাধারণের উপযোগী পাঠাগার স্থাপন করা অবশ্য করণীয় কর্ম্ম। সেখানে বালকবালিকাগণ স্বাধীনভাবে যাতায়াত করিয়া পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারিবে। কিন্তু এইরূপ পাঠাগার স্থাপন করিবার সময় একথা মনে রাখিতে হইবে যে এখানকার ব্যবস্থাপ্রণালী সুচারুরূপে সুনির্দ্দিষ্টরূপে চালনা করা প্রয়োজন, নহিলে কাজের আসল উদ্দেশ্যই বিফল হইয়া যাইবে। কাজের সুবিধার জন্য নানা প্রকার বিভাগ করিতে হইবে যাহাতে বালকবালিকাগণকে পুস্তকাদি দিবার সময় কোনরূপ গোলযোগ না উপস্থিত হয়। ভারতবর্ষে বরোদায় এইরূপ একটী শিশু-পাঠাগার আছে, সেখানকার কার্য্যপ্রণালীও অতি সুন্দর। এইরূপ একটী পাঠাগার স্থাপন করিবার ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ সেখানে গিয়া দেখিয়া আসিতেও পারেন।

কিন্তু এইরূপ একটী শিশু পাঠাগার স্থাপন করিতে হইলে দু-একজনের চেষ্টায় কিছু হইবে না, জনসাধারণের সমবেত মিলিত চেষ্টা চাই। সুতরাং আমরা দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। বর্ত্তমানে কয়েকজন ব্যক্তি এ বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদের উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। কলিকাতার কোন কোন অঞ্চলে ছোট ছোট বালক ও বালিকাদের স্বতন্ত্রভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠাগার আছে। এ সকল আশার চিহ্ন সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতির অভাব ইহাতে মিটিবে না। আমরা আরও ব্যাপক ও সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালীসম্মত ভাবে শিশু-পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা দেখিতে চাই।

পরলোকে ডাঃ অ্যানি বেশান্ত

ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি ডাঃ অ্যানি বেশান্তের পরলোক গমনে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি। তিনিই প্রথম বিদেশী রমণী যিনি ভারতের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য প্রভূত চেষ্টা করেন এবং তিনি সমস্ত জীবন ভারতের রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাজ করিয়াছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক অভ্যুদয়ে তাঁহার দানকে আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। স্বায়ত্বশাসনের ইচ্ছাকে তিনি জীবন্ত আকার ধারণ করান এবং সুরাট কংগ্রেসে গৃহবিচ্ছেদের পর লোকমান্য তিলক ও মহামতি গোখেলের দলকে কংগ্রেসের পতাকাতলে একত্রিত করেন।

কেবল যে রাজনৈতিক অবস্থার তিনি উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন তাহা নহে। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁহার কার্য্যে দেশের শিক্ষা বিস্তারে প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে। তিনি থিয়োসপি বা পরলোক সম্বন্ধীয় তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলে থিয়োসফিকাল সোসাইটী গঠিত হইয়াছিল। পৃথিবীর সর্ব্বত্র তিনি ভারতীয় থিয়োসফি ও ভারতীয় সংস্কৃতির বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন। তিনি অতুলনীয় বাগ্মিতার অধিকারিণী ছিলেন, এবং তাঁহার রচনা ও বক্তৃতাগুলি আমাদের নিকট আদরণীয়। জ্ঞানে ও কর্ম্মে তিনি যেমন মহীয়সী ছিলেন, হৃদয়ের উদারতার দিক হইতেও কৃপণ ছিলেন না। সম্প্রতি তাঁহার যে উইল বাহির হইয়াছে তাহাতে তিনি তাঁহার ভৃত্যাদিগকেও বিস্মৃত হন নাই তাহাদিগের যাবজ্জীবন বেতন দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে সকল ভারতীয় ছাত্র তাঁহার অর্থসাহায্য পাইতেছিল পাঠ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত যথারীতি সে সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছেন। এ সকল তাঁহার হৃদয়ের প্রসারতার পরিচয় দেয়। ভারতবর্ষের মনীষীরা একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি আইরিশ মহিলা ছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি মনে করিয়া তাহার সেবা করিয়াছেন। সুতরাং এই বিদেশিনী আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার যোগ্য।

সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজা

বাঙ্গলার সর্ব্বত্র সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব হইয়াছিল কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি বড় বড় সহরে এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামেও জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে মায়ের পূজা নির্ব্বাহ করিয়াছিল। বাঙালীর এই প্রচেষ্টা যে প্রশংসনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মের ক্ষেত্রে ভারতবাসীগণ কোনও দিন বিরোধ বাধায় নাই, তাহাদের উদার ধর্ম্মমতের মধ্য সকল জাতিই আশ্রয় লাভ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের ভিতরেও জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলে আপন স্থান অধিকার করিয়াছিল, সংঘর্ষ বাধে নাই। হিন্দু ভূস্বামীর পূজাপার্ব্বণে হিন্দু মুসলমান উভয়েই একত্রিত হইত সুতরাং যে বিরোধ জাগিয়াছিল তাহা সাময়িক। সুতরাং তাহা দূর করিবার জন্য উচ্চ নীচ, হিন্দু মুসলমান, নমঃশূদ্র, ডোম, হাড়ি, মুচি সকলের মিলনের জন্য এই প্রচেষ্টাকে আমরা ধন্যবাদ না দিয়া পারি না। মায়ের মহামন্দিরতলে ভারতীয়গণ একত্রিত হইবে, মায়ের প্রাঙ্গনেই আমাদের মিলন-ক্ষেত্র।

কবি কামিনী রায়

বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গলার প্রথম মহিলা কবি শ্রদ্ধেয়া কামিনী রায় মহাষ্টমীর দিন পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে সম্পন্ন হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার ঊনসপ্ততি বৎসর হইয়াছিল। সুতরাং একপ্রকার পরিণত বয়সেই তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গলা সাহিত্য একজন নিষ্ঠাবতী বিদুষী হারাইল।

স্বর্গীয়া কামিনী রায়

প্রদীপ্ত সূর্য্যের আলোর পার্শ্বে চন্দ্রের শুভ্র জ্যোৎস্না অত্যন্ত ম্লান দেখায়, তেমনি এ যুগের রবীন্দ্র কবি-প্রতিভার নিকট অপর কবিদিগের প্রতিভা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। তথাপি 'আলো ছায়া' রচয়িত্রীকে আমরা সহজে ভুলিতে পারি না। রবীন্দ্র প্রভাবান্বিত যুগে রবীন্দ্রের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তিনি যে স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়াছেন তাহা উপেক্ষার বস্তু নয়। তাঁহার কবিতাগুলির ভিতরে প্রাণের স্পন্দন অতি স্পষ্ট ও পরিস্ফুট। তিনি যেন সহজ সরল সুরে আপনার হৃদয়ের বাণী আপনি গাহিয়াছেন—একটা করুণ মর্ম্মস্পর্শী সুর হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রবেশ করিয়া নিবিড় রসের সৃষ্টি করে। ইহাই তাঁহার কাব্যের বিশেষত্ব। বর্ত্তমান যুগে আমরা অনেকেই হয়ত কামিনী রায়ের কবিতার সহিত পরিচিত নই কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্য যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন বাঙ্গালা সাহিত্যে কামিনী রায়ের কবিতা একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনসেনের যুগে কামিনী রায়ের কবিতাও লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিত। আজও "সকলের তরে প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে," ও "যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন" ইত্যাদি কবিতা শুনিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ তাঁহার 'আলো ও ছায়া' বাঙ্গলা সাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থ। ইহা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

শ্রদ্ধেয়া কামিনী রায় সে যুগের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্বনামখ্যাত চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা ও কেদারনাথ রায়ের পত্নী ছিলেন। পিতার সাহিত্যিক প্রতিভা ও দেশপ্রেম যে উত্তরাধিকার সূত্রে কন্যাতেও বর্ত্তিয়াছিল তাহা তাঁহার কবিতা পাঠেই বোঝা যায়।

সংশোধন

আশ্বিনমাসে প্রকাশিত 'উদ্বোধন' কবিতাটি শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী রচিত। ভ্রমক্রমে শ্রীরুচিরা দেবী-প্রণীত লেখা হইয়াছিল।

Printed & Published by Bibhabati Sen, 23 Wyer Street, Wari, from Wari Printing Works, Dacca.

হাটের পথে

শ্রীকিরণবালা সেন

তৃতীয় বর্ষ	অগ্রহায়ণ, ১৩৪০	অষ্টম সংখ্যা

পথের পাঁচালী ও অপরাজিত

শ্রীআশা দেবী

৫

পথের পাঁচালীতে অপুর ছেলেবেলাকার আরও যে একটি সঙ্গীর কথা এতক্ষণে তুলিনি সেই তার বোন দুর্গার চরিত্র পথের পাঁচালীর সর্ব্বোত্তম বিস্ময়। যতদিন দুর্গা বেঁচেছিল ততদিন অপুর সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য বন্ধন। এই দু'টি ভাই বোনে সর্ব্বত্র বিহার করে বেড়িয়েচে। কিন্তু দু'জনের স্বভাবে খুব বড় রকম একটা প্রভেদ। দু'জনেই দরিদ্র বিত্তহীনের ঘরের ছেলে মেয়ে। কিন্তু সকল দারিদ্র্য সকল দুঃখ দুর্গতি সত্ত্বেও অপূর্ব্বর চরিত্রের একটা মহান আদর্শ, বিপুল লক্ষ্য আছে। দারিদ্র্যই তার বিরতি নয়। সেখানেই সে থেমে যায় নি। তার বাইরের আশ্রয়হীনতা ধনহীনতাকে ছাপিয়েও তার জীবনে যেমন একটি সৃষ্টির সুর বেজেচে,—যে সুর তাকে সঞ্চয়, বিত্ত, নিরাপদনীড় এক কথায় সব ছাড়িয়ে বহুদূর পথে টেনে নিয়ে চলল সে সুর দুর্গার জীবনে বাজেনি।

দুর্গা বড় দুঃখী। তার আশা ছোট। সিঁদুরমুখীতলার একটা বড় আম, একটা বড় রকম মেটে আলু, পুতুলের একটা পুঁতির মালা পেলেই তার আহ্লাদের সীমা থাকে না। তার মধ্যে সর্ব্বদাই একটা করুণ আকিঞ্চন ভাব। কিন্তু দরিদ্র বোনের দরিদ্র ভাই হলেও অপুর ত

এভাব নেই। অপুর মধ্যে আছে সঞ্চয়ের প্রতি উপেক্ষা, নব নব সম্ভাবনার দিকে অপরিসীম ঔৎসুক্য। আমাদের মনে হয় দুর্গা যদি অপুর ভাই হোত তার মাঝেও আমরা এমনি সুর খুঁজে পেতাম। তখন অপুর মত তার মাঝেও হয়ত সৃষ্টির নেশা জেগে উঠত, হয়ত তাকে দেখেও মনে হতে পারত দারিদ্র্যের উপরে সে অবলীলা ক্রমে ফুলটির মত ভেসে রয়েচে, যার প্রত্যেকটি দল আকাশের নিঃসীম বিস্তারের দিকে চেয়ে উন্মনা।

কিন্তু দুর্গা মেয়ে, মেয়েতে সৃষ্টিকে সংশয়ের চোখে দেখে। স্বভাবতঃই তার আকর্ষণ সঞ্চয়ের দিকে। নিশ্চিন্দিপুরের বিশাল অরণ্য প্রকৃতি অপুর মত তাকেও হাতছানি দিয়ে ডেকে ক্ষণে ক্ষণে উতলা কর্‌লেও সে যেন কেমন অন্যমনস্ক। অপুর মত দ্বিধাহীন আগ্রহে সে তাতেই ডুবে যেতে পারচে না। চিত্তের যা কিছু বাধাবন্ধন খুলে ফেলে দিয়ে সর্ব্বস্ব দিয়ে সে আহ্বানের প্রত্যুত্তর দেওয়া তার সাধ্যাতীত। তাই তার ঐশ্বর্য্যশালিনী নারী প্রকৃতির স্নেহনীড় বন্ধনের দাবীর সঙ্গে এই উদাস করা পথের আহ্বান মাঝে মাঝে এসে মেশে কিন্তু মেলেনা। এইজন্যে দুর্গাকে দেখ্‌লেই মনে হয় তার জীবনে, নিজের সঙ্গে বোঝা পড়ার পালা সর্ব্বদাই চল্‌চে। সর্ব্বদাই তার কেমন সদা সচকিত, অপরাধীর মত সন্ত্রস্ত ভাব। রুক্ষ চুল মুখের উপর উড়ে এসে পড়্‌চে, ঝড়ের হাওয়ায় ময়লা কাপড়ের অঞ্চলপ্রান্ত উড়িয়ে নিয়ে যাচ্চে, শীর্ণ মলিন হাতে দুগাছা কাঁচের চুড়ি। সে পথে পথে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। নিজের মনের মধ্যে কী যেন সে তলিয়ে দেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌চে, পারচেনা। অন্ধ, অব্যক্ত একটা বোঝাপড়ার ভাব তার প্রতি পদক্ষেপে ফুটে বাহির হচ্চে। ঘরেও সে একদণ্ড থাকতে পারেনা, পাঁচজন লক্ষ্মী মেয়ের মত শান্ত শিষ্ট হয়ে ঘরের কাজকর্ম্ম করে দিনকাটান তার পক্ষে অসম্ভব। সেওত অপুর বোন, সেত আর কিছু একেবারে সাধারণ মেয়ে নয়। পাড়ার লোকে এই অদ্ভুত খাপছাড়া মেয়েটাকে দুটি চোখে দেখতে পারে না। লোকালয়ে তার সঙ্গী, সাথী, সম্মান, আরাম কিছুই নেই। কিন্তু অরণ্যের অস্পষ্ট গুঞ্জনে অপু যেমন স্বপ্নালস, দিশাহারা হয়ে যায়, যেমন করে তার প্রকৃতিনিহিত পুরুষের প্রতিভা চঞ্চল হয়ে ওঠে, সঙ্গীসাথী, নিজেদের অবস্থা, সব ভুলে যেয়ে যেমন করে তাতেই সে আবিষ্ট হয়ে যায় দুর্গা তা পারে না। তেমনকরে আনন্দ পায়না। তাই আমরা দেখি দুর্গা গভীর বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্ধের মত। উদ্দেশ্য তার একটা নোনাফল কিংবা একটা মেটে আলু। কিন্তু এই সব তুচ্ছ বস্তুতেই তা নিবদ্ধ। অপুর মত বৃষ্টির পর ভিজেমাটির কেমন একরকম সোঁদা গন্ধ, কত অজানা-পাখীর ডাক, কত অচেনাফুলের মিস্ট গন্ধ এসব কই তাকে একবারও মনে কর্‌তে দেখিনে। সে কেবল চোরের মত প্রকৃতির ভাণ্ডারে দু'একটা পরিত্যক্ত ফলের জন্যে ঘুরে বেড়াচ্চে। তাই অপুর বোন্ হয়েও সে সতুর পুঁতির মালা চুরি কর্‌লে, সোনার সিঁদুর কৌটো ব্যবহার করলে না তবুও চুরি করে এনে কলসীর ফাঁকে লুকিয়ে রাখ্‌লে। অপু যখন প্রকৃতির চিরন্তন বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে সে রহস্যের কোথাও কোন কূলকিনারা পাচ্চে না, তখনও তার বোন চুরি করে বেড়ায়।

কিন্তু দুর্গা অপুর বোন বলেই যে তার অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী নারীপ্রকৃতি তাদের অকিঞ্চনতার মাঝে, কুশ্রী দৈন্যের মাঝে কিছুতেই আশ্রয় পাচ্ছিল না। সে যে সঞ্চয় করতেই চায়, সে কি চায় পথে পথে কাঙালপণা করে একটা নাটা ফলের বীচ, একটা মেটে আলু কুড়িয়ে ফিরতে। তবু কিসের টানে, কোন প্রতিক্রিয়াবশে অবচেতন মনের কোন অন্ধকার, অতৃপ্ত তৃষ্ণায় সে আপনমনে একা একা সারাদিনমান রুক্ষকেশে বেশে এমন করে ঘুরে বেড়াত তা কে জানে। অপুই একমাত্র তার দিদিকে ভালোবাসত তাই সে তার দিদির মনোভাবের কিছু কিছু অংশ যেন বুঝতে পেরে ভেবেছিল:— "যখন তাহার দিদির মাথার সামনে রুক্ষচুলের একগোছা খাড়া হইয়া বাতাসে উড়িতে থাকে, তখনই কি জানি কেন দিদির উপর অত্যন্ত মমতা হয়! কেমন যেন মনে হয় দিদির কেহ কোথাও নাই'— সে যেন একা কোথা হইতে আসিয়াছে—উহার সাথী কেহ এখানে নাই।"

* * * *

পথের পাঁচালীর প্রধান চরিত্রগুলি বাদে ছোটখাট চরিত্রগুলিও বিভূতিভূষণের দু'একটি তুলির টানে সুন্দর, মধুর হয়ে ফুটেছে। ইন্দিরঠাকুরুণ উল্লেখযোগ্য। পল্লীবৃদ্ধার এমন অতীত স্মৃতি মাত্র অবশিষ্ট, স্নেহবুভুক্ষিত সকরুণ চিত্র বিভূতিভূষণের প্রতিভার পরিচয় দেয়। মোটের উপর পথের পাঁচালী এমন একখানি বই যা একবার পড়বার পর তৃপ্তি হয় না, মনের মধ্যে চলতে থাকে বহুদিন ধরে তার ছোট বড় নানা সুরের অনুরণণ। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের পর আধুনিক বাংলা বইয়ের মধ্যে পথের পাঁচালীর মত একখানি বই বোধ করি আর চোখে পড়বে না। কিন্তু এবারে অপরাজিতর প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।

৬

পথের পাঁচালী সুধীজন সমাজে যেমন অবিমিশ্র প্রশংসা লাভ ক'রেছিল অপরাজিতর বেলায় তা ঘটেনি। সমালোচকরা বলেছেন, বিভূতিবাবু শিশুচিত্র আঁকতে ওস্তাদ আর পথের পাঁচালীতে অপু ছিল শিশু তাই বইখানির রূপ খুলেছে। কিন্তু অপু যেমন বড় হয়ে উঠল তার যৌবনের জটিলতা নিয়ে সেই বই লেখা সুরু হলো বিভূতিবাবু তেমনটি আর পারলেন না। তাঁর অপু চিরদিনই শিশু রয়ে গেল। প্রথমে তাই মনে হ'য়েছিল বটে। অপুর চরিত্রে শান্তি, স্নিগ্ধতা নিষ্পাপ সরলতা এই সকলের ঘটাই যেন বেশী। তার জীবনের যা কিছু দ্বন্দ্ব সমস্তই বাইরের সঙ্গে। কিন্তু মানুষের আসল লড়াই যে বাইরের সঙ্গে নয় তার সকলের চেয়ে বড় যুদ্ধ যে নিজেরই সঙ্গে যুদ্ধ এবং সকলের চেয়ে বড় বাধা তার নিজের ভিতরের বাধা একথাটার পরিচয় আমরা পথের পাঁচালীর পরবর্ত্তী অপুর জীবনে পাইনে কেন?...অপু চিরকাল দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়ছে কিন্তু একবারো নিজের নিঃসীম, বৈচিত্র্যময়, অন্তর্দ্বন্দ্বভরা প্রকৃতির সঙ্গে লড়ছেনা। অন্তর্যুদ্ধের ঝটিকা অন্তর্বাষ্পের তপ্তশ্বাস নাই তার জীবনে। বাইরের অবস্থা-প্রতিকূলতা ও দুঃখ দুর্দ্দশার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অচিন্তনীয়, ভালো মন্দ মেশান রহস্যময় মানব প্রকৃতির সঙ্গেও বৈচিত্র্যময়

যুদ্ধকরে কত শান্তি, কত অশান্ত মনোবেগ, কত ঝড়ের আসন্ন পূর্ব্বাভাস, কত ঝটিকাময় মহাআবর্ত্ত, কত ঝড়ের পরের স্তিমিত স্তব্ধতা নিয়ে জনক্রিষ্টোফারের মত একটা প্রতিভা ফুটে উঠেছে, সে ধরণের পরিপূর্ণ জীবন এবং পরিপূর্ণতম সংগ্রাম কেনইবা আমরা পেলুমনা অপুর জীবনে ?

আরওমনে হয়েছিল অপূর্ব্বর হৃদয় মনে যৌবনের বিচিত্রবেদনা বিচিত্রতর আবেগ এসবেরওকি স্থান নেই ? নারীর সহিত প্রেম সংস্পর্শে আস্‌বার আলোয় আমরা তাকে ক্ষণকালের জন্য দেখ্‌লাম অপর্ণার স্বল্পপরিসর জীবনে সে প্রেম মাটির প্রদীপের মত নিস্তরঙ্গ, মৃদু। কোমল, খুব কোমল সুরের রেশ তাতে। তারপরে অপর্ণার মৃত্যু হোল আর অপূর্ব্ববেচারাও ছুটি পেলে। অপর্ণার মৃত্যুর আগে এবং পরে কতনারীর সংস্পর্শে এসেচে অপু। লীলা, রাণুদি, নির্ম্মলা, অমলা। কিন্তু সকলের সঙ্গেই তার স্নেহ, মমতা, করুণার সম্পর্ক। সবাই তার মমতাময়ী বোন। এ ছাড়া অপু আর কিছু ভাবতেই পারেনা, আরকিছু মনেও আনেনা। এমনকি দরিদ্রঘরের উৎপীড়িতা মেয়েটি, সেই পটেশ্বরী সে যে তার রিক্ত, উৎপীড়িত জীবনে মনে মনে অপূর্ব্বকে কি চোখে দেখেছিল সেটুকু বোঝবার মত মনের গতিও অপুর নেই। কিন্তু এটা কেন হোল ? অপূর্ব্ব পিউরিটান নয়, স্থূলবুদ্ধি নয়। তার আর্টিস্ট্ মন বরঞ্চ অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং গভীর। প্রকৃতির লেশতম ছায়ালোকের বিবর্ত্তন ও তার চক্ষু এড়ায় না। পথে যেতে যেতে কোন বনফুলের খুব মৃদু সুগন্ধ, কোন বন্যফলের ক্ষীণতম ঈষৎতিক্ত কষায় সুবাস সেটুকুও তারকাছে ধরা পড়ে যায়। তবে এত তীক্ষ্ণ অনুভব শক্তি নিয়ে অপু কেন মানসিক জগতের আন্দোলনে, প্রেমের ব্যাকুলতায়, হৃদয়ের নানা বিরোধী সমন্বয়ে এত অসাড় ? এসব প্রশ্নের উত্তর নিজের মনে চিন্তা করলে বোধহয় অপূর্ব্বকে বিভূতিবাবু প্রথমথেকেই দেখিয়েছেন, সে নিঃসঙ্গ সে প্রকৃতির প্রেমিক। প্রকৃতিকেই সে ভালো বেসেছে। সেইযে কবির কবিতায় আছে ঃ—

"ওরে কবি, উতলা করেছে তোরে আজি
ঝঙ্কার মুখরা এই ভুবন মেখলা !"

অপূর্ব্বর সম্বন্ধে বর্ণে বর্ণে সেই কথা খাটে। জন্মের দিন থেকে সে দুই চোখে সীমাহীন বিস্ময় নিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চেয়ে আছে! এরই সঙ্গে তার হৃদয়ের নাড়িতে নাড়িতে টান। মানুষের সঙ্গে ভালোবাসা এর পরে আসে। তাই অপরাজিত বইতে যুবক অপূর্ব্ব কোন মানবীকে এমন করে ভালোবাসেনি যার কথা স্মরণমাত্র করে তার চক্ষু জ্বলে ওঠে, তার শিরায় শিরায় টান ধরে কিন্তু সেই পরিণত বয়স্ক তরুণ প্রকৃতিকে এমন করে ভালোবেসেছিল যে, অপরাজিত বইতে অপূর্ব্বর জবানীতে বিভূতিবাবু যেখানে ছোটনাগপুরের ওইদিকের সেণ্ট্রাল প্রাভিন্সের ঘননিবিড় অরণ্যের বর্ণনা করেচেন সেখানে আমরা সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হয়ে যাই। অমরকণ্টকবনের এ বর্ণনা যে কোন সাহিত্যের গৌরব। মিঃ রায় চৌধুরির ড্রিল তাঁবুর তত্ত্বাবধানে সে কাজ নিয়েচে। দুর্ভেদ্য অরণ্যে একা তাঁবুতে তার দিন কাটছে। কিন্তু সেই একা থাকতেই তার কী আনন্দ! কী আবেশ!

সে কি একা? কে বলেছে একা! অপূর্ব্বর জীবনে যাকে সবচেয়ে ভালো বেসে এসেছে সেই উন্মুক্ত, অবারিত অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতি তার সাম্‌নে। তারই মাঝে সে গেছে তন্ময় হয়ে। প্রথম প্রেমেও কি মানুষের এমন গাঢ়, গভীর, তদ্গত তন্ময়তা আসে না? অপু কি প্রণয়ী নয়? সে যে প্রণয়ীর চেয়েও বেশী। সে নিখিলতারা-চন্দ্রময় জগতের প্রণয়ী।

প্রেমাস্পদের কাছে প্রিয়া যেমন তার আপন ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করেও চিরায়মান স্বপ্নের আভাস দেয়, অপুর কাছে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যও তেমনি সৌন্দর্য্যাতীত।

তা যেন একটা কম্পিত স্বচ্ছ আবরণ। এরই ভিতর দিয়ে চোখে পড়ে আরও কোন দূরবিসর্পিত দিগ্বলয়। তাই অপূর্ব্বর মনে হয় "আরণ্য ভূমিতে বনের ডালপালায় আলোছায়ার মধ্যে পুষ্পিত কোবিদারের সুগন্ধে দিনের পর দিন ধরিয়া এক একটি নব জগতের জন্ম হয়। ঐ দূর ছায়াপথের মত তা দূর বিসর্পিত। এটুকু শেষ নয় এখানে আরম্ভও নয়—তাকে ধরা যায়না অথচ এই সব নীরব জীবন মুহূর্ত্তে অনন্ত দিগন্তের দিকে বিস্তৃত তার রহস্যময় প্রসার মনে মনে বেশ অনুভব করা যায়।"

(৭)

যুবক অপূর্ব্ব কোন দিন কোন মানবীর প্রেমের স্মৃতিতে তেমন করে আর্ত্ত হয়ে ওঠেনি যেমন করে সে নানা দেশে নানা পথে-প্রবাসে ঘুরতে ঘুরতে অধীর হয়ে উঠেছিল তার শৈশবের লীলাক্ষেত্র নিশ্চিন্দিপুরের পল্লীপ্রকৃতির জন্য। এযে তার প্রকৃতির সঙ্গে প্রথম প্রেমে পড়ার জায়গা, তার কাছে সে তীর্থই। অপরাজিত দ্বিতীয় খণ্ডের শেষভাগে অপূর্ব্বর উদ্বেল মনের স্মৃতির আবেগ পড়ে আমাদের সমস্ত মন মথিত হয়ে ওঠে। তার স্মৃতি ভারাক্রান্ত চিত্ত আমাদেরও উতলা করে দিয়ে যায়। মনে পড়ে যায় অতীতের স্মৃতির বেশ সম্বন্ধে রাসেলের গানের ঝঙ্কারের মত মধুর সেই কয়েকটি কথা:—"This is the reason why the past has so much magical power. The beauty of its motionless and silent pictures is like the enchanted purity of late autumn, when the leaves through one breath would make them fall, still glow against the sky in golden glory."

হাঁ, অপুর প্রধানতম ও প্রবলতম ভালবাসার উৎসটা সে বিনিঃশেষে প্রকৃতিকে দান করেছিল। প্রিয়ার জন্যে প্রেয়সীনারীর জন্যে বড় বেশী উদ্বৃত্ত রাখেনি। তার এই দিয়ে দেওয়া ভালোবাসার একটুখানি ছিটেফোটা মাত্র আমরা পাই স্নিগ্ধপ্রেম এবং শান্তিতে পূর্ণ। বল্‌বার বা আঁক্‌বার বড় বেশী কিছু নেই। অপর্ণা যখন মারা গেল তখনকার ব্যাপারটাও খুব প্রথম শ্রেণীর নয়। গ্রাৎসিয়া মারা যাবার পর রোঁলা, ক্রিস্টোফারের নিঃশব্দ গভীর গহন শোকের যে চিত্র এঁকেছেন, অপর্ণার মৃত্যুসংবাদ শোনবার পরে অপুর সেই চুপচাপ

নীরবভাব সেই দিক ঘেঁষে আঁকবার চেষ্টা হলেও তার কাছ দিয়ে যায়নি। কারণ ক্রিষ্টোফারের মত অপূর্ব্বর জীবনে প্রেয়সীনারীর প্রেম অতখানি সত্য ছিলনা, এবং অতখানি জায়গা জুড়ে ছিল না তাই শোকও তেমন সত্য হোলনা।

যাক্ অপর্ণার কথা। অপর্ণা বৈচিত্র্যহীনা কিন্তু লীলার সঙ্গে অপূর্ব্বর যে সম্বন্ধের আভাস বিভূতিবাবু একটুখানি দিতে যেয়েই নীরব হয়ে গেলেন সে সম্বন্ধে আমাদের অভিযোগ আছে বই কি। লীলাকে তিনি মার্লেন কেন? সে মরে যেয়ে অপূর্ব্বকে কতটুকু দুঃখ দিতে পারলো? বেঁচে থেকে সে কি তার চেয়ে শত-সহস্রগুণ বেশী দুঃখ অপূর্ব্বকে দিতে পারতনা? লীলার সঙ্গে অপূর্ব্বর সম্পর্কটা শেলীর Epiposychidon এর ভাষায় তর্জ্জমা করলে দাঁড়ায়—

"Spouse! Sister! Angel! Pilot of the fate
Whose course has been so starless! O, too late
Beloved, O, too soon adored by me!"

ছোট থেকেই লীলার সঙ্গে তার সম্পর্ক অব্যক্ত ইঙ্গিতময়। কখনো অপূর্ব্বর মনে হয়েছে, "ঠিক সেই পুরাতন দিনের মতই মনটি আছে কিন্তু। তাহাকে সাহায্য করিতে মায়ের 'পেটের মমতাময়ী বোনের মতই হাত বাড়াইয়া দিয়াছে অমনি। আশৈশব তাহার বন্ধু.........তাহার সম্বন্ধে অন্ততঃ ওর মনের তারটি খাঁটি সুরেই বাজিল চিরদিন।" কখনো রাত্রির অরণ্যের মত লীলাকে দেখে তার কল্পনা মর্ম্মরিত হয়ে উঠেছে। প্রেয়সীনারীর মত তাকে রহস্যে, বেদনায়, প্রেমে অনির্ব্বচনীয় বলে মনে হয়েছে। সে যেন লীলাসম্বন্ধে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করতে পারে; Spouse! Sister! Angel! তারপর হ'ল লীলার জীবনের দুর্ভাগ্যের ঘন-তমিস্রা। লীলাকে তার অসার্থক অপমানিত জীবনের মধ্যে অসহায় একা দেখতে পেয়ে অপূর্ব্বর প্রকৃতি-বিলাসী মনও এক মেয়ের জন্য আর্ত্ত হয়ে উঠ্ল। তার এই মনের অবস্থার বর্ণনা বিভূতিবাবু দিয়েছেন, "লীলার খুব কাছে সরিয়া গিয়া তার ডান হাতখানা নিজের দুই হাতের মধ্যে লইয়া লীলাকে নিজের দিকে টানিয়া তার মুখ ফিরাইল। পরে গভীর স্নেহে তার উত্তপ্ত ললাটে, কানের পাশের চূর্ণকুন্তলে হাত বুলাইতে বুলাইতে দৃঢ় স্বরে কহিল—তুমি আমি ছেলেবেলার সাথী, লীলা, আমরা কেউ কাউকে ভুলব না। কোন অবস্থাতেই না। এতদিন ভুলিওনি কখনো লীলা। লীলার সারাদেহ শিহরিয়া উঠিল........." তারপর? তারপর? তারপরে কী না হোতে পারত? কিন্তু কিছুই হোলনা। অদৃশ্যে একটা গুঞ্জনধ্বনি শুনলুম:- 'O, too tate.—Beloved, too soon adored by me!', লীলা ফট্ করে মরে গেল। তাকে মরতেই হোল। আত্মহত্যা করে যদি বা না মরত, মরতে তাকে হোতই। দু'দিন বাদে যক্ষ্মারোগে সে মারা যেত। হ্যাঁ, তারপরে এই মরার কথা।

অনেক সমালোচকে বলচেন, অপূর্ব্বর ত্রিশের কোঠার জীবনের মধ্যে এতগুলো মৃত্যু আনা অস্বাভাবিক হয়েছে। তার মা মরল। বাবা, দিদি, অনিল, অপর্ণা, লীলা সবাই মরে গেল। কিন্তু কেন ?

(৮)

বিভূতিবাবু বরাবর দেখাতে চেয়েছেন অপূর্ব্বর জীবনে একটা অনাসক্ত ভাব আছে! কোন স্নেহ প্রেমের বন্ধনে আটকা পড়ে থাকতে পারে না সে। তার নিমন্ত্রণ প্রভাতের সিংহদ্বার পানে, তার আহ্বান তারায় তারায়। অপূর্ব্বকে এমনি একটা বৃহৎ পুষ্পিত পুঞ্জীত অভিপ্রায়ের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু এটা তিনি পাকা হাতে করতে পারেন নি। মানে, পথের পাঁচালীতে শিশু অপুর মনে প্রকৃতির খেলাঘর হতে যে বিচিত্র যে অব্যক্ত ধ্বনির উদাসগুঞ্জন ছায়া ফেলেছিল, তাকেই আরও ফলাও করে আরও বাড়িয়ে যুবক অপূর্ব্বকে তিনি গড়তে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেন নি। যদি তা-ই পারতেন তাহলে তাঁকে এতগুলো মৃত্যুর শরণাপন্ন হতে হোতনা। তা'হলে সবাই বেঁচে থাকত, বেঁচে থেকে তাকে অহরহ আকর্ষণ কোরত কিন্তু অপূর্ব্ব সমস্ত আকর্ষণকে কাটিয়েও নিজের মনের নির্জ্জনতায়, আত্মার অসীমতায় একেবারে একা হয়ে যেত। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। একদা কবিযশপ্রার্থী জনকয়েক ছোটছেলে মিলে কাঁচা হাতে নাটক রচনা করতে থাকে। পরে যখন তা পড়া হয় তখন দেখা যায়, প্রত্যেক পাঁচ মিনিট অন্তর একজন করে কারো পতনও মৃত্যু হচ্ছে। কি ব্যাপার? জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় যখনই নাটকের কোথাও আটকাচ্ছে তখনই কোন না কোন হতভাগাকে মরতে হচ্ছে! কিন্তু সকলেই বুঝতে পারেন এ অতি সস্তাও কৃত্রিম উপায়। অপরাজিতর অপূর্ব্ব তাই গোঁজা মিলনের অপূর্ব্ব হয়েছে। যে বস্তু ফোটাতে চেয়েছিলেন তাঁর স্রষ্টা, তা খুবই মহান খুব উচ্চ। কিন্তু তা ফুটলো না। অর্থাৎ অপরাজিত বইতে বিভূতিবাবুর স্বভাবসিদ্ধ একান্ত আন্তরিকতা, প্রকৃতির সরস বর্ণনা অমরকণ্টক বনের গাম্ভীর্য্যময় অতুলনীয় বিবরণ সবই চমৎকার হোল, কিন্তু অপূর্ব্ব ফুটলোনা। তার যুদ্ধ চিরদিন বাইরের সঙ্গেই হোল ভিতরের কথা সে একবার ভাবলে না। একেবারে শেষে কোন সাহেব বন্ধুর সঙ্গে যখন সে সুদূর দেশে পাড়ি দিচ্ছে তখনও সে কেবল নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবছে, ভাগ্যে লীলাদিকে পেয়েছিলাম। তাইত তাঁর জিম্মায় কাজলকে রেখে বাইরে বেরোতে পাচ্ছি! তখনও বিভূতিবাবু বাইরেটা দেখিয়েই ক্ষান্ত। বাইরের সুবিধা এবং ব্যবস্থা বাদেও সমস্ত রকম attachment ছেড়ে কোন একটা বৃহৎ আদর্শ, গভীর ভাবের মধ্যে তলিয়ে যেতে হ'লে মানুষকে তারই প্রকৃতির কত ক্ষুদ্রতা কত আসক্তি কত পিছুটান যে কাটিয়ে উঠতে হয় সে সব কথার এতটুকু আভাসও আমরা পাইনা।

ধরা যাক্ যদি ইতিহাসে এমন থাক্ত যে জগতের পুঞ্জীভূত যন্ত্রণা চিন্তা করতে করতে একান্ত বৈরাগ্যে যখন বুদ্ধের মন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে তখনও তিনি নিরতিশয় ভাবাকুল হয়ে চিন্তা করছেন যে সুন্দরী তরুণী পত্নীকে কার হেফাজতে রেখে যাবেন বা নাবালক পুত্রের কি ব্যবস্থা হবে। তা'হলে তা ভাব্‌তেই কি আমাদের হাসি পেতনা। কিংবা যদি এমন হোত যে রাজকুমার সিদ্ধার্থকে গৌতমবুদ্ধ হতে দেবার জন্য কোন একদিন কলেরা রোগে তাঁর স্ত্রী যশোধারা এবং পুত্র রাহুল একদিনের আড়াআড়ি মারা যেতেন। তা'হলেই বা কেমন হোত? কিন্তু তা হয় না। বুদ্ধদেব চিরদিনই বুদ্ধদেব। তাঁকে কিছু একটা হতে দেবার জন্য তাঁর মনোরাজ্যে ছাড়া বহির্জীবনে খুব একটা কিছু অচিন্তনীয় ব্যাপার ঘট্‌তেই হবে তার কোন প্রয়োজন নেই। বিভূতিভূষণ অপূর্ব্বর সেই মনোজগতের বিপ্লবের কাহিনী বাদ দিয়ে কেবল বহির্জগতকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন বলে অপরাজিত অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

সমাপ্ত

প্রতীক্ষা

শ্রীধরিত্রী দেবী

(১)

নাম হেমনলিনী। ঠাকুমার দেওয়া নাম ওই কিন্তু অষ্টাদশী তরুণী মা, তার গাঢ় নীলাভ কমলের মত চোখদুটী দেখে ডাকতেন নীলা,—হাতে খড়ি হ'য়ে যখন পাঠ্যাবস্থা এলো, তখন চলন হোলো নলিনী।

নলিনীর সঙ্গে সতীনাথের দেখা হয় প্রথম মধুপুরে। সতীনাথ একদিন নলিনীকে দেখেছিলো পথের ধারে ছোট একটা পাহাড়ের নীচে একখানা পাথরের ওপরে সে বসেছিলো, পিছনে বিস্তৃত নীল আকাশদিগন্ত বিস্তৃত, সম্মুখে শাল ও মহুয়ার বন। তখন আসন্নসন্ধ্যা নলিনীর হাত দুখানি কোলের ওপর রাখা, উদাস দূর প্রসারী দৃষ্টি দূর শালবনের দিকে ফেলে, যেন দুটী ধ্যানস্তিমিত আঁখি। এইটুকুই তার চোখের দেখা।

এর পরে তাদের পরস্পর আলাপ করবার সুযোগ হয়েছিলো। তারপরে সেই আলাপ এসে পৌঁছোল বিয়ের প্রস্তাবে।

মেঘমেদুর শ্রাবণের এক সন্ধ্যায়, আসন্নবর্ষণসম্ভাবি আকাশের দিকে চেয়ে সেদিন সতীনাথ দেখ্‌ল, এই দেশের সঙ্গে নলিনীর চোখের কোথায় যেন একটা মিল আছে। সতীনাথ তার চোখের ওপর নিজের আকুঞ্চিত দীপ্ত চোখ দুটী রেখে বস্‌ল, "নলিনী, তুমি আমার কতখানি, তা কি তুমি জানোনা! এতোদিনেও কি জান্‌তে পারোনি?" নলিনীর সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া তেমনি উদাস দৃষ্টি দূরে মেলে ঈষৎ সচকিত হ'য়ে বলল, "কি বলচেন?" সতীনাথ ব্যাকুল আগ্রহে বল্‌ল, কিন্তু তুমি তো জানোই আমি কেন এখানে আসি, সে তো শুধু তোমার জন্যেই, তুমি একবারটী বল্‌লেই তো এখন হয়। নলিনী নির্লিপ্তভাবে তেমনি দূরদিগন্তপ্রান্তে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "ও সেই কথা বল্‌চেন।" সতীনাথ বলিল, "হাঁ এক মায়ের দিক থেকেই যা কিছু বাধা এতোদিন ছিলো —তা তাঁরও তো মত পেয়েচি।" নলিনী এইবারে তাহার চোখে চোখ রাখিয়া বলিল, "কিন্তু আমি তার জন্যে বলচি না—আর সে তো বাইরের বাধা, কিন্তু আমার একটা কথা মনে হয়।" সতীনাথের আগ্রহ ব্যাকুল চোখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"একটা কথা সর্ব্বদাই মনে হয় কি জানেন? মনে হয় আজ যে অবস্থায়, যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে থেকে আপনার আমাকে ভালো লেগেচে, ভবিষ্যতে তো সে ভাব না থাকতে পারে? সতীনাথ আহতস্বরে বলিল, "শুধু ভালো লেগেচে? আর বেশী কিছুই নয়?" নলিনী ক্লান্তস্বরে বলিল, "ওই হোল, ভালোবাসাই নয় হলো, ওই একই কথা, কিন্তু আপনি আমার কতটুকুই বা জানেন? একটুখানি দেখেচেন,—দুচারটে

কথা-বার্ত্তা, দূরে থেকে চেয়ে থাকা, তাতে ভালোই লাগে মানি, কিন্তু দুজনে যখন এক সঙ্গে থাক্‌ব, তখনকার জীবন নিশ্চয়ই কান্তিতে তিক্ত হ'য়ে উঠবে। কিন্তু সেদিনও কি আপনার এই কথাই মনে থাক্‌বে?" সতীনাথ তাহার উত্তরে অনেক কথা বলিল, নলিনী যে তাহার কাছে চিরদিনই এমনি মধুর, এমনি সুন্দরই থাকিবে, অনেক কথাই সে বলিল, তার ভাবার্থটা এই—নলিনীর এ রকম আশঙ্কা একেবারেই অমূলক, সতীনাথ চিরদিনই নলিনীকে এমনিই ভালোবাসিবে। কিন্তু সেদিনকার শ্রাবণের সন্ধ্যা, বর্ষণসিক্ত সদ্যফোটা বেলফুলের গন্ধে আমন্থর ঝোড়ো হাওয়া, সতীনাথ নলিনীর সঙ্গে বিয়ের মত লইয়াই গিয়াছিলো—ইহার পরে তাহাদের বিয়ে দিতে নলিনীর বাবা-মার কোনই বেগ পাইতে হয় নাই।

(২)

নলিনী বিয়ের পরে যে দেশে আসিল, সেটা না সহর না পাড়াগাঁ, কল্‌কতা থেকে ডেলী প্যাসেঞ্জারী করা চলে। পাড়া প্রতিবেশী প্রায় সকলেই সকালে কাজে যায় ফিরিতে সন্ধ্যা হয়। বড় ভাই শিবনাথ, তিনিও প্রত্যহই আসা যাওয়া করেন। তাঁর কারবার আছে। সতীনাথ কিছুই করে না,—শীঘ্রই কিছু করিবে, পরিবারে অনেকেরই এই আশা আছে। নলিনী এ বাড়ীতে আসিল হেমনলিনী, নলিনী বা নীলা নামে নয়—বাড়ীর মেজবৌ। শিবনাথের স্ত্রী সর্ব্বজয়া এখন গৃহিণী, ছয়টি সন্তান তাঁর, তবে শাশুড়ীও আছেন। সর্ব্বজয়া হয়তো একদিন দেখিতে সুন্দর ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহার মুখ সুন্দর কি অসুন্দর সে প্রশ্নই ওঠে না, সমস্ত মুখখানিতে মনের অসন্তোষ ও অতৃপ্তির জ্বালা কঠিন রেখাপাত করিয়াছে, বয়স মাত্র ২৭ বৎসর। কিন্তু সাতাশ বছর বয়সই ৭টী সন্তান হইবার পথে যথেষ্ট। মাথার সামনে অনেকখানি সিঁদূর, সিঁথির দুপাশ চওড়া। হাতের গোছ ভরা মোটা চুড়ী, মোটা তারের বালা শীর্ণ দুখানি হাত, নিষ্প্রভ অথচ জ্বালাময় দৃষ্টি, এ সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে তাঁহাকে অনেকখানিই দিতে হইয়াছে। শিবনাথ উপার্জ্জন যাহা করেন, তাহাতে মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান সকলেরই হয়, তবে তাঁহার একটু বাহিরের টান আছে, তবে সর্ব্বজয়া ইহাতে গর্ব্ব বোধ করেন, তিনি ইচ্ছা করিলে চুড়ী ভাঙ্গিয়া অন্য চুড়ী গড়াইতে পারেন এমন একটা অনায্য না হইলে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে অনেক বাসনাই পূর্ণ করিতে স্বাধীনতা দেন। এই কি সকলে পায়? ইহারই ভিতর তিনি অনেক ফন্দী ফিকির করিয়া দুচার টাকা জমাইয়াও থাকেন। শিবনাথ চরিত্রবান্ না হইলেও এমন একটা কিছু উৎপীড়ন তাঁহাকে করেন নাই যে দশ জন জানিতে পারে, কিন্তু সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইতে গেলে, এমন এক আধটু দাম দিতেই হয়, হাসিতে তিনি পারেন না—অযথা বসিয়া শুইয়া আয়াসী হইয়া যাওয়া তাঁর ধাতে সহ্য হয় না।

সর্ব্বজয়া যখন এ সংসারে আসিয়াছিলেন, তখন সঙ্গে আসিয়াছিলেন দু'হাজার টাকা নগদ, অন্য যৌতুক তত্ত্ব, সেও প্রায় হাজার খানেকের, তিনি এ কথা বিশ্বাস করেন, পুরুষদের কাছে মেয়েদের এম্‌নি দিতেই হয়।

নলিনী যে শুধুশুধুই আসিল, না টাকা না গাভরা গহনা কি জিনিষপত্র। হাঁ, তবে তেমন একটা আহামরি সুন্দরী হইলেও নয় এ ক্ষতিটা কিছু অল্প পূর্ণ হইত। একমাত্র ওই জিনিষটা যাহার পুরুষকে মুগ্ধ করিবার মত যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, তাহার না হয় চলিয়া যায়। কিন্তু ওই কি সুন্দরী? নলিনীর কথায় ব্যবহারে এমনই একটা নির্লিপ্ততা ছিলো, যে সেটাকে উহারা অহঙ্কার মনে করিয়াই আরো অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেন। কুণ্ঠাহীন, দীপ্তভাব কাজ কর্ম্ম সবই করে, কথা-বার্ত্তাও বলে কিন্তু এই পরিবারেও মিলিতে পারিল না। পুকুরে পদ্ম যেমন জলে থাকিয়াও জলের ওপরে ফুটিয়া উর্দ্ধমুখে থাকে, নলিনীও তেমনি আপনাকে এই সংসারের আর সকলের মধ্যে মিলাইয়া দিতে পারে নাই। কিন্তু এখানে দিগন্ত বিস্তৃত নীলাকাশ নাই, শালবনে দোলা দিয়া পশ্চিমা বাতাস আসিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে না, দূরের নীলাভ পাহাড় ধূসর করিয়া দিয়া সমারোহে বর্ষার বারিধারা কঠিন রাঙা মাটীর বুকে ঝরিয়া পড়ে না,—মাধবী রাতে তারাভরা আকাশ, সদ্যফোটা বেল চামেলীর গন্ধে আমন্থর দক্ষিণা বাতাস নলিনীর আঁচল উড়াইয়া দেয় না।

চারিদিকেই বাড়ী, ধূলামলিন শ্রীহীন বাড়ীর দেওয়াল, দৃষ্টি তাহার ব্যাহত হইয়া ঘরেই ফিরিয়া আসে, নলিনীর চোখে তাই ক্লান্তির আভাস।

নলিনীর শাশুড়ী সেদিন আসিয়া বলিলেন, "বৌমা, কাগজ কলম নিয়ে এসোতো।" নলিনী এ বাড়ীতে আসার পর থেকেই এই কাজটী তারই করিতে হইত। কাগজ কলম আনিলে তিনি বসিয়া বলিলেন, "বেশ করে গুছিয়ে বেয়াইকে একখানা চিঠি লেখ।" নলিনী একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "বাবাকে লিখবো?"—"হাঁ লিখে দাও, বেশ করে গুছিয়ে এখানের সব খবর দিয়ে শেষে লেখো, সতীকে কাজের চেষ্টায় দুচার জায়গায় আসতে যেতে হবে, তা সংসারে এক শিবু কতই আর পারে আর অমনি তোমার জামা কাপড় নেই, শীতের কাপড় বলে দুই শ দুয়েক টাকা পত্র পাঠ যেন পাঠিয়ে দেন।" কিন্তু তাঁহার বক্তব্য বিষয় শুনিয়াই নলিনীর হাত থামিয়া গেলো। অসহিষ্ণু ভাবে শাশুড়ী বলিলেন, "লেখোইনা, আমার কি বসবার সময় আছে। হাঁ শেষে ইহাতে যেন কোন মতেই অন্যথা না হয় তাও লিখে দিও। আমি বল্চি, তা লিখোনা নীচে তোমার নাম দিও।" নলিনী কলম রাখিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, "এতো ছল করে চাওয়া, না মা এ আমি ওঁকে লিখতে পারবোনা।" শাশুড়ী কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "কেন পারবেনাইবা কেন, শুনি? কিইবা তিনি দিয়েচেন, যে দিতে পারবেন না? আমার সতীকে ভালো মানুষ পেয়ে তোমায় দেখিয়ে মন ভুলিয়ে নিয়েচেন, নইলে মেয়ের বিয়ে অমনি কেউ দেয়? একেবারে খৃষ্টানদের মত।" নলিনী মৃদুস্বরে বলিল, "আমার বাবা তো তা করেননি মা, ইনিতো নিজে থেকেই—" "হাঁ একেবারে দেখেই মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন না? সতী তো আমার পেটের ছেলে, তাকে জানিনে আমি, সতী তো আমাকে কিছুই বলেনি, ভেবেচো কিনা?" সর্ব্বজয়া কি কাজে আসিয়াছিলেন, কিন্তু নলিনীদের কথাবার্ত্তায় আকৃষ্ট হইয়া আর যাইতে পারেন নাই।

হাসিবার চেষ্টা করিয়া একটু চোখ টিপিয়া শাশুড়ীর গা ঘেষিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ তা, সেকথা মিথ্যে বলোনি, এ যে স্বয়ং পার্ব্বতী, মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করেচেন। এমন রূপসী তাতে লেখাপড়া জানা মেয়ে—ওসব বিদ্যাই 'ওদের জানা আছে। তা মেজবৌ তুমি রাগই কর, আর আর যাই করো মা তো ঠিকই বলেচেন, বিয়েতেতো চারহাত এক করতে একটা টাকাও খরচ হয়নি, কিন্তু এসবতো দিতেই হয়,—সত্যিইতো একা মানুষের ওপর সংসার চল্‌চে, দুশো চারশোতো দিতেই হয়—কেন মা, আমার বেলাতেই কি দিতে হয়নি? তবে আমরা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে ছিলাম কেউ একটা কথা বল্‌লে কেঁদে ভয়ে সারা হয়েচি।' নিরুত্তর নলিনীর আয়ত আঁখির কোণ সজল হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু রাগ সে করিবে না,—তাহার অন্তরে যে সুন্দর জাগ্রত আছেন, তিনি চির আনন্দময় তাহার অন্তরকে সে কিছুতেই মলিন করিবেনা। শাশুড়ী শেষবারের মত বলিলেন, "তাহলে তুমি লিখবেনা—বৌমা? বেশ, আমি সতীকে দিয়েই লেখাব, দেখি তিনি কি করেন।" সশব্দ পদক্ষেপে তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। সর্ব্বজয়া হাসিয়া একটু কোমল সুরে বলিলেন,— এ তোমার অন্যায় রাগ মেজবৌ, তোমাদের লেখাপড়া জানা মেয়েদের কিছুই অসাধ্য নেই বাবা, একবার সে তখন প্রথম এখানে এসেছিলাম বয়েসই বা কত, এই বছর পনেরো কি ষোল হবে, ঠিক মনে নেই, তা কোনদিনতো কোথাও বেরুতে পাইনি, আমার সই থাকতো ওই দোতলা বড় হলদে বাড়ীটার সঙ্গে লাগাই একখানা বাড়ীতে, তা সই সেদিন অনেক হাতে ধরে বলেছিলো, তা আমারও দুর্ব্বুদ্ধি।" একটু হাসিয়া নলিনার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বায়োস্কোপের ছবিতো কখনো দেখিনি? আর তোমার ভাসুরকে তো জানোই, তিনি তো মেয়েছেলের এসব সখ আহ্লাদ পছন্দই করেননা, গেরস্ত ঘরের বৌ কি বাইরে গিয়ে আমোদ আহ্লাদ করবে তা তখন তো ছেলে বুদ্ধি, গেলাম একদিন এই সন্ধ্যের একটু আগে, মাকে বলে গিইচি যে সয়ের বর এসেচে ডেকে পাঠিয়েচে দেখতে। বিয়ের সময় সিল্কের একখানা বেশ গোলাপী শাড়ী পেয়েছিলাম, পরা তো একদিনও হয়নি? বেশ শাড়ী পরে মনের মতন সেজেগুজে গেলাম তার সঙ্গে, ফিরতে রাত হয়ে গেলো জানোই তো ওর ওমনি লাগানর দোষ আছে যেই ছেলে বাড়ী এসেচে সেদিনবুঝি বাইরে থেকে, ওই কিসব খেয়ে এসেছিলো আমি কিছুই জানিনা, তখনও শাড়ী আমি খুলিনি, ঘরে বসে ভাবচি নলিনী হাসিয়া বলিল 'ভাবছিলে তিনি এলে একবার দেখিয়ে নেবে।' সর্ব্বজয়া হাসিয়া বলিল, 'সবে মাথার কাপড়টা খুলেচি আর না এসে কোন কথা না বলেই আমার খোঁপা ধরে টানদিয়ে সে পিঠের ওপর সে কি মার। আমি তো হাঁউ হাঁউ করে খানিক কাঁদলাম—অপরাধ কেন গিয়েছিলাম, তাওনাবলে নলিনী বিস্মিত হইয়া বলিল, 'তা তুমি তারপরে কি করলে? বাপের বাড়ী গেলেনা কেন? তারপরেও বড় ঠাকুরের সঙ্গে কথা কইলে? মুখ দেখ্‌লে?' আশা করিয়াছিলো কিছু একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করিয়াছিলো, কিন্তু সর্ব্বজয়া বহু রেখা অঙ্কিত মুখখানি তৃপ্তির হাসিতে উদ্ভাসিত করিয়া বলিল, 'দূর পাগ্‌লি কি আর করব, সে রাত্রে খাইনি, তার পরের দিনই আমায় এই মকরমুখো

বালা এনে দিয়েছিলো। পুরুষমানুষ রাগের বশে একটা করে ফেলে। তা অমন বলতে গেলে মহাভারত হয়। তুমি ছেলে মানুষ, তোমার বয়সে আমিও কতই ভেবেছিলাম। নলিনী আরক্তমুখে বলিল, "দিদি, তুমি কি করে সহ্য করে থাকো, কিন্তু আমি কিছুতেই ভেবে পাইনে, যে তিনি তোমার গায়ে হাত দেবার স্পর্দ্ধা পেয়েচেন, তুমিই সে হতে দিয়েচ বলে। আমি হলে, না দিদি, কি যে করতাম বলতে পারিনা।" সর্ব্বজয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন, ছেলেদের আসিবার সময় হইয়াছে।

(৩)

সতীনাথ সত্যই চিঠি লিখিয়াছিলো কিনা, সে জানিবার চেষ্টা করেনাই। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের মিথ্যাচার—স্বার্থপরতা, অসৌন্দর্য্য ইহার গ্লানি হইতে নলিনী নিজেকে বাঁচাইবে কি করিয়া? বাহিরে ভিতরে সর্ব্বত্র অবরুদ্ধ, মলিনতার আবর্জ্জনা, বাহিরে পাণ্ডুর আকাশ, নিত্যনববর্ণচ্ছটায় সুনীল আকাশ ভরিয়া ওঠেনা, জানলায় নলিনীর দূরে দৃষ্টি মেলিয়া বসিয়া থাকিবার অবকাশ সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে সংসারের কাজে।

সকাল থেকে সেই মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত একটার পর একটা কায লাগাই থাকে, একদিকে শাশুড়ীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠের বকুনী, অর্থাৎ তিনি যতক্ষণ জাগিয়া থাকেন, অনবরতই আপন মনেই বকিয়া চলেন সর্ব্বজয়ার ওপর নলিনীর রাগ একটুও হয়না, অনুকম্পা হয়। তাঁহাকে কেহ কোনদিন স্নেহের ব্যবহার দেয়নাই, সম্মান হীন প্রতিষ্ঠা, নিজের দেহ মন সব নষ্ট করিয়া পাইয়াছেন, সন্তানের জননী কিন্তু শ্রদ্ধা আজও পান নাই, তাই নলিনীকে তাঁহার অকারণে ভালো শাড়ী বিকালে পরিতে দেখিলে অন্যমনে বসিয়া থাকিতে দেখিলে সহ্য করিতে পারেননা। সময় সময় তাঁর একটানা একই কথা, একই বকুনী শুনিতে শুনিতে ক্লান্তি আসে।

কিন্তু সতীনাথ নির্লিপ্ত, কোথাও যে কায কর্ম্ম করিবে, তাহাকে লইয়া যাইবে সেচেষ্টা তাহার নাই। যেন এই বাড়ীতে তাহাকে আনিয়া দিয়াই তার কর্ত্তব্যশেষ হইয়াছে। সতীনাথ তাহাকে মাঝে মাঝে কোন কোন সন্ধ্যায় বেলফুল, রজনীগন্ধা আনিয়া দেয়,—বর্ষার রাত্রে বাইরে বৃষ্টির একটু আগেই বর্ষা হইয়া গিয়াছে—ঘরের কোণে ছোট তিন কোণা টিপয়ের ওপর রজনীগন্ধার গুচ্ছ—, এলোমেলো হাওয়া ঘরে আসিতেছে—সতীনাথ ইজিচেয়ারে শুইয়া নলিনীর জন্য অপেক্ষা করিল।—নলিনী আসিল, কিন্তু ঠিক যে ভাবে তাহাকে দেখিবে বলিয়া আশা করিয়াছিল, সে ভাবে নয়—সন্ধ্যা তখন হইয়া গিয়াছে, আবছা অন্ধকারে নলিনীর মুখ ভাল দেখা যাইতেছিলোনা—কিন্তু সুরটা অন্যরকম বাজিল। মাথার ওপর চুলচূড়া করিয়া বাঁধা—চোখের কোণে ক্লান্তির আভাস—নলিনী আসিয়াই বলিল,—"কৈ তুমি বেরোওনি? তোমার আদপেই ইচ্ছা নয় যে কিছু করবে। শুধুশুধি আমাকে মিথ্যে ক'রে আশা দাও।

চেষ্টা চরিত্র করবে না—শুধু গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবে,—কেন শুনি? কতদিন আর এরকম পরাশ্রিত হয়ে থাকব?" সতীনাথ আহত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন নলিনী, তোমার কি এখানে কষ্ট হ'চ্ছে?"—অধৈর্য্য হইয়া নলিনী মাথা নাড়িয়া বলিল,—"হাঁ হ'চ্চে একশোবার হ'চ্চে, জানালার ধারে বসিয়া বাহিরে তাকাইয়া বলিল,—"নতুন করে জিজ্ঞেস করচ—তোমার এসব ন্যাকামো আমি বরদাস্ত করতে পারি না। জানালার নীচে ঐ আবর্জ্জনা ও তরিতরকারীর আগাছার মাঝে একটা কামিনীগাছ ছিলো,—সেটা ফুলে সাদা হইয়া আছে, নলিনী ক্লান্ত দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল,—"তুমি মনে মনে ভাবো আমি স্বার্থপর কিন্তু আমি সত্যি বলচি, তোমাদের এবাড়ী যেন আমার জেলখানার মত বোধ হয়—একটু ইচ্ছেমত বিশ্রাম নেই, আলো নেই, আকাশ নেই।" ম্লান হাসিয়া একটু থামিয়া বলিল,—"কোথা দিয়ে যে সূর্য্য ওঠে, কবে যে চাঁদ ওঠে, সবই ভুলে গেছি। শুধু মনে হয় কি জানো?" আবার উদাসভাবে বাহিরে চাহিল। সতীনাথ তিন বছর আগেকার একটী দিনের কথা ভাবিল, সেদিনও মাথায় কাপড় ছিল, সেদিনটা শ্রাবণের এক সন্ধ্যা—ঠিক এমনি ভাবেই প্রশ্ন করিয়া মাথাটা একটু হেলাইয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিল—দূরে দৃষ্টি রাখিয়া কথা বলাই উহার বিশেষত্ব ছিল—নলিনী বলিল,—"তুমি হাস্‌বে শুনে, কিন্তু আমার জীবনে কোথাও যেন সন্ধ্যাও নেই, প্রভাতও নেই—শুধু যেন দুপুর রদ্দুরে চারিদিক জ্বলে যাচ্চে। কিন্তু প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যে বর্ষাকে তো কেউই অনুভব করতে পারে না,—তেমনি যেন কোথাও ছায়া নেই একটু আলো, একটু আঁধারের খেলা নেই, চারিদিক ঝলসানো দ্বিপ্রহর। আচ্ছা, তুমি পূর্ণিমার রাত ভালোবাসোনা? আমি কিন্তু শুক্লা একাদশী কি দ্বাদশীর চাঁদই বেশী ভালোবাসি। সব স্পষ্ট তীব্র আলো, ও আমার ভালো লাগেনা।' সতীনাথ সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, 'তোমার হাতে কি টাকা কিছুই নেই? সেদিন যে দশটাকা দিলাম? কি খরচ ক'রেচ?' 'হাঁ সে তো দিদি সেদিনই চেয়ে নিলেন।'—তা' দেখি, আরও কিছু শীগ্‌গিরই দিতে পারব। আচ্ছা নলিনি, তোমার কি আমার সঙ্গে দেখা হ'লেই শুধু এই সবই বল্‌তে ইচ্ছা করে? শুধু কি আস্‌তে নেই, একটু বস্‌তে নেই, আমি ভেবেছিলাম, অন্তত: এই ফুলগুলো দেখে তুমি খুসী হবে।' ফুলের গুচ্ছটা তুলিয়া তার হাতে দিল। নলিনী ব্যস্ত হইয়া ফুলগুলি রাখিয়া দিয়া বলিল, "থাক, থাক্ আমার এখন ফুল দেখ্‌বার সময় নেই। এখনি ঢুকতে হবে রান্না ঘরে গিয়ে, হাত থেকে তোমাদের সংসারে হাঁড়িই নামেনা, তা আবার ফুল দেখা আর গল্পকরা ভালো ও কি লাগে তোমার। আমার এখনই যেতে হবে। বিরক্ত হইয়া সে চলিয়া গেলো। সদ্যফোটা কামিনী ফুল গন্ধে আমন্থর দক্ষিণা বাতাস, শুক্লা দ্বিতীয়ার বাঁকা শশীকলায় স্বল্পালোকিত ঘরখানি, রজনীগন্ধার অম্লানগুচ্ছ, তবু তেমনি ভাবেই সুন্দর রাত্রটী অসুন্দর হইয়া গেলো, কোথায় যেন ছন্দ পতন হইয়া সবই গোলমাল হইয়া যায়—সতীনাথ বুঝিতে চেষ্টা করে। নলিনীর চোখের কোণে কালী।

৪

সেদিন তাঁতী আসিয়াছিল নানারকম সাড়ী লইয়া; সর্ব্বজয়া চওরা কস্তাপাড় শাড়ী নিজের জন্য রাখিলেন। একখানি ফিকা নীল রঙের শাড়ী লইয়া নলিনীকে বলিলেন, "মেজ বৌ, এইখানি তোমায় বেশ মানাবে দামও সাত টাকা, রাখবি? নলিনীরও শাড়ীখানি পছন্দ হইয়াছিল, শাড়ীখানা হাতে করিয়া ঘরে গেলো, সতীনাথ একখানা বই হাতে করিয়া শুইয়াছিল, নিস্তব্ধদ্বিপ্রহর বাহিরে রৌদ্র, স্তব্ধ হাওয়া, সমস্ত বাড়ীখানা যেন ক্লান্ত যোদ্ধার মত ক্ষণিক বিশ্রাম করিতেছে আবার বিকালের আগেই কল কল রবে ভরিয়া উঠিবে। নিমগাছের তলায় একটা কাক ডাকিতেছে, নলিনী এটা স্থির জানিয়াই আসিয়া ছিলো যে সতীনাথ তাহাকে খুসী করিতে টাকা দিয়া দিবে, এই রংটা তাহাকে কিরকম মানায় সে কথাও একবার শুনিবে কিন্তু সামান্য মূল্যটা লইয়াই সব ব্যাপারটা অন্যরকম হইয়া গেলো। সতীনাথকে নীরব দেখিয়া নলিনী শাড়ীখানি খাটের ওপর রাখিয়া বলিল, ছাখতো, ঠিক যেমনটী চেয়েছিলাম, সেই রকম নয়? দামও মাত্র সাত টাকা।" নিরুত্তর দেখিয়া নিজের কৃতিত্বটুকু দেখাইবার লোভও সম্বরণ করিতে পারিল না, "তুমি সত্যই বলো এ দামে তুমি আনতেই পারতে না" সচকিত হইয়া বসিয়া সতীনাথ বলিল, 'টাকা কি হবে, কিসের শাড়ীর কথা বোলচো? উৎফুল্ল হইয়া নলিনী বলিল, "তবে আর এতোক্ষণ বলচি কি? কাপড় বেচতে এসেচে, দিদি একখানা রাখলেন, আমি এইখানা নিলাম," আর বলতে পারিনা বাপু—দামটা দিয়ে দাও। রুক্ষস্বরে সতীনাথ বলিল—"টাকা আমার নেই, ও শাড়ীও তোমার রাখা হবে না। "নলিনীর ম্লানচোখ দুটী সহসা দীপ্ত হইয়া উঠিল, 'টাকা নেই মানে? আমার ইচ্ছে হ'য়েচে পছন্দ করে এনেচি তবু টাকা দেবে না?' 'দেবোনা তো বলিনি, থাকলে দিতাম কি না দিতাম ভাবা যেতো, কিন্তু টাকা নেই সহজ কথাটা বোঝোনা?' ঠোঁটের কোণ একটু বাঁকা করিয়া বিদ্রূপের স্বরে নলিনী বলিল, 'কিন্তু রজনীগন্ধাগুচ্ছ কেনার টাকা থাকে, নিত্যি এটা ওটা বাজে জিনিষ, কবিতার বই কেনার টাকা থাকে, থাকেনা শুধু আমার একখানা শাড়ী কেনার সময়, না?" দুঃখে ও রাগে চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল, এতোবড় পরাজয় তবু স্বীকার করিয়াই চলিতে হইবে? সতীনাথ চোখের জল দেখিয়া বলিল, 'বেশ, তুমি যদি আজ ও খরচ গুলোকে এতো বাজে বলেই মনে করো আর করবোনা। কিন্তু তুমি একথা ভালোকরেই জানো, যে ওর কোন একটা খরচই আমি নিজের জন্য করিনা। আজ যদি সেগুলো এতোই বাজে খরচ মনে হ'য়ে থাকে, তবে যাতে শাড়ী কেনবার সময় টাকা চেয়েই পাও, সেই ব্যবস্থাই ক'রব। তুমি আগে জানালে এরকম বিপদে পড়তে না।" নলিনীর মুখ রাগে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, চোখের জল মুছিয়া বলিল, "ও সব ন্যাকামো করবার বয়স তোমারও নেই, আমারও নেই, এরপর ফুল দেখলে নর্দ্দামায় টেনে ফেলে দেবো দুচার পয়সার ফুল এনে খুসী করা বেশ সহজ, বেশী তো খরচ লাগে না কিনা? এর চেয়ে দিদি অনেক স্বাধীন, সে ইচ্ছে করলে সবই করতে পারে। পুরুষ মানুষ ঘরে বসে থাকো, এতটুকু আত্মসম্মান নেই তোমার। চাইনা শাড়ী—বেশ, ভেবেছিলাম—'সর্ব্বজয়ার কণ্ঠ শোনা গেল, 'ওলো নলিনী, বলি রাখবি কি

রাখবিনা বলেই দেনা বাপু—কতক্ষণ ওকে বসিয়ে রাখবি ? এদিকে আমার নীলু মানু ওরা যে কেঁদে সারা হোলো, দুধ নিতে হবে না ? ঘর দোর সারতে হবেনা ? কি যে তোদের গায়ে কাজ রেখে দিন রাত গল্প করা, এতো কি তোদের কথা যে দিনে রাতে ফুরোয়না ?' নলিনী বাহির হইয়া আসিল। আরক্ত মুখখানি চোখের কোণে অশ্রুচিহ্ন তখনো মুছিয়া যায় নাই। সহসা তার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই কহিলেন, 'ও, ঠাকুরপো বুঝি টাকা দিলে না ? সর্ব্বজয়া সখেদে বলিলেন, তা এক কাজ কর হেম, তোর পছন্দ হয়েচে, তুই রাখ, আমি নয় এক সময় দাম দিয়ে দেবো অমন সখ হয়েচে, বেনারসী নয় সোনা গয়না নয়, একখানি শাড়ী তাই রাখবে না ?' নলিনী কোন কথা না শুনিয়া শাড়ীখানা তাহার হাতে দিলো, 'না দিদি, আমার অত সখ নেই, তাছাড়া তুমিই বা কোথা থেকে দেবে ? আর ওঁরা না দিলে আমরা কোনটাই বা করতে পার্চ্চি ?' সর্ব্বজয়া যদিও নিজের অবস্থাতে যথেষ্ট সুখী, তবু একটু ভাবিয়া বলিল, 'মিথ্যে বলোনি ভাই, তুমিতো যেন ছেলে মানুষ, এই আমাকেই দেখোনা এতোটী ছেলের মা হয়েচি, এই সংসারে খেটে খেটে হাড় কালী হ'য়ে গেলো।' নিজের কর্কশ, শীর্ণ হাতের দিকে চাহিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, ইচ্ছেমত একটা খরচ কি না বলে কর্‌বার উপায় আচে ? কারবারী মানুষের ভাই একটী পয়সার হিসেব নিতে ভুল হয় না। একপাল ছেলে মেয়ে, শরীরও ভালো না, নিজের জ্বালায় হাউ কাউ করে থাকি। তবে আমি তাও মিথ্যে বলে, লুকিয়ে চুরিয়ে ওরই মধ্যে দুচার টাকা হাতে রাখি, নইলে আমিই কি এই কাপড় রাখ্‌তে পারতাম ? যাকগে, দেরী হয়ে গেলো যাই তবে বিদায় দিয়ে আসি।' নলিনী কাষ ভুলিয়া যায়, দুপুরের রৌদ্রে আভাষ দেখা যায়, নীচে ছেলেদের কলরব, রান্নাঘরে উনানের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উপরের দিকে উঠিয়া যায়। নলিনী ভাবে, এমনি করিয়াই প্রতি পদে পদে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে হয় সর্ব্বজয়ার কথা ভাবিয়া দুঃখে ক্ষোভে মন ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে।

(৫)

সতীনাথ এখন নলিনীকে প্রায়ই কোন দূরদেশে যাওয়ার আশ্বাস দেয়। সেদিনও বলিল, নলিনি এবার আর বাজে কথা নয়, এই মাসেই যাবো মধুপুরে, সেখানের কায যদি নাই পাই, এলাহাবাদেরটা তো হাতে আছেই।' নলিনী উৎসাহপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া বলিল,—কবে যাবে ? আমায় নিয়ে যাবে কবে ? শুধু তুমি আর আমি ? একখানা বাড়ীতে আমি তুমি থাকবো ?' পরে ম্লান হাসিয়া বলিল,—'ও তো তুমি কতই বলো ৩৪ বছরই এমনিগেলো আর কবেই বা যাবো ?—সেদিনের প্রতীক্ষা কর্‌তেও আমার ক্লান্তি আসে। আচ্ছা যদি এই মাসেই যাও, তবে বাসা করে আমায় নিয়ে যেতে কতই আর দেরী হবে ? নাহয় দুমাস, নয় তিনমাস, তা আমি খুব থাক্‌তে পারবো। তুমি যে বাড়ী করবে তার ওপর তালায় শুধু একখানা ঘর থাক্‌বে সেটা আমাদের বসবার ঘর। সতীনাথ চাকরীর চেষ্টায় বাহিরে যাইবে এইমাত্র জানিত কিন্তু নলিনীকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য ভবিষ্যতের উজ্জ্বলচিত্র কল্পনায় বাধা সে দিবেনা 'কিন্তু যদি

একতালা হয় ? আর ধরো এই যাট কি সত্তর টাকায় তুমি চালাতে পারবে তো ?'—ক্ষুণ্ণ হইয়া নলিনী বলিল, 'মাত্র ষাট টাকা ? তা হ'লইবা কিন্তু রান্নাঘর ভাড়ারঘর, এসব দূরে থাক্‌বে, আমি মাছ কুটবো, রান্না করবো সে সবের সঙ্গে তোমায় কোন যোগ থাক্‌বেনা সে ভারী বিশ্রী লাগে, শুধু আমি যখন অবসর হয়ে বসবার ঘরে আস্‌বো, তোমার প্রতীক্ষা করে থাকবো, তখনই আসবে। অত গায়ে গায়ে থাকা ভালো লাগেনা কিন্তু ওখানেও তো লাল মহুয়ার বন থাকবে, নয় ?'

ইহার পরে সতীনাথ বাহিরে চলিয়া যায় কিন্তু সে সূত্র টুকু ধরাইয়া দিয়া যায় নলিনীর অনেক কর্ম্মক্লান্ত সকাল বিকালে, কল্পনার জাল বুনিতে সেই যথেষ্ট। একখানি শান্তির নীড়, উন্মুক্ত বাধাহীন জীবনের কিমাধুর্য্য, ছন্দোবদ্ধো একখানি কবিতার মত তাহাদের জীবন বহিয়া চলিবে। শুধু ভালোবাসা, প্রতীক্ষা, প্রতি সন্ধ্যার স্বহস্তে ধূপ জ্বালিয়া প্রিয়জনের প্রতীক্ষায় জানালায় বসিয়া থাকিবে, বাহিরে বৈচিত্রময়ী প্রকৃতির নিত্যনব আমন্ত্রণ, হয়তো আজিকারমত একটা অন্ধকার বর্ষার রাত্রে অশ্রান্ত শ্রাবণের ধারার সঙ্গে একটী নারী ও একটী পুরুষ জাগিয়া বসিয়া থাকিবে, কখনো একটী দুটী গানের কলি নলিনী গুণ গুণ করিয়া গাইবে, হয়তো শিথিলকবরী হইতে দোলন চাঁপা, খুলিয়া পড়িবে ঘন বরিষণ, বাহিরে ঘরে নলিনী ও সতীনাথ দুজনে বসিয়া নলিনীর দৃষ্টি ভবিষ্যৎ জীবনের মাধুর্য্য ভরা দিনও রাতগুলি, বহুদূর পর্য্যন্ত ভাবিয়া চলে। কিন্তু মিথ্যা কল্পনার জাল বোনা আর চলেনা, নীচের কোলাহল, বাহিরে বর্ষার কলরোলকে চাপাইয়া দু একটা টুকরা কথা বাক্য কানে আনিতেছে, নলিনী উঠিয়া একবার আয়নায় মুখখানা দেখিয়া লইয়া নীচে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

সর্ব্বজয়া ক্রন্দনরত মানুকে কোলে, ও বেলুর হাত ধরিয়া চীৎকার করিতে করিতে দরজার কাছে দাঁড়াইলেন, 'মেজবৌ, বলি মনে করেচ কি ? এমনি করে জব্দ করবে না ?'

নলিনী আজ কাহারও অপ্রিয় বাক্য কানে তুলিবেনা, আর কটা দিনই বা, রাত্রির অন্ধকার অপসৃত হইয়া আসিতেছে, পূর্ব্বাকাশে অরুণের আভাস। ত্রস্তে বাহিরে আসিয়া সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া কোলে করিয়া বলিল, চলো দিদি এখনি যাচ্চি। কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল টের পাইনি।'

সর্ব্বজয়ার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ, নিষ্প্রভ চোখদুটীর কোণে কোথাও এতটুকুও সহানুভূতি নাই, সাতাশ বছর বয়সে সাতটী সন্তানের জননী, নিজের জীবনের তিক্ত বিরক্তিতে তিনি বর্ষার বৃষ্টিধারা রাতটীতে নলিনীর কাযের শৈথিল্যতায়, কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারেন না। তাঁহার জীবনে মাধবীরাত্রের তারা ভরা আকাশ, বর্ষার ঘন অন্ধকার রাত্রি, কোনটাই মধুর, সুন্দররূপে দেখা দেয় নাই। বসন্তের মত্ত বাতাস তাঁহার বাসন্তী শাড়ির অঞ্চল উড়াইয়া দেয় নাই।

'দুটীতে মুখোমুখি বসে থাকো, আমি তো দাসী আছিই, আর তুমি রাণী না ? উনুনে যে দশসেরের কয়লা পুড়ে গেলো, এ লোকসান কে দেয় শুনি ? আমার মানু বিন্দু সব না খেয়ে ঘুমিয়ে

পড়ে তাতে ওর কি? কি স্বার্থপরই তুমি হয়েচো এই একজন আছে গলাবাজী করবে, বকবে ঝক্‌বে, করবেই সব, কেন এতটুকু গ্রাহ্য নেই?'

নলিনী ক্লান্ত স্বরে বলিল, 'এমন আর কি হয়েচে দিদি। রোজ তিরিশ দিনে বিকেল থেকে আর রাত দশটায় রান্নাঘরে হাতাবেড়ী নিয়ে থাকা আমার ভালো লাগেনা। তোমার সবতাতেই বকা আমার ভালোলাগেনা।' রাগে সর্ব্বজয়ার পাণ্ডুর মুখ লাল হইয়া ওঠে স্বর অনুকরণ করিয়া বলিলেন, কি, ভালো লাগেনা, রোজ গতর খাটাতে ভালো লাগেনা, খেতে তো রোজই ভালো লাগে? শুনলে তোমরা? উনি রাত দিন খেটে মরচেন আর আমি আছি খুব সুখে নয়? আমি খিটখিট করে রাতদিনই ওর সঙ্গে লাগি, এ্যাঁ আমি মরচি মুখে রক্ত উঠে খেটে খেটে, আরও আমায় এমনি কথা বলে? শুনলে তোমরা? সর্ব্বজয়া একবার কথা বলিতে সুরু করিলে থামেননা। তাঁহার গাম্ভীর্য্য নাই, তাই ভয় বা সমীহ আসেনা—বিরক্তি ও ক্লান্তি আসে।

নলিনীর মন থেকে মুক্তির সম্ভাবনা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতই উড়ে যায়। বাইরে একবার তাকাতে যায়, কিন্তু সেখানেও অবরুদ্ধ, দৃষ্টি বাধা পেয়ে রান্নাঘরেই ফিরে আসে। সবগুলো বাতায়নই যদি বন্ধ থাকে তবে দক্ষিণা বাতাস কোথা দিয়ে আসবে?

(৬)

আরো দুই বছর পরে সতীনাথ অনেক চেস্টার পরে রাণীগঞ্জে কায পাইয়া বাসা করিয়া যখন হেমনলিনীকে লইতে আসিল, তখন তার মেয়েটী বছর দুয়েকের। নলিনী আর খানিকটা মোটা, ও ময়লা হইয়াছে। মাত্র চার দিনের ছুটী। রাত্রে শোবার ঘরে নলিনীকে বলিল, মোটে সময় নেই কিন্তু, কালকে বিকেলের ট্রেণে রওনা হতে হবে।' ঘরের মধ্যে স্তুপাকার জিনিষপত্র ছড়িয়ে নলিনী বসেছিল। চাবীসমেত আঁচলটা মাথায় তুলিয়া নিয়া বলিল, 'ওমা, সে কি করে হবে? এতোসব জিনিষপত্র গোছ গাছ করা, বাসন কোসন সব হিসেব করে নিতে হবে, সে বড় ঠাকুর এলে পরে তাঁর কাছ থেকে নিতে হবে, তাছাড়া একটা সংসার নতুন করে পাতা, তার কায তো কম নয়? সতীনাথ চেস্টা করিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, 'ওসব কিছু নিতে হবেনা, সে একরকম চলে যাবে।"

নলিনী চাবীদিয়া তালাটা ভালো বন্ধ হইয়াছে কিনা দেখিয়া বলিল,—"তুমি বল্‌লেই তো আর আমি আমার ভাগ ছেড়ে দেবোনা? তাছাড়া মাও তো বল্‌ছিলেন, ওসব আমাদের সংসারের জিনিষ, ওতে দিদিরও যেমন, আমারও তেম্‌নি, দু'জনকারই সমান ভাগ আছে।"

সতীনাথ ইজিচেয়ারে বসিল, নলিনী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"হাঁ, ভালো কথা, তোমার বাসা ভাড়া নাকি চল্লিশ টাকা? সত্যি?" সতীনাথ একটু বিপন্নভাবে বলিল, "তার কমে যে বাসা পাওয়া যায়, তাতে মাথাগুঁজে থাকা চলে, কিন্তু আলো হাওয়া ভাল খোলামেলা বাসা পাওয়া যায় না। কিন্তু এতোদিন পরে এলাম, এতোদিন পরে তোমায় তোমায় নিজের জায়গায় নিয়া যাব, এ সব কথা কেন নলিনী?"

নলিনী বাধা দিয়া বলিল, — "আর আসবাবপত্র। "সে কিছুই নয় শুধু একখানা খাট, আর দুটো ইজিচেয়ার। আর তোমার জন্যে একখানা বড় গোল সাদা পাথরের টেবিল—তুমি দেখবে—নলিনী উচ্চ হাস্যে বলিল, "ওমা খাট, চেয়ার এসব আবার কেন? তুমি যে এমনি দু'হাতে টাকা নষ্ট করচ—সে আমি আমি আগেই দিদিকে বলেচি। তা যা করেচ করেচ' এসব নিয়েই ও বাসা তোমার ছেড়ে দিয়ে টাকা কুড়ি পঁচিশের মধ্যে একটা দেখে নিতে হবে।' একটু সরিয়া আসিয়া বলিল, "হঁ্যা গা টেবিল চেয়ারে কি হবে? তোমার কাজ কর্ম্মে লাগতে পারে, আমি কি টেবিল চেয়ারে ব'সে লেখাপড়া ক'রব না, দু'জনে বসে ব'সে ব'সে গল্প ক'রব? পুরুষ মানুষের একটা সখের ঝোক আর কি? আর তোমারইবা দোষ কি, আমি নেই, তাইতেই এমনি খুব খরচপত্র ক'রেচ।"

সতীনাথ ক্লান্ত হইয়া চোখ বুঁজিয়া বলিল, "সত্যিই নলিনী, তোমায় আমি নিতে এলাম বটে, কিন্তু দেরী হ'য়ে গিয়েচে' বড় দেরী হ'য়ে গিয়েচে, বড় দেরী হ'য়ে গিয়েচে। না নলিনী?" আলোটা সরিয়া দাও তো?" নলিনী অপ্রস্তুত হইয়া আলোটা সরাইয়া রাখিয়া কাছে আনিয়া বলিল, তুমি ঘুমোও রাস্তার কষ্ট গিয়েচে।"

বাহিরে যেন বৃষ্টির আর বিরাম নাই, দমকা হাওয়ার সঙ্গে ভেজা যূঁইয়ের গন্ধে ঘরটা আমোদিত করিয়া গেল। সেই পোড়ো জায়গাটীতে বর্ষার জল জমিয়াছে, তাহার উপর রাস্তার আলোটা পড়িয়া চিক চিক করিতেছে, সতীনাথ ধীরে বলিল, "নলিনী এটা শ্রাবণ না?" নলিনী দ্রুত আসিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, হঁ্যা, তা আর বুঝ্‌তে পারচোনা? দু'চক্ষে এই বর্ষার দিনগুলো দেখ্‌তে পারি না, দেখোনা জলের ছাঁটে বিছানা শুদ্ধু ভিজে উঠেচে।" সতীনাথ ক্লান্তস্বরে বলিল, "নলিনী একটু এখানে বস্‌তে পারো না শুধু চুপ করে?" নলিনী বলিল, একটু পা টিপে দেবো? নয়তো একটু তেল গরম করে পায়ে মালিশ সতীনাথ কোমলভাবে বলিল, "না কিছুই লাগ্‌বে না, এমনি বলছিলাম।" নলিনী অবজ্ঞাভরে বলিল, "ওঃ শুধু বসার সময় নেই, আমার তার চেয়ে আমি গোছগাছ ক'রে রাখি।"

নলিনী ক্ষিপ্রহস্তে স্তরে স্তরে কাঁথা, কাপড়, চাদর সব ভাঁজ করিয়া করিয়া বাক্সে তুলিতে লাগিল, সতীনাথ বিনিদ্র আঁখি বাহিরের অন্ধকারের দিকে মেলিয়া ভাবিতে লাগিল, বাহিরে অশ্রান্ত বৃষ্টির ধারাবর্ষণ, নলিনার চোখে ঘুম নাই কাপড় মাথার উপর নাই, একটা দোলন চাঁপা শুভ্র, ওর কালো চুলের উপর আনমনে বাতায়নে বসিয়া বসিয়া থাকিবে, হয়তো সেই আগেকার নলিনীর মত শুধু অকারণেই বসিয়া থাকিবে। কিন্তু সত্যই তাহার আসিতে দেরী হইয়া গিয়াছে।

আমেরিকার চিঠি

শ্রীকমলা মুখার্জ্জি

দাদা,

ঘটনাচক্রে আজ আমরা দু'জনেই আমাদের দেশের সাধারণ নিয়মের কতকটা বাইরে এসে পড়েছি। অর্থাৎ তুমি ঘরে, আর আমি বাইরে, তুমি বাংলা দেশে, আমি সুদূর আমেরিকায়। বিদেশের খবর জানবার জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষা যেমন প্রবল, তোমাদিগকে এদেশের খবর জানাবার আকাঙ্ক্ষাও আমার তার চেয়ে কিছু কম নয়। তাই আজ এ চিঠি।

আমেরিকার অতিক্ষণস্থায়ী গরম কালটুকু, দারুণ শীতে ও বরফে আবৃত হবার আগেই এদেশের এই গরম কালের জীবনের একটু খানি আভাস আজ তোমায় দেব। আগেই তোমায় জানিয়েছি, এ দেশের নর নারীরা গরম কালটা কত রকম ভাবে উপভোগ করে। ঘরে কেউ বড় থাকতে চায় না সাধ্যমত কেউ থাকেও না মোটরে, ট্রেণে, জাহাজে, প্লেনে যার যেমন ক্ষমতায় কুলায় সবাই ছুটছে ঘরের বাইরে। এমন কি যারা পাহাড়ের উপর বাস করে তারা গরমকালে আসে সমুদ্রের তীরে আর তীরের লোকেরা ছোটে পাহাড়ের দিকে। মোট কথা যাতায়াতের ভিড় লেগেই আছে। অসংখ্য সুন্দর মোটরের রাস্তাগুলি পাহাড়ের গা বেয়ে নদীর তলা দিয়ে নদীর উপর দিয়ে মোটর যাত্রীদের সকল সুখ সুবিধার জন্য হাসি মুখে ধরণীর বুকে শুয়ে আছে। পুরাণ বা নূতন, সস্তা বা দামী, নানা রকমের গাড়ী, নানা অবস্থার, নানা বয়সের লোকগুলি নিয়ে কেবলি ছুটে চলেছে।

আমেরিকার যে কোনও দিকে তাকালে কেবলই মনে হবে যে এটা বুঝি কল কারখানারই যুগ। মেসিনে না হচ্ছে এমন কাজ বোধ হয় নাই। জমি চাষ করা থেকে, বাসন মাজা ঘর পরিষ্কার করা এমন কি অসময়ে জাত ক্ষুদ্র শিশুকে সজীব ও জীবন্ত করে তোলা সবই মেসিনে ক'রেছে। যাক্, মেসিনের যুগ নিয়ে আজ তোমায় কিছু লিখ্‌তে যাচ্ছিনা, যাচ্ছি শুধু এদেশের নর নারীদের জীবনের অন্য একটা দিক জানাতে।

এদেশের আবহাওয়ায় দিন কাটিয়ে আমারও এদের মতই ছোঁয়াচে রোগে ধরেছে। অর্থাৎ গরম কাল এলে আর ঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখ্‌তে ইচ্ছা করে না। কোথাও নির্জ্জনে, বা পাহাড়ে কোন একটী সুন্দর দৃশ্যের কাছে কয়েকটা দিন কাটাতে ইচ্ছা করে। তাই এই স্বাভাবিক ইচ্ছাটাকে পূর্ণ করবার জন্য যখন একটা camp থেকে যাবার নেমন্তন পেলাম, তখন আমার "Shopping" বা বাজার করার ধূম দেখলে তুমি নিশ্চয়ই মনে করতে আমি বুঝি কত কালের জন্যই মানব সভ্যতা ছেড়ে কোথাও বনে জঙ্গলে বাস কর্‌তে যাচ্ছি। বাস্তবিকই সম্পূর্ণ তা না হলেও কতকটা যে বনবাস সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। Camp

এ বাস করতে হ'লে তার উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদ জামা, জুতো ইত্যাদি অনেক জিনিষরই দরকার হয়। তা বলে মনে করোনা যেন এদেশের মেয়েরা গরমের দিনে তাদের গায়ের মাত্র কয়েক ইঞ্চি ছাড়া সারা শরীরটা কখনও ঢাকে। আমার পোষাক পরিচ্ছদ যদিও সাধারণতঃ সাড়াই ছিল, তবু তা নিয়ে পাহাড় ভাঙ্গা জঙ্গলে "Hike" করা অর্থাৎ হৈ, হৈ ক'রে বেড়ান অসম্ভব বলাও যেতে পারে। তাই আমাকে এদেশের পোষাক অর্থাৎ হাফ প্যান্ট ও সার্টের ব্যবস্থা ক'রতে হয়েছিল। তুমি নিশ্চয়ই এই অপূর্ব্ব সাজে আমার চেহারা দেখতে কেমন হয়েছিল তা ভেবে মনে মনে খুব হাস্‌ছ, না ? কি করা বল ? "যস্মিন্ দেশে যদাচার" বুঝ্‌লেত ? যা হোক, সঙ্গে নেবার যা কিছু সবই যখন গুছিয়ে ব্যাগে পুরে নিলাম তখন দেখি জুলাই মাসের শেষ রাতটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে— অর্থাৎ রাত ১২টা বাজ্‌তে যাচ্ছে। মিনু তার যাবার উত্তেজনায় অনেকক্ষণ বিছানায় ছটফট্ করে শেষে ঘুমিয়ে পড়েছে, আর ডাক্তার বিছানায় শুয়েই নানা উপদেশ দিচ্ছিলেন, যাতে ওখানে সাবধানে থাকি অর্থাৎ জলেও না ডুবি আগুনেও না পুড়ি।

ভোর ৫টায় উঠে হাত মুখ ধুয়ে সামান্য প্রাতঃরাশ খেয়ে এক হাতে মিনুকে ধরে অপর হাতে একটা মাঝারি গোছের সুট্ কেস্ (Suitcase) নিয়ে ছুট্‌লাম। নিউইয়র্কবাসীরা সাধারণতঃ নিশাচর, কেউ বড় রাত ১টার আগে ঘুমুতে যায় না। কাজেই এত সকালবেলা সাব্‌ওয়েতে (মাটীর নীচে কার গাড়ী) কয়েক জন মাতাল ও কয়েক জন শ্রমিক ব্যতীত আর বড় কেউ ছিল না। এই সাব্‌ওয়েতে আধ ঘণ্টা চ'ড়ে, পরে ট্রেণে ঘণ্টা খানেক কাটিয়ে New Jersey state এর Newark সহরে গেলাম। পরে Bus এ চড়ে একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছুলাম। এখানে সকলের সঙ্গে জড় হবার কথা এবং সাড়ে সাতটায় এখান থেকে পুনরায় বাস্ নিয়ে প্রায় ৭০ মাইল দূরে Still water camp হোল আমাদের গন্তব্য স্থান।

এ দেশের মেয়েরা পর্দ্দানশীন নয় তাই সঙ্গে পুরুষ মুটে মজুরও পাওয়া যায় না, কাজেই বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা সকল বয়সের মেয়েকেই কোথাও যেতে হলে (ট্যাক্সি না নিয়ে যেতে হলে) নিজেদের বোঝা টেনে নিয়ে একলা চল্‌তে হয়। যখন আমার নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অনেক মেয়েরা নিজেদের বোঝা নামিয়ে দল বেঁধে নানা তামাসা করতে লাগ্‌লো। আমি তখনও দলের কর্ত্রী ছাড়া আর কাউকে চিন্‌তাম না ব'লে এক জায়গায় হাতের ভারী সুট্‌কেস্‌টা নামিয়ে দাঁড়ালাম। এই "হংস মধ্যে বক যথা" হয়ে কতকটা অস্বস্তিও বোধ হ'তে লাগ্‌লো। মাথায় কাপড়, পরণের শাড়ী, সিন্দুরের ফোঁটা, এর কোনটার সঙ্গেই যেন এদের সঙ্গে মিশ খাওয়াতে পারলুমনা, চেহারার কথা তো বাদই দিলাম। মনে মনে ভাব্‌লাম, কেনই বা মরতে এলাম ? এই অচেনার মধ্যে নিজেকে চেনাব কি করে ? বেশীক্ষণ ভাব্‌বার সময় হোলনা, চোখে মোটা চশমা আঁটা একটা ১৪ বৎসরের মেয়ে তার গালভরা হাসি নিয়ে আমায় বল্‌লে, "তুমি ভারতবর্ষের লোক ? আমাদের সঙ্গেই বোধ হয়

Campএ যাচ্ছ ?” আমি সম্মতি জানাতেই তাড়াতাড়ি আমার সুটকেস্‌টা হাতে নিয়ে আমাকে একটী মহিলার সঙ্গে আলাপ করে দিল। মিনু ইতিমধ্যেই একটী তার সমবয়সী মেয়ে বেছে নিয়ে আলাপ করে নিয়েছে, কাজেই এর মা হাঁফ্ ছেড়ে কিছুক্ষণের জন্য বাঁচ্‌ল।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটায় Bus খানি এসে পৌঁছুল এবং আটটার সময় আমাদের ৫০ জন যাত্রীকে নিয়ে ছুটে চল্‌ল। যাবার পথে কেউ বোধ হয় এক মুহূর্ত্তও নিস্তব্ধ ছিল না। সারা পথ গান গাইতে গাইতে সবাই চল্‌ল। একটার পর একটা হাসির গান, Campএর গান ইত্যাদি অনেক শোনা গেল। Bus মাঝ পথে একটা দোকানের সামনে সবাইকে নামিয়ে দিল, দরকার হলে বিশ্রাম ঘরে যাবার জন্য ও Candy, Ice cream কিন্‌বার জন্য। মেয়েরা তাদের রুচি মত সকলেই কিছু কিছু কিনে আবার বাসে উঠে বস্‌ল। একটী ছোট্ট মেয়ে আমার পাশে ব'সে ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “তুমি Ice cream কিন্‌তে গেলে, কিন্তু কিন্‌লে না কেন ? মেয়েটী তার বড় চোখ দুটী আরও বড় করে বল্লে, “এ দোকানদারটা জঙ্গলে থাকে কি, না, তাই বোধহয় কখনো “Depression” কথাটা শোনেনি। তাই পাঁচ সেণ্টের আইস্‌ ক্রিমের জন্য দশ সেণ্ট চায়। আমার অত দাম দিয়ে আইস্ ক্রিম খাবার সখ্ নেই।” দেখলুম তার মত আরো অনেকে আইস্‌ক্রিমের দ্বিগুণ দাম শুনে হতাশ হয়ে সস্তায় Candy কিনে এনেছে, অথবা পয়সা পকেটে পুরেছে। বেলা সাড়ে এগারটায় আমরা Campএ পৌঁছুলাম। Campএর কর্ত্রী আমাকে খুব সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং “Make yourself quite at home” বলে হাসিমুখে অন্যত্র গেলেন। এ রকম ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম তাই যে কটা দিন ছিলাম, নূতনের মধ্যে সবই আমাকে যেন কেমন একটা নূতন রকমে মুগ্ধ করে রেখেছিল। কেবলি মনে হয়েছিল, আমাদের দেশে আমরা কেন এ রকম একটা কিছু করিনা ? এই Campটী যে কি ভাবে, কার দ্বারা চল্‌ছে এবার তাই বল্‌ছি।

এদেশের গির্জ্জাগুলো ধর্ম্ম ছাড়া আরও যে কত রকমে সমাজ সেবা করে, যদি তুমি তা দেখ, তবে অবাক্ হয়ে যাবে। আমার মনে হয় আমাদের মন্দির ও মস্‌জিদগুলোর সঙ্গে এদের গির্জ্জার তফাৎ—একেবারে আকাশ ও পাতালের মত। এরা গির্জ্জায় যেয়ে আমাদের মত শুধু পূজা, প্রার্থনা, বা উপাসনা করেই এদের কর্ত্তব্য শেষ করে না বরং অনেক ক্ষেত্রেই আরম্ভ করে। নানা উপায়ে সমাজ সেবা এরা ধর্ম্মেরই একটা অঙ্গ বিশেষ বলে মনে করে। তাই ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে এদের অনেক রকম activities দেখে এদের প্রশংসা না করে পারি না। আমি যে Campটীতে গিয়েছিলাম এটা Newarkএর সব চেয়ে পুরাতন Presbyterian গির্জ্জার সম্পত্তি। এই গির্জ্জার একজন খুব ধনী সভ্য তার দুইশত একার জমি ও তার সঙ্গে একটা বাড়ী, হ্রদ পাহাড়, বন সবই গির্জ্জার মেম্বারদের ছেলে মেয়েদের গরমের সময় স্বাস্থ্য ভাল রাখ্‌বার জন্য দান করেছেন। জায়গাটী অতি সুন্দর। একটি পাহাড়ের উপর। Campএর দু'দিকে সুন্দর হ্রদ। গাছ পালা যেমন প্রচুর, মশাও তেমন অফুরন্ত। তবে সুখের বিষয় এ মশাগুলি শুধু কামড়িয়েই ছাড়ে, শরীরে বিষ ঢুকিয়ে দেয় না।

গরমের ছুটীর দুটী মাসের একটী ছেলেদের ও অপরটী মেয়েদের সমান ভাবে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ছেলেরা প্রথম মাস কাটিয়ে গেলে, পরে মেয়েরা আসে। আমি এই এখানে মেয়েদের দলেই গেলাম। তুমি হয় তো ভাবছ যে আমি যখন খৃষ্টান নই বা গীর্জ্জার ধার দিয়েও বড় একটা "ঘেঁসিনা" তখন এর ভিতরে প্রবেশ করলাম কি করে? তবে বলি শোন।

এই গির্জ্জার পাদরী বছর দুই আগে একদিন তার গির্জ্জায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য ডাক্তারকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। সে সঙ্গে আমিও বাদ যাই নাই। সেই থেকে এই 'সদাশিব" মানুষটীর সঙ্গে আমাদের বিশেষ বন্ধুত্ব হয়; এবং ইনি-ই এ Camp এ যাবার জন্য আমাদের বিশেষ করে অনুরোধ করেন। ধর্ম্মের গোঁড়ামি যেখানে বেশী সেখানে আমার যাবার সাধ বড় কম। তা তুমি জান। কাজেই প্রথম তত গা করিনি। কিন্তু এবারেও আবার যখন সাদর নেমন্তন্ন এল তখন আর 'না' করতে পারলাম না। ভাবলাম এ দুনিয়ায় যতটুকু না পাওয়া যায় তাই আমার লাভ, কাজেই ইনি যখন আদর করে ডাকছেন তখন কেন ছেড়ে দিই? জাত ত আর আমার যাবে না, দেখি না কেন ওখানকার জীবন কির কম? ধর্ম্মটাকে বাদ দিয়ে সৌন্দর্য্যটাকে কি আর বেছে নিতে পারব না? তুমি কি বল? আমার মতে মত দিচ্ছ ত?

আমি যখন এ Camp এ ছিলাম তখন এই বিশাল মাঠের মধ্যে ৮০টী মেয়ে ছাড়া, দুটী রাঁধুনী, দুটী Life saver একজন নার্স ও Camp এর কর্ত্তা, তার স্ত্রী, ও ছেলে মেয়ে বাস করতেন। মেয়েদের Camp খাবার ঘর থেকে ¼ মাইল দূরে। প্রত্যেকটী Camp এ আটটী করে বাঙ্ক (Bunk) এবং মোট এই রকম ১০টী Camp আছে। তা ছাড়া দুটী প্রকাণ্ড বাড়ী আছে। এর একটীতে রান্না হয়, একটীতে আফিস ও ডাক্তারখানা, তৃতীয়টীতে থিয়েটার, মিউজিয়াম ইত্যাদি। মেয়ে Camperরা ও তাদের লীডাররা ছাড়া আর কারো ওখানে থাকবার নিয়ম নাই। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় যথা নিয়মে প্রার্থনা ও উপাসনা, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও নামান ছাড়া মেয়েরা প্রতিদিন ৪ বেলা স্নান ও সাঁতার কাটবার খেলা ধুলো করবার যথেষ্ট সময় পায়। স্নানের সময় Life saver সঙ্গে থাকে, কাজেই জলে ডুবে মরবার কারো সখ থাকলেও তা মেটাবার সুবিধা নাই।

প্রাতঃরাশের আগে সকলে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে জাতীয় পতাকা তোলে। পরে এখানে বসে বাইবেল পড়া ও সঙ্গীত গাওয়া হয়। প্রাতঃরাশ ও ধর্ম্ম কথা হয়ে গেলে পর এই সব লীডাররা মেয়েদের নানারকম রুচি অনুযায়ী হাতে কাজ শেখান। কেউ গয়না তৈরী করতে শেখে, কেউ ছবি আঁকতে শেখে কেউ Nature Study করতে অর্থাৎ ফুল, পাতা, গাছ ফল, মাকড়, ফড়িং, সাপ (!) এমন কি চন্দ্র নক্ষত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে শেখান হয়। এখানে যে যা তৈরী করে তাকে জিনিষের অনুযায়ী দাম দিয়ে আবার কিনে নিতে হয়। আমি দুটো প্রজাপতি ধরে একটা ছবি তৈরী করে কিনে নিলাম। মিনু নিজের জন্য ব্রেস্‌লেট, একটা ছবি, ব্রাস ইত্যাদি তৈরী করে নিজেকে গৌরবান্বিত করতে চেয়ে তার মায়ের Pocket Book

অনেকটা হাল্কাই করে ফেলেছিল। যাহোক এখানে যেমন দেখ্‌লাম তাতে মনে হল এখানে কোন মেয়েকে অলসভাবে বসে কাটাবার সুযোগ দেওয়া হয় না। "যারা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে পাখীর ডাকে জাগে" কথাটা এ Camp এ বেশ স্পষ্ট করে অনুভব করলাম। সবাইকেই একটা বেশ নিয়মের মধ্য দিয়ে দিন কাটতে হয়। সকলেই এক সময়ে এক জায়গায় উপস্থিত হওয়া চাই, এবং একসঙ্গে মিলে মিশে কাজ করা চাই। এই Camp এ সাধারণতঃ ৮ বছর থেকে ১৭।১৮ বৎসরের মেয়েরা আসে। বড় লোকের মেয়ে বলে খাতির বেশী বা গরীবের মেয়ে বলে অবহেলা

একদল মেয়ে Nature Study করতে বের হচ্ছে

[সকলের প্রথম কাজ জাতীয় পতাকা উত্তোলন

করা এসব কদর্য্যভাব মোটেই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। সকলেই সমান ব্যবহার ও আদর পায়। খাবার গুলো এখানে খুবই সাদাসিদে ও স্বাস্থ্যকর। অপর্য্যাপ্ত দুধ ও শাক্ শব্‌জীই এদের বেশী খেতে দেওয়া হয়। মাংস খুবই কম, কিন্তু খুব ভালভাবে রান্না করা হয়। এছাড়া এদের বাসন মাজাটাও একটু নূতন রকমের বলে তোমায় না জানিয়ে পারছিনা। এরা সর্ব্বদা কড়ির বাসন ব্যবহার করে। আমাদের দেশের মত কাঁসা বা পিতলের বাসন কখনও দেখ্‌তে পারেনা প্রত্যেক মেয়েকে থালা বাসন, কাঁটা, চামচ ছুরী ও কাপ্ দেওয়া হয়। একটা প্রকাণ্ড আল্‌মারির মত বাক্সতে খোঁপ (এরা বলে cubby hole) করা আছে এবং প্রত্যেক camper তার নম্বর অনুযায়ী বাসন নিয়ে নির্দ্দিষ্ট টেবিলে খেতে বসে। না, এখানে রাঁধুনী বা কেউ এসে পরিবেশন করেনা। সকলের টেবিলে বসা হয়ে গেলে পিয়ানো বাজিয়ে ভগবানকে প্রথমে ধন্যবাদ জানিয়ে

গান করা হয়। এই গান শেষ হলে প্রত্যেক টেবিল থেকে একটী করে মেয়ে (Runner) রান্নাঘরে যেয়ে রাঁধুনীর কাছে থেকে খাবার জল ও দুধ নিয়ে আসে। প্রত্যেক টেবিলের লীডার সকলের থালায় খাবার দিয়ে দেন। খাবার শেষ হয়ে গেলে খাবারের বাসনগুলো Runner যেয়ে প্রথমে রাঁধুনিকে ফেরত দিয়ে আসে। খাবার পর কিছুক্ষণের জন্য টেবিলে ব'সেই সকলে মিলে সুন্দর সুন্দর গান করে। তারপর এক এক টেবিলের লোক একসঙ্গে যার যার থালা বাসন নিয়ে লাইন করে ধুতে যায়। বাসন ধোবার ঘরে দুটো সরু ও লম্বা Tank আছে; একটাতে সাবান ও গরম জল, অপরটাতে পরিষ্কার গরম জল। প্রত্যেকের থালার পরিত্যক্ত খাবার প্রথমে একটী নির্দ্দিষ্ট ময়লার টিনে ফেলে, পরে সাবান জলে ব্রাস দিয়ে থালা বাসন মেজে তার পরে পরিষ্কার গরম জলে ধুয়ে তুল্‌তে হয়। পরে বাইরের বারান্দায় প্রত্যেকের একখানা করে বাসন মুছ্‌বার তোয়ালে আছে, তাই দিয়ে থালা বাসন ভাল করে মুছে নিজের নম্বর অনুযায়ী cubby এ রেখে দিতে হয়। প্রতিদিন তিন বেলা খাবারের সঙ্গে প্রত্যেককে এই নিয়ম পালন করতে হয়।

ক্যাম্পের ক্রীড়ারত তিনটী তরুণী

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা মেয়েদের Camp fire meeting এ (অর্থাৎ সকলে গোলহয়ে ব'সে মাঝখানে একটী আগুন জ্বালায়) খেলা, তামাসা, গান, প্লে ও পরে পরস্পরে হাত ধরাধরি করে প্রীতি জানান হয়। প্রতি সন্ধ্যাতেই একটা না একটা কিছু নূতন হওয়া চাই। রাত ৯ টার পর আর কারো বাইরে থাক্‌বার নিয়ম নাই। সকলকে বিছানায় চুপ করে শুয়ে থাক্‌তে হবে।

কয়েকটা দিনে এই অচেনা মেয়ে গুলো আমাদের খুব আপন করে নিয়েছিল। ফিরে আস্‌বার সময় মেয়েরা দল করে মোটরের কাছে এসে গান করতে লাগ্‌লো—

"We 're sorry you 're going away, we wish that you longer could stay,
We 're sure we will miss you, we wish we could kiss you,
We 're sorry you 're going away."

গত সপ্তাহে আবার সেখানে বেড়াতে গিয়াছিলাম। এবার মাত্র তিন দিনের জন্য। এবং ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে ছিলাম। Sunday Service এ উনি তাজমহলের গল্প বল্‌লেন।

এ Serviceটী হয় পাহাড়ের উপর সুন্দর গাছ তলায়। তাজের কথায় সকল মেয়েই নানারকম আগ্রহ প্রকাশ করল। কিন্তু মজা হোল যখন উনি সেই রাত্রে তাসের খেলা দেখাতে যেয়ে বললেন, উনি "mind reader" মেয়েরা তখন আর সব ভুলে দলে দলে হাত গুণতে এল। কিন্তু উপায় নাই। ৯টার পর সবাই শুতে যেতে হোল। লীডারদের স্বাধীনতা বেশী, তাই Campergণ বিছানায় গেলে লীডাররা এসে ওঁকে রাত দেড়টা পর্য্যন্ত হাত দেখাবার জন্য জাগিয়ে রেখেছিল। পরের দিন সকালে উঠে দেখি আমার বিছানার কাছেও একদল মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সবাই ভবিষ্যৎ জানতে মহাব্যস্ত। মহা মুস্কিল আর কি! এদের হাত এড়াবার জন্য বল্লাম, আমার স্বামীর ওসব ক্ষমতা বেজায় আছে, তিনি তোমাদের হাত পড়ে দেবেন।" তবু শোনেনা, একেবারে নাছোড়বান্দা। শেষটা আমিও তাই আরম্ভ করলাম। ওমা! দেখি দলে দলে আমার কাছে এসে হাজির। যেন কালীঘাটের কাঙ্গালীর দল। যা বলি তাই মেনে যায়। তাদের ভক্তি একেবারে বেজায় রকম বেড়ে গেল। তাই আস্‌বার শেষ মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত মেয়েগুলো জ্বালাতন করতে ছাড়েনি। এত বোকাও হতে পারে?

তোমাকে এদের জীবনের একটা দিক জানাতে গিয়ে আমি কেবলই ভাব্‌ছি আমাদের মেয়েদের কথা। এরা যেমন গরমের দুটা মাস প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকতে ভালবাসে, দশটী দশ রকম অবস্থার মেয়েদের সঙ্গে মিল্‌বার মিশ্‌বার সুযোগ পায়, আমোদ করতে পারে, আমাদের কেন এমন হয় না? স্বাবলম্বী হবার কত রকম শিক্ষা এরা পায় দেখলে অবাক্ হ'তে হয়। এদের মানুষের ভয় ও নাই, ভুতের ভয় ও নাই, অথচ স্বাস্থ্য ও চরিত্র সংশোধনের ও গঠনের কি সুন্দর ব্যবস্থা। তোমাকে অনেক খবর দিলাম। এবারে পালাই। ইতি

তোমার বোন

কমলা

পুঃ

তোমাকে একটা কথা লিখতে ভুলে গেছি। Campএ কোন প্লে হ'লে বা বক্তৃতা হলে হাত তালি না দিয়ে মেয়েরা আনন্দ সূচক ধ্বনি করে How! How! আমি বাংলা মতেই প্রকাশ করতাম, হাউ, হাউ।
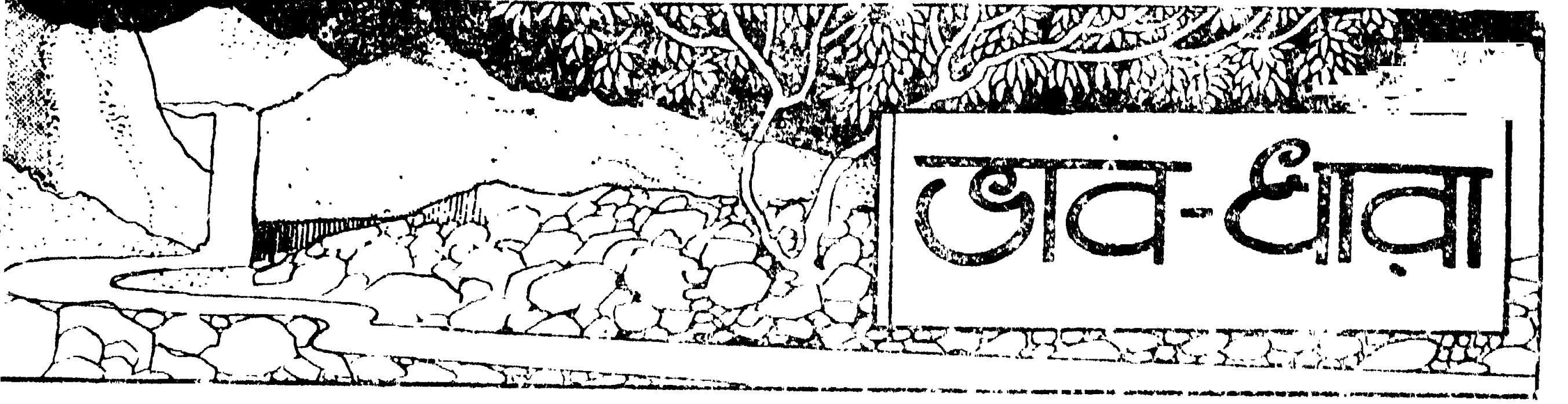
নব নারী-ধর্ম্ম

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

একদিন ছিল যখন মানুষে মানুষে পার্থক্যটিই সকলের আগে ও খুব বড় করে দেখা হ'ত।

আমি বল্‌ছি সাংসারিক দৃষ্টির কথা, আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নয়। আধ্যাত্মিক দৃষ্টি তখন আবার দেখ্‌ত অতিমাত্র এক করে—একাকার করে।

সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক এই দ্বৈত ও দ্বন্দ্বও তখনকার যুগের পার্থক্য পরায়ণতার দৃষ্টান্ত।

বর্ণ, আশ্রম, পংক্তি, শ্রেণী, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়—তির্য্যকভাবে লম্বভাবে মানুষকে যত উপায়ে পারা যায় ভাগ করা হয়েছিল; শুধু আমাদের দেশে বা প্রাচ্যে নয়, ইউরোপেও এ ব্যবস্থা ছিল ফরাসীবিপ্লবের পূর্ব্বপর্য্যন্ত!

প্রত্যেক খণ্ডিত অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল—আকৃতি প্রকৃতি পোষাক পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত সব ছিল বা হয়ে উঠেছিল আলাদা। কোন দল অন্য দলের সাথে না মিশে যায়, সে জন্য প্রত্যেকের চারদিকে শক্ত করে গণ্ডী বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

ঠিক এই মনোভাবই তখনকার দিনে বিপুল করে তুলে ধরেছিল স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্যটিকে। ও দুটি যেন দুই ধরণের প্রাণী এমনি করে ওদেরকে দেখা হয়েছিল, গড়া হয়েছিল। উভয়ে উভয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত—একের ভাব হ'ল অন্যের অভাব। একজনের স্থান যদি বাহিরে, আর একজনের স্থান তবে অন্দরে; একজন যদি জ্ঞানী আর একজন তবে ভাবুক, একজনের বিশেষত্ব যদি বীর্য্য আর একজনের তবে মাধুর্য্য, একজন যদি স্বাধীন আর একজন তবে পরাধীন, একজন যদি স্বেচ্ছাচারী আর একজন নিয়মনিষ্ঠ, একজন যদি ইত্যাদি—

এরকম ব্যবস্থার প্রয়োজন ও সার্থকতা হয়ত সে যুগে ছিল। একটা কিছু সত্যকে আশ্রয় করে সমাজের মানবপ্রকৃতির এই রকম বিশেষ রূপটি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে সত্যের কাজ ফুরিয়েছে, তার দিন আর নাই—বর্ত্তমানের সত্য অন্যরকম যুগোপযোগী ব্যবস্থাও চাই অন্যরকম।

আজ সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, শ্রেণী, পংক্তি প্রভৃতি সকল প্রকার বন্ধনীর সীমানা মুছে চলেছে। আজ মানুষের পরিচয় তার বিশেষ পদবী দিয়ে নয়—মানুষের পরিচয় মনুষ্যত্বে।

পুরাতন পদবীতন্ত্র যারা এখনও আঁকড়ে রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের অভিযানই আধুনিক সকল বিপ্লব ও বিপর্য্যয়ের মুলতত্ত্ব।

পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধেও আজ এই সত্য প্রকট হয়ে উঠেছে। নারীর নারীত্ব কোথায়—সে সমস্যা আজকার নয়; ওকথাটি আজ ভুলেই যেতে বলা হচ্ছে। বর্ত্তমানের কথা নারীর মনুষ্যত্ব।

নারী আজ পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী নয়—সে অর্দ্ধমানুষও নয়; আজ তাকে অন্তরে বাহিরে হতে হবে পুরো মানুষ। মনুষ্যত্বের গৌরব মহিমার পূর্ণ অখণ্ড প্রকাশে তার অধিকার—শুধু অধিকার নয়, তাই তার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। আর এজন্য যদি তথাকথিত নারী-সুলভ গুণ-ধর্ম্ম ঔচিত্য কোথাও বিসর্জ্জন দিতে হয়, খর্ব্ব করতে হয়, তাতেও প্রথম পথপ্রদর্শকদের অন্তত—প্রস্তুত থাকতে হবে।

সাহিত্য ও তাহার সৃষ্টি

শ্রীরমেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এ

জাতির যদি প্রাণ থাকে ত সাহিত্যই ইহার প্রাণ এবং ইহার মেরুদণ্ড। বাহুবল দ্বারা পৃথিবীর রাজাও হওয়া যায় কিন্তু সে বীরত্বের কথা কেবল ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই লিপিবদ্ধ থাকে; তাই ইতিহাসকে সাহিত্য হইতে বাদ দিলে তাহাদের আর কোন অস্তিত্ব থাকেনা।

প্রায় সমগ্র ইউরোপ যে একদিন মুসলমান করতলগত হইয়াছিল তাহা জানিতে পারি তখনই, যখন ইতিহাসের দিকে চক্ষু ফিরাই। ইংলণ্ডের উপর দিয়াও কত জাতি একে একে তাহাদের বিজয়-পতাকা উড়াইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাদের কথা মনেও হয়না। সুতরাং বাহুবল জাতিকে ক্ষণস্থায়ী করিতে পারে, আর সাহিত্য জাতিকে চিরস্থায়ী না করিলেও দীর্ঘকাল স্থায়ী করিয়া থাকে। সংস্কৃত-সাহিত্য জগৎকে অতুল সম্পদ দান করিয়াছে, তাই তাহার স্রষ্টা হিন্দুজাতির কথা জগৎ ভুলে নাই; তাই ইংরাজ জাতি যে আজ প্রবল পরাক্রান্ত—তাহা যে কেবল প্রবল বাহুবল দ্বারা সাধিত

তাহা নয়, তাহার মুখ্য অস্তিত্ব সাহিত্য জগতে। কালের সর্ব্ববিধ্বংসকারী প্রভাবে কিছুই চিরস্থায়ী নয়, সুতরাং সাহিত্যও যে কোন জাতিকে চিরস্থায়ী করিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। আজ দেড়হাজার বৎসর পরেও যে লোকে কালিদাসের শকুন্তলার কথা ভুলে নাই, ইহাতে কেবল এইটুকুই প্রমাণিত হয় যে ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী। হিন্দুজাতির বাহুবলের কথা আজ স্বপ্নসদৃশ, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এজাতি এ পর্য্যন্ত সমানভাবেই সজীবতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। কিছুই যখন চিরস্থায়ী নয় তখন সাহিত্য দোষমুক্ত, সুতরাং সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায় তাহা যে জাতির নাই, জগতের ইতিহাসে তাহার স্থান অতি নগণ্য, এবং এই সম্পদে ভূষিত অন্য কোন জাতির সমক্ষে সোজা হইয়া দাঁড়াইবার তাহার কোন ক্ষমতাই নাই।

কাব্য, ইতিহাস, গল্প, উপন্যাস, বিজ্ঞান, নাটকপ্রভৃতি নানাপ্রকারেই সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কাব্যের স্থানই শ্রেষ্ঠ। চেষ্টা করিলে কম প্রতিভার লোক ছোটখাট নাটক, উপন্যাস লিখিতে পারেন, কিন্তু কাব্য বলিতে যাহা বুঝায় শুষ্কমাত্র চেষ্টার দ্বারা তাহা সম্ভবে না, তাহার জন্য জন্মগত প্রতিভার প্রয়োজন, সাধনার প্রয়োজন। সাহিত্য বলিতে প্রথমেই কাব্যের কথাই মনে হয়, কাব্যের সৃষ্টি যত হয়, সাহিত্যের পুষ্টি উত্তরোত্তর ততই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কাব্যের দিক দিয়া বাংলা সাহিত্য বর্ত্তমানে যাঁহার জন্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, তাঁহাকে যে বিশ্বকবি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই অতিরঞ্জন নহে। আজ তিনি সমগ্র জগতের পূজনীয়, ভক্তিভাজন। অনেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে যাইয়া গলাবাজি করিয়া তাঁহার নোবেল্ প্রাইজের নজীর তুলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা এটা বুঝিতে চাহেননা যে নোবেল্প্রাইজ রবীন্দ্রনাথকে উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করা ত দূরের কথা, ইহাই রবীন্দ্রনাথে প্রদত্ত হইয়া সার্থক হইয়াছে। যে অতুল সম্পাদ তিনি জগৎকে দান করিয়াছেন তাহার শতাংশের একাংশ মূল্যও এই নোবেল্ প্রাইজ দিতে পারিয়াছে কি?

শ্রেষ্ঠ কাব্যের বিশেষত্ব দুইটী কথায় নির্দ্দেশকরা যাইতে পারে,—তাহা অতি তীক্ষ্ণ অনুভূতি ও ব্যগ্র সন্ধানপরতা। দৈনন্দিন জীবনের যথাদৃষ্ট কতকগুলি ভাবরাশি থাকিলেই কাব্য হইবেনা, জীবনের গভীরতম সত্য কবির গভীরতম অনুভূতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠা চাই। অনুভূতি অল্পবিস্তর সকলের ভিতরেই থাকে, কিন্তু গভীরতম অনুভূতি এবং তাহার ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ ইহাই কবির লক্ষণ, ইহা সকলের দ্বারা সম্ভবে না। আবার এই অনুভূতিহীন যে সন্ধানপরতা—ইহা মানুষকে কবি না করিয়া, করিয়া তুলে দার্শনিক। আশ্চর্য্যের বিষয় এইযে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যেমন কাব্যে, ইহার প্রথম সৃষ্টিও তেমনি এই কাব্যে। সকল সাহিত্যেই দেখা যায় ইহার আদিম সৃষ্টি পদ্যে, গদ্যের সৃষ্টি অনেক পরে হইয়া থাকে। ইহাতে, কবিতা যে অল্প বিস্তর সকলের ভিতরেই আছে—ইহাই মনে হয়।

এক হিসাবে কাব্য মানুষের সামান্য কাজেই লাগিয়া থাকে, কিন্তু আপাতঃ দৃষ্টিতে

যাহা সামান্য তাহাই যে মানুষের জীবনে অসামান্য। আজ যদি আমাদের বিশ্বকবি উদর-পূরণের প্রয়োজনীয় ধান চালের জন্য লাঙ্গল হস্তে ভূমি কর্ষণ করিতেন, কে তাঁহাকে তাহা হইলে এমনি করিয়া অসামান্য বলিয়া পূজা করিত? জানি, প্রথমেই আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে; এবং এই বাঁচিয়া থাকা বা টিকিয়া থাকার সহিত অন্নবস্ত্রের সংযোগ আছে, তাই অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে হইবে। পশু জগতে দেখা যায় তাহাদের বস্ত্রের কোন বালাই নাই, শুদ্ধমাত্র আহারের সংস্থানে সময় যায়; মানুষের বস্ত্রের প্রয়োজন, কিন্তু তাহা হইলেও দেখা যায় তাহার সময়ের অভাব হয় না। আপাত দৃষ্টিতে দেখিলে মানুষের আর কিছুরই প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ আর কিছুই না হইলেও ইহার বাঁচিয়া থাকা চলে। কিন্তু এই অন্নবস্ত্রের সংস্থান ছাড়া আরও অনেক কিছুই করিতে মানুষকে দেখা যায়। এই অনেক কিছুই বাদ দিলে মানুষের অনেক বিশ্রাম মিলে এবং এই বিশ্রামই মানুষ খুঁজিয়া বেড়ায়। কিন্তু মানুষের যে জ্ঞানরূপ আছে সেই তাহাকে বিশ্রাম করিতে দেয় না। আগেই বলিয়াছি যে শুদ্ধমাত্র বাঁচিয়া থাকার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তাহা খুব বেশী নয়, সুতরাং প্রয়োজনের এক জায়গায় সীমার রেখা টানা যাইতে পারে। কিন্তু জ্ঞানের ভিতর যে অসীমতা আছে সেই আমাদের প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করিয়া লইয়া যায়, এবং এই প্রয়োজনের বাহিরে যাহা কিছু, তাহাই হইল বাজে কাজ। কিন্তু একটুও কি বাজে কাজ চলিবে না? প্রাণ ধারণের জন্য চিত্তবৃত্তির যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার যে উদ্বৃত্ত অংশ তাহারই খরচ করার নাম খেলা। মনের যে ভাবটা আনন্দরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে তাহাকেই আমরা খেলা বলি। অতএব খেলা জিনিষটাও নিতান্ত বাজে, অপ্রয়োজনীয় নয়।

সাহিত্য আমাদের নানা প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে এবং নানাপ্রকারেই সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে; তাহাদের মধ্যে কাব্যই যে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাহা আগেই বলিয়াছি। ছেলেদের শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া ম্যালেরিয়া ডিপার্টমেণ্ট বিষয়ক যাহা কিছু প্রকাশ করা যায় তাহাই হইল সাহিত্য। আজকাল অনেক জিনিসই ছাপাখানার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের সবগুলিকেই সাহিত্যের মধ্যে গণনা করিতে পারা যায় না। সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সূর্য্যকরোজ্জ্বল নির্ম্মল ধারারাশির ন্যায় মর্ম্মস্পর্শী।

এই সাহিত্যের সৃষ্টি করে মন—পশুর মনও নয়, পরমেশ্বরের মনও নয়, মানুষের মন। সাহিত্যের জন্য যে মনের প্রয়োজন তাহা জাতিগত মন, ব্যক্তিগত মনে সাহিত্যের স্থান নাই। পশু জগতে জাতিগত মন বলিয়া কোন জিনিষই নাই, তবে ব্যক্তিগত মনের আভাস মাত্র আছে। এই আভাসটুকু বুঝিতে পারি তখনই যখন দেখি তাহারা প্রবৃত্তির তাড়নায় আপন লইয়াই ব্যস্ত, যখন দেখি তাহারা সমষ্টিভাবে সকলের কল্যাণ এবং সুখের

জন্য কিছুই করিতে তৎপর নয়, যখন দেখি তাহাদের মধ্যে একমাত্র প্রবৃত্তি ছাড়া আর কোন সম্বন্ধই নাই। এই আভাসটুকু যে মনের সত্ব, তাহার দ্বারা সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়, কেননা সৃষ্টির প্রথম ধাপ উঠিতে হইলেও তাহাকে এই আভাসের আঁধারটুকু কাটাইয়া অস্তিত্বের আলোতে পৌঁছাইতে হইবে। কিন্তু এইটুকুও বুঝি ইহার দ্বারা অসম্ভব। ক্রম বিকাশের ফলে এই পশুর মনই এককালে সাহিত্যের সৃষ্টি করিবে কিনা, তাহার নিরূপণ অন্ধকারের ভিতর। অপর পক্ষে দেখা যায়, পরমেশ্বরের মন ইহার ক্রমবিকাশের উচ্চ শৃঙ্গের অনেক উর্দ্ধে। ইহার সৃষ্টি অথবা বিকাশ সম্বন্ধের তথ্য নিরূপণ করিতে যাইয়া মন সকল শক্তিই হারাইয়া ফেলে। সুতরাং এই বিবিধ মনের কোনটাই সাহিত্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে, মানব মন ব্যতীত ইহার এতটুকুও অন্য স্থান নাই।

অতীতের সহিত বর্ত্তমানের যোগ এবং বর্ত্তমানের সহিত ভবিষ্যতের যোগ—ইহা সাহিত্যের অন্যতম সাধনীয় বস্তু। সাহিত্যের অভিব্যক্তি, সৃষ্টি এবং উৎকর্ষ, মানবের মনো বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। এই মনোবিকাশের প্রারম্ভ এবং পশ্চাৎ যেমন আঁধারে পরিব্যাপ্ত, সাহিত্যের সূচনা এবং সমাপ্তি সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ; কেমন করিয়া কোন্ যুগে "সাহিত্য" কথার উৎপত্তি—ইহাও যেমন অনিশ্চিত, ভবিষ্যতে ইহার অবস্থা কি হইবে ইহাও তেমনি ঠিক করিয়া বলা যায় না। সাহিত্য মানবের মনোবিকাশের মাত্র মাঝখানটা আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে। যদিও ইহা মাত্র খানিকটা আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে, তবুও ইহার সতত চেষ্টা প্রারম্ভের ও পশ্চাতের আঁধার যবনিকা দুইখানিকে পরিষ্কার করা। সৃষ্টিতত্ত্ব ও লয়তত্ত্ব বোধ হয় এই চেষ্টারই ফল। সেক্ষপীয়রের Hamlet এবং গেটের Faust—এই দুই কাব্য সম্বন্ধে লোকে বলিয়া থাকে যে ইহাতে মানব মনের Modern রূপটী বিশেষ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তাই এই বিংশ শতাব্দীতে যে তাঁহার কথা লোকের মুখে মুখে ফিরিবে তাহা পূর্ব্বে কেহই ভাবে নাই। এইখানেই অতীতের সহিত বর্ত্তমানের যোগ।

আমাদের চারিদিকের জগৎটা দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—বস্তু-জগৎ ও মনো-জগৎ। এই দুইটী জগৎকে আপনার ভিতর পাইবার জন্য প্রত্যেক মানুষেরই একটা স্বাভাবিক ব্যাকুলতা ও চেষ্টা আছে এবং ক্ষমতাও আছে। এই ব্যাকুলতা ও ক্ষমতার সাহায্যে মন তাহার অনুভূতির ভিতর দিয়া বিশ্বকে আপনার ভিতর টানিতেছে এবং আপনাকেও বিশ্বের ভিতর ছড়াইয়া দিতেছে। এই দেওয়া ও নেওয়া ক্রিয়া দুইটা হইতে আমাদের হৃদয়ে একটা নূতন, অপূর্ব্ব জগতের সৃষ্টি হয়—সাহিত্যে উপাদান সেই জগৎ হইতেই আসে। এই প্রকারের সত্যকারের অনুভূতি যদি নিজের ভিতর না থাকে তাহা হইলে প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি কখনও সম্ভব হয় না।

সাহিত্যের সৃষ্টি করা যত শক্ত, তাহার সমালোচনা করা তাহার অপেক্ষা কম শক্ত নয়। আর সমালোচনা মানে যে কেবল দোষগুলি দেখাইয়া দেওয়া তাহা নয়; ইহার ভাল গুণগুলি দেখাইয়া দেওয়াই প্রকৃত সমালোচনার লক্ষণ। সাহিত্যক্ষেত্রে মানুষের সবচেয়ে বেশী বোকামী প্রকাশ পায় তখনই যখন কোন ব্যক্তি কোন প্রকৃত সাহিত্যেকের একটী বাজে ও মন গড়া সমালোচনা করিয়া মনে ভাবেন এবং গলাবাজি করিয়া বলিয়া থাকেন যে আমি সাহিত্যের সৃষ্টি করিলাম। সাহিত্যের সৃষ্টি এত সহজ জিনিস নয়। অন্তরের অনুভূতির যে বহিঃপ্রকাশ তাহার জন্য একটী আবরণের আবশ্যক। ফুল যেমন আপনাকে প্রকাশ করে বর্ণ, গন্ধ এবং দলগুলির সমন্বয়ের ভিতর দিয়া, সাহিত্যের প্রকাশও তেমনি ভাষা, ছন্দ ও সুরে। ইহার জন্য সাহিত্যেকের প্রকৃত সাধনার প্রয়োজন।

যাহা আমরা আরাধনা করিয়া থাকি, তাহা আমরা খুব ভালভাবে পাই বলিয়া, তাহার উপর অলক্ষ্যে আমাদের ব্যক্তিত্বের একটী ছাপ থাকিয়া যায়। এই জন্যই উচ্চাঙ্গের সাহিত্যমাত্রই রচয়িতার ব্যক্তিত্বের দ্বারা সুচিহ্নিত।

সাহিত্য সৃষ্টি করিবার জন্য যেমন উপাদান, প্রেরণা, প্রকাশ করিবার আবরণ এবং সর্ব্বোপরি প্রতিভার প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুকূল্যের আবশ্যক। পারিপার্শ্বিক অবস্থার অভাব ঘটিলে বিশ্বকবিকে ও তাঁহার জীবদ্দশায় কেহই চিনিত না।

তর্পণ

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

:৫

ক্ষুদ্র কুটিরের মধ্যে রোগশয্যায় শায়িতা জননী প্রতিভা। শুভ্রতা একাই সংসারের সমস্ত কাজ করে, মায়ের সেবা শুশ্রূষার ভার ও তাহার হাতে। চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা শুভ্রতা, আজ ও সে দেবতার পায়ের শুভ্র যুঁই ফুলটীর মত নির্ম্মল পবিত্র।

একদিন ছিল যেদিন এই মাতা ও কন্যা অট্টালিকায় দিনযাপন করিয়াছে, দাস দাসী সবই তাহাদের ছিল, আজ দুর্ভাগ্যের জন্যই এই দুর্ভাগিনী মাতাকন্যাকে আশ্রয় লইতে হইয়াছে এই খোলার ঘরে দুনিয়ায় আর তাহাদের কোথাও আশ্রয় নাই।

যে দিন জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ বর্ত্তমান ছিলেন, সেদিন ইহাদের অনেকই বন্ধু বান্ধব ছিল, আজ দুর্দ্দিনে সে সব বন্ধু কোথায় সরিয়া গিয়াছে, দেখা হলেও তাহারা আজ চিনিতে পারে না।

আজ দুর্দ্দিনের একমাত্র বন্ধু, একমাত্র অবলম্বন—অরুণ।

সে একদিনকার কথা একাদশ বর্ষীয়া ফুটফুটে মেয়েটীকে পথে দেখিয়া অরুণ নিজেই তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিল। সেদিন কেহই কাহারও পরিচয় পায় নাই। প্রতিভা এই সুদর্শন ছেলেটীকে অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছিলেন, একদিন কথা প্রসঙ্গে জানিতে পারিয়াছিলেন, জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের জমিদারীতে সে বাস করে।

যে দিন প্রতিভা শয্যায় শয়ন করিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার আর বাঁচিবার আশা নাই, সেদিন তিনি অনেক কথাই অরুণের কাছে বলিয়া ফেলিলেন। অরুণ প্রথমটায় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, তাহার মুখ দিয়া একটা কথা বাহির হইল না।

তাহার হাত দুখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া রুদ্ধকণ্ঠে প্রতিভা বলিলেন, 'কিন্তু বাবা, প্রতিজ্ঞা কর, শুভাকে আমার কোন কথা জানাতে পারবে না। আমায় সকলে জানুক, আমি বেঁচে থাকতে ও যেন আমার কোন কথা না জানতে পারে, জানবে কিন্তু বেঁচে থাকতে—অসহ্য! আমার মেয়ের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারব না অরুণ, তাই মরবার সময় নিজে আসবার আগে আমায় তাকে ডেকে বরণ করতে হবে।'

সে রাত্রিতে অরুণ মোটে ঘুমাইতে পারে নাই, সে কেবল প্রতিভার কথাই ভাবিতেছিল। প্রতিভা সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের কন্যা, গৃহস্থের বধূ। জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ ছলে কৌশলে তরুণী বিধবাকে সঙ্গিনী করেন, এবং এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্ত্রীর মতই রাখিয়াছিলেন।

সে আজ বহুকালের কথা, তখন নরেন্দ্রনারায়ণ তরুণ যুবক মাত্র, হিতাহিত বোধ তখন তাহার ছিল না। তাঁহারই কন্যা শুভ্রতা। পঙ্কের মধ্যে দুনিয়ার মলিনতা আবর্জ্জনার মধ্যে তাহার জন্ম, তাই তাহার নাম হইয়াছিল শুভ্রতা। রামপুরেই নরেন্দ্রনারায়ণ মারা যান, প্রতিভার সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

অপরাজিতা স্বামীর উইল অনুযায়ী কাজ করে নাই, একটী পয়সাও সে বাহির করে নাই। বাধ্য হইয়া প্রতিভাকে বাড়ী ছাড়িতে হইল, সব শেষে আসিতে হইয়াছে এই খোলার ঘরে, আর স্থান নাই। গহনাপত্র একদিন অনেকই ছিল, সে সবই বিক্রয় করিতে হইয়াছে। আজ এই দুর্ভাগিনী রমণীর শুভ্রতা ব্যতীত আর কোন সম্বল নাই।

লোকে বলিবে—ইহাই পাপের ফল, বলিয়া থাকে তাই। মানুষ দেখে মানুষের উপরটা ভিতরটার পানে কেহই দেখে না; অথচ দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে কত ক্রটী মানুষের ঘটে তাহা সে দেখিতে পায় না। পাতিব্রত্য কেবল শরীরের ধর্ম্মই নয়, মনেরও ধর্ম্ম, এ কথা মানুষকে বুঝাইয়া বলে কে?

আজ কয়েকদিন হইতে শুভ্রতার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়াছে, মায়ের অসুখ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠায় তাহাকে সর্ব্বদাই মায়ের কাছে থাকিতে হয়। নরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর স্কুলে পড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, এখন অরুণই সে সব খরচ দিয়া আসিতেছে। অরুণ দেশের মায়া কাটাইয়াছে, কলিকাতার মায়া আজও সে কাটাইতে পারিতেছে না, কেবল এই দুস্থ পরিবারটীর জন্য।

সামান্য ক্রটী ধরিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে কার্য্য হইতে জবাব দিয়াছেন। অরুণ তাহার নিজের অজ্ঞাতে বোধ হয় ইহাই চাহিয়াছিল, তাই সে ইহাতে অসুখী হয় নাই, বরং মুক্তির আনন্দ পাইয়াছিল। সে সর্ব্ব বন্ধন হইতে মুক্তির কামনা করিতেছিল, সেই জন্যই ভগবান অরুণকে মুক্তি আনিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু সব বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়াও তাহার মুক্তি হয় নাই, নিজে সে বন্ধন তুলিয়া লইয়াছে। এই মাতা কন্যার একটা কোন উপায় না করিয়া দিয়া তাহার কোথাও যাওয়া হইবে না, সেই জন্যই সে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া অপরাজিতার কাছে বার বার ইহাদের কথা তুলিতেছিল।

যেদিন অপরাজিতার নিকট হইতে ফিরিয়া সে প্রতিভাকে দেখিতে গেল, তিনি যখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। শুভ্রতা চুপি চুপি বলিল, 'আজ মার বুকে বড় যন্ত্রণা হয়েছিল দাদা; এত ছট্‌ফট্ করেছিলেন যে দেখে আমার ভয় হয়ে গিয়েছিল।

রোগিণীর বুক যে অত্যন্ত দুর্ব্বল, যে কোন মুহূর্ত্তে হার্ট ফেল করিতে পারে তাহা অরুণ জানে, উৎকণ্ঠিত হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'তারপর—?'

শুভ্রতা শুভ্রমুখে হাসি ফুটাইয়া বলিল, 'আমি ভগবানকে খুব ভক্তি করে ডাক্‌তে লাগলুম, মার ব্যথাও কমে গেল।"

শুষ্ক হাসিয়া অরুণ বলিল, 'হুঁ, তোমার ভগবান তো খুব কথা শোনেন শুভা,—'

শুভ্রতা বলিল, 'আমার ভগবান ? ভগবান তো তোমারও দাদা —'

মাথা নাড়িয়া অরুণ বলিল, 'উঁহু, ভগবান আমার একটা কথাও কোনদিন শোনেন নি, ডেকে একটা দিনও তাঁর দেখা মেলে নি, কি করে তাঁকে বিশ্বাস করি বল দেখি ?'

শুভ্রতা মুহূর্ত্তমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু মা বলেন—যদি সত্যি করে তাঁকে ডাকা যায় তিনি সাড়া দেন। তুমি কোনদিন তাঁকে সত্যি করে ডাকোনি দাদা, তাই সাড়া পাওনি।

অরুণ মাথা দুলাইয়া বলিল, "তাই বটে, তোমার বিশ্বাস তোমারই থাক শুভা, আমায় ও দিয়ে কোন কাজ হবে না আচ্ছা, একটা কাজ কর না শুভা, ভগবান তো তোমার কথা খুব শোনেন, বল না কেন, তোমার মাকে যেন ভালো করে দেন।"

শুভ্রতা মাথা দুলাইয়া বলিল, "কিন্তু সে কথা তো ঘটচে না দাদা, মা যে বাঁচতে চান না উনি দিনে যা হোক পাঁচ শো বার বলছেন—মরণ হলেই বাঁচি।"

অরুণ বলিল, তাই বটে, ওর ওই এ জেদী স্বভাবটাই তোমার সব প্রার্থনা নিষ্ফল করে দিচ্ছে বুঝতে পারছি !

ঘরের ভিতর হইতে প্রতিভার কাতরোক্তি সহ আর্ত্তনাদ শুনা গেল —শুভা—শুভ্রতা—"

"ওই মা উঠেছেন—"

ভিতর হইতে ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকিল, "তুমিও এস না দাদা, মার আবার যন্ত্রণা উঠেছে।" অরুণ ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রতিভা যন্ত্রণায় নীরবে এতক্ষণ হয় তো খুবই ছটফট করিতেছিলেন এখন তিনি প্রাণপণে নিজকে সংযত করিলেও সেই চেষ্টার ফলে তাঁহার মুখখানি একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার বিছানার পার্শে দাঁড়াইয়া আর্দ্রকণ্ঠে অরুণ ডাকিল, "মা—" প্রতিভা চক্ষু মেলিলেন।

মৃদু হাসির রেখা তাহার মুখের উপর মুহূর্ত্তের জন্য জাগিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল, বলিল "বস বাবা, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।"

অরুণ বিছানার পার্শে বসিল, বলিল "কি কথা বলুন মা।"

প্রতিভার দুইটী চোখের জল বাহিয়া নিঃশব্দে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

কন্যার পানে তাকাইয়া তিনি বলিলেন, "তুই আমার দুধটা জ্বাল দিয়ে নিয়ে আয় শুভা, অরুণের সঙ্গে আমার কথা আছে।'

ইচ্ছা ছিলনা, কেবল মায়ের কথা রাখিবার জন্যই শুভ্রতা বাহির হইয়া গেল।

অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি কথা বলবেন মা ?"

প্রতিভা রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে অরুণ, আমি বেশ বুঝতে পারছি যে কোন দিন—যে কোন মুহূর্ত্তে আমি চলে যাব। আমি যে কেবল ওই হতভাগা মেয়েটার

কথাই ভাব্‌ছি বাবা, ওর দাঁড়ানোর স্থান যে কোথাও নেই, ওরে যে কেউ নেবে না,—কেউ জায়গা দেবে না।'

অরুণ এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া বলিল, আপনার বাপের বাড়ীর দিকে কেউ নেই মা ?'

হাসিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া প্রতিভা বলিলেন, 'পাগল সেখানে ওকে স্থান দেবে কে, ওকে চিন্‌বে কে, কার সম্পর্ক নিয়ে সে ওখানে যাবে ? আমার সম্পর্কে,—কিন্তু আমি তো তাদের চোখে বেঁচে নেই, তারা শুভ্রতা আসারও অনেক আগে আমার মুখাগ্নি করেছে যে।'

এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, "এই ঘরে একাও থাক্‌তে পারবে না, ও তো জানে না ওর মায়ের পাপের ফল ওকেই আজীবন ভুগ্‌তে হবে। হায় রে, আজ ভাবি অরুণ, যদি ওকে পৃথিবীতে না আন্‌তুম,—এ পথে আনার আগে যদি ওর আমার কল্পনাটাও করতুম—

অরুণ কি বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না, নীরবে কেবল প্রতিভার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

চোখের উপর হাতখানা চাপা দিয়া প্রতিভা পড়িয়াছিলেন, অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাত সরাইলেন—

'নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনার বস্তু স্বর্গীয় আনন্দের বস্তু সন্তান,—যদি সে সন্তান সকলের মাঝে স্থান পায়, যদি সে সকলের কাছে আদর পায়—সুখ্যাতি লাভ করে। জানো অরুণ, তার যতই যোগ্যতা থাক, যে কোন সমাজ চাইবে তার বাপের পরিচয়, তার মায়ের পরিচয়। যদি সে দিতে পারে তবে হোক না সে অযোগ্য তবু সে জায়গা পাবে, যদি না দিতে পারে সে জায়গা পাবে না। সে যে মানুষ হিসেবে মানুষের মাঝে স্থান পাবে তা কে জানতে চাইবে মানুষের মাঝে তাই তার স্থান নেই। বাপ মায়ের কাজের ফল ভুগতে হয় সন্তানকে একদিন নয়—দুদিন নয়, আজীবন। এ রকম সন্তান বুঝলে অরুণ, এ সন্তান মায়ের আনন্দ নয়, সে অভিশাপ, দুর্নিবার অভিশাপ, সে অভিশাপ এড়ানো যায় না এর ক্ষয় নেই।'

দুই হাতে বুকখানা চাপিয়া ধরিয়া তিনি হাঁফাইতে লাগিলেন।

অরুণ ধীরকণ্ঠে বলিল, "দশের মধ্যে তার স্থান না হোক তাতেই বা ক্ষতি কি মা, সে না হয় মানুষের মাঝে নিজের কাজটাকেই দিয়ে যাবে, তাতেই বা কি ?'

হাত সরাইয়া প্রতিভা বলিলেন, 'নিজের কাজে কিন্তু কি কাজ সে করতে পারবে অরুণ ? আমি ভগবানের কাছে দিনরাত প্রার্থনা করি, তার মায়ের মত সৌভাগ্য যেন তার না হয়, তাকে যেন কোনদিন প্রাসাদে বাস কর্‌তে না হয়। সে সৌভাগ্য অদৃষ্টে আসবার আগে শুভ্রতা মরে যাক, ওর নাম জগৎ হতে মিশে যাক।'

অরুণ বলিল, 'না মা, শুভ্রতা প্রাসাদে বাস করতে চায় না। আমি বলছি শুভ্রতাকে সমাজ বা দশে স্থান না দিক,—সে নিজেকে তেমনি ভাবে তৈরী করে নেবে, যেদিন দেশ ও দশ তাকে ডেকে নেবে, সে দিনে তার বংশ পরিচয় কেউ চাইবে না।'

প্রতিভার চোখ দুইটী ছল ছল করিতেছিল, রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, সে দিন কি আসবে অরুণ, শুভাকে লোকে ডাকবে আদর করবে ?

অরুণ বলিল, 'আপনি আশীর্ব্বাদ করুণ, সেই আশীর্ব্বাদই ওর চলার পথে পাথেয় হবে।'

প্রতিভা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'সে আশীর্ব্বাদ নিত্য করছি। আমার আত্মা যেখানেই যাক, সেখান হতে সর্ব্বদা এই আশীর্ব্বাদই করবে।'

উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব।

অরুণ আস্তে আস্তে বলিল, 'আমি অপরাজিতার কাছে গিয়েছিলুম মা।

প্রতিভা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন—?'

অরুণ উত্তর দিল, 'সেই দলিল খানার জন্যে'

প্রতিভা শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন, 'সে অস্বীকার করেছে তো ?

অপরাধীর মতই অরুণ বলিল, 'হ্যাঁ—।'

'তা আমি জানি—'

১৬

ইহারই কয়টা দিন পরে যেদিন প্রতিভা অরুণের হাতে শুভ্রতার ভার দিয়া নিশ্চিন্তভাবে চক্ষু মুদিলেন, সেদিন অরুণ সত্যই বড় বিব্রত হইয়া পড়িল।

তাহার কাজ নাই বেতন যখন যাহা পাইয়াছে সবই খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। এখন দুই একটা টিউসানি করিয়া যাহা পায় তাহাতেই তাহার মেসের খরচ নির্ব্বাহ হয়।

সম্প্রতি মুঙ্গের হইতে তাহার এক বন্ধু পত্র দিয়াছে, সেখানে গেলে সে তাহার একটা কাজ যোগাড় করিয়া দিতে পারে। প্রতিভার জন্যই অরুণ বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, ইচ্ছা থাকিলেও ইহাদের একেবারে, নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া সে যাইতে পারে নাই। এখন এই যে মেয়েটীর ভার তাহার উপর আসিয়া পড়িল ইহাকে নামাইবে কোথায় এই ভাবনায় অরুণ অস্থির হইয়া পড়িল।

বোর্ডিংয়ে রাখা চলে কিন্তু খরচের তো দরকার। ধূর্জ্জটিকে পরের হাতে দিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে, পরের ভার লইয়া সে নিজেই এখন বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মেসের টাকা পাওনা বাকি পড়িয়াছিল ম্যানেজারের তাগাদায় বিরক্ত হইয়া অরুণ সে মাসের বেতন যাহা কিছু পাইয়াছিল সব দিয়া দেনা মিটাইয়া দিল।

এই কুটিরের ভাড়া কয়েক মাসের বাকি ছিল, অরুণ তাহাকে মিটাইয়া দিল।

বালিকা শুভ্রতা তাহার বিপদের কথা কিছুই জানিতে পারিল না মায়ের উপদেশমত সে দাদার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াছিল, কেমন করিয়া কি হইবে তাহা জানিবার আবশ্যকতা তাহার ছিল না। এ বিপদে কাহার নিকট কতখানি সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে সে কথা ভাবিতে অরুণের আগেই মনে পড়ে অপরাজিতাকে।

কিন্তু শুভ্রতার জন্য তাহার কাছে যাইবার প্রবৃত্তি তাহার আর হইল না।

এই কিছুদিন আগেই না অপরাজিতা অরুণকে সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল, অরুণ মৃদু হাসিয়া জানাইয়াছে কিছু দরকার নাই। সাহায্যের দরকার তাহার জীবনে কোনদিন হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

অপরাজিতার সাহায্য অর্থাৎ তাহার দয়ার দান গ্রহণ করা,— কথাটা মনে করিতে ও সমস্ত রক্তের মধ্যে চঞ্চলতা জাগিয়া উঠে।

সেই অপরাজিতা, একদিন কেবল অরুণই নয়; সকলেই জানিয়াছিল সে অরুণেরই গৃহলক্ষ্মী হইবে। সমস্ত মন প্রাণ ঢালিয়া সে অপরাজিতাকে কামনা করিয়াছিল, হঠাৎ তাহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল সেই দিন যে দিন সে জানিতে পারিল অপরাজিতার বিবাহ হইতেছে।

সে তবু ও জানিয়াছিল অপরাজিতা যখন তাহাকে ভালবাসে তখন নিশ্চয়ই এ বিবাহে অসম্মতি জানাইবে; সে গরীবের গৃহলক্ষ্মী হইয়া থাকিবে, রাজার রাণী হইবার সৌভাগ্য কামনা করিবে না। কিন্তু সে ভুল তাহার ভাঙ্গিয়াছিল। যখন সে দেখিয়াছিল বিন্দুমাত্র আপত্তি না করিয়া অপরাজিতা নরেন্দ্র নারায়ণকে পতিত্বে বরণ করিল।

নারী জাতিটার উপরেই দারুণ বিতৃষ্ণা আনিয়া দিয়াছিল অপরাজিতা, অরুণ বেশ জানিয়াছিল ইহারা ভালবাসার অভিনয়ই করিয়া যায় মাত্র। ভালবাসা কাহাকে বলে জানে না।

এমনই একটী ছলনাময়ী নারীকে সে ভালো বাসিয়াছিল, নিজেকে নিঃস্ব করিয়া নিজের সমস্ত সে ইহাকেই দান করিয়াছিল, আজও অরুণ সেই কথাই ভাবে। তাহার প্রত্যাখ্যাত প্রেম সে নিবেদন করিয়া দিতে গিয়াছিল লীলাকে, কিন্তু সে ও তাহাকে দারুণ আঘাত করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছিল।

এই দুইটী মেয়ের মধ্যে পার্থক্য হয় তো ঢের ছিল, কিন্তু অরুণ জ্বালা পাইয়া ধরিয়াছিল, দাহিকাশক্তি সকল মেয়ের মধ্যেই সমান; ইহারা ভালোবাসার আগুন জ্বালিয়া পতঙ্গের মত পুরুষকে দগ্ধই করিয়া যায়।

ঠিক এই জন্যই সেও হইয়াছিল নারী-বিদ্রোহী, সোজা কথায় প্রতিদ্বন্দ্বী। কিছুকাল আগে তাহার বাড়ীতে সেই অপরাজিতাই আবার আসিয়াছে, তাহাকে ধমক দিয়া জোর করিয়া খাওয়াইয়াছে। সে দিন সে স্তম্ভিত হইয়া ভাবিয়াছিল—কোন অপরাজিতা,—রাণী অপরাজিতা অথবা বাল্যের সেই অপরাজিতা।

চারিদিকে কুয়াসার আবরণ রচিয়া সে অপরাজিতা নিজেকে মাঝখানে রাখিয়াছে তাহার লাগাল আজ সে পায় নাই। এই কুয়াশার অন্ধকার আবরণ ভেদ করিতে শারদীয়া অথবা বসন্তের জ্যোৎস্না পারে নাই; কোকিল পাপিয়া দূরে অনর্থক গান গাহিয়া গেছে, বর্ষায় কত ময়ুর নাচিয়া গেছে, কুয়াশার আবরণ ভেদ করিয়া সে গান তাহার কর্ণ কুহরে পৌছায় নাই, চোখ ও পড়ে নাই, দৃষ্টি মৃদু জালের মত অন্ধকারে বাধা পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

কিন্তু তবু সে সেই, সে ছাড়া আর কেহ নয়। সে গাম্ভীর্য্যের মাঝখানে থাক, তবু সে দিনে মুহূর্ত্তের জন্য ও অরুণের মনে হইয়াছিল এ সেই অপরাজিতা।

কিন্তু সে ভুল ও ভাঙ্গিয়া গেল, অরুণ নিজের ভুলে নিজেই লজ্জা পাইল বড় কম নয়। আজ সেই অপরাজিতা তাহার সর্ব্বস্ব লইয়া তাহাকে অর্থ সাহায্য করিতে চায়, এ উপহাস করা ছাড়া আর কি? অরুণকে দরিদ্র জানিয়াই না তাহার এই অযাচিত করুণা? অরুণ ভাবিয়া পায় না, তাহাকে ভালোরকমে চিনিয়া জানিয়াও অপরাজিতা কেন তাহাকে এমন নিষ্ঠুর আঘাত দেয়, এমন ভাবে অপমান করে? কিন্তু ছলনাময়ীর ছলনা যে অপর্য্যাপ্ত। উহাদের প্রকৃতিই নাকি তাই,—আঘাত দিয়া আনন্দ পায়।

অরুণের মনে কোন কালের শোনা একটা গল্প জাগিয়া উঠে; কবিতার দুইটী লাইন সে আজও ভুলে নাই,—

দিনকে মোহিনী, রাতকে বাঘিনী
পলক পলক লহু চোষে,
দুনিয়াকো লোক সব বাউরা হোকে
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।

মনে পড়ে অপরাজিতা তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল জোর করিয়া বলিয়াছিল, 'মেয়েদের ওপর তোমরা কেবল আজই সব অপরাধের বোঝা চাপাচ্ছ না অরুণদা, যুগ যুগ হতে তোমাদের কবিরাও এমনি ভয়ানক করে মেয়েদের চরিত্র এঁকে গেছেন। কিন্তু সত্যি বল দেখি অরুণ দা, একি সত্যি?

অরুণ গম্ভীর ভাবে বলিয়াছিল, 'সে কথাটা যুগ যুগ ধরে চলে আস্‌ছে—

হাত জোড় করিয়া অপরাজিতা বলিয়াছিল, 'রক্ষে কর' সেই পচা পুরানো কাহিনীগুলো নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ো না, যুগ যুগ ধরে অনেক কিছুই চলে আস্‌ছে, সবই তা হলে মেনে নেব সত্যি?

সম্পূর্ণ নির্ব্বিকারভাবে অরুণ বলে, "তোমরা ও তো নিশ্চেষ্টভাবে রয়ে গেছ, অপরাজিতা এ গ্লানি ধুয়ে মুছে ফেল্‌বার ভার তো কেউ নেয় নি।"

মুখের কথা লুফিয়া লইয়া অপরাজিতা বলিয়াছিল, 'নেয় নি নয়, নিলেও তোমরা কোন দিন মেনে নিতে চাও নি। কিন্তু এ কথাটা জেনো অরুণ দা, ইতিহাস আবার নতুন করে গড়ে তোলা হবে, সে গড়্‌বার ভার কেবল তোমাদের পরেই থাকবে না, সে দিনে বর্ত্তমানের ইতিহাস গড়্‌বার অর্দ্ধেক ভার দিতে হবে মেয়েদের হাতে।'

অরুণ আজও সেদিনকার কথা গুলো ভাবে। জীবনে যে দুইটী নারীর সংস্পর্শে সে আসিয়াছিল, তাহাদের একজন গিয়াছে, একজন আছে। যে গিয়াছে সে ও যেমন আঘাত দিয়া গিয়াছে, যে আছে সে তাহার চেয়ে ও বেশী আঘাত দিতেছে।

অরুণ উদাস ভাবে আকাশের পানে তাকাইয়া থাকে।

১৭

যাহাকে তরুণ এড়াইয়াই চলিতে চায় হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিত রূপে তাহারই সহিত দেখা হইয়া গেল।

সে দিন গঙ্গাস্নানের কি একটা যোগ ছিল দলে দলে পুরুষ ও মেয়েরা গঙ্গাতীরে চলিতেছিল।

আহিরীটোলার ঘাটে সেদিন অরুণ ও শুভ্রতাকে লইয়া গিয়াছিল।

কিছুতেই সেদিন এই মেয়েটীকে সে সান্ত্বনা দিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। সামান্য একটী চুলের ফিতা উপলক্ষ্য করিয়া তাহার মাতৃশোক প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

কিছুতেই তাহাকে ভুলাইতে না পারিয়া অরুণ তাহাকে ঘাটে টানিয়া আনিয়াছে, অনেক লোকজন দেখিয়া যদি তাহার মায়ের শোক নিবারিত হয়।

অপরাজিতা দাসী ও ইন্দিরার সহিত নিজের মোটরে উঠিতে যাইতেছিল। গঙ্গাস্নানে পুণ্য সঞ্চয়ের বাসনা এই মেয়েটীর মনে কোনদিন জাগে নাই, কারণ সেদিন প্রচলিত সব প্রথার বিরুদ্ধে, সে ছিল মূর্ত্তিমতী বিদ্রোহ। ইন্দিরা আজ একা কিছুতেই আসিতে চাহে নাই। সে আবার সেই প্রকৃতির মেয়ে ছিল যে এতটুকু কিছু ও বৃথা যাইতে দেয় না; আবহমান কাল পর্য্যন্ত যত কিছু ক্রিয়াকর্ম্ম পূজার্চ্চনা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, সবই দারুণ নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালন করিয়া যায়। ইন্দিরাকে অপরাজিতা কোন দিন বাধা দেয় নাই,—সে যাহা করিয়া সান্ত্বনা পায় পাক, তাহাতে তাহার আপত্তি ছিল না।

ঘাটে আসিয়া সে উপরে দাঁড়াইয়া কেবল দেখিয়াই যাইতেছিল।

ইন্দিরা ধরিয়াছিল, 'এলেই যখন—স্নানটা করে চল বউদি, একটা ডুব দিয়ে ফেল।'

অপরাজিতা শিহরিয়া উঠিয়া বলিয়াছিল—'বাপ রে, ওই জলে ডুব ওই নোংরা জলে? রক্ষে কর ইন্দু, আমার অমন পুণ্যে দরকার নেই,—তার চেয়ে আমি নরকে পড়ে থাকি সেও ভালো।'

অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া ইন্দিরা বলিয়াছিল, 'আজ যোগের দিন, কত দেশ দেশান্তর হতে কত লোক আসছে স্নান করতে, আর তুমি ঘাটে এসে ফিরে যাবে বউদি?'

অপরাজিতা শান্ত চোখে ইন্দিরার পানে চাহিল, শান্তকণ্ঠে বলিল, 'আসল কথা শোন ইন্দু, পুণ্য হবে এ কথাটা আমি মানি নে। আমার মন যা সত্যি বলে আমি তাই করে যাই মাত্র, তাতে কোন কিছুর অনুষ্ঠানের দরকার হয় না। সত্যি করে কেউ আমায় আজও বুঝাতে পারে নি পাপ কি পুণ্যই বা কি, দেবতা কি স্বর্গ নরকই বা কি? হ্যাঁ, গঙ্গাস্নান না করায় নরক বাস যদি মঞ্জুর হয় আমি রাজি ইন্দু, এতটুকু আপত্তি আমি করব না।'

ইন্দিরা অপরাজিতার কথা শুনিয়া মোটেই খুসি হইতে পারে নাই; বলিয়াছিল, অমন কথা বলো না বউদি, 'পাপ করি নি এ কথা কেউ বল্‌তে পারে না। সৃষ্টির আদিম যুগ হতে মনে

কর—এ পর্য্যন্ত কত কাণ্ডই না ঘট্‌ছে। 'লোকে বলতে পারে সে পাপ করে নি,—কেউ নিজের বুকে হাত দিয়ে স্বীকার করতে পারবে ?"

অপরাজিতা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল, ওইখানেই না তাদের দুর্ব্বলতা আর সেই জন্যেই না মানুষের এমনি ক'রে হায় হায়। মানুষ যা কিছু করে তা স্বভাবের অনুবর্ত্তী হয়েই করে যায়, তা হলে স্বভাবটাই মানুষের পাপ কি বল ? আসল কথা বল, তা হলে মানুষের জন্মানোই পাপ। তাকে আস্‌তে হয় পৃথিবীর কামনা বাসনার মধ্যে, প্রতি নিয়ত সব গুলির আকর্ষণ অনুভব ও তো করতে হয়, সব বর্জ্জন করে থাকা চলে না ; সকলেই রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ তো হতে পারে না ইন্দু। নিক্তি ধরে পাপ পুণ্যের ওজন করা আমার দ্বারা চলবে না, আমার খুসি মত কাজ ক'রে যাব তাতে যাই হোক্‌। আমায় তোমাদের বাইরের মানুষ বলেই মনে করো ইন্দু, আমায় তোমাদের সব কিছুর মধ্যে টেনো না। আমি কিছুই করতে পারিনে, অথচ সেই না করার জন্যে তোমরা ব্যথাও পাও বড় কম নয়।"

ইন্দিরা তাহার মুখের উপর যে ভাবটা ফুটিয়া উঠিতে দেখিল তাহাতে সত্যই সে বেদনা পাইল। আর একটী ও কথা না বলিয়া সে জলে নামিয়া গেল।

অপরাজিতা অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

নিজের ব্যক্তিত্ব জাগাইয়া রাখার চেয়ে আত্ম-সমর্পণেই যেন তৃপ্তি পাওয়া যায়।

নিজেকে অহোরাত্র অতি সন্তর্পণে বাঁচাইয়া রাখার সার্থকতা কি ? পদে পদে যুদ্ধ করা চলে যত দিন শক্তি থাকে ততদিন, কিন্তু মানুষ তো চিরদিনই নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না।

ভগবান নামে কেহ নাই সে ইহাই জানে। কিন্তু সাম্‌নে এই যে সহস্র সহস্র নর নারী জলে নামিয়াছে, নামিতেছে, ইহারা বিশ্বাস করে ভগবান আছে, তাই নিজেদের ভালো মন্দ সকল ভার ভগবানের উপর ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যায়।

এ বিশ্বাসটুকু যদি অপরাজিতা পাইত, নিজের ভার একজনকে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইত, কিন্তু সেই বিশ্বাস আসে কই ? মনে হয় সবই ফাঁকি ; মানুষ নিজেই কত কি কল্পনা করে! পায়ের তলার মাটি কুড়াইয়া একটা যা তা আকৃতি দিয়া পুতুল গড়িল, নাম দিল ভগবান।

ভাবিতেও যেন হাসি আসে। সেই মূর্ত্তিকেই নানা উপচারে পূজা করে, তাহারই সামনে চোখের জল ফেলে, তাহাকেই ধ্যান করে।

ওই যাহারা অঞ্জলিবদ্ধ গঙ্গাজল লইয়া সূর্য্যের উদ্দেশ্যে সমর্পন করিতেছে উহাদের যদি বলিতে যাওয়া যায় সূর্য্য জিনিষটা কিছুই নয়, একটা জ্যোতির্ম্ময় গোলক মাত্র, ভবিষ্যতে একটা দিন সে ও শীতল হইয়া যাইবে, তাহার ভিতর এতটুকু দাহিকা শক্তি থাকিবে না, এমন কি এতটুকু উত্তাপ ও থাকিবে না,—উহারা হাসিবে, তাহাকে পাগল বলিয়া তাড়াইয়া দিবে।

বিজ্ঞান যে রহস্য ব্যক্ত করিতেছে উহাদের মধ্যে কয়জন সে সংবাদ রাখে ? যাহারা

জানে তাহারা ও সংস্কার বশে আসিতেছে। ওই যে ভদ্রলোকটী নিমীলিত নেত্রে সূর্য্যের পানে তাকাইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন উনি সায়ান্স কলেজের জনৈক প্রফেসার, অপরাজিতা এ ভদ্রলোককে বেশই জানে। বিজ্ঞানের অনেক কিছু ব্যাপার লইয়া ইনি ব্যস্ত থাকেন, সূর্য্যের স্বরূপ ইঁহার নিকট অজ্ঞাত নাই, তথাপি ইনি সেই সূর্য্যকেই দেবতা বলিয়া অর্ঘ্য দিতেছেন।

আত্মদানের তৃপ্তি,—তাঁহার মুখে কি চমৎকার ভাবটী ফুটিয়া উঠিয়াছে। অপরাজিতা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। ইন্দিরা ডাকিল—'চল বউদি। বাপ্‌রে, কি অন্যমনস্কই হয়েছ, ডেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।'

অপরাজিতা নির্ব্বাকে ফিরিল। ঘাট হইতে উঠিবার সময়েই অরুণের সহিত দেখা—অরুণের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া একটী অনিন্দ্য সুন্দরী মেয়ে।

অপরাজিতা থমকিয়া দাঁড়াইল। ভাবিয়াছিল কথা কহিবে না, তবু কথা কহিতে হইল। জিজ্ঞাসা করিল, 'গঙ্গাস্নানে পুণ্য সঞ্চয় করতে এসেছ নাকি, অরুণ দা?'

অরুণ হাসিল, 'অরুণদা যে নাস্তিক সে কথাটা অনেক আগে হতেই জানা আছে অপরাজিতা।" অপরাজিতা জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিল,—'তবে?'

অরুণ বলিল, 'এরই জন্যে আসা—' সে শুভ্রতাকে দেখাইয়া দিল।

অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানার পানে তাকাইয়া অপরাজিতা জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কে?'

অরুণ হাসিল, বলিল, 'পরিচয় পেলে খুসি হতে পারবে না। পদ্ম যখন দেবতার পায়ে পড়বার জন্যে লোকের সাজিতে আসে, তখন পথের অনেক লোকেই লুব্ধ চোখে তার পানে চেয়ে থাকে। কেউ কি তখন ভাবে কোথায় কোন পাঁকের মাঝখানে ফুলটীর জন্ম?

অপরাজিতা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

অরুণ বলিল, 'কিন্তু ওই যে আগেই বললুম, অপবিত্র নোংরা পাঁকে জন্মালেও সে পদ্ম, তার রূপ চমৎকার, তার গন্ধ চমৎকার, তার গুণও চমৎকার। লোকে আদর করে গোলাপ গাছে কত যত্ন করে ফুল ফোটায়, তবু সে গোলাপ ও রূপে এর কাছে নিষ্প্রভ হয়ে যায়, গুণে ও বটে। জানোতো গোলাপ নির্য্যাস দরকার হয় বিলাসীদের, কেবল বিলাসিতার জন্যে, কিন্তু পদ্মের নির্য্যাস অন্ধের দৃষ্টি হীনতা দূর করতে দরকার হয়।'

কি বলিবার জন্য অপরাজিতা মুখ তুলিল, মেয়েটী তাহার পানে বিস্ময়ে তাকাইয়া আছে।

অপরাজিতা বলিল, তর্ক আজ থাক অরুণদা, তবে এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে একদিন কথাবার্ত্তা বলবার ইচ্ছা রইল। তোমায় শুধু একটা কথাই আজ বলে যাই, গোলাপ শুকালেও নিজের বৈশিষ্ট্য হারায় না, কেবল এই গুণেই সে জগতের পূজো পেয়েছে, কিন্তু তোমার পদ্ম,—যে শুকালে তার দাম এক কানা কড়িও নয়, যে কোন অসার জিনিষের সঙ্গে তখন তার তুলনা হতে পারে।"

অরুণ শাস্ত হাসিয়া বলিল, 'না, অসার নয়, জমিতে দিলে নাকি উর্ব্বরতা বাড়ে শুনেছি।'

শুভ্রতার পানে তাকাইয়া সে বলিল, 'থাক, এসো শুভা, ও ধারটা একবার দেখি গিয়ে।" তাহারা চলিয়া গেল।

বিবর্ণ মুখে অপরাজিতা তাকাইয়া রহিল, অরুণ যে এতবড় আঘাত দিবে এ ধারণা তাহার ছিল না। অথবা আঘাত ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছে, আজ সে কথা তাহার মনে নাই।

ইন্দিরা ডাকিল, 'এসো বউদি—'

'চল—'

বলিয়া ইন্দিরা উঠিবার আগেই অপরাজিতা মোটরে উঠিয়া বসিল।

যদু— "আমার স্ত্রী বেজায় মনঃকষ্টে আছেন।"

মধু— "শুনে বড় দুঃখিত হ'লাম, কেন তার কি হয়েছে ?"

যদু— "আজ তার গলা ব্যথা হয়েছে, তাই অসুখের কথা কাউকে বল্‌তে পারছেন না"

রোগী— "আমার কি হয়েছে তা আমি জানিনা ; আমার মাঝে মাঝে কোন কোন জিনিষ কিছুই মনে থাকে না।'

ডাক্তার— "এই যদি তোমার রোগ হয়, তবে আমার 'ভিজিট'টা আগে আমায় দিয়ে ফেল।"

নূতন রাঁধুনী— "রান্না হয়ে গেলে আমি কি বলব ? খাবার তৈরী হয়েছে বলব, না, খাবার দেওয়া হয়েছে ?"

গৃহ-কর্ত্রী— "রান্না যদি কালকের মত হয় তবে বলো খাবার পুড়ে গেছে।"

রাজা রামমোহন রায়

শ্রীরমা দেবী

বর্ত্তমান যুগের জন্মদাতা রাজা রামমোহন রায়। তাঁহার হস্তস্পর্শে আজ দেশের ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য ও রাষ্ট্র সজীবও প্রাণবন্ত।

রামমোহন ছিলেন একাধারে ধর্ম্মসংস্কারক, শিক্ষাপ্রচারক, সাহিত্য-স্রষ্টা ও রাষ্ট্রগুরু।

সেই তমসাচ্ছন্নযুগে প্রদীপ্ত আলোকবর্ত্তিকা হস্তে এই মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া দেশের সকলক্লেদের আবর্জ্জনাস্তূপ ধ্বংস করিয়া নূতন গঠন কার্য্যের সূচনা করেন। কী ছিল মহতী প্রতিভা, কী তীক্ষ্ণ দূ দৃষ্টি, কী বিরাট প্রাণ! দেশের বিরুদ্ধ প্রতিকূল স্রোতের মুখে তিনি উজান বাহিয়া চলিয়াছিলেন। দেশ তাঁহাকে প্রবলভাবে অস্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু শত অত্যাচার, নির্য্যাতন তাঁহার বলিষ্ঠ সঙ্কল্পকে দমিত করিতে পারে নাই। তাঁহার চিন্তার সহযোগী কেহ ছিলনা, প্রাণের দোসর কেহ ছিলনা। সমগ্র গগনে যেমন এক সূর্য্য তমসাচ্ছন্ন সমগ্র দেশেও সেইরূপ তিনি একক ছিলেন। তাঁহার সেই বিরাট্ একাকীত্ব সূর্য্যের মতো ভাস্বর ও দীপ্ত ছিল।

ধর্ম্ম ছিল রামমোহনের কর্ম্মের উৎস। ১৬ বৎসর বয়স হইতে তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্যানুসন্ধানে কি ঐকান্তিক আগ্রহ।

আমাদের সকল শাস্ত্র যে নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছে তিনি তাহা বিরুদ্ধবাদিদিকে যুক্তিদ্বারা দেখাইলেন।

ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা ও অসাম্প্রদায়িকভাব তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মের জাতীয়ভাবকে বর্জ্জন করেন নাই। সেজন্য সমাজকে তিনি হিন্দু আকার দিয়াছিলেন এবং নিজকে হিন্দু ধর্ম্মের সংস্কারক মনে করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, "স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্ব্বজাতিকে এবং সর্ব্বজাতির মধ্য দিয়া স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়" এবং 'আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিস্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।

রামমোহনের অসাধারণ চিন্তশক্তির কেন্দ্র ছিল তাঁহার আধ্যাত্মিকতা। তাঁহার আধ্যাত্মবোধের উৎস তাঁহার মানবপ্রীতি। সেজন্য বোধহয় তিনি সকল মানবের ভিতর মিলন সংস্থাপনের জন্য একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শঙ্করের অদ্বৈতমত তিনি গ্রহণ করেন আবার খৃষ্টানধর্ম্মের প্রতিও শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করেন। হিন্দুসভ্যতার সারধর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞান—রামমোহন সকল শাস্ত্র হইতে এই সত্য প্রমাণ করিলেন। হিন্দু, মুসলমান ও

খৃষ্টান প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের আবর্জ্জনাস্তূপ ঘাটিয়া তাঁহার তীক্ষ্ণজ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা সেই একসত্য যে রহিয়াছে তাহা প্রকাশ করিলেন।

ধর্ম্ম ও সমাজে এক অবিচ্ছিন্ন যোগ রহিয়াছে। তাহা রামমোহন রায় বুঝিয়াছিলেন। সেজন্য সতীদাহ প্রথা যে শাস্ত্রানুমোদিত নহে তাহাই যুক্তিদ্বারা প্রমান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, কোন ধর্ম্মবিরুদ্ধকার্য্য দেশাচার, লোকাচার হইতে পারেনা। 'প্রবর্ত্তকও নিবর্ত্তকের প্রথম সংবাদ' এবং 'প্রবর্ত্তকও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ' নামে যে বই রামমোহন লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বলেন, সকাম কর্ম্ম সকল শাস্ত্রে নিন্দনীয় এবং সকাম কর্ম্মের যে সকল ফল শ্রুতিশাস্ত্রে আছে, তাহা কেবলমাত্র যথেচ্ছাচার হইতে মানুষকে নিবৃত্ত রাখিবার জন্য। বিষদ্বারা যেরূপ বিষক্ষয় হয়, সেইরূপ শাস্ত্রদ্বারাই তিনি শাস্ত্রের উদ্ধারের সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

নারীর স্ব-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাজা রামমোহন যে চেস্টা করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া আজ এই নারী-প্রগতির যুগে এই নবযুগের ঋষির পূতচরণে শ্রদ্ধাভরে নতি জানাই।

হিন্দুনারীর দায়াধিকার সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত চটিবই লেখেন, তাহাতে আইনশাস্ত্রে তাঁহার কি প্রখর পাণ্ডিত্য ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজে স্ত্রীর কোন অধিকার না থাকার ফলে সমাজে সতীদাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা তিনিই সর্ব্বপ্রথম বুঝিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে নারীও পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারে এবং তাহাদের বুদ্ধিগত কোন হীনতা নাই। শতবর্ষ পূর্ব্বে এই মহাত্মা যে বাণী প্রচার করিয়াছিলেন আজ তাহাই আমরা সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

জাতীয় পরাধীনতার অন্যতম কারণ যে জাতিভেদ ও সম্প্রদায়ভেদ ইহাও শতবর্ষপূর্ব্বে রামমোহন বুঝিয়াছিলেন।

উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সময় যখন দেশীয়ভাষা কি ইংরাজীভাষা শিক্ষার বাহন হইবে এই প্রশ্ন ওঠে, তখন রামমোহনই সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্যভাষায় শিক্ষার পক্ষে ছিলেন। বর্ত্তমান স্বাধীন চিন্তাস্রোতের সহিত স্বদেশবাসী পরিচিত হউক, ইহাই ছিল তাঁহার পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের মূলে ছিল তাঁহার স্বদেশ প্রেম। তাঁহার প্রতিকার্য্যের মূলে আমরা তাঁহার স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাই; ন্যায়, সত্য ও স্বাধীনতাই ছিল রাজার জীবনের মূলকথা। সকলক্ষেত্রেই তিনি স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেন।

দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের তিনি ছিলেন অগ্রদূত। ১৮২৩ সালে প্রেস অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে প্রথম হাইকোর্ট এবং পরে প্রিভিকাউন্সিল পর্য্যন্ত তিনি আবেদন করেন। তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য হওয়াতে তিনি প্রতিবাদ স্বরূপ তাঁহার 'মিরাট-উল্ আখবর' পত্রিকাখানি বন্ধ করিয়া দেন। দেশবাসীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনিই প্রথম সংগ্রাম করেন। জুরী বিলের বিরুদ্ধে তিনি যে যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহাতে বর্ত্তমানকালের স্বায়ত্বশাসনের দাবীর আভাষ পাওয়া যায়।

স্বাধীনতার জন্য তাঁহার অন্তরে যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহা তাঁহার প্রতিকার্য্যের ভিতর দেখিতে পাই।

বর্ত্তমানযুগের সকল আন্দোলনের যিনি প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা, আজ সেই মহামানবকে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। এইরূপ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা-সম্পন্ন বিরাট পুরুষ কোনদেশে কোনকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

শতবর্ষপূর্ব্বে যে মহাপুরুষ অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতভূমিতে বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, সেই আলোকশিখাই আজ আমাদের দুর্গমযাত্রা-পথে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিবে।

কলিকাতা স্বদেশী শিল্প-প্রদর্শনী ও প্রাচীন শিল্প বাণিজ্য

শ্রীঅরু সেনগুপ্তা

মানুষ কোন কালেই সৃষ্টির অনিরুদ্ধ শক্তি বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে দিন কাটায়নি, তার হাতের স্পর্শ দিয়ে তাকে রূপায়িত করেছে বার বার, তাতেও সন্তুষ্ট হয়নি তাই তার মূর্ত্তপ্রতিভার অপূর্ব্ব সম্পদগুলি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে বিশ্বের দরবারে ভালমন্দের বিচার প্রার্থী হয়ে। এরই নাম প্রদর্শনী বা মেলা। ভারতে এ বস্তুটি নূতন নয়। অতি প্রাচীন কাল থেকে এর অখণ্ড ধারা চলে এসেছে। কোন দেব দেবী বা মহাপুরুষকে কেন্দ্র করে ঐ সব প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দূর দুরান্তের থেকে দিনের পর দিন পথ চলে গ্রাম জনপদ পার হয়ে লাখ নরনারী কোনও বিশেষ স্থানে সমবেত হয়েছে। শুধু ভক্তি প্রণোদিত হয়েই যে সকলে সম্মিলিত হয়েছে তা নয়, অনেকে এসেছে তাদের দ্রব্যসম্ভার দেখিয়ে বেচাকেনা করে কিছু লাভের চেষ্টায়, তারপর উপরন্তু আনন্দ আহরণের আশায়। তারা কারও আমন্ত্রণ লিপির প্রতীক্ষায় ঘরে বসে থাকেনি। বিশেষ কোনও পর্ব্ব তিথি ও স্থান মাহাত্ম্য থাকাতে সমগ্রদেশ এক যোগে সাড়া দিয়েছে, নিজের হাতের শ্রেষ্ঠ সামগ্রী দিয়ে নৈবেদ্য রচনা করেছে, তারপর দলে দলে এসে যুগদেবতার চরণে সেই মহান্ অর্ঘ্য নিবেদন করেছে, দেবতার শুভ আশীর্ব্বাদ তাদের মস্তকে বর্ষিত হয়েছে; তাদের স্বেদ ক্লিষ্ট ললাট রঞ্জিত করেছে সমগ্রজাতির জয়তিলক। এই প্রদর্শনী ছিল যেন জাতির সংস্কৃতির পরম প্রতীক্, তার চর্য্যার চরম নিদর্শন তার সমাজ, রাষ্ট্র ও শিল্পকলার কষ্টিপাথর। এই প্রদর্শনীর মধ্যেই নিহিত ছিল জাতির ক্রমবিকাশের অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা, এরই মধ্য দিয়ে জাতি তার শিল্প-বাণিজ্যের পথ সুগম করে নিয়ে এসেছে যুগ যুগান্তর ধরে। জাতির প্রাণের স্পন্দন এখন থামেনি। খেতুরী, কেন্দুবিল্ল, বক্রেশ্বর ও আগড়তলা তার সাক্ষীগোপাল সেজে জাতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।

বর্ত্তমান প্রদর্শনী দেখা দিল স্বদেশী আন্দোলনের ঘূর্ণাবর্ত্তের ভিতর থেকে। তদানীন্তন নেতৃবর্গ বুঝেছিলেন জাতির নাড়ী পরীক্ষা করে যে শুধু বর্জ্জন নীতির মৃগনাভি প্রয়োগ করে আর তাকে বাঁচানো যেতে পারে না। বর্জ্জনের পশ্চাতে থাক্ অর্জ্জন, এই সঙ্কল্প নিয়ে জাতি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউক, বিশ্ব প্রবাহের ঘাত প্রতিঘাতে তার আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ হউক। শ্রীঅরবিন্দ সেদিন ঠিক এমনি উদাত্ত

কণ্ঠে জাতিকে আহ্বান করেছিলেন, বিস্ময় বিমুগ্ধ বাঙ্গালীর অন্তরে বুঝি বা সে আহ্বান পৌঁছে ছিল। সেবার কালিকাতায় যখন সর্ব্ব প্রথম স্বদেশী মেলা হল বাঙ্গালীর সেকি উৎসাহ, তার চোখে মুখে কি ব্যগ্র ব্যাকুলতা! আজ প্রায় ৩০ বৎসর হয়ে এলো বাঙ্গালী ধীরে ধীরে তারই থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে বিচিত্র কর্ম্মধারার আপনাকে উৎসারিত করবার চেষ্টা করছে। পথ যতটা দুর্গম ও সামর্থ্যের ভাণ্ডার যতটা সঙ্কীর্ণ মনে হয়েছিল এখন আর ঠিক ততটা বোধ হয় না।

এবারকার প্রদর্শনী (ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যে প্রদর্শনী হয়ে গেল) দেখলেই একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শক্তি ও সংযোগিতা যে জাতির আছে তার শিল্প-বাণিজ্যের পথ তত দুর্গম নয়। এবৎসরের মেয়েদের হাতের কাজই বিশেষ করে আমাদের আকৃষ্ট করেছে। সীবন-শিল্প ও কুটীর-শিল্পের নিদর্শনগুলি সুরুচি ও সৌকার্য্যের পরিচয় দিয়েছে। তাঁদের কারু-কলার নৈপুণ্য ও বৈচিত্র্য বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এতে শুধু দেশের কল্যাণ নয় বাংলার নারী সমাজের আর্থিক সমস্যার সমাধানের উপায় দেখান হয়েছে। মাতৃজাতি যে দেশের কুটির-শিল্পের পুনঃপ্রবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়েছেন তা একটা শুভ লক্ষণ। প্রাচীন বাংলার কুটীর শিল্পও তাদের হাতে গড়ে উঠেছিল। আজ আবার তাঁরাই মৃতসঞ্জীবনী দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন। বিশ্বভারতীর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চামড়ার জিনিসগুলো প্রশংসনীয়। বয়ন শিল্পের মধ্যে বঙ্গলক্ষ্মী ও মোহিনী মিল প্রভৃতির বস্ত্র ও নানা প্রতিষ্ঠানের সিল্ক সম্ভার ভবিষ্যৎ উন্নতির ইঙ্গিত করেছে। সিল্কের উপর নক্সা ও জরির কাজ বেশ সূক্ষ্ম ও সুন্দর হয়েছে বলতে হবে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সিল্ক ব্যবসার উন্নতি হচ্ছে এতটা হত না যদি চীনা ও ফিজী সিল্কের সঙ্গে প্রতিযোগিতা না ঘটত। মোজা গেঞ্জী প্রভৃতিও বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করেছে। বেঙ্গল পটারীর মাটীর বাসন ও স্বদেশী টয়মার্ট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের খেলনা পুতুল ইত্যাদি আমাদের অনেক অভাব মোচন করেছে। কাঠের জিনিসগুলোও বেশ সন্তোষজনক হয়েছে। সোনা, রূপা, মীণা, হস্তীদন্ত প্রভৃতির কাজ চিত্তাকর্ষক। কলকারখানা বিভাগের দিকে দৃষ্টি দিলে প্রথম দেখি কেমিকেল ওয়ার্কসগুলির জিনিষপত্র। প্রসাধনশিল্প. যা ভারতকে বৈদিক, পৌরাণিক ও বৌদ্ধযুগে স্বচ্ছন্দ সুষমায় অনুলিপ্ত করেছিল, তার এই দ্রুত উন্নতি খুবই স্বাভাবিক। সাবান, পাউডার, ক্রীম, আলতা, সিন্দুর, সবই উৎকর্ষতা লাভ করেছে। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনী তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ভারতের প্রসাধনশিল্প ও বিলাস সামগ্রীর বিরুদ্ধে। তদানীন্তন রোমান সাম্রাজ্য হইতে ভারত এই সকল দ্রব্য সম্ভার বিক্রয় করিয়া আনিত প্রায় ৭০০০০ পাউণ্ড, ইহাই প্লিনির অভিযোগ। রোমেই ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের একটা তালিকা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে সিল্ক, মস্লিন, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার গন্ধদ্রব্য, ধূপ, গুগ্গুল ও মণিরত্ন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঔষধ প্রস্তুত হয়েছে নানারকমের। বিগত মহাযুদ্ধের পর থেকে বেঙ্গল কেমিক্যালের পর এখন বেঙ্গল ইমিউনিটি, বোসেস্ লেবরেটরী প্রভৃতি অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ঔষধ ও ইনজেক্সন অনেক তৈয়ারী হয়েছে তাতে দেশের অনেক কল্যাণ সাধন হবে। এনামেলের কাজগুলি আশাপ্রদ। কাঁচের বাল্ব তৈয়ারী হয়েছে, এখনও দুরূহ প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার মত শক্তি পায়নি বটে, কিন্তু তার একটা প্রশস্ত ভবিষ্যৎ আছে। ম্যান্টলও কিছু কিছু তৈয়ারী হচ্ছে, বোধহয় বাংলায় মাত্র দুই তিনটি প্রতিষ্ঠান হয়েছে। কলিকাতা কর্পোরেশনে ম্যান্টলের কাজ হয় প্রায় ১॥ লক্ষ টাকার তন্মধ্যে দেশীয় প্রতিষ্ঠান পায় প্রায় ৪০ হাজার টাকার কাজ। কালি, কলম, পেন্সিল প্রভৃতিও দেশের অনেক অভাব মোচন করেছে।

জুতার কালী, ব্রুস, দাঁতন, দড়ি ও ছোবড়ার জিনিস বোতাম প্রভৃতি বেশ ভালই চলেছে। বৈদ্যুতিক পাখা, ব্যাটারী, ছাতা, ছড়ি, কাঁচ, বাসন পিত্তলের সামগ্রী, জলের কল, বাক্স ও সিন্দুক সবই তৈয়ার হচ্ছে। গভর্ণমেণ্টের প্রদর্শনী বিভাগ, বার্ণ কোম্পানী ও বসু কোম্পানী প্রভৃতির কলকবজার অনেক শিক্ষনীয় বিষয় দ্রষ্টব্য ছিল। দেশী লবণের যেরূপ চাহিদা তাহাতে যত সত্বর নূতন নূতন কারখানা গড়ে ওঠে ততই মঙ্গল। কুটির শিল্প ও শ্রমশিল্প এতদুভয়ের যে যে প্রতিষ্ঠানগুলি প্রদর্শনীতে এসেছে তাদের কারোও দিকনির্ণয় (Charts & Statistics) লিপি নেই তা থাকলে প্রত্যেক শিল্পজাত দ্রব্যের ইতিহাস বিশেষরূপে জানিবার ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালার স্থানও নির্ণয় করা যায়। দেশী ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্সগুলিরও এই পদ অবলম্বন করা উচিত। প্রদর্শনীতে শরীর, ধর্ম্মের স্বরূপ, ব্যায়াম, অস্থিবিদ্যা স্নায়ু ও পেশীর কাজ, প্রসূতি-বিজ্ঞান প্রভৃতির আলেখ্যগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। মাঝে মাঝে বক্তাদের ব্যাখ্যা ও আবৃত্তি দ্বারা সব জিনিসটা আরও পরিষ্কার করে তোলা হয়েছিল।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের মানচিত্রগুলি ও বক্তৃতাবলী খুবই কার্য্যকরী হবে আশা করা যায়। বাঙালার শিক্ষানীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতির চিত্র ও বক্তৃতা খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। দেশের নগ্নমূর্ত্তি জাতির সম্মুখে এর চেয়ে স্পষ্ট করে তুলে ধরা যায় না। রাষ্ট্রে, সমাজে এবং ধর্ম্মসাধনায় ভারতীয় নারীদের স্থান এবং অধিকারের বিষয়গুলি বিশদভাবে দেখান হয়েছিল, যাঁহারা দেখেছেন মুগ্ধ হয়েছেন। বিশেষজ্ঞগণের বক্তৃতারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ট্রপিক্যাল স্কুলের মুর সাহেব ও কলিকাতা কর্পোরেশনের বিশ্বাস মহাশয় সারবান্ বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাতে দেখবার শেখবার ও কাজ করবার অনেক তথ্যই ছিল। শান্তি নিকেতনের কালীমোহন বাবুর পল্লী সংস্কার বিষয়ক বক্তৃতাটি বিশেষ উপাদেয় হয়েছিল। আরও অনেক খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ বক্তাগণ বক্তৃতা দিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যতথ্য প্রচার বিভাগের শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ভদ্র মহাশয় কলিকাতার ইতিবৃত্ত বিষয়ে বহু তথ্যপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দিয়াছেন। টিউবার কলোসিস এসোসিয়েসনের প্রচার বিভাগের শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয় জটীল ব্যাধি ক্ষয়রোগ তাহার বিস্তার ও প্রতিকার বিষয়ে প্রাঞ্জল বক্তৃতা দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন। উৎসব ও আনন্দেরও অভাব ছিল না। প্রাচ্য নৃত্যগীত অভিনয় প্রভৃতির আয়োজন করা হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স ফায়ার ব্রিগেড ও ব্রতীবালকগণ বিশেষ উৎসাহও আনন্দের সঙ্গেই কাজ করেছেন। প্রদর্শনী ক্ষেত্রটী নানাবর্ণের আলোক মালায় সজ্জিত করা হয়েছিল। কেন্দ্রস্থলের ফোয়ারাটি বড়ই মনোরম করে সাজান হয়েছিল। ঋষি বঙ্কিম একদিন খেদ প্রকাশ করে বলেছিলেন, বাঙ্গালী এক আত্মবিস্মৃত জাতি। তারপর থেকে আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কেটে গেল বাঙ্গালী সে কলঙ্ক মোচনে বদ্ধপরিকর হয়েছে। বাঙ্গালী জানতে পেরেছে তার অতীত ঋদ্ধির গরিমা। আচার্য্য শীল মহাশয়ের ভাষায় বলতে হয়, প্রায় দুই হাজার বৎসর ধরে ভারত শুধু সমাজ নীতি, শিল্পকলা ও আধ্যাত্মসাধনায় জগতের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়েছে তা' নয় তার নৌচালন, উপনিবেশস্থাপন, ব্যবসা বাণিজ্য ও শ্রমশিল্পের জন্য সারাজগৎ বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে এর দিকে দৃষ্টিপাত করেছে। ঋক্‌বেদে শাকদ্বীপ, ব্যাবিলন ও মিসরের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কের উল্লেখ আছে। ডাঃ সৈসের মতে সে আজ প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরের কথা। ব্যাবিলনের বস্ত্র তালিকায় আছে ভারতের মস্‌লিন। ঐ মস্‌লিনেই সজ্জিত হত মিশরের মামী। সোণা মুক্তা, প্রবাল গজদন্তনীল, তেঁতুল কাঠ প্রভৃতির ব্যবসা এদেশে পুরাদমেই চলত। বাইবেল বর্ণিত পুরোহিতমণ্ডলী সগর্ব্বে ধারণ করতেন এই ভারতেরই মুক্তা মাল (খৃঃ পূঃ ৪০০০) রাজা সলোমানের যুগে (১০১৫ খৃঃ পূঃ) সিরিয়ায় আমদানী হত এদেশের বস্ত্রসম্ভার, গজদন্ত লৌহবর্ম্ম

আরও'কত কি (বুক্ অফ কিংস্ ১ম এক্লিকায়েল)। জাতকসাহিত্যে মিসর, ব্যাবিলন, ফিনিসিয়া, আরব, সুবর্ণ ভূমি, চম্পা প্রভৃতির সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কের বিশেষ উল্লেখ আছে। মহাসমুদ্রের পরপারে এশিয়া মাইনর থেকে আরম্ভ করে। (খৃঃ পূঃ ৪০০) প্রাচীন গ্রীস ও রোমে ভারত যে যে সামগ্রী সরবরাহ করত তন্মধ্যে কার্পাসবস্ত্র মসলীন, সিল্ক, সিবন চিত্রণ, মণিমুক্তা রেশম পশম, মৃগনাভি, রঞ্জিত কার্পেট, ধাতুপাত্র, লবণ, তৈল, চাউল, ঔষধ, রং, সুগন্ধি দ্রব্য, চন্দনকাঠ লঙ্কা ও দারচিনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন মাত্র রোমান সাম্রাজ্য থেকে ভারত ব্যবসা করিয়া ঘরে আনিত ৪০,০০০০ লক্ষ পাউণ্ড। ভারতীয় শিল্পী ও বণিক অনেকেই ব্যাবিলন, আরব, আফ্রিকা ও চীনে বসবাস করত। থিবসের মন্দির গাত্রে আছে ভারতীয় দ্রব্যসম্ভারের উৎক্ষিপ্ত চিত্রাবলী। হাতিহাস প্রসিদ্ধ জন্মস্থান এই ভারত। লৌহ ও ইস্পাতের কাজে ভারতই শিক্ষাগুরু। তা ছাড়া ভোজরাজ সঙ্কলিত প্রাচীন গ্রন্থ "যুক্তিকল্পতরু"তে, আসন, ছত্র, তরবারি অলঙ্কার, মুক্তাভরণ প্রভৃতির কথা বিশেষ করে জানতে পারা যায়।

এইবার বাঙ্গালার বহির্বাণিজ্যের কথা। ধর্মসংস্থাপন ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্যই বাঙ্গালার বাণিজ্যের ইতিহাস বিজড়িত হয়ে আছে। চীন, কোরিয়া জাপানে ধর্মপ্রচার সুরু হ'ল। একাদশ শতাব্দীতে জাপান হুরুহজীর মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত হ'ল বাঙ্গালীর হাতের লেখা ধর্মপুঁথী। বাঙ্গালীর হাতের ললিত লেখায় লীলায়িত হল বরভূধরের মন্দিরমালা। বাঙ্গালা রূপদক্ষ ধীমান ও অসীত পালের শিল্প প্রভাবে আবির্ভূত হল তিব্বত, চীন ও জাপান। চণ্ডীমঙ্গল, মনসার ভাসান, পদ্মপুরাণে লোকসাহিত্য শ্রীমন্ত ও চাঁদসওদাগরের কাহিনী আজও বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করেছে। সোণারগাঁ, সাতগাঁ তাম্রলিপ্ত ছিল প্রাচীন পোতাশ্রয় ও বাণিজ্য কেন্দ্র। অর্ণবযানগুলির জন্য কাষ্ঠ সরবরাহ করিত শ্রীহট্ট ও সন্দীব। এই কাষ্ঠই খরিদ করিতেন রুমের বাদসা হাজার হাজার টাকায় সুদূর রুষের পণ্যক্ষেত্রেও বাঙালী বণিকেরা দোকান সাজিয়ে বসত। তারপর বাঙ্গালার রাজনৈতিক গগন মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতির প্রাণ প্রবাহ অবরুদ্ধ হল। বাঙ্গালীর ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি শিল্প একে একে সবই অন্তর্হিত হল। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হল শূন্য। তবু এ কথা কারও অবিদিত নেই যে এই বাঙ্গালীর মূলধনের উপর ভিত্তি স্থাপন করে আরম্ভ হল অনেক বৈদেশিক বণিকের প্রতিষ্ঠান; কেননা অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালার ব্যবসাবুদ্ধি তখন একেবারেই লুপ্তপ্রায়। আবার বহুদিন পরে বাঙ্গালী আত্মচেতন লাভ করছে ধীরে ধীরে। সে আজ অনেকটা আত্মস্থ হয়ে ভাববার অবকাশ পেয়েছে। তার শিল্পবাণিজ্যের ভিতর সে চাইছে আত্ম-প্রতিষ্ঠা। এ শুধু প্রভাতের অরুণোদয় মাত্র। শিল্প-বাণিজ্যের এ এক যুগ সন্ধিক্ষণ। পূর্ব্বদিক থেকে এসেছে জাপানের প্রতিনিধিবর্গ, পশ্চিম থেকে এল ইংলণ্ডের বণিকমণ্ডলী কেননা ১৯০৫ সালে জাপানের সঙ্গে ভারত সরকারের বাণিজ্যের যে সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল তার মেয়াদ ফুরাবে আগামী অক্টোবরে। এই দুই মহা সঙ্গমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বাঙ্গালী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে। নিজেকে মনে মনে অভিশাপ দিবার সময় আর নেই। নিজের শক্তিতে পথ প্রশস্ত করে নিতে হবে। বাংলা থেকে এক মুক্তধারা প্রবাহিত হয়ে রচিত হবে এ যুগের ত্রিবেণী সঙ্গম। "অদ্ ভদ্রং তদ্‌ব আসুবতু স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু" জয় যাত্রার পথে সমগ্র জাতির ইহাই মিলিত প্রার্থনা, বসুধারার মাঝখানে বসে আছেন জ্যোতির্ময়ী-জয়শ্রী। সঙ্কলন

দুই নারী

শ্রীআশালতা দেবী

(৭)

শুক্রবার বিকেল আন্দাজ পাঁচটার সময় সুকুমার অজিত নীপেশ, নীরেনের জনকয়েক বন্ধু ওর বাইরের বস্‌বার ঘরে আড্ডা জমিয়েচে। মাসদুই হোল নীরেনের একটা নূতন কবিতার বই বার হয়েচে, আলোচ্য প্রসঙ্গটা তাই নিয়ে। অজিত বললে, 'বাংলাদেশে ভালোকবিতার বই পড়ে কে?

সুকুমার। ওর একমাত্র সদ্গতি হচ্চে পোকার হাতে, যদি কাটে পোকাতেই কাটবে বাজারে কাটবে না।'

নীরেন। বাজারে নাই বা কাটল; কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি এখনো তোমাদের মত দারুণ প্র্যাকটিক্যাল হয়ে উঠিনি। নিরবধিকালে, নির্ব্বোধ পাব্লিকের উজান বেয়ে সে হয়ত একদিন কাকেও মথিত করবে। আগে থেকেই তার হিসেব করে বলে দিতে পারো? আর তাতেই আমি খুসী। যদি একজন পাঠকের মনও আমার লেখার সঙ্গে ঢেউ খেলে যায়; তাহলেই জানব আমার লেখা সার্থক হয়েচে।

সুকুমার। তার মানে তুমি দিব্যি আছ। টাকার ভাবনা নেই। কিন্তু কবিতার বহির কথাই বা বিশেষ করে বলি কী করে; পাব্লিকের কথা ভেবে যদি বই লিখ্‌তে হয়, তা হলে ত বিষাদের পার পাওয়া যায় না। আজকাল ভালো করে বই পড়ে ক' জনে?

নীরেন বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞেস করলে, 'তার মানে'?

সুকুমার। মানে আর কি। ধীরে সুস্থে বই পড়্‌বার মত অবসর আর ধৈর্য্য ক'টা লোকের আছে। আপ্‌ টু ডেট্‌ হবার প্রবল ঝোঁকে প্রশ্রয় দিতে যেয়ে আমাকে রোজ রাশি রাশি খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন আর তৃতীয় শ্রেণীর লেটেস্ট্‌ বহি গলাধঃকরণ করতে হচ্চে। গুণের তারতম্য যেমনই হোক সর্ব্বদাই লেটেস্টের খবর না রাখ্‌তে পারলে, মডার্নিজমের রেসে পিছনে পড়ে যাবার ভয় এত প্রবল!

নীরেন। তাহলে বলতে চাও কোথায় কি হবে খবর রাখ্‌বার কোন প্রয়োজন নেই? জগতের চিন্তাধারার সঙ্গে যোগ রাখ্‌তে হবে না?

সুকুমার। না রেখে আমাদের যো আছে? কখন মান যায় সেই ভয়ে সদাই সশঙ্কিত? তুমি যখন বল্‌বে সুকুমার, অল্ডাস হাক্সলির অমুক বইখানা পড়েচ? কী বল্লে? পড়নি? 'Oh shame!' ওটা তোমার পড়া উচিত ছিল। It's a terrible satire on fordism! তখন আমি কী বলব। জবাব দেব কী! তাইত যা কিছু বাহির হয় সবগুলোর উপর আমাদের

একবার করে চোখ বুলিয়ে নিতে হয়। যাতে কথা উঠলে দুচার কথা নিজের টীকা টিপ্পনি সমেত বল্‌তে পারি। কিন্তু চোখ বুলিয়ে যাওয়া কথাটা মার্ক কোর। মনে মনে দাগ দাও ওটার তলায় কেননা ওইটাই হচ্চে একমাত্র কথা যা আমাদের আজ কালকার বই পড়া সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায়।

অজিত। হাঁ তাই বটে। আর তাই জন্যেই ছাপার অক্ষরে আজকাল যা চোখে পড়ে; তার নশো নিরানব্বুইটা কথা অমনি চোখ বুলিয়ে যাওয়ারই যোগ্য।

নীরেন। বাঃ, কথাটা কেমন হোল? পাব্লিকে উপেক্ষা করে পড়ে। এবং তাই তারা যা পড়ে সেটা উপেক্ষারই যোগ্য। এটাকি হেয়ালির মত শোনাচ্চে না? কথাটার ল্যাজ এবং মুড়ো যেন এক হয়ে মিশে গেচে।

অজিত। প্রথমটায় তাই শোনায় বটে। কিন্তু অডিয়েন্স (Audience) জিনিষটার যে কী দারুণ দাম তা আমরা সকল সময়ে বুঝে উঠতে পারিনে। দর্শক, শ্রোতা এবং পাঠককে তুমি তোমার সৃষ্টি থেকে কিছুতেই ছেটে ফেলতে পারোনা। ধর একটা গানের সভায় যে মুহূর্ত্তে গায়কের সঙ্গে শ্রোতাদের একটা অদৃশ্য নিঃশব্দ যোগ সাধিত হবে সেই মুহূর্ত্ত থেকেই গায়ক প্রেরণা পাবে সম্মিলিত অডিয়েন্সের কাছ থেকে। বাইরে থেকে দেখা না গেলেও তা কত সত্য; তুমি বরঞ্চ জিজ্ঞেস করে দেখ কোন ভালো গায়ককে। একজন যে শ্রদ্ধা নিয়ে সমস্ত মন দিয়ে শুনবে, শুধু এই কথাটা মাত্র গায়ককে ভিতরে ভিতরে কতখানি আগিয়ে দেয়। সাহিত্যের বেলাতেও তাই। যদিচ সাহিত্যের স্রোত কোন একটি বিশেষ দিনের বিশেষ স্থানের সভা দিয়ে খণ্ডিত নয়। যদিও আমরা ভবভূতির মত, অভিমান করে বলতে পারি; 'কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী।' কিন্তু তবুও সব অভিমানটা যায় না। অভিমানের একটু খোঁচা লেগে থাকেই। নির্ব্বোধ পাব্লিকের লাগি ঠেলতে হবে মনে পড়লেই মনটা যায় মুমূর্ষ হয়ে। বহুদূর অতীতের কথাটা সকল সময়ে স্মরণ করে জোর পাওয়া যায় না। তাই যা ইচ্ছে করলে হয়ত ভালোকরে লেখা যেতে পারত, অযত্নে অবহেলায় তার নশোনব্বইটা কথা অমনি চোখ বুলিয়ে যাবার যোগ্য করেই লেখা হয়।

নীরেন উত্তেজিত হয়ে বল্‌লে। 'ভয়ানক মিথ্যে কথা! নির্ব্বোধ পাব্লিককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেও রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র এঁদের আবির্ভাবকে কেউ ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারেনি।'

অজিত। যাঁরা সত্যিই দেশ কালের অতীত, তাঁদের কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু চাওয়ার যে একটা অনিবার্য্য শক্তি আছে সে কথা অস্বীকার করবে কী করে? যে বড় করে চায়, তাকে ছোট জিনিষ দিতেই যে বাধে। তাই আজকাল নীতি শাস্ত্রজ্ঞেরা যখন 'হায় হায়' করে ওঠেন; বাংলা সাহিত্য আগাছায় ভরে গেল! তার রসাতলে যাবার বুঝিবা আর বেশী দেরী নেই। তখন আমার হাসি পায়। কেবল উপদেশ দেওয়া ছাড়া, সাহিত্যের কাছে বড় জিনিষ দুর্লভ জিনিষ চাইতে হলে যেমন করে চাওয়া দরকার তাকি তাঁরা চেয়েছেন কোন দিন? যদি সে চাওয়ায় সত্যিকার জোর থাকত তবে তাকে ঠেকাত কার সাধ্যি!

নীপেশ সায় দিয়ে বল্লে; 'সত্যিইত যে চাইতে পারে, তাকে যে দিতেই হবে। প্রবল ভাবে চাওয়ার শক্তি কী কম!'

সুকুমার মুখটিপে হেসে বললে, 'অজিতের কথা ছেড়ে দাও কিন্তু তুমি খাস বৈজ্ঞানিক হয়েও আজ এমন মিষ্টিকের মত কথা বল্‌চ যে?'

কথাটা মিথ্যে নয়। নীপেশ আশৈশব বিজ্ঞানের চর্চ্চা করে এসেচে। এমন কি এম, এস, সি পাশ করার পরে স্বাধীনভাবে ফিজিক্সের বিষয়ে রিসার্চ্চ করে তার নামও বেরিয়েচে। ঢাকার এক কলেজে সে ফিজিক্সের প্রফেসর। ছুটিতে কলকাতায় এসেচে। কিন্তু যাক্। নীপেশ একটু গম্ভীর হয়ে বল্‌লে; 'আমাকে আর তামাসা কর কেন? তার চেয়ে জিজ্ঞেস কর আজকের দিনের 'Scientific modernism' জিনিষটা কী দারুণ জিনিষ! প্রতিপদে কী অস্থির, কী চঞ্চল! পায়ের তলা থেকে তার প্রতি মুহূর্ত্তে মাটি সরে যাচ্ছে। বিধিমত যুক্তি প্রয়োগ করে যা প্রমাণ করেচ, যে কোন মিনিটে তা ভেঙ্গে যেতে পারে এতে কি একটা হতাশা আসে না? ঝাঁকরে মিস্‌টিক (Mystic) হয়ে যেতে ইচ্ছে করে না? আমাকে দোষ না দিয়ে তুমি বরঞ্চ দোষ দিতে পার—'...That disquieting scientific modernism which is now turning the staunchest mathematical physicists into mystics.'

অজিত। বাঃ, খাসা বলেচে ত হে। কে বলেছে? কথাটি বেশ ছোট্টর মধ্যে 'কোট্' করবার মত।

সুকুমার। দেখলে এতক্ষণ যা বল্‌তে চেয়েছিলুম, আজকাল আমরা বই পড়ি কেবল কোটেশন টুকে রাখ্‌বার জন্যে।

নীপেশ। তা যে জন্যেই হোক; কিন্তু মানবে ত যে আজকাল কোন বস্তুকেই বিশ্বাস কর্‌বার যো নেই। কোন জিনিষেরই জবরদস্তি সীমানা টিক্‌ছে না। কোন কিছুর মাঝেই স্থায়ী স্বস্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না।

সুকুমার টপ্ করে বল্‌লে; 'এমন কি প্রেমের মাঝেও না। প্রেমকেও যে স্থায়ীভাবে মান্‌তে পারা যাবে আর বেশীদিন তা বলে মনে হয় না।'

অজিত—'যে দিকেই কথার মোড় ফেরাও; অবশেষে তা এসে ঠেক্‌বেই প্রেমের প্রসঙ্গে।'

নীপেশ একটু বিতৃষ্ণার সুরে এবং অবশেষে Love's subtle psychology আলোড়ন চলবেই। কিন্তু ওজিনিষটার এত চর্চ্চাকরে হয়েছে এই যে শুন্‌বামাত্রই গায়ে জ্বর আসে।

নীরেন—কিন্তু সাহিত্যে এবং জীবনে প্রেম একটা বড় অনুভূতি। তা পুরাণো হয় না।

নীপেশ—তুমি হয় না বল্‌লেই হোল!

সুকুমার হেসে বললে; কিছুদিন আগে বাংলা সাহিত্যের বৈঠকে ঠিক এই তর্কই উঠেছিল। যে তর্ক আমরা চারবন্ধু মিলে, চোদ্দনম্বর ফার্ণ রোডে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে মহোৎসাহে কর্‌চি।

অজিত—অতএব তর্কের বিষয়টা প্রশস্ত, তাতে সন্দেহ নেই।

সুকুমার—সেদিন বাংলা সাহিত্যের মহারথীরাও একযোগে নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন; ওহে অতি আধুনিক সাহিত্যিকেরা তোমরা এ করচ কী! কেবল প্রেমের কথা! আর প্রেমের ব্যথা! আর কিছু নিয়ে গল্প লেখোনাহে। যা বড্ড সোজা যা ধূলোয় লুটিয়ে পড়ার মতই সোজা, তাই নিয়ে নিরন্তর এত টানাটানি কেন। সেদিন কি জানি আমার ভারি হাসি পেয়েছিল।

নীপেশ—হাসির কারণ? ওঁরা ঠিকই ত বলেছিলেন। দরদ দিয়ে দেখতে পারলে, পৃথিবীর সবজিনিষই ত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তখন একটা জিনিষকে অহরহ এত বাড়ানো কেন?

সুকুমার—সব জিনিষ নিয়েই সাহিত্য হয়, ওটা থিওরির কথা। কার্য্যকালে দেখা গিয়েচে এমন বস্তুর সংখ্যা খুবই পরিমিত, যা এমন করে নাড়াদিয়ে আমাদের মনকে জাগায় যার ফলে আর্টের সৃষ্টি। এবং এই বিরলতম বস্তুর একটি হচ্চে প্রেম। তাই ওটা সোজা কি শক্ত নতুন কি পুরোণ সে নিয়ে কথাই ওঠেনা।

নীপেশ—আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না।

সুকুমার—তা কেমন করে পারবে! আমি যা বল্লুম তা যদি মিথ্যে হোত, তা হলেত তোমাদের থিওরি অব্ রিলেটিভিটি নিয়ে রাশি রাশি সনেট্ আর উপন্যাস লেখা যেতে পারত। কারণ এখন ওটাইত জগতের সবচেয়ে রেভোলিউশনারি থিওরি।

নীপেশ—কিন্তু ওটাএত শক্ত ব্যাপার যে তোমাদের নির্ব্বোধ কবির দল ওর বোঝে কী। জগতের কটালোকেই বা ও জিনিষ বুঝতে পেরেচে। আইনস্টাইন যদি কবি হ'তেন তা হলে হয় ত আমরা পূরো একসেট্ কবিতার বই পেতুম, রিলেটিভিটি নিয়ে লেখা।

সুকুমার—কিংবা নীরেন যদি আইনস্টাইন হোত তা হলেও ও পারত এক ভলুম সনেট লিখে ফেল্‌তে ওই নিয়ে।

নীপেশ—'তা পারতে পারত। ও ত একই হোল।' তারপরে হাত দুটি একত্র করে উদ্দেশ্যে নমস্কার:—'কিন্তু দয়া করে আইনষ্টাইনকে নিয়ে ঠাট্টা কোর না। উনি আমার নমস্য গুরু।'

সুকুমার হেসে বোল্লে: 'না আর করব না। কিন্তু তা যে হয় না নীপেশ। সংসারে থিওরিতে আর কাজের বেলায় বিরোধ বাধে এইখানেই। নীরেন, সুধীরাকে যেমন করে বোঝে, তেমনি করেই যদি কোনদিন পারত থিওরি অব্ রিলেটিভিটি বুঝতে, তা হলেই বেরুত ওর কলম থেকে ওই নিয়ে কবিতা। অথচ তা যে হয় না। এমন কি নীরেন যদি রাতারাত আইনষ্টান হয়ে ওঠে তা'হলে হয় না। কিন্তু ক্ষমা কর। আবার হয়ত ঠাট্টাচ্ছলে ওঁর নাম করে ফেললুম।' সুধীরার কথা উঠতেই, বন্ধুবর্গ একটু মুচকে হাসলে। কারণ

নীরেন সর্ব্বদাই খোলাখুলি। ওর আন্তরিকতার সীমা নেই। বন্ধুদের কাছে কোন কথাই গোপন করে না। অজিত ওর দিকে চেয়ে হেসে বল্‌লেঃ 'অত ঘনঘন ঘড়ীর দিকে তাকাচ্ছ কেন? সুধীরা ও সাতটার আগে আস্‌বে না।'

নীরেন লজ্জা পেয়ে বল্‌লে—ঃ 'না তাড়া কিছু নেই। কিন্তু সাতটাওত প্রায় বাজে।

সুধীরাদের মোটরটা কম্পাউণ্ডে ঢুক্‌চে দেখা গেল। সুধীরা আর সুজাতা নেমে প্রথমে এই ঘরেই ঢুকল। সুধীরার সঙ্গে নীরেনের এইসব বন্ধুদের পরিচয় পুরোণো। সুজাতাকে সে পরিচিত করে দিলে এঁদের সঙ্গে। সুজাতার নাম শুনে নীপেশ কষ্টে হাস্য সংবরণ করলে। সুকুমার কি একটা কথা আরম্ভ করতে যেয়ে 'Really…বলে'ই থেমে গেল। সবাই যেন হঠাৎ কী একরকম আড়ষ্ট। কিছু ক্ষণের জন্যে সবাই চুপ চাপ। শুধু ম্যাণ্টেল পীসের ওপরে বড় ঘড়িটার টিক্‌ টিক্‌ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। নীরেনের এই বস্‌বার ঘরখানি ওরিয়েণ্ট্যাল্‌ ফ্যাশানে সাজান। অন্ততঃ ও তাই বলে। সমস্ত ঘর জুড়ে একটি ফর্সা জাজিম বিছানো। গোটা পাঁচ ছয় তাকিয়া। কোণের দিকে চন্দন কাঠের অদ্ভুত ডিজাইন করা ছোট একটি টেবিল। ইতস্ততঃ টেবিলের পাশে খান দুই চৌকী। দেয়ালের গায়েই খাঁজ করা কাঁচের পাল্লা দেওয়া আলমারী। আলমারীতে বহির সারি।

সুধীরা বিধ্বস্ত তাকিয়া কয়েকটার দিকে চেয়ে বল্‌লে—ঃ 'ভাবে বোধ হচ্চে আপনাদের তর্ক বেশ জমে উঠে ছিল। থামলেন কেন? চলুক না। অম্‌নি আমরাও মুখেমুখে দুটো কথা শিখে নেব।'

সুকুমার হেসে বল্‌লে—ঃ 'আপনার বিনয়ের শেষ নেই। কিন্তু তাকিয়া কয়েকটার দিকে অমন করুণ ভাবে চাইছেন কেন? ওদের ওপরে, আমাদের আবেগের চিহ্ন দেদীপ্যমান বলে বুঝি?'

এমনি করে সুধীরার সঙ্গে ওদের মিষ্টি রহস্যালাপ চলল। কিন্তু সুজাতাকে ওরা ভদ্রতার খাতিরে প্রথমের দিকে একটা নমস্কার করেছিল। এবং সেই পর্য্যন্ত। তারপরে ওর সঙ্গে আর কেউ একটা কথা মাত্র বল্‌বার চেষ্টা করলে না। এমন কি সে যে সেই ঘরেই ওদের চেয়ে একটু দূরে, কোলের উপর হাত দুটি জড়ো করে এমন সুললিত ভঙ্গীতে বসে আছে; বিশ্ব সংসারের এত বড় দৃশ্যটাও ওদের চেতনাকে তার সম্বন্ধে তেমনই অসার করে রাখলে। কিন্তু কী করেই বা তা সম্ভব হোল?

মাস খানেক ডাইভোর্স বিল যখন হিন্দু সমাজে চলবে কি না এই ধরণের একটা প্রসঙ্গ উঠেছিল, নীপেশের দল কম তর্ক করেনি। তখন তাদের সে কী প্রচণ্ড উত্তেজনা! সে সময়ে তাদের দেখ্‌লেই মনে হতে পারত, বাংলা দেশটাও দৌড়ে পেছিয়ে নেই। তরুণ ইন্‌টেলিজেন্সিয়ার কাঁধে চড়ে যথাসাধ্য সেও পাড়ি জমিয়েচে।

একটা কাগজে পড়া গিয়েছিল; বিবাহ-বিচ্ছেদের আলোচনা সম্পর্কে কোন এক সভায় জনৈক সাধ্বী মহিলা যুক্তিতে পরাস্ত হয়ে অবশেষে পায়ের জুতো খুলে বলেছিলেন, যে সভায় এ আইনকে সমর্থন করা হয়, সে সভার একমাত্র ভাগ্যফল জুতো ছুঁড়ে তাকে সম্মান দেখান। তখনই সেই মুহূর্তে তাঁর নাসারন্ধ্র কেমন করে স্ফীত হয়েছিল, সমস্ত রক্ত মুখে এসে জমা হয়ে পরম উত্তেজনায় কী গাঢ় শোণিতাভায় তা আরক্ত হয়ে উঠেছিল; কল্পনার চক্ষে দেখতে পেয়ে নীপেশের দল অট্টহাস্য করে আরও দু' পেয়ালা চা বেশিই খেয়ে ফেলেছিল।

সুকুমার হাস্‌তে হাস্‌তে বলেছিল; এ হচ্চে মেয়েদের সেই ধরণের যুক্তি, যার কথা ছোট বেলা থেকেই আমার মনে আছে; মায়ের সঙ্গে কোন বিষয়ে তর্ক করতে গেলেই তিনি তর্ক শাস্ত্রের ভরাডুবি করে প্রশ্ন করতেন—ঃ 'তুই আমার কাছ থেকে জন্ম নিয়েচিস্ না আমি নিয়েচি তোর কাছে থেকে!' আর একদফা ওদের বিপুল অট্টহাস্য শোনা যেত। অজিত বলত—ঃ আর অসহযোগের সময় মেয়ে ভলেণ্টিয়ার যদি দেখ্‌তে! যে মেয়ের চেহারা ভালো সে যদি হাত জোড় করে বলেঃ—'তর্ক রেখে দিন, মোট কথা আমার কথা না শুনে আপনার যাবার যো নাই।' সেও একটা দস্তুর মত সীন!

সুকুমার একটু গম্ভীর হয়ে বলেছিলঃ 'এতে আমি মেয়েদের তত দোষ দেখতে পাইনে। এটা হচ্ছে অসহযোগের পাণ্ডাদের দোষ। যারা বিশেষ করে বিশেষ বিশেষ কাজে মেয়ে ভলেণ্টিয়ার পছন্দ করে, এইজন্যে যে মেয়েদের প্রতি ব্যবহার বিষয়ে পাব্লিকের স্বভাবতঃই কতকগুলি দুর্ব্বলতা আছে বলে। এ যেন যার দয়া আছে, যার অত্যন্ত অধিক চক্ষু লজ্জা; যে ধার চাইলে পারত পক্ষে ফেরাতে পারে না, তারই দয়ার উপরে জুলুম করে বার বার ঋণ চাওয়া।' কিন্তু তর্কের বেলায় এক রকম করে মুখ ছোটে, আর ব্যবহারের বেলায় মন যায় সঙ্কোচে বিন্দুবৎ হয়ে। সে প্রমাণ নীপেশরা দিয়েই ফেল্‌লে আজ। সুজাতাকে ওরা প্রশস্ত মনে অভ্যর্থনা কর্‌তে পারলে না। ও যেন কুহকিনী নারী…ফাঁদ পেতেই আছে। একটু প্রশ্রয় দিলেই বিপদে ফেল্‌বে। সুধীরা হাসি হাসি মুখে ওদের সঙ্গে গল্প করচে, আর সুজাতা একটু দূরে হাঁটুর আল্‌গোছে দু'টি হাত রেখে, আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছে। দৃশ্যটা কেমন খাপছাড়া……কেমন যেন অভদ্ররূপে নিষ্ঠুর। নীরেন ক্রমশঃ আরও নার্ভাস্ হয়ে উঠ্‌তে লাগল। মামাত ভাই টুকুকে ডেকে বল্লে—ঃ 'আবদুলকে বলে এস এঁদের খাবার সাজাতে।'

সুধীরা উঠে পড়ে বললে—ঃ 'আমরা ততক্ষণ একটু ভেতরে যাই।' সুজাতাকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে বললে—ঃ 'ও মামীমার সঙ্গে আলাপ করতে খুব ব্যস্ত।'

মামীমাও সুজাতার প্রতি কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে রইলেন। সুজাতা দু'টি আঙুলে

করে তুলে অতি সন্তর্পণে, দু' এক টুক্‌রো ফল মুখে দিলে। চাম্‌চে করে রূপোর বাটিতে অনেকক্ষণ টুংটাং করে, দু' এক চামচ মাত্র ছানার পায়েস আস্বাদন কর্‌লে। আবদুলের আনা ডিম্‌ গুলো সুধীরার দিকে ঠেলে দিয়ে বল্‌লে, 'মাছ মাংস ত আমি খাইনে ভাই।'

নীরেন খাবার টেবিলের কিছু দূরে একটা চেয়ারে বসেছিল। ওর বন্ধুরা বিদায় নিয়েচে। সুজাতার আহার্য্যের স্বল্পতা দেখে ওর মুখের নিরামিষপ্রীতির কথা শুনে ও একটা নিঃশ্বাস ফেল্‌লে। সুজাতাকে ও যতই দেখ্‌চে তত মুগ্ধ হচ্চে। ছোটখাট বিষয়েও এত সর্ব্বাঙ্গীন সংযম। সমস্ত মুখের শ্রী ঘিরে একটী শান্ত ধৈর্য্যের বিষাদ।

মামীমা বললেন :—'নীরেন, আজ ষোড়শী দেখ্‌তে যাব ভেবে রেখেচি। শিশির বাবু রয়েচেন। তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। কিন্তু সাড়ে আটটা প্রায় বাজে। ...'

সেদিন 'চিত্রা'য় সুধীরা আপন অধৈর্য্যে নীরেনকে বৃথা সংশয় করে যত কষ্ট দিয়েচে তা'র মনে, আজ আপন বিশাল হৃদয়ের মহিমায় তার শেষ বিন্দুটি অবধি মুছে নেবে বলে স্থির করেচে। তাই বললে 'আজ সুজাতাও যাবে আমাদের সঙ্গে। (সুজাতার দিকে চেয়ে) বাড়ীতে যদি বলা না থাকে, তুমি না হয় ফোন করে একটা খবর দিয়ে দাও, সুজাতাদি।

'না, না, আমি যেতে পারব না ভাই। থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখ্‌তে যদিও আমার ভালো লাগে না, তোমাদের সঙ্গের লোভে তবুও না হয় রাজী হতুম। কিন্তু আজ আমার শরীরটা ভালো নেই মাথা ধরেচে বড্ড।'

মামীমা বললেন, 'শরীর যখন ভালো নেই তখন তার উপরে আর কথা কি! সুধীরা, তুমি অনর্থক ওঁকে জিদ কোরনা।

নীরেন উঠে পড়ে বললে, 'আচ্ছা তোমরা দু'জনে তৈরী হয়ে থেক। আমি ততক্ষণ এঁকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

সুধীরা এইমাত্র আপনমনে যত ভালো ভালো সঙ্কল্পের প্রাসাদ খাড়া করেছিল, তার ভিত্তি সমস্তই আলগা হয়ে গেল। আস্‌বার সময়ে সে আর সুজাতা একসঙ্গে এসেছিল। যাবার সময় নীরেনকে সেই জায়গা ছেড়ে দিতে হোল। মাথায় উপরের পাখাটার দিক চেয়ে ও মনে মনে এরই মধ্যে ভাব্‌তে সুরু করলে :—এর ক্ষতি কি আজ নাটামন্দিরে শিশিরবাবুকে দেখেই পোষাবে?

সুজাতার দিকে তাকিয়ে বললে, 'কেন সুজাতাদি, থাক না ভাই। একসঙ্গে সকলে মিলে দেখ্‌লে কত আমোদ হবে।'

নীরেন ওর হয়ে উষ্ণকণ্ঠে জবাব দিলে, 'কেন তুমি নিজের ইচ্ছেটা জোর করে সবারই ঘাড়ে চাপাতে চাও সুধীরা! শুনচ যে ওঁর শরীর ভালো নেই, তার উপরে রাত জাগবেন কিবলে।'

সুধীরা অপমানে অধর দংশন কর্‌লে। মাসীমা একটু অবাক্ হয়ে নীরেনের মুখের দিকে চাইলেন। ওর এত উষ্মার কী কারণ ঘটেচে। সুধীরার দিকে চেয়ে ওর কঠিন মুখের ভাব থেকে

ওর মনের গতি আন্দাজ করে, তাকে নরম করতে স্নিগ্ধস্বরে বললেন 'ঠিকই বলেচে নীরেন। শরীর খারাপের উপর রাত জাগতে অনুরোধ কোরনা সুধীরা। তুমি তাহলে চট করে ফিরে এস নীরেন। দেরী কোরনা। আমরা অপেক্ষা করে থাকব।'

বারান্দাটা পার হয়ে আসতে আসতে নীরেন বললে, 'আজ আপনার কী হয়েচে ? দেখে মনে হচ্চে আপনার শরীরও ভালোনেই, মনও ভালোনেই। আজ এখানে নিয়ে এসে হয় ত অনেক ক্লেশ দিলুম।' সুজাতার দিকে চেয়ে এই ক'টি কথা বলতে বলতেই নীরেনের কণ্ঠস্বর মাধুর্য্যে ভরে উঠল।

বাইরের ঘরে প্রচুর ফুল সাজান ছিল। যাওয়ার পথে একটু দাঁড়িয়ে নীরেন বারান্দা থেকে সেই ঘরে ঢুকল। সবচেয়ে ভালো গোলাপের তোড়াটি বেছে নিয়ে এসে বললে, 'এটা কি আপনি নেবেন ? আপনি যে আজ আমার আতিথ্য গ্রহণ কর্লেন এটা তারই চিহ্ন। জানি আপনার যোগ্য নয়। তবুও আপাততঃ এর চেয়ে ভালো জিনিষ হাতের কাছে নেই।'

(৮)

মোটরে উঠে ওরা পাশাপাশি বসল। খানিক দূর যেয়ে নীরেন বল্লে, 'আপনার যে মাথা ধরেছিল বলছিলেন, যদি কিছু মনে না করেন তা'হলে মোটরটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে বলি। সন্ধ্যের হাওয়াতে বোধকরি উপকার পাবেন।

সুজাতা যেন অনিচ্ছার সঙ্গেই বললে, 'আমার আর এমন কী হয়েছে, সামান্য একটু মাথা ধরা বইত নয়। ওদিকে আবার ওঁদের থিয়েটারে যাওয়ার দেরী পড়ে যাবে। না, না সে ভারি অন্যায় হবে নীরেন বাবু। আমি বলি থাক আজ।'

'কিচ্ছু দেরী হবে না। এখনও ত ঘণ্টাখানেকের ওপর সময় রয়েচে।'

মোটরটা বেশি জোরে যাচ্ছে না। ঘণ্টায় পনের কুড়ি মাইল হবে বোধকরি। নীরেনের পক্ষে এ ছ্যাক্‌ড়া গাড়ীর রেটে যাওয়া। তবুও আজ সে এতেই রাজী।

সহসা সুজাতা বললে, 'আজ এত ঘটা করে আমাকে আপনাদের বাড়ী নিয়ে যাবার কী দরকার পড়েছিল বলুন ত ?

কথাটা ছোট। কিন্তু অসমাপ্ত ইঙ্গিত এবং অভিমানের ব্যঞ্জনায় সুজাতার এই প্রশ্ন যেন নীরেনকে অনুতাপের কষাঘাত করলে। বললে, 'বুঝেচি আমার বন্ধুরা, আমার বাড়ী আপনার যোগ্য নয়। কিন্তু প্রথমে সে কথাটা বুঝ্‌তে না পেরে আপনাকে যে সেখানে টেনে নিয়ে যেয়ে ক্লেশ দিয়েচি, সেজন্যে আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।'

সুজাতার কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

অনেকক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষা করে অবশেষে নীরেন বললে, 'চুপকরেই থাকলেন, তাহলে বুঝলুম আমাকে আপনি ক্ষমা করেন নি। কিন্তু বিশ্বাস যদি কর্‌তে পারতেন যে আপনার কষ্ট আমারও ক্লেশ তাহলে বোধকরি ভালো হোত। কিন্তু যাক, সে যখন বিশ্বাস কর্‌তেই পার্‌বেন না—তখন অন্ততঃ আমাকে ক্ষমা করুন।'

তবুও সুজাতা নিঃশব্দে বসে আছে। সামনের একটা গ্যাসপোস্টের তলাদিয়ে গাড়ীটা যেতেই নীরেন দেখতে পেলে সুজাতা গাড়ীর এক কোণে ঠেসান দিয়ে শিথিলভঙ্গীতে বসে রয়েচে। গোলাপের তোড়াটা তার হস্তচ্যুত হয়ে পায়ের কাছে পড়ে গেছে। আর ওর চোখে জল! সে জল এত বেশি যে চোখের কোল বেয়ে গালের দুপাশে অশ্রুরেখা নেমে এসেচে। নীরেন ওর একটি হাত চেপে ধরে কাণে কাণে কথা বলার মত করে বললে, 'সুজাতা! সুজাতা! ছিঃ, কেঁদোনা।'

কিন্তু সে একমিনিটেরও সামান্যতম ভগ্নাংশের জন্যে। পরমুহূর্ত্তেই হাত ছেড়ে দিয়ে সরে বস্‌ল।

সুজাতা মৃদুকণ্ঠে বললে 'আপনার বন্ধুরা আর আপনার বাড়ী কেন আমার যোগ্য হবে না, আমিই তাঁদের যোগ্য নই। আপনি আমাকে স্নেহ করেন বলে এই সব সাদা সত্য আপনার চোখ এড়িয়ে যায়, কিন্তু কেন আপনার এ চেষ্টা? আর কেনই বা আমাকে সবারই মাঝখানে টেনে আনতে চান?'

ওদের বাড়ীর সকলেরই সুজাতার প্রতি আড়ষ্ট ভাব এবং নিঃশব্দ উপেক্ষার কথা মনে পড়ে যাওয়াতে নীরেন বুঝতে পারলে, অভিমানিনীর চোখের জল কেন পড়ল। সুজাতার অশ্রুব্যাকুল মৃদু কণ্ঠস্বর ওকে নিরতিশয় আর্ত্ত করে তুলেচে অথচ সঙ্গে সঙ্গে ভারি মধুর লাগ্‌চে। সুজাতা যে ওর উপরে অভিমান করতে পারে এই কথাটাই যেন নিরন্তর রয়ে বসে একটু একটু করে আস্বাদ কর্‌তে ইচ্ছে করে। সেও তেমনি মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, 'এ কথা কি বুঝতে পারেন যে আমি আপনাকে স্নেহ করি?'

'কেন বুঝ্‌তে পারব না নীরেন বাবু, আমার কি এতই আত্ম-অভিমান যে এই সহজ সত্যটা চোখবুজে অস্বীকার করব? কিন্তু এইটুকু জানবেন বাইরের জগতের কাছে আমি অপরাধী। তার চোখে আমার জন্যে স্নেহ কিংবা শ্রদ্ধা আশা করবেন না। তাইত বলি আপনারা আমাকে নিয়ে টানাটানি কর্‌বেন না। আমাকে একলা থাক্‌তে দিন।'

নীরেন আরও চঞ্চল হয়ে উঠ্‌তে লাগল। যে মেয়ে ওর পাশে বসে রয়েচে তাকেত ও জানতই না। কত বছর কত মাস কেটে গেছে তার অস্তিত্বের স্রোত নীরেনের চোখের আড়ালে হৃদয় মনের অন্তরালে কেমন করে বয়ে গেছে সে খবর তার সম্পূর্ণ অজানা ছিল। হয়ত মোটে একমাস আগে একদিন খবরের কাগজে তার নাম প্রথম দেখেচে। কিন্তু তাতে কী যায় আসে! সময় দিয়ে আর্টিস্‌ট্ নীরেনকে মাপা যায় না। ওর পক্ষে একমাসে এক যুগান্তর ঘটে যেতে পারে। যদি সময় থাকে অনুকূল এবং প্রিয় হৃদয়ের প্রসাদ এবং প্রশান্ত অন্ধকার-আকাশের তারাগুলির মত নিঃশব্দ করুণতায় এমনই করে হৃদয়ের পরতে পরতে জড়িয়ে ধরে। মনে মনে অধীর হয়ে ও ভাব্‌লে সুজাতা আমার কাছ থেকে ওইত কতটুকু দূরে বসে রয়েচে—তবুও কত সীমাহীন দূরে। ওর জীবনের জটিলতা, বেদনা দূর করবার আমার কোন অধিকারই নেই। কিন্তু তবুও ত তা মান্‌তে

পারচিনে। আজ সমস্ত জগতের পরিত্যক্তা হয়ে সে যে কেবল আমারই পাশে বসে ক্লেশ পাচ্ছে; এমন একটা আশ্চর্য্য কথা একমিনিটের জন্য ও ভুলতে পারচিনে। আপন মনে কথা বলার মত করেই ও আস্তে আস্তে বলতে লাগল, 'অথচ কী মজা দেখুন, একদিন আপনার এবং আমার আত্মীয়স্বজন উঠে পড়ে লেগেছিলেন যাতে আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। কিন্তু তখন কে জানত আপনি কে? আর তা জানতুম না বলেই ত অত অনুরোধ উপরোধ কিছুই কোন কাজে লাগল না।'

সুজাতা যেন একটু নীরস সুরে বল্লে 'থাক, ওসব কথা নীরেনবাবু। যে আলোচনায় এখন আর কোন পক্ষেরই লাভ নেই, তা অনর্থক করবেন না। কিন্তু ন'টা বোধ করি এতক্ষণে বাজে। আমার সঙ্গে অন্যদিন গল্প করবেন। আজ সময়ে না ফিরতে পারলে ওঁরা রাগ করবেন।'

নীরেন হঠাৎ সুজাতার কোলের উপর জড়ো করে রাখা হাত দুটি চেপেধরে বললে, 'কেন সুজাতা সমস্ত কথাকেই আমার চাপা দিয়ে দিতে চাও। করুন, ওঁরা রাগ। আমার তাতে কী বায় আসে! কেন তুমি আমার কথা শুনবে না? তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ, আর আমাকে তাড়াতাড়ি দৌড়তে হবে থিয়েটার দেখতে! আমার সমস্ত মন যেখানে বেদনায় আত্মবিরোধে জর্জ্জর...' সুজাতা শান্তভাবে আপন হাত মুক্ত করে নিয়ে বললে, 'নীরেন বাবু, আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি এসেগেছি। যাবার সময়ে তাড়াতাড়ি যাবেন, না হলে সুধীরা বোধ করি রাগ করবে। আর্টিস্ট্ মানুষে একটু বেশী উচ্ছ্বসী হয়। কিন্তু কাল সকালে এ সব উচ্ছ্বাসের চিহ্ন থাকবে না।'

নীরেন গাঢ় স্বরে বললে, 'কেন আর্টিস্ট্ বলে আমাকে অবিশ্বাস করেন না কি?'

সুজাতা এই বারে একটু হেসে বল্লে; 'যা বলবেন এক রকম বলুন। কখনো 'তুমি' কখনো 'আপনি' এ বল্‌বার মানে কি?'

'আপনি' নানা ছল ছুতো ধরে এখন আমাকে বিঁধবেন আর অপ্রস্তুত করবেনই। কিন্তু সবাই যদি আপনার মত অত কঠোর আত্মসংযমী না হয় তার কি বলুন? কিন্তু আমাকে অক্ষম বলে ক্ষমা করুন। আজ নিজের উত্তেজনায় নানাপ্রকারে হয়ত আপনাকে উত্যক্ত করেছি।'

'ক্ষমা করলেই বা কী হবে, আপনার অসংযমী স্বভাব ত আর বদ্‌লাবে না। আর আপনার ছেলে মানুষের মত চপলতা।'

'বেশ যাখুসী বলুন। যখন হাতে পেয়েছেন তখন ছেড়ে কথা কইবেন কেন? বলুন আমাকে অসংযমী, বলুন আমাকে ছেলে মানুষ। আমি কথাটীও ব'লব না।'

সুজাতা পায়ের কাছথেকে গোলাপের তোড়াটা তুলে নিয়ে কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। উত্তর এলনা। গেটের কাছে মোটর এসে দাঁড়িয়েচে।

———

মহিলা-কবি কামিনী রায়

শ্রীলতিকা দেবী

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর মহাষ্টমীর দিন বাংলার সুপ্রসিদ্ধা মহিলা কবি কামিনী রায় মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

যাঁহার কাব্য প্রতিভার আবির্ভাবে বাংলা ধন্য হইয়াছিল, তাঁহার তিরোধানে বাংলা সত্যই ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছে। শ্রদ্ধেয়া রায়ের মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল বাংলার সাহিত্যসমাজ।

কেবলমাত্র কবি রূপেই তিনি আজ বাংলা দেশে সুপরিচিতা নন, সমাজ সেবায়, নারী কল্যাণের উন্নতিকল্পেও তাঁহার অবদান অনেকখানি। তাঁহার বিচিত্রময় জীবনের সহিত আমাদের পরিচয় থাকা প্রয়োজন।

১৮৬৪ সালের ১২ই অক্টোবর তারিখে বাখরগঞ্জ জেলায় বাসন্ডা গ্রামে কবি কামিনী রায় জন্মগ্রহণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ৺ চণ্ডীচরণ সেন তাঁহার পিতা। পিতার সাহিত্যানুরাগই কন্যার জীবনে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। তাঁহার মাতাও সুশিক্ষিতা ছিলেন। শৈশবে তিনি মাতার নিকটই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

শিশুকালেই তাঁহার পরবর্ত্তী কবি জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। শৈশব হইতেই তিনি কবিতা পাঠ করিতে ও আবৃত্তি করিতে খুব ভালবাসিতেন। আট বৎসর বয়সের সময় হইতেই তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার রচিত কবিতায় মুগ্ধ হইয়া পিতা তাঁহাকে উৎসাহ দিবার জন্য মহাভারত ও রামায়ণ উপহার দেন। তিনি পিতার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন এবং এই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১২ বৎসর বয়সে তিনি বোর্ডিং এ থাকিয়া শিক্ষা লাভ করেন। ১৫ বৎসর বয়সে তিনি মাইনর পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কন্যাকে বোর্ডিং এ রাখিবার সময় ৺ চণ্ডীচরণ তাহাকে জীবনের একটি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া চলিতে বলিয়া বলিয়াছিলেন—'সর্ব্বদা মনে রাখিও My life has a mission' পিতার এই উক্তিই তাঁহার জীবনের মন্ত্ররূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। কামিনী রায়ের অধ্যয়নে যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। ৺ চণ্ডীচরণের একটি ভাল লাইব্রেরী ছিল—কন্যা যখন ছুটীর সময় বাড়ী আসিতেন তখন তিনি লাইব্রেরীর পুস্তক অধ্যয়নেই দিন যাপন করিতেন।

১৬ বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ইহার দুই বৎসর পর স্বর্গীয়া রায় সংস্কৃত ভাষায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া এফ,

এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবং আরও দুই বৎসর পর তিনি সংস্কৃতে দ্বিতীয় ক্লাস অনার্স পাইয়া বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি কলিকাতা বেথুন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করেন।

তাঁহার কবি-জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় প্রথম জীবনে যে কবিতা রচনা তাঁহাতেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ১৫ বৎসর হইতে ২৪ বৎসরের মধ্যে যে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহাই পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার আপন কৃতিত্ব সম্বন্ধে একটা স্বাভাবিক সঙ্কোচ ছিল—কাজেই তিনি অনেকদিন পর্য্যন্ত স্বরচিত কবিতাগুলি প্রকাশ করিতে দেন নাই। কিন্তু পরে তাঁহার পিতার বন্ধু কবি হেমচন্দ্র তাঁহার কবিতা পুস্তকগুলির ভূমিকা লিখিয়া দেন। তাঁহার আলো ও ছায়া ১৮৮৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই কাব্য গ্রন্থই তাঁহার কবি জীবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাঁহার কবিতাগুলি একটা শান্ত, স্নিগ্ধ মাধুর্য্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি নানা ভাবের ও নানা বিষয়ের, প্রত্যেকটি কবিতা অতি সহজ ও স্পষ্ট ও নির্ম্মল। এই সহজ সারল্যই কবির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। সমাজ, স্বদেশ-সেবা, ভালবাসা পতিতের প্রতি সহৃদয়তা প্রভৃতি নানা ভাবের কবিতা ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

১৮৯৪ সালে শ্রীযুক্ত কেদার নাথ রায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। শ্রীযুক্ত কেদার নাথ কবির কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়াই তাঁহাকে বিবাহ করেন। আলো ও ছায়া প্রকাশিত হইলে তিনি ইংরাজীতে সমালোচনা লিখিতে দেন। বিবাহের পর শ্রীযুক্তা রায়ের জীবন ক্রমেই আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার সুখের জীবন যাত্রা বেশী দিন রহিল না। ১৯০০ সালে তাঁহার প্রথম সন্তানের মৃত্যু হয়। ১৯০৮ সালে কেদার নাথ রায় গাড়ী হইতে পড়িয়া মৃত্যু মুখে পতিত হন। ইহার পর তাঁহার কন্যা লীলা ও পুত্র অশোকের মৃত্যু হয়। 'অশোক সঙ্গীতে' এই পুত্র শোকাতুরা জননীর মর্ম্মব্যথাই কাব্যাকারে রূপ পাইয়াছে। 'অশোক সঙ্গীতে'র করিতাগুলি তাই এত করুণ হইয়াছে।

বঙ্গ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্তা কামিনী রায় ও আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। রবীন্দ্র প্রতিভার বিকাশে তাহার সমসাময়িক অনেক কবিই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন—কিন্তু শ্রীযুক্তা রায় আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া সাহিত্যে স্থায়ী আসন অধিকার করিয়াছিলেন।

তাঁহার দেশ প্রেম, সমাজের পতিতদের প্রতি আন্তরিক দরদ সমস্তই তাঁহার কবিতায় রূপ পাইয়াছে। বিশেষ করিয়া নারী জাতির জন্য তাঁহার একটা আন্তরিক দরদ বাস্তবিকই ছিল। 'নারী-নিগ্রহ' 'নারীর দাবী' এবং 'নারীর জাগরণ' প্রভৃতি কবিতায় তাঁহার আন্তরিক দরদই ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ১৯২৩ সালে মেয়েদের ভোটাধিকারের জন্য লর্ড লিটনের নিকট যে ডেপুটেশন প্রেরণ করা হইয়াছিল—নারীর দুঃখ দৈন্যমোচন

সঙ্কল্পে এই ডেপুটেশনের অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন কামিনী রায়। ১৯৩০ সালে লেবার কমিশন ভারতে আসিলে বাংলা সরকার শ্রীযুক্তা রায়কে শ্রামিক স্ত্রীলোকদের অভাব অভিযোগ কমিশনারের নিকট অবগত করিবার জন্য এসেসর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাংলা নারীর দুঃখ তাঁহার অন্তরের অন্তস্থল স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়াই তিনি এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।

বাংলাদেশে তাঁহার প্রভাব এত বিস্তারিত হইয়াছিল বলিয়াই আজ তাঁহার অভাব বাংলার প্রতিটি জীবনে একান্তভাবে অনুভব করিবে। তিনি আজ আর ইহজগতে নাই—কিন্তু তাঁহার কার্য্যাবলীই তাঁহাকে আমাদের নিকট সঞ্জীবিত রাখিবে।

টাটানগর

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

বেড়ানো ঠিকনয়,—ভ্রমণ কাহিনী তো নয়ই, কিন্তু এত ভাল লাগ্‌ল যে টাটানগরের কথা একটু বলতে ইচ্ছে হয়েছে 'জয়শ্রীর' পাঠিকাদের।

জামশেদজী নসরবানজী টাটার নাম শুধু টাটানগরের জন্যই যে বিখ্যাত তা'নয়, ওঁদের পরিবার অনেক দিন থেকে বোম্বাই প্রদেশে ব্যবসা বাণিজ্যে আর তাছাড়া বিদ্যা ও দানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। স্থানটিতে লোহার কারখানা প্রতিষ্ঠা করবার ঢের আগেই ওঁদের ধনবত্তার ও দানের খ্যাতি যথেষ্ট ছিল।

কারখানাটীতে গিয়ে সর্ব্বপ্রথমেই গর্ব্ব আর আনন্দ হয় যে এটা একটী দেশীয় প্রতিষ্ঠান, আর এমনতর প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে দেশীয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা একটীও নেই। মিলের সংখ্যা দেশে যা'ওবা আছে তাতে কটী কাপড়ের আর অত্যল্প সুতোর ছাড়া প্রায় সবই দেশী মূলধনে বিদেশী বণিকের দ্বারা পরিচালিত কারখানা; মজুর অবশ্য আমরাই। এবং টাকাও হয়ত শেয়ারে আমাদেরই খাটে, কিন্তু কর্ত্তৃত্ব নয়। আর অনেকটা কাজই হয়ত দেশী লোকেরা করে, কিন্তু পরিচালনা করে না।

দেশে বন অরণ্য কম নেই, খনিজ দ্রব্য কম নেই, কৃষিজাত দ্রব্যও কম নেই। কিন্তু যেখানেই বড় ব্যাপার সেখানেই বণিক বিদেশী নয়ত বিলিতী, কদাচ আমাদের ভারতবর্ষীয় পরিশ্রম দিয়ে সেই কারখানা দাঁড় করেছে আমাদেরই দেশের লোক কিন্তু ভার নেবার দায়িত্ব নেবার লাভ ক্ষতিকে Speculation এ ফেলবার ভরসা আমাদের ভীরু কল্পনাহীন মাথায় নেই কেন যে তা জানিনা হয়ত মানুষ করার দোষ, নয়ত মাথার দোষ।

বছর কয়েক আগে মনে হচ্ছে একবার বেরিলীর খয়েরের কারখানাটী দেখবার সুযোগ পাই সেদিনও দেখেছিলাম, কেমিস্ট তার বাঙ্গালী সব চাকুরে তার বাঙ্গালী। আমাদের বাঙ্গালী কেমিস্ট, দেখালেন। কর্ত্তারা সব সাহেব। আইজাট নগরে (Ijat nagar আইজাট সাহেবের নামে সহর) তার প্রতিষ্ঠা। সাহেবী স্বাচ্ছন্দ্য লিপ্সায় জলকল, বিদ্যুত-বাতাসের, খেলার ক্লাবের হাসপাতালের সব ব্যবস্থা সেখানেও আছে। ইণ্ডিয়ান উড্ এডকট্ কোম্পানী তার নাম। তারও মজুর কুলী আমরাই। খয়ের আমাদের নানা কাজে লাগে, দেশেরই জিনিষ, রাসায়নিক ও দেশী; মজুরও দেশী; এমন কাজের কিছু বোঝেন এখন ও দেশী লোক আছেন, লিমিটেড্ কম্পানীর শেয়ার ও দেশের লোকের আছে তার কিন্তু আমাদের কিছুই নয়! অথচ আমাদের দেশে যেমন দীনের দরিদ্রের অভাব নেই, তেমনি লক্ষপতি ধনীও আছেন, কোটী পতি না হোক। তাঁদের টাকা খাটে বিদেশী কোম্পানীর শেয়ারে, গভর্ণমেণ্ট পেপারে; তাঁদের ছেলেরা খাটে যদি-তো চাকুরীতে খাটে, না খাটে, তো বসে বসে দিনে দিনে শুধু স্থূলতা অর্জ্জন করে বুদ্ধিতেও শরীরেও। তাঁদের ঐ সঞ্চিত উপচীয়মান।

ধনের দ্বারা তাঁদের কোনো বিশেষ খেয়াল নেই, কৌতুহল নেই, কাজ তো নেই ই। যে ক্ষেত্রে সাহেবরা খেলা, ধূলো পাখী, জীবজন্তু, বই, বাগান, গুটী, মৌমাছি যাহোক কিছু একটা চর্চ্চা নিয়ে থাকেন; এমন কি Uplifting ও করেন অনুন্নতদের, যে হিসাবেই হোক, ধর্ম্ম প্রচার জন্যই হোক, আর মনের কাজের টানেই হোক; আমাদের সেখানে কোনো সখ বা খেয়াল নেই, আমরা জানি ধনের বোঝা সঞ্চয়, আর নয়ত অপব্যয়; ব্যয় জানি না।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমরা দোষ দিই কিন্তু তাদের নিজের অনেক গুণই চোখে পড়ে; সে শিক্ষায় যে আমাদের কাজে লাগল না তার কারণ অনেক, সবটাই রাজার দোষ নয়। আমরা জাতে অচল, মনে অনড়, কাজেই শরীরে অক্ষম। প্রথম ভাগের 'অচল' 'অধম' সবই আমাদের আছে। এবং জেমসেদপুরে টাটায় লোহার কারখানা দেখে আমার মনে হ'ল অনেকটা তাই। লোহার কারখানা করবার কল্পনা, তাতে তাঁর সরকারী সহায়তা, লাভক্ষতি, নিরূপণ টাটার মনে উঠেছিল; কিন্তু সেই ছোট ভীরু কথাটা তার মনে কি জাগেনি যে যদি অসফল হয়? কিম্বা এমন 'অচলতা' জাগেনি যাতে মনে হয়, 'কাজ নেই এই স্পেকুলেশনে' তারচেয়ে 'বসে সুদ খাই' স্ফুর্ত্তি করি; কিম্বা শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায় 'নিষ্ক্রিয়তার স্বর্গলোকে' থাকি? এসব কথা অবশ্য অন্তর্য্যামীছাড়া আর কারো জানা নেই।

আমার সব প্রথমে কারখানা দেখে শুধু মনে হয়েছিল, সঞ্চিত অর্থ থাক্‌লে একজন কোটীপতিও আমাদের দেশে এমন ভাবে ব্যয় করেছেন, যা ব্যবসা হিসেবে বড় আর দেশের খনিজ দ্রব্য হিসেবে সেটা কাজে লাগানো হয়েছে, এর জন্য আমাদের দেশের অনেক অর্থ দেশের লোকের মাঝেই বণ্টিত হচ্ছে।

কারখানা কবে প্রতিষ্ঠা করবার কল্পনা হয়েছিল, কবে তাতে কাজ আরম্ভ হয়, প্রথম

থেকে পত্তনেই কেমন আয় ব্যয় আমি কিছুই বল্‌তে পার্‌ব না। কেননা আমি সে হিসেবে যাইনি। তথ্য সংগ্রাহকের বিদ্যা বুদ্ধি আমার নেই। আমি শুধু দেখ্‌তে গিয়েছিলাম অজানা দর্শকের মতন। সেই আমার দেখার কথা এবার একটু বলি।

লোহার প্রাথমিক অবস্থায় সেটা দেখতে থাকে কয়লার বা কালোমাটীর ডেলার মতন, ধুলো মাটী পাথরের মাঝ থেকে তাকে বেছে নেওয়ার বিভাগটীতে ব্লাস্‌ট্‌ ফার্ণেসে (Blast Furnace) তাকে গলানো হয়, ঐ ফার্ণেস ৬টা আছে। নীচে থেকে মালগাড়ীর ওয়াগন্‌ থেকে ছোট ছোট লোহার খাঁচায় করে ক্রমাগত একটা হেলানো ভায়াবাঁধা পথে সেগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে উঁচুতলায় ফার্ণেসের মুখে ঢালবার জন্য যতক্ষণ দরকার অংশ্য। তারপর সেগুলো—সেই গলানো জিনিষটা মস্ত মস্ত টবে ঢেলে অন্যত্র পাঠানো হচ্ছে এই লোহা তিন ভাগ হয় খানিকটা ষ্টীল বা ইস্‌পাত বিভাগ, সেটা লোহার প্রাথমিক সাধারণ গলিত অংশ থেকেও রাসায়নিক প্রয়োগে আরও অসার অংশ বাদ দিয়ে সেটাকে ইস্‌পাতের মত করে নেবার কি অন্য কাজের বিভাগে পাঠানো হয়। অর্থাৎ কিছুটা খাদ মিশ্রিত কাজে লাগে। কতক বেশী শক্ত করে তৈরী হয়। আমাদের সামনেই রেল লাইন, কড়ি, রেলিং, রড, থাম ইত্যাদি কয়েকটা হ'ল।

কতকগুলো জিনিষের কাজ ব্লাস্‌ট্‌ ফার্ণেসে গলানোর পরই হয়। সেগুলো ওপরে গলে নীচে এসে ভাগে ভাগে টবে টবে মাপে মাপে রাখা হ'তে থাকে। তার পরে সেই মাপা লাল রাঙ্গা টকটকে লোহার (তখন জমে থাকে) স্তূপগুলি একটী একটী করে বিদ্যুৎ রোলারের মাঝে দেওয়া হতে থাকে। রোলার চল্‌তে থাকে আর সেই লোহার ডাণ্ডটা ক্রমাগত এধার ওধার গিয়ে পিষ্ট হয়ে থাকে, যতক্ষণ না সেটা যে অনুপাত লম্বা ও যে আকারের গড়ন হওয়া দরকার তার হয়, ততক্ষণ সেটা সেই বিভাগীয় লোকের দ্বারা তদারক হ'তে থাকে। মিনিট কতকের মধ্যেই হয় রেলওয়ে তারের বেড়ায় রেলিং, নয়ত কড়ি, কিম্বা ডাণ্ডা বা অন্য কিছু আকারে পরিণত হয়, তখন আগেই এক জায়গায় আপনিই জমা হতে থাকে। খানিক পরেই বোধ হয় ঠাণ্ডা হলেই কুলীরা সেগুলো রেলগাড়ীতে যেখানে পাঠানো দরকার সেখানে পাঠায়। যে লোহা ইস্পাত বিভাগের কাজে লাগে, সেটা প্রথম বার গলানোর পর আবার রাসায়নিক কিসব জিনিষ দিয়ে গলানো হয়, তরপর সেটা যে ছাঁচের মত দরকার সেই ছাঁচের মাঝে ফেলা হয় ঐ রকমেই লোহার চাদর ও কয়েক মিনিটের মধ্যেই হ'তে দেখ্‌লাম। ঐ গলানো লোহা টবে ঢালা, ক্রেনে করে তু'লে আবার বৈজ্ঞানিক উনুন মহলের মাঝে (সারি সারি বাড়ীর মত উনুন মহল) ঢেলে দেওয়া আবার বড় বড় টবে ঢেলে সেইটা ওপর থেকে ঝোলানো চেনে করে ধরে ক্রেন মারফৎ ছাঁচ বিভাগে পাঠানো হয়। তা' যেমন দেখ্‌তে আশ্চর্য্য লাগে, তেমনি বিপদজনক কাজ। শুন্‌লাম বিপদ মাঝে মাঝে ঘটেও। গলানো লোহা ঢালা ও দেখ্‌বার জিনিষ। তাতে ঢালার সময় দেয়ালীর ফুলঝুরির বিরাট দৈত্য সংস্করণ লৌহকণিকার আগুন ফুলের খেলা দেখা যায় তা কাছাকাছিতে

বেশ তাপ আর ভয়ের, গায়ে কোস্কা পড়ে ফুল্‌কি লাগ্‌লে। অবশ্য আমরা অনেক দূরেই ছিলাম। সমস্ত কারখানাটা ওপরে ক্রেণ চল্‌ছে এমুড়ো থেকে ও মুড়ো অবধি, যতটা সীমানা ; নীচে ট্রেণ নয়ত খালি এঞ্জিন চলেছে ; পাশে হয়ত সেই ক্রেনে ঝোলানো চেনে ধরা গলিত লৌহের বিশাল অগ্নিকুণ্ডটী দুল্‌তে দুল্‌তে আস্‌ছে ; তারজন্য মাথার ওপর ক্রেন চালক বাঁশী (হুইসল্‌) বাজাচ্ছে নীচেও মালবাহী রেলোয়ের বাঁশী বাজছে ; পায়ের তলায় মাটীতে বিদ্যুতের তার এখানে ওখানে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে ; তার জন্য সাবধানতা বাণীবর্ষণ, সব শুদ্ধ নারী আর শূদ্রের অনধিগম্য বল্লেই হয়। (এ ক্ষেত্রে শূদ্রমানে অনভিজ্ঞ ধরে নেওয়া গেল। কেননা ওখানকার কারখানার প্রাণ তো কুলীরাই—শূদ্রেরাই ; তার মন ওখানকার কর্ম্মীরা, দেহ হচ্ছে বণিকের অর্থের)।

সুতরাং যারা দেখালেন তাঁরা ও ঐ নারী হিসেবেই দেখালেন। অবিশ্যি বুঝি আর না বুঝি দেখ্‌তে যে ভাল লাগছিল তাতে সন্দেহ নেই।

এঞ্জিন ফার্ণেস ইত্যাদি লোহা তোলা ফেলা কাটার শব্দের জন্য ওখানকার কথা প্রায় ইঙ্গিতে চলে। কারখানার সীমানাটাও কম নয়। চার্‌টে গেট, পাশ না হলে প্রবেশ নিষেধ। বারো বছরের কম বয়সের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ। প্রয়োজনীয়ের, ফার্ষ্ট এড্‌ বিভাগ কারখানার মধ্যেই। খনি বিভাগের বিশ্লেষকাগার তার বাইরে, হাঁসপাতাল বাইরে। টেকনিক্যাল স্কুলও আছে বাইরেই মনেহচ্চে। শ্রমিক নিবাসও বাইরে। এ ছাড়া আছে যা' তা' ভাবনার ও দেখবার জিনিষ। সহরটী বিদেশী ধরণের তৈরী বলে, তাদেরই মত সুখস্বাচ্ছন্দের, পরিচ্ছন্নতার জন্য যে আবেষ্টন দরকার টাটা নগরে এ সবগুলি আছে। দেশী বিদেশীর ক্লাব আছে, খেলবার মাঠ আছে, সেখানে খেলার দলও যায় বিদেশ থেকে আমন্ত্রিত হয়ে। ছেলেদের মেয়েদের স্কুল, মহিলাদের সমিতি, তার মাঝে মেলা মেশার নিয়ম সব আছে। পর্দ্দানেই, অথচ সভ্য, দূরত্ব আছে।

ছোট্ট পরিচ্ছন্ন শ্রী সহরখানির। পার্ব্বত্য দেশের রাস্তায় অসম উচ্চতা আর নিম্নতা রাজপুতানার কিষনগড়ের রাজ পথকে মনে পড়িয়ে দেয়। ভালোলেগেই চোখে ঠেক্‌ল, এখানকার অধিবাসীদের নিতান্ত সাধারণদেরও ঐ আবেষ্টনের জন্য যে পরিচ্ছন্নতা সুশ্রীতা দৃশ্য অনুরাগ আছে তা নিতান্ত বিলিতী, যা আমাদের অন্যত্র জীবন যাত্রায় থাকার মাঝে রুচির দৈন্য ফুটিয়ে তোলে। আমাদের জাতীয় জীবনে তো একটা অভাব নয় শুধু বাইরের প্রভাব, শিক্ষা, ভেতরের রুচি, পারি-পার্শ্বিক আবেষ্টন সবশুদ্ধ একটা জগা খিচুরী।

একটাকে টান্‌লে মা মাসী পিসির ছেঁড়া চুলে টান পড়ে। তাঁরা কাঁদেন, অন্যটাতে দ্বিজ যজমান গুরুজনের উত্তরীয়ে টান পড়ে, তাঁরা রাগ করেন ; কোনোটীতে বা ছেলেমেয়ের বিবাহ বংশ গোত্র ইত্যাদিতে টান পড়ে। তাই সব শুদ্ধ আমরা বিরাট অপরিচ্ছন্ন অবিচ্ছিন্ন অটল অধম হয়ে কোনো রকমে পৌরাণিক হয়ে টিকে আছি। অবশ্য বিলিতী আবেষ্টনের দোষ আছে তা' হচ্ছে অন্তরঙ্গতার অভাব। কিন্তু তা হলেও সেতো ব্যক্তির হাতে, তাই সে কথা থাক্‌।

'অর্থমনর্থম্' একটা কথা আছে; ওখানে গিয়ে মনে হল 'অনর্থম্' আছে আমাদের দেশে বড়লোকের লোহার সিন্ধুকে, ব্যাঙ্কের খাতায়, ধনীদের অলস মনে শরীরে। অর্থ টাটার মত লোকের হাতে সার্থক হয়েছে প্রথমে ভ্রমণে, জ্ঞানে এবং পরে ব্যয়ে ও দানে। অর্থের একটা উদার ব্যাপকরূপ বা ঐশ্বর্য্য আছে তা যদি কাজে লাগে ঠিকভাবে। সেটা চোখে পড়ে দেশের প্রীতে, মানুষের প্রাতে, জীবন যাত্রার আনন্দে। প্রয়োজন যে জিনিষ তাকে তো অর্থের দ্বারাই মেলে প্রয়োজনকে অবজ্ঞাও করা যায় না, উপেক্ষাও করা যায় না। অবশ্য প্রয়োজন কমিয়ে সরল জীবন যাত্রার কথা উঠিতে পারে। কিন্তু 'সরল জীবন' যাপন করা যায় না। সরল জীবন যাত্রা যদি মনের ঐশ্বর্য্য দিয়ে পূর্ণ হয়ে ওঠে তবে তা' সার্থক। মনের সে শিক্ষার ঐশ্বর্য্য কই? আমাদের ত্যাগ অভাবগ্রস্তের ত্যাগ, ত্যাগের মহিমা তাতে নেই।

ওখানে গিয়ে একটা সার্থক অর্থব্যয় দেখলাম। পার্শী ধনীদের দান, ব্যয়, ঐশ্বর্য্যের লীলার কথা বম্বে সহরে ফুটে আছে। ওঁরা সংখ্যায় খুবই কম, কিন্তু ওদের সঞ্চিত অর্থ দানে ভারতবর্ষে কম নেই। দাদা ভাই নৌরজীর, সার ফিরোজ সার মেটার মত রাজনীতিতে জ্ঞানীও ওঁদেরই জাতের। ওদের সামাজিক আচার ব্যবহার, শিক্ষা ধরণ, আমাদের দেশের হিন্দু মুসলমান থেকে অনেকটা পৃথক। জাতে পারসীক ওজরছত্র ধর্ম্মবাদী। আকার ধরণে দেশীয়তা ও বিদেশীয়তা মিশ্র পুরোনো সংস্কারও অনেক আছে; কিন্তু অল্প সংখ্যায় আর নিতান্ত আত্মীয় গোষ্ঠী আর ধনশালীতার জন্য ওদের মধ্যে দীন নেই, অভাবহীনও নেই, বিদেশীয়ানা স্বভাবের জন্য ব্যবসায়ী ব'লে অশিক্ষিত খুব কম, ব্যবসায়ী জাতি ব'লে বেকার সমস্যা নেই; সেই জন্যই ছেলে মেয়েদের শিক্ষা সমস্যাও কম। সমাজ উদার বলে সামাজিক অনেক গ্লানি ওদের নেই। আশ্চর্য্য ওদের জাতে সমাজ চ্যুতা পতিতা নেই একটিও। সেখানে শুনা গিয়ে ছিল।

এসব কথা অবান্তর। আসল কথা হচ্ছে এই শিক্ষা আর জ্ঞান অর্থ। যদি কাজে লাগে, তাহলে অর্থ ও 'অনর্থম্' বা অনর্থক হয় না; জ্ঞানও বন্ধ্যা হয় না, দেশ ও দীন থাকেনা। কয়লা, অভ্র, শ্লেট, পাথুরে চুন, কাগজ কত কি কত তুচ্ছ জিনিষ দিয়ে বিদেশী তার অন্ন আর ঐশ্বর্য্য তুলে নিয়ে যায়। আমরা তাদের কাছে চাকরীর আশায় বসে থাকি।

টাটার কারখানার বিভাগে বিভাগে যে সব প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা আছেন, তাতে পার্শী আছেন, বাঙ্গালী আছেন, আমেরিকান আছেন, মাঝারি কাজেও দেশের অনেক লোক অন্ন পায়! টাটার ঋণ সাহায্যে বছরে দুটী করে ভালছাত্র (যে কোনো ভারতীয়, সাম্প্রদায়িকতা নেই) বিদেশে ইয়ুরোপে বিদ্যার্জ্জন করতে যেতে পারে।

চির-যাত্রীর সম্বল

শ্রীলীলা নন্দী

(গান)

তবে যাই, তবে যাই
হরষ মনে।
এসেছে বিদায় খণ
বারিভরা দু'নয়ন
ভেব না দুখের জল
নয়ন কোণে॥
না ভাঙিতে প্রেমমেলা
আসে যে বিদায়-বেলা
বড় সুখ, বড় সুখ
সেই গমনে॥

বদন ফিরালে কবে
নাহি তা মনে।
বেদনা কখন দিলে
নাই স্মরণে॥
আজি শুধু জানি এই
তোমা ছাড়া কিছু নেই
তব প্রেম ভরা মোর
সারা জীবনে॥

কথা—শ্রীলীলা নন্দী   সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসন্তোষকুমার দাস, বি, এল

ভৈরবী মিশ্র

তাল—কাহারবা

•		+		০		+		•		
সা	ঋ |	মা	মা |	গা	মা |	গা	মা |	পা	া |	
ত	বে	যা	ই	ত	বে	যা—০		ই	•	

+ • + •
পা দা | মা পা | পা র্সা | [া া] |
হ র ষ ম নে—• ॥ ০ ০

+ • + •
সা মা | মা মাজ্ঞা | জ্ঞাপা পাদা | মা মা |
এ সে ছে বি দা য় ক্ষ ন

+ ০ + ০
রে জ্ঞা | মাজ্ঞা মা | জ্ঞা ঋা | সা সা |
বা রি ভ রা দু ন য় ন

+ ০ + ০
সা সাপা | পা পা | পা দা | পা পা |
ভে ব না দু খে র জ ল

+ • + •
পা ণা | দা পা | ক্ষ পা | া া |
ন য় ন কো নে—• ০ •

+ ০ + •
পার্সা র্সা | জ্ঞাঋা র্সা | ণা ধাণা | দা পা |
না ভা ঙ্গি তে প্রে ম মে লা

+ ০ + •
জ্ঞারে জ্ঞা | সা জ্ঞা মা পা মা | জ্ঞারে জ্ঞা | ঋা সা |
আ সে যে — — — বি দা— য় বে লা

+ ০ + ০ +
সা সাপা | পা পা | পা ণাদা | পা পা | মা পা |
ব ড় সু খ ব ড় সু খ সে ই
*(কো ন দু খ না ই ম ম)

০ +
দা প | মা পা |
গ ম নে———॥ তবে যাই তবে যাই ইত্যাদি।

* "বড় সুখ বড় সুখ সেই গমনের"র পরিবর্ত্তে আমি suggest করি "কোন দুখ নাই মম সেই গমনে"। যার যেমন ইচ্ছা তিনি তেমন গাইবেন। গানটা একটু টেনে গাইলে শুনতে ভাল শোনাবে।

+ ০ + ০
সা মা । মা মাজ্ঞা । জ্ঞাপা পাদা । পা মা ।
ব দ ন ফি রা লে ক বে

+ ০ + ০ +
রেজ্ঞামা জ্ঞা । মাজ্ঞা ঋা । সা া । া া । সা সাপা ।
না— ই তা ম নে ০ ০ ০ বে দ—

০ + ০ + ০ +
পা পা । পা দা । পা পা । পা ণা । দা পা । জ্ঞা পা ।
না ক খ ন দি লে না ই স্ম র ণে— ০

০ + ০ + ০
া া । পা পার্সা । জ্ঞাঋা র্সা । ণাধা ণাদা । পা পা ।
০ ০ আ জি শু ধু জা নি এ ই

+ ০ + ০
জ্ঞারে জ্ঞা । সাজ্ঞা মাপা মা । জ্ঞারে জ্ঞাঋা । সা সা ।
তো—মা ছা — — ড়া কি ছু না ই

+ ০ + ০ +
ণ্‌া সা । মাজ্ঞা মা । পা ণাদা । পা পা । পা দা ।
ত ব প্রে ম ভ রা মো র সা রা

০ + ০ +
মা পা । পা র্সা । া া া া ।
জী ব নে—০ ০ ০ ০ ০

রামমোহন শতবার্ষিকী

শ্রীঅনিন্দিতা দেবী

উদ্বোধন

যাঁহার তিরোভাবের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আজ আমরা সম্মিলিত, তিনি পৃথিবীর যুগপ্রবর্ত্তক মহাজনগণের অন্যতম। সুতরাং তিনি সকল দেশের, সকল জাতির, সকল ধর্ম্মের লোকেরই বরণীয় পূজ্য ও বরেণ্য। বিশেষতঃ তাঁহার প্রতিভা এতই বহুমুখী ছিল যে, দেশের ও মানবজাতির জ্ঞান কর্ম্মের যে বিভাগেই যাহার অনুরাগ, তিনিই তাঁহাকে পথপ্রদর্শক, সত্য প্রকাশক, পুরোধারূপে পাইয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিবেন।

কিন্তু এ বিষয়ে নারীজাতির তাঁহার নিকট ঋণ ও কৃতজ্ঞতার তুলনা নাই। যেহেতু তিনি তাঁহাদের সত্যই জীবন রক্ষা করিয়াছেন, বাঁচিবার অধিকার দিয়াছেন। কারণ যতই অপ্রিয় বা দুঃখজনক হউক একথা অস্বীকৃত হইবার নয় যে, এদেশে নারীজাতি জীবন ধারণের অধিকার হইতেও বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এমন কি তাঁহাদের হত্যা বা আত্মহত্যা একটী সবিশেষ পুণ্য ও সৎকর্ম্মরূপে গণ্য হইয়া দৃঢ়বদ্ধ সামাজিক আচারে পরিণত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য সতীদাহ বা পত্নীদাহের কথাই হইতেছে। এমন একটী অকথ্য নৃশংস ব্যাপার যাহার স্মরণ মাত্রেই জুগুপ্সার উদয় হয়, যে কোন সাধারণ মানুষেরই তাহাতে বেদনা বোধ হইবার কথা এখন মনে হইতে পারে; কিন্তু যখন সমগ্র দেশে এসম্বন্ধে বোধ, চৈতন্য এককালেই লুপ্ত ও সুপ্ত ছিল, শোকার্ত্ত, বিভ্রান্ত নারীকে আত্মহত্যায় প্রলুব্ধ, উত্তেজিত এবং কম বেশী বাধ্য করিয়া প্রকৃতপক্ষে তাহাকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া হত্যার বীভৎস অনুষ্ঠানের সমস্ত প্রক্রিয়াই লোকে ধর্ম্মবোধে করিয়া যাইত এবং আশৈশব এই দৃশ্য দেখিতে এবং কার্য্যতঃ আচরণে অভ্যস্ত হইত।

পুণ্যশ্লোক রামমোহন তখন নিজে এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই জাত, বর্দ্ধিত হইয়াও সম্পূর্ণ মুক্ত দৃষ্টিতে এই শোকাবহ ভাষণ প্রথার প্রকৃত রূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন। শুভ দেখিতেই যে পাইয়াছিলেন তাই নয়, তাহাতে হৃদয়ে যে গভীর বেদনাও অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচনার ছত্রে ছত্রেই প্রতিফলিত; বেদনা কেবল বোধ করিয়াই ক্ষান্ত ও তিনি হন নাই, উহা দূর করিবার জন্যও প্রাণপণেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার অপরাজেয় শক্তি ও অদম্য অধ্যবসায় বলে সমস্ত বাধা, বিঘ্ন অতিক্রম এবং দুঃসহ নিন্দা, ক্লেশ সহ্য করিয়াও পরিশেষে দেশের ও মানবজাতির এই মহাকলঙ্ক ও অপরাধ নিবারণেও সমর্থ হইয়াছিলেন।

দেশের শাসন কর্ত্তারা তাঁহার অনুকূল না হইলে এবং সহায়তা না পাইলে তাঁহার প্রয়াস সফল হইত না কথা হইতে পারে। কিন্তু তাহার সহায়তা না পাইলেও তাঁহারা ইহা বন্ধ করিতে

সাহস করিতেন না, সক্ষমও হইতেন না। কারণ সংস্কারে, অভ্যাসে অন্ধ না হইলে এরূপ পৈশাচিক ব্যাপারে মানুষ মাত্রেরই আঘাত পাওয়া স্বাভাবিক এজন্য গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টিও পূর্ব্বেই এদিকে পড়িয়া থাকিলেও নানা কারণেই তাঁহারা এবিষয়ে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। সে সময়ের অল্পদিন পূর্ব্বেই এদেশ ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের হাতে আসিয়াছিল। দেশ জয়ের অনুসঙ্গী প্রথম রক্তারক্তি যুদ্ধ, বল প্রয়োগের পর এই সময় কর্ত্তৃপক্ষ দেশবাসীর মনের সদ্ভাব, বিশ্বাস অধিকারেই সমুৎসুক ছিলেন। ধর্ম্মান্ধতায় আচ্ছন্ন দেশে সবে মাত্র তাঁহারা তখন প্রচলিত ধর্ম্ম, লোকাচারে হস্তক্ষেপ করিবেন না অঙ্গীকার করিয়া দেশের লোককে আশ্বাস দিয়াছিলেন। কাজেই উঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অসহিষ্ণু স্থান স্পর্শ করিতে বা পাছে সেই অঙ্গীকারের অন্যথা হইয়া দেশবাসীর অবিশ্বাস ভাজন হইতে হয়, এজন্য তাঁহাদের নিতান্তই কুণ্ঠা ছিল। তাপর তাঁহারা বিদেশী, দেশী ভাষাও জানিতেন না, দেশের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, লোক মনোভাব ইত্যাদির প্রকৃত অবস্থা বা উহার অর্থও তাঁহাদের অবিদিত ছিল। এদেশের জন্য কিছু করিতে হইলে তাই দেশী লোকের উপরই তাঁহাদের নির্ভর করিতে হইত। সুতরাং অনেক সময়ই যুক্তিতে তাঁহাদের মতে মিলিতে না পারিলেও শাস্ত্র, লোক ব্যবহারাদি সম্বন্ধে দেশীয়েরা যাহা বলিতেন ও বুঝাইতেন তাহাতেই তাঁহাদের নিরস্ত হইতে হইত।

কিন্তু রামমোহন দেশেরই অধিবাসী বলিয়া দেশের আচার ব্যবহার লোক মনোভাব এবং প্রত্যেক বিষয়ের যথার্থ অবস্থা যেমন স্বভাবতঃই অবগত ছিলেন, পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞতাও তাঁহার তেমনি অসামান্যই ছিল। সুতরাং তিনি যেভাবে বিপক্ষদের সাজান বড় বড় কথায় চাপা দেওয়ার ভিতর হইতে সত্যকে প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের মুখ হইতেই আসল কথা বাহির করিয়াছেন এবং উহাদের সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র শাস্ত্রের নজীরও শাস্ত্র যুক্তির দ্বারাই খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা অবশ্য বিদেশী গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অসম্ভব ও অসাধ্য ছিল। বিশেষতঃ এই অপচার এমন ভাবে দেশের ধর্ম্মসংস্কার, ধর্ম্মবিশ্বাসের অঙ্গীভুত হইয়া উঠিয়াছিল যে যুক্তি তর্ক, সদ্ভাবাদি দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাপারটী সত্যই যে জিনিষ তাহা লোককে দেখাইবার চেস্টা না পাইয়া বাহির হইতে শুধু গভর্ণমেণ্টের আইন বলে বন্ধ হইলে লোকে কেবল উত্তেজিতই হইত' কিন্তু এই কদাচারের জঘন্যতা, দুষনীয়তা কিছুই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইত না। কিন্তু রামমোহনের সুনিপুণ বাদবিতর্ক, বিশ্লেষণে ইহার স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া অনেক সুধী, সজ্জনকে তাঁহার সমভাবী করিয়া তুলিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে আর একটীও দেখিবার বিষয়। মনে হইতে পারে তিনি ধনী লোক, তাঁহার পক্ষে শুধু ধনী লোকই ছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কেহ তাঁহার অনুমোদন করেন নাই কিন্তু বস্তুতঃ ইহার বিপরীতই বরং ঘটিয়াছিল। দেশের প্রধান ধনী সম্প্রদায়ই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপক্ষতা করিয়াছিলেন; অথচ অনেক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার পক্ষে ছিলেন।

তারপর, ঐ সকল বাদ বিতর্কে যে সাহিত্যেরও সৃষ্টি হইল, তাহা চিরদিনের মত তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও সহৃদয়তার সাক্ষ্যও যেমন হইয়া রহিয়াছে, তেমনি আমাদের

জাতীয় সাহিত্যেরও অক্ষয় সম্পদ হইয়া আছে। বাঙ্গালী গদ্যেরও তিনি স্রষ্টা, কিন্তু এই নূতন যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা দ্বারা তিনি যে সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। প্রথম বাঙ্গলা গদ্য হইলেও তাঁহার রচনাবলীতে সুপরিস্ফুট, তেমনি তাহা যে সহজ, সরল, প্রসাদগুণেও পূর্ণ অন্য অনেক পরবর্ত্তী লেখকের লেখাতেও তাহা মিলে না। সুতরাং লিপিশক্তিও যে তাঁহার কিরূপ ছিল, তাঁহার গ্রন্থাবলীই তাহার প্রমাণ।

কিন্তু তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার অন্য কোন বিষয়ে বলা এখানে উদ্দেশ্য নয়। অন্য সুধীজনেরাই তাহা করিতেছেন। মানুষের প্রাণরক্ষার জন্য, নারী-হত্যা বিশেষতঃ ধর্ম্মের নামে মনুষ্যবলির ঘৃণ্যতর মহাপাপ হইতে দেশকে, সমাজকে উদ্ধারের জন্য মহামতি মহাপ্রাণ রামমোহনের উদ্দেশ্যে অসংখ্য প্রণিপাত জানাইয়া শুধু এই মাত্র নিবেদন করি যে, রামমোহন যে আমাদের নারীজাতিকে বাঁচিবার অধিকার দিয়া গেলেন, বাঁচিয়া জীবনের প্রাপ্য তাঁহারা লাভ করিবার কতটুকু আয়োজন এই শত বৎসরের মধ্যে হইয়াছে? অনুজন্মা মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর তাঁহার আরব্ধ কর্ম্মের পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য সম্পাদনের যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাই বা কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছে? মৃত্যুতে মানব সম্বন্ধের সবই এককালে শেষ হইয়া যায়। তাহার পর তাহার সম্বন্ধে আর কিছুই করিবার থাকে না। কিন্তু বাঁচিলেই মানুষের শারীর, মানস সর্ব্ববিধ দাবীই আসিয়া পড়ে। কাজেই কাহারও জীবন রক্ষা করিলেই কর্ত্তব্যের সমাধা হয় না; নব নব কর্ত্তব্যের আরম্ভই হইয়া যায়। কোন দৃঢ়বদ্ধ ধর্ম্ম সামাজিক প্রথাই আকস্মিক পদার্থ নয়। সমাজের অবস্থাক্রমেই তাহা দেখা দেয়।

জীবনের অধিকার নারী আমাদের সমাজে লাভ করেন নাই। স্বামীর জন্যই মাত্র উহার যাহা কিছু যেন অনুগ্রহস্বরূপই তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুর সহিতই তাই জীবিত সহজাত সকল প্রয়োজন, সকল অধিকার হইতেই তিনি সর্ব্বদা বঞ্চিত হন। জীবন যেখানে প্রতিরুদ্ধ, খর্ব্বীকৃত, মৃত্যু বা জীবন্মৃত্যুর মধ্যেই যেখানে বাঁচিয়া লইতে হয়, সেখানে মৃত্যুই যে তাহার নিজের এমন কি তাহার স্বজনেরও কাম্য হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। ইহা ভিন্ন ও এই কদাচারের আরো বহু কারণও অবশ্য ছিল। রামমোহনের জ্বলন্ত লেখনী তাহার সমস্তই উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছে। সে সকল কদর্য্যতার উল্লেখ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু একাধারে রামমোহনের প্রদীপ্ত ধীশক্তি ও হৃদয়সম্পদের আভাস পাইতে হইলে বা দেশের ও সমাজের ইতিহাস ও স্বরূপ জানিতে হইলে সকলেরই তাহা পাঠ করা একান্তই আবশ্যক ও কর্ত্তব্য। তবে এই বীভৎস প্রথা আর্য্য সমাজের নিজস্ব নয়। আদিম বর্ব্বর সমাজ হইতেই ইহা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকিবে। সেইজন্য বহু প্রাচীন অপেক্ষা অল্প প্রাচীন যুগেই ক্রমশঃ উহা প্রসার লাভ করিতে দেখা যায়। মনুসংহিতায়ও ইহার উল্লেখ নাই, রামমোহনই প্রমাণ দিয়াছেন। তবে তাহার পূর্ব্বেও ইহার অস্তিত্বের চিহ্নের একেবারে অসদ্ভাব

নাই। বিশেষতঃ মনু হইতেই নারী সম্বন্ধে যে অন্যায়, বিরূদ্ধতা, কর্কশতার বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়, পরবর্ত্তীকালে তাহারই ফল ফলিয়াছে। ইহা ভিন্ন সাধারণভাবে মনুষ্য জীবনের মূল্য বোধ এবং অন্যের অনুভূতি সম্বন্ধে উপলব্ধি মানবসমাজে অল্পদিনই জাগিয়াছে। সমস্ত রাষ্ট্রসমাজ ব্যবস্থাই পুরুষের দ্বারা গঠিত, পরিচালিত হওয়ায় নারী সম্বন্ধে তাহা তাই স্বভাবতঃই আরো অল্পদিন এবং আরোই অল্প পরিমাণে পরিস্ফুট। নরবলি অপেক্ষা নারীবলি সেজন্য অধিকতর বিস্তৃত ও মজ্জাগতভাবে এবং অধিকদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। আর জীবনের শারীর, মানস উভয়বিধ অধিকারেই নারী এখনও সর্ব্বত্রই কম বেশী বঞ্চিতই রহিয়াছেন।

কথা হইতে পারে রামমোহন এই নারীমেধেরই প্রতিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বৈধব্যের প্রচলিত কৃচ্ছ্রাচারের সমর্থনই করিয়াছেন। কিন্তু যে সময়ে নারীর প্রাণরক্ষার জন্যই প্রাণপাত করিতে হয়, তখন আর কি করা সম্ভব ছিল বিবেচনা করা উচিত। প্রাণরক্ষা করিয়াই যে তিনি জীবনের প্রতিষ্ঠা ও তাহার উপায় বিধানের ভার দেশবাসীর উপর দিয়া গিয়াছেন। সে কর্ত্তব্য যদি আমরা তাঁহারই ন্যাস বলিয়া গ্রহণ না করিতে পারি, তাঁহার চারিত্রপঞ্জিকা যদি আমাদের অনুপ্রেরণা, অন্বেষণা জাগাইতে না পারে, তবে বৃথাই আমাদের আজিকার এই আয়োজন ও পূজানুষ্ঠান।

প্রাচীন যাহা কিছু তাহারই সমর্থন এখন জাতীয়তা ও দেশপ্রীতির চিহ্ন বলিয়া অনেক সময় পরিগণিত হইতে দেখা যায়। এবং যুগ-সত্যকে বিদেশী বলিয়া বর্জ্জনের প্রস্তাবও হইয়া থাকে। কিন্তু যেখান হইতে যাহা কিছু ভালর আহরণ ও সঞ্চয়, আর প্রাচীনই হউক, নবীনই হউক, দেশেরই হউক বা বিদেশেরই হউক, যথাসাধ্য মন্দের পরিহারই বলাবাহুল্য প্রকৃত দেশানুরাগের পরিচয়। যুগসত্যকে বৈদেশিক বলিয়া জ্ঞান করিবার কোন হেতু নাই। আমরাও যখন এই যুগেরই মানুষ, তখন উহাতে আমাদেরও সমানই উত্তরাধিকার। পূর্ব্বকালের কোন দোষের স্বীকার বা প্রদর্শনেও লজ্জার কারণ বা অপরাধ ও কিছুই নাই। মানুষ সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকালেই দোষ গুণে মিশ্রিত মাত্র। জ্ঞানও তাহার আংশিক ও পরিমিত। বিশেষতঃ কোন সময়েই কোন স্থানের সমকালীন সব মানুষের চিত্ত চারিত্র সমান প্রকর্ষ প্রাপ্ত হয় না। একই সমাজের মধ্যেই নানাশ্রেণীর নানাস্তরের মানসাবস্থার নিদর্শন রহিয়া যায়। তারপর মানবচিত্ত-ধারা চিরদিনই আলোকের অভিমুখী হইলেও অজ্ঞানের অন্ধকার হইতেই তাহার জয়যাত্রা। তাই তমকে এক অংশে পরাভূত করিয়া, কখনও বা কোন দেশে, কোন সময়ে সাময়িক ভাবে আবার তাহা দ্বারা নির্জ্জিত হইয়াও তবু সমগ্রভাবে মানবজাতির জ্ঞানের সীমানা বৃদ্ধিই পাইয়া চলিয়াছে। এবং যুগে যুগেই মানব সভ্যতা পৃথিবীর এক এক অংশে এক এক সময়ে প্রস্ফুটিত হইয়া মনুষ্যজাতিকেই সমৃদ্ধতর করিয়া আসিতেছে।

নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার দূরত্বের ক্রমিক সঙ্কোচে সেই সুবিধা যে মানুষ বর্ত্তমানে অনেক অধিক পরিমাণেই পাইতেছে ইহা তাহার পরম সৌভাগ্যেরই বিষয়। তবে নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র প্রসারের সহিত মানুষের বুদ্ধি, বিবেচনার দাবীও বাড়িতেছে সন্দেহ নাই। কারণ কিছুই আর এখন শুধু চিরাচরিত বলিয়া চোখ বুজিয়া অনুসরণ বা অনুবর্ত্তন করিয়া যাইবার উপায় নাই। পৃথিবীর ভাবকর্ম্মধারার সকল বিষয় জানিয়া, বুঝিয়া তুলনামূলক সমালোচনার দ্বারা তবেই গ্রহণ বা বর্জ্জনের আহ্বান এখন আসিয়াছে। রামমোহনের দূরপ্রসারী দৃষ্টি শতবর্ষ পূর্ব্বেই আমাদের এই পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে। সুতরাং দেশে বর্ত্তমান ন্যায় ও যুক্তিমূলক যুগের সূচয়িতা ও নয়িতা বলিয়া তিনি আমাদের বিশেষরূপেই নমস্য।

পুরী মহিলা-সমিতিতে 'রামমোহন শতবার্ষিকী' উপলক্ষে পঠিত।

আজ কেহ নহ মোর

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

আজ কেহ নহ মোর, একদিন আছিলে সকলি,
প্রাণের গানের মোর প্রথম কাকলি
জেগেছিল তব মুখ চেয়ে,
কিশোর উষার স্বচ্ছ নীলাকাশ চেয়ে,
নব উদয়ের তব অরুণ আলোক,
পূর্ণ করেছিল মোর দ্যুলোক ভূলোক।
আজ তুমি কেহ নহ, বাহুর আকুল বন্ধ-হারা
কোন সুদূরের পথে; আঁখির পাহারা
সেথা আর নারে পঁহুছিতে,
আমার স্পন্দনহারা চিতে,
স্পর্শে তব জাগেনা লহরী,
কপোল আরক্ত রেগে ভরি,
নেত্রালোকে বার্ত্তা নাহি বহে,
মর্ম্মবাণী ভুলেও না কহে।
আজ তুমি কেহ নহ, চকিতের দীর্ঘশ্বাসে ক্ষীণ,
বিদায়ের বাণী তব কোথায় নিলীন
উদাসী নয়ন চেয়ে বলে,
সাম্রাজ্য বিহীন রাজা যায় আজ চলে,
লুণ্ঠিত, মুকুট দণ্ড, রতন ভূষণ,
প্রাসাদ তোরণ রুদ্ধ, শূন্য সিংহাসন।

যত বলি

যত বলি যতশুনি' তবু ভালবাসি,
তুমি তো উদাসী
অভ্রক ধবল মেঘ, চলেছে সুদূরে
তবু মর্ত্ত্যবাসি।
আমার কৈশোর দিনে তুমিযে আনিলে,
আকাশ অনিলে,
বসন্তের আগমনী, পত্র পুষ্পে গাঁথা
সঞ্জীবনী গাথা
নব প্রাণ দিলে।
ভালোবাসি বলি তবু যাই ভুলে ভুলে,
জীবনের মূলে
কতযে আঘাত ব্যথা কতযে রোদন,
প্রাণের বাঁধন
গেছে যেন খুলে।

ব্যবসায়ে উচ্চ শ্রেণীর অভিযান

বাংলার কায়স্থরা আজ মাত্র কেরাণী নহে, বৈদ্যরা মাত্র কবিরাজ নহে, ব্রাহ্মণরা মাত্র পুরোহিত বা রসুইয়ে ব্রাহ্মণ নহে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যগণ আজ কেবল শিক্ষক, উকিল, ডাক্তারও নহেন। এই উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের শত শত ব্যক্তি শিল্পদ্রব্য তৈরী করিতেছে, ছোট বড় কারখানা কল পরিচালনা করিতেছে তাহারাই ইঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, কনট্রাক্টার এর আমদানী ও রপ্তানী কার্য্যে রত আছে; ব্যাঙ্ক পরিচালনা করিতেছ। বৈমানিক হইতেছে, বীমা-বিশারদ, বীমা প্রচার-কর্ত্তা তাহারা, চিত্রকর, চিত্রশিল্পী হইতেছে, সবাক নির্ব্বাক ছবিনির্ম্মাতা তাহারা—মুদ্রাকর, পুস্তক প্রকাশক, সাংবাদিক, সংবাদ-পত্র-ব্যবসায়ী তাহারা। বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালী-জীবন, ঐ স্কুল-মাষ্টার বা আইনজীবীদের মধ্যেই নহে, ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় বিশেষজ্ঞ ও কলকারখানার পরিচালকদের মধ্যে খুঁজিতে হইবে।

এই ব্যবসায় বাড়তির ফলে বাঙ্গালীর চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বাঙ্গালার লোকসংখ্যা গত পঞ্চাশ বছরে মাত্র ৩৭ হইতে ৩৮ % বাড়িয়াছে। কিন্তু এই তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দু যাহারা নানা শিল্পদ্রব্য তৈরী, আমদানী রপ্তানী, ব্যাঙ্কিং বীমা প্রভৃতি নূতন নূতন ব্যবসায় সুরু করিয়াছে তাহাদের সংখ্যা শতকরা কয়েক শত বাড়িয়াছে। নূতন জীবিকা ও কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের ফলে এই শ্রেণীর চরিত্রের বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দু আজ জীবিকার্জ্জনের জন্য যে ভাবে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে তাহা গত উনবিংশ শতাব্দীতে কল্পনাও করা যায় নাই। আজিকার বাংলাকে দেখিয়া বঙ্কিম রামমোহন কবিকঙ্কণ চণ্ডীর লেখক চিনিতেও পারিবেন না।

আজ যে সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ও বাণিজ্য-ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর মগজ ও পরিচালনাশক্তি বাহাদুরী দেখাইতেছে পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে তাহা বাঙ্গালায় অজ্ঞাত ছিল। গত স্বদেশীযুগের গৌরবময় ১৯০৫ সাল হইতেই তরুণ বাংলার আশা আকাঙ্ক্ষা এই নবীনতম অভিযানে উদ্যোগী ও উৎসাহী হইয়া সার্থক হয়। তরুণ বাংলার এই কৃতিত্ব নবীন এসিয়ার সামাজিক বিপ্লবের এক বিশেষ ও গৌরবময় অধ্যায়।

—শ্রীবিনয়কুমার সরকার। (সোনার বাংলা)

বেরার সম্মেলন

শ্রীযুক্তা কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়ের সভা-নেতৃত্বে বেরার তৃতীয় সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সভায় শ্রীযুক্তা কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় একটি কার্য্যতালিকা সহ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

কার্য্যতালিকাটি নিম্নে দেওয়া হইল—

(১) শ্রমিকদের একত্র করিয়া ট্রেড্ ইউনিয়ন গঠন করিতে হইবে এবং তাহারা যাহাতে অর্থনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) কৃষকদের লইয়া কৃষাণ সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে এবং তাহারাও যাহাতে উপরোক্ত আন্দোলনে যোগদান করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ক) তাহারা খাজনা, কর ও কৃষকদের ঋণভার কমাইবার জন্য চেষ্টা করিবে।

(৩) শ্রমিক ও কৃষকদের একত্র করিয়া কো-অপারেটিভে সোসাইটি গঠন করা হইবে।

(৪) যুব-সঙ্ঘ (Youth League), স্ত্রীলোক ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া সকলে তাহাতে যোগদান করিবে।

(৫) ছোট ছোট কারিকর, দোকানদার ও প্রজাদের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া যাহাতে তাহাদের অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা দূর করা যায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

(৬) নাগরিক হিসাবে প্রত্যেকের স্বাধীন ভাবে কথা বলার, যে কোন লেখা ছাপাইবার, সমিতি ও সঙ্ঘ গঠন করিবার ও অস্ত্র শস্ত্র রাখিবার অধিকারের জনসাধারণের দ্বারা আন্দোলন চালাইতে হইবে।

(৮) বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে রাষ্ট্র সম্পর্কে কোন প্রকার সন্ধি করা চলিবে না।

মেদিনীপুর সহর পরিত্যাগের আদেশ

মেদিনীপুরের ৮ জন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের উপর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সহর ছাড়িয়া যাইবার জন্য নোটিশ জারী হইয়াছে। এই আট জনের মধ্যে ৬ জন ব্যবহার জীবী, একজন শিক্ষক আর একজন কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি।

কি অপরাধে সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের উপর কর্ত্তৃপক্ষের কোপদৃষ্টি পতিত হইল তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

বাংলার কৃতিছাত্রী

শ্রীযুক্তা রমা বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি গড়ে শতকরা পঁচাত্তর নম্বর পাইয়াছেন। ছাত্রীজীবন তাঁহার আগাগোড়াই চমৎকার সাফল্যে মণ্ডিত। তিনি আই, পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান ও বি, এ পরীক্ষায় অনার্স সহ দর্শন শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন। শ্রীযুক্তা রমা বসু স্বর্গীয় আনন্দ মোহন বসুর পৌত্রী ও শ্রীযুত এস্, এম, বসু ব্যারিষ্টার মহাশয়ের কন্যা।

শ্রীযুক্তা ভ্রমর ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ পরীক্ষায় পুরাতত্ত্বে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই বিষয়টী মহিলাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই নিয়াছিলেন। এই নব প্রয়াসে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া তিনি সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। এখন তিনি এই বিষয়ে গবেষণা করিবেন ঠিক করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সাফল্য কামনা করি। শ্রীযুক্তা ঘোষ শ্রীযুত অতুলকুমার ঘোষ বি, টি, সি, এস, মহোদয়ের কন্যা। ঢাকার শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর তাঁহার পিতামহ।

শ্রীযুক্তা চামেলী দত্ত এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এস সি পরীক্ষায় পদার্থ-বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা দত্ত অনার্স সহ বি-এস সি পরীক্ষা পাশ করিয়া 'রায়-বহাদুর অমৃতলাল মিত্র প্রাইজ' পাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা চামেলী দত্ত চব্বিশ পরগণ-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্তের কন্যা।

ভারতের লোকসংখ্যা

এই বৎসরের আদমসুমারীর রিপোর্ট অনুসারে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের লোকসংখ্যার পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল।

	আয়তন বর্গমাইল	পুরুষ	স্ত্রীলোক	সবশুদ্ধ
	১৮০৮৬৭৯	১৮১৮২৮৯২৩	১৭১০০৮৮৫৫	৩৫২৮৩৭৭৭
আজমীর মারবার	২৭১১	২৯৬০৮১	২৬৪২১১	৫৬০২৯২
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৩১৪৩	১৯৭০২	৯৭৬১	২৯৪৬৩
আসাম	৫৫০১৪	৪৫৩৭২০৬	৪০৮৫০৪৫	৮৬২২৩৫১
বেলুচিস্থান	৫৪২২৮	২৭০০০৪	১৯৩৫০৪	৪৬৩৫০৮
বঙ্গদেশ	৭৭৫২১	২৬০৪১৬৯৮	২৪০৭২৩০৪	৫০১১৪০০২
বিহার এবং উড়িষ্যা	৮৩০৫৪	১৮৭৯৪১৩৮	১৮৮৮৩৪৩৮	৩৭৬৭৭৫৭৬
বোম্বে (এডেন সহ)	১২৩৬৭৯	১১৫৩৫৯০৩	১০৩৯৪৬৯৮	২১৯৩০৬০১
ব্রহ্মদেশ	২৩৩৪৯২	৭৪৯০৬০১	৭১৭৬৫৪৫	১৪৬৬৭১৪৬
মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার	৯৯৯২০	৭৭৬১৮১৮	৭৭৪৫৯০৫	১৫৫০৭৭২৩
কুর্গ	১৫৯৩	৯০৫৭৫	৭২৭৫২	১৬৩৩২৭
দিল্লী	৫৭৩	৩৬৯৪৯৭	২৬৬৭৪৯	৬৩৬২৪৬
মান্দ্রাজ	১৪২২৭৭	২৪০৮২৯৯৯	২৩৬৫৭১০৮	৪৬৭৪০১০৭
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৩৫১৮	১৩১৫৮১৮	১১০৯২৫২	২৪২৫০৭৬
পাঞ্জাব	৯৯২০০	১২৮৮০৫১০	১০৭০০৩৪২	২৩৫৮০৮৫
যুক্ত-প্রদেশ	১০৬২৪৮	২৪৪৪৫০০৬	২২৯৬৩৭৫৭	৪৮৪০৮৭৬৩
	১০৯৬১৭১	১৫৯৯৭১৫৫৬	১৩১৫৯৫৩৭৭	২৭১৫২৬৯৩৩

জেনেভায় তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর জেনেভায় তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে ভারতের দুইজন প্রসিদ্ধ নেতা শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত ভোলাভাই দেসাই ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। ডাক্তার এডমণ্ড প্রাইভেট সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে কতকগুলি প্রস্তাব (বিশেষতঃ আন্দামান সম্পর্কে) আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তারপর যথাক্রমে শ্রীযুত দেসাই ও শ্রীযুত বসু বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুত বসু বলেন যে বর্ত্তমান কংগ্রেসের নিক্রিয়তার কারণ বুঝিতে হইলে কংগ্রেসকে দমন করিবার ব্যবস্থাগুলি ভাল করিয়া জানা প্রয়োজন। জেল হইতে মুক্তি পাইয়াও বন্দীদের বন্ধন ঘোচে নাই। দেশের মনোভাব বুঝিবার কোন উপায় নাই, প্রেস আইন তাহার কণ্ঠ রোধ করিয়াছে। জনসাধারণের সভা সমিতি করাও জাতীয়তা মূলক পুস্তক পাঠ করা নিষিদ্ধ। তিনি বলেন যে এই নিক্রিয়তাকে ব্যর্থতা বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না। স্বাধীনতার জন্য জাগরণ ও যুদ্ধ মানবজীবনের মতই গভীর ও সত্য। এই নিপীড়িত মানবাত্মার বিদ্রোহকে কিছুতেই দাবান যাইবে না। যুবকদের সম্বন্ধে তিনি বলেন যে যতদিন মহাত্মা গান্ধী পথ দেখাইতে পারিবেন ততদিন তাহারা তাঁহাকেই একান্তভাবে অনুসরণ করিবে কিন্তু তাহারা পূর্ণ স্বাধীনতা চায় এবং ইহা না পাওয়া পর্য্যন্ত দেশে কিছুতেই শান্তি স্থাপিত হইবেনা। তিনি আরও বলেন যতদিন ভারতবাসীদের তাহাদের জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইবে এবং অর্থনৈতিক শোষণ চলিতে থাকিবে ততদিন এ চাঞ্চল্য ও অশান্তি থাকিবেই। তিনি বলেন যে রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য বিশেষতঃ আন্দামান দ্বীপে অবরুদ্ধ হতভাগ্য বন্দীদের জন্য আন্দোলন করা নিতান্তই প্রয়োজন।

হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুভাষ বসু বলেন যে এই দুই সম্প্রদায়েরই স্বাধীনতা কাম্য। একসঙ্গে একপ্রকার নির্য্যাতন ভোগ করিয়াই তাহারা এক হইবে।

তারপর তিনি বলেন, ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিকতাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করে কিন্তু ইহাকে ভুঁয়ো কথার মোহ হইতে সত্যে পরিণত করিতে হইলে পৃথিবীর নির্য্যাতিত পরাধীন জাতিগুলির মুক্তি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ভারতবর্ষ কেবলমাত্র তাহার দেশ নয়—সমস্ত পৃথিবীর সমস্যা। ইংরেজ ভারতেই প্রথম সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে, পরে উহা সমস্ত জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কাজেই ভারতকে মুক্ত করিতে যাহারা চেষ্টা করিতেছেন, সমস্ত পৃথিবীকে এই সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে সাহায্য করিতেছেন তাহারাই। প্রত্যেক দেশই স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় অন্যান্য দেশের নিকট হইতে যেরূপ সহানুভূতি পাইয়া থাকে—সেরূপ সহানুভূতি হইতে ভারতবর্ষও যেন বঞ্চিত না হয়।

সেনগুপ্তের শোকযাত্রা শীর্ষক ফিল্ম প্রদর্শন নিষিদ্ধ

সপারিষদ বিহার ও উড়িষ্যার লাট, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে "স্বর্গীয় দেশপ্রিয় সেনগুপ্তের শোকযাত্রা" এবং "দেশপ্রিয়ের প্রতি কলিকাতার শ্রদ্ধা নিবেদন" শীর্ষক দুইখানি ফিল্ম প্রদর্শন বন্ধ করিবার আদেশ দিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বোম্বাই গভর্ণমেণ্টও বায়োস্কোপ কোম্পানীর উপর এই আদেশ জারী করিয়াছেন। মৃত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনও কি রাজদ্রোহ মূলক ?

নারীর সম্ভ্রম রক্ষা

ঢাকা হিন্দু সভার উদ্যোগে শ্রীযুত রজনীকান্ত দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে ঢাকার এক সভা হইয়াছিল। শ্রীযুত প্রফুল্লরঞ্জন রাহা এবং শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ক্রমবর্দ্ধমান নারীহরণ এবং নারী ধর্ষণের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উহার সমুচিত প্রতিকারের পন্থা অবলম্বন করিবার জন্য সকলকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। সভায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই উপস্থিত ছিলেন।

সন্তরণবীর প্রফুল্ল ঘোষ

শ্রীযুত প্রফুল্ল কুমার ঘোষ ৭৯ ঘন্টা ২৪ মিনিট অবিরাম সন্তরণ করিয়া জগতে নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি ২২শে অক্টোবর প্রাতে ৮টা ৬মিনিটের সময় জলে অবতরণ করেন এবং ২৫শে ৩টা ৩০মিনিটের

সময় জল হইতে উঠেন। তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল এবং অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইলেও তাঁহাকে অভিবাদন করা হইলে তিনি ইঙ্গিতের দ্বারা তাহাতে সাড়া দিয়াছিলেন।

সিন্ধুদেশে মহিলা য়্যাডভোকেট

কুমারী হোমি সেথ্না বি,এ এল এল বি, হায়দ্রাবাদ কোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি জুডিসিয়াল কমিশনারের কোর্টে এক দেওয়ানী মোকদ্দমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সিন্ধুপ্রদেশে তিনিই প্রথম মহিলা য়্যাডভোকেট।

বিমান পোতে কলিকাতা হইতে ঢাকা

কলিকাতা ও ঢাকার মধ্যে বিমান পোতে চলাচলের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনেল এয়ার ওয়েজ লিমিটেড নামক একটি কোম্পানী ১লা ডিসেম্বর হইতে ঢাকা ও কলিকাতার মধ্যে বিমানপোত চালাইতে আরম্ভ করিবেন। আপাততঃ যাত্রী ও পার্শ্বেল বহনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। পরে হয়ত ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত হইবে। প্রত্যেক যাত্রির একবারের ভাড়া ৫৫৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কলিকাতা ও ঢাকার মধ্য অপর কোন স্থানে থামিয়া যাত্রী কিম্বা পার্শ্বেল লওয়া যাইবে না। দেড় ঘন্টায় কলিকাতা হইতে ঢাকায় পৌছান যাইবে।

বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ৭ হাজার টাকা দান

প্রকাশ, চট্টগ্রামের জমিদার ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ রায় নন্দনকানন গার্লস স্কুলের (চট্টগ্রাম) জন্য ৭ হাজার টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন স্কুলের নামটী দাতার নামানুসারেই রাখা হইবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, শ্রীযুক্ত রায় ইতিপূর্ব্বে স্বীয় গ্রাম জফরানগরে এক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের জন্য ৩০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। জফরানগর সীতাকুণ্ড (এ, বি, রেলওয়ে) হইতে কিছুদূরে উক্ত স্কুলের নাম রাখা হইয়াছে 'জফরনগর অপর্ণাচরণ হইস্কুল।

ভারতের লোকগণনা রিপোর্টের কয়েকটী জানিবার বিশেষ বিষয়

১০৩১ সনের লোকগণনা রিপোর্টে জানা যায় লোকসংখ্যার দিক্ দিয়া ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলি হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

১৯২১ সনের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে লেখাপড়া জানা লোক সংখ্যা ছিল ২২,৬২৩,৮৭১ এবং বর্ত্তমানে ২৭,১৩১,৩২৫ জন।

সহরের লোকসংখ্যা ৩৮,৯৮৫,৪২৭ অর্থাৎ মোট লোকসংখ্যার শতকরা ১১জনের সহরে বসতী।

হিন্দু বিধবার সংখ্যা—৪,৩১৩,৭৭১। হিন্দু সমাজে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী কিন্তু বর্ত্তমানে কিছু কমিয় ৫০ লক্ষের উপরে হইয়াছে।

ভারতবর্ষে উন্মাদ—১২০,৩০৪; বধির—২৩০,৮৯৫, অন্ধ—৬০১,৩৭০, কুষ্ঠরোগী—১৪৭,৯১১।

কৃষি ও গবাদির পশুপালন কার্য্যে রত লোক শতকরা ৭১৭১। বাংসাক্ষোত্র ১৯২১ সনে লোকসংখ্যা ছিল শতকরা ১১জন, এখন শতকরা ১০জন। ১৯২১ সনে উপনিবেশ, খনি ব্যবসাবানিজ্যে লোকসংখ্যা— ২৪,২২৯,৫৫৫, ১৯৩১ সনে ২৬,১৮৭,৬৪৯।

ব্যবসা ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা পূর্ব্বে ছিল ৮০ লক্ষের উপরে, এখন ৮০ লক্ষের নীচে হইয়াছে।

বাংলাদেশ আয়তনে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির মধ্যে নবম স্থানে কিন্তু লোকসংখ্যায় ইহা সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে।

বৃটিশবাংলার জেলা—৭৭,৫২১ বর্গ মাইল এবং ষ্টেটের সংখ্যা ৫,৪৩৪ বৃটিশ বাংলার লোক সংখ্যা বর্গ মাইলে ৬৪৫।

বাংলাদেশে বিধবার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, প্রতি হাজারে ২২৬ জন বিধবা।

অর্থনীতির দিক্ হইতে গত ১০ বৎসর বাংলার অবস্থা মোটের উপর অসন্তোষজনক নহে, যদিও প্লাবন, সাইক্লোন, ভূকম্পের ঝড় বাংলার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমানে ব্যবসাক্ষেত্রে বাংলার কাপড়ের কলই সমধিক উন্নতি করিয়াছে। ১৯২৯ পর্য্যন্ত বাংলার পাট ও ১৯২৭ পর্য্যন্ত চা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে, বাংলার জীবনযাত্রার আদর্শ বাড়িয়াছে। কিন্তু জীবনযাত্রার আদর্শের বৃদ্ধির সহিত উন্নততর বা মূল্যবান খাদ্যের ব্যবহার হয় নাই। বাংলার দরিদ্র কৃষককেরা পর্য্যন্ত আজকাল কোট, সার্ট, জুতাও ছাতা ব্যবহার করে। এদিক দিয়া ধরিলে অবশ্য জীবনযাত্রার আদর্শ কিছু উচ্চ হইয়াছে বলিতে পারা যায়।

প্রবাসী বাঙ্গালী মহিলা

বাংলার সুপরিচিতা মহিলা শ্রীযুক্তা কিরণময়ী বসু নারীশিক্ষা বিস্তার বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

তিনি গত দেড় বৎসর যাবৎ ইতালি, জার্ম্মানি, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, জেকোস্লোভিয়া, আষ্ট্রিয়া, ডেনমার্ক সুইডেন ও ইংলণ্ড ভ্রমণ করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতেছেন। জার্ম্মানি, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, সুইডেন বালকবালিকাদের জন্য যে নূতন ধরণের শিক্ষা প্রণালী আছে তাহা তিনি বিশেষ ভাবে পরিদর্শন করেন। গত গ্রীষ্মের সময় জেনেভার Institute of International Relation এর সভ্য হইয়া শ্রীযুক্তা বসু অনেক বিষয় শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা কিরণময়ী বসু

শ্রীযুক্তা বসু ষ্টকহলমের মহিলা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা, ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও ভারতের মহিলাদের কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া ভারতসম্বন্ধে তাহাদের অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়াছেন।

ডেনমার্কের কোপেনহাগেন সহরের 'ভারতবন্ধু সোসাইটি' হইতে শ্রীযুক্তা বসুকে বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল।

আমরা আশা করি শ্রীযুক্তা কিরণময়ী বসু দেশে প্রত্যাবর্ত্তন বাঙ্গালার নারীশিক্ষা বিস্তার কার্য্যে আপনার যথাশক্তি নিয়োজিত করিবেন।

বিজ্ঞান ক্ষেত্রে নারী

১৮ই সেপ্টেম্বরের লণ্ডন টাইমসে 'মহিলাইঞ্জিনিয়ারদের কনফারেন্স' শীর্ষক প্রবন্ধে ("Women Engineers Conference)" কয়েকজন মহিলা ইঞ্জিনিয়ারদিগের বক্তৃতার সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমতী ই, জে, মুনটস বায়ুযানে ভ্রমণ বিষয়ে তাঁহার ৫০ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলেন। এই মহিলা প্রথমে হ্যাভিলাণ্ড এয়ার ক্রাফ্‌ট কোম্পানির (Havilland Aircraft Comp.) একজন সামান্য মজুর ছিলেন। তারপর ঐ কোম্পানির প্রত্যেক বিভাগে কাজ করিয়া শেষে বায়ুযানের এঞ্জিন পরীক্ষা বিভাগের (Engine Testing Department) কাজ শেষ করেন। তাঁহার অবসর সময়ে তিনি বিমান ভ্রমণের 'পাইলট্' এর কাজ করেন। এবং তারপর এয়ার এম্বুলেন্স ডিপার্টমেণ্টে কাজের (Air Ambulance Department) প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। মিস্ মুন্ টস্ বায়ুযান হইতে ফটোগ্রাফ লওয়া বিষয়েও বিশেষ বিচক্ষণ হন। বর্ত্তমানে তিনি (The Mersy Docto & Harbon Board) এর অধীনে কাজ করিতেছেন। মিস্ জক্রিসোণ্ড তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে ইঞ্জিনিয়ার ড্রইংএও মহিলারা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতেছেন। পাশ্চাত্য মহিলারা শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষতঃ বিজ্ঞান জগতে খুব উন্নতি করিতেছেন। বাংলার মেয়েদেরও বিজ্ঞান অর্থশাস্ত্র, চিকিৎসা এমন কি ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সময় আসিয়াছে।

নিখিল ভারত মাড়োয়ারী মহিলা সম্মেলন

কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে শ্রীযুক্তা জানকী দেবী বাজাজের সভানেত্রীত্বে নিখিলভারত মাড়োয়ারী মহিলা সম্মেলন হইয়া গিয়াছে।

মাড়োয়ারী মহিলা সম্মিলনের সভানেত্রী
শ্রীযুক্তা জানকী দেবী বাজাজ

শ্রীযুক্তা জানকী দেবী তাঁহার অভিভাষণে বলেন নারীসমাজের সম্মুখে সমস্যা অনেক কিন্তু প্রধান সমস্যা হইতেছে আমাদের ভাগ্যগঠনে আমাদের নিজেদের কোন অধিকার নাই। পর্দ্দা প্রথাই যে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু; ইহাই আমাদের জীবনের নানা ক্ষেত্রে বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এই কুপ্রথাই মেয়েদের যথার্থ শিক্ষা, সামাজিক ও আর্থিক নানাবিষয়ে উন্নতির প্রধান অন্তরায়। সুতরাং এই পর্দ্দা প্রথার উচ্ছেদ সাধন আমাদের করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনে ভাইদের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদেরও তাহাদের সহকর্ম্মীরূপে সংগ্রাম করিতে হইবে। স্বদেশী গ্রহণ, খদ্দর প্রচার ও হরিজন উন্নয়ন কার্য্যে মেয়েদেরও একান্তভাবে যোগ দিতে হইবে। পরিশেষে বাল্য বিবাহের বিষময় পরিণতি ও বিধবাদের অবস্থা সম্বন্ধে বলেন, সভায় বহু অত্যাবশ্যকীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

গান্ধিজী ভারত-বিজয়

সংবাদপত্রে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত গান্ধিজী সত্বরই ভারত বিজয়ে বহির্গত হইবেন। শ্রীযুক্ত জহরলালজী সঙ্গে যাইবেন কি না জানি না। ভারতের বর্ত্তমান ধর্ম্ম ও সমাজকে ধ্বংশ করিয়া তাহার শ্মশানের উপরে বুদ্ধের ন্যায় গান্ধী এক নূতন ধর্ম্মমত স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। গান্ধিজী ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ভারতের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে প্রথমে "তাঁতি সমিতিতে অর্থাৎ Weavers' Associationএ পরিণত করেন। যাঁহারা রাজনীতি আলোচনা করিতেন তাঁহারা "কাটুনি" হইলেন। তার পর গান্ধিজী ভারতের নিম্নবর্ণ হিন্দুদিগকে চিরস্থায়ী নিম্নবর্ণে—আইনানুসারে নিম্নবর্ণ বা depressed classএ পরিণত করিয়া রাখিবার জন্য আইন প্রণয়ন করাইলেন এবং তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত হরিজন আন্দোলন করিয়া কংগ্রেসকে ধ্বংস করিলেন। দেখি, এবার ভারত-বিজয়ে তিনি কতটা সাফল্য লাভ করেন। —জনমত

আইনপরীক্ষায় নারীর কৃতিত্ব

কলম্বোর পার্শী মহিলা কুমারী আভাবাই মেটা মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে শেষ আইনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

কুমারী আভাবাই মেটা

মীরাটে মহিলা সমিতি

গত ২৯শে অক্টোবর শনিবার অপরাহ্ণে মীরাট কলেজের প্রফেসার অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে মীরাটস্থ বাঙ্গালী মহিলাদিগের একটী সভা হয়। শ্রীমতী লীলা বসু সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন. সভানেত্রী একটী দীর্ঘ প্রবন্ধে মহিলাদিগের সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বুঝাইয়া দেন। একটী মহিলা সমিতি স্থাপন করা স্থির হয় এবং নিম্নলিখিত কার্য্যতালিকা গৃহীত হয়—(১) রোগী পরিচর্য্যা, প্রাথমিক চিকিৎসা, শিশু কল্যাণ এবং প্রসূতি পরিচর্য্যা, পথ্য প্রস্তুত প্রণালী প্রভৃতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা। (২) গীত ও বাদ্যাদি শিক্ষা। (৩) ছাটকাট, সেলাই, আলপনা, বেতের কাজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রদান। (৪) দুঃস্থা স্ত্রীলোক এবং বিধবাদিগকে ঘরে বসিয়া জীবিকার্জ্জনের উপায় করিয়া দেওয়া। (৫) স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে ব্যায়ামের ব্যবস্থা ও মধ্যে মধ্যে প্রীতি সম্মেলনের ব্যবস্থা করা। ইহা ছাড়া স্ত্রীলোকেরা যখন সভায় যোগদান করিবেন, তখন তাহাদের ছেলেমেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি 'ক্রাচ' বা শিশুশালা স্থাপন করার প্রস্তাবও গৃহীত হয়। সভায় সকলেরই বিশেষ উৎসাহ দেখা গিয়াছিল।

কুমারী জ্যোতিঃকণার ৪ বৎসর কারাদণ্ড

গত বুধবার আলিপুরের স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, আর, সেন ডায়োসেসান কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী জ্যোতিঃকণা দত্তকে বিনা লাইসেন্সে দুইটী রিভলবার, দুইটী পিস্তল ও ৫৩টী কার্ত্তুজ রাখিবার অভিযোগে ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া রায় প্রদান করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণ এই ছিল যে, গত ১লা অক্টোবর তারিখে কলেজ হোষ্টেলের কোন মেয়ে বোর্ডারের ১২৲ টাকা চুরি যায়, ইহাতে কয়েকটী মেয়ে সকল ঘরে তল্লাসীর দাবী জানায়। পরদিন কলেজের প্রিন্সিপাল নির্দ্দেশ দেন যে, মেট্রন মিসেস ডিউইট ঘর তল্লাস করিবেন। তল্লাসীর সময় জ্যোতিঃকণার বিছানার নীচে উক্ত অস্ত্রশস্ত্রগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

যক্ষ্মারোগীগণের জন্য শিলং এ স্বাস্থ্যনিবাসের পরিকল্পনা

প্রকাশ রেডক্রশ সোসাইটী শিলংয়ে যক্ষ্মারোগীদিগের জন্য এক স্বাস্থ্য নিবাস করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। উক্ত সোসাইটীর সভ্যগণ তজ্জন্য গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। আরও প্রকাশ গভর্ণমেণ্ট এবং শিলং মিউনিশিপ্যাল বোর্ড সোসাইটীকে উক্ত কার্য্যে সাহায্য করিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় উক্ত প্রদেশের এক মহোপকার সাধিত হইবে। চিকিৎসকেরা বলেন, স্থানটী উক্ত রোগীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

সোভিয়েটে পান নিবারণ প্রচেষ্টা

সোভিয়েট রুশিয়ায় মদের বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় একেবারে নিষিদ্ধ। তথায় আইন করা হইয়াছে যে, স্কুল সমূহে মদ্যপানের কুফল বুঝাইয়া দিতে হইবে, পাঠ্য পুস্তকেও এই সম্পর্কে লিখিত হইবে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট প্রচার করেন যে, দশ হাজার বিপ্লববাদীর অপেক্ষাও মদ্যপান বড় শত্রু।

ব্যবস্থাপক সভার মহিলা সদস্য

শ্রীমতী টি, নারায়ণীরাম্ বি এ,

শ্রীমতী টি, নারায়ণীরাম্ এ, এই বৎসর ত্রিবাঙ্কুরের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

স্ত্রী-শিক্ষায় দান

শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায় হুগলী জেলার মাহেশ গ্রামে 'পরমেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়" নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনোদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্টের হাতে ১০,০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন।

শিশু ও প্রসূতি মঙ্গল
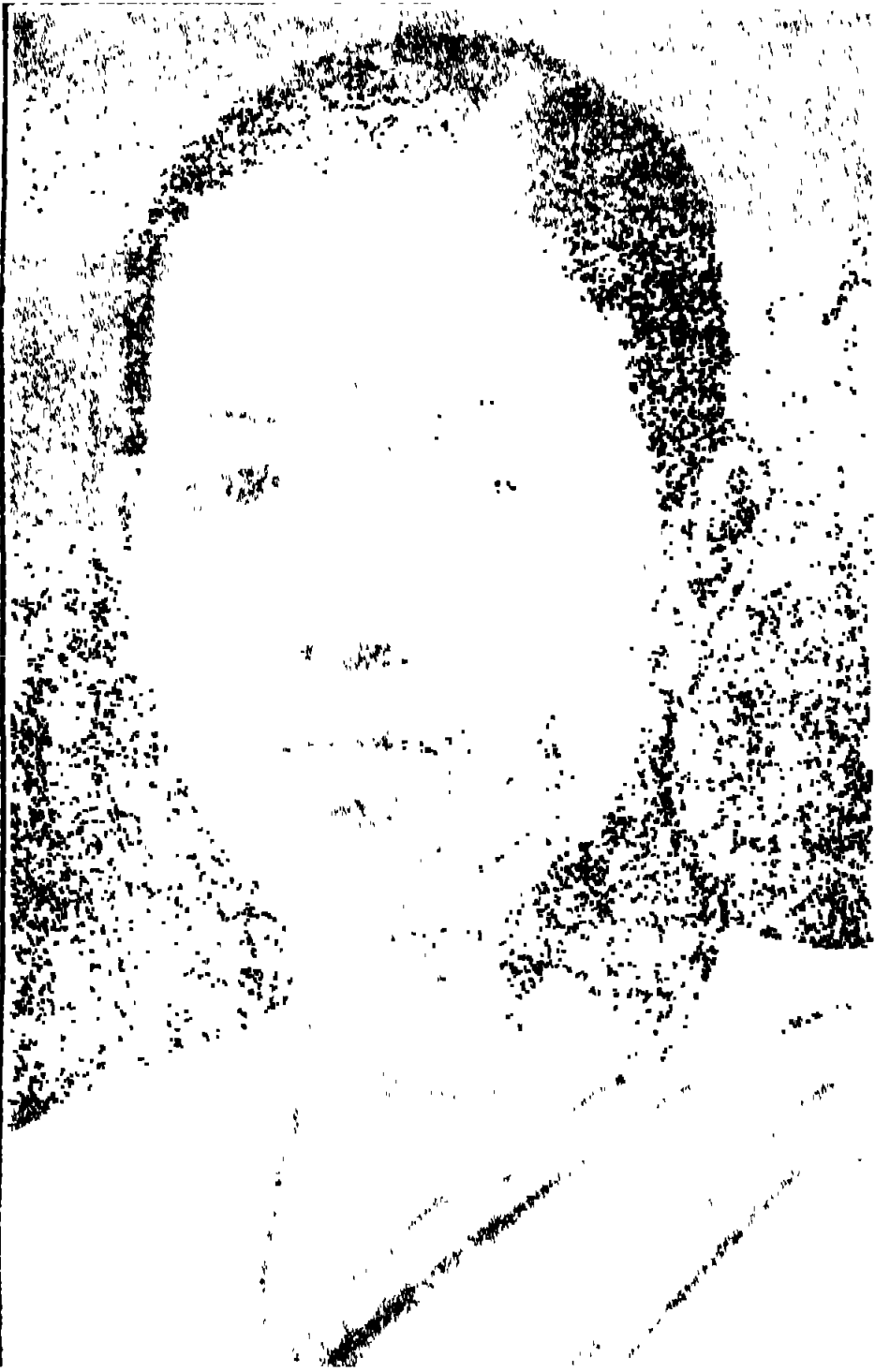
কলিকাতার রোটারি ক্লাবে ডাক্তার শ্রীমতী এলিসহেডওয়ার্ড ভারতের শিশু ও প্রসূতি মঙ্গল সম্পর্কে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, ভারতের প্রসূতি মৃত্যুর হার সম্পর্কে মেজর জেনারেল মেগো যে বিবরণ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, বাঙ্গালার মধ্যে প্রতি হাজার জন প্রসূতির মধ্যে ৫০ জন মারা যায়। ডাঃ এম বেন্থার যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, আসামে প্রসূতি মৃত্যুর হার আরও বেশী। বাঙ্গালাদেশের

৬৯ গ্রামের হিসাব লইয়া জানা গিয়াছে, প্রতি হাজারে ৫০ জন প্রসূতির মৃত্যু হয়। ইংলণ্ডে হাজার করা প্রসূতির মৃত্যু ৪।৫ জন। ইহাকেই অতি উচ্চ হার মনে করা হয়।

শিশু মৃত্যু সম্পর্কে ডাঃ শ্রীমতী এলিস বলেন, ১৯৩০ সালে ইংলণ্ডে হাজার করা ৬০ জন শিশু মারা গিয়াছিল। ঐ বৎসরে ভারতবর্ষে হাজার করা ১৮০৩৫ জন শিশু মারা যায়। উপসংহারে তিনি বলেন, হুইটলী কমিশন এবিষয়ে নানা প্রকার সুপারিশ করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও প্রতিকারের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই।

মল্ল যোদ্ধা ও তাঁহার স্ত্রী

ম্যান মার্টেন ডিন আমেরিকার একজন বিখ্যাত মল্লযোদ্ধা, ছবিতে তাহার সাহত যে স্ত্রীলোকটিকে দেখা যাইতেছে, তিনি এই মল্লবীরের স্ত্রী, কিন্তু সাধারণ স্ত্রী নহেন। তিনি তাঁহার স্বামীর ট্রেডারই ম্যানেজার। ম্যান মার্টেন লম্বায় ৬ফুট ২ইঞ্চি এবং তাঁহার ওজন পোনে মণ।

নারী হরণ ও নারী নিগ্রহের সংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৩২ সালে বাঙ্গলার পুলিসের কার্য্য সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৩২ সালে নারী হরণ ও নারী নিগ্রহ জনিত অপরাধের (ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৬ ধারা ও ৩৫৪ ধারা সংক্রান্ত অপরাধ) সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এই সংখ্যা ৯৪টি বেশী।

১৯২৯ সালে এবং ১৯৩২ সালে কতটি অপরাধ ঘটিয়াছে, তাহা পরিষ্কার ভাবে দেওয়া উচিত ছিল। তাহা হইলে দেশবাসী দেখিতে পাইতেন, এই মারাত্মক অপরাধ কি পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছে; এই সংখ্যাগুলি না দেওয়ায় হয়ত সকলে এই মহাপাপের পরিমাপ করিতে পারিবেন না।

মল্লযোদ্ধা ও তাঁহার স্ত্রী

আমরা সর্ব্বদাই বলিয়া আসিতেছি এবং সঞ্জীবনীতে প্রতি সপ্তাহে নারী হরণ ও নারী নিগ্রহের বহু সংবাদ প্রকাশ করিয়া দেখাইতেছি, দণ্ডবিধির ৩৬৬ ধারা এবং ৩৫৪ ধারার অপরাধ অতিশয় ভয়াবহরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। পুলিশ রিপোর্টেও এই কথাই স্বীকার করা হইয়াছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নানা কারণে নারী হরণ ও নারী নিগ্রহ জনিত সমস্ত অপরাধের সংবাদ পুলিশের নিকট পৌছায় না। সমস্ত অপরাধের সংবাদ পুলিশের কাণে গেলে এই সংখ্যা আরও অনেক বেশী হইত।

রিপোর্টের মধ্যে আরও বলা হইয়াছে যে, বর্দ্ধমান, নদীয়া এবং হুগলী জেলায়ই এই শ্রেণীর অপরাধ অধিক পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যান্য জেলা যে এই মহাপাপ হইতে মুক্ত, এমন কথা মনে করিবার কারণ নাই। প্রতিদিন সংবাদপত্র খুলিলেই নারীহরণ ও নারী নিগ্রহের যে সমস্ত মর্ম্মান্তিক সংবাদ চোখে পড়ে, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, এই মহাপাপ কেবল কয়েকটী জেলায় আবদ্ধ নহে সমগ্র বাঙ্গলা ও আসামে ইহা ভয়াবহরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতেও ইদানীং নারী হরণ ও নারী নিগ্রহের

বহু সংবাদ আসিতেছে। মাতৃজাতির এরূপ লাঞ্ছনা ও অবমাননার সংবাদ জানিয়াও একদল লোক নির্বিকার চিত্তে বড় বড় আদর্শের কথা বলিয়া, "দেশের সেবা" করিতেছেন। এদিকে মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট হইতেছে, নরপিশাচের কবলে পড়িয়া তাঁহারা মর্ম্মান্তিকভাবে নির্য্যাতিত হইতেছেন, অপহৃতা বহু নারীকে এখনও দুর্বৃত্তগণের কবল হইতে উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নাই, তাহারা যে কি ভীষণ নরক যন্ত্রণায় কালাতিপাত করিতেছেন, এই সমস্ত চিন্তা করিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। কিন্তু এদিকে কাজ করিবার লোক কোথায়? নিগৃহীতা জননী ভগিনীর করুণ আর্ত্তনাদ কে শুনে? সাময়িক উত্তেজনার মোহে দেশ যেন আত্ম-সম্বিত হারাইয়াছে।

সে যাহাই হউক পুলিশ রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ইদানীং যে অপরাধ বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং যে বিষয়ে জনসাধারণের পক্ষ হইতে সমালোচনা হইতেছে, তাহার বিষয়ে পুলিশ ইতঃপূর্ব্বে যেরূপ যত্নের সহিত তদন্ত করিয়াছে ভবিষ্যতেও তদনুরূপ যত্নের সহিত তদন্ত করিয়া এই পাপ দমনের জন্য চেষ্টা করিবে।

আমরা স্বীকার করি যে, কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারী বিশেষ দৃঢ়তার সহিত নারী হরণ ও নারী নিগ্রহের অপরাধ দমনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় অনেক অপহৃতা নারীর উদ্ধার সাধন করিয়াছে এবং অনেক দুষ্কৃতকারী দণ্ডিত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও আমরা বলিতে বাধ্য যে, কোন কোন স্থলে কোন কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্যের ত্রুটি দেখা গিয়াছে। ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ না ঘটে, তজ্জন্য অবহিত হওয়া পুলিশ বিভাগের পদস্থ এবং নিম্নপদস্থ সমস্ত কর্ম্মচারীরই অবশ্য কর্ত্তব্য। সঞ্জীবনী

কাশী আর্য্য-মহিলা মহাপরিষদ

এই মহাপরিষৎটির বয়স মাত্র তিনমাস—গত আগষ্ট মাসে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য এই পরিষদের মহিলা কর্ম্মিগণ এবং পুরুষ পৃষ্ঠপোষকগণ অনেকদিন হ'তেই কাশীর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করে আসছেন। কিন্তু ব্যাপকভাবে বিভিন্ন শাখার দ্বার উদ্ঘাটন করে কাজ আরম্ভ হল এই প্রথম। এই প্রতিষ্ঠানটির আর একটি বৈশিষ্ট্য এটি 'অর্থ্য সমাজী'দের চেষ্টায় স্থাপিত হয় নি, একেবারে বর্ণাশ্রমী সনাতনীদের সম্পত্তি। প্রায় পঁচাত্তর হাজার টাকা ব্যয় করে পরিষদের পরিচালিকাগণ একখানি বাড়ী কিনেছেন। 'আর্য্য-মহিলা' নামে এঁদের একখানি পত্রিকাও আছে। 'অন্নপূর্ণা অন্ন-সত্র' নামে এঁদের একটি দরিদ্র ভাণ্ডার আছে, অনাথের সাহায্য করাই এই সত্রের উদ্দেশ্য। একটি বালিকা-বিদ্যালয়ও এই পরিষদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে, শিক্ষয়িত্রী সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পরিষৎ একটি ট্রেনীং স্কুল খুলেছেন, যেখানে বর্ণাশ্রমী শিক্ষয়িত্রীগণ শিক্ষা বিজ্ঞানে পারদর্শিনী হবেন।

কুমারী কে, এস, রঙ্গরাও

কুমারী কে, এস, রঙ্গরাও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এস, সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

কুমারী কে, এস, রঙ্গরাও

ছাত্র ও ছাত্রীদের অভিনয়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যে সব নাট্যাভিনয় হইয়া থাকে তৎসম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা-দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সম্প্রতি এক সারকুলার জারী করিয়াছেন। প্রকাশ, ঐ সারকুলারে এই বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে যে, পেশাদার অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সঙ্গে কোন ছাত্র বা ছাত্রীকে কিছুতেই একত্র অভিনয় করিতে দেওয়া হইবে না। যে সব পুস্তক অভিনয় করা হইবে সেগুলি নির্ব্বাচনের উপরও বিদ্যালয় সমূহের কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণকরা হইয়াছে এবং এই পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে যে, বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে অভিনয়ের জন্য তাঁহারা যদি নিজের পুস্তক কিনিয়া দেন তাহা হইলেই ভাল হয়। সাম্মলী

দারিদ্র্য ও সম্পদ

শ্রীবীণা দাশ গুপ্তা বি. এ

এই অসীম সম্পদভরা বিশ্বের কোলে জন্মেও মানুষ চিরদিন দুঃখ ও দারিদ্র্যে ডুবে থাক্‌বে এ চিন্তাও যেন মনকে ব্যথিত করে তোলে। ফুলে ফলে সুশোভিত, মণি মাণিক্যে উজ্জ্বল বসুন্ধরা প্রত্যেক মানুষের দাবী মেটাতে পারে এমন শক্তি তার আছে, কিন্তু সেই শক্তির সদ্ব্যবহার কর্‌তে না পারলেই প্রাচুর্য্যের চেয়ে অভাবই দেখা দেয় বেশী। সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত ও সভ্য এই বিংশ শতাব্দীতে মানুষের অভাব ও দরিদ্রের হাহাকার অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। এই লজ্জা মোচন কর্‌তে হোলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা প্রয়োজন। ধনতান্ত্রিকতাকে লোপ ক'রে সাম্যের ভিত্তির উপর রাষ্ট্রকে নূতন ক'রে গঠন কর্‌তে হবে। আর ঐশ্বর্য্য যা'রা গড়ে তা'দের হাতেই সেটার ভার থাক্‌বে এবং যা'দের প্রয়োজন তা'রাই এর অধিকারী হবে। সম্পদের এর চেয়ে বড় সার্থকতা আর হোতে পারেনা, এই হোল আদর্শ।

কিন্তু তবুও অর্থের ন্যায়সঙ্গত ভাগ বাঁটোয়ারা ও বাইরের দারিদ্র্য মোচনই এই যুগের একমাত্র ও বড় সমস্যা নয়। দেহই কি মানুষের সব? তার যে আত্মা ও আছে। অন্তর বাহির দেহ ও মন নিয়েই যে সে পূর্ণ হতে পেরেছে। যে মুহূর্ত্তে সে দেহকেই সার মেনে আত্মাকে বিসর্জ্জন দিয়েছে—তখনই ঘটেছে তার মৃত্যু। বাইরে সে হয় তো তার পরিপুষ্ট দেহ নিয়ে বেঁচে রয়েছে কিন্তু অন্তরের সম্পদের যা'র পরিসমাপ্তি হয়েছে সে কি সত্যি বেঁচে আছে? অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আত্মা যার লজ্জায় ম্রিয়মাণ হ'য়ে আছে, জীবন তা'র বিকশিত হবে কেমন করে? তাই তো অন্তরের দারিদ্র্য ও ঠিক বাইরের দারিদ্র্যের মতোই সত্য এমন কি তা'র চেয়ে বেশী অশুভ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই সত্যটা দিনে দিনে ভুল্‌তে আরম্ভ করেই আমরা প্রকৃত ভয়ের কারণ সৃষ্টি কর্‌ছি।

প্রকৃত ঐশ্বর্য্য কোন দিনও টাকার থলে কিংবা ব্যাঙ্কের নোটে থাক্‌তে পারে না। সে যে মহান্ ও উদার স্থূল জিনিষকে সে অবহেলায় ত্যাগ করেছে। কে যেন মহামুল্য মাণটার মতো তাকে মানুষের অন্তরে পু'রে তার সন্ধানে মানুষকে ভুল পথে যেতে দেখে আড়ালে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে। এ যে কতবড় প্রবঞ্চনা তা' বুঝ্‌তে পার্‌লে তথাকথিত ধনীর দল বাহ্যিক ঐশ্বর্য্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে নিশ্চয়ই অন্তরের দিকেই ছুটে যেতো কিন্তু সেটা তারা বুঝ্‌বে কবে?

তথাকথিত গরীবদের ও একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রকৃত দারিদ্র্য ও সম্পদ ভিতরের জিনিষ,—বাইরে তা'দের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। বাইরে থেকে দেখ্‌তে গেলে যা'র মূল্য কানাকড়িও নয় সেই নিঃস্ব মানুষটা ও সুন্দর ও শাশ্বত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হোতে পারে—যে

ঐশ্বর্য্য চোর ও দস্যুর কবল থেকে রক্ষা কর্‌বার চিন্তায় তা'র আহার নিদ্রা ঘোচাতে হবে না। রাজা সলোমন বলেছেন,

'অনেক ধনীলোক ও একেবারে নিঃস্ব হোতে পারে। তা'র এই জ্ঞানগর্ভ উদার বাণী যুগে যুগে মানুষকে সত্যের সন্ধান বলে দিচ্ছে।'

* * * *

আইন ও আদালতের জোরে আমরা যা দাবী করতে পারি তাই কি প্রকৃত সম্পদ? তা' মোটেই নয়, এমন সম্পত্তি ও আছে যা' বিশ্বের সব আদালত একত্র হ'য়ে ও আমাদের দিতে কিংবা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারেনা। অদ্ভুত লাগে এই ভাব্‌লে যে আইনতঃ যা' মোটেই আমার অধিকারে নয় এমন হাজারো জিনিষকে আমরা আমাদের বলে সগর্ব্বে প্রচার করছি—আর সেটা মিথ্যে প্রচারই বা বলি কেমন করে—তা'রা সত্যি আমাদেরই। রেজেষ্ট্রি করে যদি ও কেউ তা'দের দান করেনি তবুও অন্তরে তা'রা আমাদের হ'য়েই আছে—আমাদের মন জানে তা'রা আমাদেরই। যখন বলি 'আমার বন্ধু' আমি নিশ্চয়ই জানি তা'র উপরে আমার এমন অধিকার আছে যা'র জোরে তা'কে আমার বল্‌তে পারি আর সেই অধিকারই আমার সত্যিকারের অধিকার। একে জোর জবরদস্তি ক'রে কেউ গড়্‌তে পারেনা—নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে সকলের অলক্ষ্যে এজিনিষটা মানুষের মনে পুষ্টিলাভ করে। আমার প্রিয়জনকে যা' খুসী তা' কর্‌বার অধিকার আমার নেই কিন্তু আইনের স্থূল দৃষ্টি ত্যাগ ক'রে সূক্ষ্মভাবে বিচার কর্‌লে বুঝতে পারি তা'দের মতো আপন আমার আর নেই। দেশকে যে বিন্দুমাত্র ও ভালবাসে 'আমার দেশ' বলতেই এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় ভাবে তা'র মনপ্রাণ ভ'রে ওঠে। তা'র হৃদয়বীণায় এ দুটী কথা কেবলই বাজ্‌তে থাকে—কিন্তু সে হয়তো তা'র দেশের এক কণা ভূমি ও আইনতঃ দাবী করতে পারেনা তবুও এ কথা দুটী বল্‌তে তা'র এত আনন্দ কেন? তার কারণ জন্মাবধি সে জানে সেটা তার দেশ—তা'র একান্ত আপন, তা'র জীবনের মতোই সত্য ও সুন্দর। আইনের দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে সে হয় তো সেখানে বাড়ী তুলে বংশপরানুক্রমে ছেলেদের দিয়ে যেতে পারবেনা কিন্তু তাই বলে কি সেটা তা'র নয়? সে দেশের মাঝে নিজকে বিলিয়ে দিয়ে নিবিড়ভাবে অনুভব করে সেটা তারই দেশ। অনুভূতি যার কম এটা উপলব্ধি কর্‌বার শক্তি তার নেই।

* * * *

কবিদের জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে আমরা ঐশ্বর্য্যের এই দিকটা বেশ বুঝ্‌তে পারি। তা'দের নিবিড় ঘন অনুভূতি বিশ্বের সব জঞ্জালের আবরণ পেরিয়ে কোন অতলে অবগাহন ক'রে যে সত্যের সন্ধান পেয়েছে সেটী হচ্ছে এই যে মানুষের জীবন শুধু বেঁচে থাক্‌বার জন্যই নয়। বেঁচে তো পশুপাখী ও থাকে। তা'রা ও অন্যকে ঠকিয়ে কাড়াকাড়ি করে বেশী খাবার জন্য, বেশী জমা করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে—তবে মানুষ তা'দের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হোল কিসে?

প্রকৃতি আমাদের চারদিকে কত আলো ঐশ্বর্য্য ও আনন্দের সম্ভার সাজিয়ে রেখেছে—মাধুর্য্যের আর সীমা নেই—আকাশে বাতাসে ফুলের সুবাসে তা'দের আকুতি মাখানো কিন্তু সেই বাণী শুন্‌তে বা বুঝ্‌তে পারে কয়জন? যে পারে সেই তা'দের জীবন মন দিয়ে গ্রহণ ক'রে ধন্য হয়। লুসি লারকম্ লিখেছেন, 'যদি ও একবিন্দু ভূমি ও আমার নয় তবু ও চারদিকে যা দেখ্‌ছি সবই আমার। ঐ বিশাল মাঠ, সুদূর আকাশ ফুলে ভরা বাগান ও বন বনান্তর সবই আমার। চার্লস্ ম্যাকে বলেছেন, 'রাশি রাশি ডেইজি ফুলের মধ্য দিয়ে যখন আমি পথ চলি তখন আমার মতো ঐশ্বর্য্যশালী খুব কমই আছে বলে মনে হয় প্রত্যেকটা ডেইজি ফুল এক এক টুকরা সন্ত-ঘুম-ভাঙ্গা নবীন প্রভাতের আলোর মতো আমার অন্তর বাহির উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। ফুলে ফলে আমি কোন লুকানো ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার খুঁজে পাই, বনের মর্ম্মরধ্বনিতে আমি কার মনমাতানো মধুর সুরের ঝঙ্কার শুন্‌তে পাই—আমি এমনই সুখী। আমার মতো ধনী কে আছে?

এসব কি শুধুই অসংবদ্ধ মনের প্রলাপ মাত্র বলে উড়িয়ে দেবো না, গভীর সত্য বলে মেনে নিয়ে সেই সত্য-সাধক কবিদের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাবো?

একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝ্‌তে পারি যে অধিকার দু' রকমের হোতে পারে, একটা হচ্ছে আইনের অধিকার আর একটা সেই মধুর ও চিরস্থায়ী অধিকার যা' আমরা ভালবাসা জ্ঞান ও রসগ্রাহিতার সাহায্যে লাভ করি। এই দু'রকমের অধিকারের মধ্যে প্রথমটাই কৃত্রিম ও ক্ষণস্থায়ী আজ আছে কাল নেই।

তাই বলে আইনের গণ্ডিটানা বিষয় সম্পত্তির যে কোনই মূল্য নেই তা' নয়! তবে ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু তার মূল্য—এর বেশী নয়। সভ্যতার পক্ষে এটা খুবই প্রয়োজনীয় বল্‌তে হবে। সমাজকে উন্নত বলি আমরা সেখানেই যেখানে আইন ও শৃঙ্খলা মানুষের ধন সম্পত্তি রক্ষার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করে তা'কে নিশ্চিন্ত হয়ে অন্য কাজ কর্‌বার সুবিধা দেয়। এ জিনিষটার যেখানে অভাব সেখানেই অরাজকতা, অবিচার ও বিশৃঙ্খলা এমনভাবে মাথা উঁচু করে ওঠে যে শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতা সেখানে কোনদিন ছিল বলে মনে হয় না। সমাজের স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য এ অধিকার খুবই প্রয়োজনীয় যেমন প্রয়োজন আহার ও নিদ্রা মানুষের বেঁচে থাক্‌বার জন্য কিন্তু এই প্রয়োজনের উপরেও প্রয়োজন আছে যার অভাব বাহির থেকে চোখে হয় তো পড়ে না, কিন্তু তিলে তিলে জীবনকে ব্যর্থতা দিয়ে ক্ষয় করে ধ্বংসের মুখে পৌঁছে দেয়। হঠাৎ সে চমকে উঠে দেখে টাকা দিয়ে যতই সে লোহার সিন্দুক ভর্‌তে চেয়েছে জমার ঘরে ততই তার শূন্যের সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু তখন আর সময় নেই, নিঃসম্বল অবস্থায়ই তাঁকে বিদায় নিতে হয়। যাওয়ার আগে সে জেনে যায় সহানুভূতি জ্ঞান ও ভালবাসা দিয়ে পাওয়া অধিকারই বেশী গভীর মূল্যবান ও সুন্দর যদিও তখন প্রতিকারের কোন উপায় থাকে না।

অন্তরের সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ সম্পূর্ণ উদাসীন। তারা চায় সুখ

সুবিধা, বিষয় আশয়—মানুষের মাঝে নিজের প্রতিষ্ঠা। মানুষের মনে কোন আসন পাবার ইচ্ছা তাদের নেই। হিংস্র পশুর মতো বিষয় সম্পত্তির অধিকার নিয়ে মারামারি কর্‌তে তারা লজ্জিত হয় না,—লজ্জিত হয় যদি হিংস্রতার প্রতিযোগিতায় তাদের পরাজয় ঘটে যদি ভাগের কোন কমতি হয়। এক শ জনের মধ্যে নিরানব্বই জনই অধিকার বল্‌তে বিষয় সম্পত্তির অধিকারই বুঝ্‌বে আর ধারণা করবার মতো শক্তি তাদের নেই কিন্তু যে অধিকার নিয়ে তারা এত মত্ত সেটা যে কত সঙ্কীর্ণ ও কৃত্রিম সে খেয়াল তাদের নেই।

খুব কম জিনিষই আমরা আইনের জোরে পেতে পারি। যা' না হোলে এক মিনিট ও বেঁচে থাকতে পারিনা তা'ও আইন আদালতের সাহায্যে দখল করে বেচা কেনা কর্‌তে শক্তিতে কুলোয়না। বিশ্বের প্রাণ আলো ও বাতাস কেড়ে নিয়ে অন্যকে তাতে বঞ্চিত করবার অধিকার আমাদের নেই কিন্তু যখন দেখি গর্ব্বে মত্তহ'য়ে মানুষ মানুষকে সেই জন্ম-গত প্রাপ্য হ'তে অমানুষিক উপায়ে বঞ্চিত কর্‌ছে তখন আর আশা কর্‌বার কিছু থাকে না। তথাকথিত ধনীর দল আলো বাতাসহীন রুদ্ধ কারাগৃহে তিলে তিলে চিরবঞ্চিত শ্রমিকদের রক্ত শোষণ কর্‌ছে,—এ অধিকার তা'দের দিল কে? অন্তর দেবতার বাণী অগ্রাহ্য ক'রে দিনের পর দিন তারা চির ইপ্সিত মনুষ্যত্বকে হারাতে বসেছে। দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করবার মতো ক্ষমতা তা'দের আছে স্বীকার করি কিন্তু প্রকৃতির উপর তাদের কতটুকু অধিকার? সজল কালো মেঘের রাশি যখন আকাশ ছেয়ে ফেলে—তারপরই প্রবল বৃষ্টিধারা যখন পৃথিবী ভাসিয়ে নিয়ে যাবার উপক্রম করে তখন কোথায় থাকে তা'দের শক্তির দম্ভ? এই যে চাঁদের টিপ কপালে প'ড়ে, তারার মালা গলায় দুলিয়ে বসুন্ধরা ছয়টী ঋতুতে নূতন বেশ-ধারণ করছে,—তার চারিদিক ঘিরে সূর্য্যাস্তের রঙীন সমারোহ—উষার শিশির-সিক্ত শোভা ও পাখীর কাকলি,—এই যে তা'কে ঘিরে রয়েছে অফুরন্ত আনন্দের ঝঙ্কার, আলো ও ঐশ্বর্যের বিপুল সম্ভার তা'র উপরে জোর খাটাবার মতো শক্তি আছে কার? সে মানুষের শক্তির বাহিরে সসম্ভ্রমে বিরাজ করছে। তবে কেন মানুষের অধিকারের ছোট্ট সীমা নিয়ে এত মাতামাতি, এত অহঙ্কার?

এই মানব সমাজ ও সমস্ত পৃথিবীর চিন্তাধারার উপরই বা আমাদের অধিকার কতটুকু?

পৃথিবীর সব কাব্য ছবি ও বাদ্যযন্ত্র যদি আমাদের থাকে তবু ও কাব্য শিল্প ও সঙ্গীতের জগতে আমাদের কতটুকু স্থান যদি না আমরা হীরা জহরত মণি মুক্তার মালা ত্যাগ করে সমস্ত মন প্রাণ পরম উৎসাহ ও আগ্রহে সেই সুন্দরের আরাধনায় ঢেলে দিতে পারি। আর এই আরাধনায় সিদ্ধিলাভ কর্‌তে হোলে চাই একাগ্রতা জ্ঞান ও প্রেম। এদের সাহায্যে যে ঐশ্বর্য্যই চয়ন করিনা কেন তা হ'বে আমার চিরদিনের—চিরকালের। আমার নিজের সত্ত্বার সঙ্গে মিশে তার কোন আলাদা স্বরূপ থাক্‌বে না—তবেই না আমার জীবন সার্থক হবে।

আইনের শক্তিতে অর্জ্জিত অধিকার মানুষকে দিন দিন সঙ্কীর্ণচিত্ত ও স্বার্থপর ক'রে তোলে। শুধু এই অভিশাপের রূপেই সেটা তা'র জীবনে আসে। যখন তার বিশেষ কোন সম্পত্তি ছিলনা তা'র দৃষ্টি ছিল আকাশের মতোই উদার ও বিস্তৃত। এই বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্যই সে নিজের ভেবে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করত কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে কোন রকমে সেটী অধিকার করল, তক্ষুনি সেই দৃষ্টি ঘুচে গিয়ে তার ছোট্ট অধিকারের সীমাটুকুতে আবদ্ধ হোল। তার যত বাসনা কামনা ও কল্পনা সব সেই টুকু ঘিরে—তা'র বাহিরের বিশাল জগত তার চোখে লুপ্ত হ'য়ে গেল। আপন বল্‌তে তা'র স্বোপার্জ্জিত সেই ক্ষুদ্র জগতটুকু ছাড়া আর কিছুই রইলনা। একে ঐশ্বর্য্য বলব না নিঃস্বতা বলবো, উন্নতি বলব, না অবনতি বলবো? একজন বিখ্যাত লেখক লিখেছেন, 'যখন আমি নিঃস্ব ছিলাম তখন ঐ গভীর বন, বিশাল মাঠ, অকূল সমুদ্র, তারাভরা অনন্ত আকাশ সবই আমার ছিল কিন্তু যখন আমি একটী বাড়ী ও বাগান সম্পূর্ণ আমার ব'লে পেলাম তখন আমার সেই দুটী ছাড়া আর কিছুই রইলো না।'

কবিদের সুগভীর চিন্তাধারা আমরা কেমন ক'রে আপন কর্‌তে পারি? রাশি রাশি বই কিনে আলমারীতে সাজিয়ে রাখ্‌লেই তা' হ'বেনা, বই পড়ে সেটা সম্পূর্ণ আয়ত্ত কর্‌তে হবে,— মন প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে হ'বে।

ওয়ালডেন উড্‌স্ ও ওয়ালডেন পণ্ডের উপর হেন্‌রি থোরোর কোন কর্ত্তৃত্ব ছিল না কিন্তু তিনি সেখানকার প্রত্যেকটা গাছ, ঝোপ, ফুল ও পাখীর খবর জান্‌তেন—তা'রা কেউ তার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়নি। ওয়ালডেন পণ্ডের পাড়ের প্রত্যেকটী পাথরের সঙ্গে তা'র মিতালী ছিল। সেই পুকুরের মসৃণ কালো জলে আলোছায়ার লুকোচুরি কেবল তা'র চোখেই ধরা পড়্‌তো। কে বলবে তা'র কোন অধিকার তা'দের উপর জন্মায় নি, যে টাকা দিয়ে কিনেছে সেই একমাত্র তা'দের মালিক?

জীবনকে যা' সুন্দর ও সরস ক'রে তোলে অর্থ ছাড়াও ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে আমরা তা' লাভ কর্‌তে পারি। সব চেয়ে সুখী বল্‌তেই আমাদের চোখের সামনে এক নধর ও কোমল দেহ ভোগবিলাসী ভদ্রলোকের চেহারা ভেসে ওঠে যা'র টাকা আছে দেদার—আলস্য আছে তার চেয়ে ও বেশী, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইংলণ্ডের সবচেয়ে সুখী ছিল, একজন সাধারণ বেতন ভোগী শ্রমিক। বাইরের কাজ ছাড়াও ছাব্বিশ বছর ধরে সে তার রুগ্ন স্ত্রীর পরিচর্য্যা ও ঘরের সব কাজ করতো। স্ত্রীকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত বলেই তা'কে কেন্দ্র করে কোন কাজ কর্‌তেই তার ক্লান্তিবোধ হোত না সেটা ছিল তার বিশ্রাম ও সুখ। তার বিবর্ণ রোগম্লান মুখে একটুক্‌রা হাসি ফোটাতে পার্‌লেও সে নিজকে ধন্য মনে কর্‌তো। স্ত্রী ও রুগ্ন হোলে ও স্বামীর মতোই সুখী ছিল। এমন অবস্থার লোক সুখী হয় কেমন করে? এর একমাত্র কারণ, দুজনের অন্তরই পবিত্র ও অকৃত্রিম প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। বাইরের দিকে নজর দেওয়ার দরকার তাদের হয়নি। একেই আমরা

বল্‌বো প্রকৃত ঐশ্বর্য্য। টাকার বিনিময়ে এ ঐশ্বর্য্য লাভ করা যায় না, তাই তো মানুষ এত অসুখী।

মহামানব যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন, 'যদি সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও কেউ আপনাকে হারায় তবে তার রইল কি?' মহম্মদও সেই চিরন্তন সত্যই প্রকাশ করেছেন। জীবনে কে কতটা পৃথিবীর উপকার করেছে তাই দিয়ে তার সম্পদের বিচার করা হয়। যখন সে সব ত্যাগ করে কোন অজানা দেশে রওনা হয়, মানুষ খোঁজ নেয় কতটা ধন সম্পত্তি সে রেখে গেল, আর কল্যাণময় ভগবানের দূত প্রশ্ন করে কতটুকু সৎকাজ সে জীবনে করেছে।

জ্ঞান ভক্তি ও প্রেমের অভাবেই জীবনে দারিদ্র্য আসে—অর্থের অভাবে নয়। যখন ভাবি টাকা দিয়ে মানুষের অভাব পূর্ণ করতে পাব্‌ব তখনই আমরা মস্ত বড় ভুল করি। দেহের চেয়েও মনের খাদ্যের প্রয়োজন যে বেশী।

ধনীই হই আর দরিদ্রই হই আমরা আমাদের অবস্থার ক্রীত দাস এটাই সব চেয়ে লজ্জার বিষয়। এই দাসত্ব ঘুচাবার একমাত্র উপায় হৃদয় মনকে সবল ও প্রসারিত করা। আত্মা যাদের পরিতৃপ্ত ও পার্থিব ঐশ্বর্য্যে নিস্পৃহ কোন অবস্থাতেই তাদের মনের কোন পরিবর্ত্তন হয়না। দারিদ্র্য ও বিপদ আস্‌লে তারা জীবনকে ব্যর্থ মনে করেনা,—তার ভিতর থেকেই পরম শ্রেয়কে আবিষ্কার করে নেয়।

যে নিজকে বশ করতে পেরেছে সেই পৃথিবী জয় করেছে। যেখানে যে অবস্থাতেই তাকে রাখোনা কেন সম্পদ কখনও তার ফুরোবে না। আবার যে নিজের অধীন, সমস্ত পৃথিবী অধিকার করলেও তার অধীনতা কখনও দূর হবার নয়। যে বছরের পর বছর ম্যামনকেই একমাত্র উপাস্য করে কৃপা লাভ করবার জন্য তার আরাধনায় সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছে, তার মতো হতভাগ্য আর নেই। অতোদিন ধরে সে পলে পলে আত্মাকে খর্ব্ব করেছে। বাতাসের মতোই স্বাধীন অন্তরকে টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে তাই জীবনের সুন্দর ও মধুর দিকটা উপভোগ কর্‌বার শক্তি তার কোথায়? আমাদের অন্তরই যদি রিক্ত থাকে সমস্ত পৃথিবীর অধিকারী হলেও আমরা রিক্তই থেকে যাবো চিরকাল। পূর্ণের পায়ের পরশ পাবার শুভক্ষণ আর জীবনে আস্‌বেনা, কিন্তু অন্তরের সম্পদ চয়ন করতে পারলে আর কিসের ভাবনা? আমরা তখন আপনাতেই পরিপূর্ণ, সব অভাব দূর হয়ে তখন কাঙ্গালপনা আমাদের ঘুচ্‌বে।

মডার্ণ রিভিউ' হইতে জে, স্তাওার ল্যাণ্ড লিখিত 'Wealth and Poverty' প্রবন্ধের অনুবাদ।

গ্রন্থ-পরিচয়

উদয়ন—সম্পাদক ও পরিচালক—শ্রীঅনিলকুমার দে। সচিত্র মাসিক, কার্ত্তিক, প্রথমবর্ষ, সপ্তম সংখ্যা।

আমাদের এই সহযোগীকে আমরা প্রথমাবধি বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখিতেছি, প্রারম্ভেই এত চিত্র সম্ভার, ও উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধসহ ইহার আবির্ভাব আমাদের মনে যতখানি আনন্দ দিয়াছিল, সেইসঙ্গে একটু আশঙ্কার ও উদ্রেক করিয়াছিল, 'উদয়ন' তার উদয়কালের আদর্শ শেষ পর্য্যন্ত বজায় রাখিতে পারিবে না, আজ সপ্তমসংখ্যা পত্রিকাখানি হাতে লইয়া বুঝিতেছি, পত্রিকাখানা কত দ্রুত উন্নতির পথে চলিতেছে, আমাদের ভয় অমূলক সপ্রমাণিত হইয়া আমরা আনন্দিতই হইয়াছি।

আলোচ্য সংখ্যায় একখানি ত্রিবর্ণ, তিনখানি দ্বিবর্ণ চিত্র আছে। বাংলার খ্যাতনামা লেখক লেখিকা-গণের রচনা-সম্ভারে পত্রিকা সমৃদ্ধ। আমরা ইহার উত্তোরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

হোমিওপ্যাথি পরিচারক—সম্পাদক ডাঃ অজিত শঙ্কর দে, সহ সম্পাদক ডাঃ রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক—হোমিওপ্যাথি সার্ভিং সোসাইটি (ইণ্ডিয়া) বরাহ নগর, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ১৶০ আনা।

ইহা একখানি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রণালী সম্বলিত মাসিক পত্রিকা।

কার্ত্তিক সংখ্যায় সাধারণের উপযোগী মাত্র একটি পথ্যাকার প্রবন্ধ 'শিশু কলেরা' পড়িয়া প্রীত হইলাম। এরূপ প্রবন্ধ আরও প্রকাশিত হইলে সাধারণে বিশেষতঃ মায়ের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারেন এবং সন্তানগণের রোগে ডাক্তার ব্যতীত নিজেরাই ঔষধ দিতে পারেন।

পত্রিকার অন্যান্য প্রবন্ধ হোমিওপ্যাথিক ছাত্র ও গ্রাম্য চিকিৎসকগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হয়।

বর্ত্তমান অর্থ সঙ্কট দিনে সুলভ হোমিওপ্যাথি প্রচারকারী পত্রিকার প্রয়োজন আছে। এই পত্রিকাখানির বহুল প্রচার কামনা করি। পত্রিকার ছাপা ও কাগজ ভাল।

শ্রীরেখা রায়

মুক্তিমন্ত্রে মুস্‌লিম নারী—মোহাম্মদ মোদাব্বের প্রণীত। ১৪নং কড়েয়া রোড, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—বার আনা।

আলোচ্য গ্রন্থে তুরস্ক, পারস্য, ইরাক, আফগান ও মিশরের নারী-প্রগতির ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমানযুগে এরূপ গ্রন্থ মূল্যবান ও অতি প্রয়োজনীয়।

গৃহ-গণ্ডির বাহিরে যে বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্র রহিয়াছে, সে ক্ষেত্রও যে নারীর কল্যাণ হস্তস্পর্শে সবল ও সুন্দর হইয়া উঠে, দেশের মুক্তি সংগ্রাম তখনই সার্থক ও সফল হয় যখন নর-নারী উভয়ে সে সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে, নর-নারী উভয়ের কর্ম্ম প্রচেষ্টায় দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীক উন্নতি ও কল্যাণ নির্ভর করে—ইহারই সাক্ষ্য দিয়াছে এ গ্রন্থের মুস্‌লিম নারী-প্রগতি। ভারতের বাহিরে মুস্‌লিম নারীর দিকে দিকে কি মহতী কর্ম্ম

প্রচেষ্টা, দেশের বিরুদ্ধশক্তি যে তাহাদের প্রগতিকে রোধ করিতে পারে নাই—ইহাই গ্রন্থকার সবল ও সতেজ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। এ গ্রন্থ বাংলার প্রতি নারীকে পড়িতে অনুরোধ করি।

ভারতের বর্ত্তমান নারী আন্দোলনযুগে এ গ্রন্থের মূল্য আছে। এই পুস্তক পাঠে বাংলার মুসলমান নারী সমাজ বুঝিতে পারিবেন ভারতের বাহিরে তাঁহাদের সমধর্ম্মী নারী আজ কত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইয়াছেন এবং তাঁহারা কোথায়।

এরূপ গ্রন্থ আশাকরি ভারতের তথা বাংলার গৃহ-কোণে অবরুদ্ধা নারীকে সচেতন করিবে, প্রেরণা দিবে ও বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর করিবে। পুস্তকের প্রচ্ছদপটটী অতি সুন্দর ও গভীর ভাবোদ্দীপক। বিদুষী মহিলাদের ও দেশের নেতাদের চিত্রগুলি গ্রন্থখানির শ্রী আরও বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীসুরমা দাস

প্রেমের কাহিনী—শ্রীশৈলেশচানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দোপাধ্যায়। ৮নং রাধামাধব গোস্বামী লেন, কলিকাতা।

উপন্যাসটীর নাম সার্থক হইয়াছে। আগাগোড়াই প্রতুল ও রেণুকার প্রেমের কাহিনী। রেণুকার জঘন্য চাতুরীর পরিচয় পাইয়াও প্রতুলের মন তাহার উপর এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিরূপ হইল না,—প্রেমের এমনই মহিমা! বইটী বিশেষ ভাল লাগিল না তবে লেখকের ভাষা বেশ ঝরঝরে—কোথাও আড়ষ্ট ভাব নাই। উপাখ্যানভাগ আর একটু সুন্দর হইলে বইটী খুবই তৃপ্তিদায়ক হইত সন্দেহ নাই। ছাপা ও বাঁধাই বেশ ভাল।

শ্রীসরস্বতী গুপ্তা

তরুণ—সম্পাদক শ্রীহৃষীকেশ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীতারকদাস মিত্র ৩১২নং জি, টি রোড, উত্তরপাড়া গ্যাঞ্জেস্ প্রেস হইতে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যা ১০। বার্ষিক ১৷০।

তরুণ—নবজাগ্রত বাঙ্গালীর প্রাণেএক নূতন আনন্দ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিবে। এই পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য খুবই গুরুতর—একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমরা আশা করি যে ইহা আরো সমৃদ্ধ ও সুন্দর হইয়া প্রকাশিত হইবে। এই পত্রিকার সমস্ত আবরণ উন্মুক্ত করিয়া বাঙালীর ভাবধারাকে মিশ্রিত করিয়া দেশ ও সাহিত্যের সহিত গভীর যোগ স্থাপন করিতেছে। আমরা ইহার কল্যাণ কামনা করিয়া তরুণকে অভিনন্দিত করিতেছি।

ফাল্গুনী—সম্পাদক শ্রীপ্রভাকর মুখোপাধ্যায়। বান্ধব পুস্তকালয়, ১৭নং শিবপুর রোড হাওড়া হইতে প্রকাশিত। প্রতিসংখ্যা ৵১০। বার্ষিক ১৷৵০।

পত্রিকাখানা উপেক্ষা করার মত নয়। ইহাতে অনেক বিষয়েরই আলোচনা করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে ইহা শোভনরূপ ধারণ করিবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি।

শ্রীবিনয় সেন

বিজলী—কার্ত্তিক, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, সম্পাদক শ্রীবাসুদেব বন্দোপাধ্যায়। প্রকাশালয়—সান্যাল বুক ষ্টোর ৭৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বার্ষিক ৫৲ টাকা।

এই চমৎকার মাসিক পত্রিকাকে প্রথমে একখানা ছবির বই বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম, এমনই সুদৃশ্য উহার বহিরাবরণ। দু পাতা খুলিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি, ছবির বইএর অন্তরে বিজ্ঞান-তথ্য। কিন্তু বিজ্ঞান-তত্ত্বও এমন অপূর্ব্ব সরল ও মনোরম ভাষায় লেখা অত্যন্ত কঠিন, তদপেক্ষা কঠিন এই অমূল্য প্রবন্ধগুলি একত্র সংগ্রহ, এ বিষয়ে সম্পাদক মহাশয় অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

বর্ত্তমান সভ্যতা অতি দ্রুতগতিতে চলিতেছে, কিন্তু ইহার মূলে আছে বৈদ্যুতিক শক্তি, কিন্তু বাংলা ভাষায় এই বিদ্যুৎ সংক্রান্ত একখানা কাগজের বিশেষ অভাব ছিল 'বিজলী' এই অভাব পূরণ করিয়াছে। আমাদের জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপারে আজকাল বিদ্যুতের সাহায্য না লইয়া আমরা পারি না, ক্রমেই বিদ্যুতের আরও প্রচলন হইবে, এমন সময়ে কাগজখানার আবির্ভাব কত সময়োচিত হইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস মহিলাসমাজেও কাগজখানি অত্যন্ত সমাদর পাইবে, এমন সরল ও মধুর ভাষায় 'বিজলী'র কথা আমাদিগকে ইতিপূর্ব্বে কেহ বলেন নাই আমরা এই নব প্রয়াসের উন্নতি কামনা করি। এইসঙ্গে একটী কথাও না বলিয়া পারিলাম না, এই অভিনব পত্রিকাখানাতে ২।৩টী তৃতীয় শ্রেণীর গল্প দেওয়ায় ইহার মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

আমোদ—সম্পাদক শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত বি এ, সহ সম্পাদক শ্রীদিলীপ কুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীজানকী বসু।

ইহা তরুণ সমাজের মুখপত্র একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা। এর শারদীয়া সংখ্যা বাংলার খ্যাতনামা লেখক লেখিকার লেখায় সমৃদ্ধ। এসংখ্যায় আছে অনেকগুলি কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, গানের স্বরলিপি ও দেশী শিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ।

'মিলনের শিক্ষা,' 'দেশী ছবির কথা' ও 'মানুষে মানে' প্রবন্ধ পড়িয়া বেশ ভাল লাগিল।

শ্রীগিরিজা কুমার বসুর 'টুক্‌রো' লেখার মধ্যে কয়েকটী টুকরো কথা অবান্তর এবং এগুলি লেখার কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয়না, ইহা আমোদও দেয় না। শ্রীশান্তিসুধা ঘোষের 'অপারগ' ছোট গল্পটীর মধ্যে লেখিকা সাহিত্য সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন তাহা সাহিত্যিকদের অবশ্য গ্রহণীয়।

শ্রীযুক্তা ঘোষের সহিত আমরাও বলি যে আমাদের সাহিত্য যেন শুধু ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিচ্ছবি না হয়, উহা যেন জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়। জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তাধারা সাহিত্যে ফুটিয়া উঠুক। এ পত্রিকা খানির 'আমোদ' নাম যেন সার্থক হয়। 'আমোদ' বাংলার নিরানন্দ ঘরে ঘরে যথার্থ আনন্দ বহন করিয়া লইয়া চলুক ইহাই কামনা করি।

শ্রীআভা দেবী

হারমনিয়ম ও কণ্ঠ-দীপিকা—প্রথম খণ্ড, সঙ্গীত শিক্ষক শ্রীবিরাজ মোহন দাস প্রণীত এবং ঢাকার প্রসিদ্ধ হারমোনিয়ম্ প্রস্তুত কারক ও বিক্রেতা 'যতীন এণ্ড কোং' কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১৲এক টাকা।

ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে ঢাকা হ'তেও স্বরলিপি পুস্তক বের হ'ল। এজন্য গ্রন্থকার ও প্রকাশক উভয়েই প্রশংসার্হ।

এই পুস্তকে সঙ্গীতের ঔপপত্তিক ভাগ বেশ সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করে লেখা হয়েছে। 'হস্ত ও কণ্ঠ সাধন' প্রণালী, এবং ১৯টি বিভিন্ন রাগ রাগিণীর যেসকল অতি সহজ গদের স্বরলিপি দেওয়া হয়েছে তা রীতি মত সাধলে প্রথম শিক্ষার্থীরা বিশেষ উপকৃত হবেন। এ ছাড়া গ্রন্থকার ১০টী বাংলা ও ১০টী হিন্দুস্থানী গানের অতি সরল স্বরলিপি দিয়ে গ্রন্থ শেষ করেছেন হিন্দুস্থানী গান ক'টি দেওয়া খুবই ভাল হয়েছে, কারণ আজকাল উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শেখার দিকে অনেকেরই বেশ ঝোঁক দেখা যায়। ঐ গান ক'খানির সঙ্গে দু'একটি করে তানের স্বরলিপি দিলে আরও ভাল হ'ত।

আবহকাল আকার মাত্রিক স্বরলিপিরই বিশেষ প্রচলন হচ্ছে, গ্রন্থকার সেকেলে দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি না দিয়ে উহা অবলম্বন করলেই ভাল করতেন।

গ্রন্থকার 'উদারা', 'মুদারা', ও 'তারা', এই তিনটিকে 'গ্রাম' বলেছেন, কিন্তু সঙ্গীত শাস্ত্র মতে উহারা গ্রাম নহে,—'সপ্তক' (ষড়জ হতে নিষাদ পর্য্যন্ত ৭টি স্বরের সমষ্টিকে 'সপ্তক' বলা হয়)। গ্রাম হয়েছে তিনটি, যথা—'ষড়জ গ্রাম' 'মধ্যম গ্রাম', 'গান্ধার গ্রাম'—

'ষড়জ মধ্যম গান্ধারা স্ত্রয়ো গ্রামা মতা ইহ।"

—সঙ্গীত নায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সঙ্গীত-চন্দ্রিকা', ১ম ভাগ, ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থে যে সকল রাগ রাগিনীর গৎ দেওয়া হয়েছে তাদের বেলায় 'ঠাট কল্যাণ', 'ঠাট কাফি', 'ঠাট বিলাওল' ইত্যাদি এইরূপে না লিখে প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন ঠাটগুলি দেওয়া উচিত ছিল, তা হ'লে শিক্ষার্থীদের 'ঠাট' সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হ'ত সহজে।

'বেহাগ' রাগিনী গাইবার সময় 'রাত্রি ২য় প্রহর' (সমালোচ্য গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠা) নহে, রাত্রি ৩য় প্রহর অর্থাৎ রাত্রি ১২টা থেকে ৩টা পর্য্যন্ত।

'ভয়রোঁ' রাগ গাইবার সময় 'প্রাতঃকাল' (২২ পৃঃ) না লিখে রাত্রি ৪র্থ প্রহর অর্থাৎ রাত্রি ৩টা থেকে ভোর ৬টা লেখাই সমীচীন।

সমালোচ্য গ্রন্থে 'অস্থায়ী' লেখা হয়েছে। প্রথমে মনে হ'ল এটি ছাপার ভুল, কিন্তু পরে দেখা গেল যে গ্রন্থের সর্ব্বত্রই ঐরূপ আকার যোগ করা হয়েছে। প্রকৃত শব্দটী হচ্ছে 'আস্থায়ী' (আ+স্থা+ণিন্) আতিষ্ঠতি আশ্রয়তি সম্বন্ধাতীত্যর্থঃ যঃ অংশঃ। অর্থাৎ যে (সুর) অপরের (অপর সুরের) সহিত সম্বন্ধ হয়। শব্দকল্পদ্রুমে 'আস্থা' শব্দের 'আলম্বন' অর্থাৎ আশ্রয় অর্থ দৃষ্ট হয়। সুবল মিত্র মহাশয়ের 'সরল বাঙ্গালা অভিধানে', স্বর্গীয় অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের 'সঙ্গীত সারে', সঙ্গীত নায়ক শ্রীযুত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সঙ্গীত চন্দ্রিকায়, স্বর্গীয় দক্ষিণাচরণ সেন মহাশয়ের 'রাগের গঠন শিক্ষা নামক গ্রন্থে, স্বর্গীয় কাঙ্গালীচরণ সেন মহাশয়ের 'ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপিতে' স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের গ্রন্থে 'আস্থায়ী' শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে, 'অস্থায়ী' নহে।

ইউরোপীয় সঙ্গীত-বিদ্যা বিশারদ Mr. Fox Strangways মহোদয় তাঁর 'The Music of Hindusthan' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের বহুস্থানে 'আস্থায়ী' শব্দই গ্রহণ ক'রেছেন,, কেবল এক জায়গায় 'স্থায়ী' শব্দ লিখেছেন ('stayi') তাও বিকল্পে। আজ কাল 'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা' নামক মাসিক পত্রিকায় ও 'আস্থায়ী'ই লেখা হয়, তবে কেউ কেউ সময় সময় 'স্থায়ী' ও লেখেন বটে। Mr. Fox Strangways সমগ্র ভারতবর্ষ পর্য্যটন করে বহু ওস্তাদ ও গুণীদের কাছে সংবাদ নিয়ে তাঁর উক্ত গ্রন্থ লিখেছেন।

প্রথম শিক্ষার্থীদের বিশেষতঃ যাদের স্বাভাবিক সুকণ্ঠ নেই তাদের পক্ষে হারমোনিয়ম্ যন্ত্র বিশেষ উপযোগী গ্রন্থকারের এ কথা খুবই ঠিক। হারমোনিয়ম পতিতপাবন যন্ত্র। কিন্তু এ যন্ত্রের দ্বারা প্রকৃত সুর বোধ হয় না, ইহা উচ্চাঙ্গের ভারতীয় সঙ্গীতের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। গ্রন্থকারও এ কথা লিখেছেন। উচ্চাঙ্গের ইউরোপীয় সঙ্গীতেও ইহা ব্যবহৃত হয় না। Mr. Fox Strangways উচ্চাঙ্গের ভারতীয় সঙ্গীতে এই যন্ত্রের ব্যবহারের দোষ অত্যন্ত তীব্র ভাষায় কীর্ত্তন করেছেন।

বইখানাতে ৩৪টি ছাপা ও বানান ভুল রয়ে গেছে, যেমন ৪৩ পৃষ্ঠায় "আঁখি বারি ঝড়ি ঝড়ি পড়িছে ধরায়," এখানে ঝরি ঝরি হবে।

দেশপ্রেমিক বিঠল ভাই প্যাটেল

এ বইর ছাপা ও কাগজ উত্তম। আমরা উপসংহারে আবার বলি বইখানা প্রথম শিক্ষার্থীদের বিশেষ সাহায্য করবে।

সরল পোল্ট্রী পালন—শ্রীঅজয় নাথ রায়। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক দি গ্লোব নার্শারী, ৯৫ নং রামধন মিত্রের লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১৲।

এ পুস্তকে গৃহপালিত মুরগী হাঁস প্রভৃতির চাষ ও লালনপালন এবং সরল চিকিৎসা প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এরূপ ধরণের গ্রন্থ আমরা এই প্রথম দেখিলাম। লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়। পুস্তকখানি পাঠ করিলে সকলেই এ বিষয়ে শিক্ষালাভের সাথে আনন্দ উপভোগ করিবেন। গ্রন্থকারের নানাস্থান হইতে সঙ্কলন বেশ সুন্দর হইয়াছে। কিরূপে বিশেষ খাদ্য দানে সবল হৃষ্টপুষ্ট মুরগী তৈরী করিয়া ব্যবসাক্ষেত্রে লাভবান হওয়া যায় গ্রন্থকার বিশদরূপে তাহা এ পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আরও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় পুস্তকে রহিয়াছে। যাহারা এ ব্যবসায় নিযুক্ত হইতে চান তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে গ্রন্থখানি ক্রয় করিতে বলি।

বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের দিনে এ গ্রন্থের মূল্য আছে। পুস্তকের ভাষা ও ব্যাখ্যা বেশ সরল। ছাপা ও কাগজ মন্দ নহে।

শ্রীকুন্তলা গুপ্তা

মহামতি বিঠলভাই প্যাটেল

শ্রীসরস্বতী দাশ

দেশ প্রেমিক বিঠলভাই প্যাটেল আর এ জগতে নাই। যদিও অনেকদিন হইতেই তিনি অসুখে ভুগিয়াছিলেন এবং এই অশুভ আকাঙ্ক্ষা যে আমাদের মনে কখনও উঁকি দেয় নাই তা নয় কিন্তু সত্যি যে এত তাড়াতাড়ি এই সংবাদ আমাদের শুনিতে হইবে তাহা ভাবি নাই। দেশপ্রিয়ের মৃত্যুর পর বৎসর না যাইতেই দুর্ভাগা আমরা তাঁহাকে হারাইলাম। ভারতের এ দুঃসময়ে তাহার মত দেশ নেতার অভাব কে পূর্ণ করিবে জানিনা।

গুজরাট জেলার অন্তর্গত নদিয়াবাদ তালুকের অধীন করমসাদ গ্রামে বিঠলভাই প্যাটেলের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম জাভের ভাই প্যাটেল। বল্লভ ভাই প্যাটেল তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিঠল ভাই বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া এই ব্যবসায়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখান কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই তাঁহার প্রতিভার সবচেয়ে বেশী বিকাশ হইয়াছিল। তাঁহার দৃঢ় ও গভীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ মতামতের জন্য সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত।

মণ্টেগু চেমস্ ফোর্ড শাসন সংস্কারের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেন।

১৯২৩ সালে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজী সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ডেপুটী লিডার নিযুক্ত হন। ১৯২৫ সালের পরিষদে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া তিনি সর্ব্বপ্রকার নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিয়া ঐ পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৯২৬ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে ও তিনিই পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচিত হন; ১৯২৭ সালে ও তিনি আবার পরিষদের সভাপতি মনোনীত হন। চীনে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের প্রস্তাবে তিনি যে মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে সমস্ত দেশবাসী মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির নির্ম্মাল্য প্রদান করিয়াছিল। তাহারই ঘোর বিরোধীতায় জনরক্ষা আইন অবশেষে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল।

১৯৩০ সনে ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি পদ পরিত্যাগ করিয়া তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। গ্রেপ্তারের পর রহস্য করিয়া তিনি বলেন, 'এত দিনে আমি আমার সম্মান ও পেনসন্ লাভ করিলাম'। মুক্তিরপর স্বাস্থ্যলাভ করিবার জন্য বিলাত যান পরে ভারতে ফিরিয়া আসিলে ১৯৩২ সনের আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইবার সঙ্গেই জরুরী অর্ডিন্যান্স আইন অনুসারে তাঁহাকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। দুই মাস পরে ছাড়িয়া দিলে তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন। তাহার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাহা সত্বেও তিনি আয়র্লণ্ডে গিয়া দুইবার মিঃ ডি, ভ্যালেরার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আমেরিকায় ও তিনি ভারতের পক্ষে প্রচার কার্য্য করিয়াছিলেন। শেষে ভিয়েনাতে আসিয়া ভাঙ্গা স্বাস্থ্য তাঁর আর জোড়া লাগিল না। সুদূর ভিয়েনাতে আত্মীয় স্বজন বিচ্যুত হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি ভারতের কল্যাণ কামনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শূন্য আসন শীঘ্র কেহ পূর্ণ করিতে পারিবে বলিয়া ভরসা হয় না।

শিক্ষা-বিভাগের পঞ্চবার্ষিক রিপোর্ট

বাংলা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের গত পাঁচ বৎসরের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, ইহাতে প্রকাশ এই সময়ে বাংলা দেশ শিক্ষায় অবনতির দিকে গিয়াছে, গিয়াছে, উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা গড়ে ২৩৮ জন মাত্র, কলেজে ছাত্র সংখ্যা ২২,৪২০ হইতে ১০,৭৪৪ পর্য্যন্ত নামিয়াছে, সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, রাজনৈতিক আন্দোলন বিশেষভাবে আইন অমান্য ও বিপ্লব আন্দোলনই এই অবনতির কারণ, সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক দুরবস্থা তো আছেই।

অর্থাভাব শিক্ষা বিস্তারের প্রধান বাধা আমরা মানি কিন্তু একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই, জাতির জীবনে সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য শিক্ষা সমস্যা সমাধান করা। অন্যান্য বিভাগে যতদূর সম্ভব ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া এমনকি ক্ষতি করিয়াই শিক্ষা প্রচারে সরকারের ব্রতী হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে ব্যয়-সঙ্কোচের প্রধান ধাক্কা সামলাইতে হইতেছে শিক্ষাবিভাগেরই। প্রাথমিক শিক্ষা এখন পর্য্যন্ত বাধ্যতা-মূলক হইতে পারিল না। দেশে সরকারী স্কুলের সংখ্যা অতি নগণ্য, যা যা-প্রাপ্ত স্কুলগুলি কোনরূপে টিকিয়া আছে, কিন্তু বে-সরকারী স্কুলের অবস্থাই অতি শোচনীয়, পূর্ব্বে জনসাধারণের নিকট কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য সাহায্য পাওয়া সম্ভব ছিল, বে-সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি, ছাত্রবেতন ও এই সাময়িক দানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু এখন যে দেশের অবস্থা তাহাতে সেরূপ সাহায্য পাওয়া আশা নাই। সুতরাং সরকারী সাহায্যের পরিমাণ যথাসাধ্য বাড়াইয়া বিদ্যালয়গুলি রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

সরকারী বিদ্যালয়গুলির সাহায্য কমাইয়া বে-সরকারী বিদ্যালয়ে সাহায্য করা উচিত, অর্থাভাবে সেই স্কুলে শিক্ষার মান (standard) ও কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। দেশের সরকারী, বে-সরকারী ও সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলের আয় ব্যয় দেখিয়া এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়।

তাছাড়া আমাদের মতে বিদ্যালয় পরিদর্শক বিভাগের জন্য যে ব্যয় হয়, তাহার অনেকাংশের তেমন প্রয়োজন নাই, প্রতি স্কুলেরই কমিটি আছে, তাছাড়া স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ আজকালকার দিনে স্কুল উন্নতির জন্য যথাসাধ্য

চেষ্টা করিয়া থকেন, নতুবা ছাত্রসংখ্যা বাড়েনা। পরিদর্শকগণ বৎসরে এক আধবার গিয়া আর তেমন কি করিতে পারেন? এই টাকাটা বরং স্কুলের সাহায্য করিলে বিদ্যালয়ের উন্নতি হয়।

রিপোর্টে প্রকাশ নারীশিক্ষার কিছু উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু আমাদের নিকট এই শিক্ষাপ্রচার অতি সামান্য বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানে নারীশিক্ষার জন্য চারিদিকে যেরূপ চেষ্টা হইতেছে বলিয়া শুনা যায় তাহা সত্ত্বেও যে আশানুরূপ নারী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল না তাহাই আশ্চর্য্য।

পুত্রকে সংযত করিতে অসমর্থ

(১) ঢাকার পি-ডবলিউ-ডি অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেট ইঞ্জিনিয়ারের কেরাণী শ্রীযুক্ত মনোমোহন মল্লিককে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে, তিনি তাঁহার পুত্র জীবনকৃষ্ণ মল্লিকের গতিবিধি সংযত করিতে পারেন নাই। জীবনকৃষ্ণ মল্লিক ঢাকা জেলে অর্ডিনান্স বন্দী।

(২) মিঃ গ্রাস বি আক্রমণের মামলায় শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ দে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত, তাঁহার ৬০ বৎসর বয়স বৃদ্ধ পিতা শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দে মাসিক ৫০ টাকা পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন, পুত্রকে সংযত করিতে পারেন নাই অভিযোগে গভর্ণমেণ্ট তাঁহার পেন্সন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তবে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ২০৲ ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(৩) ঢাকা স্কুল পরিদর্শক বিভাগের প্রধান কেরাণী শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র রায় তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহার পেন্সন ও কম করিয়া দেওয়া হইবে। প্রকাশ, তিনি তাঁহার পুত্রগণ ও ভ্রাতষ্পুত্রের গতিবিধি সংযত করিতে পারেন নাই, তাহারা সকলেই অর্ডিনান্স বন্দী।

পুত্রের অপরাধে পিতার এরূপ দণ্ড আজকাল সাধারণ ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমরা ঢাকার কয়েকটী ঘটনার মাত্র উল্লেখ করিলাম। বাইবেলে আমরা পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় যে পিতার পাপ সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত বর্ত্তিবে, কিন্তু আজ কাল যুগ বদলাইয়া গিয়াছে, তাই উল্টা ব্যবস্থা, দণ্ডাংশের বিষয় লইয়া আমরা কিছু বলিব না তবে শাস্তিদানের অন্যতম উদ্দেশ্য যদি অপরাধ হ্রাস করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা ইহা কিরূপ কার্য্যকরী হইবে তাহাই চিন্তাব বিষয়।

আজকাল জীবন সংগ্রাম যেরূপ তীব্র তাহাতে কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছাদের ব্যবস্থা করিতে সকলেরই অস্থির হইতে হয়, সকাল সন্ধ্যা তাহার জন্যই যায়, তাহার পরে এমন শক্তি বা সময় থাকে না যে পুত্রের গতিবিধি নজরে রাখিতে পারা যায়, একার্য্য যে কিরূপ কঠিন তাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জানেন সি, আই, ডি বিভাগের কর্ম্মচারীগণই। তাঁহারা ইহার জন্য উচ্চ বেতন পান, সারা দিনরাত্রি এইজন্য অসাধারণ পরিশ্রম করেন, কিন্তু তথাপি প্রকৃত অপরাধী বাহির করিতে অধিকাংশ সময়ই ব্যর্থ হন। এই যে এত যুবকগণ গ্রেপ্তার হন ও অনেকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি লাভ করেন, এই যে সহরের যখন তখন খানাতল্লাস লাগিয়াই আছে, এসব তাঁহাদের কাজের ব্যর্থতারই পরিচায়ক, ইহাতে নিরপরাধীই লাঞ্ছিত হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ফলে পুলিশের প্রতি অসন্তোষ বর্দ্ধিত হইতেছে। পিতারা তাঁহাদের গৃহের ও সংসারের কার্য্যশেষে পুত্রেরউপর খবরদারি করিয়া কতটুকু কি করিতে পারিবেন, অনর্থক পিতা পুত্র সম্বন্ধ সন্দেহে, শাসনে, সতর্কতায় আবিল হইয়া উঠিবে। আর নাবালক পুত্রের গতিবিধি বিচারে এ ব্যবস্থার তবু একটা হদিস্ পাওয়া যায়, বয়স্ক পুত্রকে কতটুকু শাসন করা সম্ভব?

অর্ডিনান্স বন্দীর অপরাধের বিষয় কর্ত্তৃপক্ষ ও প্রমাণ করিতে পারেন না, কর্ম্মব্যস্ত, সংসার-ভার-প্রপীড়িত

পিতা সরকারের চেয়ে কতখানি বেশী সংবাদ রাখিতে পারিবেন ? শুধু সন্দেহ করিয়া হয় তো পুত্রের ও স্বীয় জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলিবেন।

সন্ত্রাসবাদদমনের অভিনব উপায় নির্দ্দেশ

মেদিনীপুরের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে দেশের সর্ব্বসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রত্যেকেই আন্তরিক দুঃখিত, সরকার সন্ত্রাসবাদদমনের নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন, দেশবাসী ও সহযোগিতা করিতে ত্রুটী করে নাই। এদিকে বিবেচনার অনেক কথা আছে। উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও স্থিরভাবে যে সমগ্র বিষয় বুঝিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে তাহার কার্য্যই ফলপ্রসূ হয় নতুবা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে, আসল ব্যাধির প্রতিকার হয় না।

উন্মাদকে সংযত রাখিতে পারে কেবল স্থির মস্তিষ্ক ব্যক্তি,—উন্মাদ নয়, স্বাস্থ্যবান্ সেবকই পীড়িতকে রোগমুক্ত করিবার সামর্থ্য রাখে. বিপ্লববাদ—সন্ত্রাসবাদ দেশের একটা অস্বাভাবিক অবস্থা,—এবং প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে হইবে, বিশেষ ধীরতার বিচক্ষণতার সঙ্গে এমন কি অনেকখানি হৃদয়-সম্পদ লইয়াই। কিন্তু এই সহজ, সরল সত্যটী সকলে বুঝিতে পারে না।

সম্প্রতি ষ্টেটম্যানের এক ইয়োরোপীয় পত্র প্রেরক সন্ত্রাসবাদীদিগের দমনের নিশ্চিত উপায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটলী, আইরিশ ফ্রিষ্টেট প্রভৃতির নজির দিয়াছেন, তাহার মতে ভবিষ্যতে কোন ইংরাজ নিহত হইলে দুই বা ততোধিক মেদিনীপুরের জেলবাসীকে লইয়া দেওয়ালের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া সকলের সম্মুখে গুলি করা উচিত।

আর একজন আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ফাঁসি দেওয়া উচিত বলিয়াছেন।

এসব হইতেছে ক্রোধের প্রকাশ—যুক্তি নয়, কিন্তু তাহা হইলেও এই উক্তির তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত—সরকার পক্ষ হইতেই, কারণ উহাতে যে বিষ উদ্গীরণ হয়, তাহাতে বিদ্বেষ-বৃত্তি সবিশেষ জাগাইয়া দেয় এবং তাহার ফলভোগ করিতে হয় সরকারকেই, দেশবাসীর কপালেও লাঞ্ছনার সীমা থাকে না।

মধ্যযুগে এই বর্ব্বর উক্তি শোভা পাইত, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে সভাপদবাচ্য কোন দায়িত্ব-জ্ঞানশীল ব্যক্তি এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারে না, একথা বুঝিবার মত চিন্তাশক্তির যাহার অভাব, তাহাকে আর কি বলা যায়।

ইংরেজ নারী কর্ত্তৃক ভারতবাসীকে বিবাহ

মিস্ জে, সেকার্ড ও লেডি ম্যাকড ইংরেজ নারীদিগের ভারতীয় স্বামী গ্রহণে সতর্ক করিয়াছেন, তাঁহাদের পত্রে প্রকাশ, এই ইংরেজ নারীগণের বিবাহিত জীবন অত্যন্ত দুর্গতিময় হইয়া পড়ে, তাঁহারা স্বামীর পরিবারে গৃহীত হন না, স্বামীগণও আত্মীয়-স্বজনকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বেকার জীবন যাপন করেন, সুতরাং পত্নীদের ভাগ্যে অশেষ দুঃখক্লেশ থাকে। জেনেভার ইন্‌টারন্যাশানাল ক্লাব হইতে মিঃ আর, কে করিয়ান লিখিয়াছেন, যে ভবিষ্যতে ভাল ব্যারিষ্টার কিম্বা ডাক্তার হইয়া সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হইবে, এরূপ প্রলোভন দেখাইয়া ইংরেজদিগকে বিবাহে স্বীকৃত করা ভারতীয়দের পক্ষে অনুচিত।

বিদেশী বা বিদেশিনী বিবাহের গতি রোধ করা এ যুগে সম্ভব হইবে না, আন্তর্জাতিকতা এখন জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সমস্যা, ভিন্ন দেশী-বিবাহ ইহার একটী প্রধান অঙ্গ তাহা ব্যতীত বর্ত্তমানে দেশগত,

জাতিগত, ভাষাগত ব্যবধান অতি অনায়াসে দূর হইতেছে, এখন একদিন বোধ হয় অতি নিকটে আসিতেছে, যখন যথার্থই আমরা বলিতে পারিব, 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। এই সমাজিক আদান প্রদানের ভালমন্দ লইয়া বলিবার অনেক আছে, কিন্তু আমাদের আলোচ্য তা নয়—আমরা সাংসারিক দৃষ্টিতে উপরিউক্ত কথার সম্বন্ধে যৎসামান্য বলিব)

প্রথমতঃ ভারতীয় যুবকগণের প্রতি অতি অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা প্রলোভন দেখান কি প্রলুব্ধ হন তাহাই বিচার্য্য, দেশী বিদেশী যা খবর আমরা পাই তাহাকে এই বিবাহে ইংরেজ মহিলাগণের উৎসাহ দেখা যায় বেশী, আর ক্ষতি বা দুঃখ ভারতীয় যুবকগণও সমানভাবে ভোগ করেন। তবে বিদেশিনী বধূ যে ভারতীয় পরিবারে সসম্মানে গৃহীত হইয়াছে ভারতে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে, অধিকাংশের বিবাহিত জীবন সুখেরই হইয়া থাকে, আর যে দুঃখ বা অসুবিধা তাহা অনিবার্য্য। ভিন্ন আবেষ্টনে আসিয়া যে আনুসঙ্গিক নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ে চলিতে হয়, ইহা তো সহজসিদ্ধ কথা, তাহা সত্ত্বে ও যাঁহারা বিবাহ করেন, তাহাদের বিবাহের ভিত্তি থাকে হৃদয়সম্পর্কের উপর সেখানে যুক্তি খাটে না, স্বার্থ বুদ্ধি দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া তোলে না, সেখানে উপদেশ দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র সুতরাং অযথা ভারতীয় যুবকগণের উপর কলঙ্ক লেপন করিয়া লাভ নাই।

পরলোকে রাজবন্দী শৈলেশচন্দ্র

আবার দেউলীয় বন্দীশিবিরে মৃত্যুর কালছায়া বিস্তৃত হইয়াছে। গত ২১শে অক্টোবর শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাত্র তিনদিনের জ্বর ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। দেউলীতে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি পান নাই, তাঁহার পীড়ার বিষয়ও জানিতে পারেন নাই, অতি অকস্মাৎ এই মর্ম্মভেদী সংবাদ তাঁহার পিতামাতার নিকট পৌঁছিল। পর পর দেউলীতে দুই তিনটী মৃত্যু সংঘটিত হইল, এই বন্দীনিবাসে বন্দীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, আর প্রায়ই নূতন দল আসিতেছে, সুতরাং এরূপ আকস্মিক মৃত্যু সকলের প্রাণেই আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। দেউলীর স্বাস্থ্য, বন্দীনিবাসের ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন বাংলার জলবায়ু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আবহাওয়াতে বন্দীদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে কিনা, তাহাও দেখা কর্ত্তব্য।

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মহিলা

বোম্বাই প্রদেশে নিখিল-ভারত নারী সম্মিলনের এক অধিবেশনে মিসেস্ হামিদ আলি বলেন, মুসলমান হিসাবে তিনি সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথার প্রতিবাদ করিতেছেন, তাহার মতে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথার নির্ব্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত আইন পরিষদের নির্ব্বাচনে ভোট না দেওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

মুসলমান মহিলাগণের ভিতর যে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ায় নাই, ইহাও অত্যন্ত আশার কথা। মুসলমান ভ্রাতাগণ এইখানে তাহাদের ভগ্নীদের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

মুক্তাগাছায় বালিকা বিদ্যালয়ের অভাব

মুক্তাগাছা স্বনামধন্য দানবীর শ্রীযুক্ত রাজা জগৎ কিশোর আচার্য্য চোধুরী, মহারাজা শশীকান্ত চোধুরী প্রভৃতি প্রধান প্রধান জমিদারের বাসস্থান বলিয়া বিখ্যাত, তাহারা সকলেই বিদ্যোৎসাহী, অনেক বিদ্যালয়

স্থাপন করিয়া শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছেন ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয় তাঁহাদের স্ত্রীশিক্ষার অবদান কিন্তু আমরা জানিয়া বিস্মিত হইলাম মুক্তাগাছায় একটী মাইনর বালিকা বিদ্যালয়ও নাই, এজন্য সেখানকার মেয়েদের শিক্ষা লাভের কোন সুযোগ নাই, স্থানীয় জমিদারগণ ইচ্ছা করিলে এইরূপ বিদ্যালয় অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

মহাত্মার বাংলায় আগমন

মহাত্মা গান্ধী আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলায় আসিবেন, তাঁহার বাংলায় আগমনের উদ্দেশ্য হরিজন অন্দোলনের প্রসার। অনুন্নত শ্রেণী শিক্ষাদীক্ষায়, স্বাস্থ্যে, সম্পদে উন্নত হোক্ এ কামনা আমরা সর্ব্বাংশে করি, কিন্তু তাহারা বিরাট হিন্দু সমাজের এক অংশ রূপেই হইবে, তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র নাম, স্বতন্ত্র সুবিধা একেবারে একটা ভিন্ন গোষ্ঠী করিবার প্রয়োজন কি? অন্য প্রদেশের স্বরূপ সঠিক জানি না, তবে বাংলায় 'হরিজন' বলিয়া একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন সম্প্রদায় নাই, আর নিম্ন শ্রেণী বলিয়া কাহারও উপর তেমন বিশেষ অত্যাচার বা অবজ্ঞা প্রকাশ হয় না। এখনও পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর শ্রেণী পাশা পাশি পরম সদ্ভাবে বাস করিতেছে, উভয়ের আচার ব্যবহারের পার্থক্য মানিয়া লইয়া পরস্পরের সঙ্গে সুখ দুঃখ সমান ভাবে ভাগ করিয়া লইতেছে। শিক্ষিত সম্প্রাদায়ে তো কোন বৈষম্য নাই। কিন্তু মহাত্মার হরিজন আন্দোলন যে ভাবে চলিতেছে তাহাতে আমাদের সমাজ-দেহ সম্পূর্ণ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়, বর্ণাশ্রমী ও হরিজন এখনকার যেন এই মূলমন্ত্র হইয়াছে, হরিজনের উন্নতিকল্পে বিশিষ্ট ব্যবস্থা, বিশিষ্ট সুবিধা দেওয়া হইতেছে, বর্ণাশ্রমীগণ তাহাদের প্রতি কত অন্যায় আচরণ করিতেছে তাহার যেমন সজীব বর্ণনা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে উভয়ের বৈষম্য চিরস্থায়ী হইবার উপক্রম হইতেছে, এতে 'হরিজন'দের কিছু সময়িক উপকার হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সমাজে অন্তর্কলহ উপস্থিত হইবে। দুই সম্প্রদায় সৃষ্টি হইবে, একে ভাবিবে আমি চির-উপদ্রুত, আমার অধিকার আরও বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন, অন্যে আবার অধিকারচ্যুত হওয়ার ভয়ে আরও সাবধানী ও সঙ্কীর্ণচিত্ত হইয়া পড়িবে। এই ক্ষুদ্র অন্তর্বিরোধে জাতি শক্তিহীন হইয়া পড়িবে, জাতির মহত্তম দাবী উপেক্ষিত হইবে, সুতরাং অবনত শ্রেণী উন্নত না হইয়া বরং উন্নত শ্রেণীই অবনতদের সঙ্গে দুর্ভাগ্য সমান ভাবে বরণ করিয়া লইবে। একে তো দেশে যে কত সম্প্রদায় আছে, কত ধর্ম্ম-বরোধ, স্বার্থ-বিরোধ আছে তার অবধি নাই, হিন্দু মুসলমান সমস্যা দেশে দাবানল তুলিয়াছে, ইহা দেখিয়াও কাহারও শিক্ষা হয় না।

মহাত্মার আগমন—আনন্দের, কিন্তু তাঁহার প্রচারের কথা ভাবিয়া আমাদের শঙ্কা হয়, বাংলার হিতৈষীগণ কি তাঁহাকে বাংলার অবস্থা বুঝাইয়া দিবেন না।

গঠন-মূলক কার্য্য

কংগ্রেস লুপ্ত, আইন অমান্য আন্দোলন ব্যক্তিগত আইন-অমান্যে পর্য্যবসিত, গান্ধীজী একবৎসরের জন্য রাজনৈতিক গগন হইতে অপসৃত, জহরলাল ধনবাদের বিরুদ্ধে প্রচাররত নেতারা কেউ গিয়াছেন জেলে, কেউ কাউন্সিলে ঢুকিতে ইচ্ছুক, এমন অবস্থায় সকলে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে, যারা রাজ নৈতিক কাজকেই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, ইহার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, অশেষ দুঃখ অম্লান বদনে ভোগ করিয়াছে, আরও করিতে প্রস্তুত, তাহারা কাজ খুঁজিয়া পায় না, পথ বুঝিতে পারে না, গন্তব্য স্থানের বিষয়েও বোধ হয় গোলে পড়ে।

এই সঙ্কটময় অবস্থার একটা সহজ মীমাংসা করিতে সকলে পরামর্শ দিলেন, গঠন-মূলক কাজ কর, দেশের ছোট বড় সব নেতাই এই এক ধুঁয়া ধরিয়াছে, সংগঠন-কার্য্য অবলম্বন কর, কিন্তু গঠন কার্য্য শেষে কিসে গিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে, হরিজন, চরকা-খদ্দর ও পরিশেষে উপবাস, এত বড় বড় নেতাদের সব কথা সব কাজ তার পরিণতি এই, এই কি রাজনৈতিক প্রচেষ্টা, সমাজ সংস্কার, ধর্ম্ম সংস্কার খুব ভাল কথা, কিন্তু দেশ এখন চায় এমন নেতা যিনি সুস্পষ্ট, পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন দেশসেবার, হোক্ না তাহা কঠোর; এই গোলক ধাঁধার মধ্যে তাহারা আর কতদিন ঘুরিবে, যদি বোঝ যে সত্যই এ আন্দোলন আপাততঃ ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে লজ্জা নাই, সব ভুল ত্রুটী স্বীকার করিয়া সর্ব্বদল সম্মিলিত হইয়া আবার কর্ম্মপন্থা ঠিক কর, তাহা না করিয়া গঠনকার্য্যে পরাজয়ের গ্লানি ঢাকিতে চাও কেন? বোঝ না, দেশের অশান্ত অবস্থায় সংগঠন চলিতেই পারে না, অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমান মর্য্যাদা দিয়া, সমান অধিকার অর্জ্জন করিয়া দেশে শান্তি আন তখন সংগঠন মূলক কাজ তোমার অলক্ষিতেই কত গড়িয়া উঠিবে, তার পূর্ব্বে এ অসম্ভব প্রচেষ্টা কেন?

কামরুন্নেছা আই, এ শ্রেণী

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম স্থানীয় কামরুন্নেসা ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ে আই, এ ক্লাসের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছে, অল্পকাল মধ্যেই ইহার ছাত্রীসংখ্যা আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, অধ্যাপনার ব্যবস্থা সবিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছে, আমাদের একটু আশঙ্কা ছিল কলেজের একটি শ্রেণী খুলিলে স্কুলে অধ্যাপনার ক্ষতি হইতে পারে কিন্তু অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, ইহাতে স্কুলের কোন ক্ষতি তো হয় নাই বরং স্কুলের অধ্যাপনার রীতির বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এই নূতন প্রচেষ্টার আমরা মঙ্গল কামনা করি।

ঢাকায় সাংবাদিক সঙ্ঘ

বিগত ৩রা নবেম্বর ঢাকার অ্যাডিসনাল মাজিষ্ট্রেট হিউজেস্ সাহেবের আমন্ত্রণে ঢাকার সাংবাদিকগণ তাঁহার কাছারীতে একত্রিত হইয়াছিলেন। হিউজেস্ সাহেব ঢাকার একটা সাংবাদিক সঙ্ঘ স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন ও এবিষয়ে তাহার ব্যক্তিগত মতামত জ্ঞাপন করেন।

সেখানে অনেক আলোচনার পর স্থির হয় যে ঢাকায় একটী বে-সরকারী সাংবাদিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা হইবে ও শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহ মহাশয়ের আহ্বানে ১৩ই নবেম্বর ইহার কার্য্যাবলী ও সমিতির সংগঠন বিষয়ে স্থির হইবে।

তদনুসারে বিগত সোমবার ঐ সভা আহুত হইয়াছিল, এবং উহাতে সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়, সকলেই অত্যন্ত আশান্বিত ভাবে ঐ কার্য্যে যোগদান করেন। সমিতির কার্য্যকরী কমিটি গঠন হয়। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গুহ প্রেসিডেন্ট ও শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

এইরূপ সমিতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সকলেই স্বীকার করে, আমরা আশা করি এই সমিতি সকল সাংবাদিকেরই সহায়স্বরূপ হইবে। আজকাল সংবাদ পত্র পরিচালন নানা কারণে যেরূপ সঙ্কটপূর্ণ হইয়াছে, সেস্থলে এরূপ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের সহায়তা পাইবার সুবিধা থাকিলে সকলেরই মনে আশার সঞ্চার হয়।

Printed & Published by Bibhati Sen, 23 Wyer Street, Wari, from Wari Printing Works, Dacca.

সাথী

হাসিরাশি দেবী

[উদয়নের সৌজন্যে]

তৃতীয় বর্ষ	পৌষ, ১৩৪০	নবম সংখ্যা

মেয়েদের বিষয়ে গান্ধীজীর মত

শ্রীঅনিন্দিতা দেবী

সিন্ধুপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ সহরের 'উন্নতি' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের প্রতিনিধি আজকালকার সবিশেষ আন্দোলিত কয়েকটী বিষয় যথা সহশিক্ষা, অসবর্ণ বিবাহ ও পর্দ্দাসম্বন্ধে গান্ধীজীর মতামত জানিবার জন্য ওয়ার্দ্ধায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাহার বিবরণ অমৃতবাজার পত্রিকায় যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

প্রশ্ন। আজকালকার যুবকদের বিশ্বাস মাসিক ১৫০৲ কি ২০০৲ টাকা আয় না থাকিলে বিবাহের কথা মনেই স্থান দেওয়া যায় না। এদিকে তাহাদের মধ্যে ক্রমেই অধিক সংখ্যক ছেলেরা মনে করিতেছে যে, বিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়াও অন্য নানা উপায়ে যৌনবৃত্তির চরিতার্থতা দোষের বিষয় নয়। এরূপ মনোভাব সম্বন্ধে আপনার মত কি ?

উত্তর। একান্ত লজ্জা ও দুঃখের বিষয় ভিন্ন ইহা আর কোন ভাবেই দেখা যায় না। এরকম মনোভাব আত্মহত্যার দিকেই চালিত করে। ইহা যে কতদুর হীন ও নিকৃষ্ট যে সব যুবকেরা ইহা উপলব্ধি করিয়াছে, বিশুদ্ধ জীবন ও সদাচারের দ্বারা তাহাদের ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়ানই ইহার একমাত্র প্রতিকার।

প্রঃ। যে সব বালিকাদের বাধ্য হইয়াই অবিবাহিত থাকিতে হয় বা যাহারা বিবাহে অনিচ্ছুক তাহাদের সম্বন্ধে আপনার উপদেশ কি ?

উঃ। এই সকল বালিকাদের আপনাদের ক্ষুদ্র শ্রেণী এমন কি আপনাদের প্রদেশ হইতেও বাহির হইয়া যোগ্য সঙ্গীর অনুসন্ধান করা উচিত। প্রাদেশিকতা ও জাতের গণ্ডী হইতে আমরা যত শীঘ্র মুক্ত হইতে পারি ততই মঙ্গল। একজন শিক্ষিত আমিলকে কেন আমিল সঙ্গীই খুঁজিতে হইবে ? ছেলে মেয়ে যেই হোন্ সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্য হইতেই কেন তিনি সমযোগ্য সঙ্গী নির্ব্বাচন করিবেন না, ইহার কারণ আমি বুঝি না। তবে পাশববৃত্তির বশবর্ত্তিতা নয়, জাতীয় উন্নতি এবং চিত্ত-প্রকর্ষই ইহার প্রেরণা হওয়া উচিত।

প্রঃ। 'নরনারী সকলকেই আত্মপ্রকাশের পরিপূর্ণ সুবিধা দেওয়া উচিত' এই যদি আপনার মত হয়, তাহা হইলে আপনি কি উপদেশ দেন যে তরুণতরুণীরা পিতামাতার রক্ষা, উপদেশের কোন অপেক্ষাই না রাখিয়া তাঁহাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পরস্পরে অবাধ মেলামেশা করিবে ? আর মেয়েদেরও ঠিক ছেলেদের মতই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে দেওয়া উচিত কিনা ?

উঃ। অবশ্যই নয়। মধ্যপথেই আমার বিশ্বাস। অধিকাংশ বালকবালিকারই পিতামাতা গুরুজনের উপদেশানুসারে চলা এবং আপনাদের চালিত করাই উচিত। গুরুজনদেরও তেমনি আবার যে সব ছেলেমেয়েরা তাঁহাদের রক্ষাধীনে থাকে তাহাদের স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। দেশের তরুণদের বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে কোন রকম গোপনীয়তার ভাব থাকা উচিত নয়।

প্রঃ। প্রবীণেরা বলেন, সিন্ধুদেশের বিশেষ অবস্থার জন্য পর্দ্দাদূর এখানে নিরাপদ নয়। এদিকে নবীনেরা আবার স্বভাবতঃই ইহার বিরুদ্ধ মতের ; তাহারা ইহা একান্তই কদাচার বলিয়াই জ্ঞান করে। প্রবীণ, নবীনের এই মতবৈধে কি করা যায় ?

উঃ। পর্দ্দা প্রথায় আমার কখনই বিশ্বাস নাই। আমার মনে হয় যে মেয়েরা সাহস করিয়া পর্দ্দা ছিন্ন করিয়া প্রতিবেশীদের দেখাইতে পারে যে তাহাতে তাহাদের কোনই ক্ষতি হয় নাই, তাহারাই এসম্বন্ধে ভয় ও কুসংস্কার দূর বিষয়ে প্রত্যক্ষ্য প্রমাণ হইতে পারে। পর্দ্দা ছিন্ন করা বলিতে অবশ্য মেয়েরা যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইবে ইহা বোঝায় না। লোকের কাছে আপনার মুখ ঢাকিয়া রাখা আমি মানুষের বুদ্ধি ও আত্ম-প্রকাশের পক্ষে সবিশেষ অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি। নম্রতাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পর্দ্দা ও রক্ষা।

প্রঃ। সহশিক্ষা সম্বন্ধে আপনার মত কি ?

উঃ। সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত সহশিক্ষায় আমার খুবই বিশ্বাস আছে।

এই সূত্রে মনে আসিল যে নানা গ্রন্থ, পত্রিকাদিতে প্রকাশিত গান্ধীজীর নানা বিষয়ের মতামত চয়ন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য ছাত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু এম, এস্, সি সঙ্কলিত একটী সবিশেষ সুনির্ব্বাচিত সংগ্রহপুস্তক শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে। বাহির হইলে তাহা পাঠ করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিয়া এখানে তাহা হইতেও মেয়েদের বিষয়ে মহাত্মাজীর কয়েকটী উক্তির অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে :—

বিবাহের আদর্শ—

শারীর মিলনের মধ্য দিয়া আত্মিক মিলনই বিবাহের আদর্শ। ইহাতে যে মানুষ-প্রেমের সৃষ্টি, ঐশ্বরিক ও সর্ব্বভূতে প্রেম সঞ্চারের তাহাই সোপান।

পত্নী স্বামীর ক্রীতদাসী নহেন, তাঁহার সঙ্গিনী ও সমস্ত সুখদুঃখের সমভাগিনী সহায়িকা। আর স্বামীর মতই নিজপথ নির্ব্বাচনেও তাঁহার স্বাধীনতা।

বিবাহের পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচন—

মেয়েদের এবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানই আমার একান্ত কাম্য। বালিকা বিধবা দেখিলেই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সদ্য বিপত্নীক স্বামীকে জঘন্য তাচ্ছিল্যের সহিত আবার বিবাহ করিতে দেখিলেও রাগে আমার গা কাঁপিতে থাকে। দণ্ডনীয় উদাসীন্যের সহিত বাপমাকে মেয়েকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, নিরক্ষর রাখিয়া শুধু ধনী দেখিয়া বিবাহ দিবার জন্য প্রতিপালন করিতে দেখিলেও আমার দুঃখের অবধি থাকে না তবে রাগ, দুঃখ হইলেও সমস্যার কাঠিন্যও আমি উপলব্ধি করি। মেয়েদের ভোট এবং আইনতঃ সমাধিকার পাওয়া নিতান্তই আবশ্যক। কিন্তু সেইখানেই সমস্যার শেষ নয়। জাতীয় রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনায় মেয়েদের যোগদান হইতে ইহার আরম্ভ মাত্র।

বিবাহ যেমন হওয়া উচিত তেমনি পবিত্র কর্ম্ম এবং নূতন জীবনারম্ভই যদি হয়, তাহাহইলে মেয়েরা সম্পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই তবে বিবাহিত হওয়া উচিত। এবং জীবনসঙ্গী নির্ব্বাচনে তাহাদের কিছু হাত অন্ততঃ ও থাকা চাইই। তাহাদের কাজের ফল কি তাহাও তাহাদেরা জানা দরকার। শিশুদের মিলনকে বিবাহ আখ্যা দিয়া তারপর তথাকথিত স্বামীর মৃত্যুতে বালিকাকে বিধবা বলিয়া ঘোষণা, মানুষ ঈশ্বর দুইয়ের বিরুদ্ধেই মহাপাপ।

বাল্যবিবাহ—

ছোট শিশুদের সম্বন্ধে আবার কন্যাদান কি? সন্তানেরা কি পিতার সম্পত্তির অন্তর্গত? পিতা তাহাদের রক্ষাকর্ত্তা, মালিক নহেন। আর রক্ষাধীন সন্তানদের স্বাধীনতা লইয়া কেনাবেচা করিলে পিতা সেই অধিকারচ্যুত হইয়া থাকেন।

যে পিতা এইভাবে বিশ্বাসভঙ্গ করিয়া বৃদ্ধ বা বালকের সহিত শিশুকন্যার বিবাহদেন, কন্যার বৈধব্যের স্থলে তাহার পুনর্বিবাহ দ্বারাই মাত্র তাঁহার যাহা কিছু পাপস্খালন হইতে পারে। এইরকম বিবাহ যে প্রথম হইতেই বাতিল হওয়া উচিত তাহাওত আমি আগেই বলিয়াছি।

বিবাহবিচ্ছেদ—

বিবাহ অন্য সকলকে ছাড়িয়া দুইজনের মিলনের অধিকার দিয়া থাকে। যখন দুইজনেরই ইহা ইচ্ছানুগত, তখন পর্য্যন্তই ইহার অধিকার। কিন্তু একজন সঙ্গীর ইচ্ছায় অপরের অবশ্যবাধ্যতার অধিকার ইহাতে নাই। যখন সঙ্গীদের একজন নৈতিক বা অন্য কোন কারণে অপরের ইচ্ছামত চলিতে অক্ষম হয়, তখন কি কর্ত্তব্য তাহা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু আমি নিজে হইলে এরকমস্থলে নৈতিক প্রকর্ষের বাধা অপেক্ষা বিবাহচ্ছেদও বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি। অবশ্য উহা সম্পূর্ণই নৈতিক ও আত্মিক কারণ হওয়া আবশ্যক।

বিধবা বিবাহ—

১৯২১ সনে বিধবার সংখ্যা আগের বিশ বৎসরের তিনগুণে দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু বালিকা বিধবার প্রতি অন্যায়ের পরিমাণ ইহাতে ভাল করিয়াই প্রকাশ করিতেছে। গোরক্ষার জন্য আমরা ধর্ম্মের নামে চীৎকার করি, কিন্তু বিধবা বালিকাগণ আমাদের কাছে কোন রক্ষাই পায় না। বিবাহ কি তাই যাহারা জানে না, এমন তিন লক্ষ বালিকার উপর আমরা ধর্ম্মের নামে বৈধব্য চাপাইয়া দিই। কচি বালিকাদের উপর বলপূর্ব্বক বৈধব্য নিক্ষেপের জঘন্য পাপের ফল আমরা হিন্দুরা প্রতিদিন ভাল করিয়াই পাইতেছি। আমাদের বিবেক যদি সত্যই জাগ্রত হইত, তাহা হইলে বৈধব্য দূরে থাক্, ১৫ বৎসরের পূর্ব্বে আমরা বালিকার বিবাহই দিতাম না। (২৬।৮।২৬ তারিখে গান্ধীজী একস্থলে লিখিয়াছেন, সাধারণতঃ ১৮ বৎসরের নীচে কোন বালিকার বিবাহ হওয়া উচিত নয়।) আর এই তিন লক্ষ বালিকার বিবাহই হয় নাই বলিয়া আমরা মনে করিতাম। জীবন সঙ্গীর প্রতি প্রেমে স্বেচ্ছাবৈধব্যে জীবন সম্পন্নও মহিমামণ্ডিত করিয়া থাকে কিন্তু ধর্ম্ম ও প্রথার দায়ে বাধ্যতামূলক বৈধব্যে গুপ্ত পাপে গৃহ মলিন ও ধর্ম্ম অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

আমরা যদি শুদ্ধ হইতে চাই, হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিতে চাই, তাহাহইলে বাধ্যতামূলক বৈধব্যের বিষ আমাদের দূর করিতে হইবে। যাঁহার গৃহে বালিকা বিধবা আছে, তাঁহার ভাল বিবাহের জন্য সাহসে ভর করিয়া তাঁহাকেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। ইহা পুনর্বিবাহ নয়; উহাদের বিবাহ হয়ই নাই।

পর্দ্দা—

সচ্চরিত্রতা কাচের ঘরের ঢাকা দেওয়া বস্তু নয়। পর্দ্দার চার দেওয়ালের বেড়াতেও ইহাকে রাখা যায় না। অন্তরেই ইহাকে জন্মলাভ করিয়া বাঁচিতে হয়। আর সকলরকম অযাচিত প্রলোভন জয় করিবার শক্তি ইহাতে চাই।

নারীর বিশুদ্ধতার জন্যই বা কেন এই অদ্ভুত ব্যস্ততা? পুরুষের বিশুদ্ধি সম্বন্ধে মেয়েরা কি কিছুই বলিতে পায়? পুরুষের চরিত্র বিষয়ে মেয়েদের ব্যস্ততার কথাও ত কই শুনিতে পাওয়া যায় না। নারীর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে আইন কানুন বানাইবার অহঙ্কার পুরুষে কেন করিয়া থাকে? ইহা বাহির হইতে চাপাইবার জিনিষ নয় উহা অন্তরের অভিব্যক্তি, সুতরাং আত্মচেষ্টার উপরই ইহা নির্ভর করে।

তর্পণ

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

১৮

বহুকাল পরে অরুণ বাড়ী ফিরিল, তাহার সঙ্গে রহিয়াছে শুভ্রতা। এ বোঝা সে নামাইবে কোথায় তাহাই ঠিক করিতে পারিতে ছিল না। করুণাময় ভগবানের বিচার পদ্ধতি দেখিয়া তাহার হাসি পাইতেছিল। সে নিজের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে, নিজের বোঝা তাহার কাছে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, ইহার উপর আবার একি বিরাট বোঝা আসিয়া পড়িল; এ বোঝা সে চাপাইবে কাহার মাথায়?

শুভ্রতা এ সব বার্ত্তা পায় নাই, দাদার উপর নির্ভর করিয়া সে পরম নিশ্চিন্ত; তাহার জন্য দাদাকে কতটা ভাবিতে হইতেছে তাহা সে কি জানে। মাঝে মাঝে মায়ের কথাটা মনে পড়ে, অতি কষ্টে সে চোখের জল সামলাইয়া ফেলে, দাদাকে সে বিব্রত করিতে চায় না।

শুভ্রতার জন্য অরুণকে পরিশ্রম করিতে হয় বড় কম নয়। সে শুভ্রতাকে বোর্ডিংয়ে দিয়াছে, তাহার পড়ার খরচ চালাইতেছে। এক মাড়োয়ারীর কাছে সে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে কাজ পাইয়াছে, তাহা ছাড়া কয়টা টিউসানী ও আছে।

শুভ্রতাকে দেখা শোনার ভার কাহারও উপর দিতে পারিলে সে নিশ্চিন্ত হইয়া দেশ ছাড়িয়া যাইতে পারে। কিছু দিন আগে গ্রামের রতিনাথ বাবুর সহিত দেখা হইয়াছিল। বয়সে তিনি বৃদ্ধ, কলিকাতাতেই থাকেন। এ রকম একটা লোকের উপর শুভ্রতার ভার দিয়া যাইতে পারিলে অরুণ বাঁচিয়া যায়।

রতিনাথ বাবুকে এ কথা বলিতে তিনি তাঁহার স্ত্রীর নিকট কথাটা তুলিতে বলিয়াছেন, সেই জন্য অরুণ প্রায় তিনচারি বৎসর পরে দেশে ফিরিয়াছে।

গ্রীষ্মের ছুটি হইয়াছে, শুভ্রতাকেও সে তাই সঙ্গে আনিয়াছে। ইহারই মধ্যে একবার সে ধৃতিকে দেখিতে গিয়াছিল। সন্তানহীনা উৎপল তাহাকে নিজের সন্তানের মতই মানুষ করিতেছিল; ধৃতি উৎপলকে মা বলিয়া ডাকে, বিমলকে পিতা সম্বোধন করে।

অরুণ তাহার কাছে অপরিচিত রহিয়া গিয়াছিল। উৎপল যখন তাহার পরিচয় দিল, তখন ধৃতি বিস্ফারিত নেত্রে এই লোকটীর পানে তাকাইয়াছিল, তাহার পর স্পষ্টই বলিয়াছিল—'না, আমার বাবা আছে, এ আমার বাবা নয়।'

অন্তরের অন্তরালে কোথায় যেন বেদনা বাজিলেও মোটের উপর অরুণ খুসি হইয়াছিল।

উৎপলের পানে তাকাইয়া একটু হাসিয়া সে বলিয়াছিল, 'সত্যি ওকে আমি তোমার দিলুম উৎপল, ওকে মানুষ করতে যেমন ভাবে হয় গড়ে নিয়ো, আমি ওকে আর চাই নে।'

তাহার কথা শুনিয়া উৎপল যে যথেষ্ট খুসি হইয়াছিল তাহা তাহার মুখ চোখের ভাব দেখিয়াই বুঝা গিয়াছিল। সত্যই তাহার ভয় ছিল পাছে অরুণ আসিয়া ধৃতিকে লইয়া যায়, সেটা কিছুই অসম্ভব ও নয়।

তথাপি ভদ্রতার খাতিরেই সে বলিয়াছিল, 'তা ও কি হয় অরুণ দা,—তোমার মেয়ে তুমি তাকে নেবে না এ যে অসম্ভব কথা। তবে হাঁ, এ কথা বল্‌তে পারো, যতদিন ছোট আছে আমার কাছে থাক, তারপর তুমি নিয়ে যাবে,—সেইটাই সত্যি কথা। যতদিন ছোট থাকে তুমি মাঝে মাঝে এসে বরং দেখে যেয়ো বুঝ্‌লে ?"

কিন্তু অরুণ যে আসিয়াছে আর যায় নাই। পত্র প্রায়ই পায়, জানিতে পারে ধৃতি বেশ ভালোই আছে, দুই একদিন মোটরে করিয়া তাহাকে পথে বেড়াইতে ও দেখিয়াছে।

অরুণ শুভ্রতাকে লইয়া যখন গ্রামে পৌঁছাইল, তখন গ্রামে বেশ একটু সাড়া পড়িয়া গেল।

তিন বৎসরের বেশী হইয়াছে, অরুণ আসে নাই।

তাহার একখানি ঘরের যে দেয়ালটা ফাটিয়াছিল তাহা কবে পড়িয়া গিয়াছে। অপরাজিতা মাসীমার কাছে চাবি দিয়া গিয়াছিল—গ্রামের লোক অরুণকে সংবাদ দিয়াছিল—চাবি দিয়া গিয়াছিল, অরুণ আসে নাই।

রতিনাথ বাবু গ্রাম সম্পর্কে কাকা হন, তাঁহার স্ত্রী সেই সম্পর্কে কাকিমা।

অরুণকে তিনি নিজের বাড়ীতে থাকা ও খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিলেন। নিজের বাড়ীতে দাঁড়াইবার স্থান না থাকায় অরুণকে রাজি হইতে হইল।

শুভ্রতাকে দেখিয়া কাকীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটী কে অরুণ ?"

অরুণ তাহার সত্য পরিচয় গোপন করিয়া বলিল, এদের বাড়ী আমি অনেক কাল ছিলুম কাকিমা,—আমায় দাদা বলে ডাকে, তাই আমাদের দেশ দেখ্‌তে এসেছে।"

সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটীকে দেখিয়া কাকিমার বড় পছন্দ হইয়াছিল, প্রথমেই প্রস্তাব করিয়া বসিলেন, "বেশ মেয়েটী অরুণ, এর সঙ্গে আমার ভাইপো বিনয়ের বিয়ে দিলে খাসা মানাবে ! আমারই বা ওই ভাইপোটী ছাড়া আর কে আছে,—যা কিছু আছে সব ওরাই তো ভোগ কর্‌বে।"

অরুণ শুভ্রতার মুখের পানে তাকাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "আর দুই একটা বছর যাক্ না কাকিমা, ওকে আরও খানিকটা পড়াই, তারপর যদি ওর ইচ্ছে হয় বিয়ে কর্‌বে।"

মুখ বাঁকাইয়া কাকিমা বলিলেন, "তুই আর বলিস্‌নে অরু, মেয়েদের আবার ইচ্ছে অনিচ্ছে, ওদের আবার লেখাপড়া ? যাদের কাজই ঘরসংসার করা, ছেলেপুলে মানুষ করা, তাদের আবার ও সব কেন ? গেরস্তর ঘরের মেয়ে নাকি লেখাপড়া শেখে,—কেন, ওরা কি চাকরী কর্‌তে যাবে

নাকি তোদের মত হ্যাট কোট পরে, কাণে কলম গুঁজে ? বরাবর দেখে আসছি, মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী যায়, রান্নাবান্না করে, সকলের সেবা করে, ছেলেপুলে মানুষ করে, এ ছাড়া আর কি করবে বল তো ?"

কথাটা যে কতখানি সত্য তাহা অরুণ জানে। কারণ সে গ্রামের ছেলে, আর গ্রাম লইয়াই সমাজ—দেশ। মেয়েরা গৃহিণী, সন্তানের জননী, তাহাদের কাজ শুধু সকলের মনতুষ্টি করা, কোনরকমে ছেলেমেয়ে মানুষ করা। ঠিক এই কাজটুকুর জন্যই তাহারা তদনুপাতে সম্মান পায়। উহাদের প্রচলিত নিয়মগুলি মানিয়া চলিতেই হইবে, তদতিরিক্ত কিছু করিতে যাওয়ার নাম শুধু স্বেচ্ছাচারিতা নয়—ব্যভিচারিতাও বটে।

অরুণ বলিল, "বিয়ে তো হবেই কাকিমা, ওকে ওর মা মরণের সময় আমায় বারবার করে বলে গেছেন, আমিও সেই সত্য রক্ষা করতে চাই।"

কাকিমা চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু খুসি হইতে পারিলেন না।

সমস্ত দিন পরে সন্ধ্যার সময় কাকিমাকে নিশ্চিন্তভাবে পাইয়া অরুণ বলিল, "একটা জরুরী কাজের জন্যেই এসেছি কাকিমা। ধৃতি উৎপলের কাছে আছে, তার সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত, ভাবনা শুধু শুভ্রতার জন্যে। যদি ও এ বোর্ডিংয়ে থাকে তবু দেখাশোনার একজন লোক চাই, বা ছুটি হলে কাছে নিয়ে যেতেও তো হবে। আমি ওকে এমনি ভাবে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে রেঙ্গুনে চলে যেতে পারি, ওখানে কাজ করবার ঠিক করেছি। অবশ্য শুভা যতদিন থাকবে আমি তার জন্যে খরচ দেব। তুমি তো প্রায়ই কলিকাতায় থাকো কাকিমা, ওর ভারটা তুমিই নাও না।"

কাকিমা খরচ পাইবার কথা জানিয়া অখুসি হইলেন না, বলিলেন, "তা বেশ, বোর্ডিংয়ে রাখারই বা কি দরকার, আমার বাসাতেই এসে থাকবে। তুমি বাপু মাসে মাসে ঠিক করে খরচটা পাঠিয়ো, তা হলেই আমার হল। কিন্তু ও কথা যাক্, তুমি বাপু এমনি করে পথে পথেই ঘুরবে, আর বিয়ে থাওয়া করবে না ?"

অরুণ হাসিল, "এই তো বেশ আছি কাকিমা।"

মুখ ভার করিয়া কাকিমা বলিলেন, "বেশ আছ বই কি বাছা, তা না বলা ছাড়াই বা উপায় কি ? এই যে এমনি করে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ, বাড়ী ঘর সব যে বয়ে গেল। তোমার মা ছিল সতী লক্ষ্মী মেয়ে, কখনও তাঁকে স্বামীর ভিটে ছেড়ে একটী দিনের জন্যে কোথাও যেতে দেখিনি, সে মরে হাড় জুড়িয়েছে। তারপর তুমি যে কুলের ধ্বজা বউ নিয়ে এলে বাবা, রাক্ষুসী সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিলে। কোলের মেয়ে ফেলে যে চলে যেতে পারে, দুনিয়ায় তার অসাধ্য কাজ আর কি আছে অরুণ ?"

একটু হাসিয়া অরুণ বলিল, "কোলের সন্তান আছে বলে যমের দণ্ড তো এড়াবার যো নাই কাকিমা।"

বিকৃত মুখে কাকিমা বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, তোমায় ওরা তাই বলেছে বুঝি ? ওরা যে "জ্যান্ত মাছে পোকা" পাড়্‌তে পারে গো। বলি—যমে নিলে যে ভালো ছিল বাছা, কিন্তু যম কি ও হতভাগিকে ছোঁয় ? শুনলুম তোরই এক বন্ধুর সঙ্গে সে দেওঘর হতে পালিয়ে গেছে।"

অরুণ অকস্মাৎ যেন বজ্রাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। কাকিমা বলিতেছিলেন, "এই মাস পাঁচ ছয় আগে নাকি আমাদের রাজুর সঙ্গে হাওড়ায় দেখা হয়েছে। হাজারই অন্য রকম চালচলন করুক, আমাদের রাজুর চোখ এড়াতে পারবে না,—রাজু তাকে দেখেই চিনেছে। সে রাজুকে দেখেই—"

এতক্ষণে যেন অরুণের চেতনা ফিরিয়া আসিল, সে আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না না, এ একেবারে মিছে কথা রাজু হয়তো লীলার মতই আর কাউকে দেখেছে। লীলা সত্যিই মারা গেছে কাকিমা, উৎপল পর্য্যন্ত আমায় বলেছে লীলা মারা গেছে। কলেরা হয়েছিল, আমাকে দেখ্‌তে চেয়েছিল—"

কাকিমা মাথা দুলাইয়া বলিলেন, "কিন্তু এখানকার শুভেন্দু দত্ত যে সপরিবারে দেওঘরে ওদেরই বাড়ীর পাশে ছিল; তারাই বলেছে তোর বউ, তোর এক বন্ধু কিংশুক না কি নাম, তার সঙ্গে কোথায় চলে গেছে। বড়ঘরের কেলেঙ্কারী বেশীদূর গড়ায় নি, মরে গেছে বলে ধামা চাপা দিয়েছে। হতো আমাদের মত গরীব গেরস্তের ঘর, এতদিন এ বার্ত্তা বাতাসের মুখে ভেসে বেড়াত। বিশ্বাস না হয়, তুমি একবার ভালো করে না হয় খোঁজ নিয়ো।"

অরুণ শুষ্ককণ্ঠে একবার মাত্র বলিল, "আচ্ছা।" অন্তর তখন তাহার অসাড় হইয়া গিয়াছে।

তাই তো—সে একটা দিকই দেখিয়া গেছে, আর একটা দিকও আছে যে।

সে যখন শুনিয়াছিল লীলা মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া তাহাকে একবার দেখিতে চাহিয়াছিল, তখন সত্যই তাহার চোখ দুইটী তাহার অজ্ঞাতেই জলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, মুহূর্ত্তের জন্য তাহার কঠিন অন্তরও দ্রব হইয়া গিয়াছিল। সে উর্দ্ধমুখে চাহিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল, "লোকান্তরবাসিনি, আজ আমার প্রাণের প্রথম ও শেষ সত্যকার প্রেমার্ঘ্য তুমি গ্রহণ কর;—তুমি ধন্য হও, তুমি পবিত্র হও, তুমি মহান্ হও। তোমার চলার পথে বাধা যেন না থাকে, আমার শুভেচ্ছা তোমায় উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত করুক, এই প্রার্থনাই করি।"

এই মুহূর্ত্তে মনে হইল ফাঁকির চূড়ান্ত হইয়াছে, তাহাকে সকলেই ফাঁকি দিয়াছে, তাহার সর্ব্বস্ব লইয়াছে কিন্তু কেহ এতটুকু তাহাকে দেয় নাই।

সে কি স্বপ্ন ? সেই যে একটা রাত্রে সে লীলার অশরিরী আত্মার ক্রন্দন শুনিয়াছিল ? উঃ, স্বপ্নও প্রতারণা করে, দুর্ব্বল মানুষের মস্তিষ্ক লইয়া মিথ্যা ছবি অঙ্কিত করে ?

অরুণ অন্ধকারের পানে একদৃষ্টে নীরবে কেবল তাকাইয়া রহিল। ক্রমশঃ

ছাত্রী-সঙ্ঘ

শ্রীসুলতা কর

ছাত্রী-সঙ্ঘ হচ্ছে ছাত্রীদের প্রতিষ্ঠান। বিগত সাত আট বৎসর ধরে ছাত্রী-সঙ্ঘের কাজ চলে এসেছে নীরবে অথচ দৃঢ়ভাবে। ছাত্রীসঙ্ঘের প্রধান এবং প্রথম উদ্দেশ্য ছাত্রীদের মনে জাগরণের সুর ধরিয়ে দেওয়া।

আজ এই যুগসন্ধিক্ষণে তরুণীচিত্ত যদি তার বিগত যুগ যুগান্তরের মোহনিদ্রা কাটিয়ে না উঠ্‌তে পারে, তবে কি বাংলার মেয়েদের তথা ভারতের মেয়েদের বেঁচে ওঠ্‌বার আর কোন আশা আছে ? তরুণ আন্‌বে পুরুষ সমাজের প্রাণ আর তরুণী আন্‌বে নারী সমাজের প্রাণ। এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছাত্রীসঙ্ঘ আজ আহ্বান করছে তরুণীশক্তিকে, কে জানে কবে তার আহ্বানের সাড়া মিল্‌বে ?

ছাত্রীসঙ্ঘ ছাত্রীদের মনকে জাগ্রত করে তুল্‌তে চায়। কিন্তু মনকে জাগিয়ে দেওয়ার অর্থ কি ? এর অর্থ এই নয় যে ছাত্রীরা সকলেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগদান করুক, কিংবা শিক্ষার বিস্তার করুক কিংবা ব্যায়ামচর্চ্চা করুক। ছাত্রীসঙ্ঘের সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা অনেকেরই মনে বদ্ধমুল হয়ে আছে যে এটা একটা রাজনৈতিক সঙ্ঘ। এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে কত অভিভাবকই যে কত ছাত্রীকেই এতে যোগ দিতে দেননি, তাহা আমরা জানি। অথচ তাঁদের এই ভ্রান্ত ধারণার কোন প্রমাণ নাই।

আমরা অভিভাবকদের, ছাত্রীদের এবং সকলকেই জানাতে চাই যে ছাত্রীসঙ্ঘ কেবলমাত্র রাজনৈতিক সঙ্ঘ নয়, কিংবা কেবলমাত্র জ্ঞান প্রচারের সমিতি নয়। কোন কিছু একটা বিশেষ দিকের চর্চ্চা করা ছাত্রীসঙ্ঘের উদ্দেশ্যও নাই এবং সে দিকে তার গতি ও নাই। সকল দিক দিয়া সকল ভাব দিয়া তরুণীগণকে সচেতন করে দেওয়াই হ'ল ছাত্রীসঙ্ঘের ব্রত। মন যদি জেগে ওঠে তবে আপনার পথ সে আপনিই বেছে নেবে, এই বিশ্বাস নিয়ে ছাত্রীসঙ্ঘ কাজ আরম্ভ করেছে। পূর্ব্বাহ্নেই একটা পথ বেঁধে রেখে, যাহাতে সবাই অন্ধভাবে অনুসরণ করে, তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করার যে মূর্খতা তার হাত থেকে ছাত্রীসঙ্ঘ অব্যাহতি পেয়েছে।

ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে তুল্‌তে হলে যে যে উপায় গ্রহণ কর্‌তে হয় ছাত্রীসঙ্ঘ তার সবগুলিকেই নিয়েছে।

ছাত্রীসঙ্ঘের একটী পাঠাগার আছে, আলোচনাসমিতি আছে ও ব্যায়ামসমিতি আছে, এই তিনটীরই কাজ বহুদিন ধরে সুন্দর ভাবে চলে আস্‌ছে।

ছাত্রীসঙ্ঘ পাঠাগার :—ছাত্রীসঙ্ঘের পাঠাগারে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, দর্শন, অর্থনীতি ইত্যাদি সকল বিষয়ের সকল ভাবের পুস্তকই সংগৃহীত করা হয়েছে। বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ ভাবুক ও মনীষিদের অধিকাংশ রচনাই এখানে আছে। যে কোন ছাত্রী ই যে ছাত্রীসঙ্ঘ পাঠাগারে যোগদান

করিলে জ্ঞানরাজ্যের উন্নত চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসিবেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কেবলমাত্র অতীতের নয়, বর্ত্তমান জগতের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হ'লে ছাত্রীদের এই পাঠাগারে যোগদান করা কর্ত্তব্য। পুঁথির পুস্তকের অন্তরালে, পরীক্ষায় টেক্সট্‌বুকের বাইরেও যে অগাধ অপার চিন্তাস্রোত জগতকে ভাসিয়ে ছুটে চলেছে তার স্পর্শ লাভ কর্‌তে না পার্‌লে ছাত্রীদের মন কখনই সজীব গতিবান্ হতে পার্‌বে না। বর্ত্তমান জগৎ—বিংশ শতাব্দীর জগৎ দাঁড়িয়ে নাই, সে ছুটে চলেছে, নব নব আবিষ্কার, নব নব জ্ঞান, নব নব চিন্তার সঙ্গে তাল রাখা যেন এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে মানব এই সজীব, জাগ্রত জগতের গতিধারার সঙ্গে যোগ রাখ্‌তে পার্‌বে সেই শুধু বাঁচবে, যে তাহা পারবে না, মর্‌তে তাকে হবেই। তাই আজ ছাত্রীদের তরুণীদের বাঁচাতে হলে, জগতের গতির সঙ্গে গা মেলাতে হলে, জগতের চিন্তাধারার সঙ্গে যোগ রাখ্‌তেই হবে।

ছাত্রীসঙ্ঘের প্রত্যেক সভ্যাই পাঠাগারে পুস্তক পাঠের সুযোগ লাভ করেন, তাঁহারা নিজ নিজ গৃহেও পুস্তক লইতে পারেন। ইহা ভিন্ন কলিকাতার মহিলাদের স্কুল ও কলেজগুলিতেও অপরাপর ছাত্রীদের মধ্যে ছাত্রীসঙ্ঘের পুস্তক বিতরণ করিয়া, ছাত্রীদের মধ্যে চিন্তাশক্তি জাগ্রত করাইবার প্রয়াস করা হয়।

পাঠাগারে কেবলমাত্র পুস্তক পাঠ করান ভিন্ন আর একটী উপায়ে ছাত্রীদের চিন্তাশক্তি জাগ্রত করাইবার প্রয়াস করা হয়। খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ইত্যাদি অনেকেই ছাত্রীদের মধ্যে আসিয়া প্রায়ই নানা বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন। এই সব বক্তৃতাগুলিতে কেবলমাত্র ছাত্রীসঙ্ঘের সভ্যা নয়, কলিকাতার সমস্ত স্কুল, কলেজের ছাত্রীরা এবং অপরাপর বহু মহিলা যোগদান করেন এবং নিজেদের চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ সাধন করেন। গত বৎসরেও সাহিত্য সম্রাট্ শ্রদ্ধেয় শরৎ বাবু, অধ্যাপক নৃপেন বাবু, সার পি, সি, রায়, ডাঃ কালিদাস নাগ ইত্যাদি বহু মণীষী ছাত্রীসঙ্ঘে আসিয়াছেন।

ছাত্রীসঙ্ঘে আলোচনা সমিতি—বর্ত্তমানযুগে শিক্ষিত নরনারীমাত্রেই আলোচনার মূল্য যে কতখানি তাহা সুন্দররূপেই বুঝেন। বিচার, বিতর্ক, আলোচনা জীবনের গতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে জড়িত হয়ে গেছে। এ যুগটাকে বলা যেতে পারে চিন্তার যুগ। ভাবের আবেগে গা ঢেলে দেওয়া, যে যত বল্‌ছে, বিনা বিচারে, বিনাতর্কে মেনে নেওয়া অর্থে নিজের স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে, জাগ্রত মনকে ধ্বংস করে ফেলা এ কথা আজ শিক্ষিত নরনারীমাত্রেই স্বীকার করে। বেঁচে থাক্‌তে হলে স্বাধীন চিন্তাশক্তি চাই, জীবনের প্রত্যেকটী খুঁটিনাটীকে বিচার করে তলিয়ে ভেবে তবে তাহা গ্রহণ করা উচিত। এইজন্য ছাত্রীসঙ্ঘের পক্ষে আলোচনা সমিতির মূল্য অনেকখানি। প্রতি-সপ্তাহেই ছাত্রীসঙ্ঘের আলোচনা-সমিতির অধিবেশন হয়। বহু ছাত্রী সমবেত হয়ে বহু বিষয়ের আলোচনা, তর্কবিতর্কের দ্বারা মত ও পথের সুস্পষ্ট ধারণা করিতে সক্ষম হয়। পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের ফলে সমস্ত ছাত্রীমণ্ডলীর মধ্যে একটা ঐক্যের নিবিড় বন্ধন স্থাপিত হয়েও উঠ্‌ছে।

ছাত্রীসঙ্ঘ ব্যায়াম সমিতি ঃ—বাংলার মেয়েদের স্বাস্থ্যের অবস্থা কেমন ? বাংলার তরুণীরা, ছাত্রীরা যারা নতুন সমাজ গড়বার ভার নেবে, দেশের বুকে নতুন প্রেরণা আন্‌বে তাদের জীর্ণ শীর্ণ দেহযষ্ঠীর দিকে তাকালে মনে হয় নাকি এ সব আশা দুরাশা ? চোখে যাদের দীপ্তি নাই, বাহুতে যাদের শক্তি নাই, তারা কি জগতে কোন কাজ কর্‌তে পারে ?

পার্ব্বত্য রমণীদের দিকে তাকালে, পাশ্চাত্যের নারীদের দিকে তাকালে আমরা বুঝ্‌তে পারি যে আমাদের স্বাস্থ্যের কতদূর উন্নতি হওয়া সম্ভব ছিল এবং এখন কি হয়েছে।

বাংলার মেয়েরা স্বাস্থ্য হারিয়েছে এ কথা অসঙ্কোচে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু এজন্য দায়ী কে ? আমরা বল্‌তে পারি এজন্য দায়ী সমাজ ও সমাজ-ব্যবস্থাকারী। কিন্তু এই দুরবস্থায় আমাদের সেই এনে থাক্‌, আজ আমাদের এই লুপ্তস্বাস্থ্য ফিরিয়ে আন্‌বার সাধনা কর্‌তেই হবে। এবং সে ভার আমাদের নিজেদের হাতে তুলে নিতেই হবে, তা ভিন্ন আর গতি নাই।

বাংলাদেশে পুরুষদের ব্যায়াম চর্চ্চার জন্য অনেকগুলি ব্যায়াম সমিতিই আছে, বহু বালক, কিশোর এতে যোগ দিয়ে শরীরকে ব্যায়াম পুষ্ট, সুস্থ, সতেজ করে তুলেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মহিলাদের জন্য কত অল্পসংখক ব্যায়ামসমিতিই না প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ছাত্রীসঙ্ঘ ব্যায়াম সমিতি এই ভার গ্রহণ করেছে, এবং তাহা সার্থক কর্‌বার সাধনাও কর্‌ছে।

কলিকাতার বিদ্যাসাগরষ্ট্রীটস্থ একটী বিস্তৃত মাঠে বাায়ামসমিতি খোলা হয়েছে। শ্রীপুলিনবিহারী দাস মহাশয় ছাত্রীদের লাঠী, ছোরা খেলা ব্যায়ামচর্চ্চা শেখান ইত্যাদির ভার গ্রহণ করেছেন! মহিলাদের মোটর, সাইকেল ইত্যাদি চালাইবার শিক্ষাও এখানে দেওয়া দেওয়া হয়। সম্প্রতি ছাত্রীসঙ্ঘের কতিপয় মহিলা সাইকেল করিয়া বহুদূর ভ্রমণ করে এসেছেন।

বিশ্বের নারীশক্তি আজ সবেগে, সগর্ব্বে ছুটে চলেছে। কাগজে দেখ্‌ছি বৈমানিক নারী দেশ দেশ অতিক্রম করে ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশের বুকে, সাঁতরে পার হচ্ছে ইংলিশ চ্যানেল, ব্যায়ামপুষ্ট সতেজ, সবল শরীর নিয়ে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ কর্‌ছে অনায়াসে।

ছাত্রীসঙ্ঘ প্রমাণ কর্‌তে চায় যে প্রাচ্যের নারীরাও পাশ্চাত্যের ভগিনীদের তুলনায় শারীরিক শক্তিতে ন্যূন নয়। সুযোগ এবং সুবিধা পেলে এই বাংলা দেশের মেয়েরাই লাঠী চালাতে পারে বিমান পোতে উড়্‌তে পারে, প্রয়োজন হ'লে যুদ্ধ ক্‌রতে পারে।

ছাত্রীসঙ্ঘের সংক্ষিপ্ত কর্ম্মবিবরণী আমরা দিলাম। আমরা সমগ্র ছাত্রীমণ্ডলীকে ছাত্রীসঙ্ঘে যোগ দিতে আহ্বান কর্‌ছি। সামান্য কয়জন তরুণীর প্রাণপণ উদ্যম ও বিপুল প্রয়াসের ফলে ছাত্রীসঙ্ঘ গড়ে উঠেছে এবং আজ পর্য্যন্ত কাজ চালাচ্ছে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না সহস্র সহস্র ছাত্রী ছাত্রীসঙ্ঘকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করে, তার ভাবধারাকে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়ে এনে, ভারতের অনড়, অচল নারী সমাজের বুকে জাগরণের উন্মাদনা এনে দেবে, ততদিন পর্য্যন্ত ছাত্রীসঙ্ঘের সাধনা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

দেবদাসী

শ্রীমমতা মিত্র

পুষ্প ভূষণে সাজায়ে অঙ্গ আজ তুমি একা জাগি
এ ঘোর নিশীথে কাহার আঁখির করুণা প্রসাদ মাগি ?
পাষাণ দেবতা কোন দিন কিগো চাহিবে নয়ন তুলে
চৈত্র রাতের উতলা বাতাসে ক্ষণিক আবেশে ভুলে !
যৌবন তব হইবে সফল যাহার সোহাগ পেয়ে
তারি তরে বুঝি অনিমেষ চোখে সারা রাত আছ চেয়ে ?
সকলি মনের ভুল,
পাথরের বুকে কোন দিন হায় ফোটে না প্রেমের ফুল।

অতীতের কোন উজল প্রভাতে নবীন ফাগুন তোরে
পরশ করিয়া রূপে রসে তব দিয়েছিল তনু ভরে,
জাগিয়া প্রথম অবাক্ নয়নে চেয়েছিলে ধরা পানে
রঙিন কত না আশা অভিলাষ উঠেছিল ফুটে প্রাণে।
দেবতার সাথে মিলনের কথা দিবা রাত্তি অনুক্ষণ
তব বর দেহে বাজায়ে তুলিল পুলকের শিহরণ।
কোন্ সে অতীত সাঁজে
মায়াময় তব আঁখি তারা দুটি মুদেছিল সুখ-লাজে।

প্রতি রাত তব বৃথাই কাটিছে লয়ে পূজা সম্ভার,
ধীরে নিশি আসে সুগভীর হ'য়ে, নাই দেখা দেবতার।
কত না যামিনী কাটাও জাগিয়া দেউলের দ্বারে বসে
ফুল সাজ তব রজনীর শেষে শুকায়ে পড়ে যে খসে।
আঁখির কাজল হয় গো মলিন, শীর্ণ মুখের হাসি,
ফুটিবার আগে কমল-কলিকা ঝরিয়া হও হে বাসি।
ব্যর্থ অশ্রুজল,
বাঁধন হারায়ে সিক্ত করে গো পাষাণ সোপান-তল।

ও যে প্রাণহারা, ও যে গো পাষাণ কামনা বাসনা হীন
অধীর আবেগে তোর পানে হায় চাহিবে না কোন দিন
কার পায়ে তুমি সঁপিয়াছ নারী যৌবনভরা দেহ,
ওর মনে নাই কামনার লেশ ওর বুকে নাই স্নেহ।
ভালবাসা তব পারে না সঁপিতে কঠিন পাথরে প্রাণ,
যা কিছু তোমার দিয়েছ দিতেছ নাহি পাও প্রতিদান।
তবুও কিসের আশে
দিবারাতি কেন রহিয়াছ জাগি নিঠুর প্রিয়ের পাশে?

নৃত্যের কলা ও কৌশল

শ্রীপরিচিতা দেবী

যতপ্রকার শিল্পবিদ্যা আছে, তাদের মধ্যে নৃত্যকলাই বোধহয় সবচেয়ে কঠিন বিদ্যা। শুধু আগ্রহ থাক্‌লেই এ বিদ্যা শেখা যেতে পারে না। এ কথা জোর দিয়ে বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না যে নৃত্যও রীতিমতভাবে শিখ্‌তে হয়, নৃত্যকলার উপর পরিপূর্ণ দখল রাখ্‌তে হ'লে খুব কষ্ট স্বীকার করে তা আয়ত্বে আন্‌তে হয়; শুধু নামমাত্র স্বাভাবিক অনুপ্রেরণা থাক্‌লেই নৃত্য শেখা যায় না। কোন জাতির জীবন ও অন্তরের ভাব প্রকাশ নৃত্যের ভিতর দিয়ে হয়, এই ভাব ও হৃদয়ের আবেগ সমগ্র পৃথিবীতেই প্রায় এক প্রকার দেখা যায় তবুও বিভিন্ন লোক এ সমস্তকে বিভিন্নরূপে ফুটিয়ে তোলে। তাদের ভাবসমূহ প্রকাশের জন্য নানাপ্রকার নৃত্যকলার সৃষ্টি হয়। কোন দেশের নৃত্যের আবির্ভাব হ'লে তা যেন সেই দেশের জাতীয় শিল্পের অনুসরণ করে চলে। যুগযুগান্তর ধরে যে ভাব দেশের ভিতরে বিকাশ লাভ করেছে সেটাই যেন নৃত্যকলার সূচনায় থাকে; এর সাধনাই প্রথমে দরকার তাহলেই ধীরে এগিয়ে গিয়ে উন্নতি সম্ভবপর হবে।

এ কথা সত্য যে আমাদের দেশে অন্যান্য বিদ্যার মধ্যে নৃত্যকলাই সবচেয়ে ধ্বংসের পথে ও অবহেলার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে একদিন এ দেশে নৃত্যকলার সরল সংস্কার ও বিকাশ হয়েছিল। প্রাচীন পুঁথিগুলি খুল্‌লেই দেখ্‌তে পাওয়া যাবে যে বহুযুগ পূর্ব্বে যে সকল উৎকৃষ্ট নৃত্যকলার অনুশাসন দেওয়া হয়েছিল সেগুলি এত উঁচুদরের যে আজ পর্য্যন্তও কোন দেশে সেগুলিকে কেউ হারাতে পারে নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে নৃত্যকলা ধ্বংসের

পথে গেলেও এবং জনসাধারণ যদিও এর যথার্থ সমজদার নয় তবুও সবই একেবারে নিঃশেষ হয় নাই। বংশপরম্পরাগত যে ভাব তার উপযুক্ত প্রকাশক এখনও দেখ্‌তে পাওয়া যায়, আমরা যদি সত্যই নৃত্যকলার পুনরুত্থান কর্‌তে চাই তা'লে এই সকল সুদক্ষ নৃত্যকলাবিদ্‌গণের নিকট হতে তা শিখ্‌তে হবে। যারা স্বেচ্ছামত ভারতীয় নৃত্যকলা সম্বন্ধে নিজেদের অভিজ্ঞ বলে প্রচার করেন তাদের দ্বারা যেন বিপথে চালিত না হই। যে যুগে আমরা সকলের চেয়ে অধম এই মিথ্যা সন্দেহে জর্জ্জরিত হয়ে আছি সে যুগে এ কথা জোর দিয়ে বলা চলে না। আমাদের পরম হিতৈষী প্রতিচ্যবাসীগণ যারা আমাদিগকে ভারতীয় নৃত্যকলা শেখাবার ভার নিয়েছেন তারা একথা বুঝ্‌তে পারেন না যে তাদের শারীরিক গঠন আমাদের দেশের নৃত্য ভঙ্গীর সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিভিন্ন দেশে যে বিভিন্ন প্রকারের নৃত্যকলার বিকাশ দেখা যায় তার সহিত বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন শারীরিক গঠনের কোন কার্য্যকারণ সূত্রে যোগ আছে।

এখন যে কথা বল্‌ছিলাম—আমাদের ভারতীয় কলার আদর্শ যে সকল সুদক্ষ নৃত্যবিদ্‌গণ এখনও বর্ত্তমান তাদের নিকট হতেই নেওয়া উচিত। আমাদের সময়ের সবচেয়ে সমকালবর্ত্তী যে আদর্শ আমরা পাই তা হচ্ছে উত্তর ভারতের কথক (kathaka) এবং দক্ষিণ ভারতের কঠকলি (kathakali) নৃত্য। প্রাচীনকালে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ এই কথক নৃত্যে যোগদান কর্‌তেন। পৌরাণিক কাহিনীতে পাওয়া যায় যে এই নৃত্য পার্ব্বতীর প্রতি আরোপ করা হয়েছে কারণ তাঁকেই এর প্রথম প্রদর্শক বলে অনুমান করা হয়েছে। এই নৃত্যের নাম লাস্য নৃত্য। পুরাণে যে তাণ্ডব নৃত্য আছে তাই কঠকলি (kathakali) নৃত্য। এই তাণ্ডব নৃত্য প্রথমে বোধহয় মহাদেব পরে কালিয়দমনকালে কৃষ্ণ দেখিয়েছিলেন। ইহা মুখ্যতঃ পুরুষের নৃত্য, পুরুষোচিত শৌর্য্যবীর্য্যে পরিপূর্ণ।

এই সকল নৃত্যের যে সকল অনুশাসন আছে সংস্কৃত গ্রন্থ হ'তে বৈদ্যনাথবাসী পণ্ডিত বিশ্বনাথ সেগুলি অনুবাদ করেছেন। তাতে দেখা যায় যে হাতের ভঙ্গী, মুখের ভাব চলার ভঙ্গী ও পায়ের গতি, সকলের ভিতরেই একটা একতা ও ছন্দের মিল থাকা দরকার। সংস্কৃতগ্রন্থের কবিত্বপূর্ণ উক্তিতে বলা যেতে পারে যে "পুষ্করিণীতে সাঁতার দেওয়ার সময় মাছের যে গতি দেখা যায় হাতের ভঙ্গী সেরকম হওয়া চাই।" আমাদের গদ্যময় যুগে তার অর্থ এই যে হস্তদ্বয় নমনীয় ও কোমল হওয়া প্রয়োজন, কোন কিছু যেন আকস্মিক ও অসম্পূর্ণ না হয়। "রাজহংসের গতি ভঙ্গীর মত গতি অথবা দ্রুত সঞ্চালিত পক্ষের ন্যায় চলার ভঙ্গী হবে।" এর অর্থ এই যে নৃত্যকালে কোন কোন সময় গতিভঙ্গী কোমল সম্পূর্ণ ও মৃদুমন্দ কখনও বা দ্রুত সজীব হবে; এ সব অবশ্য নর্ত্তক বা নর্ত্তকী নৃত্যে যে ভাব প্রকাশ করতে চায় তার উপর নির্ভর করে। "লম্ফ প্রদানের পূর্ব্বে অশ্বের শরীর যেরূপ হয় শরীরটাকে সেরূপ ভাবে রাখ্‌তে হবে "এর অর্থ এই যে দেহকে সোজা ও খাঁড়াভাবে দাঁড় করানো প্রয়োজন কিন্তু তা সত্ত্বেও নমনীয় হওয়া চাই।"

"শরীর হাত ও বাহুদ্বয়ের রেশমের ন্যায় কোমল হওয়া দরকার।" হাতে সকল প্রকার গতি ভঙ্গীই সরল কোমল, সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ ও সুছন্দ হয়। "যে গভীর আনন্দে ময়ূর ময়ূরীর নিকট নৃত্য করে নর্ত্তক বা নর্ত্তকীর হৃদয়ের ভাব সেই রকম হওয়া চাই।" এতে এই বোঝায় যে যিনি নৃত্য করবেন, তিনি তার চতুপার্শ্বের সকল কিছু বিস্মৃত হবেন, তিনি নৃত্যের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হবেন; তার নৃত্য যেন সমগ্র দেহ মনের নৃত্য হয়, "চক্ষুদ্বয় ও মস্তক হস্তভঙ্গী অনুসারেই চলবে' এ কথা আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। "যিনি নৃত্য করেন তার যেন সম্মোহন করার শক্তি থাকে, যাতে তিনি মদনকে জাগাতে পারেন।' এর অর্থ এই যে দর্শকগণের উপর তাঁর ব্যক্তিত্ব যেন এরূপ প্রভাব বিস্তার করে যে সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখবে। নৃত্য এরূপ হওয়া উচিত যে মণীষিগণও আনন্দ লাভ করবেন এবং আদর্শের উৎকর্ষের প্রশংসা করেন অথচ জনসাধারণও যাদের এর উৎকর্ষতা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই তারাও এর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে যাবে, এর আদর্শের সম্পূর্ণতার জন্যই কারণ তা সম্পূর্ণ না হলে নৃত্য কখনও সুন্দর হওয়া সম্ভবপর নয়।

দেশের ভিতর কতগুলি বিকৃত, মনগড়া ও নানাপ্রকারের গ্রাম্য নৃত্য দেখতে পাওয়া যায়। হোলির সময়ে রাস্তায় রাস্তায় দলে দলে লোকেরা যে নৃত্য করে এ দৃশ্য সর্ব্বদা দেখা যায়। কিছুদিন আগে বোম্বাই প্রদেশে বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব কালে কয়েকজন স্ত্রীলোক ধর্ম্মের আবেগে একপ্রকার উন্মত্তের মত নৃত্য করতে করতে সমুদ্রের তীরে পর্য্যন্ত গিয়েছিল তারপর সেখানে তারা ক্লান্তিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। কোলি মৎসজীবীদের মধ্যে একপ্রকার নৃত্য দেখা যায় যাতে দাঁড় দিয়ে নৌকা চালানো ও জাল ফেলা এমন সুন্দরভাবে দেখানো হয় যে মুগ্ধ হতে হয়।

এ সমস্ত হতে বোঝা যায় যে আমাদের দেশে নৃত্যের একদিন বেশ বড় স্থান ছিল এবং এখনও আছে। যে সকল গ্রাম্যনৃত্য আমি দেখেছি সেগুলি প্রাণবান্ ও গতিশীল এবং যদি অভিনয়ের উপযোগী করে সাজান যায় তাহলে এর ভিতর অসীম সৌন্দর্য্য বিকাশের সম্ভাবনা। কিন্তু একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে দেশের আবহমান প্রচলিত কলা সৌন্দর্য্যের উপর সম্পূর্ণ অধিকার না থাকলে এসব সম্ভবপর নয়। এ পারলেই নৃত্যের উন্নতি ও অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা।

নৃত্যকলার পুনরায় বিকাশ সাধনে আমরা চিত্র ও ভাস্কর্য্য বিদ্যার সাহায্যে জ্ঞান লাভ করতে পারি। এই সকল সূত্র হতে ও পুরানো সংস্কৃত পুঁথিপাঠে জানা যায় যে কথকনৃত্যে ও কঠকলি নৃত্যের বহুপূর্ব্বে আমাদের দেশে শরীরগঠনক্ষম নৃত্যের অত্যন্ত উৎকর্ষ হয়েছিল। ভরতের ন্যায়শাস্ত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে সম্পূর্ণরূপে শুধু নৃত্যের বিষয় লেখা আছে সেই নৃত্য বর্ণনার চিত্র দক্ষিণ-ভারতের চিদম্বরমে মন্দির গাত্রে খোদিত দেখতে পাওয়া যায়। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে নৃত্যের বর্ণনা আছে তা একেবারে শরীর গঠনের উপযোগী ও কোন কোন সময়ে ব্যায়ামসম্বন্ধীয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজকাল এ সবনৃত্য প্রদর্শিত হলে অনেক সমালোচনা হবে এবং লোকে বলবে যে এগুলি ভারতীয় নৃত্য নয়, অন্ততঃ পক্ষে প্রতীচ্য ছাপ পড়েছে।

. নৃত্যকলার পূর্ণবিকাশ সাধনে আমাদের সাহায্যের জন্য যে সকল উপাদান আছে আমি সেগুলি যথেষ্টবলে নির্দ্দেশ করতে পারি না কিন্তু আমাদের এর অন্তর্নিহিত ভাবগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা উচিত; প্রাচীন চিত্র ও ভাস্কর্য্য এবং গ্রাম্যনৃত্যে যে সমস্ত উপাদান পাওয়া যায় তা ঠিক ভাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন।

এভাবে আমরা যে নৃত্যকলার আবির্ভাব হচ্ছে তাকে সজীব, সুষ্টু, উন্নতিশীল ও বিচিত্র করে তুল্‌তে পারি। নর্ত্তক বা নর্ত্তকীর মত জনসাধারণেরও কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, তাদেরও সমালোচনা শক্তির প্রসারতার প্রয়োজন। কারণ উপযুক্ত সমালোচনার অভাবে অর্থশূন্য অঙ্গভঙ্গীও নৃত্যেবলে চলে যায় ও লোকের প্রশংসা পায়। এর অভাবে নৃত্যকলার সমাজে শুধু অনর্থক অসার আনন্দ উপভোগের পথে দাঁড়াবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। তাতে আমরা নৃত্যকে যে চৌষট্টী কলার একটী বলে পুনরায় প্রকাশ করতে চাই যে বিষয়ে বাধা পড়ে।

নর্ত্তক বা নর্ত্তকীর কোন বিশেষ নৃত্যের অন্তর্নিহিত ভাব শেখ্‌বার পূর্ব্বে প্রথমে তার: শরীরের প্রত্যেক মাংসপেশী, ভার ও সমতার উপরে সম্পূর্ণ অধিকার ও তালমাত্রার জ্ঞান থাকা চাই। মাংসপেশী ভার ও সমতার উপর দখল রাখিতে হইলে যিনি নৃত্য করতে ইচ্ছুক তার নৃত্যোপ-যোগী কঠোর শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়োজন এ কথা সকলেই ভুলে যায় কিন্তু এটা না হলে কিছুতেই নৃত্য শেখ্‌বার আশা নাই। কঠিন ও সুদীর্ঘ নিয়মাদির প্রয়োজন। অধিক কি যখন নর্ত্তকহিসাবে বেশ কতকটা দক্ষতা লাভ হয়েছে তখনও ব্যায়ামাদি প্রতিদিন প্রণালীবদ্ধ ভাবে করা উচিত। নৃত্যোপযোগী ধীশক্তি ও ছন্দের জ্ঞান লাভ কর্‌তে হলে তবলা ও মৃদঙ্গের সাহায্যে নিয়মমত নৃত্য করা উচিত।

লাস্য ও তাণ্ডব নৃত্যের জন্য এ সকল নিয়মাদির প্রবর্ত্তন হয়েছিল কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের নৃত্যেও এ সকল নিয়মই চলে। দুই প্রকার নৃত্যের মধ্যে লাস্য নৃত্যের ভঙ্গী আরও কোমল ও স্ত্রীজনসুলভ! কিন্তু তাণ্ডব নৃত্য শৌর্য্য বীর্য্যে পরিপূর্ণ ও পুরুষোচিত। লাস্যনৃত্যে চরণ যুগল সকল সময় সরলভাবে ধরে রাখ্‌তে হয় কিন্তু তাণ্ডব নৃত্যের সে দুটী বাঁকা করে ধরে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠী ও গুলফ্ দ্বারা মাটীতে আঘাত কর্‌তে হয়। এই নৃত্যে নানাপ্রকারের লম্ফঝম্ফ ও দ্রুত ঘূর্ণন দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

এ সকল নৃত্যের যথার্থ প্রকাশক আজকাল বড় দেখা যায় না কিন্তু বর্ত্তমানে এই কঠক নৃত্যের সব চেয়ে বড় নর্ত্তক হচ্ছেন কল্কবিন্দ (Kalka Beenda)। তাঁর শিষ্যসংখ্যা অত্যন্ত অল্প তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় তার পুত্রাদি আসান ও সুকু এবং পণ্ডিত সীতারাম মিশ্র। কিন্তু আমার মনে হয় এখনকার ও পুরাকালের নৃত্যের ভিতরে প্রভেদ এই যে এখন নৃত্যে শুধু দক্ষতা প্রকাশ করা হয় এবং নৃত্যের তেমন সমাদর নেই বলে এর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে গেছে। এই কলাবিদ্যার মূল নীতিগুলি এখনও শিখ্‌তে পারা যায়। যদিও খুব কষ্টসাধ্য ও সাবধানে শিখ্‌তে

হবে তবুও এর সংযোগ প্রয়োজন। নৃত্যকে কেবল সুসম্পূর্ণ নিয়মাদির প্রকাশ না করে সমগ্রভাবে সৌন্দর্য্যের বিকাশ সাধন করার ইচ্ছা থাক্‌লে এ জিনিষটী আবার সচ্ছন্দ সরস নৃত্যে পরিণত করা প্রয়োজন।

আমি এখন নৃত্যকালে হস্তদ্বয় কি ভাবে ব্যবহার করতে হয় ও না কর্‌তে হয় তাই বল্‌বো। প্রত্যেক হস্তে যেমন তেমনই শরীরের প্রত্যেক অংশেও স্বচ্ছন্দ গতি থাকা অবশ্য দরকার। এটা দরকারী যে বিষয়ের উপর জোর না দিয়ে আমি পারি না; এ জিনিষটা সফল না হলে কোন নর্ত্তকেরই সন্তুস্ট থাকা উচিত নয়; কারণ সকল নৃত্যে বিশেষতঃ আমাদের নৃত্যে হাতের খেলা একটী প্রধান বস্তু। হস্ত ও অঙ্গুলীর গতি সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ ও বিশেষ নাম আছে। সেগুলি কঠক ও কঠকলি নৃত্যে বিশেষ উদ্দেশ্যে ও অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। নৃত্যকলা কার্য্যকরী হতে হলে তার পিছনে কিছু অর্থ থাকা যেমন উচিত, সেরূপ হস্তসঞ্চালনের ভিতরের এরূপ কোন ভাব থাকা উচিত যা দর্শকের মনে বিশেষ অর্থ বহন করে। এখন আমি তোমাদের যা বোঝাতে চাই সেটাই লিখ্‌বো এবং কতগুলি মুদ্রা, সেগুলি কেমন করে করা উচিত ও অনুচিত সেটাই ব্যাখ্যা কর্‌বো।

(ক) ভ্রমর

(খ) পদ্ম অথবা পদ্মহস্ত

(গ) কৃষ্ণের বাঁশী

(ঘ) গরুড় বা পক্ষী হস্ত

(ঙ) শিখর হস্ত বা বিদ্রূপ নৃত্য।

(চ) জলপাত্র ইত্যাদি উত্তোলন।

(ছ) মানুষ বা ধনুক ও বান।

(জ) কৃষ্ণের গোপীদিগের সহিত লীলা।

এখন আমি দেহের অবস্থিতি সম্বন্ধে লিখ্‌বো। এগুলি ভাস্কর্য্যের সাহায্যে আমাদের নিকট অতি সুপরিচিত সুতরাং নৃত্যের সহিত যোগ করলে খুবই ফল দেবে। যেমন "সমভঙ্গ" অথবা শরীরের সরল ভঙ্গী, এ সময়ে দেহের ভার দুই পায়ের মধ্যে সমভাবে বিন্যস্ত করা হয়। এই অবস্থিতি প্রশান্ততা, গাম্ভীর্য্য, শান্তি অথবা ধ্যানের ভাব প্রকাশ করে। "অতিভঙ্গ" বা ঈষৎ বক্রস্থিতি দেহের কিঞ্চিৎ আরামসূচক ভাব-প্রকাশক। নৃত্যে এটা নানাপ্রকারভাবে ব্যবহৃত হয়, কখনও চঞ্চলভাব কখনও বা ছলাকলা প্রকাশিত। এইভাবে অবস্থানকালে দেহের ভার সেই পায়ের উপর পরে যে পায়ের পশ্চাৎ দেশ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়েছে; মস্তকও সেদিকে হেলানো উচিত। উল্টোদিকে নয়। যদিও সাধারণতঃ অনেক নর্ত্তক এরূপ করেন। তাহ'লে অল্পেই বোঝা যাচ্ছে যে সামান্য ত্রুটীতে শরীরের ভার ও সমতা একেবারেই বদলে যায় এবং রেখাগুলির সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট করে দেয়। তারপর 'ত্রিভঙ্গ' বা ত্রিবক্র স্থিতি। এটা প্রায়ই তাণ্ডব নৃত্যে বা শিবের নৃত্যে ব্যবহৃত

হয় এবং এ ধরণের নৃত্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষেরই উপযোগী। যদি কেউ শিবনৃত্য বা রুদ্রনৃত্য এইভাবে করে তাহলে সে ঐ নৃত্যের যে প্রথম পদক্ষেপ করে সেটা এখনও ত্রিভঙ্গ নৃত্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই নৃত্য কোন ক্রুদ্ধ শক্তির বিনাশ সূচনা করে।

চরণদ্বয়ের উল্লেখ না করাটা উচিত হবে না, কারণ পণ্ডিত সীতারাম কোন নৃত্য দেখে ফিরে এসে বলেছেন, আর তার সে বলাটা সত্যই যে, নর্ত্তক বোধহয় ভুলে যায় সাধারণতঃ নৃত্যের সময় পা ব্যবহার করা হয় না। এর অবস্থিতি ব্যবহার সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী যত্ন নেওয়া উচিত। আমি খুব নিশ্চয় করে বল্‌তে পারি যে নৃত্যের ভিতরে এটা একটা খুব বড় অংশ ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সবচেয়ে সহজ পদক্ষেপের সময়েও চরণের শক্তি ও অবস্থান সম্বন্ধে খুব যত্ন নেওয়া দরকার।

আমাদের জাতীয় নৃত্যে ছন্দের তালে তালে যে পদ-নিক্ষেপ আছে তা বিভিন্ন প্রকারের। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই সকল বিভিন্ন প্রকারের তাল অর্থভরা ও ফলপ্রদ ; একক নৃত্যে বা বহুজন একসঙ্গে নৃত্য কর্‌বার সময়ও আরও একটা প্রধান বিষয় আছে যা নর্ত্তকের পাঠ করা উচিত ; সেটা হচ্ছে মানচিত্রকারী বিদ্যা নৃত্যের আদর্শ চিত্রের সম্বন্ধে জ্ঞান। এর সাহায্যে নৃত্যের আদর্শ, নৃত্যের দলের বিভাগ এবং নৃত্যকালে একই সময়ে বহুলোকের গতি ভঙ্গী ঠিক কর্‌তে পারা যায়। এ বিষয়ের জ্ঞান না থাক্‌লে লোকে ইচ্ছামত নৃত্য করবে, ও তার এক প্রকারের ঘূর্ণন দুবার দেখা যাবে না।

এখন নৃত্যের উৎকর্ষ লাভের খুব একটা প্রয়োজনীয় বিষয় আনা গেল যেমন নৃত্যকালীন সঙ্গীত ; এতদিন আমাদের দেশে এদিকে যেটুকু মন দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত কম। বর্ত্তমানে যে নৃত্য দেখা যায়, সঙ্গীতবাদ্যাদি তার সঙ্গে একঘেয়ে সুরে শুধু বাজে ; নর্ত্তকগণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না থাম্‌তো ততক্ষণ পর্য্যন্ত একই পদ বারে বারে গাওয়া ও বাজানো হ'ত। আমার মনে হয় নৃত্যের ভাব ও চরিত্রের প্রকাশানুযায়ী হওয়া সঙ্গীতের পক্ষে একান্ত দরকার। আমার নৃত্যে আমি সঙ্গীত বাদ্যাদির এ প্রকার সংস্কার করেছি তাতে আমার খুব সাহায্য হয়েছে।

আরও একটা জিনিষের কথা ভুল্‌লে চল্‌বে না। আমাদের নৃত্যে আমি জাতীয় ভাবের স্থান নির্দ্দেশ করেছি, কিন্তু আমরা যে তারও বাইরে যেতে পারবো না, একথা বলি নাই। কিন্তু এই ভাবকে সকল প্রকারে সমৃদ্ধ কর্‌বার চেষ্টা যেন আমাদের থাকে, যাতে আমাদের বর্ত্তমান জীবনধারা আরও সুস্পষ্টরূপে এর দ্বারা প্রকাশিত হ'তে পারে। এ বিষয়ে প্রতীচ্য নৃত্য আমাদের অনেক কিছু শেখাতে পারে। ডিয়াগলিফ্‌ (Diaghiief) তাদের জাতীয় নৃত্যের সহিত বর্ত্তমান কালের শরীর গঠন ও ব্যায়ামমূলক ভাব মিশিয়ে এমন সুন্দর ও আশ্চর্য্যজনক নৃত্যকলার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আমাদের নৃত্যকলা সম্বন্ধে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য ? দেখা গেল যে নর্ত্তক বা নর্ত্তকীর

সুস্থ সুগঠিত সুপরিচালিত দেহ ও তাললয়ের জ্ঞান থাকা চাই। আমাদের দেশে যে সকল জাতীয় ভাবের নৃত্য দেখা যায়, নৃত্যকে সজীব ও সুন্দররূপে বিকশিত করার জন্য তার সবগুলি যে অধিকার করতে হবে। ও গতানুগতিক ভাবেই অনুসরণ করে চল্‌তে হবে এ কথা আমি খুব জোর দিয়ে বল্‌তে পারি না। তবে অর্থশূন্য অঙ্গভঙ্গী ও অভিনয়ের দ্বারা যারা জনসাধারণের মন হরণ কর্‌তে চেষ্টা করেন তাদের দৃঢ়ভাবে বাধা দেওয়া উচিত। আমাদের নৃত্য যে পাশ্চাত্যের নৃত্যের নকল ও ছলাকলার বিকাশ হবে এ আমরা চাই না, শুধু তামাশার চেয়েও আরও কিছু হবে এই আমরা চাই। এর ভিত্তি দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন। বস্তুতঃ ইহা সত্যিকারের নৃত্য হবে, এবং নৃত্য হিসাবেই এর বিচার করতে হবে। এমন অদ্ভুত কিছু হবে না যে বালকোচিত ও মূঢ়জনোচিত হলেও শুধু ভারতের বলেই এ চল্‌বে। ইহা আমাদের জাতীয় জীবন ও ভাব প্রকাশ করবে, যেন শুধু জাতীয় বিবরণ প্রকাশের ভঙ্গী না হয়। এইজন্য সব আবার বাঁচাতে হবে এবং শুধু কঠোর ও সজ্ঞান পরিশ্রমেই এ বিষয়ে চেষ্টা করা আশা করা যেতে পারে। আমাদের যে মহার্ঘ আদর্শের উপাদান আছে এবং আবহমান প্রচলিত জাতীয় ভাব আছে সেগুলি অধিকার করতে হবে তবেই আমাদের নৃত্যের কিছু উন্নতি সম্ভবপর। আমি আমার জীবন এদিকে উৎসর্গ করেছি, আমার আশা যে নারী ও পুরুষ আমার সহিত যোগ দেন তা'হলে আমরা একত্রে উদ্যমশীল ও উৎসাহী কর্ম্মী হয়ে এমন নৃত্যের সৃষ্টি করতে পার্‌বো যা সত্যই প্রশংসনীয়।

স্ত্রীধর্ম্ম হইতে অনূদিত

গান

শ্রীবেলা দেবী

ওরে ও পথভোলা তুই চল, মাভৈঃ, মাভৈঃ চল।
আছে যার পথের সাথী, তার ভয় কিসের বল!
পথে তুই নেমে কেন ফিরে যাস্ বারে বারে,
এ চলা যে চল্‌তে হবে বেদনার অশ্রুভারে,
মিছে তোর ফিরে-চাওয়া চোখভরা বাদল!
স্বপনের ওপার থেকে এসেছিস্ খেয়ায় ভেসে
যেতে হয় যাস্‌না কেন ওরে ভোলা আপনি হেসে,
চেয়ে দেখ জীবনপথে চল্‌ছে কারা অবিরল!
ওরে ও জীবনপথের পথটি তোর নয় অজানা,
যেতে হবে ওই পথে গো কারু যে নাইকো মানা,
বয়ে যায় গহীন নদী গান গেয়ে যায় কল কল,
জীবনের তান মিশায়ে তার সাথে আজ চল!
—মাভৈঃ মাভৈঃ চল!

ছাত্রীর পত্র

শ্রীইন্দ্রাণী দেবী

শ্রীচরণেষু

মাসিমা, আপনার চিঠি যথাসময়ে পাইয়াছি। আপনার চিঠিখানি আমার খুব ভাল লাগিল। আপনার সহিত আমার মতের এবং স্বভাবের যে কিঞ্চিৎ মিল রহিয়াছে এটা জানিয়া মনে বড় তৃপ্তি অনুভব করিলাম। আপনি যে লিখিয়াছেন ঐরূপ স্বভাবের জন্য দুঃখ পাইতে হয়, ইহা অতি সত্য কথা। আমি নিজে উহার জন্য অনেকবার অনেকের নিকট লজ্জা পাইয়াছি, কিন্তু তথাপি আজ পর্য্যন্ত নিজের স্বভাব বদলাইতে পারিলাম না। মনে মনে কতবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, মনে জোর আনিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত নিজের কাছে নিজে মিথ্যাচারী হইয়া রহিলাম। আর একটী আমার চরিত্রের ভীষণ দুর্ব্বলতা যে কাহারো সহিত স্পষ্টভাবে কথা বলিতে পারি না। এমন কি নিজের ভাইবোনদের সহিত কথা বলিতেও কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে। সব বিষয়ে নিজেকে এত ছোট মনে হয় যে অন্যের সহিত মিশিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। কি করিলে যে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে কিছুই বুঝিতে পারি না। ছোট বেলা হইতেই আমার একক এবং শান্ত জীবন যাপনের ইচ্ছা। লেখাপড়ার চর্চ্চা আজীবন রাখিতে মন চায়। জানিনা জগদীশ্বর কি করিবেন। আইএ, বি, এ, পাশ করিয়া Universityর ছাপ লইবার বাসনা আমার কোন দিনই নাই। কিন্তু আইএ, বি,এ পড়িলে কতকগুলি বাঁধা নিয়মের ফলে নিজের কিছু শিক্ষা হয় এবং ভবিষ্যতে জ্ঞানলাভের যথেষ্ট সহায়তা আছে এই ভাবিয়া এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছি। আর একটী কথা, আমাদের যেরূপ অবস্থা তাহাতে নিজেদের কিঞ্চিৎ অর্জ্জন না করিলে জীবিকা নির্ব্বাহ অসম্ভব। সেদিক দিয়ে Universityর ছাপ বিশেষ প্রয়োজনীয়। এইরূপ নানাবিষয় চিন্তা করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। যদিও নিজের অক্ষমতা নিজেকে অনেক সময় পীড়িত করিতেছে, তথাপি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া একটু আনন্দ হয়। আমাদের গ্রাম হইতে শান্তিনিকেতনে আসা—এরূপ অসম্ভব ব্যাপারও

মেয়েদেরও যে এখন অনেকস্থলে শিক্ষার ইচ্ছা কিরকম প্রবল হইয়াছে, আর কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তাহারা উহার জন্য চেষ্টা পাইতেছে পত্রখানি তাহারই নিদর্শন। ইহাতে যদি আর সব বালিকাদেরও মনে শিক্ষানুরাগ জাগ্রত হয়, আর দেশের লোককেও মেয়েদের শিক্ষা তথা উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থার জন্য এতটুকও উদ্বুদ্ধ করে এই আশাতেই আরো এই দুঃখকাহিনীটী প্রকাশ করা গেল। দেশের অবস্থাও ইহাতে খুবই প্রকাশ পাইতেছে। মেয়েটী রক্ষণশীল পরিবারের, আগে পড়াশুনার সুবিধা কিছুই পায় নাই। নিজের চেষ্টায় ঘরে পড়িয়া কোনমতে ম্যাট্রিকুলেশন দিয়াছিল।

যে আমার জীবনে সম্ভবপর হইতে পারিয়াছে এরূপ মনে করিতে বড় আনন্দ হয় এবং ইহার জন্য দাদার নিকটও আমি চিরকৃতজ্ঞ। বেচারী দাদা নিজের মাহিনা হইতে আমাকে ও বাড়ীতে পাঠায়। এইসব জন্য আবার কলেজে পড়িতে ভাল লাগে না। মনে হয় সব ছাড়িয়া দি। কিন্তু সব ছাড়িয়া দিলে নিজে কি লইয়া থাকিব? আর কিছুদিন দেখিব যদি দাদার উপর খুব বেশী চাপ দেওয়া মনে হয় তাহা হইলে কলেজ পড়া ছাড়িয়া দিব। এবং বাড়ীতে যা হয় নিজের চেষ্টায় অগ্রসর হইব। এসব চিন্তাকে অতি তুচ্ছ বলিয়া প্রকাশ করিলেও ভুলিতে পারা যায় না। যখনই নিজের স্বার্থে ঘা পড়ে তখনই ইহার প্রয়োজন বুঝিতে পারি। দারিদ্র্যদোষ যে গুণরাশি নাশ করে ইহা যথার্থ কথা। দারিদ্র্য আসিলে এক বনে জঙ্গলে সন্ন্যাসী হইয়া ফল মূল আহার করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। চারিদিকের ভাবনা আমাকে যেন আরো ক্লিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কোন আনন্দেই যোগ দিতে ইচ্ছা করে না, কিছু ভাল লাগে না।

শান্তিনিকেতন বেশভাল লাগিতেছে। বেশ কাজের মধ্য দিয়া দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছে। লেখাপড়া, গান বাজনা, খেলাধূলা ইত্যাদি যা কিছু জীবনের আনন্দদায়ক এবং শ্রেষ্ঠ জিনিষ তাহাই পাইয়াছি। আজকাল প্রত্যেক মঙ্গলবারে মেয়েদের গান বাজনা হয়। আর প্রতি বৃহস্পতিবারে উত্তরায়ণে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নতুন নতুন লেখা পড়েন। ওঁর মুখে ওঁর লেখা ও পড়া শুনতে এত ভাল লাগে। গত বৃহস্পতিবারে "প্রকৃতি", নামে লেখা নূতন একটী নাটক পড়িলেন। এটা চীনের গল্পের একটী ভাব লইয়া রচিত। এটা অনেকটা নটীর পূজার ধরণের লেখা। শ্রাবস্তীপুরে যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তখন প্রকৃতি নামে এক চণ্ডাল কন্যার নিকট বুদ্ধের শিষ্য আনন্দ এক ঘটি জল চাহিয়াছিলেন। তাহার পরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই এই নাটকটিতে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। নাটকটী বেশ কঠিন হইয়াছে। "রাজার" ধরণের ভাবও আছে।

পড়াশুনা ভালভাবে করিতে চেষ্টা করিতেছি কিন্তু সব জিনিষ এত কঠিন লাগিতেছে যে কিছুই ঠিকমত হইতেছে না। যাহাদের অনুভব করিবার শক্তি আছে, অথচ বুদ্ধি কম তাহাদের যে কিরূপ মুস্কিল তাহা বেশ উপলব্ধি করিতেছি।

আর কি লিখিব। আপনার শরীর কেমন আছে? আমি আজকাল ভালই আছি। প্রণাম লইবেন।

স্নেহার্থিনী ছায়া।

শরচ্চন্দ্র—বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর

"বঙ্গ-সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব" নামক নিবন্ধটী প'ড়ে সন্তুষ্ট হ'তে পারি নি। সন্তুষ্ট না হবার কারণ এ নয় যে আমি পাশ্চাত্য রীতিনীতিকে এদেশে আমদানী করতে চাই। রবীন্দ্র-সাহিত্য পাশ্চাত্য প্রভাবের দোষে দুষ্ট হ'য়ে প'ড়েছে, সে কথা সত্য কিন্তু শরৎচন্দ্রকে পাশ্চাত্যপন্থীদের পর্য্যায়ে ফেলে যা' তা' বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রতিবাদ তুলছি শুধু এই জন্যে যে সমালোচনায় সত্যকে ঢেকে মিথ্যাকথা প্রচার করতে যাওয়ায় নাম থাকতে পারে কিন্তু তার যে কোন দামই নেই, এ কথাও চরম সত্য। শরৎসাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব "ওতোপ্রোতোভাবে" জড়িয়ে থাকা দূরের কথা ও বস্তুটীর সন্ধান আমরা কোথাও পাই না।

শরৎচন্দ্র বাস্তবিক বাঙ্গালী। কার্ল মার্কস্ যে অর্থে জার্ম্মান, টলষ্টয় যে অর্থে রাশিয়ান, শরৎচন্দ্র ঠিক সেই অর্থেই বাঙ্গালী। তিনি বাঙ্গালীকে যে মনে প্রাণে ভালবেসেছেন তার প্রমাণ র'য়েছে তাঁর সাহিত্যে। বাঙ্গালার জ্বালাযন্ত্রণা, রোগ শোক তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। বাংলার সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর সাহিত্য ফুটে উঠেছে। কিন্তু কেন সেই কথাটাই আগে বলি।

যে কোন পাশ্চাত্য সাহিত্য পড়লেই সকলের আগে যে দুটী জিনিষ সাধারণ পাঠকের চোখে পড়ে যায়, তা হ'চ্ছে Love ও Heroism, Heroism আমাদের দেশে নেই ব'ল্লেই চলে সুতরাং এ নিয়ে সাহিত্য রচনা অসম্ভব। আর Love বলতে পাশ্চাত্যদেশের লেখকদের যা অভিমত তাও আমাদের এখানে শুধু অচল নয়, বটতলার উপন্যাসের মতই নিকৃষ্ট। সে রকম সাহিত্য প'ড়ে হাস্‌ব না কাঁদব, ঠিক বুঝতে পারি না। অথচ পাশ্চাত্যে এই দুটী জিনিষ না হলে সেটী সাহিত্যের মধ্যে গণ্য করা হয় না, হয়ে উঠে পাঁক। ঠিক এই জন্যেই Alexander Dumas, Scott, Stevenson, এর রচনাপদ্ধতি আমদানী করা চলবে না। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। Dumas এর "Count of Monte Cristo" একজন বীর ও প্রেমিক এই রকম অতিরিক্ত বীরত্ব ও প্রেমের অভিনয় শরৎসাহিত্যে আছে বলে আমাদের জানা নেই।

বলছিলাম যে বাংলার সমস্যাগুলিই তাঁর সাহিত্যে জীবন্ত উঠেছে। বাঙ্গালীর সুখ দুঃখ, স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ, ভালবাসার ব্যর্থতা ও উত্থানপতন তাঁর সাহিত্যের উপাদান। প্রথমে দেখি "অরক্ষণীয়া" এল তার দুঃখ নিয়ে। সে ছিল কালো ও গরীব। বিয়ে হবার সম্ভাবনা ছিল না। এই পণ-প্রথা পাশ্চাত্যে নাই, সুতরাং "অরক্ষণীয়ার" সমস্যা সম্পূর্ণরূপে এদেশের। এইখানে পোড়াকাঠের যে ছবিখানা দেখি পাশ্চাত্যে তার তুলনা মেলে না। তারপর "বিন্দুর ছেলে" ও "রামের সুমতি।" মাতৃস্নেহ এমনি পবিত্র এমনি সুন্দর হয়ে উঠা শুধু শরৎবাবুর লেখনীতেই সম্ভব হয়েছে। "হেমনলিনী" কে পথনির্দ্দেশ করাটা কি খুব ভাল হয়েছে? বিধবাবিবাহটা কি লেখিকা মহাশয়া পাপের পর্য্যায়ে ফেলতে চান না বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অপমান কোরলে তাঁহার মনস্তুষ্টি হয়? "গৃহদাহে" অচলার প্রতি তার কি একটুকু সহানুভূতি নেই? অচলা পাপের পথে চলেছিল, দেহের পবিত্রতা সে রক্ষা করতে পারে নি কিন্তু ঐ রুগ্ন স্বামীকেই ত সে চিরকাল ধ্যান ক'রে এসেছে। ভুল যখন সে বুঝতে পারলো, তার সমাজের সব পথ রুদ্ধ হ'য়ে

গেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি পাশ্চাত্যে কয়জন নারী এইরূপে অকুল পাথারে ভেসে বেড়াচ্ছে? "বিরাজবৌ" সাময়িক উত্তেজনায় বাইরে এসে দাঁড়ালো। এইটাই কি তার সবখানি সত্যি, তার ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি কিছুই নয়? বিরাজ বৌ ওদেশে কয়জন?

সমাজের এত বাঁধন কষণ ওদেশে নেই। বেপরোয়া ফূর্ত্তি চালাতে আমাদের দেশের নারীরা পারে না, তা সে যে যাই বলুক। সমাজের রক্তচক্ষু দেখে তারা আজও ভয় পায়। ঠিক এই জন্যেই "পরিণীতার" প্রাণের দেবতা আর্ত্তনাদ ক'রে উঠেছে, "আঁধারে আলোয়" সরযূ এই জন্যেই শান্তি পাচ্ছে না, "পথনির্দ্দেশে" হেমনলিনীকে এই জন্যেই বুকে একটা পাথর চাপিয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠানো হলো আর শেষকালে সে বিধবা হ'য়ে ফিরে এল। সমাজের ভয়েই ত কমলিলতা (শ্রীকান্ত ৪র্থ ভাগ) বৈষ্ণবী বেশ ধরে একটা আত্মগ্লানি ও ব্যর্থতার বোঝা বহন ক'রে আজও পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের দেশের নারীর যদি এতটুকু স্বাধীনতা থাকত কমলিলতাকে শেষপর্য্যন্ত শ্রীকান্তের কাছ থেকে সজল চক্ষে বিদায় হ'ত না।

শরৎচন্দ্র যদি পাশ্চাত্যপন্থী হোতেন "শ্রীকান্ত" লেখা তা হ'লে হ'ত কি না সন্দেহ। রাজলক্ষ্মী ও সুরলক্ষ্মীর যদি বিবাহে স্বাধীনতা থাকত ওরা জোর গলায় প্রতিবাদ তুলতো। লজ্জায়, কলঙ্কের ভয়ে তাদের পালিয়ে যেতে হ'ত না। সুরলক্ষ্মী গেল স্বর্গে, রাজলক্ষ্মীর জীবন অতিষ্ঠ হোয়ে উঠল। সেও ত নারী। তারও দেহের উপর তথা যৌবনের উপর দৈত্যরূপী কামনাগুলো নাচন সুরু করল তারা তাকে টেনে নিয়ে গেল পাপের পথে। কিন্তু সেই রাজলক্ষ্মীই আবার উঠে এল পঙ্কের থেকে পঙ্কোজিনীর মতো। মাতৃত্বের পবিত্রতা নিয়ে সেও আজ সমাজে তার দাবী জানিয়েছে। পাশ্চাত্যে রাজলক্ষ্মী নেই আছে "পিয়ারী"। মাতৃত্বের সিংহাসন তারা দাবী করছে না। তারা চাচ্ছে দেহের সুখ মনের স্বাচ্ছন্দ্য। অভয়ার মত সতী সাধ্বীর চিত্র ও দেশে কয়জন লেখক আঁকতে পেরেছে। স্বামীর কাছে বেতের ঘা খেয়েও যে তারই দাসী হোয়ে থাকতে চায় তার ছবি বিদেশীর তুলি দিয়ে বেরোয় না। অন্নদাদিদি ঘূর্ণিপাকে ঐ অভয়ার মতই দৈন্য দারিদ্র্য সহ্য ক'রে সাপুড়ে স্বামীর চরণতলে আত্মনিয়োগ করেছে, বিদেশীদের এ চিত্র আঁকবার সাধ্য নেই।

তারপর এল "চরিত্রহীনে"র কিরণময়ী ও সাবিত্রী। কিরণময়ী লাঞ্ছিতা অপমানিতা। নারীর আদর্শকে সে বুঝেছিল ছাপার অক্ষরে, তার প্রকৃত আস্বাদন সে পায় নি। জীবনের প্রতিটী মূহুর্ত্তে তার ক্ষুধিত নারী আর্ত্তনাদ ক'রে উঠেছে। পাশ্চাত্যে কয়জন নারী এর জন্যে পাগল হ'য়ে যায়? সাবিত্রীকে আমরা মেসের ঝি ব'লে গালি দিয়ে থাকি কিন্তু সে যে একটা মাতালের চরিত্র সংশোধন ক'রে দিলে, নীচ মানুষকে মহৎ ক'রলে, সে কথা ভুলে যাই। সে যে ভীষণ দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের দেহের পবিত্রতা অক্ষুন্ন রেখেছিল, তার কি কোন পুরস্কার নেই? এই "সাবিত্রী" চরিত্রের পরিকল্পনা পাশ্চাত্যের সাহিত্যরথীদের মাথায় ঢোকে নি। কোন টলষ্টয়, কোন টুর্গেনিভ, ইবসেন, মেটারলিঙ্ক এমন কি সেক্সপীয়রের মস্তিষ্কজাত বস্তু "সাবিত্রী" নয়।

এইবার বোলবো "শেষপ্রশ্নের" "কমলমণির" কথা। সকলে ব'লছেন কমলমণি বিলিতি। স্বীকার করি যে, সে মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিল অনুপম রূপ আর পিতার কাছ থেকে পেয়েছিল বিদ্যাবুদ্ধি।

কিন্তু এগুলি তার বাইরের সৌন্দর্য্য তার ভিতরে যে নারী বাস ক'রছে তা এই বাংলার। দুঃখে লাঞ্ছনায় সে ক্লিষ্ট। তাজমহলের নীচে সে যখন মহিষীদের প্রেমের বিফলতার কথা মনে ক'রে শিবনাথকে প্রশ্ন কর্‌লো—"হ্যাগা তুমিও কি করবে নাকি তাই · ···" মনে হয় বাংলার নারী এক সঙ্গে ক্রন্দন ক'রে উঠ্‌লো। আমরা শিবনাথের দোষ ধরি না, কমলকেই শুধু আসামী ক'রে কাঠগড়ায় দাঁড় করাই। কমলই ত শিবনাথের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ক'রে গেল। কিন্তু এ ছাড়া তার আর গত্যন্তর নেই। শেষপ্রশ্ন যদি পাশ্চাত্যের অনুকরণ হোতো রাজেনের মত লোককে দেখ্‌তে পেতাম না। অথচ রাজেন এত উচ্চ এত মহৎ যে হরেন্দ্রদের "ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে" সে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌লো। আমাদের দেশেও ব্রহ্মচর্য্যের যে একটা আধ্যাত্মিক দিক আছে তা আমরা ভুলে যাই আর বাহ্যাড়ম্বরে মেতে থাকি। কিন্তু রাজেন ও দলে না গিয়ে দেশের কাজে প্রাণ বিসর্জ্জন কোরেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই রাজেনের মত ছেলেদের দেখ্‌তে চেয়েছিলেন, "ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের অর্দ্ধভুক্ত গেরুয়াপরা ছেলেদের তিনি চান্‌ নি। তাই মনে হয় দেশবন্ধুর আদর্শ মূর্ত্তি পরিগ্রহ কোরেছে রাজেনের চরিত্রে।

আমি লেখিকার ভুল ভাঙ্‌তে চাই আর চাই সত্য বস্তুটী সাধারণ্যে প্রচার করতে। এর জন্য যদি কোন রূঢ় বাক্য প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে তাঁর অন্তরকে পীড়ণ করে তার জন্যে বারংবার আমি ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌ছি।

শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তীকর্ত্তৃক কার্ত্তিক সংখ্যায় জয়শ্রীতে প্রকাশিত 'বঙ্গ সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব প্রবন্ধের' সমালোচনা।

মনের মতন তবে

শ্রীপারিজাত দেবী

এত খোঁজ তোর কেন যে নিলুম, বলি তবে তাই শোন্‌;
মামীমার ভায়ের বিয়ের কথাটা নিয়ে যে এসেছি বোন্‌।
বাধ্য হয়েই আজকে যে আমি ধরেছি ঘট্‌কী সাজ্‌,
মনে হয় তাই তোর কথা শুনে বাড়ে বুঝি হাতে কাজ।
ওরা দুটি ভাই খুব সাদাসিধে, আকাশের চাঁদ নয়,
অথচ সহজে লাগাল পেতেও মনে হবে সংশয়।
বড় ভাইটির লম্বা চেহারা, এমনি চওড়া বুক;
কত গুণে গুণী অথচ দেখিনি দেমাকের লেশটুক।
ফর্সা তেমন না হলেও তার মুখখানি ভালো ভাই;

খুঁত ধরা যার অভ্যাস সে ও বল্‌বে না, "দূর্ ছাই।"
স্বাস্থ্য সবল সুস্থ চেহারা,— মেয়েলী মোটেই নয় ;
বিপুল শক্তি ওই দেহে তাই গুণ্ডা ও করে ভয়।
অথচ কেউ তো পালোয়ান্ তারে বলেনিক কোনোকালে ;
শুধুগায়ে তারে যে দেখে বলে, হ্যাঁ লোক্‌টা শক্তি পালে।
কুস্তিগীরের মস্ত ভূঁড়ি, কি স্যাণ্ডোর 'বাইসেপ্' ;
বাড়াবাড়ি তার নেইক কিছুরি,—মাঝামাঝি সব স্রেফ্।
দোষ গুণ এতে যাই বল আর 'ফ্রেঞ্চ-কাট্' দাঁড়ি গালে ;
ধূমপান ছাড়া পান খেতে তারে দেখি নিক কোনো কালে ;
নস্যি দোক্তা চলেনাক তার চা খায়নি কোনোদিন ;
ন্যাকা মিহি কথা কয় না সে কভু, নহে তো অর্ব্বাচীন,
মূর্খ ও তারে বল্‌তে পারিনি, এম্-এস্ সি আছে ছাপ্।
ইংরিজি বুলি শুনিনি কখনো,—বাংলাই বলে সাফ্।
গুণের আলোকে উদার হৃদয় যথার্থ সজ্জন ;
যদি কেউ থাকে মনে হয় মোর এ-ই তার একজন।
আয়ের কথাটা ঠিক তো জানিনে, শুনেছি যা বোন্ তবু,
ডাল, চাল সব জমি থেকে আসে, কেনে না বছরে কভু।
বাড়ী ভাড়া থেকে যাই কিছু হয়, খরচটা চলে যায় ;
নিজেও মোটর এঞ্জিনিয়ার, মোটরে ও আছে আয়,
সহরের বুকে দশখানা বাড়ী কার আছে আসে পাশে ;
হাজার টাকা তো আয়ের ট্যাক্স দেয় তারা বারো মাসে,
ব্যাঙ্কে ও বেশ মোটা টাকা জমা, জীবন-বীমাও আছে ;
অভাব কিছুরি হবে না যদি বা অঘটন ঘটে পাছে।
আমার বাড়ীর পাশে তার বাড়ী, খুব ভালো জানি ভাই ;
মেয়ের কুৎসা করেনা কখনো,—পুরুষেরি গুণ তাই।
চাকরের হাতে সংসার চলে, আমার সয় না চোখে ;
কত যে বোলেছি, বে-থা কর মামা, বলে সে, দেয় না লোকে,
কথায় কথায় সেদিন কিন্তু সহসা ফেলেছে বোলে ;
বিয়ে কোরতে সে রাজী তো সদাই,—মনের মতন হ'লে।
সতী, সাবিত্রী সেও তো খোঁজে না,—অপ্সরী, কিন্নরী ;

মেম সাহেবেও মন নাই তার অথবা বিদ্যাধরী।
কায়দা ফ্যাসানে সারাদিন রাত চলে যার বাবুয়ানা ;
সে-সব মেয়েকে বৌ কোরে তার ঘরেতে যাবে না আনা।
হয় তো দুদিন ঠাকুরই এলো না,—চাকরের হল জ্বর,
ঘরের গিন্নী ছুঁলোনাক হাঁড়ি,—উপোস্ অতঃপর।
দুটি ভায়ে ভায়ে ভয়ানক মিল, ভয় তাই সব চেয়ে ;
ভায়ে ভায়ে পাছে বিরোধ বাঁধায় ঘর-ভাঙানিয়া মেয়ে।
ইংরেজি বুলি কথায় কথায় চলে শুধু চাল দিয়ে ;
তার চেয়ে ভালো গণেশের মতো কলা গাছটাকে বিয়ে।
এ তো গেল তার সংসারী কথা,—আসল কথাটা ওই ;
বেঁটে মোটা আর কুরূপা না হয়, চলবে চলনসই।
কি ভীষণ দেরী হয়ে গেল আজ, আচ্ছা, এখন যাই ;
মামীমাকে সব বুঝিয়ে শুনিয়ে বল্‌তে তো হবে ভাই ?

মাতৃ-দিবস

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

নবীন মার্কিনমুলুক নারীপ্রগতিতে দুনিয়ার সবদেশকে বোধহয় অতিক্রম করিয়াছে। সমাজ, ধর্ম্ম, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি সববিষয়েই মার্কিন মহিলা আন্তর্জ্জাতিক উন্নতি বিধানে উল্লেখযোগ্য অনেক কিছু করিয়াছে। 'থিওজফি' নামক জগদ্ব্যাপী উদার আন্দোলনটী ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কী নামক ইয়াঙ্কী নারী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। জার্ম্মাণ দার্শনিক কাউণ্ট কাইসার স্মিথের মতে আমেরিকার সমাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠও উন্নত। সামাজিক উৎকর্ষই মার্কিন জাতির আদর্শ।

আমেরিকার নারী-প্রগতিমূলক প্রচেষ্টা আমাদের অনুকরণীয়। হোয়াইটহল সম্প্রতি সামাজিক, রাজনৈতিক ও জাতীয় জীবনে নারীর সর্ব্বপ্রকার বাধা দূর করিয়া পুরুষের অপেক্ষা বেশী না হইলেও নারীকে সমান অধিকার দিয়াছে। নারী পুরুষের চেয়ে যে কোন অংশে অনুপযুক্ত বা হীন নহে আমেরিকা তাহা প্রতিপন্ন করিতেছে। নারী পুরুষের সর্ব্ববিষয়ে পশ্চাতে, এই শতাব্দী সঞ্চিত ভ্রান্তি মার্কিন দেশ হইতে দূর হইতে চলিয়াছে। প্রতিভাশালিনী মার্কিন মহিলাগণ সিভিলসার্ভিস পরীক্ষায় অনুমোদন পাইয়া দেশের সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে এবং রাষ্ট্রীয় শাসনে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইতেছে। বর্ত্তমানে মার্কিনদেশ একটি অভিনব কার্য্য আরম্ভ করিয়া নারী উন্নতি বিধানে এক অভূতপূর্ব্ব শুভসূচনার সুত্রপাত করিয়াছে। ওহিও কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ মিসেস কম্পটন নামক সম্ভ্রান্ত মহিলাকে সম্মানসূচক উপাধি প্রদানের এক মৌলিক সংকল্প স্থির করিয়াছেন। এই বিদুষী ও ভাগ্যবতী মহিলার বিশেষ জনহিতকর কার্য্য এই যে, তাঁহার দুই পুত্রই জড়-বিজ্ঞানে সমধিক বুৎপন্ন। তন্মধ্যে একজন চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক নোবেল-প্রাইজ প্রাপ্ত ডক্টর কম্পটন।

বাপমার গুণ শিশুতে সঞ্চারিত হয় কিনা বা পারিপার্শ্বিক অবস্থাতেই শিশুর প্রতিভা

বৰ্দ্ধিত হয় এসব বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। তবে জগতের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের জননীগণ যে, সম্মানার্হ তাহা নিঃসন্দেহ। কী ত্যাগ স্বীকার করিয়া যে জননীগণ শিশুদের লালন, পালন করেন, যিনি শান্ত হইয়া ইহার গুরুত্ব মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিবেন তিনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, শিশু মাতার শরীর ও মনের একটী অংশমাত্র এবং শিশুর সর্ব্ব কৃতিত্বে জননীর ঈশ্বরপ্রদত্ত দাবী আছে। মহামনীষী এব্রাহাম লিন্‌কন বলেছেন যে, আমি জীবনে যে সব সফলতা লাভ করেছি সবই আমার স্নেহময়ী মায়ের কৃপায়। আমার সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির জন্য আমার মা-ই সম্পূর্ণ দায়ী আমি নহি। জগতের শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ সকলেই একবাক্যে এব্রাহাম লিন্‌কনের মত সমর্থন করেন। শিশুর কৃতিত্বে মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রাচীন রোমেও নাকি প্রচলিত ছিল এরূপ শুনা যায়। নবীন ওহিও এই প্রাচীন পদ্ধতির পুনরুদ্ধার করিয়া বর্ত্তমান জগতের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছে। আমেরিকা যদি কম্পটন, মিলিকান, ইমারসন প্রভৃতির জন্ম দিয়া থাকে, ভারত বিশেষতঃ বাংলা পৃথিবীর কোন দেশ বা প্রদেশের তুলনায় পশ্চাৎপদ নহে। আমাদের সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা সৌম্যা অতি সুন্দরী বঙ্গজননী এত মহাপুরুষের জন্মদান করিয়াছেন পৃথিবীর কোনদেশ তাহা করিতে পারে নাই। ইহা বঙ্গলক্ষ্মীগণের পক্ষে অসীম গৌরবের কথা। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশ, রামমোহন, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ, অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন, প্রভৃতি মহাপুরুষগণ শিল্পেও সাহিত্যে বিজ্ঞান ও ধর্ম্মে, রাজনীতি ও দর্শনে আমাদের বাংলাদেশ উজ্জ্বল করিয়াছেন। বাংলায় যেন আর্য্যসভ্যতা ঘনীভূত হইয়াছে বাংলার তুলনা দুনিয়ায় নাই। আমেরিকার নারী-প্রগতি-মুখী আর একটী প্রশংসনীয় সাধনার উল্লেখ করিতেছি। তাহারা জননীদের প্রতি বাৎসরিক সম্মান প্রদর্শনার্থ একটী জাতীয় উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। উহা মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারে সম্পন্ন হয়। ফিলাডেল্‌ফিয়ার জনৈকা মহীয়সী দুহিতা জননীর স্মৃতিরক্ষার্থ ১৯০৭ খ্রীঃ এই উৎসব আরম্ভ করেন। তদনুযায়ী আমেরিকার প্রায় সব ষ্টেটস্‌ে এই মাতৃ-দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনে নানারঙের পতাকা গৃহোপরি উড়ান হয়—জননীদের ফুলের মালা প্রভৃতির দ্বারা সজ্জিত ও সম্মানিত করা হয়। সমগ্রদেশটী যেন একবাক্যে মাতৃত্বের গৌরব গান করে। বোধ হয় পৃথিবীর অন্যত্র এইরূপ শুভপ্রথার প্রচলন নাই। সুতরাং মার্কিন মুলুক আমাদের এই বিষয়েও পথপ্রদর্শক।

যে দেশ নারীজাতির প্রতি যতবেশী সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সে দেশের সভ্যতা তত উচ্চ। প্রাচীন ভারত অন্ততঃ নারীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদানে জগতের শীর্ষস্থান লাভ করিতে পারে। আদিমকাল হইতে ভারতের হিন্দুগণ মাতাকে ঈশ্বরের জীবন্ত প্রতিনিধিজ্ঞানে শুধু সম্মান নহে পূজা করিয়া আসিয়াছে। এরূপ করিয়াছিল বলিয়াই হিন্দুসভ্যতা এত উন্নত হইয়াছিল। সন্ন্যাসী বীর বিবেকানন্দ আত্মবিস্মৃত হিন্দুজাতিকে প্রবুদ্ধ করিবার মানসে সিংহনাদ করিয়া বলিয়াছেন, "হে ভারত ভুলিওনা, তোমার নারীজাতির আদর্শ, সীতা, সাবিত্রী, ও দময়ন্তী।" মাতৃভক্ত বিবেকানন্দই আবার বলিয়াছেন, হিন্দুরা সব হারাইয়াছে সত্য, পূর্ব্বের সে যশঃ গৌরব আর নাই ঠিক কিন্তু হিন্দু।

হারায় নাই তাদের নারীজাতি। এই পতনের দিনেও হিন্দুনারীর যে নারীত্ব বজায় আছে তাহার তুলনা অন্যত্র নাই। এই মাতৃত্বের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নিখিল বঙ্গে একটী মাতৃ-দিবসের বার্ষিক অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক মনে করি। মান্দ্রাজের নিখিলভারত নারীসঙ্ঘ, কলিকাতার সরোজ-নলিনী নারী-মঙ্গল-সমিতি প্রভৃতি বিশিষ্ট নারী-সমিতি গুলি একত্রিত হইলে মাতৃদিবস দেশব্যাপী অনুষ্ঠান করিতে সুবিধা হইবে। তবে আমার বিশ্বাস মাতৃ-উপাসক বাংলা এবিষয়ে ভারতের অগ্রণী হইতে পারে। এইদিনে সমষ্টিভাবে আমরা নারীদিগকে বিশেষতঃ সামাজিক ও জাতীয় কর্ত্তব্যগুলি তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিব। নারীশক্তির উদ্বোধন নারীদেরই করিতে হইবে। উক্ত অভিপ্রায়ে বাৎসরিক একটী মাতৃ-দিবস অনুষ্ঠান বিশেষ কার্য্যকরী হইবে। যখন মায়েরা জাগিবেন তখন তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ অনায়াসেই প্রবুদ্ধ হইবে। জাগ্রতা মাতা স্বীয়কোলে নিদ্রিত শিশুকে এক মুহূর্ত্তে জাগাইতে পারেন।

বিখ্যাত লেখক মরীস মেটারলিঙ্ক বলিয়াছেন যে, নারী আজন্ম অন্তর্মুখী ও সাধুপ্রকৃতি। বিন্দুমাত্র অনুপ্রেরণা পাইলে তাহারা জাগ্রতা হন। আর হিন্দুনারীগণ ত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া জাতীয় প্রাণ জাতির আত্মা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। দেশময় পুঞ্জীভূত অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে তাহারাইত দেশের ধর্ম্ম, কৃষ্টি, আচারব্যবহার প্রভৃতি অসীম ধৈর্য্যের সহিত বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। কারণ নারী-প্রকৃতি সদা সংরক্ষণশীল। সুতরাং বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একদিন আমাদের অন্যসব ভুলিয়া মাতৃপূজায় নিরত হওয়া উচিত। রাখি-বন্ধনের মত, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার মত এই মাতৃদিবস জাতীয় উৎসবে পরিণত হওয়া উচিত।

ভাবী-ভারতের শাসন-তন্ত্র

শ্রীসুহাস দেবী

ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা আজ নূতন গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। চিন্তাশীল বিচক্ষণ রাষ্ট্রবিদ্‌গণ আজ বুঝিতে পারিতেছেন, জগতে নির্য্যাতিতের মুক্তিলাভের জন্য যে সংগ্রাম চলিতেছে ভারতের সংগ্রামও তাহারই অংশ।

বর্ত্তমান জগতের বিরাট অর্থনৈতিক সমস্যাই বোধহয় বিংশশতাব্দীর জটিলতম সমস্যা। এ সমস্যার উদ্ভবের কারণ জগতে ধন-বিভাগের অন্যায্য ব্যবস্থা। বর্ত্তমান যান্ত্রিকযুগে ধনতান্ত্রিকতার ফলে পৃথিবীর সমস্ত অর্থ মুষ্টিমেয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তির করায়ত্ব হইয়া পড়িয়াছে, ফলে জগতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্যের করালগ্রাসে নিষ্পেষিত। একদিকে মুষ্টিমেয় ধনিকের প্রয়োজনাতিরিক্ত

স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাসব্যসন, অপরদিকে গণসাধারণের দুঃসহ দারিদ্র্য, বুভুক্ষা, লাঞ্ছনা ও দৈন্য। ধন-বণ্টনের কু-ব্যবহার ফলেই জগতব্যাপী মহাবিপ্লবের সূচনা দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য ধনবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদের শোষনের অবসান একান্ত অপরিহার্য্য।

ধনবাদের চরম পরিণতি সাম্রাজ্যবাদ বা ইম্পিরিয়ালিজম। ধনবাদী ধনিক প্রথমে স্বদেশে ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রে আপনার একাধিপত্য স্থাপন করে, তারপর ধীরে ধীরে সমগ্র পৃথিবীতে ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রে আপনার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। উপনিবেশ ও নূতন রাজ্যের পত্তন করিয়া সেখানে শোষণ কার্য্য চালাইতে থাকে। ধনলিপ্সু বণিক এইরূপে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী আপনার সাম্রাজ্যের বিস্তার করে। সাম্রাজ্যবাদীর শোষণের ফলেই ইউরোপের অধীনস্থ দেশসমূহে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন দেখা দিয়াছে। এই সকল রাষ্ট্রীয় আন্দোলন বস্তুতঃ অর্থনীতিক আন্দোলন। ভারতে জাতীয় আন্দোলনও এই কারণে মূলতঃ অর্থনীতিক। শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ইহার উদ্দেশ্য নহে, বুভুক্ষিতের ক্ষুন্নিবৃত্তিই ইহার মূলে রহিয়াছে।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের প্রধান আশ্রয় ভারতবর্ষ। ভারতে যে পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহা সমগ্র জগতে প্রভাব বিস্তার করিবে। সুতরাং বিশ্ব সমস্যার সহিত ভারতের সমস্যাও একান্ত ভাবে জড়িত।

বর্ত্তমান ধনবাদ সমস্যার সমাধানের উপর সমস্ত জগতের শান্তি ও কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। যদিও সাম্রাজ্যবাদীগণ নানা চমকপ্রদ মতবাদ প্রচার করিয়া আপনাদের একাধিপত্য বজায় রাখিতে সচেষ্ট কিন্তু জগতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া মনে হয় সাম্রাজ্যবাদের একছত্র আধিপত্যের অবসান অনিবার্য্য। গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র প্রহসন এবং ভারতীয় সকল শ্রেণীই ভাবী শাসনতন্ত্র অগ্রাহ্য করিয়াছে। এমনকি মডারেট নরমপন্থীগণও সে শাসন-তন্ত্রে সুতীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এসকল ভূঁয়ো সাম্রাজ্যবাদীর চালে যে নিপীড়িত, নির্য্যাতিত জাতি ভুলিবে না তাহা বোধহয় বিদেশী রাষ্ট্রবিদ বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রই উপলব্ধি করেন।

এতদিন পর্য্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের লক্ষ্য সম্বন্ধে ভারতীয় নেতারা কোন সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করেন নাই। প্রথমে বলা হইয়াছে 'স্বরাজ' ভারতবাসীর কাম্য। 'স্বরাজ' অর্থে কি চাওয়া হইতেছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। 'স্বরাজ' অর্থে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব-শাসন ও শোনা গিয়াছে। তারপর লাহোর কংগ্রেসে 'পূর্ণ-স্বাধীনতা ভারতের কাম্য' ঘোষিত হয়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর না গণসাধারণের স্বাধীনতা বা স্বার্থ সংরক্ষণ হইবে সে বিষয়ে রাষ্ট্রবিদ্‌গণ কোন স্পষ্ট কথা বলেন নাই।

বর্ত্তমানে পণ্ডিত জহরলাল ও অন্যান্য রাজনৈতিকগণের মতামত হইতে বোঝা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভারতের জাতীয় আন্দোলন বুর্জ্জোয়া বা মধ্যবিত্ত আন্দোলন হইতে গণ-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিবে।

পণ্ডিত জহরলাল তাঁহার এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, 'পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য। এবিষয়ে কোন অস্পষ্টতা নাই। দেশের জনসাধারণের জন্যই স্বাধীনতা, কাজেই বিশেষ অধিকার সমূহ যাহারা এতদিন একচেটিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছেন তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট, ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও জমিদার বর্গকে তাহাদের অধিকার সমূহ ছাড়িতে হইবে। সবচেয়ে যারা বঞ্চিত হইয়াছে, সেই সর্ব্বহারার দলকেই তাহাদের ন্যায্য অধিকার দিতে হইবে।'

বহু শতাব্দী ধরিয়া যে শ্রমিক কৃষকশ্রেণীর ওপর শোষণ চলিতেছে তাহার অবসান যে আবশ্যক ইহা আজ দেশের রাষ্ট্রবিদগণ উপলব্ধি করিতেছেন। শ্রমিককৃষাণদের রাজনৈতিক চেতনা দান করিয়া তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে—এভাব ভারতে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিতেছে। সুতরাং ভারতের বুর্জ্জোয়া বা মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক আন্দোলন শ্রমিক-কৃষাণ আন্দোলনে রূপায়িত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাবী-ভারত যে সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ভাবী-ভারতের শাসনতন্ত্র কিরূপ নিবে সেবিষয়ে ভাবিবার সময় আসিয়াছে। ভারতের ভাবী-শাসন তন্ত্র যে অসাম্রাজ্যবাদী, জাতীয় গণতন্ত্রমূলক হওয়া উচিত ইহা চিন্তাশীল বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। জাতীয়তা বলিতে ইউরোপের বিকৃত জাতীয়তা যাহাতে ভারতে প্রতিষ্ঠিত না হয় সে দিকে দেশের নেতাদের দৃষ্টি দিতে হইবে। ইউরোপের জাতীয়তা পররাজ্যলিপ্সু ধনতান্ত্রিক সাম্রাজবাদেরই নামান্তর। আমাদের জাতীয়তা বর্জ্জন করিলে চলিবেনা। জাতীয়তার শক্তি অপরিসীম ইহাই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে জাতিকে সংহত করিবে, শক্তি দিবে ও ঋদ্ধি দিবে।

তারপর গণতন্ত্র মূলক শাসন। 'গণতান্ত্রিক শাসন' বলিতে ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক শাসন বোঝায় না। পাশ্চাত্য দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র নাই আছে শুধু গণতন্ত্রের মিথ্যা অভিনয়। রাষ্ট্রব্যাপারে শ্রেণী বিশেষেরই একাধিপত্য ও স্বার্থসংরক্ষণ। ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্র পরিচালনায় পূর্ণবয়স্ক নরনারীর সম-অধিকার থাকা চাই। কোন বিশেষ শ্রেণী, সম্প্রদায়ের বা ধনের প্রাধান্য বা স্বার্থ-রক্ষণ থাকিবে না। ইহা সম্পূর্ণ সর্ব্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান হওয়া চাই।

বর্ত্তমান পৃথিবীর রাষ্ট্রীক অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে জগতের সকল দেশেই গণ-আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা আজ নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। জনসাধারণের আর্থিক দুর্গতি দূর করিয়া তাহাদের ন্যায্য অধিকার না দেওয়া পর্য্যন্ত জগতের ধনবাদ-সমস্যার সমাধান হইবে না।

যে শক্তি পৃথিবীকে অন্ন দেয়, আনন্দ দেয়, সভ্যতার বা বিলাস উপকরণ তৈরী করে, তারাই আজ খাদ্যাভাবে স্বাস্থ্য অভাবে দীন মলিন রুগ্ন জীবন যাপন করে। এরাই আজ অভাবের তাড়নায় জীবনের সকল আনন্দ থেকে বঞ্চিত। মুষ্টিমেয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তির সুখবিলাসের যূপকাষ্ঠে অগণিত মানুষের জীবন বলি চলিতেছে।

বঞ্চিত নিপীড়িত চাষী-মজুরকে তাদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা আজ দেশের অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন।

বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনকে সর্ব্বসাধারণই সজীব ও সচল করিয়া তুলিবে।

দুইনারী

শ্রীআশালতা দেবী

রাত্রি প্রায় এগারটা বাজে। সুজাতা শোবার ঘরে রাত্রির কাপড় পরে বসেছিল। টেবিলের উপর দুহাতের মাঝে ওর মুখ লুকোন। এক একটা গন্ধের ইঙ্গিত মানুষকে কতদূর নিয়ে যায়। অস্ত অতীতের কতদূর পথে! রুদ্ধকল্পনা অকস্মাৎ কোনদিন একটুকু প্রশ্রয় পেয়েই যেন শতধা আপনাদের উন্মুক্ত করে দেয়। একটু আগে সুজাতা গোলাপের একটা পাপড়ি ছিঁড়ে আনমনে বসে বসে খান খান করছিল। সেই গন্ধ ওকে মনে পড়িয়ে দিলে কত দিনের কথা!

দু'বছর আগে এই বাড়ীরই বাগানে বাঁধান পথের দু'পাশে অজস্র গোলাপ ফুটেচে। সেই রাস্তায় সন্ধ্যের দিকে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে পায়চারি কর্‌ছিল। সেই ছেলেটির নাম সরোজ কুমার রায় আর মেয়েটি সুজাতা সেন। সেদিন সেই ছেলেটিকে সমস্ত দিয়ে ভালো বেসেও সুজাতার যথেষ্ট তৃপ্তি হচ্ছিলনা। কোথায় যেন একটা মস্তবড় অতৃপ্তিও ফাঁক রয়ে গেছে। যে সুজাতা কোনদিন রেডিও শুন্‌তে চায়না সে সেদিন ওদের বাড়ীর রেডিওতে তন্ময় হয়ে কীর্ত্তন শুন্‌লে, 'জনম অবধি হাম ওরূপ নেহারিনু; নয়ন না তিরপিত ভেল।' সেদিন সে গানকে সেন্টিমেণ্টাল রাবিশ বলে ব্যঙ্গ কর্‌তে ওর মন সরেনি। কারণ সেদিন ত আর ও গানটা তার কাছে স্থানে স্থানে বেসুরো তৃতীয় শ্রেণীর একটা বাংলাগান বলে মনে হয় নি। সেদিন ওর হৃদয় মন এমন অবস্থায় ছিল যে বাইরের একটুখানি দানই যথেষ্ট। আপন হৃদয়ের অপর্য্যাপ্ত রস সমারোহে বাইরের উপকরণের কার্পণ্যে ওর কিছুই যায় আসেনি। আর তাই ওই গানটার অপর সমস্তবাদ দিয়ে কেবল কথাগুলোর মাঝেই ওর সমস্ত মন ডুবে গিয়েছিল।

সেদিন সবেমাত্র সন্ধ্যেটি সুরু হয়েচে। বাতাসে বাগানের ঝাউগাছের কম্পিত পত্রের শব্দ কার উতলা নিঃশ্বাসের মত মর্ম্মরিত হয়ে উঠেচে। একটি মাত্র উজ্জ্বল তারা চোখে পড়্‌চে। গেটের কাছের তীব্র ইলেকট্রিক আলো অনেকদূর চেয়ে মৃদু হয়ে এখানে এসে পড়েচে। আধো-আলোছায়া খচিত পথে বেড়াতে বেড়াতে সুজাতা বল্‌লে, কেন সরোজ, আমাদের বিয়ে হিন্দুমতে হতেই বা বাধা কী? আমি ব্রাহ্মধর্ম্মকে এত ভালো বাসিনে যে তোমাকে ভালোবাসার পথে সে এসে দাঁড়াবে। তুমি কিসের জন্যে তোমার সমাজের নিয়মের বাইরে রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে করবে? আমার এমন কী যোগ্যতা আছে সরোজ, যে আমার জন্যে তুমি এত ত্যাগ কর্‌বে?' সরোজ, হেসে বললে—ঃ 'সে যোগ্যতার ফিরিস্তি যদি দাখিল কর্‌তে বসি, পারবে সহ্য কর্‌তে? দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাল দুটি হয় উঠ্‌বে রাঙা। কিন্তু সে কথাও হচ্চেনা। আমি রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে করচি আমার নিজের গরজে।'

'আর তোমার নিজের ছাড়া অপর কোন আত্মীয় স্বজনের বুঝি মতামত নেই !'

'আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ত বাবা। তাঁকে তুমি জানো। আমি হিন্দুধর্ম্ম অনুসারেই বিয়ে করি বা ব্রাহ্মমতে বিয়ে করি তাতে তাঁর কিছুই যায় আসেনা। দিনের মধ্যে আটঘণ্টা যদি তাঁর অফিসে খাটতে পারি—সেই তাঁর আমার কাছ থেকে একমাত্র পাওয়া।'

'তবে ?'

'তবে আর কি ! তোমাকে ত বার বার বল্‌চি সু— আমি যে রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে কর্‌তে চাইছি, এটা কেবল আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা। কোন মতামত, সুবিধে অসুবিধের সম্পর্ক এতে নেই।, 'ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মেয়ে হলেও, আমার হিন্দুমতে বিয়েই ভালো। রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে হওয়াটাই কেমন যেন প্রাণহীন, সৌন্দর্য্যহীন।'

'ওতে কিছু যায় আসে না সু—। তুমি আর আমি সমাজের চোখে কেমন করে মিল্‌ব— সে প্রণালী কেমন এবং কীপ্রকারের তাই নিয়ে মাথা ঘামানোয় লেশমাত্র লাভ নেই। তার চেয়ে বরঞ্চ বলো আমি যে তোমার সঙ্গে মিল্‌তে চাই... এসম্বন্ধে তোমার নিজের মনে কোন দ্বিধা নেইত ? সেই কথা ভেবে দেখ। কী নিয়মে বিয়ে হবে তাই নিয়ে একবিন্দুও চিন্তার অপব্যয় করোনা।'

'কিন্তু তোমার আপত্তি টা কী ?'

'আপত্তি কিছুই না। হিন্দুবিবাহে এক একবার আমারও লোভ হয়। কী গদ্‌গদ সেণ্টিমেণ্টাল ব্যাপার ! চিরজীবনের জন্যে আমাদের জীবনকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা হবে। তোমাকে আমার গৃহের আমার জীবনের সাম্রাজ্ঞী করে নিয়ে যাব। কিন্তু লোভ থাক্‌লেও ও আমি চাইনে। তা যদি চাই তাহলে তোমার আমার মিলনের মাঝে—মুক্তির বাঁশিকে যে আমি লোভের মোটা মোটা আঙ্গুলের চাপে গুঁড়ো করে ফেল্‌ব। চারিদিকে চোখ কাণ খোলা রেখে যে মিলন—তাই আমার চাই। তাতে জিনিসটা যদি আন্‌সেণ্টিমেণ্টাল্ হয়ে পড়ে... কী কর্‌তে পারি !

'সেণ্টিমেণ্টর উপর এত বিতৃষ্ণা !'

'বিতৃষ্ণা কিনা জানিনে। কিন্তু তোমার ওপর যে আমার ভয়ানক তৃষ্ণা সু—। তোমাকে আমি এমন করে ঠক্‌তে দিতে কিছুতেই পারবনা। এর পরে যদি জীবনে তুমি কোন অবস্থায় কোনদিন আমার হাত থেকে মুক্তি চাইলে, তা যে আর পাবার যো থাক্‌বেনা। অবশ্য কখনই আমি নিজে তোমাকে বেঁধে রাখ্‌তে চাইবনা। কিন্তু সমাজের চোখে তোমার রাস্তা যে চিরকালই বন্ধ থেকে যাবে। আজকের ঠিক যদি কোনদিন ভুল বলে প্রতিপন্ন হয়ে যায়···তখন আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ কর্‌বার তোমার যে উপায়ই থাক্‌বে না।'

এর উত্তরে সুজাতা গাঢ় স্বরে বল্‌লে, 'কেন সরোজ, তুমি কি এখন থেকেই মুক্তির জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ছ। মুক্তি চায় কে ? ও আমি চাইনে। যদি কোনদিন তোমার আমার সম্বন্ধ

মিথ্যে হয়ে যায় আমি যাবো তাইনিয়ে অভিযোগ করতে! আমি সেই মিথ্যেকেই অসীম মমতা দিয়ে লালন করব। আনন্দ যদি বেদনায় রূপান্তরিত হয়ে যায়···সেই বেদনাই হবে আমার সম্বল।'

'ছিঃ—সু ওকথা বোলো না। কারো খাতিরেই মিথ্যেকে নিজের জীবনের মালা কোরনা।'

এইখানে দুজনেই চুপ করল। কারণ এইখানেই যে মেয়ে পুরুষের চিরন্তন—তর্ক চিরকালেও শেষ হচ্চেনা। অনেক সময়ে যে মেয়ের কাছে মুক্তির চেয়েও মিথ্যে বড়···সেকথা সুজাতা সেদিন অস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করলও...একথা সে বোঝাবে কি করে? তাও আবার সরোজের কাছে; ওরা কি কোনদিন একথা বলতে পারে?

অবশেষে নানা তর্কের পর, ওদের দুজনের রেজেষ্ট্রী করেই বিয়ে হয়ে গেল। সরোজের রক্তে এক নতুন কিছু করবার নেশা প্রবল। আর সুজাতা মুখে যতই মধুর অভিমান দেখাক, ভিতরে ভিতরে তারও এটা মন্দ লাগেনি। তার স্বামী যে অতি আধুনিক। তিনি যে শুধু মুখেই নয় কাজেও দস্তুরমত আধুনিকতার খোরাক জুগিয়ে চলেন, এ তারই একটা উদাহরণ। এবং ও নিয়ে সঙ্গিনী মহলেও রীতিমত গর্ব্ব করা চলে। সরোজ নিজের মতটাকে প্রায়ই তাই করে প্রতিপন্ন করতে চাইত। ও বললে, 'দেখ সু···বাবার মোটরের ব্যবসায়ের ম্যানেজার একটি আমেরিকান যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েচে। আমার সঙ্গে প্রায়ই তিনি নানাধরণের তর্কালাপ করেন। আমি বলি, মিঃ ফরেষ্টার, পরিশ্রমক্ষমতা, কুসংস্কারহীনতা, যুক্তির ন্যায্যতা, Scientific efficiency এ সবেতে আপনাদের গুণ আমি বরাবরই মেনে নিয়েচি কিন্তু হৃদয়ের ব্যাপারে আপনারা, আমাদের চেয়ে ঢের নীচে দিয়ে যান।'

মিঃ ফরেষ্টার হেসে বলে, 'হঠাৎ মিঃ রায় একথা, আপনার মনে হোল কেন?'

'ধরুণ আপনাদের দেশের ডাইভোর্স ব্যাপারটা। আপনাদের পক্ষে বিচ্ছেদটা সোজা বলে বিবাহটাও যেন কিছু নয়। You marry only to divorce. হাতে বিস্তর পয়সা রয়েচে, আর দোকানে অনেক চকোলেট সাজান, তাই পাকস্থলীর বিদ্রোহটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেও বহুবার রসনার স্বাদ নিতে হবে। এও এক ধরণের অসংযম···' বলবার পথেই বাধা দিয়ে ফরেষ্টার কি একটা বলতে চাইলে, আমি হাত তুলে থামিয়ে বললুম... 'জানোইত—সু যখন একটা আইডিয়ার মত আইডিয়া মাথায় আসে—আর গুছিয়ে উপমা মিলিয়ে বলতে শুরু করচি—তখন কেউ বাধাদিলে দস্তুরমত রাগ হয় আমার। হ্যাঁ, আবার গম্ভীর হয়ে ওকে থামিয়ে দিয়ে বলতে শুরু করলুম আপনাদের হাতের কাছে, মুক্তি নিয়ে যথেচ্ছাচার করবেন—এইটেই হচ্চে আপনাদের প্রবৃত্তিগত অসংযম—আর আমরা মুক্তির দরোজা গুলো যদ্দুর পারা যায় টেনেটুনে বন্ধ করে যে সংযমের বড়াই করে বেড়াই—সেটা হচ্চে আমাদের প্রকৃতিগত অপৌরুষ। মিঃ ফরেষ্টার আপনাকে আমি বলে রাখলুম—আমার জীবনে আমি এই দুয়ের সমন্বয় করব। এবং করে দেখাব যে হৃদয়ব্যাপারে আপনারা আমাদের চেয়ে কত নীচে।'

এবারে ফরেষ্টার ও গম্ভীর হয়ে বল্‌লেঃ—আপনি পারতে পারেন। আপনার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমি কিছু বল্‌তে চাইনে……কিন্তু অমন করে বড বড় কথা বল্‌বেন না। এদেশটা অমন ও দেশটা তেমন। দুটোর গায়ে আলাদা আলাদা ছাপ্‌মারা পরিষ্কার লেবেল এঁটে দিয়ে, তাদেরকে শ্রেণীবিভক্ত করে দেবেন না। দেখুন, যতক্ষণ না পরীক্ষার সুযোগ আসে, একটা জিনিষের যথার্থ দাম কিছুতেই বোঝা যায় না। মিঃ রায়, আপনাদের দেশে ডাইভোর্সের সুবিধা নেই, আপনাদের দেশের মেয়েরা কাগজে কলমে সে সুবিধে পেলেও হাতে হাতে তা নিতে পার্‌চেনা কারণ তারা আর্থিক দিক থেকে ভয়ানক রকম পরাধীন। এইসব বাইরের ঘটনার আলোতেই আপনারা ধরে নিয়েচেন যে আপনাদের হৃদয়-মাহাত্ম্য বড্ড বেশি। আপনাদের বিবাহ সকল অবস্থাতেই চিরস্থায়ী। এখন তুলনা করবার দিন আসেনি। আগে আপনাদের স্ত্রী-পুরুষে আমাদের মত সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রিক এমনকি পারলৌকিক ওপিনিয়নের তরফথেকেও একেবারে নির্ভেজাল স্বাধীনতা পাক, তারপরে দেখা যাবে হৃদয়ের তাপমানযন্ত্রে কার কত ডিগ্রী ওঠে।'

ভারি উত্তেজিত হয়ে, সমস্ত দেশের পক্ষ হয়েই যেন আমি বললুমঃ—'দেখে নেবেন, তা কখনো হবে না। শীগ্‌গীর, যদি খুববেশিও হয় বছর কুড়ির মধ্যেই আমাদের দেশে ডাইভোর্স বিল পাস্‌ হবে এবং জনসাধারণের মধ্যেও তা চলবে। আর আশা করা যায় মেয়েরাও অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন হতে পারবে……কিন্তু তাই বলে কি আপনাদের দেশের মত গণ্ডায় গণ্ডায় ডাইভোর্স চল্‌বে! কখনো না। আমাদের দেশের মেয়েদের একটি শাশ্বত মহিমা, একটি অচঞ্চল আদর্শ রয়েচে… তাদের শান্তি তাদের ধৈর্য্য…আবেগের বশে আরও হয়ত কত কী বলে বসছিলুম—সু…কিন্তু ফরেষ্টার হো হো করে হেসে উঠ্‌ল। বল্‌লেঃ—'মনের মধ্যে একটু বিনয় রেখে, আরও পাঁচটা দেশের দিকে চেয়ে দেখুন ত। সত্যি মেয়েদের বিষয় নিয়ে যখন কেউ এমনি নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে কথা বলে, তখনই হয় আমার সবচেয়ে বেশিরাগ। জানেন আপনি মেয়েদের সম্বন্ধে? তারা যে কী—তার কতটুকু খবর রাখেন? কতশীগ্‌গীর তারা মরে যায়, আবার তেমনি অকস্মাৎ কেমনকরে একদিন বেঁচে ওঠে! জানেন এসবের কিছু? যে কোন পরিবর্ত্তনের সঙ্গেই তাদের নিজেকে মানিয়ে নিতে এতটুকু কষ্ট হয়না—কারণ আসলে মন বলে বস্তুটাই বোধকরি ঈশ্বর ওদের খুব কম করে দিয়েচেন, জানেন তা?'

বললুম —'জানি বইকি। They are capable of infinite adaptations.'

ফরেষ্টার হেসে বল্‌লে, 'তাহলেও খুব জানেন দেখ্‌চি। কিন্তু কি জানেন, ওদের কাছে একমাতৃত্ব ছাড়া—তীব্র, লোলুপ, লেলিহান মাতৃত্বছাড়া, আর সব জিনিষই ভাসা ভাসা। ভিত্তিহীন। তাই একটা অবস্থাথেকে আর একটা অবস্থায় অতিদ্রুত পরিবর্ত্তনে, ওদের মনের পরতে পরতে কোন মোচড় লাগে না। কোন যুগযুগান্তের সংস্কারই বলুন কিংবা কোন শাশ্বত মহিমার আভাসই বলুন—ওদেরকে যথেষ্ট বেদনা দিতে পারে না। অর্থাৎ মেয়েদের আসল রূপের বারোআনাই হচ্ছে, ফলিয়ে তোলারূপ…' 'যা খুসী তাই বল্‌চেন বুঝি?'

'বাঃ, যা খুসী কি ! দস্তুরমত সত্যি কথা বলচি। মিসেস্‌রায়কে নতুন ঘরে এনেচেন বলে কথাগুলো বড্ড কড়া লাগচে বুঝি ?' ও তামাসা করে আমার হাতে একটা ঝাঁকুনি দিলে।

'কিন্তু কী করচ বন্ধু। আপনি তর্ক তুল্‌লেন কেন ? আমি চাইনে যে মেয়েদের সম্বন্ধে কেউ নির্ম্মম সত্য জানুক। কারণ যতদিন না তা জানা যায়, তত দিনই থাকে জীবনের মোহ…কিন্তু ওইত আপনি খামাখা তর্ক তুল্‌লেন কেন ? অথচ আমার সত্যিই মনে হয় মেয়েদের স্বরূপের বারোআনাই হচ্চে সামাজিক বা সাংসারিক প্রয়োজনের তাগিদে ফলিয়ে তোলা রূপ। এই ফলাও অংশটা—নদীর ধারের বে-মজবুত বালুর চরের মত, যে কোন একটা বাইরের ধাক্কায় খসে খসে পড়ে। ধরুন, কিছুদিন আগে রাশিয়ান মেয়েরা কী ছিল ? ডষ্টয়েভ্‌স্কির লেখা ব্রাদার্স কারমাজভ্‌ পড়তে বসে দেখি পাতায় পাতায় মেয়েদের সে কী হিষ্টিরিয়ার ধুম ! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ফুঁপিয়ে কাঁদা ! কীরকমকরে এসব সহ্য করে চল্‌তে হয় বলুন ত। এসহনাতীত ন্যাকামির ছবি, পাতা উলটিয়ে উলটিয়ে ক্রমাগত দেখে যাওয়া সে কতখানি ক্লেশকর তা ঈশ্বরই জানেন। আর শুধু ঈশ্বরইবা বলি কেন, আমরাও একটু আধটু জানি বইকি। অবশেষে আসে, অপূর্ব্ব অদ্ভুত সব জিনিষ। কিন্তু তার আগে আমার, নোটবুকে নোট করে রাখ্‌তে ইচ্ছেকরে :—সেইদিনে এক একটি রাশিয়ান মেয়ে পাল্লা দিয়ে ক্রমান্বয়ে কতবার করে Sob কর্‌তে পারত, আর হিষ্টিরিয়ায় অভিভূত হোত। কোথায় গেল আজ, সূর্য্যাস্তের সময়কার বিলীয়মান দিগন্ত স্বর্ণরেখার মত কাকুতি, মূর্চ্ছনা, রক্তিম হওয়ার প্রচুরতা ? তাদের পনের আনাই যে বানানো তাওকি বলে দিতে হবে ?'

১০

সেদিন সরোজ ওর দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতম খুঁটি নাঁটিও যতক্ষণ না সুজাতার কাছে উজাড় করে বলত ততক্ষণ তৃপ্তি পেত না। সারাদিনে ও মিঃ ফরেষ্টারের সঙ্গে কী কী তর্ক করচে, বাসে যেতে যেতে কখন কী দেখেচে, সব তার ওর কাছে বলা চাই-ই। হাতের ভেতর যে মুখ লুকোনো ছিল, আস্তে আস্তে সুপ্তোত্থিতের মত তা উঠ্‌ল। সুজাতা গোলাপের গুচ্ছটি নাড়াচাড়া কর্‌তে কর্‌তে ভাবতে লাগ্‌ল ; সেদিন সরোজ গোধুলি বেলাকার রঙিন আলোয় ওরহাত চেপে ধরে বলেছিল ; 'সু—আমার আমেরিকান্‌ বন্ধু যাই বলুক, আমি জানি তুমি পৃথিবীর সব মেয়ের থেকে আলাদা। তোমার আমার মিলনে, মুক্তির রাস্তা যদি খোলা থাকে—সেটা দু'মাসের মধ্যে ডাইভোর্সের মামলা রুজু করবার রাস্তা নয়—সেটা হচ্চে বাঁশির রন্ধ্রপথ। সেটা না থাক্‌লে, সুরের অবাধ লীলায় যে বাধা পড়ে।' কিন্তু এ উপমাটা ওর মনের মত হোলনা বল্লে ; 'সু—তুমি আমার কথা শুনে হাস্‌চ নাত ! মনে হচ্চে না ত যে রবিঠাকুরের কাছ থেকে কথা ধার করচি ?' কারণ বলেই ওর মনে পড়েচে, রবীন্দ্রনাথ এই বাঁশি আর তার রন্ধ্রপথের উপমাটা এতবার প্রয়োগ করচেন—এবং সেই কারণেই একটু আগে ওটা ওর মনঃপূত হয়নি।

'কিন্তু উপমার দরকার কী ! আর যুক্তি তর্কই বা কী কাজে লাগবে, সুজাতা ! তোমাকে

আমার হৃদয় দিয়ে স্পর্শ করে বুঝতে পেরেচি ; তুমি অনন্যপূর্ব্বা ! আমার কাছে তুমি জগতের সকল দেশের সকল রকম মেয়ের টাইপের চেয়েও অন্য রকম। আর তোমাকে আমি রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে করে দেখাব। বিচ্ছেদের রাস্তাটা খোলা থাকলেও, বিবাহটা আমাদের কাছে হৃদয়ের জিনিষ। যখনই দরকার ফুরিয়ে যাবে, একটা ছুতো খুঁজে বার করে তাকে টান মেরে ধূলোয় ফেলে দেব ! কখনো নয়। যে তর্কে আমেরিকান বন্ধু ফরেস্টারের কাছে হারলুম, আমাদের দু'জনের জীবনেই সেই তর্কের শেষ উত্তরকে প্রতিষ্ঠিত করে যেয়ে জিতব এই আমার পণ। এবং তোমারও পণ সুজাতা নিশ্চয়ই।'

গোলাপের একটি বিমর্দ্দিত পাপড়ির গন্ধে, ওর মনের কী অগাধ স্মৃতি মথিত হয়ে ওঠে। সেই পুরোণ দিনের সরোজের কথা তার হৃদয়ে অশান্ত আবেগে তোলপাড় করতে থাকে।

* * *

বিয়ের পরে প্রথম ছ'মাস সুজাতা আর তার স্বামী কলকাতাতেই ছিল। সে ছ'মাস ওদের জীবনের একটা আবেশময় ঈষৎ অতৃপ্ত নেশার মত অবস্থা। এত সুখ যে চেতনা নেই। পরস্পরের জন্যে এত আদৃতি যে সেটা স্বপ্নের মত।

সরোজের বাবার প্রকাণ্ড মোটরের ব্যবসায়। তাঁর হেড্ অফিস কলিকাতাতেই। ফোর্ডের নীতিতে মনে প্রাণে বিশ্বাস কর্তেন ভদ্রলোক। অল্প সময়ে বুদ্ধিপূর্ব্বক, যতদূর সম্ভব বেশি কাজ করতে পারায় তাঁর মতে মানুষের প্রধান গুণ। ব্যবসায় জগতে হোক, কিংবা ব্যক্তিগত জীবনে হোক সবচেয়ে আগে চাই (efficiency) এফীশিয়েন্সি। সরোজ বড়লোকের ছেলে হ'লেও ফোর্ডমন্ত্রে দীক্ষিত। বাবা বেঁচে থাক্‌তে, বড়লোকের ছেলের দস্তুর চর্চ্চা করার সুযোগ পায়নি। একেবারে ইচ্ছে না থাক্‌লেও এবং বিধিমত বিরাগ থাকলেও হতে হয়েছিল তাকে বাধ্য হয়ে কাজের লোক। বিয়ের পরেই সরোজের বাবা বল্‌লেন, 'তোমরা ইচ্ছে করলেই, আলাদা একটা ফ্ল্যাট্ ভাড়া করে থাকতে পার। আমি জানি, তুমি চিরদিনই কখনো আমার আওতায় থাকা পছন্দ করবে না। সেটা আমিও চাইনে। তা থাকা উচিত নয়। নিজে স্বাধীনমত সংসার না পাত্‌লে কোনদিন দায়িত্ববোধ জন্মায় না। আমি তোমাকে মাসে মাসে যা এ্যালাউন্স দিই, তার সামান্য কিছু বাড়িয়ে দিতে পারি...যদি দরকার হয়। কিন্তু তাহলে সেটা পুষিয়ে দিতে অফিসে তোমাকে আরও একটু খাট্‌তে হবে।'

অথচ তার দু'একদিন পরে সরোজের স্ত্রী, সরু সরু ভাটিয়ালি চুড়িপরা সুন্দর হাতে, হাতপাখার বাতাস দিতে দিতে তাঁর খাওয়ার কাছে বসে যখন বল্‌লেঃ—'বাবা, আবার শুধু শুধু একটা আলাদা ফ্ল্যাট্ ভাড়া কেন ? তাতে কেবল ত পয়সা নষ্ট। তাছাড়া আপনাকে দেখ্‌বেইবা কে ? এতবড় বাড়ী পড়ে রয়েচে।' সত্যিই বাড়ীতে কেউ ছিলনা। সরোজের মা বহুদিন হোল মারা গেচেন। সরোজের বাবা ফাউলের কারির ডিশ থেকে চামচে উঠিয়ে যখন একটু থেমে ভাবচেন, এ বেচারাকে

বর্ত্তমান যুগের ফোর্ডিজম্ সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানিয়ে দেই যে ঃ— কারুকে দেখাশোনা সুবিধের জন্যে কারো জীবন নয়। জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য কাজ, স্বাধীনতা, উন্নতি, এফীশিয়েন্সি। ফোর্ডিজ্‌মের লেক্‌চারটা যখন মুখে মুখে তৈরী হয়েচে তখন তাঁর হঠাৎ নজর পড়ে গেল ; সরোজের বৌয়ের মুখের উপরে। সে কী সুন্দর মুখ ! স্নেহে, করুণায় প্রথম প্রেমের অকারণ উচ্ছ্বলিত আনন্দে টলটল করচে। সংসারে এমন জিনিষও আছে, সেকথা যে তিনি ভুল্‌তে বসেছিলেন প্রায় ! এরপরে বোর্ডের নব্যতম অধ্যায়ের প্রস্তুত লেক্‌চারখানা তিনি আর তাঁর বৌমার কাছে ঝেড়ে ফেল্‌তে পারলেন না। এবং আলাদাকরে ফ্ল্যাট নেওয়ার প্রসঙ্গটাও চাপা পড়ে গেল।

জাতীয়তা ও সাহিত্য

হোস্‌নে আরা বেগম

১৯৩২ সালের কথা। একদিন স্বদেশী আন্দোলনের এক খ্যাতনামা ব্যক্তি কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন, জাতির অভাব অনটন অন্তহীন, কিন্তু সে সবের প্রকাশযোগ্য সাহিত্য গড়িয়া ওঠে কৈ ? সাহিত্য গড়িয়া না উঠিলে আর আশা কোথায় !

সে ভদ্রলোকের কথা আজ ও আমার মনের তারে মাঝে মাঝে প্রতিধ্বনি জাগায়। জাতি ত তন্দ্রামুক্ত, কিন্তু তাদের পথের দিশা দেয় কে ? সাহিত্য কোথায় !

জাতীয় সাহিত্যের জন্য এই যে হাহাকার এর মধ্যে কি আন্তরিকতা নাই ? কিংবা জাতির মুক্তি সাধনার বর্ত্তমান অভিব্যক্তি আন্তরিকতাশূন্য, তাই বুঝি সাহিত্যগগণে জীবনের বাণী ধ্বনিত হয় না ? এ প্রশ্নের উত্তর জাতি হয়ত পাইবেনা কখনও।

ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের যারা সবচেয়ে বড় বিরুদ্ধ সমালোচক তাঁরাও আজ স্বীকার করিতে বাধ্য যে, যেমন করিয়াই হউক, জাতির জীবনে একটা স্পন্দন জাগিয়াছে। জাতি জাগিয়া পথ খুঁজিতেছে, এবং এ কথাও সত্য যে জাতি একদিন জীবনের পরিপূর্ণতার রূপ পরিগ্রহ করিবে। জাতি চায় স্বাধীনতা, এক কথায় জাতি অন্ন চায়, আলো চায়, চায় সত্যকার জীবন। আরো পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে জাতি চায় আর্থিক সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা। কিন্তু আমাদের দেশের—বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা দেশের সাহিত্যে এই আন্দোলন কতটুকু রূপ পাইয়াছে ? এ দৈন্য কেন ?

আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাবধারার সহিত যাঁরা বিশেষ ভাবে পরিচিত তাঁরা বেশ জানেন যে, রবীন্দ্র সাহিত্যের বিরুদ্ধে একদল সাহিত্যিক বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু

রবীন্দ্রনাথ এত বড় এবং জাতিকে এত বেশী ঋণ জালে জড়িত করিয়াছেন যে, এদের তথাকথিত বিদ্রোহ জাতির প্রাণে সাড়া জাগায় নাই। জাতিকে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরোধী করিয়া তুলিতে পারে নাই। আমি রবীন্দ্রনাথের প্রতি অতি ভক্তি দেখাইতেছিনা, আমরা সত্যই রবীন্দ্রনাথের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী, রবীন্দ্রনাথ জাতিকে যেটুকু দান করিয়াছেন, সে ঋণ বোধহয় আগামী শতবর্ষের মধ্যেও বাঙ্গলা দেশ শোধ করিতে পারিবেনা। তাঁর "শেষের কবিতা" অতি আধুনিক সাহিত্যিক দিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ও একজন শ্রেষ্ঠতম ultra-modern সাহিত্যিক। অথবা তাঁর সাহিত্যে জাতির জন্য কেবল সাহিত্যই সৃষ্টি করে নাই—জাতির মুক্তি-আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের গান ছিল আঁধার পথের রুদ্র-মশাল। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথই ছিলেন, একমাত্র স্রষ্টা যিনি নব-সৃষ্টির আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া গান গাহিয়া জাতিকে উন্মাদ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পর সাহিত্যের রং মশাল হস্তে জাতিকে পথ দেখাইতে অগ্রসর হন শিল্পী শরৎচন্দ্র। কিন্তু তাঁর তীব্র কশাঘাত শাসক ও শাসিত—কেহই সহ্য করিতে পারে নাই। এখন তিনি জীবনের সায়াহ্নে উপনীত। জাতি তাঁর নিকট আর বেশী কিছু আশা করেনা। যদি করে তবে সে হইবে দুরাশা—অন্যায়।

শরৎচন্দ্রের পর জাতীয়-সাহিত্য স্রষ্টার নাম করিতে হইলে একমাত্র কবি নজরুল ইস্‌লামের নাম মনে পড়ে। একদিন ছিল, যেদিন তাঁর কাব্যে হুইটম্যান, বিসমার্কের রুদ্রধ্বনি শুনা যাইত। তাঁর কাব্যে ছিল বিষের তীব্রতা, অগ্নির প্রচণ্ড দাহন। কিন্তু এখন তাঁর কাব্যউৎস রুদ্ধ-প্রায়। তিনি সিঙ্গা ফেলিয়া বাঁশী ধরিয়াছেন। তিনি জাতীয়তাকে নিরাশ করিয়া ছাড়িয়াছেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকায় এক সাহিত্য সম্মেলনে শরৎচন্দ্র অতি আধুনিক সাহিত্যিক-দিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি আশা করি, এক শ্রেণীর সাহিত্যিক আমাদের পরে আসিতেছেন যাঁরা জাতির ব্যথা-বেদনার গান গাহিবেন, যাঁদের সাহিত্যে অন্নহীন, নিপীড়িত জনগণের জীবনের দাবী ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। এক কথায়, রুশিয়ায় বিদ্রোহের পূর্ব্বে যে সাহিত্য রুশ দেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল, বাংলায় ও সেই ধরণের সাহিত্য গড়িয়া ওঠার পূর্ব্বাভাষ পাইতেছি।" ভাবুক শরৎচন্দ্রের এ-স্বপ্ন কতটুকু সফল হইয়াছে? অতি আধুনিক সাহিত্যিকরা শরৎচন্দ্রের এ স্বপ্নকে কতটুকু সফল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন? দেখা যাইতেছে জন কয়েক তরুণ সাহিত্যিক সমাজের অতি নিম্নস্তরের জীবন (proletarian life) সাহিত্যের তুলিতে অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু সে চিত্র মানুষের মনে সত্যকার দাগ কাটে নাই। মানুষকে জীবনের সন্ধান দেয় নাই। বরং তাঁহারা এমন এক অশ্লীল সাহিত্য বলিতেও অনেকে দ্বিধা করেন না। তাঁদের সাহিত্য ভাবুকের মনে প্রশ্ন জাগায়, যৌন ক্ষুধাই কি দেশের কোটী কোটী নিরন্ন সর্ব্বহারা নরনারীর একমাত্র ক্ষুধা? এদের কি অন্য চিন্তা নাই?

নিপীড়িত জাতি আজকার সত্যকার সাহিত্যের সন্ধান। এদের দিক হইতে শক্তিশালী

সাহিত্যিকরা মুখ ফিরাইয়া আর্ট ফর আর্টস্ সেক (Art for art's Sake) এর দোহাই দিয়া Aristocrat সাহিত্য সৃষ্টি করিলে জাতির মুক্তি কি পিছাইয়া থাকিবেনা? দীনের দুয়ারে যে মণি-মাণিক্য অশ্রুবিন্দুরূপে অহরহ ঝরিতেছে—সাহিত্য-স্রষ্টারা কি তাহার মধ্যে জাতির জীবনস্পন্দন অনুভব করেন না?

জাতিকার রিয়েলিষ্টিক সাহিত্য—ভুঁয়া কথায় মালা নয়। সাহিত্যের মধ্য দিয়া কোটী কোটী সর্ব্বহারা নিপীড়িত মানবের জীবনের দাবী রূপ পরিগ্রহ করুক, এই দাবীকে সফল করিয়া তোলার মত স্রষ্টার আবির্ভাব অদূরবর্ত্তী, এ আশা বোধহয় বাঙ্গলা দেশ রাখিতে পারে।

সহ-শিক্ষা

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

সহ-শিক্ষা বা কো-এডুকেসনের কথা উঠ্‌তে আগেই মনে আসে আশ্চর্য্য হয়ে, তাহলে কি এই কিছুদিন আগেই স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হওয়া উচিত কি না, আর ঐ শিক্ষা প্রচার হলে সেটা কি ধরণের হবে; কতটা তার সীমা, তার বেড়ার উচ্চতা কতটা, এই সমালোচনার সীমানাটা আমরা পার হয়ে গিয়েছি। নইলে এই নিয়ে আলোচনা এই ক'বছর আগেই তো কম দেখা যায়নি (এখনো মাঝে মাঝে ওঠে)। মনে হতে পারে আশার সঙ্গেই, তাহলে হয়ত এতদিনে এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়ানো গেছে, যেখানে কিছুটা জনমত শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা মেয়েদের পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত, আর সেটা পাওয়া এবং দেওয়ার পরে যে সব অসুবিধা আছে, তার কতকটা কিসে নিরাকরণ হয়, সেকথা ভাবেন। সহ-শিক্ষার কল্পনা মনে হয় এতেই এসেছে।

কিন্তু এই সহ-শিক্ষাতে আজকালকার এই মতামত ও সংস্কারগত আপত্তি ওঠ্‌বার বছর কয়েক-প্রায় ৫।৭ বছর আগেই কলিকাতায় কয়েকটী বেসরকারী কলেজে (স্কটীসচার্চ্চ তাদের মধ্যে একটী, যাতে এখন শতাধিক ছাত্রী পড়েন) মেয়েরা খুব অল্পসংখ্যায় প্রবেশ করেছিলেন। অনেকেই তাদের মধ্যে অন্য প্রদেশিনী এবং ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান, হিন্দু নাম নিয়ে দু'একজন ছাড়া (সম্ভবতঃ দুএকবছর আগেপরে ডাঃ নরেশ সেন গুপ্তের মেয়ে) বড় বেশী কেউ ছিলেন না। এখন সম্ভবতঃ মেয়েদের নিজস্ব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অভাব, স্থাপনের সুযোগও অর্থাভাব, নানা অসুবিধার জন্য এই ক'বছরেই অনেকগুলি মেয়ে ছেলেদের কলেজে ঢুকেছেন। আর তাঁদের মধ্যে অনেকেই হিন্দুনামেই আছেন। সামাজিক জাতিসংস্কার, সম্মান, নাম, পুরাতন প্রথার একই ভাবে আছে। এতে মনে হয়, সহশিক্ষার সমর্থন পরোক্ষভাবে সমাজে চলেছে (অবশ্য খুঁড়িয়ে!), সমগ্রতাতে খুব অল্প সংখ্যাতেই তবু চলেছে।

শিক্ষায় বাংলাদেশ কত পেছিয়ে আছে, সভ্যদেশের তুলনায় ভারতবর্ষ কোথায় আছে, এতো নানাদেশীয় শিক্ষার আলোচনায় আমাদের জাতীয় অজ্ঞতার সমালোচনায় আমাদেরই নিরুপায় একচেটে আলোচ্য বিষয় বল্লেই হয়। আর তার মেয়েরা কোথায় আছেন তাদের অশিক্ষার অবস্থা কিরকম, সে আলোচনাও হয় মাঝে মাঝে। তবু আরও মেয়েদেরও যথাসাধ্য করা উচিত।

ওপরে বলেছি, কয়েকটা কলেজে মেয়েরা পড়্‌তে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু সেটা কলেজেই চলেছে, স্কুলে নয়। তবু মেয়েদের এই কলেজে পড়া আর শিক্ষিত হওয়া বা লেখাপড়া-শেখা ও স্ত্রীশিক্ষার গতানুগতিক গণ্ডীর সীমা নানাবাধা সত্ত্বেও একটু একটু করে সরছে, এই থেকে আমরা যা বুঝতে পারি তাতে ঐ মনেহয় যে শিক্ষাটা যে পাওয়া উচিত তা শিক্ষিতমন-সম্মত হয়ে

আসছে। অথচ সহজ ভাবে তা লাভের উপায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, সেটাও সকলের চোখে ঠেক্‌ছে।

দেখ্‌তে পাওয়া যায়, ছেলেদের জন্য নগণ্য পল্লীতেও পাঠশালা মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় থাকেই, সেক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য বালিকা বিদ্যালয় থাকেনা। (আর ইচ্ছা থাক্‌লেও পৃথকভাবে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনকরাও একটা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার তাই সেটা ঘটেও না)। তারপর ছেলেদের জন্য হাইস্কুল প্রায় একটু বড় গ্রামমাত্রেই আছে, (তাতেও মেয়েদের জন্য ছোট পাঠশালাও নেই)। এরপর সবডিবিশনে, সহরে, মাঝারি সহরে ছেলেদের স্কুলতো একটীর বেশী থাকেই; ইণ্টারমিডিয়েট কলেজও থাকে প্রায়। কোনোরকমে বাড়ীতে থেকে মফঃস্বলের ছেলেদের পড়্‌বার সুযোগ কিছুদিনও দেবারজন্য বিদেশের ব্যয়ে অসুবিধায় কলেজে পড়ার জন্য, তখন অবধি অভিভাবকদের ভাব্‌তে হয়না। যেমনকরে হোক, তারা খানিকটা শিক্ষার সুযোগ পায়। যেটা প্রতি গণ্ডগ্রামে পাঠশালা স্কুল, প্রতি গ্রামে উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়, এবং অনেক বড় সহরে কলেজ থাকাতে তারা পায়।

এইথেকে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে সাধারণভাবে মেয়েদের এই সুযোগ নেই। অথচ আজ কালকার দিনে এটার চলন হয়েছে কয়েকটীদিক থেকে, প্রথম, অনেক বয়স অবধি অবিবাহিতা থাকায়; দ্বিতীয়, অনেকে বিবাহ দিতে না পারায়; যেকারণেই হোক মেয়েদের অনেক সময়েই উপার্জ্জন করার তাগিদে, আর শিক্ষালাভের আগ্রহে। এই শিক্ষালাভের আগ্রহই হওয়া উচিত, এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এইটে উপলব্ধি কর্‌বার আগেই আমাদের দেশে অধিকাংশ সাধারণের বিবাহ হয়ে যায়, তাই এইটেই সবশেষের দিকে পড়ে।

পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ দেখা যায়, মেয়েরা কোনোক্রমে বাড়ীতে বা পাঠশালায় বর্ণপরিচয় করে, তারপর বিবাহ হয় তো ভালো, নাহয় তো, অনেক বয়স অবধিই ঐভাবেই লেখাপড়ার সমাপ্তি করে চুপচাপ থাকে। পল্লীগ্রাম থেকে যদি সহরে আসি, তাহলেও মেয়েদের পৃথক স্কুল স্থাপনের খরচ স্কুলের গাড়ী, পর্দ্দার সম্মান জন্য খরচ, অর্থাভাব ইত্যাদি নানাকারণে স্কুল প্রতিষ্ঠা ঘটে ওঠেনা। তারপর যদি বড় সহরে স্কুল বা থাকে মিশনারী মেমদের কল্যাণে বা ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টায়, তাতেও ঐ গাড়ী, তার 'ফী' শুদ্ধ স্কুলের বিপর্য্যয় দক্ষিণা এবং মেয়েদের পোষাকপরিচ্ছদ এই তিন একত্র জুটিয়ে পড়ানোর মত মনোবৃত্তি এবং অবস্থা খুব কম লোকেরই থাকে।

সহ-শিক্ষার যদি কোনো কারণে বিশেষ দরকার থাকে তা হলে এই কারণে। শিক্ষা জিনিষটা যত সহজে ও সস্তায় যত বেশীজনকে দিতে পারা যায় ততই রাষ্ট্রের ও সমাজের আদর্শের পক্ষে ভালো। এই ভালোটা যে মানুষের সত্যই দরকার, সেটা মনে করে নিতে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে, আপাততঃ সহশিক্ষাতেই আমরা সুলভে এই সুযোগটা পাই; এর (এই সহশিক্ষার) চলন হ'লে পল্লীগ্রামের মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে একই ব্যবস্থায় একই ব্যয়ে একই স্কুলের সাহায্যে প্রাথমিক, মধ্যশিক্ষা এবং ম্যাট্রিক অবধিও অনায়াসেই পড়্‌তে

পার্‌বে। এবং যেখানে সে সহরে কলেজ আছে, তাদের ভাইয়েরা আত্মীয়রা পড়ে থাকেন, অথচ তাদের সে শিক্ষা পাবার কোনো পথ নেই, কলিকাতা ছাড়া; সে ক্ষেত্রে এর চলন হলে ব্যয়, অভিভাবকের তত্ত্বাবধান, এবং আত্মীয়ের সঙ্গে একসঙ্গে কলেজে পড়ার তিন রকম দুর্ভাবনার দায় এড়িয়ে মেয়েদের মানুষ করে তোল্‌বার সুযোগ পাওয়া যাবে। বিদেশে শিক্ষার ব্যয়, রক্ষণাবেক্ষণের দায় আর ঘরের আবেষ্টনের প্রভাব থেকে দূরে রাখার যে শঙ্কা তাও কমই হবে।

কিন্তু এসব তো গেল সহ-শিক্ষার সুবিধার দিক।

অসুবিধার দিক দেখ্‌বার লোক কম নেই। বরং বেশী তাঁরাই। এই সুবিধা অসুবিধার দিকের কয়েকটী আলোচনা সম্প্রতি চোখে পড়েছে। তাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সহ-শিক্ষার পক্ষে নন। তাঁর কিছুদিন আগের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দেওয়া বক্তৃতায় তাই দেখা গেল। সম্পূর্ণ বক্তৃতাটী কোথায়ও দেখা যায় নি, আংশিক যা দেখা গেছে, তাতে তিনি আশঙ্কা করেন, এতে জাতির চরিত্র লঘু হয়ে যেতে পারে। পাশ্চাত্যসমাজের শিক্ষার প্রভাবে পড়ে প্রাচ্যসমাজের ও চরিত্রের গড়ন বদলে যেতে পারে। এবং নীতি ও সতীধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর পাশ্চাত্য সমাজের নরনারী ওপর খুব সম্ভ্রমপূর্ণ ধারণা নেই। এই তাঁর বক্তব্যের সার মনে হল। এর পরেই মডার্ণ রিভিয়ুতে শ্রীমতী উষা বিশ্বাসের লেখাটী চোখে পড়্‌ল। সহ-শিক্ষার সপক্ষেই তাঁর মত। সাধারণতঃ পৃথক স্কুল কলেজের সংখ্যাল্পতার জন্য মেয়েদের পড়ার অসুবিধা,—উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থিণী কম, সেজন্য যার প্রয়োজন সেও সুযোগ পায় না; এছাড়া যে সহরে বা গ্রামে পৃথক স্কুল কলেজ নেই এবং বিদেশে গিয়ে লেখাপড়া শেখবার মত অবস্থা নয় বা সুযোগ নেই, কেন না মেয়েদের অনেক বাঁধা। এই সব স্থলে তার কোএডুকেশন পাওয়াই সব চেয়ে সুবিধার উপায়। নীতি সম্বন্ধেও কিছু তিনি বলেছেন। কিন্তু এর অভিমত কো-এডুকেশনের পক্ষেই।

তারপর পূজার আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় সামান্য একটু বলেছেন শিক্ষা সম্বন্ধেই। তিনিও কো-এডুকেশনের পক্ষে। তাঁরও মত এতে সাধারণ ভাবে অনেক মেয়ে লেখাপড়ার খুব বেশী সুযোগ পাবে, জাতির পক্ষে যেটা দরকার এবং লাভ।

এতো যাঁরা মতামত ব্যক্ত করেছেন তাঁদের কথা। সাধারণ যাঁরা বলেন না, বা বলেন নি, কিন্তু সমর্থন ও করেন না; আর কেন করেন না পরিষ্কার করে বল্‌তে পারেন না তাও, তাঁদের সংখ্যাই আরও বেশী। তাঁদের পক্ষের জনমত হচ্ছে এই যে নৈতিকতার হানি হবে। এই নীতিহানি সম্বন্ধে সাধারণতঃ নীতির দিক দিয়ে যা' কথা ওঠে, তা প্রায়ই জাতিবর্ণ আর সংস্কারের কথা মনে করে। কিন্তু নীতি যা' বস্তু সংস্কার সে জিনিষ নয়;— এবং নৈতিকতার হানি আর সংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ একই কথা নয়। প্রথম তো কো-এডুকেশনের

সুযোগ যাঁরা দিয়েছেন নিজেদের বিদ্যালয়ে, তার মধ্যে শান্তি-নিকেতন আমাদের বাংলাদেশেরই, ইহার বিষয়ে অনেকেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। এখানে সহ-শিক্ষা আর মেলামেশা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও মেয়েদের বা ছেলেদের সম্বন্ধে নৈতিকতাহীনতার কথা শোনা যায় না। অন্যত্র বম্বেতে আছে,—হয়ত আরও এক আধ জায়গায় আছে। কলিকাতায় কয়েক বছর ধরে কয়েকটী কলেজে মেয়েরা পড়ছেন। এসব ক্ষেত্রেও এই নীতিহানির বা গ্লানির কোনো বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

এখন আমাদের মনে হয় এই সমস্ত কিছু সত্য কিছু কাল্পনিক ধারণার দোহাই ছেড়ে এটা নিয়ে সুবিধা সুযোগ উন্নতি আর অবনতির এদিক দিয়ে পরিষ্কারভাবে আলোচনা হওয়া উচিত।

এক্ষেত্রে আর একটা দিক আছে যা' অবাস্তব মনে হলেও অবাস্তব ঠিক নয়। তা' হচ্ছে, সাধারণের আর অসাধারণ অনেকেরও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কেবল একটা ভয় আছে। ঐ ভয়টা অনেকটা সেই ধাতের যে ভয় আমাদের মনে সমাজের নীচু স্তরের অথবা অশিক্ষিত স্তরের লোকদের শিক্ষা দিতে আছে;—যে ভয় আমাদের কর্ত্তৃপক্ষরা আমাদের সামরিক শিক্ষা দিতে পান,—সে ধরণের ভয়—সর্ব্বত্রই ক্ষমতাপন্নদের থাকে—ছোট বড় সব জায়গায় অক্ষমকে চির অক্ষমও মুখাপেক্ষী করে রাখার লোভে,—সেই ভয়টা আমাদের বেলাতেও আছে।

যদিও ঐ স্ত্রীশিক্ষার কথা, সহ-শিক্ষার আলোচনার বিষয় নয়।

তবু আমাদের মনে হয় ঐ নীতিহানির আশঙ্কা আর এই স্ত্রীশিক্ষাতে নিজ সম্পর্কীয় চিন্তার বা কাজের অথবা কোনো কিছুর সহজ স্বচ্ছন্দ আলোচনার যে ভয় আর অপছন্দ ভাবটা কর্ত্তৃপক্ষের মনের মধ্যে মূল বিস্তার করে আছে, এই দুটো মিশিয়ে মনের মধ্যেই এর বাদানুবাদ চলে। সেই জন্যই অধিকাংশ লোক আর স্বজনরা এই সম্বন্ধে পরিষ্কার স্পষ্ট মতামত দিতে পারেন না। আর দুর্নীতির নীতিহীনতার শঙ্কা সমাজের পক্ষেও মানুষের পক্ষেও একটা এত বড় বিপদ্, যে, তার সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিত করলেই প্রতিবাদ করা ও হয়,—কাজও হয়।

কিন্তু সত্যই সহশিক্ষা নীতিহানির সহায় কিনা ভাব্‌বার বিষয়। সহশিক্ষা পাশ্চাত্য দেশে যেখানে চল্‌চে সেখানকার কথা যাঁরা জানেন ভালোকরে, তাঁরা আলোচনা কর্‌তে পারবেন। আমেরিকায় অনেকদিন চলেছে। সেখানকার কথাও যাঁরা দেখেছেন আশাকরি তাঁরা বল্‌বেন।

সহশিক্ষাতে যে নীতিচ্যুতির কথা ওঠে, তার কথা শ্রীমতী ঊষা বিশ্বাস বলেছেন এতে সাধারণতঃ অভিভাবকের ভয় পাছে অবাঞ্ছনীয় বিবাহ ঘটে।

প্রথমেইতো এই কথার উত্তরে বলা যায়, যদি বিবাহই হোল,-তা নীতিচ্যুতি কোথায়? ভয় তো মানুষের অবন্ধিত স্বেচ্ছাচারকে, বন্ধনযুক্ত মিলনকে কি নীতিহীন বলা যায়?

এই শঙ্কিত মনোভাবের নীতিকে কি ভাবে নেওয়া হয় সেটা দেখা যাক ;

এই অবাঞ্ছনীয় বিবাহ, মানে, স্বজনের বা অভিভাবকের অনভিমতে বিবাহ ; সেটা (১) অসবর্ণ হ'তে পারে, (২) অবর্ণ প্রাদেশিক হতে পারে, (৩) প্রদেশিক অসবর্ণ হ'তে পারে, যেমন বাঙ্গলার ব্রাহ্মণে অন্য দেশের বৈশ্য, (৪) একবারে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী, বিদেশী জাতি যথা মুসলমান য়ুরোপীয়ান, বর্ম্মী জাপানী চীনা যাই হোক। প্রথমতো এই প্রসঙ্গে সাধারণভাবে মনে রাখ্‌তে হ'বে ঐ বিবাহ কথাটী। কেননা, সঙ্ক্ষেত্র 'বিবাহ' হচ্ছে, সে যতই অবাঞ্ছনীয় হোক্ না কেন তার উদ্দেশ্য আর কাজ ভবিষ্যৎ বংশীয়ের মঙ্গল, উহা এই বন্ধনের বা মিলনের পরিপন্থি হচ্ছে না। যেমনই হোক, তাদের একটা সমাজ এবং আশ্রয় আছেই। এতো গেল সমগ্র ভাবের সববিবাহের কথা। এছাড়াও চতুর্থটী ছাড়া আর তিনটী অনেক সময়ে লোকাচার হিসেবে অবাঞ্ছনীয় হতে পারে ; অশাস্ত্রীয়ও নয়, আর অবৈধ ও নয়, অচল ও নয়। হিন্দু শাস্ত্রে অনুলোম, প্রতিলোম বিবাহ এবং সবর্ণ বিবাহ আছে, এইসব বিবাহের পদ্ধতি আছে আট রকমের। * তাদের নাম আর্য্যব্রাহ্ম, গান্ধর্ব্ব, ও রাক্ষস, আসুর, পিশাচ ও পাশব। তা'হলে দেখা যাচ্ছে, এই অবাঞ্ছনীয় বিবাহ মানে অভিভাবকের অপছন্দে বা অনভিমতে বিবাহ। যাইহোক, এটা যখন বিবাহ, তখন একে নীতির দিকথেকে সর্ব্বথা নিন্দনীয় বলা যায় না। এবং সহশিক্ষার সমর্থকপক্ষের এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের একটা বড় জবাব এই যে, এপর্য্যন্ত কো-এডুকেশনের সুযোগ বা দুর্য্যোগ না ঘটা সত্ত্বেও এই ধরণের অবাঞ্ছনীয় বিবাহ অসবর্ণ, সবর্ণ, বিদেশী, বিজাতি সব বিবাহই ঘটেছে, অনেকস্থলেই ও অন্য সূত্রেই আর সহশিক্ষার মাঝে ও ইতিমধ্যেই ওরকম বিবাহ বড় অনেক হয়নি। এরপরে অনেকে বলেন, মেয়েদের ও ছেলেদের চরিত্রে নীতির লঘুত্বের কথা। যেদিন স্কটীসের প্রিন্সিপ্যাল আরকুাহট্ সাহেবের রোটারী ক্লাবে প্রদত্ত বক্তৃতার থেকে একটি দুটী লাইন তুলে দিচ্ছি। তিনি বলেছিলেন, কয়েকবছর আগে সেণ্টএণ্ডরুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একসভায় জে, এম, ব্যারি বলেছিলেন, স্কট্‌ল্যাণ্ড এচারটী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ও একটী পঞ্চম বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সে হচ্ছে অগণিত দরিদ্র ছাত্রদের পারিবারিক জীবন। বিশ্ববিদ্যালয়ই একমাত্র শিক্ষাক্ষেত্র নয়। গৃহও শিক্ষার অন্যতম বিশিষ্ট ক্ষেত্র।" আমাদের দেশেও পরিবার আর পারিবারিক জীবন বলে একটা জিনিষ আছে, এবং তার ও প্রভাব বালকবালিকাদের জীবনে একটু আছে, বলা যেতে পারে। সেইক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার (যদি মন্দ প্রভাব থাকে) প্রভাবই একমাত্র প্রভাব নয়, একথা অতি অশ্রদ্ধেয়। চরিত্র আর নীতি এমন জিনিষ যা অনেকটাই পারিবারিক আর সামাজিক প্রভাবের ওপর নির্ভর করে। সহশিক্ষার সহায়তাতে সেই নীতিবোধ বা চরিত্র যে একেবারে শিথিলমূল হয়ে গিয়ে যথেচ্ছাচার কর্‌বে, এমন অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা আমাদের ছেলে মেয়েদের ওপর আর সহশিক্ষার উপরও না আসাই উচিত। আরও এও সঙ্গে সঙ্গে বলা উচিত যদি এমনই হয়,

* ঐ বিষয়ে ১৩৩৮ সালের অগ্রহায়ণের জয়শ্রীতে অলোচনা আছে, 'অসবর্ণ বিবাহ' শীর্ষক লেখায়।

যে পৃথক ও আড়ালকরে রাখা ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের নীতিবোধ রক্ষা করা যাবে না তাহলে এমন সুনীতির বিশেষ মূল্য নেই ; এবং বিশেষ দরকারও নেই তার বোধহয়। ঐবক্তৃতারই আর একজায়গায় তিনি বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো ছাত্রবিপ্লববাদী তাই বলে ছাত্রমাত্রেই ওরকম মনে করা অন্যায়"। আমরাও বল্‌তে পারি, সহশিক্ষার যদি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবাঞ্ছনীয় আচরণ দেখা যায় সেটা সকলের পক্ষেই প্রযুক্ত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এও অমূলক, কেননা আগেই বলেছি,—যে, সব সময়ে (অভিভাবকের) 'অবাঞ্ছনীয়' মিলন ঘটেছে,—তা'র—সহায়তা সহশিক্ষার পন্থার হয়নি। —(আর তা' সুনীতিও নয় এও মনেরাখা দরকার)। আর সহশিক্ষার দ্বারা যদি কোন ঐ 'অবাঞ্ছনীয়' ঘটনা ঘটে থাকে, তা' আইনতঃ সিদ্ধ, নীতি ও বটে। 'অবাঞ্ছনীয়' আর অবৈধ একজিনিষ নয়।

সহ-শিক্ষায় নৈতিক পতনের শঙ্কায় যেটুকু আমার বলার প্রয়োজন ছিল, বলেছি। কিন্তু সহশিক্ষা যে একটু আধটু চলে এক এক জায়গায় তার কথা বল্‌তে ভুলেছি। সহশিক্ষা মেয়ে স্কুলে অনেক সময়ে অনুমোদিত হয়। গাড়ীতে দেবার জন্য, পথে একলা ছাড়াতে ভয়ের জন্য অনেক সময় অনেক মা বাপ ছোট ছোট ছেলেদের দিদিদের স্কুলে দিয়ে থাকেন। এরা ১০।১১ বছর মেয়ে স্কুলে পড়্‌তে পায়। সংখ্যায় অবশ্য খুব কম করেই যায়। এছাড়া গ্রাম্য পাঠশালায়, পল্লীগ্রামে প্রাথমিক স্কুলে আর সহরেও ছোট ছোট ছেলে এবং মেয়ে একসঙ্গে পড়ে। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাথমিক ছোট স্কুলগুলিতে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ায়, খেলায় ড্রিলে বাধা নেই। শান্তিনিকেতনে স্কুলের মধ্যে প্রায় ১৩ বছর অবধি বালক বালিকা একসঙ্গে পড়ে। এরপরে কীপার বয় দ্বারা পৃথক পাঠ নেয় শুনেছি। আবার বিশ্বভারতীতে একত্রে পড়ানো হয়।

তা'হলে দেখা যাচ্ছে সেখানে সহশিক্ষা ভাল না থাকায় বা নীতিহীন বলে কিছু হয়নি। বরং পড়াশোনা শান্তিনিকেতনে বেশ ভাল ও আনন্দময় হয়েছে বলে শোনা যায়। আর ছাত্রছাত্রীতে নিঃসম্পর্কতার মাঝেও বেশ সহজ বন্ধুমনোভাব ভাই বোন ভাব ও জন্মেছে দেখা গেছে।

এখন স্কুলকলেজের সংখ্যার হার, অশিক্ষিতের সংখ্যায় তলিয়ে উপায় দেখ্‌তে গেলে, আমাদের চোখে সব প্রথমে পড়ে, আমাদের অর্থও নেই, সহায়ও নেই। অথচ অশিক্ষিতের সংখ্যা প্রচুর। এর নিরাকরণের ঐ একটীমাত্র উপায় আছে সহ-শিক্ষার সুযোগ নেওয়া। বাংলাদেশে কতগুলি প্রাথমিক, মধ্য-ইংরেজী, কয়টীবা হাইস্কুল আছে মেয়েদের ও পুরুষদের, তা গত আশ্বিনের জয়শ্রীতে বেরিয়েছিল। মেয়েদের ক'জনের আর ছেলে কতজনের অক্ষয় পরিচয় আছে, আর নেই, শিক্ষা কতদূর কার আছে, নেই—; এও দেখ্‌তে বেশী খোঁজ কর্‌তে হয় না সে মাসের রিপোর্টেই দেখা যাবে। এই লক্ষ লক্ষ 'মূঢ় মূক ম্লানমুখে ভাষা'দেবার কথা মনে আনা যায় একমাত্র উপায় এখন যতক্ষণ না হাতে অন্য উপায় আসে, ওই সহ-শিক্ষা অন্ততঃ স্কুলে ১৩ বছর অবধি একত্রে, তারপর পৃথক ক্লাশ ঘর করে উচিত (যদি এখন আপত্তি থাকে কিছু—অভিভাবকদের) আবার কলেজে একত্রে।

আমাদের মনে হয় এতে নীতিহানি না হয়ে লাভই হবে। সহজভাবে দেখ্‌তে শিখবে ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে। আর এক স্কুলে এক পল্লীর এক পরিবারের শিশু ও বালকবালিকা পড়াতে কোনও ক্ষতিই নেই, কেননা বাড়ীতে এবং পল্লীতেও তারা অনেক সময়েই একত্র খেলা করে থাকে।

যাদের দেশে শিক্ষা বল্‌তে নিরক্ষরতা নাম ঘোচানো বোঝায় এখনো—যাদের দেশে সেই শিক্ষারই বিস্তারের জন্য যা' খরচ হওয়া উচিত, স্বাস্থ্য ও জ্ঞানলাভের জন্য যা করা উচিত, স্বাস্থ্যোদ্ধার যা পাওয়া উচিত, তার দেশে জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারের জন্য আয়ুর জন্য যা' হওয়া উচিত তার একটাও হয় না; সেদেশে অক্ষর পরিচয়ের জন্যই স্বল্পব্যয়ে এই শিক্ষা লাভের সুযোগ না নিলে আগামী আরও দশবার আদমসুমারীর রিপোর্টেও অর্থাৎ আরও শ'খানেক বছর আমরা আমাদের অশিক্ষিত সঙ্কীর্ণ মন ও মত, কল্পিত নীতিবাদ লোকাচারপরায়ণতা, অদৃষ্টবাদ নিয়ে ২৩৷৷০ বছরের আয়ুকে ১৩৷৷এ নিয়ে ঠিক সনাতন ভাবে বেঁচে থাক্‌ব সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশে পতিতার সংখ্যা যত সেই অনুপাতে যদি পতিত অর্থাৎ পুরুষ অসচ্চরিত্রের সংখ্যা করি, তা'হলে সংখ্যাটা বেশ মোটা রকম হয়। বলা উচিত, এরা এই মেয়েরা ও পুরুষেরা অধিকাংশই মূর্খ, মেয়েরা প্রায়ই নিরক্ষর, সমাজে মেলামেশা করার অবকাশ তারা পায় নি, পায় না। নৈতিকতার যে ত্রুটীর জন্য বেচারী শিক্ষাপ্রণালী ও তথাকথিত শিক্ষিতা ও শিক্ষিতরা দায়ী হয়, নিন্দিত হয়, এরা সে দুর্য্যোগের মাঝে পড়েনি; সনাতন অশিক্ষা, পুরাতন পর্দ্দা, চিরন্তনী মূর্খতা তাদের নিবিড়ভাবে ঘিরে জড়িয়ে আছে, তবু তাদের পতন প্রবৃত্তি আছে। এবং পতিত হয়, অতঃপরই পতিতভাবেই জীবনযাপন করে। এতে বোধ হচ্ছে শিক্ষা এবং সহশিক্ষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষাই যে পতনের ও নীতিহানির কারণ হয়, তা নয়।

আর তা'হলে এতদিন যুগ-যুগান্তর যখন এই একই এক্‌স্‌পেরিমেণ্টে মানব জাতির তথা নারীর চরিত্র পরীক্ষা করে দেখা গেছে, আর আমরা আদি এই নানা নাম্নীদের নামে তার পরীক্ষা ফল প্রমাণ হয়েছে; (জানা যাচ্ছে অনীতি দুর্নীতি পালন আছেই!) এখন না হয় ও পরীক্ষা বিচার কিছুদিন বন্ধ রেখে বিধাতার ওপর ছেড়ে দিয়ে অন্য পরীক্ষাধীন করা যাক না। দেখা যাক্ বিষে বিষ ক্ষয় হয় কিনা। মানুষের নীতিবোধও কম প্রবল নয়।

পরিশেষে আর একটী কথাও বলা দরকার। সেটা হচ্ছে এই:— অনেকে বলেন যে, (১) মেয়েদের লেখাপড়া বা উচ্চশিক্ষার কি এমন দরকার,—সে তো কাজ কর্‌তে যাবে না, বা চাকরী করে সংসার প্রতিপালন করবে না, অতএব মেয়েদের লেখাপড়ায় কি উপকার দিবে! (২) আর স্বামীরা বা অন্য সকলে একে লেখাপড়া বলে না। লেখাপড়া অথবা শিক্ষার প্রয়োগ দু রকমের, একটা মুখ্য অন্যটা গৌণ। যেটা মুখ্য, সেটা হচ্ছে নিজের মনের জন্য, জ্ঞানের

জন্য, কালচারের জন্য ; (কিন্তু এইটা হয়েছে গৌণ। আর যেটা গৌণ সেটার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, শিক্ষার কার্য্যকারিতার দিক, ঐ উপকারে লাগার দিক অর্থ-অর্জ্জনের ক্ষমতা (এইটেই মুখ্য উদ্দেশ্য নেওয়া হয়)। এঁদের ঐ প্রথম আপত্তির জবাব হচ্ছে, মানসিক উৎকর্ষতে মেয়েদের নিজের প্রয়োজন আছে, তাঁরা সেটা বলে। এবং সেটা ত অভিভাবকের বা কারুর আপত্তি থাকা অন্যায়, উচিত নয়। তাঁদের আপত্তি তোলার অধিকার থাকাই উচিত নয়, যদি শিক্ষা পাবার সুযোগ থাকে। দ্বিতীয় কথার উত্তর এই, একজন মানুষের মানসিক প্রয়োজনকে আর একজন মানুষ নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়ে চেপে দিতে পারেন না। সেই চেপে দেওয়ার ইচ্ছা বা চেষ্টা তাঁর নিজের ক্ষমতার ও অপপ্রয়োগ, তার অপর ও অত্যাচার। সঙ্কীর্ণচিত্ততার পরিচয় ও বটে। এছাড়াও মেয়েদের শিক্ষালাভ সুমাতৃত্বের জন্য দরকার, আত্মরক্ষা করার জন্য দরকার এবং মানসিক শক্তি, বুদ্ধির মার্জ্জনার জন্য প্রয়োজন আর অনেক সময়েই জীবিকা সংগ্রহের দরকার পড়ে ; এর জন্যও মেয়েদের 'আওতায়' মানুষ করে রাখার চেয়ে একটু শক্ত করে মানুষকরাই উচিত। কেন না পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্র প্রথায় উত্তরাধিকারও তো নেই ; আর দান স্ত্রীধন সে বিষয়েও তো তাঁরা কঠোর নিয়মানুবর্ত্তী। মেয়েদের স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণের সবকটা প্রণালীই অভিভাবকের অত্যন্ত শীলযুক্ত শিষ্ট সদয় ব্যবহারের ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে ; অন্যরূপ হলে বল্‌বার কিছু থাকে না। শিক্ষার দরকার এরজন্যও। এবং ঐ শিক্ষার জন্য সল্পব্যয়ে আমাদের একমাত্র উপায় সহশিক্ষা।

এখন লিখ্‌তে পড়্‌তে জানা মেয়ের সংখ্যা (শিক্ষিতা নয়) দিই, (বাংলার) "১৯২১ সালে ৫ ও তদূর্দ্ধ বয়সের মেয়েদের মধ্যে হাজারে ২১ জন লিখনপঠনক্ষম ছিল। ১৯৩১ সালে হাজারে ৩১ জন ছিল।" (প্রবাসী ১৩৪০ অগ্রহায়ণ)

অর্থাৎ শতকরা তখন আমাদের দুজন প্রায় ছিল হাজারে গিয়ে ২ য়ের ওপর ১ ছিলেন। এখন এক আধ দিন নয়, দশ বৎসরে আমাদের শতকরা ঐ প্রায় একজনই বেড়েছে। এও লিখ্‌তে পরতে পারা শুধু গড়ে। "লিখন পঠন ক্ষম পুরুষ হচ্ছেন বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমান মিশিয়ে ১৮০ জন হাজারে। ১৯২১ সালে ছিলেন ১৮১ জন।" এ ক্ষেত্রে একজন কমেছে আবার।

এইত আমাদের অক্ষর পরিচয়ের নমুনা, বা বর্ণ পরিচয় জ্ঞান। মনেহয়,—যদি ছেলে মেয়ে এক স্কুলে পাঠশালায় পড়ার প্রথা চলে, তাহলে প্রতিযোগিতায় ছেলেরা ও স্বভাবতঃই মেয়েদের চেয়ে ভালো আর বড় হ'তে চেয়ে শিক্ষার প্রসার হ'তে পারে উভয়তঃই। এও অনেক লাভ।

এই লেখার পরে গত ২রা ডিসেম্বর স্কটীশচার্চ্চ কলেজের প্রতিষ্ঠাদিন উপলক্ষে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ আর্কুট বলেছেন, "কুমারী সুজাতা রায় বি, এ, পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া মেডেল পেয়েছেন। এবং বর্ত্তমান বৎসরে যেসব ছাত্রী আমাদের কলেজ থেকে পোষ্ট গ্রাজুয়েট শ্রেণীতে অধ্যয়ন কর্‌তে গেছেন তাদের সম্বন্ধেও আমাদের গর্ব্ব অনুভব কর্‌বার

কারণ রয়েছে। দুইবৎসর আগে আমাদের কলেজের কুমারী রমাবসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে প্রথমস্থান অধিকার করে মেডেল পেয়েছেন। ইনি বর্ত্তমানে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আমাদের এই কলেজের আরো দু'জন ছাত্রী দর্শনশাস্ত্রেও ইংরাজীতে প্রথমশ্রেণী পেয়েছেন। কুমারী চামেলী দত্ত পদার্থবিদ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এস, সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ইনি দুইবৎসর পূর্ব্বে আমাদের কলেজের ছাত্রী ছিলেন।

ছাত্রীদের কৃতকার্য্যতার বিষয়ে আমি এও বল্‌তে পারি যে, গতবৎসরের অভিজ্ঞতা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অধ্যয়নের সার্থকতা সম্বন্ধে আমাদের আরও নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত করেছে। স্ত্রীলোকদের জন্য কার্য্যতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের পথ বন্ধ না করা পর্য্যন্ত উহাই বঙ্গের শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের একমাত্র সম্ভবপর পন্থা। শুদ্ধমাত্র মেয়েদের জন্যই প্রতিষ্ঠিত কলেজ সমূহের সার্থকতা যতই থাকুকনা কেন, বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের সময় উহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং ছেলেদের কলেজে মেয়েদের স্বতন্ত্র সময় ক্লাসকরার কোনো মূল্য আছে কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয় এতে প্রকৃতপক্ষে ছাত্রজীবনের কোন সার্থকতা হয় না ; এরদ্বারা দিনের অস্বাভাবিক সময় পর্য্যন্ত লেক্‌চারের ভিড় জমে যায়। আর অবশিষ্ট সময় ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত পড়াশোনা থেকে বিরত থাকে, এবং বিশেষভাবে যারা হোষ্টেলে থাকে, বাড়ীতে থাকে না, তারা নিজেদের কোনো উন্নতির কাজও কর্‌তে পারে না।"

মহিলা-কবি স্বর্গীয়া কামিনী রায়

শ্রীবিভা সেন এম, এ

বৈদিক যুগ বহুদিন হয় অতীত হইয়া গিয়াছে, বৈদিক যুগের গার্গী, মৈত্রেয়ী, প্রভৃতি বিদুষী মহিলাগণের কথা আমরা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি। তাহারপর বহুদিন পর্য্যন্ত শিক্ষিত হিসাবে উচ্চ স্থান অতি কম ভারতীয় নারীই অধিকার করিয়াছে। বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই নারীকে জ্ঞানদান হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে আদর্শ "গৃহলক্ষ্মী" করা হইয়াছে। নারী রন্ধনগৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নারীর পাঠস্থান রন্ধনগৃহ, তাহার পাঠ্যপুস্তক পরিবারের সকলের সন্তোষ-অসন্তোষব্যঞ্জক মুখ, তাহার প্রধান কর্ম্ম রাঁধার পরে খাওয়া এবং খাওয়ার পরে রাঁধা। পুরুষও যাহাতে তাহাদের নিজদের স্বার্থ বজায় থাকে সেইজন্য নারীজাতিকে শিক্ষা দেওয়া অসঙ্গত বলিয়া স্থির করিয়া নিয়াছিলেন, নারীজাতিকে শিক্ষা দিলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইবে, সমাজের শাসন সুশৃঙ্খলা রক্ষা হইবেনা এইরূপ ভীতিপ্রদ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। সেইজন্য পূর্ব্বকালের নিরক্ষরা বঙ্গ-মহিলাদের নিকট হইতে সাহিত্য হিসাবে কিছু আশা করিবার উপায় নাই। তাহাদের মনে যে নানাভাবের উদয় হইত না তাহা কে বলিতে পারে, কিন্তু প্রকাশ লাভের উপায় না থাকায় তাহা লুপ্তই থাকিত।

তাহার পর ২।৪ জন উদারচেতা মহাপুরুষ যখন নারীজাতির শিক্ষার অভাবই সমাজের উন্নতির অন্তরায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, যখন তাঁহারা সমাজকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, নারীদিগেরও চিন্তা করিবার শক্তি আছে তখন কয়েকজন নির্ভীকচেতা মহানুভব ব্যক্তি সমাজের বিধি নিষেধ না মানিয়া স্বীয় কন্যাদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাদেরই প্রচেষ্টার ফলে আজ বঙ্গ মহিলাগণ সাহিত্যিক জগতে অল্প পরিসর স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন। পুরুষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে, তাহাদের তীব্র সমালোচনার মধ্যে আপনাদের অতি সহজ সরল গার্হস্থ্য জীবনের এবং আপনাদের মনের ২।৪ টা অতি সাধারণ ভাবনারাশি ফুটাইয়া তুলিতে যাঁহারা সাহসী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মহিলাকবি শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের জীবনী সম্বন্ধে অনেকে অনেক সারগর্ভ বিষয় বলিবেন, তবে তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া তাঁহার কবিতার মূল কথা কি, তিনি বাঙ্গলাসাহিত্যকে কি কি ভাবরাশি দান করিয়া গিয়াছেন সেই সম্বন্ধেই ২।৪ টা অতি সামান্য কথা বলিতে চাই।

বাঙ্গালী রমণীর নিজস্ব শক্তি বহির্মুখ করিবার যে স্বাভাবিক কুণ্ঠা তাহা শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের চরিত্রে ও বিশেষভাবে বর্ত্তমান ছিল। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন—

"বিধাতা দেছেন প্রাণ
থাকি সদা ম্রিয়মান
শক্তি মরে ভীতির কবলে
পাছে লোকে কিছু বলে"

কবির নিজের প্রতিভার প্রতি বিশ্বাস অতি অল্প ছিল, এইজন্য তাঁহার কবিত্বশক্তি নীরবেই, লোকচক্ষুর অগোচরে ঝরিয়া যাইত, যদি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে উৎসাহ না দিতেন, তিনি কবির রচিত "আলোছায়ার" ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "কবিতারগুলি ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, কবির নির্ম্মলতা এবং সর্ব্বত্র হৃদয়-গ্রাহিতা গুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি। পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারকে মনে মনে কতই সাধুবাদ প্রদান করিয়াছি আর বলিতেই কি স্থলবিশেষে হিংসার উদ্রেক হইয়াছে।"

তাঁহার কবিতা পাঠে সাধারণতঃ কয়েকটী ভাবের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হয় তাঁহার অধিকাংশ কবিতা ঈশ্বরানুরাগ, স্বদেশপ্রীতি, স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি এবং নিরাশ প্রাণের আশ্বাস বাণীতে পূর্ণ।

মানুষের শক্তি পরিমিত, সে স্রষ্টার ক্রীড়াপুত্তলি মাত্র। মানুষ নিজের ইচ্ছায় কিছুই ভাঙ্গিতে অথবা গড়িতে পারে না, নর ক্ষুদ্র ভগবান মহান, ভগবান প্রভু এবং মানুষ ভৃত্য মাত্র এই ভাব তিনি বহুবার তাঁহার কবিতার ব্যক্ত করিয়াছেন।

ভগবান মানুষকে ঠিকপথে চালনা করিবেন তাহার চিন্তা করা বৃথা, শোক করা বৃথা, "চলিবার ভার তব নহে চালাবার" অদৃশ্য কর্ণধার তরঙ্গ-গ্রাসের মধ্য দিয়া তরণী চালাইবেন এই আশ্বাস বাণী অনেক নিরাশ প্রাণে আসার সঞ্চার করে।

মানুষের সকল অভাব সকল প্রেমের তৃষ্ণা এক ভগবৎ প্রেমেই পূর্ণ হইতে পারে এবং যে ভগবানের দত্ত শক্তিতে যথাসাধ্য কর্ত্তব্য করিয়া তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে সেই প্রকৃত সুখী হইতে পারে তিনি বলিয়াছেন,

"ধন্য সেই, হয় যেই তাঁর সহচর,
এ সংগ্রামে, দিয়ে সুখ, তনু, মন, প্রাণ"

* * * * * *

বিবেক যে সে হাতেরই ঘন কশাঘাত
মহতী কামনা রাশি সে হাতেরই বাশ
জর্জ্জরিত তনু, তুচ্ছ করি অস্ত্রপাত
চির অগ্রসর শুনি তাঁহারি আশ্বাস।"

দুঃখিনী জন্মভূমির জন্য কবির প্রাণ কাঁদিয়াছে। পুরুষত্বহীন এদেশবাসী, সমাজ শাসনে লাঞ্ছিতা বঙ্গরমণী, জাতিগত, ধর্ম্মগত, সমাজগত, বিভেদে বিচ্ছিন্ন একতাবিহীন এদেশবাসীর চিন্তা

তাঁহাকে মর্ম্মান্তিক যাতনা দিয়াছে। দুঃখতপ্ত, নৈরাশ্যপূর্ণ, প্রিয়জনবিচ্ছেদে শোকাতুর প্রাণ কবি দেশ-মাতৃকার চরণে বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকে ধন্য করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। বহুর মঙ্গলের জন্য একের বিনাশে ক্ষতি হয় না, দেশের হিতের জন্য আত্মোৎসর্গ করিলে নিজের ছোট খাট সুখ দুঃখের কথা ভুলিতে হইবে, যেখানে সকলের অশ্রু বারণ করিতে হইবে সেখানে আপনার অশ্রু ফেলিবার অবসর কোথায়—তিনি লিখিয়াছেন—

"হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর
দুঃখিনী জনমভূমি মা আমার মা আমার,"

তাঁহার কবিতার কয়েকটী লাইন

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"

চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

স্বজাতি নারীজাতির প্রতি তাঁহার সহানুভূতি বড় গভীর, বড় আশ্চর্য্যরকমের হীন পতিত সমাজ-তিরস্কৃত, সমাজ-বহিষ্কৃত বঙ্গরমণীর জন্য তিনি প্রকৃত ব্যথিত ছিলেন। মুহূর্ত্তের প্রলোভনে নারী যদি কোন দোষ করিয়াই থাকে তাহা হইলে সারাজীবন কি সে অস্পৃশ্য হইয়া থাকিবে, তাহার দোষক্ষালনের কি কোন উপায় নাই। সমাজ তাহাকে ঘৃণা করিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া তাহার মনুষ্যত্বের অবমাননা করিতেছে সমাজ বিধি নিষেধের গণ্ডী টানিয়া তাহাকে অতি পবিত্র রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহার ফলে যে কত জীবন নষ্ট হইয়া যাইতেছে সেইদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই যেখানে স্নেহ, ভালবাসা ক্ষমা সঞ্জীবনীর ন্যায় কাজ করিতে পারিত সেখানে ঘৃণা, বিদ্রূপ, ভর্ৎসনা বিষবাণের মত ফল আনয়ন করিয়াছে। কলঙ্কিতার জীবন তাহার পূর্ব্বকৃত পাপের অনুশোচনার প্রায়শ্চিত্তে পূত হইয়া যায় তাহার পরেও গৃহে না তুলিবার কি কারণ থাকিতে পারে? পাপ ঘৃণ্য কিন্তু পাপী ঘৃণ্য নয় একথা তিনি বহুবার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। জ্ঞানীব্যক্তিগণ তাঁহাদের জ্ঞানালোক দ্বারা পতিতাদিগের ভুল বুঝাইয়া দিবেন, তাহাদের লুপ্ত চেতনা, লুপ্ত জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের অন্ধকার জীবন অলোকিত করিবেন ইহাই তাহাদের কর্ত্তব্য হওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া তাহারা এই অসহায় অবলাদিগের প্রাণনাশে উদ্যত হইয়াছেন। যে প্রাণে মানুষ দান করিতে পারেনা, সে জীবন নষ্ট করিবার অধিকারও তাহার নাই এই কথা তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন,

দিনেকের অবহেলা, দিনেকের ঘৃণা ক্রোধ,
একটী জীবন তোরা হারাবি জনম শোধ,
তোরা না জীবন দিবি; উপেক্ষা যে বিষ বাণ
দুঃখভরা ক্ষমা লয়ে, আন্ ওরে ডেকে আন্।

নারীর দুঃখে এমন করিয়া কে কাঁদিতে পারিয়াছে, তিনি নিজে কাঁদিয়াছেন, অন্যকে কাঁদাইয়াছেন।

সতী সাবিত্রীর জন্মভূমি ভারতে আজ সতীর অপমান হইতেছে আর ভারতরমণীরা নিজ নিজ আমোদ প্রমোদে লিপ্ত আছে তাহাদের প্রতিকারের উপায় হইতেছে না।

সতী কীর্ত্তিময়ী পবিত্র ভারতবর্ষ আজ পাপানলে আচ্ছন্ন। রমণীর চরম দুর্গতি দেখিয়া নারী কি করিয়া তাহা সহ্য করিতে পারে। একই দেশের জলবায়ুতে পরিবর্দ্ধিত কুলী নারীও সকলের বোন, তাঁহাদের দুঃখেও হৃদয় টলেনা। তিনি রমণীদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

"রমণীর তরে কাঁদেনা রমণী
লাজে অপমানে জ্বলে না হিয়া
রমণী শকতি অসুর দলনী
তোরা নিরমিত কি ধাতু দিয়া?
ভারতে অসুর করে উৎপীড়ন
বীর, বীর-নারী ভারতে নাই
দশাননজয়ী, নিশুম্ভনাশিনী
ঘোর অন্তর্দ্দাহে মরিয়া যাই।"

এইরূপে তিনি সমাজের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে সমাজসংস্কারকের ন্যায় লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তিনি প্রত্যেক বঙ্গনারীকে তাহার বোনের অপমান দূর করিবার জন্য সতীর সম্মান রক্ষা করিবার জন্য নিজ নিজ স্বামী, ভ্রাতা, পিতাকে অনুরোধ করিতে বলিতেছেন। কবিতাতে যে কেবল তাঁহার কবি প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নারীজাতির প্রতি একান্ত ভালবাসা, অনুন্নতদের প্রতি দরদ ও দেশের প্রতি ঐকান্তিক মমতা প্রকাশিত হইয়াছে!

এক কথায় বলিতে গেলে আর্ত্ত ও পতিতের প্রতি সমবেদনাই কামিনী রায়ের কবিতার বিশেষত্ব।

তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বঙ্গরমণী এক মহৎ আশ্রয় হারাইল, তিনি আরো কিছুদিন জীবিত থাকিয়া তাঁহার স্নেহাঞ্চলে আশ্রিত নারীর অভাব অভিযোগ সমাজকে জানাইয়া তাহার প্রতিকার করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই। তাঁহার অভাবে বঙ্গনারীমাত্রই দুঃখিত।

আমরা তাঁহার পুণ্যস্মৃতি স্মরণে তাঁহাকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক ভক্তি অর্ঘ্য পরপারে থাকিয়াও গ্রহণ করিতেছেন কারণ তিনি নিজে একস্থানে বলিয়াছেন—

আছে আশা আর
পৌঁছে ধরণীর বার্ত্তা মৃত্যুর ওপার।

কামরুন্নেসা ছাত্রী-সঙ্ঘের উদ্যোগে স্বর্গীয়া কামিনী রায় স্মৃতি-সভায় পঠিত।

ঋণ

শ্রীহাসিরাশি দেবী

একমাথা রুক্ষ চুলের বোঝা, রোগা, শিরওঠা দেহ আর বড় বড়, অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখ দুটি সম্মুখে ধরিয়া সে আসিয়া দাঁড়াইল; গায়ের আধময়লা সার্টের কাঁধের কাছে খানিকটা ছিঁড়িয়া কোথায় উড়িয়া গিয়াছে কে জানে! ছোট কাপড় মালকোঁচা করিয়া পরা,—পদদ্বয় পাদুকা শূন্য,—ধূলি-ধূসরিত।

বয়স চৌদ্দ কি বড় জোর পনের। চাকর রামদয়াল সিং তাহার বৃহৎ বপু দর্শন করাইয়া বাহির হইতেই তাহাকে হাঁকাইয়া দিতেছিল, ঠাকুর—মহাদেও পাঠক কান পাকড়াইতে যাইতেছিল, কিন্তু সে যে এ সমস্ত নন্দী-ভৃঙ্গীর হাত ছিনাইয়া কেমন করিয়া ভিতরে একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, ইহাই আশ্চর্য্য।

কল্যাণী বিস্ময়ের সহিত বিরক্তি মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "কি চাও?"

সে কহিল, "কিছু চাইতে আসিনি, থাকতে, আর দুবেলা দু'টি খেতে এসেছি, আর কিছু নয়।—"

অদূরে দুষ্টামিরত খোকা খুকুও খেলা ফেলিয়া আগন্তুক ছেলেটির দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

কোলের কাছে স্তূপীকৃত জামা কাপড়, ছেলে মেয়ের টুপি, প্যাণ্ট, মোজা লইয়া কল্যাণী মেশিনে সেলাই করিতে করিতে বলিল—'তা হ'লেই যে আর কিছু চাওয়া হয়না বাছা, তা আমিও বুঝি। কিন্তু এতবড় সহরে থাকা আর খাওয়াটা চালানই কত বড় মুস্কিলের ব্যাপার, তা এখনও বোঝনি ব'লেই বল্‌তে পেরেছো, কিন্তু বুঝ্‌লে ব'ল্‌তে না। সে কথা যাক্—ব'লছি যে একটি লোকের থাকা খাওয়াটাও তো কিছু কমে হয় না বাপু, তার চেয়ে তুমি বরং আর কোথাও চেষ্টা দেখো; এখানে হবেনা।'

এমন সময়ে ঠাকুর চাকর, উভয়েই মধুমুরারী রূপে আবির্ভূত হইল।

তাদের একজনের হাতে পাকা বাঁশের লাঠি, অন্যজনের হাতে বাবুর লৌহদণ্ড। যেন, ইহারই আঘাতে তাহারা দুই জনেই একসঙ্গে ঐ ছেলেটির চিহ্ন পর্য্যন্তও পৃথিবী হইতে লোপ করিয়া দিবে; ইহা তাহারই আয়োজন। ঠাকুর মাথার উপরে লাঠি ঘুরাইয়া তুলিতেই কল্যাণী হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—,

'থাম্—থাম্— আমার সামনেই তোরা খুন করবি নাকি!' ছেলেটি যেমন দাঁড়াইয়াছিল, তেমনি নির্ব্বাকে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া শুধু একবার করুণ দৃষ্টিতে কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিল, যেন কি একটা ভাব প্রকাশ করিতে চায়, কিন্তু ভাষা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

একটু কি ভাবিয়া কল্যাণী কহিল,—'একটা কথা—আজ কাল নয় এখানে খাও দাও, থাক্, কিন্তু বেশী দিন এখানে থাকা তোমার চল্‌বে বাছা, কারণ একেই আমার বাসায় তেমন জায়গা নেই,—তার ওপোরে আসা-যাওয়া, আত্মীয় কুটুম্বও আমার বারো মাস; তাদের ফেলে তো আমি তোমায় রাখতে পারিনে!—কি বল?.........'

ছেলেটি নির্ব্বাকে মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

কল্যাণী মেশিনটাকে পুনরায় কোলের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, "তা, হ'লে যাও—বাইরের যে ঘরটায় আমার চাকর থাকে সেই ঘরেই তুমি থাক্‌বে, আর—'

কি একটা কথা বলিতে গিয়া থামিয়া, ইঙ্গিতে রামদয়ালকে দেখাইয়া বলিল,

"ওর সঙ্গে যাও।"

কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে এমন সময়ে ফিরিয়া ডাকিল, 'শোন—, ও খোকা—'

সে ফিরিলে প্রশ্ন করিল,—'কিন্তু, তোমার নাম?'

উত্তর দিল—'অরুণ।'

'আচ্ছা যাও—'

বলিয়া কল্যাণী আবার বসিয়া মেলা জামা কাপড়, টুপি, প্যাণ্টের রাশি নিকটে টানিয়া লইল।

কিন্তু কিছুক্ষণ আগে এই সেলাইগুলির উপরেই যতখানি আগ্রহ আসিয়াছিল, তাহা যেন আর রহিল না। মনটা ঐ অচেনা অজানা রোগা ছেলেটার আশে পাশে ঘুরপাক খাইয়া মরিতে লাগিল; স্বামী অবিনাশ যখন অফিস হইতে বাসায় ফিরিলেন, তখন সূর্য্যাস্তের শেষ আলোটুকু ছাদে, থামে ও আঙ্গিনায় পড়িয়া ঝিক্ ঝিক্ করিতেছিল।

গাড়ি দরোজার কাছে থামিতেই উপরের বারান্দা হইতে একখানি সহাস্য মুখ দেখা গেল; সে মুখ কল্যাণীর।

রামদয়াল আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। উপরে উঠিতেই ছেলে মেয়ে দুইটি পিছু লইল, রামদয়াল বাবুর পোষাক খুলিয়া দিতে প্রস্তুত হইল এবং রান্নাঘরে ঠাকুর তাড়াতাড়ি চায়ের জল উনুনে বসাইল। যেন এক মুহূর্ত্তে কি একটা উৎসব আরম্ভ হইয়া গেছে।

কল্যাণী বামহস্তের দামী আংটিপরা আঙ্গুলটায় মাথার কাপড়টা ধরিয়া সহাস্য মুখ একটু নীচু করিল।

এটা যে তাহার কিছু বলিবার পূর্ব্ব লক্ষণ ইহা বুঝিয়াই অবিনাশ একটু হাসিলেন। কহিলেন, 'কিছু ব'লবে?"

বলিবার কিছু ছিল বৈকি! তাই ক্ষণকাল একটু থামিয়া, একটা ঢোক গিলিয়া কল্যাণী কহিল,

'রাগ ক'রবে না? ব'ক্‌বে না?…বল!'

অবিনাশ হাসিলেন, "কখনও,—কোনওদিন তোমায় ব'কেছি ছোটবৌ?

লজ্জিত, কল্যাণী বলিয়া উঠিল, না, না; তবে—

একটু থামিয়া বলিল,

"বলছিলাম যে, একটি ছেলে আমি কুড়িয়ে পেয়েছি…তাই! আর তাকে খাবার থাক্‌বার জায়গাও দিন দুইয়ের জন্যে দিয়েছি। এই কথাই বল্‌ছিলাম",

অবিনাশ তাহার অর্দ্ধ-সমাপ্ত কথা মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া সহাস্যে কহিলেন,

'কুড়িয়ে যখন পেয়েছ, তখন যে তাকে আশ্রয় দেবেই একথা আমিও যেমন মানি, জগতের লোকেও তেমনি মান্‌বে যে, এতে এতটুকু আশ্চর্য্য হবার নেই। কিন্তু সেকথা আমাকে জানাবার কি দরকার ছোটবৌ—'

কল্যাণী, নির্ব্বাকে বাহির হইয়া গেল এবং একটু পরেই যে ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিল তাহার দিকে চাহিয়া অবিনাশ যেন চমকিয়া উঠিলেন।—তিক্ত স্বরে ডাকিলেন, "কল্যাণী!"

কল্যাণী সে আহ্বানের অর্থ বুঝিয়াছিল, তাই নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই অবিনাশ দুই হাতে কপালের দুইটা পাশ টিপিয়া ধরিলেন; বলিলেন, 'হঠাৎ, মাথাটা বড় ধরে উঠলো।'

ছেলেটি আগের মতই দুই চোখে বিস্ময় বহন করিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

সেদিন সমস্ত কাজের পরে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া, খোকাকে দুধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে কল্যাণী শুনিল, অবিনাশ এপাশ ওপাশ করিতেছেন, ডাকিল,

'ওগো।'

অবিনাশ উত্তর দিলেন, 'কেন?'

কল্যাণী কহিল, 'ঘুমাওনি?—

অবিনাশ বলিলেন, 'ঘুম আস্‌ছে না।'

খোকার দুধ খাওয়া শেষ হইয়াছিল, তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া কল্যাণী আসিয়া অবিনাশের পার্শ্বে বসিল; কহিল, কি ভাবছো?

অবিনাশ উত্তর দিলেন, 'ঐ ছেলেটার কথা'

একটু থামিয়া বলিলেন, 'সত্যিই, মা যার নেই, তার ওমনিই হয়।'

কণ্ঠস্বর ভারি হইতেই তিনি চুপ করিয়া গেলেন। একটা ঢোক গিলিয়া বলিলেন,

তবুও তো বেঁচে থাকে তবে আদরে আর অবহেলায়; প্রভেদ যা শুধু এই টুকুতেই। কিন্তু শুধু সে কথাই নয়, আরও একটা কথা আছে।

হঠাৎ তিনি থামিয়া গিয়া উঠিয়া বসিলেন;

কল্যাণী কহিল, উঠ্‌লে যে,—কি কথা…এমন জরুরী!

অবিনাশ কি একটা বলিতে গিয়া শুধু নির্ব্বাক করুণ দৃষ্টিতে কল্যাণীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন; সে মুখও যেন বিবর্ণ, অব্যক্ত যন্ত্রণায় যেন হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে চায়।

সন্দেহের দোদুল দোলায় কল্যাণী দোল খাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত হৃৎপিণ্ডটাকে কে যেন সজোরে মুচ্ড়িয়া ধরিল। কঠিন স্বরে প্রশ্ন করিল, তবে তোমার সম্বন্ধে লোকে যা বলে তা সত্যি, সত্যিই তোমার চরিত্র—······

ব্যাকুলভাবে অবিনাশ তাহার হাত দুইখানা জড়াইয়া ধরিলেন, 'সব—সব সত্যি, শুধ্ এইটুকু তুমি মিথ্যা হতে দিওনা ছোটবৌ যে, খোকাখুকুর তুমি যেমন মা, তেমনি ঐ হতভাগা ছেলেটারও—হাত ছাড়াইয়া লইয়া কল্যাণী আসিয়া খোকার পার্শ্বে শুইয়া পড়িল। ঘর দুয়ার তখন অন্ধকারে ডুবিয়া গেছে, বাতাস স্থির হইয়া আসিতেছে, যেন নিঃশ্বাস টুকুও বহিতে দিবেনা।

দিন আসে,—আবার চলিয়াও যায়, কিছুই দাঁড়াইয়া থাকেনা; কিন্তু স্বামীস্ত্রীর মাঝে যে একটা অতল প্রাচীর গড়িয়া উঠিতে লাগিল তাহার ভিত্তি আরও দৃঢ় হয় তখন, যখন অরুণ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়! হয়তো না বুঝিয়াই কল্যাণীর নিকটে একটা আব্দার করিয়া বসে। নয়তো খোকা খুকুকে খেলা দেয়।

কল্যাণীর দৃষ্টি ঐ ছেলেটির দিকে পড়িতেই সে ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইয়া লয়; মনের মধ্যে একটা বিরাট শূন্যতা দিনরাত্রি হাহাকার করিয়া ফেরে। সে হাহাকারের মুখে কিছুই দাঁড়াইতে পারেনা, একমাত্র খোকা-খুকুর অধিকারটুকু ছাড়া।

বৎসর খানেক পরে······

অবিনাশের আয় কম হইতেই চাকর ঠাকুর ছাড়াইয়া দিয়া কল্যাণী একাই সমস্ত দিকের ভার লইয়াছিল, তবুও দুধের ও বাড়ী ভাড়ার টাকা বাকী,—

আরও কত লোক যে কতটাকা পাইবে তাহার সংখ্যাও ঠিক মনে নাই— হিসাবের খাতা দেখিতে হয়।

সন্ধ্যার পরে অবিনাশ বসিয়া একখানি খবরের কাগজ দেখিতে দেখিতে গুড়্গুড়ির নল টানিতে ছিলেন; কাছে বসিয়া খোকা ও খুকু খেলিতেছে, অদূরের রান্নাঘর হইতে কল্যাণীর রান্না চড়াইবার শব্দও ভাসিয়া আসিতেছে।

এমন সময়ে অবিনাশ দেখিলেন, অরুণ সতর্ক দৃষ্টিতে রান্না ঘরের দরোজার দিকে তাকাইতে তাকাইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। যেন, যত ভয় ঐ কল্যাণীকেই।

অবিনাশ ডাকিলেন, "অরুণ"

উত্তর আসিল, "আজ্ঞে"

অবিনাশ কহিলেন, "এদিকে এসো"

অরুণ ফিরিল।

সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অবিনাশ একবার তাহার মাথার রুক্ষ, বিশৃঙ্খল চুল হইতে ময়লা কাপড় জামা পর্য্যন্ত দেখিয়া লইয়া প্রশ্ন করিলেন,

"কাপড় জামা নিজে পরিষ্কার করে নিতে পার না? চুল ছাঁট্‌বার পয়সারও কি অভাব হয়েছে?—"

অরুণ নির্ব্বাকে নিজের দেহের প্রতি চাহিল।

অবিনাশ উষ্ণ স্বরে কহিলেন,

"যাও, অমন নোংরা অবস্থায় যাতে আর কোনও দিন আমার সাম্‌নে না পর তারই চেষ্টায় থেক; আর,—যদি পার ঐ সঙ্গে অন্য কোথাও থাক্‌বার যোগারটাও করে নিও।" তেমনি নীরবে,—শুধু মাথাটাকে একবার বাম দিকে হেলাইয়া অরুণ বাহির হইয়া গেল।

সেই দিনই গভীর রাত্রে যখন বাসার চারিদিকে পুলিশে ঘিরিয়া, ঐ রোগাছেলেটার হাতে চার পাঁচজনে মিলিয়া হাতকড়া পরাইয়া থানায় লইয়া গেল তখন সে একবার অবিনাশ বা কল্যাণীর উদ্দেশ্যে মাথাটাকেও নোয়াইল না; শুধু একটু হাসিয়া, খোকা খুকুর দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

শোনা গেল— সে নাকি কোন একটা রাজদ্রোহমূলক অপরাধে অপরাধী!

হইলই বা ঐটুকু ছেলে, কিন্তু অপরাধ তো আর ঐটুকু নয়, তাই বোধহয় কল্যাণীর মত সরকার বাহাদুরও তাহাকে ক্ষমার চক্ষে দেখিলেন না।

কল্যাণী কিছু বলিল না, অবিনাশও নীরবে বসিয়া রহিলেন; শুধু ঝিটা রোদনরত খোকা ও খুকুকে সান্ত্বনা দিতে দিতে হতভাগ্য ঐ অপরাধী ছেলেটার উদ্দেশ্যে কহিল, পরের ছেলে খায় দায়, বন পানে ধায়।

পেটের না হলে কখনোও আপন হয়? নইলে এতদিন খেয়ে পরে শেষটায় যাবার সময় একবার মাথাটা পর্য্যন্ত নোয়ালেনা; এ-কি কম শয়তানীর কাজ গা! ও ছেলের হাড়ে ভেল্কা খেলে!"

প্রতিদিনের রান্না, খাওয়া, কাজ সবই হয়।

অবসর সময়ে কল্যাণী সেলাই করে ও অবিনাশ ছেলে মেয়েকে লইয়া গল্প করে।

দুধওয়ালা বাড়ীওয়ালা এবং আরও অনেকে তাগাদায় আসে ও ফিরিয়া যায়; ঝি খ্যাচ্‌ খ্যাচ্‌ করে।

অবশেষে একদিন কল্যাণীর গহনা বন্ধক দিয়া দেনার কতক মিটিল, কিন্তু অশান্তি কমিল না।

অরুণ যেন আসিয়াছিল শুধু এই অশান্তির বীজ বহন করিয়া ছড়াইয়া দিতে।

সে বিষের যন্ত্রণা আজিও স্বামী স্ত্রী উভয়কেই পলে পলে দগ্ধ করিতেছে কিন্তু, তবু, সেই স্বামী স্ত্রীরই সন্তান খোকা, খেলিতে খেলিতে যেন কোন হারান সাথীটির চিন্তায় উন্মন হইয়া পড়ে; খুকু ঘুমাইতে ঘুমাইতে কাঁদিয়া উঠে; প্রশ্ন করে, দাদা,—দাদা কই মা?

মা তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া পুনরায় ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করে; বলে,

ঘুমো;······এক ছিল রাজা······

সে শাসনে মন মানেনা, সেই শাসনের সীমা ছাড়াইয়াও একদিন একটা অজানা দাবী মনের মধ্যে মাথা নাড়াদিয়া উঠিল।

কল্যাণী কহিল, "আমি যাব।"

অবিনাশ প্রশ্ন করিলেন, "কোথায়?

কল্যাণী কহিল, "যেখানে অরুণ আছে।"

অবিনাশের দুই চক্ষে বিস্ময় মূর্ত্ত হইয়া উঠিল, "জেলে?—"

নতমুখে অথচ দৃঢ়স্বরে কল্যাণী উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

অবিনাশ ক্ষণকাল নীরবে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পরে আর্দ্রস্বরে কহিলেন, "পাগল হয়েছ ছোট বৌ?—তুমি যাবে সেইখানে, সেই হতভাগাটাকে দেখ্‌তে?"

একটা অসম্পূর্ণ উত্তর কল্যাণীর মুখে চোখে ভাসিয়া উঠিতেই অবিনাশ চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "যাবে যেও, কিন্তু—"

গুড় গুড়ির নলটী মুখে তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে দুই ভ্রূর মধ্যস্থল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

অনেকটা অপমানের সঙ্গে অভিমান বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কল্যাণী যেদিন জেলের দরোজা হইতে ফিরিয়া আসিল, সে দিনটা ছিল মেঘ্‌লা।

আকাশে গুরু গম্ভীর স্বরে মেঘের গর্জ্জন করিতেছিল।

উন্মুখ আবেগে অবিনাশ পত্নীর শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি বল্‌লে সে?"

শূন্য দৃষ্টিতে অন্যদিকে চাহিয়া কল্যাণী উত্তর দিল, "দেখা করেনি।"

"তখনই তো বলেছিলুম।" বলিয়া অবিনাশ গুড় গুড়ির নল মুখে তুলিলেন।

বাতাস বহিয়া যাইতেছিল,—তাহারই আর্ত্তস্বরের প্রতিধ্বনি উঠিল, "আঃ হাঃ হাঃ—"

দীর্ঘ পনের বৎসর পরে······

শীর্ণদেহ প্রৌঢ়া বিধবা কল্যাণী আবার ধীর পদে জেলের দরোজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আজ তাহার জীবনের একমাত্র সম্বল খোকা,—সেই খোকাও এই দুর্ভেদ্য পাষাণ প্রাচীরের অপর পার্শ্বে আশ্রয় লইয়াছে। ঐখানেই যে তাহার জীবন প্রদীপও নিভিয়া যাইবে তাহাও বিশ্ব-বিদিত; কিন্তু তাহা জানিয়াও শুধু একবার চোখের দেখা দেখিয়া যাইতে দুঃখিনী জননী ভিখারিণীর মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেও কি তাহাকে বহুবৎসর পূর্ব্বের আর একজনের মত ফিরাইয়া দিবে?

---

(১)

ভাবী জাতির মাতা

মিসেস্ এ, এন, সেন

ভারতীয় নারীর ভোটাধিকার বিষয়টী অতি দুরূহ। আজ ভারতের শাসনতন্ত্র রচিত হ'তে চলেছে। আমার মনে হয় যে ভাবী ভারতজাতির স্রষ্টাদের মা হিসেবে এই শাসনতন্ত্র নির্ম্মাণ ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব বড় কম নয়।

'ভোটাধিকার' এই শব্দটির মানে হচ্ছে ভারতীয় অথবা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদে স্বীয় মনোমত সভ্য নির্ব্বাচনের ও প্রেরণের অধিকার। এই অধিকারের দ্বারাই যে সমস্ত নরনারীর কর্ম্মকুশলতায় বা পরহিতৈষণায় আমাদের আস্থা আছে, তাদের আমরা আমাদের হয়ে কাজ কর্‌তে সেখানে পাঠাতে পারি। অতএব ভোটাধিকারে স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্য অতীব প্রয়োজনীয়। এটী কেমন ক'রে হতে পারে তাই নির্দ্ধারণ কর্‌তেই আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।

অতএব, আজকের সভায় আলোচ্য বিষয় হবে :—

(১) বয়ঃপ্রাপ্তমাত্রেরই (adult) ভোটাধিকার।

(২) সম্পত্তির মালিক হিসাবে ভোটের যোগ্যতা।

(৩) শিক্ষিতের ভোটাধিকার।

(৪) Communal representation সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনবিধি এবং (৫) সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতির স্বার্থসংরক্ষণের জন্য সভ্যপদের স্বতন্ত্রীকরণ।

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার

সামাজিক রীতি নীতির দরুণ ভারতীয় নারীর শিক্ষার যে সমস্ত বাধা বিঘ্ন আছে তাহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ব্যতীত মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার পত্রে ভারতীয় নারীর জন্য কোনও উল্লেখ নাই। কিন্তু আজ ভারত শাসনসংস্কার বিষয়ক কোনও লিখিত আলোচনা ভারতীয় নারীকে বাদ দিলে চলে না। তাহাদের জাতীয় উন্নতির ইহা একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইতিপূর্ব্বেই ভারতের নয়টী প্রদেশের মধ্যে সাতটী প্রদেশে মেয়েরা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের অধিকার পেয়েছেন। ভারতে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশী। ১৯৩০

সালের census-এ ঠিক হয়েছে যে পুরুষের সংখ্যা নারীর চেয়ে অনুন নব্বই লক্ষ বেশী। বালিকার চারগুণ ছেলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ করে। আঠার গুণ ছেলে মধ্যস্কুলে দেখা যায় এবং উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ে ছেলের সংখ্যা চৌত্রিশ গুণ। ভারতের নারী সম্বন্ধে মানুষ যদি আর একটু সচেতন হয় তবে কি সুফল ফলতে পারে তাহা সত্য সত্যই বর্ণনাতীত। ১৯১৯ সালের শাসনসংস্কারে মেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় নাই সত্য কিন্তু প্রত্যেক প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভাকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যে যদি তাঁরা ইচ্ছা করত তবে এ বাধা সরিয়ে মেয়েদের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশাধিকার দিতে পারত এবং প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই এ অধিকার মেয়েদের দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যে সব মেয়েরা নিজ ক্ষমতায় ভোট দিতে পাবেন তাঁদের সংখ্যা অতি কম। এই নিয়ম অনুসরণ করলে যারা সম্পত্তির অধিকারিণী না হয়েও অন্যান্য প্রকারে ভোটের ক্ষমতা পরিচালনের সমধিক যোগ্য তাঁহারাও বাদ পড়ে যাবেন। সুতরাং সম্পত্তির মালিকত্ব ভোটের অধিকার জন্মিবে এ নিয়ম সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

আমার মতে বয়ঃপ্রাপ্তমাত্রেরই ভোটাধিকারই হচ্ছে একমাত্র আদর্শ নিয়ম। নর বা নারী ২১ বৎসর বয়সে বয়ঃপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু ভারতের অনুকূল জলবায়ুর সাহায্যে আমাদের মন ও শরীর অতি দ্রুত পরিণতি লাভ করে। কাজেই আমরা ১৮ বৎসর বয়সে সাবালক হই। এই ১৮ বৎসরই আইনসম্মত বয়ঃপ্রাপ্তির কাল। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে আমাদের গ্রাম্য ভগিনীগণ প্রায় প্রত্যেকেই এখনও উন্নতি-শিখরের অধোদেশে পড়ে আছেন। এবং শাসন ব্যাপারের কিছুই বোঝেন না। কাজেই আমাদের উচিত একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে আমরা গভর্ণমেণ্টের নিকট দাবী করব যে সহরের সব নারীকেই ভোটাধিকার দেওয়া হউক। কারণ মেয়েদের মধ্যে যত সমাজ সংস্কারক দেখা যায় তারা সবই সহর থেকে এসেছেন। এরূপ করলে ৫০,৬০ লক্ষ স্ত্রীভোটারের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং আমি আশা করি আপনারা আমার সঙ্গে একমত হবেন যখন আমি বলব যে শিক্ষিতের ভোটাধিকার মেয়েদের বেলায়ও ভোটাধিকারের একটি 'অন্যতম' দাবী স্বরূপ হবে। এ দাবী গ্রাহ্য হলে আমরা (প্রায়) আরও ১২ সহস্র স্ত্রীভোটার পাব, এবং এর সঙ্গে সম্পত্তির দাবী করে আরও ১৯ সহস্র ভোটাধিকারিণী নারী মিলিবে। রক্ষিত সদস্যপদ সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এটি থাকা উচিত নয়। ভারতীয় বা প্রাদেশিক উভয় পরিষদ হতেই এ-জিনিষটী উঠিয়ে দেওয়া উচিত। মেয়েদের ভোটাধিকার সম্বন্ধে সাইমন কমিশনে লিপিবদ্ধ আইন কানুন তাদের কাউন্সিলে যাওয়ার কোনও ব্যবস্থা করে নি সত্য, কিন্তু প্রত্যেক কাউন্সিলকে ক্ষমতা দিয়াছিলেন মেয়েদের প্রবেশাধিকার দিতে। আমাদের কিন্তু মেয়েদের জন্য পুরুষের সমানাধিকার দাবী করা উচিত এবং তজ্জন্য পুরুষের কৃপাপ্রার্থী হয়ে বসে না থেকে, তাদের সঙ্গে সমানভাবে ভোট দেওয়া ও সদস্য পদলাভের চেষ্টা করার সুবিধা করে নেওয়া আবশ্যক।

এখন আমরা যা আলোচনা করব সেটি আজকের বিষয়গুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। আমার মুসলমান ভগিনীবৃন্দ, আমি আপনাদিগকে অনুরোধ কচ্ছি যে আপনারা মিসেস্ হামিদ আলির (Mrs. Shareejah Hamid Ali) পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের সবার সঙ্গে মিলিত হয়ে (white paper) হোয়াইট পেপারএ প্রস্তাবিত সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন বিধির বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হউন। রাজকুমারী অমৃত কাউরের ভাষায় বলতে গেলে আমার বলতে হবে যে আমারা কোনও সাম্প্রদায়িক দলের সুবিধার জন্য তাদের ভোটের আধিক্য, জন্মাবার জন্য তাদের হাতের ক্রীড়নক হতে অস্বীকার করি। মনে রাখবেন, সাম্প্রদায়িক ভোটাধিকার প্রবর্ত্তিত হলে আমাদের এ-অবস্থা না হয়ে পারে না।

অন্যপক্ষে আমাদের চেষ্টা করতে হবে সোজা রাস্তা ধ'রে অসাম্প্রদায়িক ভাবে ভোটের অধিকার পেতে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমাদের স্বকীয় প্রতিভার উপর দাঁড়িয়ে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ করবার। সংক্ষেপতঃ আমাদের চাইতে হবে যুক্তনির্ব্বাচন বিধি এবং আমি আশা করি, ঈশ্বরের কৃপায় আমরা কৃতকার্য্যতা লাভ করিব। —সোনার বাংলা

(২)

বিপ্লবীদল ও দেশের শাসনতন্ত্র

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার এম, এ

বিপ্লববাদ কি করিয়া সমূলে দমন করা যায় তাহা লইয়া ছোট বড়, সরকারী অনেক লোক বিস্তর মাথা ঘামাইতেছেন। সম্ভব অসম্ভব অনেক রকম উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে এবং এমন অনেক প্রণালী অনুসৃত হইতেছে যাহাকে স্থির মস্তিষ্কপ্রসূত বলিয়া মনে করা শক্ত। স্কুলের শিক্ষকদিগকে অনারারী চৌকীদারে পরিণত করা হইয়াছে। বিভিন্ন শিক্ষক বিভিন্ন পাড়ার তত্ত্বাবধান করিবেন, দেখিবেন সেই পাড়ার ছেলেরা যাহাতে বিপ্লবীদলে যোগ না দেয়। ইহা ছাড়া প্রত্যেক শনিবারে ছেলেদের কাছে বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতাও শিক্ষকদের করিতে হয়।

জয়েণ্ট পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটিতেও এবিষয়ে আলোচনার অবধি নাই। বাংলার বিপ্লববাদ দমনের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ এবং স্বতন্ত্র মন্ত্রীনিয়োগের কথা আলোচিত হইয়াছে। শাসন ব্যবস্থা যেরূপই হোক বিপ্লবীদের কিছুতেই সন্তুষ্ট করা যাইবে না, এমন কথাও অনেক সভ্য বলিয়াছেন।

বিনা বিচারে অবরোধ, আন্দামানে প্রেরণ, সন্দেহে আটক, পিউনিটিভ ট্যাক্স, বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে প্রচার ইত্যাদি নরম গরম উপায়ের কোনটাই ত গভর্ণমেণ্ট বাকী রাখেন নাই। অতিরিক্ত বিভাগ সৃষ্টি করিয়া মন্ত্রী নিয়োগ করিলে যে মন্ত্রীর মাথায় এর চেয়ে নূতন কোন উপায় গজাইবে বলিয়া মনে করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। ৬৪ হাজার টাকা বেতনের একটী পদ এবং নূতন বিভাগ পরিচালনের জন্য খরচ অবশ্য বাড়িবে।

তবে বিপ্লববাদ দূরীকরণের কি কোন উপায় নাই? আমাদেরও মনে হয় অতি সহজ এবং নিশ্চিত উপায় কর্ত্তাদের হাতের কাছেই রহিয়াছে। এখন কথা হইতেছে যে তাহারা বিপ্লববাদ দমন করিতে চান, না দূর করিতে চান? যদি দমন করাই তাহাদের উদ্দেশ্য হবে তবে অত্যাচার করাই হইল একমাত্র পথ, আর যদি দূর করিতে চান তবে অবশ্য অন্য উপায়ের কথা আসে।

বিপ্লব দুই রকমে হইয়া থাকে। এক সিংহাসনের অধিকার লইয়া যখন রাজবংশীয় দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়; আর যখন প্রজা সাধারণ শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তনের জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। শেষোক্ত প্রকারের বিপ্লব কয়েক বৎসরের মধ্যে আমরা অনেকগুলি দেখিলাম, যথা রাশিয়ার বিপ্লব, আয়র্লণ্ডের বিপ্লব, শ্যামের বিপ্লব। দেখা যায় যে সমস্ত দেশে বিপ্লব হইয়াছে সে সব দেশেই এইরূপ সশস্ত্র বিপ্লব ব্যতীত শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তনের অন্য কোন উপায় ছিল না। যদি থাকিত বিপ্লব হইত না। নব্য জার্ম্মানির রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সর্ব্বজন বিদিত। হার হিট্‌লার ভোটের জোরে রাইন্ দখল করিয়া নাৎসি গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিলেন। এক্ষেত্রেও ব্যালটের পথ যদি বন্ধ থাকিত তবে বুলেটের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি ছিল না। ইংলণ্ডে কোন বিপ্লব হওয়া সম্ভব নয়। কারণ দল প্রতিষ্ঠা করিয়া ভোটের জোরে গবর্ণমেণ্ট পরিবর্ত্তন করিবার পথ

খোলা রহিয়াছে। আয়র্লণ্ডে বিদ্রোহ থামিল কখন? যখন সেই দেশের শাসনতন্ত্রের এমন পরিবর্ত্তন করা হইল যে ভোটের জোরে শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করা সেই দেশের লোকের করায়ত্ত হইল। কোথায়ও অত্যাচার করিয়া বিপ্লববাদ দমন করা গিয়াছে বলিয়া দেখা যায় না।

বাংলা তথা ভারত হইতেও যদি বিপ্লববাদ দূর করিতে হয় তবে তাহার পথ হইতেছে ভারতে পূর্ণ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, যাহাতে দেশের লোক নিজেদের ইচ্ছামত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। শ্বেতপত্র বর্ণিত কমিউন্যাল রিপ্রেজেনটেশন দূষিত সেফগার্ডশঙ্কুল গণতন্ত্র নহে। ইহা নামে গণতন্ত্র হইলেও কার্য্যতঃ আত্মকলহের "পরশ পাথর"।

কংগ্রেসের যখন পূর্ণপ্রতাপ ছিল তখন বিপ্লব আন্দোলন অনেক নিস্তেজ ছিল একথা বোধ হয় গবর্ণমেণ্টও স্বীকার করিবেন। ইহার কারণ কি? অহিংসাবাদ প্রচার? অহিংসাবাদ প্রচার একটি কারণ বটে কিন্তু এক মাত্র কারণ নহে।

বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন আবশ্যক ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। চিরকাল একটা দেশ কিছু অপরের কর্ত্তৃক মানিয়া চলিবেনা। এই পরিবর্ত্তন 'আপছে' হইবেনা। তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। গান্ধীজীর আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই চেষ্টার দুই প্রকার পথ ছিল। এক আবেদন নিবেদন, যাহা তৎকালীন কংগ্রেস এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি অনুসরণ করিত; অন্যপথ সশস্ত্র বিপ্লবের গুপ্ত প্রচেষ্টা। আবেদন নিবেদন (যাহার ভদ্রনাম এজিটেশন) বার বার অগ্রাহ্য হইলেও পুনরায় তাহা করা ধৈর্য্যের পরিচায়ক বটে তবে লোকের আর তাহাতে বিশ্বাস থাকে না। কাজেই বিপ্লবের পথই তখন স্বদেশ সেবায় একমাত্র পথ বলিয়া পরিচিত ছিল। সকলেই বিপ্লবী হইত না, তবে হইতে পারিত না বলিয়া লজ্জা অনুভব করিত। বিপ্লবীগণ লোকের অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। গান্ধীজী দেশের সম্মুখে এক নূতন পথ ধরিয়া দিলেন। এ পথে হত্যা না করিয়াও স্বদেশ উদ্ধার করা যাইতে পারে। গান্ধীজীর আন্দোলন দমিত হওয়ার সাথে সাথে বিপ্লববাদ আবার যেন মাথা তোলা দিতেছে।

এক্ষেত্রেও আমরা দেখিতেছি অহিংস কোন পথ খোলা থাকিলে হিংসার পথকে লোকে স্বভাবতঃই পরিহার করিয়া থাকে। হিংসার পথ অবলম্বন করে তখন, যখন অন্য কোন পথই খোলা থাকে না। সেফ্‌টি ভাল্‌ব্‌টি বন্ধ থাকিলেই অন্তর্নিহিত বাষ্পের তাড়নায় যন্ত্র ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা, নচেৎ নহে। কাজেই বিপ্লববাদ যদি দূর করিতে হয়, শান্তি যদি প্রকৃতই কাম্য হয় তবে অবিলম্বে পূর্ণগণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই ইহার একমাত্র পথ—যাহাতে জনমত অনুসারে শাসনতন্ত্র বদলাইবার পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব দেশবাসীর থাকে। ইহা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই এবং থাকিতে পারে না। তবে যদি দেশের সর্ব্বপ্রকার প্রগতিকে দমন করিয়া দেশকে চিরকাল করতলগত রাখিবার সঙ্কল্প থাকে তাহা হইলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

—সঙ্কল্প

(৩)

বাঙ্গালী হাসিতে ভুলিয়াছে

[শ্রীগুরুসদয় দত্ত, আই সি এস্]

সম্প্রতি শিক্ষাশাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ স্যর মাইকেল স্যাড্‌লার হইতে আরম্ভ করিয়া বহু ভারতীয় এবং বিদেশীয় মনীষিগণ একবাক্যে বলিয়া গিয়াছে যে, বাঙ্গালী জাতি হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে। ইহা যে সত্য, তাহা অস্বীকার

করিবার উপাই নাই। তবে একদিক দিয়া দেখিতে গেলে বাংলা দেশের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়, কেবল অংশিকভাবেই সত্য। মোট কথা, আমরা আজকাল সাধারণতঃ 'বাঙ্গালী' বলিতে আমাদের নিজেদেরই মত যে মুষ্টিমেয় আধুনিক-শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিতের দলকে বুঝিয়া থাকি, কেবল তাহাদের এবং তাহাদের সন্তান সন্ততির ক্ষেত্রেই ইহা সত্য। কিন্তু বাংলার প্রতি সহস্রের মধ্যে নয়শত নিরানব্বই জন লোক, যাহারা আধুনিক শিক্ষায় অশিক্ষিত, যাহারা আমাদের চক্ষে অসংকৃষ্ট যাহাদিগকে আমরা "বাঙ্গালী" সংজ্ঞাভুক্ত বলিয়াই মনে না করিয়া কেবলমাত্র বাংলার উপরোক্ত আধুনিক-শিক্ষিত মুষ্টিমেয় শ্রেণীর দাস বা বাহন-শিক্ষিত বলিয়া বিবেচনা করি, এবং যাহারা আধুনিক ছুৎমার্গাবলম্বী হিন্দুসমাজের, এবং আধুনিক 'ভদ্র' 'শিক্ষিত' ও সম্ভ্রান্ত' সম্পদায়ের কাছে অবজ্ঞাত ও নির্য্যাচিত হইয়া, বাংলার তথা ভারতের খাঁটি প্রাচীন কৃষ্টির দীন-হীন বাহকরূপে সমাজের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ভারতের সংকৃষ্টি বিচ্যুত গর্ব্বিত কর্ত্তা শ্রেণীদের মুখাপেক্ষী হইয়া, অনশনে ও অর্দ্ধাশনে অতিকষ্টে কোনরূপে জীবনধারণ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের ক্ষেত্রে ইহা সত্য নহে। অভিজাত্যাভিমানী, ধর্ম্মের ভ্রান্ত ছুৎমার্গাভিমানী, এবং আধুনিক শিক্ষার ছাপ-অভিমানী আমরা এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু আমাদেরই অবজ্ঞাত, নির্য্যাতিত, আধুনিক-শিক্ষার অলোক হইতে বঞ্চিত, অনশন ও অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট, গরীব-দুঃখী পল্লীবাসী ভাই বোনেরা হাসিতে ভুলিয়া যায় নাই। তাহাদের মধ্যে যেখানে আধুনিক শিক্ষার গর্ব্বিত ঝলক্ পৌঁছিতে পারে নাই, তথায় জীবন আনন্দের স্ফূরনে পরিপূর্ণ। আমাদের 'ভদ্র', 'শিক্ষিত' ও 'সম্ভ্রান্ত' বাঙ্গালী সমাজের ছেলে বুড়োদের মধ্যেও কখনো কখনো হাসি দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা বিকারগ্রস্ত রুগ্নের হাস্যের মতই সহরের রঙ্গালয় ও চলচ্চিত্রাগার ইত্যাদি আমোদ মজলিসের নিকট নেওয়া হাস্য। একটি স্বাস্থ্যবান্ জীবন্ত তেজস্বী জাতির দৈনন্দিন ব্যক্তিগত, পরিবারিক ও সামাজিক জীবনে যে মুক্ত, আনন্দময় ও সহজ হাস্যের উৎস প্রবাহিত হইয়া থাকে, ইহা সে হাস্য নয়।

একদিকে আধুনিক বাংলার 'শিক্ষিত', ধনগর্ব্বিত ও 'সম্ভ্রান্ত' সমাজের জীবন, এবং অপর দিকে বাংলার সমাজের পদদলিত, অবজ্ঞাত, অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট, শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত "ছোটলোক"দের জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের আনন্দ, ধনের অধিকার অথবা অতি-সচ্ছলতার উপর নির্ভর করে না, এবং পক্ষান্তরে, উপবাস ও অর্দ্ধাশনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতেও মানুষ জীবনে আনন্দের ধারাকে অটুট রাখিতে পারে। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ যে প্রথমোক্ত সমাজের নিরানন্দ ও কৃত্রিমতাময় জীবনের এবং শেষোক্ত শ্রেণীর সহজ-সরল আনন্দময় জীবনের মধ্যে এখন যে পার্থক্য, ইহার জন্য দায়ী—সম্পূর্ণভাবে নাই হোক্, অন্ততঃ প্রভূত পরিমাণে—আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রণালী।

ভারতের আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী যে বহু দোষে দুষিত, এবং, বহুদিক হইতে যে ইহার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন, তাহা আজকাল সর্ব্ববাদিসম্মত। এমন কি, সরকারী শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তাগণ নিজেরাই ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। এই শিক্ষাপ্রণালীর দোষে দেশ নিরানন্দময়।

আনন্দ হইতে বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হয়, আনন্দ দ্বারাই বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ জীবিত থাকে এবং যে আনন্দ আবার তাহারা প্রতিগমন করে, ব্রহ্মের সেই আনন্দ যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের জীবনীশক্তি স্বরূপ। সুতরাং যদি কোন জাতি অথবা শ্রেণীবিশেষের জীবন এই আনন্দরসের অভিসিঞ্চন হইতে বঞ্চিত

হয়, তাহা হইলে সেই দুর্ভাগ্য দেশে আর্থিক ধন-সমৃদ্ধির বহুল ছড়াছড়ি সত্ত্বেও জীবনের উৎস শুকাইয়া যাইবে, এবং জাতি অচিরাৎ অবনতির পথে এবং মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইবে। অতএব ইহা নিঃসন্দেহ যে, শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়কে যদি আবার মৃত্যুর পথ হইতে টানিয়া ফিরাইয়া আনিতে হয়, এবং শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে যদি আবার দৈনন্দিন জীবনে নির্ম্মল হাস্য হাসিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিতে, হয়, তাহা হইলে সব-চেয়ে দরকার ব্যক্তির ও জাতির জীবনকে ভূমার সেই আনন্দে অভিষিক্ত করা যে আনন্দের অবারিত ছন্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যুগ হইতে আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। জাতির এবং ব্যক্তির জীবনে এইযে আনন্দ-প্লাবনের অভিসিঞ্চন, ইহা বিজ্ঞানের শত গবেষণা ও আবিষ্কার, কল কারখানার অদ্ভুত যন্ত্রশক্তিনিসৃত পুঞ্জীভূত বস্তুসম্ভার, অথবা দর্শনশাস্ত্রের গভীর অনুসন্ধান দ্বারা সাধিত হওয়া অসম্ভব। ইহা সাধন করার একমাত্র উপায়—ব্যক্তির এবং জাতির জীবনে রসকলাচর্চ্চার আনন্দময় জাতীয় ধারায় জীবন্ত অনুপ্রাণনার সংস্পর্শ আনিয়া জীবনকে ভূমার নির্ম্মল আনন্দের ছন্দে মিলাইয়া দেওয়া। আনন্দের অভিসিঞ্চনে সজীব জাতি তখন হাসিবে আবার।

—মুক্ত

ধর্ম্ম ও সভ্যতা

শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ এম্, এ

নূতন যুগের নূতন হাওয়া একেবারে ঘূর্ণিঝঞ্ঝার মত আসিয়া আমাদের দৃষ্টিপথ ঢাকিয়া ফেলিতেছে। যাহা জানিয়া ও মানিয়া আসিতেছিলাম, সবই না-মানার কোঠায় ফেলিতে হইবে। সত্যযুগ হইতে যাহা চলিয়া আসিতেছে, আজ তাহাই সব মিথ্যা।

এই মিথ্যা জুয়াচুরির মধ্যে একটি আমাদের ধর্ম্ম।

সমাজের ব্যবস্থার বৈষম্য, অবিচার ও অত্যাচার। ইহার প্রতীকার করিবার জন্য মানুষ আজ বদ্ধপরিকর। অথচ ভগবান্ নামক জীবটি এসকল দেখিয়া শুনিয়াও নিশ্চিন্তে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া আছেন; মানুষের অসহ্য দুঃখবিপাকেও তাঁহার মন টলিতেছে না। সুতরাং ভগবান্ বস্তুটিই যে একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পাবাজি, আসলে যে ভগবানও নাই এবং ধর্ম্মও নাই, একথা একেবারে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। আরও প্রমাণ হইয়াছে এই যে, সমাজের মধ্যে এই অন্যায় অধর্ম্মকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই ফন্দিবাজ লোকেরা ফন্দি করিয়া এই ভগবান্‌টাকে সৃষ্টি করিয়াছিল। অজ্ঞ জনগণ না বুঝিয়া ভয়ে ভয়ে মানিয়া লইয়াছিল বটে, কিন্তু জগতের ভাগ্য ভাল, আজ বিংশশতাব্দীর বুদ্ধিমান্ লোকেরা এ ধাপ্পাবাজি ধরিয়া ফেলিয়াছে।

প্রচলিত সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাহাকে সকল দিক্ হইতে আঘাত করিতে করিতে বর্ত্তমান যুগ এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অবশ্য বিষয়টি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন গুটি-কয়েক মাত্র মনীষী; তবে বেশীর ভাগ লোকই ইহার সুর তুলিয়া ধরিয়াছে অর্দ্ধেক বুঝিয়া এবং একেবারেই না বুঝিয়া। যুগের ঝোঁকটা এখন এইদিকেই—এই ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করায়, ধর্ম্মবোধকে উপহাস করায় এবং দৈহিক ভোগসুখকে একমাত্র কাম্য বলিয়া প্রতিপন্ন করার দিকে।

আমাদের উদ্দেশ্য মানবসমাজের সুখপ্রতিষ্ঠা। এই সংকল্প লইয়াই এত ভাঙ্গাচোরার পথে যাত্রা সুরু করিয়াছি। কিন্তু ভাল করিয়া ভাবিয়া না চলিলে—ভয় হয়, পাছে শিব গড়িতে গিয়া বানর না গড়িয়া ফেলি। মানুষের সভ্যতা ও সুখের পথে ধর্ম্ম একটি অন্তরায় কিনা, এবং ধর্ম্মবস্তুটির স্বরূপ কি, ইহা আমাদের আজ ভাবিবার বিষয়। নতুবা অন্ধের মত গড্ডালিকাপ্রবাহে মিশিয়া গিয়া ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এই ধর্ম্মযুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া লাভ নাই, লোকসানও হইতে পারে।

ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে মানুষের অজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া এবং দুর্ব্বলতার আশ্রয়ে, সুতরাং সভ্যতার আলোয় জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মের কুঝাটিকা সরিয়া পড়িতে বাধ্য—অধর্ম্মবাদীদের এই একটি বৈজ্ঞানিক যুক্তি। যুক্তি নেহাৎ অমূলক নয়। মানুষ যখন শুধুই মাত্র বর্ব্বর মানুষ, জানিতে ও বুঝিতে শেখে নাই, তখন প্রকৃতির বিচিত্র রুদ্রলীলা দেখিয়া ভয়ে সে হইত আধমরা।

যাহা তাহার নাগালের বাহিরে অথচ যাহার প্রতি চোখ মুদিয়া থাকিবারও উপায় নাই, অহরহ গায়ে আসিয়া লাগে, তাহার কাছে প্রণতি জানাইয়া নিষ্কৃতিপ্রার্থনা করা ছাড়া আর তাহার করিবার কিছু ছিলনা; প্রবলকে তোষামোদ করিয়া প্রসন্ন রাখিবার চেষ্টা মানুষের স্বভাবগত। সুতরাং প্রকৃতির একেকটি রূপে একেকটি দেবতার অধিষ্ঠান হইল। তাই ধর্ম্মের প্রাথমিক স্তরে বহুদেবতাবাদ দেখিতে পাই। মিশরীয়, গ্রীসীয় আদিদেবতাগণের সৃষ্টি এই অজ্ঞতা ও ভয়ের সমন্বয়ে, আমাদের বৈদিক ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নিও তাহাই। তারপর ধীরে ধীরে মানুষ যতই প্রকৃতির রহস্যোদ্‌ঘাটন করিতে আরম্ভ করিল, ততই সে দেখিল, ভয় করিবার কিছুই নাই। আজ তাই দেবতারা সব দূরে পলাইয়াছেন, মানুষ বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রকৃতির শক্তির উপর আধিপত্য করিয়া জয়গর্ব্বে স্ফীত। আদিমযুগে মানুষ নিতান্ত প্রাণের দায়ে ঠেকিয়া যে ধর্ম্ম খাড়া করিয়াছিল, সে ধর্ম্ম আজ একেবারে অর্থহীন।

কিন্তু একটুখানি ফাঁক পড়িয়া যায়। বহুদেবতাবাদের উদ্ভব শুধু যে ভয়মূলক প্রকৃতি হইতে, তাহা নয়, সৌন্দর্য্যের প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহা হইতেও বটে। চন্দ্র, সূর্য্যকে মানুষ যে পূজার অর্ঘ্য দিল, বন উপবনের মধ্যে যে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিল, তাহার মূলে ভীতির আধিক্য নাই, আছে সৌন্দর্য্যের উপাসনা। এবং মানুষের সেই সহজ সৌন্দর্য্যবোধ আজও একেবারেই কমে নাই, বরং মনের পরিকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াই চলিয়াছে। সুতরাং আদিমকালের ধর্ম্মের এই অংশটুকুর প্রয়োজনীয়তা আজ ঘোচে নাই।—ধর্ম্মের আর একটি মূল বিস্ময় অজ্ঞতা হইতেই আসে বটে, কিন্তু ভয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক নাই। সূর্য্যের চারিপাশে গ্রহমণ্ডল কেমন করিয়া ঘোরে, তাহা ভাবিতে আজ আমাদের কিছুমাত্র ভয় করেনা, নিউটনের তথ্য আমরা সব শিখিয়া ফেলিয়াছি,—কিন্তু কি বিপুল শক্তি ইহার পশ্চাতে ক্রিয়া করিতেছে, ভাবিয়া বিস্মিত না হইয়া পারি না। অসীম আকাশের গায়ে তারার মালার দিকে যখন চাহিয়া থাকি, তখন গ্রন্থগত বিদ্যায় বুঝিতে পারি, উহারা আমাদেরই সূর্য্যের মত সূর্য্য অথবা আমাদেরই পৃথিবীর মত গ্রহ, কিন্তু মন তাহাকে সমগ্রভাবে বেষ্টন করিতে না পারিয়া রহস্যময় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। এই যে অনায়ত্ত বিরাটের কল্পনা, এই অভাবনীয়তা—ইহাই ধর্ম্মের আর একটি প্রধান উপাদান। প্রাচীনযুগে যাহা মানুষের বুদ্ধি ও ধারণার বাহিরে ছিল, তাহার অনেক কিছু আমরা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছি সন্দেহ নাই; কিন্তু আজও আমাদের অনধিগম্য রহিয়া গিয়াছে এক বিশাল অনন্ত:ভুবন। এবং মানুষের বুদ্ধি যখন অসীম, তখন অনেকখানিই চিরকালের মত অনধিগম্যই থাকিবে। বিস্ময়পরিতৃপ্ত আমাদের কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মভিত্তির এই অংশও রহিয়া গেল।

সভ্যতা ও জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম স্থূল হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া চলিয়াছে। আদিমযুগের বহুসংখ্যক স্থূলস্বভাব দেবতা ক্রমে ইহুদীজাতির সভ্যতর জিহোভার একেশ্বর মূর্ত্তিতে

দেখা দিলেন। কিন্তু মানুষের ভয়ের প্রকোপ তখনও কমে নাই, কাজেই জিহোভা প্রতিশোধপরায়ণ রুদ্রমূর্ত্তি। আরও পরে আবির্ভূত হইলেন খৃষ্টের ভগবান্; তাহাতে ভয়ের লেশ মুছিয়া গিয়াছে—তিনি মানবজাতির কারুণিক পরমপিতা। এদিকে ভারতবর্ষের ভূমিতে স্তর আরও আগাইয়া গেল। খৃষ্টেরও বহুপূর্ব্বে বুদ্ধের নবধর্ম্ম রূপ পরিগ্রহ করিল—যাহাতে ভগবানের নামগন্ধ বা পূজাবিধি নাই, যাহা শুধু ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যবুদ্ধি ও কল্যাণবুদ্ধির প্রতীক ধর্ম্মের অনাবশ্যক ও ভারপ্রদ সজসজ্জা ক্রমে খসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু আসল সত্তাটি টলে নাই। আজ বিংশ শতাব্দীতে ইহাকে টলাইবার জন্য যে প্রচণ্ড চেষ্টা চলিতেছে, তাহার পিছনে কোন্ বৈজ্ঞানিক সত্য আছে, তাহাই ভাবি। ইহা কি সত্যই ক্রমবিবর্ত্তনের স্বাভাবিক পরিণতি, না প্রতিক্রিয়ার উন্মাদ বিক্ষোভ?

ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান যুগের দুইটি গুরুতর অভিযোগ। এক, ধর্ম্মান্ধেরা ধর্ম্মের নামে একে অন্যের উপর অমানুষ অত্যাচার করিয়াছে। দুই,—প্রবল ও প্রতিপত্তিশালী সম্প্রদায় এই ধর্ম্মের দোহাই পাড়িয়া অজ্ঞ ও দুর্ব্বল জনসাধারণকে নিজের পায়ের তলায় চাপিয়া রাখিয়া আপন আপন স্বার্থ বজায় রাখিতেছে; ভগবানের অভিশাপ ডাকিয়া আনিবার ভয়ে উৎপীড়িত পতিত সম্প্রদায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথাটি তোলে না। সুতরাং ধর্ম্মের আমূল উচ্ছেদ করিতে হইবে।

ধর্ম্মের সম্বন্ধে এই যে অভিযোগ, ইহা অস্বীকার করিতে পারে শুধু মূর্খেরাই। কিন্তু আসল কথা, এটি ছবির একতরফা বর্ণনা। ছবির মধ্যে কালো রেখা কয়টি কি ভাবে আছে, শুধু তাহাই বিশদ ভাবে বলিয়া গেলে শ্রোতা ছবিখানি হৃদয়ঙ্গম করিতেই পারে না; শাদা, লাল, হল্‌দে কেমনভাবে দাগ কাটিয়াছে, তাহাও তেমনি বিশদভাবে বলা দরকার। না হলে বুঝিবার ভুল হয়। প্রোটেস্‌ট্যান্টের উপর ক্যাথলিকের যে বীভৎস অত্যাচারে ইউরোপের মাটি কলুষিত করিয়াছে, সে ইতিহাস আমরা জানি। এই ভারতবর্ষেই বৌদ্ধ সম্প্রদায় হিন্দুর হাতে যে লাঞ্ছনায় নিগৃহীত হইয়াছে, সে কথাও ভুলিতে পারি নাই; হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পর ঘৃণা আজও চোখের উপর অহরহ উৎকটরূপে দেখিতেছি। কিন্তু সে দোষ ধর্ম্মের নয়, দোষ মানুষের সংস্কার, প্রাণহীন অনুষ্ঠান ও অহঙ্কারের। আকৃতিতে বিকৃতি ঘটিয়াছে বলিয়া ধর্ম্মের প্রকৃতি তো হেয় হইয়া পড়ে নাই। বিকৃত, মরণোন্মুখ ধর্ম্ম যখন নব ধর্ম্মকে পিষিয়া ফেলিবার জন্য বর্ব্বর রূপ ধরিয়াছে, সেই ছবিটিই আমরা শুধু বড় করিয়া দেখি এবং ধর্ম্মকে দোষী সাব্যস্ত করি; কিন্তু নবধর্ম্মী যে নিষ্ঠা, সংযম ও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া অত্যাচার বরণ করিল, তাহার প্রেরণার মূলেও যে ধর্ম্ম। ধর্ম্মের এই মহৎ 'রূপটি' ভুলিয়া গেলে তো চলিবে না!

দুই নম্বর অভিযোগটি আরও অসম্পূর্ণ। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া রাজা প্রজাকে শাসণ করিতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, পুরোহিত ধর্ম্মযাজকেরা অন্যায় করিয়াও পূজ্য রহিয়াছে, আমাদের দেশে ধর্ম্মের নামে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, পুরুষ নারীকে প্রবঞ্চিত ও লাঞ্ছিত করিতেছে—বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কথা ভুলিলে বিষম ভুল হইবে যে, ধর্ম্মের প্রবক্তাগণ

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্যই ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন নাই। আজ খৃষ্টান জগৎ তাহার জাগতিক সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য সাম্রাজ্য লোলুপ হইয়া নিরীহ প্রাচ্য ভূভাগের দিকে দিকে মিশনারীর মাথায় খৃষ্টধর্ম্মের পসরা পাঠাইয়া আমাদিগকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে বটে। কিন্তু দুই হাজার বছর আগে নাজারেথের কিশোর যখন স্বর্গীয় পিতার প্রেম পৃথিবীতে বিলাইবার প্রেরণায় 'উদ্বুদ্ধ' হইয়াছিলেন, তখন এ মতলব তাহার মাথায় আসে নাই, সত্য। জগতের দুঃখে, অন্যায় ও অত্যাচারে তাঁহার প্রাণ আমাদের চেয়ে কম কাঁদে নাই। ধর্ম্মের অপব্যবহার দেখিয়াই আমরা চেঁচাইয়া মরিতেছি, তাহার কল্যাণ সাধনা আমরা দেখি না। এইখানেই অসম্পূর্ণ একতরফা বিচার।

তারপর শেষের কথাটুকু।

অধর্ম্মবাদিগণ বলেন, ধর্ম্ম যখন কল্যাণবোধের ভিত্তিতে দাঁড়ায় তখন তাহা আর ধর্ম্মপদবাচ্য নয়, তখন তাহা হয় মানবনীতি। তাহার বিরুদ্ধে তাঁহাদের অভিযোগ নাই। কিন্তু ভগবান্‌মূলক ধর্ম্ম অনাবশ্যক ও অনিষ্টকর; ইহা মানুষকে মিথ্যা সংস্কারে বাঁধিয়া পঙ্গু করিয়া ফেলে। ইহার বিরুদ্ধেই অভিযান।

এইখানে আমাদের বাস্তবজীবনের একটি মোটা কথা আসিয়া পড়ে। জন সাধারণের মন—অর্থাৎ আমরা যাহাকে mass mind বলিয়া থাকি সূক্ষ্মচিন্তা ও সূক্ষ্ম উপলব্ধির উপযুক্ত নয়। তাহারা কোনও বিষয় তলাইয়া দেখিতে জানে না, ভাসা ভাসা ধারণা করিয়া লয় মাত্র। নব রাশিয়ার কম্যুনিজম্ তাহার সাম্যনীতির বলে মানুষকে কোন্ স্বর্গ পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারিবে জানি না; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত জগতের সর্ব্বত্র মানুষে মানুষে অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রতিভার অসাম্য প্রখরভাবেই প্রকট,—বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শুধু নয়, সবশ্রেণীতেও। আজ পর্য্যন্ত দুইচারিজন মাত্র মনীষীই সূক্ষ্মচিন্তা ও ধ্যানের দ্বারা পথ খুঁজিয়া বাহির করেন এবং অন্যে অনুসরণ করে, মানিয়া লয়। মহাপুরুষরা যাহা আবিষ্কার করিলেন, তাহা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে কম লোকেই। সেই জন্যই মনীষীও তাঁহার চিন্তার সমগ্রধারা ও সম্পূর্ণ রূপ জনসাধারণের কাছে বিবৃত করিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া স্থূলভাবেই বাহিরের আলোতে প্রকাশ করেন। ধর্ম্মবীরেরা জানিতেন, বাহিরের অনুষ্ঠানের উপরে ধর্ম্ম কিছুমাত্র নির্ভর করে না; তবু তাঁহারা সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করিলেন। আর বর্ত্তমানের অধর্ম্মবাদী মহাপুরুষেরাও জানেন, ধর্ম্মের সূক্ষ্ম কল্যাণবোধ, প্রেম ও ত্যাগমন্ত্র মানুষের বরণীয়; তবু তাঁহারা সোজা কথায় বুঝাইবার জন্য সাধারণের কাছে প্রচার করিতে ব্যস্ত—ধর্ম্ম একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পাবাজি ও অমঙ্গল। ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, ফলে যাহারাই ঠিক বুঝিয়া আসিয়াছিল ধর্ম্মই মানুষের ইহপরকালের কার্য্য, আজ তাহারা অবলীলাক্রমে বুঝিয়া ফেলিয়াছে, ধর্ম্ম একটা কিছুই নয়। অর্থাৎ তাহারা কালও কিছু বোঝে নাই, আজও কিছু বোঝে নাই। আসল কথা, জনমত চলে সংস্কারের বশে। এতকাল ধর্ম্ম, ধর্ম্ম বলিয়া চীৎকার করিয়া মরিয়াছে সংস্কারের মোহে, আজকার এই ধর্ম্মহীনতার আতিশয্যও আর এক নূতন

সংস্কার। পুরানো সংস্কারের সহায়তা করিতেছিল মানুষের স্বভাবগত ভীরুতা, আজ নূতন সংস্কারের সহায়তা করিতেছে স্বভাবগত স্বার্থবুদ্ধি। উপরে একটি সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ দাঁড়াইয়া না থাকিলে যখন মানুষের দাম্ভিকতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়, তখন ভগবান্ নিশ্চয়ই নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রের পাপপুণ্য নামক প্রাচান শব্দ দুইটি না থাকিলে নৈতিক ভাল, মন্দও লোপ করিয়া ফেলা সহজ, সুতরাং ধর্ম্ম না থাকাই মঙ্গল। ইহাই মানুষের মন চুপি চুপি চাহিতেছিল। আজ মনীষী যখন ভগবান্ ও তাঁহার ধর্ম্ম দুইটিকেই আক্রমণ করিয়াছেন, তখন আর ভয় কি ?

আমাদের সামনে আজ তাই এক জটিল প্রশ্ন। আমরা চলিব কোন পথে ? মানব সভ্যতাকে উন্নত হইতে উন্নততর করিতে হইলে ধর্ম্মকে আমরা কোথায় আসন দিব ? সমস্ত সৌন্দর্য্য, কল্যাণ ও শক্তির প্রতীক করিয়া যখন এক ভগবানের পূজার বিধান প্রচারিত হইল তখন ধীরে ধীরে মানুষ সৌন্দর্য্য, কল্যাণ ও শক্তির লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়া পূজা করিল শুধু নিজ নিজ মনোমত এক স্থূল ভগবান্‌কে। ন্যায়ের ব্যভিচার তাহাতে অনেক ঘটিয়াছে। আবার আজ যাঁহারা ধর্ম্মবিকৃতি দূর করিবার জন্য ধর্ম্মের গোড়া ধরিয়াই টান দিয়াছেন, তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে ধর্ম্মভয়ের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মানুষের স্বার্থপরতা এবার উচ্ছৃঙ্খলভাবে ছড়াইয়া পড়িবে। যে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য এই অধর্ম্মের আয়োজন, সে শান্তির ভিত্তি পড়িবে একেবারে ধ্বসিয়া।

যে অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া বুদ্ধিমান্ লোকেরা ধর্ম্মকে ব্যবসা করিয়া চালাইতেছিল, সেই অজ্ঞতা জনসাধারণের মন হইতে দূর করিয়া ভগবানের সূক্ষ্মতর রূপ মানব সমাজে প্রবর্ত্তন করিবার মত মাঝামাঝি পথ কেন আজ মানুষের মাথায় আসে না, আশ্চর্য্য। মানুষ যেন চরমপন্থা ছাড়া ভাবিতেই জানে না ! অথচ প্লাবন আসিয়া যখন দেশকে ডুবাইয়া দেয়, তখন তাহার উচ্ছ্বাসান্তে জমির উর্ব্বরতা হয় অনেকখানি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষের পূর্ব্বতন প্রতিষ্ঠিত সম্পৎ যে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, সে ক্ষতিও কম নয়, কারণ তাহাকে আবার গড়িয়া তুলিতে হইবে। ঠিক কয় হাত উঁচু হইয়া জলোচ্ছ্বাস উঠিলে যে জমিরও উর্ব্বরতা সাধিত হইত, অথচ সহরও ধ্বসিত না, তাহা বলা দুষ্কর। কিন্তু ইহাই আমরা আজ চাই।

মহিলা-কর্ম্মী সেনোরা রোজেল

মহিলা কর্ম্মী সেনোরা রোজেল দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত পেরুর মহিলা প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রী ও মহিলা পরিচালিত 'ইউনিভারসাল' নামক বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদিকা। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন প্রথম লিমায় (পেরুর রাজধানী) যান, তখন বুঝিতে পারেন নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। তাঁহার গৃহই তখন বিভিন্ন মতবাদী নারীদের মিলন কেন্দ্র ছিল।

সেনোরা রোজেল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া আপনার কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিতেছেন। তিনি বহু বৎসর শ্রমিক কাউন্সিল ও সমাজ হিতকর সভার সভ্যারূপে শ্রমিক ও মালিকদের বিরোধ মামাংসা করেন এবং নিখিল আমেরিকান মহিলা বৈজ্ঞানিক কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। সিনোরা রোজেল বর্ত্তমানে লিমার ভৌগোলিক সমিতি, শান্তি-স্বাধীনতার আন্তর্জাতিক সংঘ, আমেরিকার কালচার ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সভ্যারূপে কার্য্য করিতেছেন।

সেনোয়া রোজেল নারীর নারীত্ব রক্ষণে আস্থাবান্। তিনি মনে করেন সেদিনই নূতন, পবিত্র ও অধিকতর স্বাস্থ্যকর জগতের সূচনা হইবে যেদিন নরনারী পরস্পরকে সহকর্ম্মী মনে করিবে।

বনবিভাগে নারী

মহিলারা আজ নানাক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন। সম্প্রতি সুইডেনের বনবিভাগে নারী প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে এবং এখনও অনেকনারী ভূসম্পতির মালিক। বনভূমিও ভূসম্পত্তির অন্তর্গত। কিন্তু বন-রক্ষার জন্য পূর্ব্বে কেহ দৃষ্টি দিত না। বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে বন-রক্ষার আইন পাশ হয়। তাহার ফলে সুইডেনের অধিকাংশ স্থানে বনবিভাগ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল বোর্ড বিশেষ করিয়া মহিলাভূসম্পত্তির মালিকদিগকে বন-রক্ষা সম্বন্ধে অনেক সাহায্য করিতে আরম্ভ করে। বনবিভাগে বন-রক্ষা বিষয়ে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মেয়েরাও উপলব্ধি করেন। মেয়েরা প্রথমে কৃষিবিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। এখন

বন-রক্ষা-বিদ্যালয়ে মেয়েরাও প্রবেশ করিয়াছেন। এই স্কুলের কার্য্য তালিকা এইরূপ—সকালে ৭টার সময় ক্লাস আরম্ভ হয়, প্রথমে চার ঘণ্টা পুঁথিগত শিক্ষা দেওয়া হয়, তারপর পাঁচঘণ্টা হাতে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা।

ইহা খুব আনন্দের বিষয় যে সুইডেনে মেয়েরাও বনবিভাগে প্রবেশ করিবার সুবিধা লাভ করিয়াছেন।

মেদিনীপুরে পিউনিটিভ ট্যাক্স

মেদিনীপুর সহর হইতে ৫৯ হাজার টাকা পিউনিটিভ ট্যাক্স বাবদ আদায় করা হইয়াছে। ৬৬ হাজার টাকার মধ্যে বাকী ৭ হাজারও শীঘ্র আদায় করা হইবে।

ভারতে বিদেশী দ্রব্য আমদানী

১৯৩২—৩৩ সালে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে মোট ১৩২ কোটি ৫৮ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকার জিনিষ আমদানী হইয়াছে।

কতিপয় জিনিষের আমদানীর হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল—

রেশম ও রেশমী জিনিষ—	৪ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা
কৃত্রিম রেশম	৪ ,, ১৬ ,, ,,
পশম ও পশমী জিনিষ—	২ ,, ৯৬ ,, ,,
এলুমিনিয়াম—	,, ,, ২২ ,, ,,
পিতল—	১ ,, ৮০ ,, ,,
জার্ম্মাণ সিলভার—	,, ,, ১২¾ ,, ,,
চিনির কল—	১ ,, ৫৩ ,, ,,
মোটর গাড়ী—	১ ,, ২৯ ,, ,,
ছুরি ও কাঁচি—	,, ,, ২৪ ,, ,,
কেরোসিন তৈল—	২ ,, ৫৪ ,, ,,

ভুলক্রমে ফাঁসি

ডেইলি হেরাল্ড পত্রে প্রকাশ গত ২১শে নবেম্বর লাহোর সেন্ট্রাল জেলে জনৈক প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দীর ভুলক্রমে ফাঁসি হইয়াগিয়াছে। প্রকাশ উক্ত বন্দী প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়া পঞ্জাব লাট ও বড় লাটের নিকট আবেদন করিয়াছিল কিন্তু উহা অগ্রাহ্য হয় তৎপর তাহার পক্ষ হইতে প্রিভিকাউন্সিলে আপিল করা হয় এবং মামলার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত ফাঁসি স্থগিত রাখিবার আদেশ দেওয়া হয়। প্রকাশ এই সম্পর্কে নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া যে চিঠি জেল সুপারিন্টেণ্ডের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহা উক্ত লোকটীর ফাঁসির ২৪ ঘণ্টা পর খোলা হইয়াছিল।

জেল সুপারিন্টেণ্ডের ভুলের জন্য এক হতভাগ্য ব্যক্তিকে অকালে প্রাণ দিতে হইল। যাহারা জেল ডিসিপ্লিন রক্ষার্থে সর্ব্বদা তৎপর তাহারা কি অফিস সংক্রান্ত কার্য্যের ডিসিপ্লিন রক্ষার সময় পান না?

বিবাহে ব্যয়-সংক্ষেপ

বিবাহ-উৎসবে যথেষ্ট খরচ হয় বলিয়া ইন্দোরের মহারাজার নির্দ্দেশানুসারে ইন্দোরের শাসন-পরিষদ এক নূতন আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। বিবাহ উপলক্ষে যদি কোন পক্ষ দুইটীর বেশী ভোজ দেন বা আত্মীয় স্বজন ছাড়া ৫০ জনের অধিক লোককে নিমন্ত্রণ করেন অথবা বিবাহ সভায় বিবাহের যৌতুক দেখান হয়, তবে এই আইন অনুসারে ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটেরাই এই ধরণের অভিযোগের বিচার করিতে পারিবেন এবং যদি পূর্ব্বেই কোথাও এইরূপ ঘটনা ঘটিবার সংবাদ পান, তবে নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারিবেন।

ইংরাজী যাহাদের মাতৃভাষা

পৃথিবীতে ২২ কোটী লোক ইংরাজী ভাষা মাতৃভাষা হিসাবে ব্যবহার করে। এই সংখ্যা পৃথিবীর সমগ্র অধিবাসীর নয় ভাগের এক ভাগ।

অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার কারণ

১৯২০ সালে চালের মণ ছিল ৬৲—এখন সেই দাম কমিয়া ৩৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইহাতেই দেশে হাহাকার উঠিয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার কারণ—ইহাই বিশেষজ্ঞদের মত। কিন্তু ৩৲ টাকা চালের মণ হওয়াতেই যখন এঅবস্থা তখন সায়েস্তা খাঁর আমলে কি ছিল! তখন যে টাকার আট মণ চাল বিকাইত!—

আজকাল

বাংলার শিশুমৃত্যু

১—৩০ দিন বয়স্ক	১৪০৪৪৩,	৫৭·৩৫০%
১ মাস—৬ মাস বয়স্ক	৬৩০৫১	২৬·৭৫০%
৬ মাস—১ বৎসর	৪১৩৭০	১৬·০০০%

১ বৎসরের শিশু মৃত্যু মোট—২৪৪৮৬৪

প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে এক বৎসর না যাইতেই বাংলা দেশে—১৮০ জন মারা যায় কিন্তু ইংলণ্ডে প্রতি হাজার শিশুর মাত্র ৬৫টী মারা যায়।

সহরে শিশু মৃত্যু—হাজার করা—২০১

গ্রামে শিশু মৃত্যু ,, ১৭৯

বাঙ্গালার কাপড়ের কল

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার মিলগুলির দুরবস্থা দেখিয়া লিখিয়াছেন :—

'বাঙলা দেশের কাপড়ের কারখানা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন এসেছে তার উত্তরে একটি মাত্র বল্‌বার কথা আছে, এগুলিকে বাঁচাতে হবে। আকাশ থেকে বৃষ্টি এসে আমাদের ফসলের ক্ষেত দিয়েছে ডুবিয়ে, তার জন্যে আমরা ভিক্ষা করতে ফির্‌চি, কার কাছে? সেই ক্ষেতটুকু ছাড়া যার অন্নের আর কোন উপায় নেই, তারই কাছে। বাঙলা দেশে সব চেয়ে সাংঘাতিক প্লাবন। এদেশের ধনীরা ঋণগ্রস্ত, মধ্যবিত্তেরা চির-দুশ্চিন্তায় মগ্ন, দরিদ্রেরা উপবাসী। তার কারণ, এদেশের ধনের কেবলই ভাগ হয়, গুণ হয় না।

আজকের দিনে পৃথিবীতে যারা সক্ষম, তারা যন্ত্রশক্তিতে শক্তিমান। যন্ত্রের তারা আপন অঙ্গের বহু বিস্তার ঘটিয়েচে, তাই তারা জয়ী। এক দেহে তারা বহু দেহ, তাদের জনসংখ্যা মাথা গুণে নয় যন্ত্রের দ্বারা

আপনাকে বহুগুণিত করেছে। এই বিকলাঙ্গ মানুষের যুগে আমরা বিরলাঙ্গ হয়ে অন্য দেশের ধনের অধমর্ণ হ'য়ে পড়ে আছি।

সংখ্যাহীন উমেদারের দেশে কেবল যে অন্নের টানাটানি ঘটে তা নয়, হৃদয়ের ঔদার্য্য থাকে না। প্রভুমুখ-প্রত্যাশী জীবিকার সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ কণ্টকিত হয়ে ওঠে। পাশের লোকের উন্নতি সইতে পারিনে। বড়োকে ছোট করতে চাই, একখানাকে সাতখানা করতে লাগি। মানুষের যে সব প্রবৃত্তি ভাঙন ধরাবার সহায়, সেইগুলিই প্রবল হয়, গড়ে তোলবার শক্তি কেবলি খোঁচা খেয়ে খেয়ে মরে।

দশে মিলে অন্ন উৎপাদন করবার যে যান্ত্রিক প্রণালী তাকে আয়ত্ত করতে না পারলে যন্ত্ররাজদের কনুইয়ের ধাক্কা খেয়ে বাসা ছেড়ে মরতে হ'বে। মরতেই বসেছি। বাহিরের লোক অন্নের ক্ষেত্র থেকে ঠেলে বাঙালীকে কেবলি কোণঠেসা করেছে। বহুকাল থেকে আমরা কলম হাতে নিয়ে একাকার ক'রে মানুষ—
—যারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত, আজ ডাইনে বাঁয়ে কেবলি তাদের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে চলি, নিজের রিক্ত হাতটাকে কেবলি খাটাচ্চি পরীক্ষার কাগজ, দরখাস্ত এবং ভিক্ষার পত্র লিখতে।

একদিন বাঙালী শুধু কৃষিজীবী, এবং মসীজীবী ছিল না; ছিল সে যন্ত্রজীবী, মাড়াই কল চালিয়ে দেশান্তরকে সে চিনি জুগিয়েছে। তাঁত যন্ত্র ছিল তার ধনের প্রধান বাহন। তখন শ্রী ছিল তার ঘরে, কল্যাণ গ্রামে গ্রামে।

বাঙলা দেশের বুদ্ধিমানদের হাত বাঁধা পড়েছে কলম চালনায়। ঐ একটি মাত্র অভ্যাসেই তারা পাকা, দলে দলে তারা চলেছে আপিসের বড়বাবু হবার রাস্তায়। সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে কলম আঁকড়িয়ে থাকে, পরিত্রাণের আর কোন অবলম্বন চেনে না। সন্তানের প্রবাহ বেড়ে চলে, তার জন্য যারা দায়িক, তারা উপরে চোখ তুলে ভক্তিভরে বলে, 'জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি।'

আহার তিনি দেন না, যদি স্বহস্তে আহারের পথ তৈয়ারী না করি। আজ এই কলের যুগে কলই সেই পথ। অর্থাৎ প্রকৃতির এই ভাণ্ডারে যে শক্তি পুঞ্জিত, তাকে আত্মসাৎ করতে পারলে সকলেই এ যুগে আমরা টিকতে পারবো।

অশিক্ষার ও অনভ্যাসে আজ বাঙলা দেশের মন এবং অঙ্গ যন্ত্র-ব্যবহারে মূঢ়। এই ক্ষেত্রে বোম্বাই আমাদেরকে যে পরিমাণে ছাড়িয়ে গেচে, সেই পরিমাণে আমরা তার পরোপজীবী হয়ে পড়েছি। বঙ্গবিভাগের সময় এই কারণেই আমাদের ব্যর্থতা ঘটেছিল, আবার যে কোনো উপলক্ষে পুনশ্চ ঘটতে পারে। আমাদের সমর্থ হতে হবে—সক্ষম হতে হবে, মনে রাখতে হবে যে, আত্মীয় মণ্ডলীর মধ্যে নিঃস্ব কুটুম্বের মত কৃপাপাত্র আর কেউ নেই।

সেই বঙ্গবিভাগের সময়ই বাঙলা কাপড় ও সুতোর কারখানার প্রথম সূত্রপাত। সমস্ত দেশের মন বড় ব্যবসার বা যন্ত্রের অভ্যাসে পাকা হয়নি, তাই সেগুলি চলছে নানা বাধার ভিতর দিয়ে মন্থরগমনে। এখন তৈরী ক'রে তুলতে হবে, নইলে দেশ অসামর্থ্যের অবসাদে তলিয়ে যাবে।

ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের মধ্যে বাঙালাদেশে সর্ব্বপ্রথমে যে ইংরেজী বিদ্যা গ্রহণ করেচে সে হলো পুঁথির বিদ্যা। কিন্তু যে ব্যবহারিক বিদ্যায় সংসারে মানুষ জয়ী হয়, য়ুরোপের সে বিদ্যাই সব শেষে বাঙলা দেশে এসে পৌঁছলো। আমরা য়ুরোপের বৃহস্পতি গুরুর কাছ থেকে প্রথম হাতে খড়ি নিয়েচি, কিন্তু য়ুরোপের শুক্রাচার্য্য জানেন কি করে মরণ বাঁচানো যায়— সেই বিদ্যার জোরেই দৈত্যেরা স্বর্গ দখল করে নিয়েছিল। শুক্রাচার্য্যের কাছে পাঠ নিতে আমরা অবজ্ঞা করেচি—সে হলো হাতিয়ার বিদ্যার পাঠ। এই জন্যে পদে পদে হেরেচি আমাদের কঙ্কালও বেরিয়ে পড়চে।

যাই হোক বাঙলা দেশেও একদিন বিষম ব্যর্থতার তাড়নায় বঙ্গলক্ষ্মী নাম নিয়ে কাপড়ের কল দেখা দিয়েছিল। সাংঘাতিক মার খেয়েও আজও সে বেঁচে আছে। তারপর দেখা দিল মোহিনী মিল, একে একে আরো কয়েকটি কারখানা মাথা তুলেচে।

এদের যেমন ক'রে হোক রক্ষা করতে হবে—বাঙালীর উপর এই দায় রয়েচে। চাষ করতে করতে যে কেবল ফসল ফলুলে, তা নয় চাষের জমিও তৈরী হয়, কারখানাকে যদি বাঁচাই তবে কেবল যে উৎপন্ন দ্রব্য পাবো, তা নয়, দেশে কারখানার জমিও গড়ে উঠবে।

বাঙলার মিল থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হচ্চে, যথাসম্ভব একান্তভাবে সেই কাপড়ই বাঙালী ব্যবহার করবে ব'লে যেন পণ করে একে প্রাদেশিকতা বলে না, এ আত্মরক্ষা। উপবাসকৃত বাঙালীর অন্ন-প্রবাহ যদি অন্য প্রদেশের অভিমুখে অনায়াসে বইতে থাকে এবং সেই জন্য বাঙালীর যদি মরতে থাকে, তবে মোটের উপর তাতে সমস্ত ভারতেরই ক্ষতি। সুস্থ সমর্থ হয়ে দেহ রক্ষা করতে পারি, তবেই আমাদের শক্তির পূর্ণ চালনা সম্ভব হতে পারে। সেই শক্তি নিরশনক্ষীণতায় অবমর্দিত হ'লে তাতে শুধু ভারতে কেন, পৃথিবীকেই বঞ্চিত করা হবে।

বাঙালীর ঔদাসীন্যকে ধাক্কা দিয়ে দূর করা চাই। আমাদের কোন্ কারখানায় কি রকম সামগ্রী উৎপন্ন হচ্চে বার বার সেটা তাহাদের সামনে রাখতে হবে। কলিকাতার ও অন্যান্য প্রাদেশিক নগরের মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তব্য হবে, প্রদর্শনীর সাহায্যে বাঙলার সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের সংবাদ নিয়ত প্রচার করা, এবং বাঙালার যুবকদের মনে সেই উৎসাহ জাগানো, যাতে বিশেষ ক'রে তারা বাঙালীর হাতের কলের জিনিষ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়। জনমত

"নারীকল্যাণ ও শিশুভবন"

প্রায় ৬ মাস হইতে চলিল, ঢাকাতে "নারীকল্যাণ ও শিশুভবন" নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ধর্ষিতা নারী, অসৎপথে প্রতিপালিতা নাবালিকা বালিকা ও অবৈধ-জাত সন্তানদিগকে সেখানে রক্ষণাবেক্ষণ ও সুশিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। শিশুভবনে প্রসবেরও বন্দোবস্ত আছে এবং সমস্ত কার্য্যই উপযুক্ত মহিলা কর্ম্মীদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানে ৮টী শিশু এই ভবনে প্রতিপালিত হইতেছে তন্মধ্যে তিনটী বালক ও ৫টী বালিকা। ৯টী নারীভবনে বাস করিতেছে। ৭টী নারীকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের পরিবারে ও সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে এবং দুইটী নাবালিকা বালিকা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে।

বর্ত্তমান সামাজিক বিপ্লবে এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বলিয়া শেষ করা যায় না। পূর্ব্ববঙ্গে এইরূপ প্রতিষ্ঠান বিশেষ নাই। ইহার প্রয়োজনীয়তা যেরূপ অশেষ, ব্যয়ও তেমনি প্রচুর।

সমাজ হিতৈষী ও সহৃদয় ব্যক্তিগণ ঐ হতভাগিনী ধর্ষিতা নারী, প্রলোভিত জননী এবং নিষ্পাপ শিশুদের প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্যানুরূপ সাহায্য করিয়া ইহাদিগকে রক্ষা করুন।

নিখিল ভারত স্বদেশী প্রদর্শনী

মহাত্মা গান্ধী ২৩-এ নভেম্বর অপরাহ্ণে রায়পুর নিখিল ভারত স্বদেশী প্রদর্শনীর উদ্বোধন ক্রিয়া সমাপন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে কম পক্ষে ৪০ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল।

ঠাকুর সপ্তাহের উদ্বোধন

২৩-এ নভেম্বর সন্ধ্যায় বোম্বাই টাউন হলে ঠাকুর সপ্তাহের উদ্বোধন হইয়াছে। সহরের বিদ্বন্মণ্ডলী উৎসবে যোগদান করেন।

আটকবন্দীর পরীক্ষা দিবার অনুমতি লাভ

দেউলী বন্দিনিবাসের আটকবন্দী নিবারণচন্দ্র দত্ত লেকচার না শুনিয়াই প্রাথমিক আইন পরীক্ষা দিতে পারিবেন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি বিশেষ অনুমতি পাইয়াছেন।

পণ নিলে বিবাহ করিব না

গৈলায় পূজার সময় যে সকল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির বাৎসরিক সভাধিবেশন প্রভৃতি হইয়াছিল তাহার মধ্যে মেয়েদের একটি সভা উল্লেখযোগ্য। অবিবাহিতা মেয়েরা একটি বৈঠকে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, পণ-নেওয়া ছেলেদের তাহারা বিবাহ করিবে না। বিবাহ না হয় তাহারা চিরকুমারী থাকিবে।

স্বাক্ষরের মূল্য

এদেশে দলিল পত্রে সাক্ষীরূপে সহি করিয়া কেহ কেহ যৎসামান্য মূল্য পাইয়া থাকেন। কিন্তু চিত্রজগতে অভিনেতা ও অভিনেত্রীবৃন্দ স্বাক্ষরের জন্য ১০ শিলিং হইতে ১৫ পাউণ্ড বা তদূর্দ্ধ মূল্য পাইয়া থাকেন।

"গোল্ডেন হার্ভেষ্ট" নামক ফিল্মের প্রধান প্রধান অভিনেতা অভিনেত্রীদিগের স্বাক্ষরের মূল্য ৮ পাউণ্ড।

সাম্প্রতি রুডলফ ভ্যালেন্টিনোর স্বাক্ষর ১৫ পাউণ্ডে বিক্রীত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে যে সকল ফিল্ম-অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের স্বাক্ষর ৫ পাউণ্ড করিয়া বিক্রীত হইতেছে, তাঁহাদের নাম মে ওয়েষ্ট, গ্রেটা গার্ব্বো এবং মারলেন বিয়েট্রিস।

মরিস সিভ্যালিয়ারের স্বাক্ষরের মূল্য ৪ পাউণ্ড।

ফ্রেডরিক মার্চ্চ, জন ব্যারিমুর, ওয়ালেস বোর, হারবার্ট চান্সেল, চার্লস্ ল্যাফটন এবং নরমা সিয়ারারের স্বাক্ষরের মূল্য ৪ পাউণ্ড ১০ শিলিং করিয়া।

জেনেট গেনার, মেরী ড্রেসলার ও কিং ক্রস্বির স্বাক্ষরের মূল্য ৪ পাউণ্ড করিয়া।

যদিও জর্জ্জ বার্ণার্ড শ তাঁহার নিজের স্বাক্ষরের মূল্য ২০০ পাউণ্ড বলিয়া মনে করেন, কিন্তু চিত্রজগতে তাঁহার স্বাক্ষরের মূল্য মাত্র ৬ শিলিং। চিত্রামোদীর নিকট যে যত বড় গ্রন্থকার হউক না কেন, সকলের স্বাক্ষরেরই মূল্য ঐ মাত্র ৬ শিলিং।

কতকগুলি ছায়াচিত্র পরিচালকের স্বাক্ষর ৬ শিলিং এবং কতকগুলির মূল্য ৪ শিলিং।

ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার

একটি দুইটি করিয়া, দু দশ বছর নয়, একশত বৎসর অতীত হইতে চলিল কিন্তু বাঙালী বিস্মৃত হতে পারে নাই মহৎ গুণ, অক্ষয় কীর্ত্তি ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের। ডাঃ সরকার প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান মন্দির জাতির বিজ্ঞান শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছে; ডাঃ সরকার প্রবর্ত্তিত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-জগতের অমিয় পথ। সুতরাং জ্ঞানপিপাসু এবং রোগক্লিষ্ট বাঙালী চিরদিনই ডাঃ সরকারের কথা কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্মরণ করিবেই। কলিকাতায় ও ভারতের বিভিন্নস্থানে বিজ্ঞান মন্দিরে ও সভাসমিতি এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রতি বৎসরই ডাঃ সরকারের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয় এবং তাঁহার ন্যায় মহেন্দ্র সরকারের গুণমুগ্ধ ও শিষ্যমণ্ডলী আগামী ২রা নভেম্বর তারিখে কলিকাতায় ডাঃ সরকারের শত বার্ষিকী স্মৃতিপূজার বিশেষ আয়োজন করিতেছেন। বেতার বার্ত্তায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয় এ সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া ভালই করিয়াছেন। ভিষক্‌প্রবর ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের জন্মদিনে বাঙালী কৃতজ্ঞহৃদয়ে বিজ্ঞানাচার্য্যের স্মৃতিপূজায় শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া ধন্য হও—তরুণ বাংলার সম্মুখে মহতের মহান আদর্শ প্রচার কর।

কমলা দেবী প্রদত্ত 'ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালীর' মূলাংশ

আমি মানস নেত্রে দেখিতেছি, আমাদেরে সংগ্রাম জয়যুক্ত হইলে একটি জাতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলী (Constituent Assembly) ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র গঠনকল্পে আহূত হইবে। ঐ মণ্ডলী নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির উপর ভিত্তি করিয়া জাতীয় শাসনতন্ত্র রচনা করিবে।

"বস্ত্রশিল্প, লৌহশিল্প, যানবাহন সমস্তই জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইবে। রাষ্ট্র ভবিষ্যতে জাতির অর্থনৈতিক জীবন, নিয়ন্ত্রিত করিবে। বৈদেশিক বাণিজ্যে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার থাকিবে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত বাণিজ্যের স্থান ক্রমে সরকারী সমবায় প্রতিষ্ঠান সমূহ গ্রহণ করিবে। করদ রাজ্য সমূহ এবং পরগাছাস্বরূপ জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হইবে। রাষ্ট্রই ভূসম্পত্তির মালিক হইবে। সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য্য চালাইতে রাষ্ট্র উৎসাহ প্রাদান করিবে এবং ক্রমে কৃষিও রাষ্ট্রের অধিকারে আনিবার উদ্দেশ্য থাকিবে। শ্রমিকের সমস্ত ঋণই মকুব করা হইবে। বিদেশী সরকার ভারতের জন্য যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন সেই ঋণ একেবারে অগ্রাহ্য করা হইবে। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীপুরুষের ভোটাধিকারের থাকিবে, এবং রাষ্ট্রের জন্য কে কিরূপ কাজ করে—তাহার উপর ভোটাধিকার নির্ভর করিবে। যে সকল সম্প্রদায় মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতা করিবে, তাহারা ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। রাষ্ট্র প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবে, বয়স্কদিগকেও লেখাপড়া শিখিতে বাধ্য করিবে। ধর্ম্মবিষয়ক ভেদবিরোধ থাকিবেনা। স্ত্রী পুরুষের বৈষম্য থাকিবেনা। সংবাদপত্রে এবং বক্তৃতামঞ্চে স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার থাকিবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহ নিজেদের সংস্কৃতি বজায় রাখিবার অধিকার পাইবে। শ্রমিকদের নূনতম বেতন, কাজের ঘণ্টা, বার্দ্ধক্য পেন্সন প্রভৃতি রাষ্ট্র নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া, তাহাদের মানুষেব মত বাঁচিবার সুযোগ দান করিবে।

(আকোলা যুবসম্মিলনে প্রদত্ত)

প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্যের প্রভুত্ব

অদ্য পার্শী যুবক সমিতির উদ্যোগে রিগ্যাল থিয়েটারের এক সভা হয়, এই সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বক্তৃতা করেন, মিঃ এফ এইচ তালেবর খাঁ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বক্তৃতাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্যের প্রভুত্বের নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে, ইউরোপের সহিত এশিয়ার সম্পর্ক মৈত্রীর নহে। ইউরোপীয়ানরা তাঁহাদের সভ্যতাকে প্রাচ্যের সভ্যতা অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর মনে করে। পাশ্চাত্যের আসুরিক শক্তি রাজনৈতিক অবিচার এবং অর্থ-নৈতিক শোষণে পর্য্যবসিত হইয়াছে আমরা পাশ্চাত্যের নিকট মাথা নত করিয়াছি—শ্রদ্ধায় নহে, নত করিয়াছি কারণ উহা প্রবল এবং শক্তিশালী।

বাঙ্গালীর শরীরচর্চ্চা

শিক্ষকদের জন্য বিশেষ ব্যাবস্থা—বাঙ্গলার ব্যয়ম চর্চ্চা বিভাগের ডিরেক্টার নিয়োগ করার সময় হইতেই স্কুল ও কলেজগুলিতে শরীরচর্চ্চা বিষয়টিতে বেশ উন্নতি হইয়াছে, স্কুলসমূহে আরও সুবিধা প্রদানের জন্য বর্ত্তমান কলিকাতায় একটী ক্লাস খোলা হইয়াছে উক্ত ক্লাসে প্রত্যেক স্কুল হইতেই শিক্ষক প্রেরণের সুবিধা দেওয়া হয় এবং উক্ত ক্লাসে শিক্ষকগণ যোগদান করিয়া শরীরচর্চ্চার বর্ত্তমান আদব কায়দায় অভিজ্ঞ হইতে পারেন।

বিশপস কলেজে এই সপ্তাহে একটি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে উক্ত ক্লাসে বিবিধ বিষয় শিক্ষা দান করা হয়।

বাংলার সংবাদ পত্র

বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের ১৯৩১-৩২ সালের কার্য্য বিবরণীতে প্রকাশ যে আলোচ্য বৎসরে ৩২৯৪ খানা পুস্তক ও ১৩১৩ খানা সাময়িকপত্র রেজেষ্ট্রী করা হয় পুস্তকের মধ্যে ৩১৪৩ খানা মৌলিক রচনা, ১৫১ খানা পুনর্মুদ্রিত ও ১৫১ খানা অনুবাদ। আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গলা দেশে ৭০৪ খানা সংবাদ ও সাময়িক পত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২১৩ খানা খাঁটি সংবাদপত্র এবং ৪১৪ খানা খাঁটি সাময়িক পত্র, ১৭ খানা কিরূপ সাময়িক পত্র তাহা জানা যায় নাই। ইহার মধ্যে ১৭১ খানা ইংরাজী, ৩৬৩ খানা বাঙ্গলা এবং অন্যান্যগুলি অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে ৬৯ খানা নূতন সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং মোট ২০৯ খানা সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

আলোচ্য বৎসরে ২৪ খানা সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২৮ (ক) ও ১৫৩ (ক) ধারা অনুসারে মামলা রুজু হইয়াছিল; সম্পাদকদিগকে অর্ডিন্যান্স অনুসারে ৫৯ বার সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কোনও পত্রের জামিন বাজেয়াপ্ত করা হয় নহে। ১৮ খানা পুস্তক ৪০ খানা ইস্তাহার ও ৪৮ খানা পুস্তিকা ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরেও সংবাদপত্রগুলি বিপ্লববাদীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে বিরত হয় নাই কিন্তু তাহাদের সুর সর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা নরম হইয়া আসিয়াছিল। আন্দোলন প্রচারকল্পে সংবাদপত্র গুলি যে সত্য ও শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত নহে, তাহা গত তিন বৎসরের সংবাদপত্র ইতিহাস হইতেই স্পষ্ট প্রমানিত হয় সুতরাং গভর্ণমেণ্ট "জরুরী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স" ও বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিনান্স" জনরক্ষা আইনে ও সংশোধিত ফৌজদারী আইনে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করেন। ১৯৩২ সালের প্রথমেই একজন প্রেস অফিসার নিযুক্ত করা হয়। প্রথমে সমস্ত সংবাদ পত্রের সম্পাদকদিগকে সাবাধান করিয়া দেওয়া হয়। অলোচ্য বৎসরে ৫০ খানা সংবাদ পত্র হইতে জামীন দাবী করা হয় এবং চারিখানি সংবাদ পত্রের জামিন আংশিক ভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়। সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করায় বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে।

মনঃ সঙ্ঘ (League of Minds)

নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক এখন বিষম সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন, পৃথিবীর সমস্যা সমাধানের জন্য কোন কোন প্রধান রাষ্ট্রশক্তি সঙ্ঘ-নীতির ভিতর অভিনব ক্ষমতা সৃষ্টের দাবী করিতেছেন; কিন্তু রাষ্ট্র সঙ্ঘের কার্য্য স্রোন সমান ভাবেই বহিয়া চলিয়াছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ যে নৈতিক নিরস্ত্রী করণ সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, মিসেস্ করবেট্ অ্যাস্‌বির সভাপতিত্বে তাঁহারা একটী বিশেষ বিধির (convention) খসড়া প্রস্তুত করিতেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ও যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধিদ্বয় এবং সংস্কৃতিসহকারিতার অন্তর্জাতিক সমিতির পক্ষ হইতে ম্যঁদিয়ে কোমারনেকি যে খাসড়া দিয়াছেন তাহাই ভিত্তি করিয়া উক্ত বিশেষ বিধি লিখিত হইতেছে। কেননা ইহা বিশেষ

ভাবেই অনুভূত হইয়াছে যে রণলিপ্সা মানবের মন হইতে দূরীভূত না হইলে, রাষ্ট্রগণ যতই না কেন নিরস্ত্রীভূত হইতে চেষ্টা করুণ না তাহাতে বিশেষ সুফল ঘটিবার সম্ভাবনা তাই সেই হেতু নৈতিকনিরস্ত্রী করণ সমিতির কার্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। "মনঃ সঙ্ঘ" (League of Minds) নামক পুস্তকে ডাঃ গিলবার্ট মারে তাঁর প্রথম পত্রে বলিয়াছেন সত্যকারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ আজ মনঃসঙ্ঘই ব্যক্ত হয়। সংস্কৃতে সহকারিতার অন্তর্জাতিক সমিতির কাজ সেই সঙ্ঘকে বর্দ্ধিত করা। ভারতীয় পাঠকগণের জানা প্রয়োজন যে জেনীভা এবং অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং চিন্তার ধারার যথেষ্ট খ্যাতি প্রচারিত হইয়াছে। জেনীভার চিঠি

মুসোলিনীর হুকুম

ইটালীর নায়ক মুসোলিনী এই হুকুম জারী করিয়াছেন যে, তাঁহার দলের কার্য্য নির্ব্বাহকদের মধ্যে যাহারা অবিবাহিত বা যে সকল অবিবাহিত ব্যক্তি ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ প্রার্থী তাহাদের সকলেরই বিবাহ করিতে হইবে। নতুবা তাহারা কার্য্যনির্ব্বাহকের পদ হইতে বরখাস্ত হইবে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদও পাইবে না। মুসোলিনী ইটালীর জন সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া স্বদেশকে শক্তিশালী করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন! মুসোলিনী ইতঃপূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে মাতা যত সন্তানের জননী তাহাকে তত বেশী পুরস্কার দেওয়া হইবে।

নারীহরণকারীর বেত্রদণ্ড

কলিকাতা হাইকোর্ট নারীহরণকারীদের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ব্যতীত বেত্রদণ্ড করা উচিত কিনা তৎ সম্বন্ধে বাঙ্গালার সমস্ত জেলার উকীল লাইব্রেরীর সভ্যদের মতামত জানিবার জন্য পত্র দিয়াছেন।

নারী-নাবিক

লণ্ডনে এক রুশ মাল জাহাজ পৌছিয়াছে। ঐ জাহাজে অনেক স্ত্রীলোক নাবিক আছে। তাহারা অবিবাহিত। জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারী বলেন যে, এই সকল অবিবাহিতা নারী মোটামুটি ভালই কার্য্য করে।

জহরলালের মন্তব্যে আচারিয়া

হিন্দুসভার প্রতি পণ্ডিত জওহরলালের মন্তব্যে দুঃখ প্রকাশ করিয়া শ্রীযুক্ত বিজয়রাঘব আচারিয়া একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন তিনি বলেন,— জগতে যতগুলি জাতি ও সম্প্রদায় আছে, তাহাদের মধ্যে একমাত্র হিন্দুর সেই জাতি, যে জাতির মধ্যে যে কোন বিদেশী আসিয়া একান্ত নিরাপদে বসবাস করিতে পারে, হিন্দু পরিবেষ্টিত থাকিয়াও বিদেশীরা সমাজ ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিষয়ে অবধি অধিকার ভোগ করিতে পারে।

পুলিশ সাব-ইনসপেক্টারের পদে মহিলা

মিস এস ই নিকোল জোন্সকে রেঙ্গুনের পুলিশ সাব ইন্‌সপেক্টারের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আর কোন মহিলা সাব ইন্সপেক্টার রেঙ্গুনে ছিলেন না। রেঙ্গুন সহরের গণিকালয়গুলি উঠাইয়া দেওয়া সম্পর্কে ইনি কার্য্য করিবেন।

জার্ম্মাণীতে কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষ

ডাক্তার কে হবিব হাসান নিজাম গবর্ণমেণ্টের রসায়ন বিভাগের কর্ত্তা। ইনি সম্প্রতি জার্ম্মাণী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, তিনি বলেন সমগ্র কৃষ্ণাঙ্গ জগতের লোকদের ন্যায় ভারতীয় ছাত্রদের উপরও জার্ম্মাণীতে অত্যন্ত অভদ্রোচিত আচরণ করা হইতেছে। বার্লিণে তাহাদের অনেককে একটা স্বতন্ত্র স্থানে রাখা হইয়াছে; যে সব জার্ম্মাণ বালিকা ভারতীয় ছাত্রদিগকে বিবাহ করিয়াছে, তাহাদিগকে জার্ম্মাণীর সমাজচ্যুত করা হইতেছে।

কর্পোরেশনের চাকুরীতে মুসলমানের দাবী

গত সপ্তাহে কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভায় ১৯ জন মুসলমান এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন যে কলিকাতা কর্পোরেশনের সকল বিভাগের চাকুরীতে (ভৃত্যাদির কাজ ব্যতীত) মুসলমানদের জন্য শত করা ৩৩⅓টী পদ রাখিতে হইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত না এই সংখ্যায় পৌঁছে ততদিন শত করা ৫০টী করিয়া মুসলমানদের চাকুরী দিতে হইবে।

মেয়রের নির্দ্দেশক্রমে ঘরোয়া-বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তাবটী আপাততঃ স্থগিত রহিয়াছে।

সাম্প্রদায়িকতা আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কি ভাবে প্রবেশ করিয়াছে, উক্ত প্রস্তাবটী তাহারই নিদর্শন। সরকারী চাকুরীর বণ্টনে সাম্প্রদায়িকতাকেই মানদণ্ড করা হইয়াছে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িকতা অসঙ্গতরূপেই প্রশ্রয় পাইয়াছে। আবার এখন কলিকাতা কর্পোরেশনেও উহার প্রবেশের সম্ভাবনা হইয়াছে।

যে কোন কাজে নিযুক্ত করিবার মাপকাঠী হওয়া উচিত যোগ্যতা, নতুবা কর্ত্তব্য যথাযথ পালিত হয় না। যাহারা অর্থ যোগায় কর্ম্মচারী নিয়োগে তাহাদের স্বার্থই বিশেষভাবে দেখা উচিত, নতুবা তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়, কর্পোরেশনের কাউন্সিলারগণেরও করদাতার স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার। ঘরোয়া-বৈঠকের নামে আমাদের মনে আশঙ্কারই সঞ্চার হইয়াছে, পাছে কোনরূপ অন্যায় অযৌক্তিক-ভাবে আপোষ করা হয়।

মুসলমানদের পক্ষে চাকুরীর শতকরা এক তৃতীয়াংশ দাবী কি হিসাবে করা হইল, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। লোকসংখ্যা হিসাবে তাহারা মাত্র চৌদ্দটী চাকুরী পাইবার অধিকারী, যোগ্যতা ও শিক্ষা হিসাবের কথা না তোলাই ভাল।

এই ভাগ বাঁটোয়ারার নিষ্পত্তি করিতে করিতেই জাতির শক্তি-সামর্থ্য ব্যয়িত হইবে, আসল উন্নতির পরিপন্থী কাজ পড়িয়াই থাকিবে।

মহাত্মা গান্ধীকে বাংলায় আনয়ন সম্পর্কে গোলযোগ

মহাত্মা গান্ধী শীঘ্রই বাংলায় আসিবেন বাংলার অস্পৃশ্যতা দূর করিতে, তাঁহার আগমনের আয়োজন শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় করিতেছিলেন সম্প্রতি শুনা যাইতেছে, শ্রীযুক্ত বিধান চন্দ্র রায় অস্পৃশ্যতা নিবারণ সমিতির সভাপতিরূপে এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ সতীশবাবু ঐ সমিতির সম্পাদক সাতকড়িবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়াই সব করিতেছিলেন, এবিষয়ে সতীশবাবুর বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছে। এইরূপ গোলযোগের মূল কারণ কি জানি না, সকলেই পদস্থ, সম্মানিত ব্যক্তি তথাপি যে এরূপ ঘটনা অত্যন্ত রূঢ়রূপে প্রকাশ পাইল, ইহাই আশ্চর্য্য। বাংলা দেশে দলাদলি যে কতভাবে কতদিক হইতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সতীশবাবু অস্পৃশ্যতা নিবারণে অনেক করিয়াছেন, করিতেছেন ও 'হরিজন' পত্রিকার সম্পাদকরূপে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে প্রচার করিতেছেন, অপর পক্ষে কংগ্রেসের বিশিষ্টস্থানীয়, গান্ধীজীর অকৃত্রিম ভক্ত হিসাবে শ্রীযুক্ত বিধান রায় ও অস্পৃশ্যতা নিবারণে সচেষ্ট। লক্ষ্য, পন্থা, উভয়েরই এক অথচ এক গান্ধীআমন্ত্রণ লইয়া উভয়ের মধ্যেই কি মনান্তর। দেশে একতা আসিতে এখনও যে কত দেরী।

বেথুন কলেজের নূতন মহিলা-অধ্যক্ষ

আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে শ্রীযুক্তা তটিনী দাস এম্ এ বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রে এম্, এ দিয়াছিলেন, শিক্ষাদান কার্য্যে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, বিলাতে ট্রেণিং বিষয়ে তিনি শিক্ষা-লাভ করিয়া আসিয়াছেন। এদেশী ও বিদেশী উভয় শিক্ষার যোগ্যতা তাঁহারে আছে, সুতরাং বাঙালী মহিলার এরূপ সম্মান দান করিয়া শিক্ষা-বিভাগ আপনার গৌরবই বর্দ্ধন করিয়াছে। এই প্রকৃত যোগ্য মহিলার নিয়োগে আমরা আন্তরিক সন্তুষ্ট হইয়াছি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের একটী কথা মনে জাগিতেছে, বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্তা রাজকুমারী দাস ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যক্ষ উভয়ের সময়ে বেথুন কলেজে ছাত্রীদের মধ্যে যে অশোভন ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই, এই ঘটনার পরিণতি এত দূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, যে, বাহিরের লোক আসিয়া হস্তক্ষেপ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, সংবাদ পত্রে ইহা লইয়া বাদানুবাদ ও বড় কম হয় নাই, এ সম্বন্ধে কাহার দোষগুণ উল্লেখের প্রয়োজন নাই, কিন্তু পর পর দুই প্রিন্সিপালের সময়ে গোলযোগ হওয়াতে তখন হইতেই বেথুন কলেজ তাহার সুনাম হারাইয়াছে। ছাত্রী-সমাজের সহিত যাহার একটুকু পরিচয় আছে, তাহারাই জানেন বর্ত্তমানে বেথুন কলেজে ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন মেয়ে সহজে ভর্ত্তি হইতে চায় না, যাহাদের পক্ষে সুবিধা আছে, তাহারা কষ্ট স্বীকার করিয়াও অন্য কলেজে ভর্ত্তি হইয়া থাকে, অথচ বেথুন কলেজই বোধ হয় কলিকাতায় মেয়েদের একমাত্র কলেজ যেখানে অল্পব্যয়ে শিক্ষা-লাভের সুযোগ আছে।

বেথুন কলেজ মেয়েদের সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত কলেজ, বাংলা দেশে আজ যে সব কৃতী, উচ্চশিক্ষিতা মহিলা আছেন, তাঁহাদের প্রায় অধিকাংশই উহার ছাত্রী, বাংলার মহিলাসমাজ তথা বাংলাদেশ ইহার নিকট শিক্ষা বিস্তারে প্রভূত ঋণী। বিগত কয়েক বৎসর ইহার ছাত্রীগণ পরীক্ষায় তেমন কৃতিত্ব প্রদর্শন না করিলেও এখনও দেশ এই কলেজের নিকট অনেক আশা করে। বর্ত্তমানে ছাত্রীদের চালানো নিতান্ত সহজ নহে

তাহারাও এখন সববিষয় জানিতে বুঝিতে চায়, অন্ধবিশ্বাসে গতানুগতিক পথ বাহিয়া চলিতে তাহারা স্বীকার পায় না, আত্ম-বিশ্বাস কর্ম্মের আগ্রহ তাহাদের মধ্যে দুর্জ্জয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অপরিণত বুদ্ধি লইয়া অনেক সময়ই হয়তো তাহারা ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারে না, নানাপ্রকার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, এমন সময়ে অত্যন্ত হৃদয়-বর্তী· স্থির-ধী ও সহানুভূতিসম্পন্ন অধ্যক্ষের প্রয়োজন। আমরা আশা করি শ্রীযুক্তা তটিনী দাস অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত কলেজটী পরিচালনা করিবেন।

উচ্চশিক্ষা অনর্থের আকর নহে

দেশের তীব্র বেকার সমস্যার জন্য সকলেই শিক্ষা-পদ্ধতির নিন্দা করিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই একশ্রেণীর লোক সর্ব্ব অনিষ্টের মূলকারণ বলিয়াও থাকেন, এই মনোভাবের ফলে সাধারণশ্রেণী বিদ্যাশিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িতেছে ফলে শিক্ষার প্রতি লোকের আগ্রহ কমিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা আমাদের হয়, এই নিরক্ষর দেশে যেখানে যতটুকু সম্ভব শিক্ষা বিস্তৃত হয়, ততটুকু আমাদের লাভ, উচ্চশিক্ষিতগণ যদি বেকার থাকিয়া অসন্তোষের সৃষ্টি করেন, তাহাতে ক্ষতি নাই, কারণ এই অসন্তুষ্ট-অবস্থা হইতেই প্রতিকারের উপায় হইতে পারিবে, স্কটিশচার্চ্চ কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ আর্কুট রোটারী ক্লাবে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে উচ্চশিক্ষার সম্বন্ধে এত সুন্দর-ভাবে আলোচনা করিয়াছেন যে এবিষয়ে আর বিশেষ কিছু না বলিয়া তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে নানা দেশের আদর্শ নানা রূপ। এক দেশে যে শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বলিয়া স্বীকৃত, অন্য দেশে তাহাই হয়ত স্কুলের শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত। যাহা হউক আপনারা আমাকে এই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে কিছু বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন, আমি সেই সম্বন্ধেই কিছু বলিতেছি।

দুর্ভাগ্যক্রমে দেশে এমন কতকগুলি রাজনৈতিক ঘটনা ঘটিয়াছে যে, তাহা সত্য সত্যই শোচনীয় এবং ঐ সকল ঘটনার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ জড়িত এই নিমিত্ত অনেকের নিকট বিশ্ববিদ্যালয় চক্ষুঃশূল, বিশ্ববিদ্যালয়ের নামোচ্চারণ মাত্রই তাঁহাদের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া ওঠে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র বিপ্লববাদী, বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রই যে বিপ্লববাদী এরূপ ধারণা অন্যায়। কোনও কোনও জাহাজ কাষ্ঠ নির্ম্মিত বলিয়াই কি ধারণা করিতে হইবে যে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সমস্ত জিনিষই জাহাজ?

অনেকে বলিয়া থাকেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা বর্ত্তমান যুগের উপযোগী নহে, তাঁহাদের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমিত্ত যে ব্যয় হয়, তাহা অপব্যয়, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় বেকার সমস্যার সমাধান না করিয়া তাহা উৎকট করিয়া তুলিতেছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় তেমন অতিরিক্ত কিছু নহে, এবং যাহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করে, তাহাদের অভিভাবকগণই ছাত্র-বেতন, ছাত্রদের গ্রাসাচ্ছাদন ইত্যাদির ব্যয় যোগাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ের অধিকাংশ বহন করিয়া থাকেন। সমালোচকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ের যে অংশ বহন করেন, তাহা নিতান্তই যৎকিঞ্চিৎ।

"বেকার সমস্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইয়া থাকে, বাঙ্গলার বাহিরের জনৈক সরকারী কর্ম্মচারী আমাকে বলিয়াছেন, তিনি ত্রিশ টাকা বেতনের কেরাণীগিরির জন্য বিজ্ঞাপন দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু গ্র্যাজুয়েটও ঐ পদের নিমিত্ত দরখাস্ত করিয়াছে অনেকের বিশ্বাস এইরূপ সামান্য বেতনের চাকুরীর জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রগণও দরখাস্ত করে বলিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু তাঁহারা বিস্মৃত হন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদিগকে সামান্য বেতন দেওয়া হয় বলিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত

যুবকগণের অপদার্থতা প্রমাণিত হয় না কোনও ব্যক্তির উপার্জ্জনশীলতা দ্বারা তাহার বিদ্যাবত্তার পরিমাপ করিতে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে।

"অনেকের ধারণা বৃত্তি শিক্ষার নিমিত্ত উপযুক্ত সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেই বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে কারণ বৃত্তি শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরাও চাক্‌রী পাইতেছে না। পাশ্চাত্য দেশে যতদূর সম্ভব উচ্চ-শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও দেশে প্রত্যাগমন করিয়া বহু যুবক বেকার বসিয়া আছে; তাহারা একটা মাত্র বৃত্তির উপযোগী শিক্ষালাভ করিয়াছে। ঐ বৃত্তি অবলম্বনের সুযোগ না পাইলে তাহারা একান্তই অসহায়। সাধারণ শিক্ষায় তাহারা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই, সুতরাং তাহাদের উদর যেরূপ বভুক্ষু তাহাদের মস্তকও তেমনি শূন্য; ব্যক্তিগতভাবে আমার মত এই যে আমাকে যদি বেকারও হইতে হয় তবে উচ্চশিক্ষার পরিপূর্ণ মস্তক লইয়া বেকার হওয়া আমি পছন্দ করি। উদর যদি ক্ষুধার্ত্ত হয় তাহা হইলে মস্তক শূন্য থাকিলে যে ক্ষুধার জ্বালার তীব্রতা কমে, তাহা নহে বরং উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বেকার হইলে সে কথঞ্চিৎ মানসিক শান্তি লাভ করিবার সুযোগ পায়।

"অনেক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে কিন্তু কম ছাত্রই সসম্মানে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হয়। তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় নিরাশ হইবার কিছু নাই। অতীতকালে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ন্যায় বৈজ্ঞানিক, এবং লর্ড সিংহ ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের ন্যায় ব্যবহারাজীব বাহির হইয়াছেন; ভবিষ্যতেও যে বাহির হইবেন না কে বলিতে পারে? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আদর্শ অন্য কোনও প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ অপেক্ষা হীন নহে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ সুযোগ্য স্যার সি ভি রমণের ন্যায় জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সেইদিন পর্য্যন্তও অধ্যাপকতা করিয়াছেন। দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা যতই অধিক হইবে, বিখ্যাত জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির আবির্ভাবের সম্ভাবনাও ততই অধিক হইবে বৃত্তিশিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপনের আমি বিরোধী নহি, যাহারা উচ্চ শিক্ষা লাভে অনিচ্ছুক, তাহাদের নিমিত্ত বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষারও আবশ্যকতা আছে। এমন দিন আসিবে যেদিন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ গ্রামে গ্রামে গিয়া জ্ঞানলোক বিস্তার করিবেন। পাশ্চাত্য দেশের পল্লী অঞ্চলের উন্নতির কৃতিত্ব বহুলবশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের, তদ্রূপ ভারতের পল্লীঅঞ্চলও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সাহায্যের প্রতীক্ষায় আছে।"

বেকার সমস্যা ও নারীশিক্ষা

বেকার সমস্যার জন্য উচ্চশিক্ষা কিরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা ডাঃ আর্কুটের বক্তৃতা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু তিনি নারীশিক্ষা বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বেকার সমস্যা নারীশিক্ষার সাক্ষাৎভাবে ও পরোক্ষে বিষম অন্তরায়। অনেকে হিট্‌লারবাদী হইয়া বলিতেছেন, শিক্ষিত যুবকগণই চাকুরী পান না, নারীগণ ও শিক্ষিতা হইয়া এদিকে ভিড় করিতে চাহিবে, সুতরাং তাহার চেয়ে তাহাদের শিক্ষা না দেওয়াই ভাল, অন্ততঃ স্কুল কলেজের শিক্ষা না দেওয়া উচিত কারণ তাহাতে এই চাকরীর উমেদারের সংখ্যা শুধু বৃদ্ধি করিবে। নারীশিক্ষার প্রতি মাত্র সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে, এখনও এদিকে তেমন উন্নতি হয় নাই, সে অবস্থায় এরূপ মনোবৃত্তি দেশে প্রসার লাভ করিলে শিক্ষার গতি বিশেষ ব্যাহত হইবে। চিন্তাশীলা মহিলাদের একথা বিশেষ ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

কুষ্ঠরোগে রাজবন্দী ধনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ঢাকার শ্রীধনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৯৩০ সনে বঙ্গীয় অর্ডিন্যান্স অনুসারে ধৃত হন। গত ২৬শে জুলাই দেউলী বন্দীনিবাস হইতে তিনি তাহার জেষ্ঠভ্রাতার নিকট চিঠিতে জানান যে দেওলী যাওয়ার পর হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে এবং তাঁহার দক্ষিণ হাতের তালু এবং দক্ষিণ পায়ের এক অংশে অনুভব শক্তির আকস্মিক হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। এই পীড়া ক্রমশঃ তাঁহার সমস্ত শরীরে ছড়াইতে থাকে। তাঁহার জোষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট চিঠি দেন। দেড়মাস পর সেই চিঠির উত্তর তিনি পাইয়াছেন। সেই চিঠিতে গবর্ণমেণ্ট নিরুদ্বেগে জানাইয়াছেন, "ধনেশবাবুর অসাড় কুষ্ঠ হইয়াছে, বন্দীনিবাসে তাঁহার চিকিৎসা চলিতেছে। চিন্তার কোন কারন নাই।" গত ১১ই অক্টোবর ধনেশবাবু তাঁহার এই মারাত্মক অসুখের বর্ণনা দিয়া তাঁহার দাদাকে যে মর্ম্মস্পর্শী ও করুণ চিঠিখানা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমরা গবর্ণমেণ্টের শত অভয় সত্ত্বেও তাঁহার জন্য চিন্তিত না হইয়া পারি না। তাঁহার এই কঠিন অসুখ, আটটা ইন্‌জেকসন্ দেওয়া সত্বে ও কোন ফল না পাওয়া মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয়। এই তরুণ বয়সে কোন সুদূর বন্দীনিবাসে অসহায়ভাবে ও বিনা চিকিৎসায় যদি তাহার সুন্দর জীবন নষ্ট হইয়া যায় তবে তাহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে শিক্ষিত ও সভ্য গবর্ণমেণ্ট পক্ষেও তাহা নিতান্ত লজ্জা ও অগৌরবের বিষয় হইবে, আমরা তাঁহার দেশবাসী তাঁর এ দারুণ দুঃখে তাঁহাকে কোন আশার বাণী শুনাইব? এই ভীষণ ব্যাধি হইতে তিনি শীঘ্রই নিরাময় হন তাহাই আমরা বেদনার সহিত একান্তভাবে প্রার্থনা করিতে পারি। ধনেশ বাবু কলিকাতার ট্রপিকেই চিকিৎসিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি গবর্ণমেণ্ট সহৃদয়তার সহিত বিচার করিয়া তাহার এ ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন।

হিন্দু অবলা সদন, ঢাকা

বাঙলা দেশে দিনে দিনে নারী হরণ ও নারী নিগ্রহের সংখ্যা যেরূপ বাড়ীতেছে তাহাতে মনে হয় দেশে বুঝি মানুষ নাই, যাহার রক্ত মা বোনের প্রতি এই অত্যাচারে গরম হইয়া ওঠে। এই ঘৃণিত ও অন্যায় কাজের প্রতিকার করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করা প্রত্যেক হিন্দুরই কর্ত্তব্য কারণ হিন্দু নারীই বেশীরভাগ নির্য্যাতিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে আত্মীয় স্বজন ও সমাজ পরিত্যক্ত নারীদের আশ্রয় দিবার জন্য উপযুক্ত আশ্রমের অত্যান্ত অভাব। এই কারণেই অনেক দুর্ভাগিনী অনিচ্ছা সত্বেও চিরজীবনের জন্য ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। এই অভাব কিছু পরিমাণে দুর করিবার জন্য ঢাকাতে হিন্দু অবলাআশ্রম নামে হিন্দু পরিচালিত একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। নির্য্যাতিতা ও নিরাশ্রয়া হিন্দু মেয়েরা যাহাতে একটা মাথা রাখিবার ঠাঁই পাইয়া শিল্প লেখাপড়া ইত্যাদি শিখিয়া সমাজে নিজের একটা স্থান করিয়া নিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠানটীকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আশা করা যায় সর্ব্বসাধারণ বিশেষতঃ হিন্দুরা এই মহৎ প্রচেষ্টাকে সফল করিবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

নেতৃহীন বাংলা

যে বাংলা চিরদিন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, যে দেশে চিত্তরঞ্জন ও সুরেন্দ্রনাথের মত প্রতিভাবান্ ও দেশ-প্রেমিক নেতার অভ্যুদয় হইয়াছিল, সে দেশে এখন একজন ও উপযুক্ত নেতা নাই ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য? নিতান্ত লজ্জার বিষয় হইলে ও সত্যি কথা তাই। ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ

করিয়া, ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবার পর হইতেই জনসাধারণের মনে দারুণ অবসাদ আসিয়াছে তাহারা মনে মনে বুঝিতেছে ইহা দ্বারা স্বাধীনতা লাভের আশা দুরাশা মাত্র। এখন তাই দেশ ব্যাপী অলসতা ও কর্ম্মহীনতা কিন্তু প্রাণে যাহাদের একবার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, পরাধীনতা ও দাসত্ব যাহাদের প্রতি নিয়ত বিদ্ধ করিতেছে আলস্যের আরাম তাহাদের কয় দিনের? অবসাদ ঐ তাহাদের বেশীদিন থাকিতে পারেনা। নূতন উৎসাহ ও আশার সঞ্জিবনীতে তাজা হইয়া তাহারা আবার তাহাদের পথ চলা সুরু করে। জহরলালের কারামুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাই চতুর্দ্দিকে যেন সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে কর্ম্ম পদ্ধতি লইয়া নানা আলোচনা চলিতেছে কিন্তু বাংলা কি করিতেছে? হতাশার ভাব কাটাইয়া নূতন উৎসাহে সে কেন কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতেছেনা? ইহার কারণ কি কর্ম্মীর অভাব? তা' মোটেই না। কর্ম্মীর সংখ্যা বাংলার অন্য দেশের তুলনায় বেশী ছাড়া কম নয়, কিন্তু তাহাদের এই মারাত্মক অবসাদ দূর করিতে হইলে চাই উপযুক্ত নেতা যে তাহাদের পরিচালনা করিতে পারিবে। সেই সর্ব্বত্যাগী, স্বার্থলেশশূন্য নেতার উদয় কবে হইবে, কবে বাংলার এই নেতৃহীনতার কলঙ্ক ঘুচিবে? আমরা সেই আশায় বসিয়া আছি।

হিন্দুমহাসভা ও পণ্ডিত জহরলাল

সম্প্রতি হিন্দু মহাসভার প্রতি পণ্ডিত জহরলাল যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। সব বিভেদ ও মত বিরোধ ভুলিয়া একাগ্রমনে যখন স্বাধীনতার মহান আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন; সেই সময়ে বৃথা উত্তেজনায় দলাদলি করিয়া শক্তি ক্ষয় করিলে কি লাভ আমরা বুঝিতে পারি না। মুসলমানেরা তো সর্ব্বদাই নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিতে ব্যস্ত আর কোনদিকে তাকাইবার সময় তাঁহাদের নাই। সেই স্বার্থের মহাসাগরে হিন্দুরা যাহাতে তাহাদের বৈশিষ্ট্যসহ একেবারে ডুবিয়া না যায় সেজন্যই ১৯০৪ সনে হিন্দুমহাসভা স্থাপিত হইয়াছিল। তা ছাড়া নানাস্থানে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের অত্যাচার যাহাতে আর না সম্ভব হয় সেজন্য সব হিন্দুদের এক করাও হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য। কাজেই সহজেই বুঝা যায় রাজনীতি ও কংগ্রেসের সঙ্গে হিন্দু মহাসভার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই তবে ইহাও সত্য যে সাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়াচ থাকিলেও ইহাকে সম্পূর্ণরূপে একটী সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলা চলে না। ইহা সত্ত্বেও পণ্ডিত জহরলাল হিন্দু মহাসভাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়া বলিয়াছেন, "হিন্দু মহাসভার কার্য্যপ্রণালী জাতীয়তাবিরোধী, প্রতিক্রিয়ামূলক, দুর্গতিজ্ঞাপক এবং অদূরদর্শী"। এই উক্তিতে হিন্দু মহাসভার নেতাগণও উত্তেজিত হইয়া তীব্রভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহারা নরমপন্থী ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতা অল্পবিস্তর কামনা করিলেও জহরলালজীর মত বিজ্ঞ ব্যক্তির এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করা ঠিক হয় নাই। ভাই পরমানন্দ সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দু মহাসভা সম্বন্ধে লোকের ভ্রান্ত ধারণা ঘুচাইবার জন্য ও জহরলালের উক্তির প্রতিবাদ করিবার জন্য একটী বিবৃতি দান করিয়াছেন। আমরা আশা করি, ইহার পর আর বাকবিতণ্ডা করিবার প্রয়োজন থাকিবে না।

শিক্ষাসমস্যার মীমাংসা

এবার কলিকাতায় লাট-প্রাসাদে শিক্ষা-সম্মিলন বসিয়াছিল। দেশের বড় বড় শিক্ষাবিদ্গণ ইহাতে যোগদান করিয়া শিক্ষা-সমস্যার সুমীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী ও উপস্থিত ছিলেন, আমরা সেজন্য বৈঠকের ফলাফল জানিতে আগ্রহান্বিতই ছিলাম। বৈঠকশেষে আমাদের একেবারে নিরাশ হইতে হইয়াছে, এমনকি আমরা

অত্যন্ত আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছি। বৈঠকে শিক্ষা-সমস্যা দূর করিবার জন্য প্রস্তাব হইয়াছিল যে, বর্ত্তমান হাইস্কুলগুলি অকেজো, সুতরাং সেগুলির অধিকাংশ উঠাইয়া দিয়া অল্প কয়েকটী উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় দেশে থাকিবে, অবাঞ্ছনীয় বিদ্যালয়গুলি উঠাইয়া দিয়া যে অর্থ সাশ্রয় হইবে, তাহাদ্বারা অবশিষ্ট স্কুলগুলির উন্নতি করিতে পারা যাইবে। তাছাড়া যে স্কুলগুলি রাখা হইবে, সেগুলি যাহাতে একস্থলে না পড়ে, দেশে বিভিন্ন জেলায় জেলায় থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইবে, বিদ্যালয়গুলি ছাত্রাবাস সমন্বিত করিতে হইবে।

বিদ্যালয় হ্রাস করা সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রীর আগ্রহ খুব বেশী, ইহাতে আমাদের বিস্মিত করিয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। পাঁচ কোটী বাঙ্গালীর দেশে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র বারশত অর্থাৎ প্রতি পাঁচলক্ষে বারটী বিদ্যালয়, এই মুষ্টিমেয় বিদ্যালয়গুলি তুলিবার কেহ প্রস্তাব করিতে পারে ইহা আমাদের কল্পনায়ও আসে নাই। অথচ শিক্ষামন্ত্রী প্রমুখ মহারথীগণ এছাড়া আর কোন পথ দেখিলেন না, বিদ্যালয়গুলির অবস্থা আশানুরূপ না হইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রতিকার উপায় কি সেগুলি সমূলে উৎপাটিত করা, এযে রোগীকে মারিয়া রোগের চিকিৎসা করা। কতকগুলি তুলিলে অন্যগুলির উন্নতির জন্য অর্থ পাওয়া যাইবে, এই যুক্তির প্রশংসা করিতে পারা যায় না। এদেশে বিচার-বিভাগে, পুলিশ বিভাগে, সিভিলিয়ানদের মোটা মাহিনা দিতে যে পরিমাণ অর্থব্যয়, সেতুলনায় অতি সামান্য অংশই শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় আর এই বিভাগেই অপব্যয় হয় বলিয়া অভিযোগ, এও বাঙ্গালী স্থিরভাবে শোনে। ধনীর ধনে ভাগ বসাইতে সাহসের প্রয়োজন, বিদুরের ক্ষুদকণা কাড়িয়া লইতে কোন ভাবনা নাই।

বাংলার হাইস্কুলগুলির অধিকাংশ বেসরকারী বিদ্যালয়, খাস গভর্ণমেন্টের ও সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা অতি নগণ্য। এই বেসরকারী বিদ্যালয়গুলি বাঙ্গালীর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দানে পরিপুষ্ট, তাছাড়া ছাত্র-বেতনে-ই ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। সুতরাং এগুলি তুলিয়া দিলেও ইহার অর্থ অন্য বিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে কিরূপে যাইবে, আমরা বুঝিতে পারি না। তবে ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া সেগুলির সামান্য অর্থাগম হইতে পারে মাত্র।

তারপর বিদ্যালয়গুলি জেলায় স্থাপিত করা সম্পর্কেও অনেক ভাবিবার আছে। সরকারী বিদ্যালয় ব্যতীত যে ব্যক্তি বা যে গ্রামের অধিবাসীগণ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহারা তাঁহাদের অভিরুচিমত স্থান-ই নির্ব্বাচন করেন, যদি সেরূপ করিবার সুযোগ না থাকেন বা কিছু বাধা থাকে, অনেক স্থলে দাতার প্রেরণা অঙ্কুরেই বিনাশ পাইবে। পরোপকার প্রবৃত্তি যেমন এরূপ কাজে অনুপ্রেরণা দেয়; খ্যাতি, নাম করিবার ইচ্ছা, গ্রামবাসী বা প্রতিবেশীর আনুকূল্য করিবার ইচ্ছাও ইহার পিছনে থাকে।

যে যে স্কুলগুলি উঠিয়া যাওয়ার প্রস্তাব হইয়েছে, তাহার ছাত্রগণ কোথায় যাইবে, দূরবর্ত্তী বিদ্যালয়ে হাঁটিয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না, অবশ্য ছাত্রাবাস-সমন্বিত বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাবে ইহার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু উহা বহুব্যয়সাধ্য, আদৌই করা হইতে পারিবে কিনা সন্দেহ, হইলেও দরিদ্র বাঙ্গালী ছাত্রগণ এই ছাত্রাবাসের সুবিধা নিতে বহুস্থলেই অপারগ হইবে।

এই সঙ্গে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে স্কুলগুলি বিপ্লবীদের আড্ডা বলিয়া সরকার পক্ষ হইতে এইগুলি অধীনে আনিবার একটা প্রয়াস পরিলক্ষিত হইয়াছে। শিক্ষালয় যত অল্প সংখ্যার হয়, এদিকে তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতে তত সুবিধা হয় কিন্তু যে সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যার অন্তর্গত, শিক্ষা-সম্মেলন তাহার উপযুক্ত স্থান নয়, সুতরাং সেহিসাবে আলোচনা করিতে হইলে খোলাখুলি ভাবেই বলিয়া করিলেই ভাল। তাহা হইলে কার্য্য ও কারণের একটা সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায়, দেশবাসীও কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবার পূর্ব্বে চোখখোলা রাখিয়া বিচার করিতে পারে।

ঢাকার আনন্দ-আশ্রম

ঢাকার আনন্দ-আশ্রম সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, মহিলাদের অতিস্বল্পব্যয়ে কার্য্যকরী শিল্পবিদ্যা শিখাইবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। ইহার বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন কার্য্যশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, এতদভিন্ন বিদ্যাচর্চ্চায় ও সবিশেষ সুবিধা আছে। মাত্র অল্পকাল মধ্যে ইহা আশাতীত উন্নতি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরের বার্ষিক কার্য্যবিবরণীখানা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা উহাতে আশ্রমের সাফল্য বিশেষভাবে বুঝিতে পারি, ঢাকার এই প্রতিষ্ঠানের জন্য আমরা গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। স্থানাভাবে উহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব হইল না।

নারী-হরণের সংখ্যা সম্বন্ধে সরকারের মত

পার্লামেণ্টে জনৈক সদস্য প্রশ্ন করেন যে, বাংলার নারীহরণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহার প্রতিকারের জন্য গভর্ণমেণ্ট কি ব্যবস্থা করিয়াছেন। সরকারের জবাব এই যে যদি ও গভর্ণমেণ্ট নারীহরণের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন, কিন্তু বাংলার নারীহরণ বৃদ্ধি পাইয়াছে একথা বলা যায় না।

সেদিন ঢাকার বড়লাটও এইরূপ বলিয়াছিলেন যে বর্ত্তমানে সংবাদপত্রে প্রচারাদির ফলে ও নানা প্রতিষ্ঠানের জন্য এই ধরণের কুকার্য্য লোকের দৃষ্টিগোচরে আসিতেছে, বাস্তবিক পক্ষে নারীহরণের সংখ্যাবৃদ্ধি পায় নাই।

আমাদের বিশ্বাস অন্যরূপ, সমাজের ভয়ে, লোকলজ্জায় এইধরণের কলঙ্ক অতি সামান্যই প্রকাশ পায়, সংবাদপত্রে কতটুকু আর প্রচার হয়। সুতরাং বৃদ্ধি পায় নাই বলিয়া চুপ করিয়া থাকিবার কথা নাই। লাঞ্ছিত নারীদের আর্ত্তনাদে দেশের বাতাস বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, এখন কি এবিষয়ে সামান্য বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে তাহা নিয়া চুলচেরা বিচার করিবার সময় আছে। ইহা এমন একটী ঘৃণিত কার্য্য যে কোন মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। সরকারী, বে-সরকারী সকলে সহযোগিতা করিয়া অবিলম্বে এপাপ দমনে সবিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন।

ভুল সংশোধন (অগ্রহায়ন, ১৩৪০ সন ৯৪৬ পৃষ্ঠা, ৬ষ্ঠ প্যারা)

ভুল।	শুদ্ধ।
সমালোচ্য গ্রন্থে 'অস্থায়ী' লেখা হয়েছে। প্রথমে মনে হ'ল এটি ছাপার ভুল, কিন্তু পরে দেখা গেল যে গ্রন্থের সর্ব্বত্রই ঐরূপ আকার যোগ করা হয়েছে।	সমালোচ্য গ্রন্থে আস্থায়ী শব্দটির স্থলে 'অস্থায়ী' লেখা হয়েছে। প্রথমে মনে হ'ল এটি ছাপার ভুল, কিন্তু পরে দেখা গেল যে গ্রন্থের সর্ব্বত্রই ঐরূপ আকার লোপ করা হইয়াছে।

Printed & Published by Bibhati Sen, 23 Wyer Street, Wari, from Wari Printing Works, Dacca.

তৃতীয় বর্ষ | মাঘ, ১৩৪০ | দশম সংখ্যা

আমার রাজা প্রাসাদ ত্যজি এলো কি মোর আশে

শ্রীমমতা মিত্র

গভীর রাতে শুন্‌ছি জেগে নিবিড় অন্ধকারে
বাজ্‌ছে গান বীণার তারে তারে,
এসেছি যারে ফেলিয়া দূরে ভুলেছি যার স্মৃতি
সে কি আমায় শোনায় এমন গীতি ?
সবাই যখন ঘুমায় সুখে সুষুপ্তির কোলে
বেদন আমার বক্ষ ভরি তোলে।
বাতাস বেয়ে আস্‌ছে ঘরে [illegible]
শোনায় কানে ভাল[illegible]
সুরঙ্গমা, দেখ্‌ত চেয়ে[illegible]
কাহার সুর আস্[illegible]
এই রাগিণী জাগায় ম[illegible]
বিস্মরণের সাগর হ'[illegible]
তুচ্ছ রূ[illegible]ান হ'য়ে ভর্‌ল আমার [illegible]
হারিয়ে গেল তাইত পরম ধন।

বাহির মোরে ক'রল পাগল চাইনি ভিতর পানে
ফিরেছি ঘুরে রূপের প্রবল টানে।
চোখের ক্ষুধা মিটল আজ হৃদয় ক্ষুধাতুর
পাই না সুধা, রিক্ত চিত্তপুর।
নিশীথে রোজ শুনি গো আমি যেন বীণার ধ্বনি,
ঘুমের ঘোরে স্বপন মনে গণি।
আজকে কেন উতল হ'ল আমার সারা প্রাণ
বীণার এই শুনে করুণ তান ?
[illegible]র রাজা প্রাসাদ ত্যজি এল কি মোর আশে
খোলা আমার বাতায়নের পাশে ?
[illegible]র সেই অসীম প্রেম বীণার তারে তারে
কত না রূপ ফুটছে বারে বারে।
জাগো, জাগো সুরঙ্গমা, দেখ বারেক তরে
কে জাগে ঐ একলা পথ পরে।

* * * *

মার্শল হনিসুইট

শ্রীআমোদিনী ঘোষ

ইংরেজদের বিপক্ষে আমরা লড়্‌ছিলুম। ওদের সেনা নায়ক ছিলেন, ওয়েলিংটন আর আমাদের সেনাধ্যক্ষ মার্শল মশিনা। যুদ্ধ হচ্ছিল ১৮১০ খৃষ্টাব্দে পোর্টুগাল প্রদেশে। আমরা ওদের হারিয়ে দিচ্ছিলাম।

ওয়েলিংটনকে সসৈন্যে হঠিয়ে আমরা একেবারে ট্যাগাস্ নদীতে নিয়ে ফেল্লুম।

কিন্তু লিস্‌বন থেকে আমরা যখন পঁচিশ মাইল দূরে তখন দেখা গেল, সেখান থেকে টোরিস্ ভেড্রাস্ পর্য্যন্ত সমস্তটা পথ নিরবচ্ছিন্ন সুদীর্ঘ দুর্গ শ্রেণীর দ্বারা ওরা সুরক্ষিত করে রেখেছে।

এই জন্যেই, সঙ্কটে পড়্‌লে ওর পেছনে ওঁরা যেন চলে যেতে পারেন।

হোল ও তাই।

আমরা যখন টোরিস্ ভেড্রাস্ এ পৌঁছলুম তখন ওরা রইল ওদের লাইনের পেছনে, আমরা রইলুম সম্মুখে।

এগোবার পথ বন্ধ। থাম্‌লুম আমরা ঐখানে। লড়াইর জন্য মন ছটফট্ কর্চ্ছে—তবু অলস ভাবে বসে থাক্‌তে হোল ওখানে ছয়টি মাস।

আমার ডাক পড়্‌ল একদিন মশিনার তাঁবুতে। আমি ছিলুম তাঁর প্রিয়পাত্র একজন, সুতরাং গেলাম খুসী মনে।

একলা বসেছিলেন। করতলে ন্যস্ত কপোল, ললাট গভীর রেখাঙ্কিত। আমাকে দেখে একটু খানি হেসে বল্লেন, "সুপ্রভাত কর্ণেল জেরার্ড।" বল্লুম, "সুপ্রভাত মার্শল।"

"তোমার সেনারা কেমন আছে?"

"সাত শ তেজী ঘোড়ার ওপর সাত শ তেজী বীর যেমন থাকে।"

"আর, তোমার ক্ষত? শুকিয়েছে সে সব [illegible]

"আমার ক্ষত কখনও শুকোয় না মা[illegible]

"বটে? তা, শুকোয় না কেন?"

'যেহেতু পুরাণোর জায়গায় নতুন ক্ষত [illegible] হয় সর্ব্বদাই।'

মার্শল একটু হেসে বল্লেন, 'আমি কিন্তু তোমাকে তোমার ঐ ক্ষত গুলোর জন্যেই এতদিন ডাকিনি।'

---

* সার আর্থার কোনান ডয়েল লিখিত 'মার্শল হনিসুইট' উপন্যাসের অনুবাদ।

'আপনার এ কথায় আমি ক্ষতের চেয়ে বেশী বেদনা পেলুম।'

'কিছু মনে কোরো না ওতে। ইংরাজরা ওদের লাইনের পিছনে দাঁড়ানো অবধি আমরা একেবারে বসে আছি। এখন আমাদের চল্‌তে হবে।'

'কোন্ দিকে? সমুখের পথে?'

'না, ফিরে যেতে হবে আমাদের এখন।'

আমার চোখ ফেটে জল এল। ওয়েলিংটনকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে আমাদের ফিরে যেতে হবে।

একটু খানি অসহিষ্ণুভাবে মশিনা বল্লেন, কি কর্ব্ব আমরা! এ দুর্গের বেড় ভেদ করে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব কাজ। লোকক্ষয় ও আমাদের ত কম হয় নি! এদিকে ছ'মাসের ওপর আমরা এখানে বসে আছি—রসদ গেছে ফুরিয়ে—আমাদের ফিরে যাওয়া ছাড়া এখন উপায় কি? এ গাঁয়ে এক সের ময়দা বা এক বোতল মদ পর্য্যন্ত নেই!'

'লিসবনে ময়দা আর মদ আমরা যথেষ্ট পেতে পারি।'

'তা পেতে পারি। কিন্তু আমাদের এই বৃহৎ সৈন্য বাহিনী নিয়ে আমরা ত তোমার একদল অশ্বারোহী সৈন্যের মত ফস্ করে ওদের ঘায়েল করে বেরিয়ে পড়্‌তে পার্ব্বনা। সে যাক, আমি তোমায় ডাকিয়েছিলুম, অন্য একটা বিশেষ কাজে—এর জন্য নয়।'

আমি কাণ খাড়া ক'রে রইলুম। মশিনা মস্ত একটা ম্যাপ টেবিলের ওপর খুলে ধরে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন, এই হচ্ছে সান্তারেম, এর পঁচিশ মাইল দূরে হচ্ছে—য়্যালমিক্সাল। ওখানে আছে প্রকাণ্ড একটা মন্দির।'

আমি মাথা নাড়লুম, কি যে আস্‌ছে সাম্‌নে তার একটা অনুমান ও কর্ত্তে পার্লুম না।

মশিনা বল্লেন, 'মার্শল হনি সুইটের নাম শুনেছো কি?'

'যতগুলি মার্শল আছেন, সবার নীচেই আমি লড়ে এসেছি—কিন্তু এ নাম ত আমার পরিচিত নয়।'

'এ তার আসল নাম নয়। সৈন্যেরা তাকে ডাকে ঐ নামে। তুমি কয়েক মাস আমাদের কাছে ছিলে না, তাই ও নামটা তুমি শোনো নি। লোকটা পর্ত্তুগীজ, সুশিক্ষিত। মিষ্টি ব্যবহারের জন্য লোকে ওকে ঐ নাম দিয়েছে। য়্যালমিক্সালে এর কাছে আমি তোমায় পাঠাতে চাই।'

'যে আজ্ঞে।'

'শুধু তাই নয়, ওকে [illegible] দেরী না করে সাম্‌নে যে গাছটা দেখ্‌বে, তারই ডালে ওকে ফাঁসী লট্‌কে দেবে।'

'যে আজ্ঞে' বলে বেরিয়ে এলুম।

পেছন থেকে মশিনা ডেকে নিয়ে আবার বল্লেন, 'কর্ণেল, যাওয়ার আগে ব্যাপারটা কি তা তোমার জেনে রাখা ভাল। হনিসুইট লোকটা সাহসী ও যেমন, উদ্ভাবনপটুও তেমন।

পদাতিক সৈন্যের ও ছিল সেনাপতি। তাস খেলায় প্রবঞ্চণার জন্য ওকে পদভ্রষ্ট করা হয়, তখন ও কতগুলি দল ছেড়ে বেরিয়ে পড়া পর্ত্তুগীজ সৈনিক নিয়ে পর্ব্বতে গিয়ে বাসা বাঁধলে। যত রাজ্যের যত নাম কাটানো সেপাইরা গিয়ে জুট্‌ল ওর সঙ্গে। এই ক'রে পাঁচ শ সৈন্যের সেনাপতি হয়ে য়্যালমিক্সালের ধর্ম্ম মন্দির সে এখন হস্তগত করেছে। ঐ মন্দিরে সন্ন্যাসী যারা ছিল, তাদের সে দিয়েছে তাড়িয়ে। মন্দিরটাকে ওরা দুর্গের মত ক'রে সুরক্ষিত করে চারিদিক থেকে লুটপাট করে এনে ঐখানে সব্ জমাচ্ছে।'

লোকটার ওপর অশ্রদ্ধা ও বিরাগে মনটা উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌ল, বল্লুম্, 'ওকে অনেক আগেই ফাঁসি লটকানো উচিত ছিল।'

বেরিয়ে যাচ্ছি চট্‌পট্—মার্শল আমার অধীরতায় হেসে আমায় থামিয়ে বল্লেন, 'তোমার দুটো কাজ কর্ত্তে হবে। এই দুর্ব্বৃত্ত লোকটাকে শাস্তি দেবে—আর ডাকাতের দলটা ছত্রভঙ্গ করে দেবে। মাত্র পঞ্চাশ জন লোক আমি তোমায় দেব। তার থেকেই তুমি বুঝতে পার্ব্বে, তোমার ওপর আমার বিশ্বাস ও নির্ভর—কতখানি!'

অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলুম। এ রকম একটা অসম সাহসিক কাজে মাত্র পঞ্চাশ জন লোক!

মশিনা আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, 'আচ্ছা, যদি তুমি প্রয়োজন বোধ করো তবে না হয় আর কিছু লোক দেওয়া যাবে। কাল সকালে আমরা যাত্রা সুরু কর্ব্ব। ওয়েলিংটনের অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা যে রকম তাতে আমাদের তরফের অশ্বারোহী সৈন্য যা আছে তার একজনও আমি কমাতে পার্ব্ব না। এর দ্বারাই যা পারো তা তোমার কর্ত্তে হবে। কাল রাত্রিতে আমরা থাক্‌ব য়্যাব্রাণ্টিস্‌এ, সেই খানে তুমি আমার কাছে তোমার কাজের রিপোর্ট দেবে।"

আমার ওপর এত বড় একটা কাজের ভার অর্পণ ক'রে মার্শল আমাকে গৌরবান্বিত কর্ল্লেন, সন্দেহ নেই—কিন্তু পঞ্চাশ জন মাত্র লোক নিয়ে দুর্জ্জয় এক ডাকাতের বেড়া ভাঙ্গব, আর তাদের দলপতিকে ফাঁশী লট্‌কাবো—এ ও ত বড় মুস্কিলের কথা!

তবে—এই পঞ্চাশ জন আমার নিজের অজেয় অশ্বারোহী সেনা! ভয় গিয়ে ভরসা এল মনে। বাহিরে প্রসন্ন সূর্য্যালোকে দাঁড়িয়ে মনে আশার ও সঞ্চার হ'তে লাগ্‌ল, ভাবলুম হয়ত আমার এই সাফল্যের জন্যে আমার চিরদিনের আকাঙ্ক্ষিত মেডেলটি হয়ত জুটে যাবে এবার!

পঞ্চাশ জন আমার দল থেকে খুব হিসেব ক'রে আমি বেছে নিলুম। জর্ম্মাণ যুদ্ধের সময়কার প্রবীণ সম্মানিত যোদ্ধা তারা—কেউ পেয়েছে তিন্‌টে ষ্ট্রাইপ, কেউ পেয়েছে দুটো। গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ অশ্বরাজির পিঠে বিছানো চিতাবাঘের ছালের ওপর রজত ধূসরের পরিচ্ছদে, মাথায় রক্ত পালকের টুপি—ওদের শ্রেণীবদ্ধ করে যখন দাঁড় করালুম, তখন গর্ব্বে ও আনন্দে আমার হৃদয় স্পন্দিত হ'তে লাগ্‌ল। আমার বিপুলকায় কৃষ্ণবর্ণ রণ তুরঙ্গমে আরোহণ করে আমি ওদের

পুরোবর্ত্তী হয়ে দাঁড়ালুম, ওদের রৌদ্রদগ্ধ তাম্রবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, আমার মত ওদের বক্ষ ও বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে অননুভূত গর্ব্বে ও আনন্দে।

ক্যাম্প ছাড়িয়ে নদী পার হয়ে আমরা চল্লুম। সম্মুখে রাখ্‌লুম, য়্যাড্‌ভান্স গার্ডদের, আমি রইলুম সৈন্যদের পুরোভাগে। সাস্তারেনে এর ওপর শৈলমালা থেকে একবার ফিরে চাইলুম। চোখে পড়্‌ল দিগন্তে তরুপুঞ্জের মত মশিনার সৈন্য শ্রেণীর অন্ধকার রেখা, তার মাঝে মাঝে বেয়োনেট ও তরবারির ফলকে সহসা বিচ্ছুরিত প্রদীপ্ত আলোক। দক্ষিণে এখানে ওখানে ছড়ানো ইংরাজ সৈন্যের আউট পোষ্ট। তার পিছনে ওয়েলিংটনের ক্যাম্প থেকে অন্ধকার ধূম-কুণ্ডলী শূন্যপথে বিসর্পিত গতিতে উঠ্‌ছে। দূরে—পশ্চিম দিগ্বলয়ে লীন নীল সমুদ্র, ইংরাজদের জাহাজের শুভ্র পাল তার স্থানে স্থানে শ্বেত বিন্দুর মত শোভা পাচ্ছে।

আমরা চল্‌ছিলুম পূব দিকে। ফরাসী ও ইংরাজদের অনেক দূর দিয়ে সে পথ। তবু শত্রু পক্ষের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষের ভয় নেহাৎ কমও ছিল না। ওদের দলের স্কাউটরা আর আমাদের দলের লুণ্ঠনেচ্ছু সৈনিকরা সমস্ত দেশটা ভরেই ঘুরছিল। আমরা খুব সন্তর্পণে গোলযোগ বাঁচিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লুম।

সারাটা দিন আমরা নির্জ্জন অনুচ্চ পর্ব্বতমালার পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চল্লুম। নীচের দিকটা তার নব মুকলিত দ্রাক্ষাকুঞ্জে সুশোভিত, কিন্তু শ্যামল থেকে ক্রমশঃ ধূসর হয়ে ওঠা দিগন্তলীন বন্ধুর উদ্দগাতাঙ্গে ওর ওপরের দিকটা দেখাচ্ছিল খেতে না পেয়ে শুকিয়ে ওঠা ঘোড়ার বিরোম পৃষ্ঠদেশের মত।

অনতিগভীর পার্ব্বত্য নদী ও কয়েকটি পড়্‌ল সম্মুখে, স্রোত তাদের পশ্চিমাভিমুখে। একবার একটা খরস্রোতা বড় নদীর সম্মুখে পড়্‌লুম। সে নদী পার হওয়ার আমাদের কোনো আশাই ছিল না। কিন্তু ইতস্ততঃ পর্য্যবেক্ষণ করে একটি জায়গা দিয়ে দুপাশে মুখোমুখী তৈরি বাড়ীগুলি দেখে ওর অগভীর অংশটা অনুমান করে আমরা উৎরে গেলুম। কোন স্কাউট যদি সেখানে উপস্থিত থাক্‌ত, তাহ'লে তারা তৎক্ষণাৎ এই সন্ধানটা আমাদের বাৎলে দিতে পার্ত্ত। কিন্তু সেখানে জন মানবের লেশত ছিলই না—একটা ছাগল মহিষ পর্য্যন্ত ছিল না। শুধু মাথার উপরে গভীর কৃষ্ণ মেঘ স্তূপের মত বৃহৎ বায়সযূথ উড়ে চলেছিল।

অস্তোন্মুখ সূর্য্যালোকে আমরা একটা গ্রামে এসে পৌঁছ্‌লম। মধ্যভাগ তার বেশ খোলামেলা, কিন্তু দুই পাশ বৃহৎকায় ওক গাছে ঢাকা। য়্যালেক্সিমেল ওখান থেকে মাইল খানেকের বেশী হবে না। শীত শেষ না হ'তেই বসন্তের আবির্ভাবে প্রপর্ণ বনানী নব কিসলয়ে সজ্জিত হয়েছে। আমরা তারই অন্তরালে আত্মগোপন করে প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িগুলোর গা ঘেঁষে চল্‌তে লাগ্‌লুম।

একজন অগ্ররক্ষী হঠাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে এসে আমাকে অভিবাদন করে বল্লে, 'কর্ণেল, এই উপত্যকার ওপিঠে ইংরাজদের ছাউনি।"

জিজ্ঞাসা কল্লুম—"পদাতিক, না অশ্বারোহী সৈন্য?" "অশ্বারোহী সৈন্য। ওদের বেয়োনেটের ঝক্‌মকানি দেখেছি, আর ঘোড়ার হ্রেষারব ও কাণে এল।"

আমার সৈন্যদের থাম্‌তে হুকুম দিয়ে আমি ত্বরিত বনপ্রান্তে গেলুম। সংবাদটা নিঃসংশয়িত সত্য। একদল ইংরাজ সৈন্য আমাদের সঙ্গে আমাদের গন্তব্য স্থলাভিমুখে চলেছে। বৃক্ষরাজির অন্তরালে তাদের রক্তবর্ণ টুপি ও অস্ত্রের দীপ্তি আমার চোখে ও পড়্‌ল। একবার ওরা একটা খোলা জায়গা অতিক্রম করে গেল—দেখ্‌লুম দলে ওরা আমাদেরই সমান,—পঞ্চাশজন অশ্বারোহী একজন সেনানায়কের অধীনে। পঁচিশজন করে দুই সারিতে চলেছে।

কোন সমস্যার সমাধান কর্ত্তে অথবা কর্ত্তব্য নিরূপণ কর্ত্তে আমার কখনো সময় লাগ্‌ত না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। এই নবাগত অশ্বারোহী দলের সঙ্গে যুদ্ধ করা একদিকে যেমন লোভনীয় ব্যাপার অন্যদিকে এদের সঙ্গে যুদ্ধে যদি আমার লোকক্ষয় ঘটে, তবে—যে আদেশ আমি পালন কর্ত্তে নিযুক্ত হয়েছি—বলহানি প্রযুক্ত তাহা পরিপূরণ করা আমার হবে অসাধ্য।

আমার ঘোড়ার উপর বসে অরণ্যের আলোকিত দূর প্রান্তের দিকে চেয়ে এই কথাগুলি আমি মনে মনে আন্দোলন করছি, এমন সময় ওদের দলের লালকোট-পরা একজন লোক গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আমার দিকে এসে ওর সঙ্গীদের ডাক দিল।

জন তিনেক লোক এল ওর ডাকে। একজন ছিল তার ভিতর বিউগ্‌লার, সে উচ্চনাদে তার বিউগ্‌ল্‌ বাজাল,—তার আহ্বানে সমগ্র সৈন্যদল শ্রেণীবদ্ধ হয়ে ওখানে এসে দাঁড়াল। আমার সৈন্যদের ও আমি তৎক্ষণাৎ ওদের মতকরে শ্রেণীনিবদ্ধ করে দাঁড় করালুম। মাঝখানে রইল শ দুই হাত তৃণ ভূমি।

ওদের দিকে আমি চাইলুম। কি গর্ব্বদৃপ্ত ভঙ্গিমায় ওরা আমাদের অপেক্ষা কচ্ছিল! গায়ে ওদের রক্তবর্ণ কোট, মাথায় রৌপ্য শিরস্ত্রাণে চূড়ার মত শুভ্র পালক গুচ্ছ নিবদ্ধ, কটিতটে ঝলকিত উন্মুক্ত তরবারি। ওরা ও আমাদের দিকে চেয়ে রইল অমনি প্রশংসমান দৃষ্টিতে।

দুইদলের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট বৈলক্ষণ্য ও ছিল। ওরা ছিল আমাদের চেয়ে ঢের ওজনে ভারী এবং ওদের ধাতব সজ্জা ও পরিচ্ছদে নিবদ্ধ অস্ত্রফলক দর্পণফলকের মত আমাদের চেয়ে ছিল সমুজ্জ্বল। ওয়েলিংটনের নিয়ম অনুসারে ওদের তা প্রত্যহ পালিশ কর্ত্তে হোত—আমাদের সে নিয়ম ছিল না। অপর পক্ষে ওদের কোট ছিল এমন আঁটশাঁট, যে তরবারি চালনার পক্ষে তা কোনো মতেই প্রশস্ত ছিল না। আমাদের ও অসুবিধাটা ছিল না।

হঠাৎ ওদের পক্ষের সেনাপতি দ্বন্দ্বে আহ্বানের মত উর্দ্ধে তরবারি উত্তোলন করে তৃণভূমির উপর দিয়ে আমার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে।

মদমত্ত অশ্বের উপরে অধিষ্ঠিত মদমত্ত বীর! গর্ব্বোন্নত শির পিছনে একটুখানি হেলানো, কটিতটে কোষমুক্ত তরবারি, মাথায় শিরস্ত্রাণের চূড়ায় আন্দোলিত শুভ্র পালক গুচ্ছ, একাধারে মিলিত যৌবন শৌর্য্য ও সাহসের ছবি! অতৃপ্ত নয়নে আমি চেয়ে রইলুম তার দিকে!

আমি অবহিত হবার আগে অবহিত হোল আমার সুশিক্ষিত পুরাতন অশ্ববর র‍্যাটাপ্ল্যান। ওকে চালনা করার অপেক্ষা না রেখেই আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে ও ছুটে চল্ল।

যে সব জিনিস জলরেখার মত আমার স্মৃতিপথ হতে সহজে অপসারিত হোত না—বীর্য্যোদ্ধত অশ্ব তার মধ্যে একটি। অশ্বও অশ্বপৃষ্ঠে আসীন আমার পুরোবর্ত্তী প্রতিদ্বন্দীকে দেখে অবধিই একটা বিস্মৃত-প্রায় পরিচয়ের আভাষ আমার মনে জাগ্‌ছিল। কোথায় দেখেছি একে কোথায়—প্রশ্নটা আমার মনের মধ্যে ক্রমাগত ধ্বনিত হচ্ছিল।

আগন্তুকের মুখেরদিকে চেয়ে হঠাৎ মনে হোল ইনি আমার পরিচিত সেই ইংরাজ সেনাপতি যিনি আমায় গতবার স্পেনীয় দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তরবারি উর্দ্ধে উত্তোলন করে তিনি আমাকে আক্রমণোদ্যত হতেই আমি আমার তরবারির দ্বারা যখন তাঁকে অভিবাদন জানালুম, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠ্‌লেন—"কে? জেরার্ড?"

আনন্দে পুলকিত হয়ে আমি তাঁর সমীপবর্ত্তী হ'লাম। সেনাপতি বল্লেন, আমি এসেছিলুম যুদ্ধ কর্ত্তে—কখনো ভাবিনি—এ তোমার দল।

কণ্ঠস্বরে তাঁর আশাভঙ্গ জনিত ক্ষোভের ব্যঞ্জনা! শত্রুর স্থলে বন্ধুকে পেয়ে তাতে প্রীতির লেশমাত্র ও ছিল না।

শুষ্কস্বরে বল্লুম, "আমিও যুদ্ধ কর্ত্তেই এসেছিলুম, কিন্তু একদিন যে আমার প্রাণরক্ষা কোরেছে—তার ওপর অস্ত্রধারণ কর্ব্বার প্রবৃত্তি আমার নেই।

সেনাপতি নাসিকা ও অধরপ্রান্ত আকুঞ্চিত করে বল্লেন—"ও কিছুই নয়।" ও বিষয়ে তোমার ভাব্‌তে হবে না।"

"আপনি বল্লেই আমি তা কিছু নয় বলে মনে কর্ত্তে পারি নে।"

"তুচ্ছ বিষয়কে তুমি বড় বাড়িয়ে দেখ্‌ছ!"

"আপনাকে দেখার জন্য আমার মায়ের যে কি সাধ তা কি বল্‌ব! আপনি যদি কখনো দক্ষিণ-ফ্রান্সে যান—"

"জান? লর্ড ওয়েলিংটন ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে সেখানে আস্‌ছেন?"

হেসে বল্লুম, "তাদের ভেতর একজন ত বেঁচে থাকবেই! তা এখন আপনার তরবারি কোষেই রাখুন না!"

আমাদের অশ্ব ছিল, পরস্পরের বিপরীত মুখে। হাত বাড়িয়ে আমার পিঠ চাপড়ে সেনাপতি বল্লেন, "জেরার্ড, ছেলে তুমি খুব ভালো, আফ্‌শোষ আমার এই যে তুমি ইংলিশ চ্যানেলের এপিঠে না জন্মে ওপিঠে জন্মেছ।"

গর্ব্বভরে উত্তর দিলুম, "ঠিক্ দিকেই জন্মেছি।"

আমার দিকে চেয়ে এমন করুণাভরা কণ্ঠে তিনি বলে উঠ্‌লেন, "আহা বেচারা"—যে কৌতুকে আমি হো হো করে হেসে উঠ্‌লুম।

সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তিনি বল্লেন, "কিন্তু দেখ জেরার্ড, ব্যাপারটা হোল ভারী অদ্ভুত। তোমাদের মশিনা এ খবর পেলে কি ভাব্‌বেন জানিনা, কিন্তু আমাদের ওয়েলিংটনের কাণে যদি একথা যায় তবে তিনি বিস্ময়ে এমন লম্ফই দেবেন যে ওঁর রাইডিং বুট পা থেকে খসে পড়ে যাবে। ফুর্ত্তি কর্ত্তে যে আমরা এখানে আসি নি—এ ত নিশ্চিত?"

সবিনয়ে জিজ্ঞাসা কল্লুম, "কি কর্ত্তে বলেন আমাকে?" "সেই স্পেনীয় দস্যুর আস্তানা থেকে চলে আস্‌বার সময় আমাদের পরস্পরের সৈন্য সম্বন্ধে যা কথা হয়েছিল—! তা তোমার মনে আছে কি? সংখ্যা শ্রেণীতে আমরা যেমন সমান,—বেশ ভূষায় শৌর্য্যে বীর্য্যে ও আমরা তেমনি কেউ কারো চেয়ে হীন নই। সাম্‌নে এই তৃণভূমির ওপর আমাদের সৈন্যেরা পরস্পরের সঙ্গে যদি এক দফা শক্তি পরীক্ষা করে—তাহলে—কিই বা এমন ক্ষতি হবে?"

এক নিমিষে ভুলে গেলুম—মার্শল হনিসুইটের কথা—য়্যালমিন্সালের ধর্ম্মমন্দিরের কথা। যে চমৎকার যুদ্ধটি আমাদের সম্মুখে এখন সংঘটিত হবে—তার চিন্তায়ই আমি মগ্ন হয়ে গেলুম। খুসী হয়ে বল্লুম, "বেশত, এতক্ষণ আপনার সৈন্যদের সম্মুখভাগ দেখেছি, এখন দেখ্‌ব ওদের পৃষ্ঠদেশ। মন্দ কি!"

"এস তবে। আমার দল যদি তোমার দলকে হারায়—তবে ত আর কোনো কথা নেই। কিন্তু তোমার দল যদি আমার দলকে হারায়—মার্শল হনিসুইট ব্যাটা স্বচ্ছন্দে আবার বিচরণ কর্ব্বে।" সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কল্লুম—"মার্শল হনিসুইট্! সে কি!"

"ও, শোননি সে দুর্ব্বৃত্তটার নাম? ঐ লোকটা এইখানেই নিকটস্থ কোন জায়গায় থাকে। ওকে ফাঁসী লট্‌কাবার জন্যই ওয়েলিংটনকর্ত্তৃক আমরা এখানে প্রেরিত হয়েছি!"

"কি মজার কাণ্ড! আমরাও ত ওরই জন্যে মশিনাকর্ত্তৃক এখানে প্রেরিত হয়েছি!"

দুই জনেই তখন উচ্চ হাস্যে অসি কোষনিবদ্ধ কল্লুম। আমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমাদের সৈন্যেরাও তাই কল্লে।

সেনাপতি চেঁচিয়ে বল্লেন, "আমরা পরস্পরের মিত্র!" হেসে বল্লুম—"একদিনের জন্য"!

"এখন তবে আমাদের সৈন্যেরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হোক্।"

বল্লুম—"নিশ্চয়ই"!

তখন সংগ্রামের পরিবর্ত্তে নূতন করে সৈন্য সমাবেশ করে যাত্রা সুরু হোল। ক্রমশঃ

বদরিকাশ্রম তীর্থ

(আমার জনৈক আত্মীয় কয়েক বৎসর হইল "বদরিকাশ্রম" তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে এক সুদীর্ঘ চিঠি লিখিয়াছিলেন। বদরিকাশ্রম হিন্দুদের এক মহাতীর্থস্থান, সুদূর হিমালয়ে অবস্থিত। দুর্গম পাহাড়, হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ; চোর ডাকাতের ভয় ও উপদ্রব আছে, অনেক চড়াই উৎরাই অতিক্রম করিয়া এই দুরারোহ তীর্থ স্থানে পৌঁছিতে হয়। এজন্য পার্ব্বত্য পথ-ভ্রমণে অনভ্যস্ত বাঙ্গালী খুব কমই এই তীর্থে গমন করিয়া থাকেন। ইতিপূর্ব্বে আমাদের আত্মীয় ও পরিচিত যে দু'একজন এই তীর্থে গিয়াছিলেন তাঁহারা এই তীর্থ বিশেষ দুর্গমতর বলিয়াই আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই চিঠি পড়িয়া এই তীর্থস্থান তেমন কিছু দুর্গমতর বলিয়া আমার মনে হইতেছে না। আমার জয়শ্রীর পাঠিকা ভগিনীদের মধ্যে যদি কেহ কোনদিন এই হিমালয়স্থিত তীর্থে যাইতে ইচ্ছা করেন, এই চিঠি পড়িয়া তাঁহারা এই তীর্থস্থানের ও পথঘাটের মোটামুটি একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ইহার অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনেকটা আভাস পাইবেন। সেজন্য চিঠিখানা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠাইলাম, জয়শ্রীতে প্রকাশিত দেখিলে আনন্দিত হইব। —শ্রীচারুবালা দেবী)

*　　*　　*　　*　　*

—বদরিকাশ্রম যাওয়ার বৃত্তান্ত জানিতে চাহিয়াছেন, কারণ যে নামের লিষ্ট দিয়াছেন তাহাতে বোঝা যায় ওদিক্‌কার সব জায়গা সম্বন্ধেই আপনার জ্ঞান আছে। দীর্ঘ ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া পত্রে সম্ভব হয় না। তবু মোটামুটি লিখিতেছি। ভ্রমণ বিবরণ কেবল দেশ বিদেশের মাটীগাছ পাথরের বর্ণনা হইলে তাহাতে আর বিশেষত্ব কি? কারণ গাছ পাথর মানুষের বাইরের চেহারার বর্ণনা অনেক বইতেই পাইবেন এবং আমার দৃষ্টস্থান সমূহও বর্ণনা করিলে পূর্ব্ব লেখকদের বর্ণনা হইতে তফাৎ হইবে না।

আমি একা যাই নাই। সঙ্গে আর একটী ছেলে বরাবর সাথী হইয়াছিল। আমরা এখান হইতে কলিকাতা, সেখান হইতে বর্দ্ধমান, সেখান হইতে আসানসোল সেখান হইতে ধানবাদ, ধানবাদ হইতে কাশী, কাশী হইতে অযোধ্যা, অযোধ্যা হইতে লক্ষ্ণৌ, লক্ষ্ণৌ হইতে দেরাদুন গিয়াছিলাম। দেরাদুনেই স্থায়ী আস্তানা করিয়া আশপাশে চারিদিকে হিমালয় গিয়াছি, আসিয়াছি। রাস্তায় এই সব জায়গায় ৪।৫ দিন করিয়া থাকিয়া গিয়াছিলাম। দেরাদুন পর্য্যন্ত ট্রেণে গিয়াছিলাম, সেখানে এক অপরিচিত ভদ্রলোকের বাসায় অতিথি হইয়া থাকিয়াছি। দেরাদুনের ৮ মাইল উত্তরে সহস্রধারা নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে চারিদিক হইতে অসংখ্য জলধারা কল কল শব্দে নামিয়া আসিয়া অনেক নীচে এক নির্জ্জন সমতল স্থানে মিলিয়াছে। চারিদিকে উঁচু পাহাড় বনমাঝে

বহুনীচে ফেনিল জলস্রোত অবিশ্রাম শব্দ করিয়া ছুটিয়াছে। যেদিকে চোখ ফিরান যায়, কেবল শাদা জলধারা ও ঝরণা উপর হইতে নামিয়া আসিয়াছে। একান্ত থম্‌থমে নির্জ্জনতায় জলের অশ্রান্ত গর্জ্জন মানুষের মনকে গাম্ভীর্য্যে ভরিয়া তোলে। সেখানে একটা গন্ধক (sulphur) জলের ফোয়ারা আছে। বহুদূর হইতে সব লোক আসিয়া ঐ জল লইয়া যায়।

দেরাদূন হইতে ১৫ মাইল উপরে মুশৌরী পাহাড় ও সহর। আমরা হাঁটিয়া গিয়াছিলাম। ৭০০০ হাজার ফিট্ উঁচু সেখান হইতে চারিদিকে হিমালয়ের অফুরন্ত পর্ব্বতশ্রেণী স্তরের পর স্তর, যতদূর চোখ্ দেখা যায় কাতারের পর কাতারে চলিয়া গিয়াছে। দূরে, উত্তরে চিরদিন বরফঢাকা পর্ব্বতশ্রেণী সাদা ধব ধব করিতেছে। বরফ পাহাড়ে সূর্য্যের আলোক পড়িয়া সারাক্ষণ ঝক্‌ঝক করিতেছে। সে সৌন্দর্য্য সমতল ভূমিতে যারা থাকে তাদের কল্পনার বাইরে। সকালবেলা প্রথম উষালোক যখন শাদা তুষার ঢাকা পাহাড়ের গায়ে আসিয়া পড়ে তখন পাহাড়গুলো সব সোনালী আলোতে ঝলমল করিতে থাকে।

দেরাদুন হইতে হরিদ্বার আসিয়াছিলাম কয়দিন। সেখান হইতে হৃষীকেশ গিয়াছিলাম। দেরাদুন হইতে একেবারে বদরিকাপথে যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছিলাম। যাত্রাকালে সন্ন্যাসী-বেশ নেওয়া হইয়াছিল। গৈরিক কাপড়, গৈরিক জামা, গৈরিক হিন্দুস্থানী টুপী, হাতে দণ্ড ও পায়ে জুতা, কাঁধে একটী করিয়া ঝোলা, প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র সহ।

হৃষীকেশ হইতে বৈকালে ৪½ টায় হাঁটিয়া রওনা হইয়া লছমন ঝোলায় গঙ্গাপার হইয়া সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় বদরিনাথের দিকে রওনা হইয়াছিলাম। লছমন ঝোলায় তো আপনি নিশ্চয়ই গিয়াছেন। সেখানে এখন পাকা পোল হইয়াছে, গঙ্গা পার হইবার জন্য। আমরা যাইয়া দেখি গঙ্গার প্রবল স্রোতে পোল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিন চার খানা খেয়া নৌকায় গঙ্গা পারাপার হইতেছে। সন্ধ্যার কিছু আগে লছমন ঝোলার পরপারে আসিলাম। বহু হিন্দুস্থানী যাত্রী স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা দলে দলে বোচ্‌কা কাঁধে বদরিকার দিকে যাত্রা করিয়াছে। নৌকায় উঠিয়া সকলে সমস্বরে "জয় বদরি বিশাল লালকি জয়" বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া স্তোত্রপাঠ করিতে লাগিল। হিন্দুস্থানী মেয়েদের মিষ্টিগলায় এ সরল গান ও স্তোত্রপাঠ অতি চমৎকার লাগে।

সেদিন রাত্রি ৯½ পর্য্যন্ত চলিয়া নয় মাইল দূরে "গুলো" নামক চটীতে আসিয়া রাত্রিবাস করিলাম। লছমন ঝোলা হইতে "গুলোড়" চটী পর্য্যন্ত এই রাস্তা টুকুর মধ্যে তিনটী চটী "গরুড়চটী" 'ফুলবাড়ী চটী', 'রুদোড় চটী'।

পরদিন ভোরে ৪½ আবার রওনা হইয়া সারাদিন ৩৫ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া দেব প্রয়াগের দুইমাইল আগে এক চটীতে আসিয়া রাত্রিবাস করি। এইরকম প্রতিদিন ভোরে অন্ধকার থাকিতে রওনা হইতাম। এবং বেলা ১২টা ১টা পর্য্যন্ত পথ চলিয়া কোন চটীতে আশ্রয় নিয়া রান্নাবান্না করিয়া খাইয়া একটু বিশ্রাম করিয়া আবার রওনা হইতাম। রাত্রি ৮।৯।১০টা পর্য্যন্ত

পথ চলিয়া আবার চটীতে উঠিয়া রান্না বান্না করিয়া খাওয়া দাওয়ার পরে শুইয়া পড়িতাম। এমনি দিনের পর দিন ক্রমাগত চলিয়া চলিয়া বদরিকাশ্রমের ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইয়াছি।

রাস্তা খুব ভালো পাকা পাথর সমান। তিনচার হাত চওড়া। খাওয়া দাওয়ার কোন কষ্ট নাই। চাউল ||০, ||৵০ সের, আলু ।/০ ।৵০ সের; মহিষের দুধ ।৵০ সের; মহিষের ঘী ৩৲ সের, আটা ।৵০ সের। আমরা একবেলা আলুসিদ্ধ ভাত ও অন্য বেলা আটার রুটী খাইয়াছি। আর কিছু পাওয়া যায় না। তবে মাঝে মাঝে বড় জায়গায় যেমন 'দেবপ্রয়াগ' 'রুদ্রপ্রয়াগ' ইত্যাদিতে 'জালিপী' পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ যাত্রীরা ভোরে রওনা হয় এবং রৌদ্র কিছুটা উঠিলেই চটীতে উঠিয়া খাওয়া দাওয়া সারিয়া বিশ্রাম করে। আবার বৈকালে রোদ পড়িলে রওনা হয় ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হাঁটে। সন্ধ্যার পর কেউ পথে থাকে না। ভল্লুকের ভয় ও অন্ধকারের জন্য আমরা কিন্তু রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত পথ চলিয়াছি এবং দুপুরেও বেলা ১১৷১২ পর্য্যন্ত চলিয়াছি। সাধারণ যাত্রীরা অতিকষ্টে প্রতিদিন ১২৷১৫ মাইল চলে। কিন্তু বেশী পরিশ্রম করিতে পারায় আমরা প্রতিদিন ৩০ হইতে ৩৫ মাইল হাঁটিয়াছি। হৃষীকেশ হইতে ১৬৯ মাইল বদরিকাশ্রম। এই দীর্ঘ পার্ব্বত্য পথ চলিতে যাত্রীদের একমাস অন্ততঃ ২০ দিন লাগে। আমরা ৮ দিনে বদরিকাশ্রমে পৌঁছিলাম এবং ৮ দিনে সেখান হইতে ফিরিলাম দেরাদুনে। বদরিকাশ্রমে দুই দিন ছিলাম।

রাস্তায় কোন অসুবিধা নাই, বুড়া মানুষ ও অনায়াসে তীর্থ করিয়া আসিতে পারে। প্রতি দুই মাইল তিন মাইল অন্তর চটী ধর্ম্মশালা আছে। সব চটীতেই চাল, আলু, আটা ঘি পাওয়া যায়। লোকে মিছামিছি এই রাস্তার কথা অনেক কিছু বাড়াইয়া বলে, এবং যত না কঠিন ও দুর্গম পথ তাহা হইতে কঠিনতর ও দুর্গমতর করিয়া প্রকাশ করে। আসলে সকলেই কিন্তু বদরিকাশ্রম নির্ব্বিঘ্নে যাইতে পারে।

রাস্তায় 'দেবপ্রয়াগ' 'ব্যাসকাশী' 'রুদ্রপ্রয়াগ' 'শ্রীনগর', 'কর্ণপ্রয়াগ' 'নন্দপ্রয়াগ' 'বিষ্ণুপ্রয়াগ' 'পাণ্ডুকেশ্বর, যোশীমঠ এই সব স্থান পরে। বরাবরই পথ পাহাড়ের গায়ে গায়ে অলকানন্দার ধারে ধারে উঠিয়া গিয়াছে। 'দেবপ্রয়াগ' অলকানন্দা আর ভাগীরথীর সঙ্গম স্থল। হিমালয়ের এই অংশের নাম 'উত্তরাখণ্ড'। এই উত্তরা খণ্ডে ৫টী প্রয়াগ আছে। এই পাঁচটী সঙ্গম স্থলই দেখার জিনিষ। 'অনকানন্দা' উত্তরাখণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও দীর্ঘতম নদী। এক এক প্রয়াগে এক একটী নদী আসিয়া অলকানন্দার সহিত মিশিয়াছে।

'অলকানন্দার' সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। রাশি রাশি জল ক্রমাগত উঁচু হইতে ফুলিতে ফুলিতে ছুটিয়াছে। তার কি গভীর গর্জ্জন, অশ্রান্তগতি প্রবাহ। শত শত মাইল এই অলকানন্দা কত অজস্র পাথর ডিঙ্গাইয়া কত পাহাড় ভাঙ্গিয়া দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত উদ্দাম বেগে বহিয়া চলিয়াছে। নদীর মাঝে অগণ্য পাথর ছোট বড়, মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই সব পাথরে অলকা-

নন্দার জলরাশি উন্মত্ত গতিতে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আর গভীর জল ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। বদরিকাশ্রমের পথ বরাবর এই অলকানন্দার পারে পারে কখনও ঠিক নদীর সঙ্গে কখনও নদী হইতে ১০০০ এক হাজার ফিট উঁচুতে চলিয়া গিয়াছে।

রুদ্র প্রয়াগে অলকানন্দার সহিত আসিয়া 'মন্দাকিনী' নদী মিশিয়াছে। মন্দাকিনী 'অলকানন্দার মত অত অশ্রান্ত দুর্দ্দান্ত নয়। তার গভীর জল আশ্চর্য্য রকমের নীল বর্ণের। সেই সুগভীর নীল জলরাশি অলকানন্দার শাদা ধব্‌ ধবে জলে পড়ায় পরিষ্কার এক রেখা পড়িয়াছে— শাদা আর নীল সেখানে মিশিয়াছে।

মেঘনা আর পদ্মার জল ও এমনি স্পষ্ট রেখায় পরস্পরের পার্থক্য বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু মন্দাকিনী আর অলকানন্দার মধ্যে যে শাদা আর নীল মিশিয়াছে তার পার্থক্য রেখা আশ্চর্য্য রকম স্পষ্ট।

ব্যাস চটীতে ব্যাস গঙ্গা আসিয়া 'অলকানন্দায়' মিশিয়াছে। এখানে চারিদিকে বড় বড় পাহাড়ের মধ্যে সঙ্গমস্থল। এক সমান চড়া জায়গার সৃষ্টি করিয়াছে। এখানে ব্যাস দেবের তপস্যার স্থান। জায়গাটা বড়ই সুন্দর। রাত্রি জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিয়া গিয়াছিল। সেদিন বড় বড় পাহাড়ের গায়ে গায়ে জ্যোৎস্না আলোছায়ার বৈচিত্র্য এমন আশ্চর্য্যভাবে রচনা করিয়াছে, আর উপরে পরিষ্করে নীল আকাশের গায়ে চাঁদ হইতে অঝোরধারে আলো ঝরিয়া পড়িতেছে। তারাগুলি ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছে। চারিদিকে পাহাড়গুলি মৌন স্তব্ধ হইয়া গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। গাম্ভীর্য্যপূর্ণ নির্জ্জনতার গঙ্গার অবিশ্রান্ত শোঁ শোঁ গর্জ্জন ধ্বনি।

সে যে কি আশ্চর্য্য সুন্দর স্থান তা' আমাদের বাঙ্গলা দেশের সমতলবাসীরা কল্পনায় ও আনিতে পারিবে না।

কর্ণ প্রয়াগে কর্ণগঙ্গা আসিয়া অলকানন্দায় পড়িয়াছে। এখানে কর্ণের মন্দির আছে। বিষ্ণুপ্রয়াগে অহল্যাবাঈ নির্ম্মিত এক মন্দির বিষ্ণুগঙ্গার আর অলকনন্দার ঠিক সঙ্গমস্থলে আছে।

যোশীমঠ দেখিয়াছি। তারপর বদরিকাশ্রমের বার মাইল আগে হইতে রাস্তা ক্রমে উপর দিকে উঠিয়া গিয়াছে। এই রাস্তার শেষ দিকে চারিদিকে তুষারাচ্ছন্ন পাহাড়। রাস্তার দুই পাশে যে দিকে চোখ ফিরান যায় কেবল বরফে সাদা আর সাদা। পাহাড়ের গায়ে গায়ে মাথায় মাথায় রাশি রাশি বরফ জমিয়া পাথরের মত শক্ত হইয়া রহিয়াছে। পাণ্ডুকেশর ছাড়াইয়া দুই মাইল গেলে হঠাৎ দেখি সাম্‌নে রাস্তা পথ ঘাট বরফের উপর দিয়া। চারিদিকে বরফের রাজ্য। রাস্তা বরফের উপর দিয়া। বরফ ভাঙ্গিয়া খাইতে খাইতে রাস্তা চলিতে লাগিলাম। শেষদিকে অলকানন্দা সমস্ত যায়গায় জমিয়া একেবারে শক্ত হইয়া রহিয়াছে। সে বরফও ১২।১৪ হাতের কম গভীর হইবে না। কোথায় বরফের উপর হাঁটিয়া চলিয়াছি। নীচে বরফ গলিয়া হুহু শব্দে জল ছুটিয়াছে। এক গহ্বর সৃষ্টি হইয়াছে। চোখের উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফ গলিয়া হু হু শব্দে জল বাহির হইয়া আসিতেছে।

সে যে কি দৃশ্য তাহা বর্ণনা করিয়া বোঝান সম্ভবের বাহিরে। এত সৌন্দর্য্য এত মাধুর্য্য যে পাহাড়ের গায়ে গায়ে কঠিন পাথরের ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃতি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে তা কোনদিন ভাবি নাই। একবার আসাম গিয়াছিলাম সেখানেও এক আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তবে এবার যে সৌন্দর্য্য দেখিয়া আসিয়াছি তাহা অতুলনীয়। এবারকার যাত্রার স্মৃতি আমার মনে চিরদিন এক অব্যক্ত মাধুর্য্যে সিক্ত হইয়া জীবন ভরিয়া অক্ষয় হইয়া থাকিবে। এখনও যখনই আমি একা থাকি অবসর সময়ে বদরিকা যাত্রার স্মৃতি আমার মনে অসীম সৌন্দর্য্যে ঝলমল করিতে থাকে। স্পষ্ট মনের সম্মুখে হিমালয়ের সেই পাহাড়ের শ্রেণী স্তরের পর স্তর তার গায়ে গায়ে শান্ত ছোট ছোট গ্রামগুলি, স্বাস্থ্যবতী পাহাড়ী মেয়েদের ছবি। পরিষ্কার ধান ক্ষেত সেই অলকানন্দার মন্দাকিনী ইত্যাদি নদীর সেই রাস্তা ঘাট, চটী, ধর্ম্মশালা সেই দিনের পর দিন সন্ন্যাসী বেশে পথিক-বৃত্তি, গঙ্গার ঠাণ্ডাজল আর রুটী খাওয়া, পরিশ্রান্ত হইলে গাছের ছায়ায় পাথরে বসিয়া বিশ্রাম, সেই বরফের উপর দিয়া ছেলেমানুষি ও উল্লাসের আতিশয্য, একের পর এক ছবির মতো ভাসিয়া উঠিয়া মনকে উদাস করিয়া দেয়।

বদরিকা যাত্রার বর্ণনা আপনাকে কী যে লিখিব ভাবিয়া পাই না। কোনটা ফেলিয়া কোনটা যে লেখা উচিত তাহাই ঠিক করা দায়। মনের মধ্যে ভীড় করিয়া সব ছবি আসিয়া জমা হইতে থাকে। আমি গঙ্গোত্রী, যমুনাত্রী, গুপ্তকাশী, ত্রিযোগীনারায়ণ, গৌরীকুণ্ড ইত্যাদি যাই নাই। কারণ তাতে আরও ৫০ মাইল বেশী চলিতে হইত। রুদ্রপ্রয়াগ হইতে অন্য রাস্তায় একটু ঘুরিয়া কেদার নাথ যাইতে হয় এবং আবার বদরিকার রাস্তায়ই আসিয়া পড়িতে হয় কোলসাঙ্গা নামক স্থানে। কেদার নাথ গেলে রাস্তায় গুপ্তকাশী ইত্যাদি পড়ে। গঙ্গোত্রী যাইতে আরও একটু ঘুরিতে হয়।

আমাদের যাত্রাকালে বাঙ্গালী মাত্র ৪।৫ জন পথে সাক্ষাৎ হইয়াছে। আর সব মান্দ্রাজী, কাশ্মীরি, গুজরাটী, হিন্দুস্থানী, বেহারী ইত্যাদি জাতি।

বরাবর ধর্ম্মশালা আর চটীতেই ছিলাম। বদরিকাশ্রম জায়গাটাও খুব সুন্দর। চারিদিকে পাহাড়ের মধ্যে একটু সমতল স্থান। মাঝখান দিয়া অলকানন্দা বহিয়া চলিয়াছে। অধিকাংশ স্থানেই জমাট বরফ। অসহ্য শীত, রাত্রিতেও দুই তিন খানা কম্বলেও কুলাইতে চায় না। বদরিকাশ্রমের দুই মাইল উত্তরেই তিব্বত দেশের সীমান্ত। এখানে তিন মাস মন্দির খোলা থাকে; গ্রীষ্মকালে বরফ গলিয়া বাড়ীঘর আবার বাহির হয়। তখনই তীর্থযাত্রার সময়। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মন্দির দ্বার প্রথম উদ্‌ঘাটন করা হয়। বদরিকাশ্রমের পাণ্ডারা সব নীচে দেবপ্রয়াগে থাকে। সেখানে তাদের বাড়ী ঘর। প্রায় ৫০০ ঘর পাণ্ডা দেবপ্রয়াগে থাকে। সেখান হইতেই পাণ্ডা লইয়া যাত্রীরা সব আসে। বদরিকায় পাণ্ডাদের বাড়ীতে থাকিতে হয়। নতুবা কাশী কম্বলীওয়ালা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশালা আছে সেখানেও থাকা যায়।

* * *

বিচিত্র

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

যতদিন মন মাঝে,
ছিন্ন ছিন্ন ধ্বনি বাজে বসন্ত বাতাসে;
উল্লসিত মুগ্ধ হিয়া
নিত্য উঠে উদ্ভাসিয়া নূতন উল্লাসে,
ফাল্গুনেতে মত্ত বায়ে
পুষ্প ঝরে বৃক্ষছায়ে কি আনন্দ হানি!
বন্ধ ভাঙ্গি দুকুলের
ছোটে নদী; মুকুলের দোলে বৃন্ত খানি।
সেই ধ্বনি যতদিন
মন মাঝে হয় লীন শুধু সেই সুখে,
সেই গন্ধ উছলিত
আকুল হয় যে চিত মধুর কৌতুকে;
ততদিন মনে আহা
যা কিছু দেখেছি তাহা নব ছন্দে সুরে
অনুপম রূপলয়ে
সব গেছে আঁকা হয়ে হৃদয় মুকুরে।
যত সুর যত গন্ধ
যত ফুল যত ছন্দ যত মুগ্ধ হাসি,
যত নব দীপ্ত আশা
চিত্তভরা ভালবাসা স্নিগ্ধ মধু রাশি
জ্যোৎস্নাময় যত রাতে
আপনারে আপনাতে লাগে উথলিত।
বন্ধ হীনা যে তটিনী
ছুটে চলে রিনি ঝিনি হয়ে উছলিত
শত তারা জ্যোতির্ম্ময়
আকাশ মগনরয় ভেসে চলে সব,
সে মাধুরী চিত্তে মম
আনে ছবি অনুপম তোলে কলরব।

প্রতি দিন প্রতি কাজে
যত মধুছন্দ বাজে যত মুগ্ধ সুর,
আমার হৃদয়ে তার
সাড়া লাগে অনিবার আনন্দে মধুর।
ঘন নীল নীলাম্বর
দৃষ্টি মেলে আঁখিপর চারিদিক চেয়ে
ধুসর গুণ্ঠন টানি
সন্ধ্যার জগৎখানি দূরে রহে চেয়ে
মনে হয় নিত্য স্রোতে
এমন ধরণী হতে পেলো যা হৃদয়,
না জানি কেমনে তবে
তারে শোধ দিতে হবে দেবার সময়!
কত ছন্দে মরি মরি
দিয়েছ অঞ্জলী ভরি কত সুধা ধার
আমার হৃদয় মাঝে
কোনও তার চিহ্ন আছে দিতে উপহার?
যত নব ধ্বনি আসে
আমার হৃদয় পাশে যত রূপ হায়
যা কিছু বলার আছে
মেলে মোর মন মাঝে একটী কথায়।
যত স্পর্শ লভি তবে
বারে বারে মনে হবে এমন মধুর
কেন মুগ্ধ এ হৃদয়ে
বাজে এত ক্ষীণ হয়ে এ বিচিত্র সুর!
সমস্ত জগৎ লয়ে
কে রয়েছ এক হয়ে মোরে বল দিতে
এই ক্ষুদ্র যন্ত্রে মম
সেই সুর অনুপম পারিনা ধরিতে
সবি কিগো যাবে ভেসে
আমার হৃদয়ে এসে কিছু কি রবে না!
কোনও সত্য উদ্ভাসিয়া
এই ক্ষুদ্র মুগ্ধ হিয়া কৃতার্থ হবেনা?
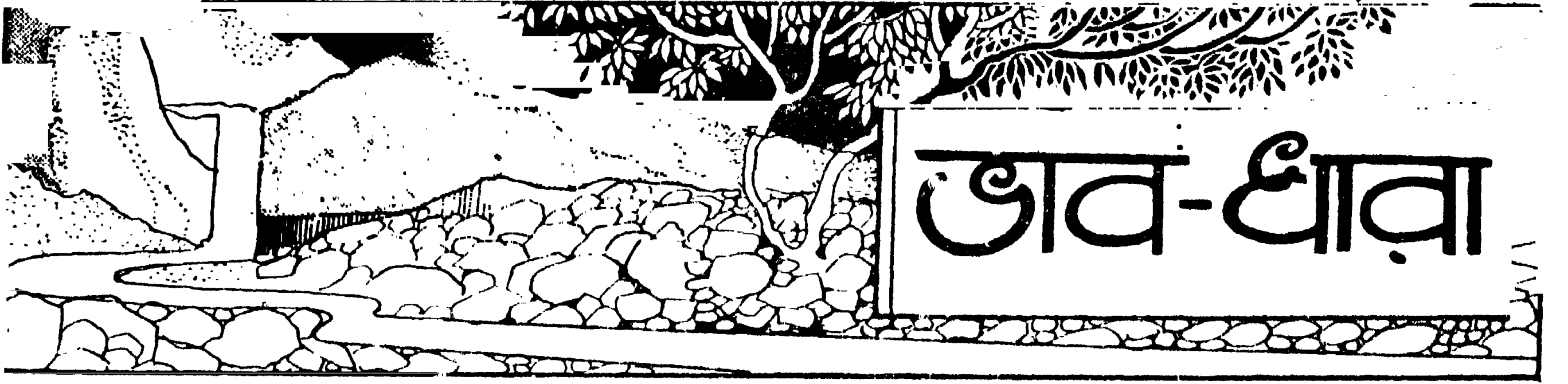
বাংলার নাট্যমঞ্চের ইতিহাস

শ্রীরমেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

ভারতের সর্ব্বত্রই আজকাল নাট্যাভিনয় পরিদৃষ্ট হইতেছে। বিশেষতঃ বাংলাদেশে ইহার সমধিক প্রাচুর্য্য দেখা যায়। বৃহৎ বৃহৎ সহর হইতে ক্ষুদ্র পল্লীতে পল্লীতেও বর্ত্তমানে নাট্যাভিনয়ের যেন একটা প্রবল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই সমবেত চেস্টার দ্বারা আমোদ প্রমোদ লাভের আশায় এইরূপ একটী প্রতিষ্ঠান সংস্থাপন করিতে উৎসুক। থিয়েটারের নাম শুনিলে আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই একসঙ্গে আনন্দে মাতিয়া উঠেন। কিন্তু কিরূপে আমাদের দেশে এই নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত হইল তাহা হয়ত অনেকেই বিশেষরূপে অবগত নহেন—তন্নিমিত্তই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

আমাদের বাংলা দেশে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সময় হইতেই প্রকৃত নাটক আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে সংস্কৃত নাটক ছিল; তবে সম্পূর্ণ বাংলা নাটক ছিল কিনা সে বিষয়ে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মহাপ্রভুর সময় কীর্ত্তনের মধ্যদিয়া নাটকীয় রসধারা প্রথম পরিস্ফুট হইয়াছে। পরে কীর্ত্তন হইতে সেই নাটকীয়ভাব যাত্রায় পরিপুষ্টিলাভ করে। যাত্রা সেই সময় ধনী লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই আশ্রয় হইতে ক্রমশঃ বঞ্চিত হইয়া পথে দাঁড়াইতে বাধ্য হইল; তখন গত্যন্তর না দেখিয়া তাহা বারোয়ারীতে পরিণত হইল। তাহাতে প্রাণের রস হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে সেই নাটকীয় অভিব্যক্তি অতি নিম্নপথে ধাবিত হইল। পরে ইংরাজের যুগে সেই নাটক আবার ইংরাজী নাটকের অনুকরণে যুগান্তর স্থষ্টি করিল।

পুরাকালে আমাদের দেশে নাটক ছিল কিনা কিংবা অভিনীত হইত কিনা—এবিষয় লইয়া যথেস্ট মতদ্বৈধ উপস্থিত হইতে পারে; তবে অধুনাতন নাট্যবিশারদগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন, ইউরোপীয়গণের অনুকরণে ইহা চরম পরিণতিলাভে সমর্থ হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতীয়গণ একসময় আচারব্যবহার, বেশভূষা প্রভৃতি

সকল দিক দিয়াই বিদেশীয় প্রভাব দ্বারা সাতিশয় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। এমন কি আমোদ প্রমোদ করিতে গিয়াও সাধ্যমত বিদেশীয়দের হুবহু নকল করিবার প্রয়াস পাইতেন। এই সব প্রচেষ্টার ফলে বাংলার ইংরাজী অনুকরণে নাটক রচনার ও নাটক অভিনয়ের প্রচলন হয়।

পূর্ব্বে এ'দেশে নাটক না থাকা সত্ত্বেও যে আমোদপ্রমোদের ত্রুটী হইত তাহা নহে। তৎকালে যাত্রা, কথা, কবি, তর্জ্জা, আখড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি অহঃরহঃ সকলের গৃহে প্রধানতঃ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের গৃহে অনুষ্ঠিত হইত। এইসব অনুষ্ঠানের নিমিত্ত কেহই যথাসাধ্য সাহায্য ও উৎসাহ প্রদানে বঞ্চিত করিতেন না। অদ্যাপিও যাত্রা, কবি, তর্জ্জা, পাঁচালি প্রভৃতি আমাদের দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। যাঁহারা ঐ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু, তাঁহারা এখনও পাঁচালির কথা উঠিলে দাশরথিরায়ের পাঁচালি এবং তর্জ্জার কথা উঠিলে নিধুবাবুর তর্জ্জার উল্লেখ করিয়া আশাতিরিক্ত আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

বাংলার নাট্যমঞ্চের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরাজরাজত্বের প্রারম্ভে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় তাঁহাদের আপ্রাণ চেষ্টায় সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা মহানগরীতে একটী নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন। উহাঁরা অত্যন্ত নাট্যানুরাগী ছিলেন বলিয়া ঐ দেশীয় কাহারও কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণে কৃতকার্য্য হইয়া ছিলেন। এইভাবে নাট্যশালা নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে সেক্ষপীয়রের 'মার্চ্চেণ্ট্ অব্ ভেনিস্' (Merchant of Venice—Shakespeare) নামক নাটক অভিনয় করিলেন। নাটকখানি সম্পূর্ণ বিদেশী, ভাষাও বিদেশী এবং অভিনেতাগণও বিদেশী। সুতরাং ইহা অতি স্বল্প লোকেরই বোধগম্য হইয়াছিল। তবে ইহা যে সাধারণের অন্তরে নূতনত্বের আভাস দিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ইহার কিছুকালপর ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত রুশীয় পরিব্রাজক মিঃ লেবেডেফ্ (Mr. Lebedeff) তৎকালীন মাননীয় সরকার বাহাদুরের সানুগ্রহে এবং স্বীয় অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা কলিকাতায় 'ইণ্ডিয়ান্ থিয়েটার' (Indian Theatre) নামে একটী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় ইনিও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মিঃ লেবেডেফ্ (Mr. Lebedeff) অতিশয় বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বুঝিলেন, বাংলা নাটক ব্যতীত ভারতীয়দের তৃপ্তিবিধান দুঃসাধ্য। তৎসঙ্গে তিনি ইহাও স্থির করিলেন, বঙ্গদেশে নাট্যাভিনয় প্রচলন করিতে হইলে, এতদ্দেশীয় লোকদ্বারা অভিনয় করান একান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি কঠোর শ্রমসহকারে 'ডিস্‌গাইজ্' (Disguise) ও 'লভ্' (Love) নামক দুইখানি ইংরাজী নাটক বাংলায় তর্জ্জমা করিয়া, ইংরাজ ও ভারতীয় উভয় লোকের সাহায্যে 'ইণ্ডিয়ান্ থিয়েটার' (Indian Theatre) নামক রঙ্গমঞ্চেই যথাক্রমে ১৭৯৫ খৃঃ নভেম্বর মাসে এবং ১৭৯৬ খৃঃ মার্চ্চ মাসে অভিনীত করাইলেন। এই সময় হইতে ভারতীয়গণ কথঞ্চিৎ পরিমাণে নাট্যরস উপভোগের অধিকারী হইলেন।

১৭৯৭ খৃঃ হইতে ১৮৩০ খৃঃ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কাল নাট্যাভিনয় একরূপ স্থগিত ছিল। ইহার প্রকৃত কারণ কি তাহা জানা যায় না। আর ঐ সময়ের মধ্যে অপর কোন নাটক অভিনীত হইয়াছিল কিনা তাহারও সঠিক কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৮৩১খৃঃ নাট্যাভিনয়কে পুনর্জীবিত করিবার নিমিত্ত যথোপযুক্ত চেষ্টা চলিতে লাগিল: তৎকালীন বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণের মধ্যে মহাত্মা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, শ্রীযুত নবীনচন্দ্র বসু প্রভৃতি মনীষিগণ প্রাণপাত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহাত্মা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাধু প্রচেষ্টায় 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকখানি শ্রীযুত নবীনচন্দ্র বসু মহাশয়ের শোভাবাজারস্থিত বাসভবনে ১৮৩১ খৃঃ নভেম্বর মাসের শেষের দিকে অভিনীত হইল। ইহাই ভারতে সর্ব্বপ্রথম বাংলানাটকের অভিনয়। নাটকখানি দেশীয় ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহার অভিনেতা ও অভিনেতৃর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রচুর অর্থব্যয়ও হইয়াছিল। তবে দুঃখের বিষয় রুচি-বিগর্হিত অনেক বিষয়ের অবতারণা করায় ইহা সাধারণের মনঃপূত হয় নাই। তন্নিমিত্ত অনেকেই যেন অভিনয়ের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া পড়িলেন। এই কারণে এবং উপযুক্ত বাংলা নাটকের অভাবে প্রায় পঞ্চবিংশতি বর্ষ ব্যাপী অর্থাৎ ১৮৫৬ খৃঃ পর্য্যন্ত বাংলার রঙ্গমঞ্চে আর কোন নাটক অভিনীত হয় নাই।

১৮৫৭ খৃঃ বাংলার নাট্যজগতে আবার নবযুগের আবির্ভাব হইল। এই সময় 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' নাটকখানির অভিনয় হইল। ইহার আখ্যাত বিষয়টী—বল্লালসেনের কৌলীন্যপ্রথার বিষময় কুফল। বাংলার ঘরে ঘরে কিরূপে ইহা ঘোরতর অশান্তি উৎপাদন করিয়াছিল তাহাই এই নাটকখানিতে অতি সুপরিস্ফুটভাবে দেখান হইয়াছে। শ্রোতৃবর্গের সকলেরই ইহা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল এবং সকলেই উচ্চকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়া ছিলেন। নাট্যামোদীগণ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া যে রসাস্বাদে বঞ্চিত ছিলেন, পুনরায় তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া যেন নবজীবন লাভ করিলেন। তাঁহাদের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

১৮৫৭ খৃঃ নাট্যজগতে আর একটী নূতন জিনিষের প্রচলন হইল। ঐ পর্য্যন্ত মঞ্চ নির্ম্মিত হইলেও তাহাতে দৃশ্যপটের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। এই সময় হইতে দৃশ্যপটের প্রচলন ও তাহা পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হইল। ইহার পর যাহাতে নাটকের অভাব অনুভূত না হয়, তন্নিমিত্ত কতকগুলি সংস্কৃত নাটকও বাংলায় অনুবাদ করা হইল। যে সমুদয় নাটক অনূদিত হইয়াছিল তন্মধ্যে 'শকুন্তলা', 'বেণীসংহার', 'বিক্রমোর্ব্বশী' ও 'রত্নাবলীর' নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৫৮ খৃঃ 'বেণীসংহার' নাটকখানি সাড়ম্বরে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের পাইক পাড়াস্থ বাসভবনে অভিনীত হইল। ইহাতে সাধারণের পরিতৃপ্তি হইয়াছিল। এই সময় সিংহ বাহাদুরের অনুগ্রহে কলিকাতায় সাধারণের সুবিধার্থ রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হইল। ইহা ব্যতীত আরও একটী নূতন

প্রথা এই সময় নাটকের সহিত সংযোজিত হইল। ঐ পর্য্যন্ত নাট্যাভিনয়ে ঐক্যতান্ বাদনের কোন পদ্ধতি ছিলনা। কয়েকজন পারদর্শী সঙ্গীতজ্ঞের আন্তরিক উৎসাহে ঐক্যতান্ বাদন প্রথা প্রচলিত হইল। এই সময় হইতেই নাট্যাভিনয় পূর্ণাঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইল।

১৮৬০ খৃঃ বাংলার নাট্যমঞ্চ একনিষ্ঠ সাহিত্য সেবক মাইকেল মধুসূদন দত্তের সৌজন্যে অতীব গৌরবান্বিত হইল। মাইকেল মধুসূদনের অসামান্য প্রতিভাবলে অনেকগুলি নাটক এবং কয়েকখানি প্রহসন রচনা করিলেন। তাঁহার রচিত 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকখানিকে বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় নাটক বলা যাইতে পারে। নাটকখানির অভিনয়ও অত্যন্ত চমৎকার হইয়াছিল। মধুসূদনের অপরাপর নাটক ও প্রহসনগুলিও যথেষ্ট কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হয়। তাঁহার 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' বাংলার আদি প্রহসন। ইহার পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় কোন প্রহসন ছিলনা। তাই বাংলার রঙ্গ মঞ্চের কথা আলোচিত হইলে মধুসূদনের নামই সর্ব্বাগ্রে আমাদের মানসপটে উদিত হয়।

১৮৬০ খৃঃ 'রত্নাবলী' অভিনীত হইবার পর ঐ বৎসরেই 'বিধবা বিবাহ' অভিনীত হয়। ইহার পর ক্রমান্বয়ে ১৮৬৪ খৃঃ 'একেই কি বলে সভ্যতা', ১৮৬৫ খৃঃ মালবিকাগ্নিমিত্র', ১৮৬৬ খৃঃ 'সীতার বনবাস' ও মধুসূদনের 'পদ্মাবতী', ১৮৬৭ খৃঃ 'কৃষ্ণকুমারী', রামনারায়ণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের 'নব নাটক', ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'কিছু কিছু বুঝি' ও মহাত্মা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের 'বুঝলে কিনা' প্রভৃতি নাটকগুলি অভিনীত হয়। এই সমুদয় অভিনয় গুলিও সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

নাট্যাভিনয়ের বিস্তারের অনুপাতে কলিকাতার বিভিন্নস্থানে রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হয়। তন্মধ্যে বৌবাজার, শোভাবাজার, জোড়াসাঁকো, চোরবাগান প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চে কোন না কোন নাটক অভিনীত হয়; তবে বৌবাজার রঙ্গমঞ্চে 'রামের রাজ্যাভিষেক' 'সতী', 'হরিশ্চন্দ্র' প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নাটক অভিনয় করা হয়। অতঃপর ১৮৬৯ খৃঃ নাট্যাভিনয় শীর্ষস্থানে অধিরোহণ করিল। ঐ সময় শারদীয়া সপ্তমীর দিন যখন বাংলার খ্যাতনামা যুবক সম্প্রদয় শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিলেন, তখন সকলেই গভীর বিস্ময়ে আপ্লুত হইল। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই শতমুখে এই নাটকখানির গুণ গরিমা প্রচার করিতে লাগিলেন।

ইহার পর কয়েক বৎসর যাবৎ নাট্যাভিনয় সম্পর্কে বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে থাকে। একপক্ষ বলিতে লাগিলেন, 'এমেচার পার্টি' অর্থাৎ বিনা পয়সায় অভিনয় করিয়া কোনই সার্থকতা নাই। অপরপক্ষ বলিতে লাগিলেন—না, ইহাতে যথেষ্ট উপকারিতা আছে। অবশেষে নাট্যপ্রবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অপরিমেয় চেষ্টায় এই বিরোধের অবসান হয়। তাঁহার মতানুযায়ী 'এমেচার ভাবেই' অর্থাৎ বিনাপয়সায় নাটক অভিনয় করা স্থিরীকৃত হইল।

অনন্তর ১৭৮২ খৃঃ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অশ্রান্ত উৎসাহে 'নীলদর্পণ' অভিনীত হইল। এই অভিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। তৎসঙ্গে গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের যশোগাথা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইহার অব্যবহিত পরে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' (National theater) নামে আর একটী সাধারণ নাট্যশালা স্থাপিত হয়। এই নাট্যালয়ে ক্রমান্বয়ে 'নবীন তপস্বিনী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক অভিনীত হয়। কিন্তু অতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্য ও দলাদলির সৃষ্টি হওয়ায় এই নাট্যাগারটী অচিরেই বিনষ্ট হইল।

'ন্যাশনাল থিয়েটার' (National theatre) নাট্যালয়টী উঠিয়া গেলে, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নিজ উৎসাহ ও অর্থব্যয়ে ১৮৭২ খৃঃ নবেম্বর মাসে তাঁহার বসত বাটীর সম্মুখে টাইল দ্বারা সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত একটী রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিলেন এবং 'বেঙ্গল্ থিয়েটার, (Bengal theatre) নামে উহার নামকরণ করিলেন। কালে এই নাট্যমঞ্চই 'পাব্লিক্ ষ্টেজ্' এ (Public stage) অর্থাৎ সাধারণ নাট্য নিকেতনে পরিণত হয়। এই সময় আর একটী নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এ যাবৎ পুরুষেরাই অভিনেতা ও অভিনেতৃর স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছিল কিন্তু এখন হইতে স্ত্রীলোকেরা অভিনেত্রীর আসন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। এই নাট্যমঞ্চে বহু নাটক অভিনীত হয়; তন্মধ্যে 'শর্ম্মিষ্ঠা' 'মায়াকানন' এবং 'উঃ কি মোহান্তের এই কি কাজ' সমধিক উল্লেখ যোগ্য।

১৮৭২ খৃঃ হইতে 'বেঙ্গল থিয়েটার' (Bengal theatre) প্রকৃত পক্ষে বাংলায় স্থায়ী নাট্যমঞ্চের স্থান অধিকার করে এবং ইহাতে নিয়মিত ভাবে অভিনয় হইতে থাকে। এই সময় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ রায়, শ্রীযুত অমৃত লাল বসু, শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুত মনমোহন গোস্বামী, শ্রীযুত ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট অভিজ্ঞ অভিনেতৃগণের সমবেত চেষ্টা ও উৎসাহে 'বেঙ্গল্ থিয়েটার' এ (Bengal theatre) অহঃরহঃ নাট্যাভিনয় চলিতে লাগিল। এইভাবে ধনী নির্ধন, উচ্চ নীচ সকলেই ক্রমাগত অভিনয় দর্শনে অত্যধিক আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রায় ত্রিশ বৎসর অতীত হইলে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কলিকাতার অনেক স্থানেই নাট্য নিকেতন স্থাপিত হইল। এই সময় হইতে অর্থের বিনিময়ে অভিনয় দেখানর প্রথা সুরু হইল। অতঃপর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবার একজন অলৌকিক প্রতিভা সম্পন্ন নাট্যবিৎ বাংলার নাট্যমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। ইনিই জনপ্রিয় শ্রদ্ধাস্পদ শিশির কুমার ভাদুড়ী। নাট্য জগতে এই নাট্যবিশারদ বহু নূতন বিষয় সংযোজিত করিলেন। ইহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় বাংলার নাট্যমঞ্চ আজ এত অত্যধিক উচ্চাসনে স্থাপিত। বড়ই আনন্দের বিষয় যে নাট্যাভিনয়ের কথা সমালোচিত হইলে বাংলার নাট্যমঞ্চ আর এখন বাদ পড়েনা। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সকলেই সমস্বরে বাংলার নাট্যমঞ্চের প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহাই আমাদের গৌরব। ইহাতেই আমাদের পরম পরিতৃপ্তি।

রামমোহন

শ্রীশান্তা দেবী বি, এ

নদীগর্ভ শুকাইয়া গেলে ধরিত্রী যখন মরুভূমি হইয়া উঠে, তখন পঙ্কিল খানা ডোবা পুষ্করিণীর বিষময় জলই হয় মানুষের প্রাণস্বরূপ। যে বিষ দিনে দিনে মানুষের আয়ুক্ষয় করে, তাহাকেই আকণ্ঠ পান করা ছাড়া জীবন ধারণের আর অন্য উপায় থাকে না। আত্মরক্ষার নামে যে তাহারা আত্মহত্যা করিতেই বসিয়াছে ক্ষীণদৃষ্টি সাধারণ মানুষ তাহা বোঝে না। সগর রাজার বংশ ব্রহ্মশাপে ধ্বংশ হইয়াছিল আমরা পুরাণে পড়িয়াছি, ধরণীর জীবনরূপিণী নদীর রসধারা লুপ্ত হইয়া যায় বিধাতারই অভিশাপে মানুষ বলিয়া থাকে। তখন :সুরু হয় মানব সংসারে ধ্বংসলীলা। এমন দিনে মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু আপারকুল প্লাবিনী প্রলয়বন্যারূপিণী জলধারাই।

সগররাজ বংশকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগীরথ বহু তপস্যা করিয়া স্বর্গের অমৃতধারা মর্ত্তে বহাইয়াছিলেন। তাঁহারই তপস্যায় সমস্ত পৃথিবীবে প্রাণরস সঞ্চারিত হইল।

জগতের ইতিহাসে আমরা বার বার দেখিয়াছি সমাজের প্রাণধারা যখন শুষ্ক পঙ্কিল ও স্রোতহীন হইয়া আপনার বিষে আপনি মৃতপ্রায় হয় তখনই তাহার উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন হয় কোনো মহা-ভগীরথের অমৃত জলধারার। কিন্তু অমৃতপ্রবাহকে কয়জন অমৃত বলিয়া চিনিতে পারে।

ভারতবর্ষ যখন আপনার প্রাচীন সমাজ ধর্ম্ম ও শিক্ষার সম্পদকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল এবং আপনার ভৌগোলিক প্রাচীর ও পরিখা বেষ্টিত হইয়া জগতের সকল সভ্যতা উদারতা ও প্রগতি হইতে স্বভাবতই বিচ্ছিন্ন ছিল তখনই সেই যুগসন্ধি ক্ষণে পৃথিবীর নানা অমর মহাপুরুষের মত এই মহামানব রামমোহন ভগীরথের তটপ্লাবিনী গঙ্গার মত আপনার ধীশক্তি প্রাণ-শক্তি ধর্ম্মবুদ্ধি ও মমতার প্রাচুর্য্য লইয়া স্বদেশের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির জন্য আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু প্রতিভার ও মহত্বের মূল্য বুঝিতে ও প্রতিভা এবং মহত্বের কিছু প্রয়োজন আছে। দেশের সমাজধর্ম্ম ও শিক্ষার প্রবাহ যখন স্রোতহীন বালুগর্ভের মত শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল তখন এই মহাপুরুষের সর্ব্বতোমুখী সংস্কারের তীব্র গতিবেগ সহ্য করিবার এবং তাহাকে উপযুক্ত মূল্য দিবার যোগ্যতা মানুষের:ছিল না। তাঁহার ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার ত মানুষের চোখে সমাজ ও ধর্ম্মের .সংহার বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়াছিল। মানুষের প্রাণকে সঞ্জীবিত করিবার জন্যই পার্ব্বত্য নদীর জলধারা প্রচণ্ডবেগে দুইকুল ভাসাইয়া বন্যার মত নামে। রামমোহন ভারতের পরিপূর্ণ মুক্তিকে অখণ্ড ও সমগ্রভাবে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই এবং এমন কি সমগ্র পৃথিবীর সহিত ও ভারতকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবেন নাই বলিয়া তাঁহার প্রাণশক্তির উৎস হইতে উৎসারিত এই বহির্মুখী কর্ম্মধারাকে তখনকার ভারতবাসী বিধর্ম্মীর বিদ্রোহ বলিয়াই মনে করিয়াছিল। সমগ্র

মানব জাতিকে একই দেবতার সন্তান বলিয়া জানিয়া তিনি মানবদেহে প্রতিষ্ঠিত দেবতার সর্ব্বপ্রকার অবমাননা হইতে স্ত্রী পুরুষ জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাই তিনি সে যুগে হইয়াছিলেন দেবতার ভক্তিহীন নাস্তিক। তাঁহার প্রবর্ত্তিত মহাবিপ্লবের হাত হইতে সমাজ ও ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য বিদ্রোহ ভয়ভীত মানুষকে নানা আঁট ঘাট তখন বাঁধিতে হইয়াছিল।

কিন্তু মরুভূমিতে অভ্যস্ত মানুষ স্রোতস্বিনীর গতিবেগকে ভয় করিলেও স্রোতস্বিনী তাহার কাজ করিয়া যায়। রামমোহনকে মানুষ ভয় করিয়াছিল, শত্রুরূপে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছিল, তবু তাঁহারই প্রবাহিত ধর্ম্ম ও জ্ঞানধারার রসে ভারতবাসীর প্রাণ তাহাদের অজ্ঞাতসারে সিঞ্চিত হইয়াছিল বলিয়াই আজিকার ভারতে নব প্রভাতের অরুণরাগ দেখা দিয়াছে। তিনি ধর্ম্মে জ্ঞানে ও কর্ম্মে ভারতকে যে ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার সাধনা করিয়া গিয়াছেন, শতবৎসর পরেও আজ ভারত সে ভিত্তিমূলে পৌঁছিতে না পারিলেও ভারতের এই অর্দ্ধ জাগরণ সেই পূর্ণ জাগরণেরই পূর্ব্ব লক্ষণ। রামমোহনকে অন্তর-দেবতা তাঁহাকে যে সাম্যের বাণী শুনাইয়াছিলেন তাহারই ফলে আজ ভারতে নরনারী উচ্চ নীচ ব্রাহ্মণ শূদ্র, হরিজন সকলে আমরা সমভূমিতে দাঁড়াইবার অধিকার অন্ততঃ দাবী করিতে পারি, কার্য্যতঃ তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব হউক বা না হউক।

রামমোহনের জীবনকালে যাহা বিদ্রোহ ও বিপ্লব ছিল তাহাই ক্রমে ক্রমে মুক্ত বায়ু ও জলের মত আমাদের প্রাণ মনের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইয়া যাইতেছে। যে বায়ুলোক আমাদের প্রাণরূপে এমন করিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে যে জলধারা আমাদের শরীরের শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত তাহাদের নিকট আমাদের ঋণ আমরা সর্ব্বাগ্রে ভুলিয়া যাই। বায়ুর অভাব যখন পীড়া দেয় তখনই বায়ুকে মনে পড়ে তার পূর্ব্বে নয়। তেমনি রামমোহনের প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত ভারতে যে টুকু মুক্তি আমরা পাইয়াছি, যেটুকু সার্থকতা জীবনে আসিয়াছে, ঠিক সেই সেই স্থানেই আমরা ভুলিয়া বসিয়াছি, সেই অমর মহাপুরুষকে আজ যে শিক্ষিত জনসাধারণ পৌত্তলিকতা ও বহু দেববাদের রূপক ব্যাখ্যা করিয়া আপনাকে একমাত্র ভগবানের বিশ্বাসী বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, আজ যে স্ত্রীলোকের মনুষ্যত্বকে ও সর্ব্বক্ষেত্রে তাহার অধিকারকে মানুষের বিবেক মনে মনে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে এবং শিক্ষা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতে নব জাগরণ দেখা দিয়াছে এই সকল ক্ষেত্রেই উদ্গাতা ছিলেন যে রাজর্ষি তাঁহাকে আমরা শত বৎসরের মধ্যেই ভুলিয়া বসিয়াছি।

প্রথম ছিল শত্রুতা ও বিরোধের যুগ তারপর আসিয়াছে বিস্মরণের যুগ! কিন্তু রামমোহনের তিরোধানের পর এই দ্বিতীয় শতাব্দীতে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তির সংগ্রামে নূতন নূতন আঘাত ও বেদনা, অবমাননা ও লাঞ্ছনার মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিবার দিন আসিয়াছে সেই মহাপুরুষকে যিনি কোনো অনুপ্রেরণার সম্ভাবনামাত্র কোনো ক্ষেত্রে না পাইয়া ভারতে একক দাঁড়াইয়া সকল ক্ষুদ্রতা ও অন্ধতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু কি পুষ্পাঞ্জলি ও স্তুতিবাক্যের অর্ঘ্যেই আমাদের শ্রদ্ধার অবসান হইবে? পিতামাতার বর্ত্তমানে আমরা

তাঁহাদের ঋণ শোধ করি তাঁহাদেরই বংশ ধারার সেব ভিতর দিয়া। মাতার যে ঋণ জীবনে আমার নিকট সঞ্চিত হইয়াছে, সন্তানের সেবায় সেই মাতার অনন্ত ঋণকে শোধ করিবার চেষ্টাই আমাকে করিয়া যাইতে হইবে।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষ এই মহারথী সর্ব্বাগ্রে তাঁহার অন্তরদেবতাকে স্বীকার করিয়া মনুষ্যত্বের সকল অবমাননা ও সকল প্রকার দাসত্বের বিরুদ্ধে আজীবন তীব্র সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, হিমাচলে ও সাগর-বেষ্টিত দেশে জন্মিয়াও বিশ্ববাসীকে এক দেবতার সন্তান জানিয়া তাহাদের যে কোনো মুক্তিতে আনন্দ করিয়া গিয়াছেন এবং মানব জাতির সেবায় আপনার অসামান্য প্রতিভাকে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে জাগরণের অগ্রদূতরূপে ভাগ্যহীন ভারতে দেখা দিয়াছিলেন, ভারত তাহা আজিও উপলব্ধি করে নাই। ভারতের নরনারী আজ তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে উপলব্ধি করিয়া তাঁহারই প্রবর্ত্তিত পথে শতাব্দীর জড়তা দূরে ঠেলিয়া নূতন উদ্যমে পূর্ণ-মানবতা লাভের প্রচেষ্টায় জয় যাত্রা করিয়া তাঁহার কীর্ত্তিধারা চির প্রবাহিত রাখুক, ইহাই আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা।

রামমোহন শতবার্ষিকীতে মহিলা সভায় পঠিত।

তৃপ্তি

শ্রীঅমিয়া সরকার

ছন্দ আমার লুকান থাক্,
ছন্দে মনের কথা,
ছন্দে ঝরে আনন্দ মোর,
ছন্দে প্রাণের ব্যথা।
ছন্দ গাঁথি, একথা মোর
নাইবা জানুক্ কেউ,
তাদের প্রাণে লাগ্‌বে কিগো
আমার প্রাণের ঢেউ।

স্মৃতির পূজা

শ্রীরমা দেবী

স্মৃতি, তুমিই মানবের জীওনকাঠি। তোমার স্পর্শে মানব হাসে, কাঁদে, অকূলে কূল পায়। যেদিন ধরণীর বুকে মানব প্রথম চোখ মেলে তাকালে তখন হতেই তুমি তার সুখ দুঃখের চিরসাথী। কি শৈশবে, কি যৌবনে, কি প্রৌঢ়ে, কি বার্দ্ধক্যে সকল অবস্থায় তুমি একমাত্র সহায় হ'য়ে রয়েছ।

শৈশবের ধূলিখেলার মধ্যে মানব যখন ধীরে ধীরে সুখ দুঃখের আস্বাদন পেতে থাকে, তখন তুমি তার খেলা ঘরের বাল্যবন্ধু। যৌবনের মত্ততায় মানব যখন বিভোর, তখন তুমি তার প্রিয় সাথী। বার্দ্ধক্যের স্থবিরতায়, শোকের বহ্নিতে মানব যখন জরাজীর্ণ, তখন মানবের মন দর্পণে তোমার ছায়াই তাদের মনকে সান্ত্বনা দান করে।

আমার এই জীবনও একদিন সেই শৈশবের চঞ্চলতা, যৌবনের উন্মাদনা, বার্দ্ধক্যের স্থবিরতা বহন করে এনেছে। দুঃখের অংশ হতেও এজীবন বাদ্ পড়েনি।

যৌবনের মাঝ কিনারায় যখন আমার তরীখানি বেয়ে চলেছে, তখন পারের সন্ধান বলে দিয়েছিল, অর্দ্ধাহারী চাষীর ঘরের মেয়ে ফুল্লরা। সে ছিল অনাথা, হতভাগ্য সন্তান। শৈশবের প্রথম সোপানে তার পিতামাতা তাকে পরিত্যাগ করে জন্মের মত সংসার হ'তে মুক্তি পেয়ে গিয়েছিল। তাদের অসমাপ্ত কর্ত্তব্যের বোঝার ভার হাসিমুখে বহন করে নিলে, তাদেরই প্রতিবেশিনী জয়া। জয়া, ফুল্লরাকে বাঁচিয়ে তুল্লে আমার জীবনকে গড়ে তুল্‌বার জন্য। সে তাকে নিজের মেয়ের মত স্নেহ করত।

ফুল্লরার চেহারাখানি ছিল, সদ্য ফুটন্ত কুঁড়ি হতে ফোটা ফুলের মতন। বড় বড় কাজল মাখা চোখ দুটি, পদ্মের পাঁপড়ীর ভঙ্গিমাতে গড়া। মন ছিল তার, শিশুর মত সরল, ঝরণার জলের মত স্নিগ্ধ স্বচ্ছ, পবিত্র। দেহের আকারখানি মনে হোত কোন এক শিল্পীর হাতের খোদাই করা মানস প্রতিমা। বর্ণ ছিল গৌরবর্ণ, স্বর্ণকারের ঢালাই করা স্বর্ণের মতনই উজ্জ্বল।

সারাদিনের কর্ম্ম-অবসানে যখন বাড়ী ফিরতুম, তখন ফুল্লরা এসে নানা গল্পচ্ছলে আমার ক্লান্তি দূর করে দিত।

তার সঙ্গে যখন আমার পরিচয়, তখন তার বয়স দশ বৎসর মাত্র। তাদের বাড়ীর নিকটেই আমার বাসা বেঁধে ছিলুম। সেই বালিকা বয়সের চঞ্চলতার মধ্য দিয়ে আমি তার, দেশের প্রতি অনুরাগের যথেষ্ট আভাস পেয়েছিলুম। দেশের যাঁরা বীর যোদ্ধা তাঁদের গল্প যখন তার কাছে করেছি, তখন তার প্রাণ উৎসাহে নেচে উঠেছে। আমার পানে তাকিয়ে বলত, "কুমার, আমিও বড় হ'লে ওইরকম দেশের জন্য প্রাণ দেব। তুমি যাবে না, কুমার? তার কথা শুনে হেসে বলতুম,

নিশ্চয় যাব, তুমি আমায় সঙ্গে নেবেত, ফুল্লরা ? ভুলে যাবেনা ত ?" ফুল্লরা অম্‌নি উত্তর দিলে, "নেব বৈকি।" কিন্তু তুমি যদি হেরে যাও ? তা কিন্তু হবে না—জিতে ফিরে আস্‌তে হবে।" তার বালিকা-সুলভ মিষ্টি কথাগুলি বাস্তবিকই আমার মনকে আনন্দ দান কর্‌তো। এইভাবে এই খেলাধূলার মধ্যে আমার দিন কেটে গেল, পাঁচ বৎসরের গ্রহের ফাঁকে। দিনগুলি যে কিকরে কাট্‌লো, টের পেলুমনা। যখন ফুল্লরার জীবন আমার জীবনের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা হতে যাচ্ছে ঠিক্ সেইসময় ডাক্ পড়ল সমর-ক্ষেত্রের মাঝখানে, দেশকে বাঁচাবার জন্য। মন তখন ওই ডাকে সাড়া দিতে মোটেই প্রস্তুত হয়নি। দোটানার ঘুর্ণীপাকের মধ্যে কেবলই তখন পাক্ খাচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই, যেতেই হবে।

২

যেদিন যাবার দিন কাছে এল, ফুল্লরা এসে আমার হাতখানি ধরে মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বল্লে, "দেশকে রক্ষা করতে পার্‌বে কুমার ? জন্মভূমিকে পরের হাতে যেন সঁপে দিয়ে এসনা। যদি নিতান্তই দিতে হয় তবে তার আগে যেন আমাদের দুজনের প্রাণ এই দেহ হতে মুক্ত হতে পারে। এই ব্যথা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবোনা, কুমার।"

পারবেনা—ফুল্লরা, সত্যি বল্‌ছ ? তবে তোমার কথাই সত্য হোক্। যদি জন্মভূমিকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে দিতে হয় তবে.........

ফুল্লরা, না, না, কুমার, এত মঙ্গলের কথা মুখে এনোনা। মনে কর্‌তেও বুক কেঁপে ওঠে। মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ট হ'য়ে যার কোলে প্রথম প্রাণ জুড়িয়েছিল, জন্মের মুহূর্ত্তের সঙ্গে আজ পর্য্যন্ত যে আলো বাতাস প্রতিমুহূর্ত্তে দেহে প্রাণ সঞ্চার করে দিচ্ছে, যার অন্নে এই দেহ বর্দ্ধিত—আজ কেমন করে তাকে পরের হাতে সঁপে দিয়ে আস্‌বে, কুমার ? মনে রেখো, আজ তোমার সম্মুখে কঠিন অগ্নি-পরীক্ষার দিন। এই পরীক্ষায় জয়ী হয়ে যেদিন ফিরে আস্‌বে, সেইদিন তোমার গলায় জয়মাল্য পড়াবে, এই হতভাগ্য জন্মদুঃখিনী নারী তোমার স্নেহপাত্রী ফুল্লরা। প্রেমের জয়-তিলক তোমার কপালে এঁকে দিয়ে তার এই অভিশপ্ত নারী-জন্ম সার্থক করে তুল্‌বে। ফুল্লরার এই আশা যেন ব্যর্থ না হয় দেখ, কুমার।" ফুল্লরা, তার ঘর হতে একটি তলোয়ার এনে আমার হাতে দিলে। তলোয়ারখানি দেখে মনে হ'ল, প্রায় একশ বছরের কম হবেনা। জিজ্ঞেস কর্‌লুম, "ফুল্লরা, এটি তুমি কোথায় পেলে ?"

ফুল্লরা বল্লে, এটি আমার বাবার জিনিষ। শুনেছি, আমার বাবা জন্মগ্রহণ কর্‌বার পর তাঁর ঠাকুরদাদা, এটি বাবাকে উপহার দিয়েছিলেন। তাই এটি আজ আমার কাছে বড় প্রিয় জিনিষ হ'য়ে রয়েছে, বাবার এই তলোয়ার আর মায়ের একটি আংটী, আজ আমার জীবন যাত্রার অমূল্য সম্পদ। তারই একটি আজ তোমার হাতে সঁপে দিলুম। পুর্ব্বপুরুষদের আশীর্ব্বাদ যেন তোমার মস্তকে বর্ষিত হয়, তুমি যেন জয়ী হ'য়ে ফিরে আস্‌তে পার। তলোয়ারখানি ফুল্লরা খুলে আমার

হাতে দেবার সঙ্গে সঙ্গে, ওর মধ্যেদিয়ে একটা বিদ্যুতের খেলা খেলে গেল। বল্লুম,—"হাসিমুখে. বিদাও দাও ফুল্লরা।" ফুল্লরা বল্লে, "তাই দিলুম, কুমার"।

যুদ্ধের ভীষণ তাণ্ডবনৃত্য চলেছে। অসংখ্য মানবের শোণিতধারায় আজ জন্মভূমি কলুষিত। আর্ত্তনাদের করুণশব্দ, আকাশ পাতালকে ভেদ করে চলেছে। চারিদিকে তারই প্রতিধ্বনি বার বার ফিরে ফিরে এসে এই কলুষতার বিভীষিকার মূর্ত্তিকে সজাগ করে তুল্ছে। কি ভয়ঙ্কর মানবের পরিণাম! মানুষ মানুষকে আপন হাতে আজ দগ্ধে মার্ছে। যে মানব সামান্য ব্যথায় কাতর, যার অন্তর শোকের যাতনায় ব্যথিত হয়, সেই আজ নিজের হাতে ছুরী বসাতে কাতর হয় না! যে একদিন পরম বন্ধু ছিল, সে হ'ল আজ পরম শত্রু? কিসের মোহে আজ মানবের এই পরিণাম? জানি—জানি প্রচণ্ড স্বার্থ এর পশ্চাতে রয়েছে। স্বার্থেরই জ্বলন্ত চিত্র, এই সমরভূমি। আর আমি, আমিও সেই স্বার্থের জ্বলন্ত চিতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে, ভাইয়ের বুকের রক্তে, হাত কলুষিত কর্ছি। এর প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? নেই—হতে পারে না। আজ কত গৃহ শূন্য হয়ে গেল, কত শত নারীর চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, কত নারী পতিহীনা। কত সন্তান আজ পিতৃহারা। তার শেষ আছে কি? সকল দুঃখের ভয়াবহ দৃশ্য হোল এই যুদ্ধের পরিণাম। কিন্তু তা জেনেও মানব এই মোহ পাপ হ'তে নিজেকে দূরে রাখ্তে পারে নি। তাই জগতের ইতিহাসে বার বার এরই খেলা চলেছে।

৪

কামানের ভীষণ গর্জ্জন। আবার সেই রণপ্রাঙ্গনের মাঝে আমি। দেখ্তে দেখ্তে অসংখ্য মানবের দেহ লুটিয়ে পড়ল জন্মভূমির কোলে। যুদ্ধের বিরাম নেই। হঠাৎ সজোরে মাথার উপর আঘাত পেলুম, চেতনা লোপ হোল। যখন চেতনা ফিরে পেলুম তখন দেখ্লুম শিয়রের কাছে বসে ফুল্লরা। বিষাদের ছায়ায় তার মুখখানি ঢেকে দিয়েছে। দেহখানিতেও সেই লাবণ্য আর নেই। কে যেন এরই মধ্যে নিংড়ে বার করে নিয়েছে। অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে রইলুম। বল্লুম "ফুল্লরা, তুমি কি করে এই ভয়ঙ্কর স্থানে এলে? ফুল্লরা চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বল্লে" কুমার, শৈশবে পিতৃমাতৃহারা হ'য়ে পিতামাতার স্নেহ হ'তে বঞ্চিত হয়েছি। সেই সুখ কেমন জানি না। এই হতভাগ্য জীবনের প্রথমে তোমার দানই আমার জীবনকে বিকশিত করে তুলেছে, সুখের আলোর রেখার রবি, প্রথম অন্তরকে স্পর্শ করে তুলেছে। এই দীন দুঃখিনী ফুল্লরার জীবনের আশা, ভরসারস্থল হ'লে, কুমার—তুমি। তুমি চলে আস্বার পর হতেই দিনগুলি আমার কাছে একটি দুর্ব্বহ বোঝার মত মনে হ'তে লাগ্লো, তাই এই কণ্টক হ'তে মুক্তি পাবার জন্য তোমার পাছে ছুটে এলুম। সেবিকার কাজেই এরা আমাকে নিযুক্ত করে নিলে, তাই আজ

তোমার পাশে এসে দাঁড়াতে পেরে কৃতার্থ মনে কর্‌ছি।" অসহ্য যন্ত্রণা। কথা বল্‌বার শক্তি নেই। অনেক কষ্টে বল্লুম, "ফুল্লরা, জন্মভূমিকে কি রক্ষা করতে পারলুম?" ফুল্লরার চোখ দুটী জলে ভরে এলো, আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বল্লে, "এখনও যুদ্ধের শেষ হয়নি, কুমার।" "তবে কি হবে ফুল্লরা, জন্মভূমিকে রক্ষা কর্‌তে কি পারবোনা? শৃঙ্খলিত দেখে মর্‌তে হবে?" হঠাৎ কাণে একটা বিষম গোলমালের শব্দ এল। সমস্ত শরীর ভয়ে কেঁপে উঠ্‌ল। উঠ্‌বার চেষ্টা করলুম, পার্‌লুম না। ফুল্লরা, তাড়াতাড়ি আমার হাতদুটি চেপেধরে শুইয়ে দিলে। "কিসের গোলমাল ফুল্লরা?" ফুল্লরা ভালকরে শব্দটা শুনে সেও আনন্দে চিৎকার করে উঠ্‌লো। বল্লে "আমরা জয়ী হয়েছি, জয়ী। দেশকে ফিরে পেয়েছি, কুমার।"

আনন্দ কর্‌বার শক্তি নেই, সব হারিয়ে ফেলেছি। তখনও অসহ্য মাথার যন্ত্রণা। ফুল্লরা তখুনি নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে আমার সেবায় মন দিলে। আমার পাশে আরো আমার মতনই ব্যথায় কাতর সৈনিকের দল শায়িত। তাদের সেবার জন্য মাঝে মাঝে ফুল্লরাকে মন দিতে হচ্ছে। ফুল্লরার মতন আজ অনেক নারী গৃহত্যাগ করে এই সেবিকার পদে আত্মনিয়োগ করেছে। ধনীর ঘরের ঐশর্য্যশালিনী ভোগবিলাসিতায় বর্দ্ধিতা নারী, আজ সকল সুখকে পদদলিত করে এই সেবায় নিরতা। তারা দুঃখকে একমাত্র জীবনের সম্পদকরে নিয়ে এই পথের পথিক হয়েছে। ফুল্লরাও তাদের মতনই একজন নারী। নারী, সকল রকম দুঃখকে বরণ করে থাকে, তাই এই দুঃখের ভাগীও সেই নারীকেই হতে হয়েছে। নারীর শক্তি, নারীর বাহুবল, নারীর অন্তরের প্রেরণা, দুঃখীর দুঃখ মেটায়, দুর্ব্বলচিত্তে বলদান করে, শক্তিহীনকে শক্তি দেয়।

ফুল্লরা বল্লে, "কুমার, চল এবার আমরা বাড়ী ফিরে যাই।" ফুল্লরার সেবা যত্নে সে যাত্রায় প্রাণ ফিরে পেলুম। একটি হাত গুলির আঘাতে জখম হ'য়ে রইল। মাথার আঘাতটা যদিও খুব বেশী হয়েছিল কিন্তু অল্পদিনের ভিতর আরাম পেলুম। বাড়ী ফিরে এলুম। বাড়ী আস্‌বার কয়েকদিন পর ফুল্লরা বল্লে "কুমার আজ আমাদের আনন্দ করবার দিন এসেছে। এস আমরা দুজনে এই তলোয়ারখানি ছুঁয়ে শপথ করি, যেন সুখে দুঃখে কোনও অবস্থাতেই আমাদের এই মিলন ছিন্ন না হয়। আজ আমাদের মিলনের দিন। যদি মৃত্যু এসে আমাদের মাঝে ব্যবধান হ'য়ে দাঁড়ায়, তখনও যেন আমাদের এই পবিত্রভাব নষ্ট না হতে পারে।" তলোয়ার ছুঁয়ে শপথ কর্‌লুম। ফুল্লরা, জয়মাল্য গলায় পরিয়ে দিয়ে জয়তিলক কপালে এঁকে দিলে। ফুল্লরাকে জীবনের সঙ্গিনীরূপে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে কর্‌লুম। জয়া, আমাদের এই আনন্দে তার আনন্দকে মিশিয়ে দিয়ে ফুল্লরাকে আমার হাতে সমর্পন কর্‌লে। দেবার সময় বল্লে "তোমারমত উপযুক্ত পাত্রে ফুল্লরাকে দান করে আজ আমার কষ্টের সার্থকতা বলে মেনে নিচ্ছি।"

তোমরা জীবনকে উন্নতির পথে নিয়ে গিয়ে বিবাহ বন্ধনকে দৃঢ় করে তোল এই আমার আশীর্ব্বাদ। আমার আত্মীয় স্বজন যারা ছিল সকলেই এই বিবাহে আপত্তি জানালে। কিন্তু সেই

আপত্তির বাধা এই নারীর অন্তরের বিশুদ্ধ প্রেমকে অবহেলা করে নিতে পারলেনা। সেই দীনদরিদ্র কৃষকের মেয়েই হোল আমার জীবনের চিরসঙ্গিনী। আমিও ফুল্লরার মতন পিতৃমাতৃহীন সন্তান।

আমার নিজের বলতে একটিমাত্র ভগ্নী ছাড়া দুনিয়ায় কেউ নেই। সে আমার চাইতে বয়সে ছোট। তার সংসারে সে একাই গৃহিণী। কাজেই তার সঙ্গে দেখা হওয়া খুব কমই ভাগ্যে ঘটে থাকে। আমার বিবাহের কথা যখন শুনলে তখন তারও মনে যে ব্যথা না লেগেছিল তা নয়, কিন্তু আমার সুখটা, সে তার নিজের ব্যক্তিগত সুখের চাইতে বড় ক'রে দেখতে শিখেছিল। তাই এই সংবাদ পাওয়া মাত্র আমাকে লিখে জানালে—

ভাই দাদা,

তোমার সুসংবাদ পেলুম। তোমার উপর অনেক আশা করেছিলুম। কিন্তু তুমি যদি সুখী হও, তাই দেখেই আমার আনন্দ। আমাদের ঘর আজ অনেকদিন হ'তে শূন্য। আজ সেই শূন্য ঘরের গৃহিণী হ'য়ে যে আমাদের কাছে আসছে সে যেন সেই স্থান পূর্ণ করতে পারে। তবেই মনের আশা মিটবে। তোমার জীবন সুখের হোক্।

তোমার বোন শেফালি।

চিঠি পেয়ে মনে বড় আনন্দ হোল। ভাবলুম, এই আমার বোন হবার উপযুক্ত বটে। শেফালির যখন বিবাহ হয় তখন পিতা জীবিত। পিতা শেফালিকে সৎপাত্রে দান করেছিলেন। ছেলেটীর জমীদারি ছিল। তারই আয়ে তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হোত। সেই সুখ শেফালির ভাগ্যে বেশীদিন সইল না। বিধাতা তার সুখে বাদ্ মানলেন। দুটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার কিছুদিন পরেই সুখের সংসার তার চূর্ণ হয়ে গেল। বৈধব্যের ছাপ্ তার দেহের ভূষণ হয়ে রইল। শ্বশুর জীবিত অবস্থাতে এই বিপদ ঘটে যাওয়ায়, শেফালির ব্যবস্থা তিনি করে গেলেন। খাওয়া পড়ার দুঃখ তার রইল না।' স্বামী ছিল তার সেই ঘরের আদালের ঘরের দুলাল।

বিবাহের একবৎসর কত সুখের স্বপ্নের সঙ্গে আমাদের দিন কেটে গেল। দুঃখ যে মানবের অন্তরে আসতে পারে তা তখন ভাবতে পারিনি। সুখের নানা স্বপ্নের জাল আমরা তখন দুজনে বুনে যাচ্ছি। কিন্তু সেই জাল বুনবার মাঝখানে আমার জালবুনার সূতো হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। ফুল্লরার শরীরে কঠিন রোগ এসে দেখা দিলে। ডাক্তারেরা বলে গেলেন, "যক্ষ্মারোগের প্রথম আভাসগুলি শরীরে প্রকাশ পেয়েছে, এখুনি তার ব্যবস্থার প্রয়োজন।" স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তনের জন্য তাকে নিয়ে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ালুম। কিন্তু রোগের অবসান হোলনা। দিনের পর দিন তাকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে নিয়ে চল্লে। আমাদের মাঝখানে ওই মৃত্যু এসে তার যবনিকার ছায়া ফেলতে সুরু করলে। একদিন সে চুপি চুপি এসে জোর করে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। যাবার আগের দিনও ফুল্লরাকে বলেছিলুম, ফুল্লরা, তোমাকে আমি কিছুতেই যেতে দিতে পারবোনা

জীবনের প্রথম প্রভাতে তুমি এসে দেখা দিয়েছিলে শুকতারার মতন। হৃদয় জেনেছিল একমাত্র তোমাকেই এই শূন্যময় জীবনে। আজও সেই তুমি আমার সকল অবস্থার— হ'য়ে রয়েছে।

ফুল্লরা সেই আগের মতনই একটু হেসে, ধীরে ধীরে হাতখানি তার হাতের মধ্যে নিয়ে বল্লে, "কুমার, যদি যেতে হয় তবুও সেই শপথ কখনও ভঙ্গ হবে না। মৃত্যুর পরপারে এই মিলন আরো জ্বলন্ত হ'য়ে দেখা দেবে। আজ স্মৃতিকে তোমার পারের কাণ্ডারী কোর। সেই তোমার দুঃখের সম্বল হ'য়ে থাক্‌বে, কুমার যেমন ক'রে একদিন মরণের মুখে তোমায় বিদায় দিয়েছিলুম, আজ সেইভাবে মৃত্যুর পথযাত্রীকে বীরের মতন তুমি বিদায় দাও। তুমি বিদায় না দিলে মরেও শান্তি পাব না যে।" ঠোঁট কেঁপে উঠ্‌ল, বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে এল! ভাবলুম যাবার সময় একি কঠিন শাস্তি দিলে, ফুল্লরা?—আমি বীর নই, আমি তোমার, অতি দীন হীন দুর্ব্বল কিন্তু, ভীরু, কাপুরুষ, চিরজীবনের সাথী মাত্র।

ফুল্লরা তবু বল্লে—আমি জানি তুমি আমার বীর, সাহসী যোদ্ধাপতি। এ কথা আমি ভুল্‌তে পারবো না। 'বল, বল, একবারটি বল—আর দেরী কোরনা, কুমার' তার কথা মতই তাকে বিদায় দিতে হোল। ফুল্লরা হাসি মুখে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

'স্মৃতি', আজ তুমিই আমার সেই ভবের কাণ্ডারী। মানব যখন সুখে অশ্রুপাত করে, তখন সেই অশ্রুর প্রতি কণার মধ্য দিয়ে তোমার চেতনা বর্ত্তমান।

দুঃখের বেদনায় মানব যখন চেতনা হারা হয়, তখন তুমি তাদের জীবন কাঠি হ'য়ে তোমার স্পর্শের দ্বারা সজাগ করে তোল। সেই স্পর্শ লাভে মানব অকূল সংসার সমুদ্রে, কূলের সন্ধান পায়। আমার জীবনকে তোমার স্পর্শেই সজীব করে রেখেছ। সুখের দিনে তুমি ছিলে সহচরী, দুঃখের অশ্রুজলে আজ তুমি আমার দুঃখহারী হ'য়ে রয়েছ।

———

নৃত্য-কলা

শ্রীপঙ্কজিনী সেন গুপ্তা

ললিতকলাশাস্ত্রের যে কয়টি অঙ্গ আজকাল জনসমাজে বিশেষ Appealing বা চিত্তাকর্ষক বলে খ্যাতি লাভ করেছে, তার মধ্যে নৃত্যকলা যে অন্যতম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

য়ুরোপের বহুদেশে আজকাল এর গভীর বিকাশ দেখা যাচ্ছে। পাশ্চাত্যের নরনারী যেন একে তাদের সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতির একটি অঙ্গ বলেই মেনে নিয়েছে তার ফলে এবিষয়ে তারা যে পরিমাণে পারদর্শিতা লাভ করেছে, তা সত্যি বিস্ময়কর।

আধুনিক পাশ্চাত্য নর্ত্তকীদের মধ্যে যিনি সব চাইতে বেশী যশস্বিনী হতে পেরেছেন, তিনি হচ্ছেন একটি ইংরেজ মহিলা তাঁর নাম Miss Emit gretien কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তাঁর নৃত্যভঙ্গিমার অপরূপ সৌন্দর্য্যে, তিনি সকলকে মুগ্ধ করে গেছেন।

এই নাচের ঢেউ আমাদের হতশ্রী বাংলা দেশেও এসে লেগেছে। বাংলার মেয়েদের মধ্যে এসে বেশ একটা আনন্দের আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছে তা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে-নাচের লালিত্যে পাশ্চাত্য জন সাধারণ মুগ্ধ, যা তাদের চোখে প্রশংসার জ্যোতি ফুটিয়ে তুলছে, তাই আমাদের দেশে এক গভীর সমস্যার অবতারণা করে তুলেছে।

আমাদের সমস্যা হচ্ছে, প্রাপ্তবয়স্কা কুমারী বাঙ্গালী মেয়েদের নিয়ে। বাংলাদেশের অনেকেই আজ "বড় মেয়েদের নাচ" এর কথা শুনলেই মুখ ফিরিয়ে নেন। তাঁদের মতে নৃত্য বর্ত্তমান বাঙ্গালী মেয়েদের শোভা পায়না।

এজন্য তারা অনেক সময় এদেশে নারীনৃত্যের প্রবর্ত্তক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে পর্য্যন্ত অনেক রকম অপ-ভাষায় অভিহিত করে থাকেন।

এই নারী নৃত্যের বীজ, তাঁরা বাংলা দেশ হতে সম্পূর্ণরূপে সমূলে উচ্ছেদ করবেন এই তাদের জীবনের একটি ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের সমস্যা নিয়ে তাঁরা থাকুন, তাঁদের মতবাদের বিরুদ্ধে আমি কিছুই বলতে চাইনা, তবে কোন দিক থেকে আমি নিজে এই সমস্যাটাকে দেখেছি, এবং এই নৃত্যকলা একটি সম্পূর্ণ বৈদেশিক বিদ্যা কিনা, ভারতীয় ইতিহাসে তার কোন অস্তিত্ব আছে কিনা, সে বিষয়েই শুধু দু-একটি কথা বলবো। আমার দিক থেকে আমি এইটুকু বলতে সাহস করি, যে এই নারীনৃত্য বিষয়ে আমাদের দেশে যেকোন সমস্যার অবতারণাই, আজ নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ ইহা ভারতবর্ষের চিরন্তন সৌন্দর্য্যের আদর্শ।

নৃত্যের শোভা নারীর দেহকে ঘিরিয়া অত্যন্ত সহজে লীলায়িত হয়ে ওঠে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ এ সত্য অতি গভীরভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন।

তাই সেদিন গৃহে গৃহে, মন্দিরে মন্দিরে, রাজসভায়; রাজান্তঃপুরে, সর্ব্বত্র নারী-নৃত্যের অসীম আদর ছিল। এক্ষেত্রে হয়ত অনেকে বল্‌বেন রম্ভা, উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরীগণতো স্বর্গের পতিতা নারী। রাজসভায় তো ছিল সব সুন্দরী বারবণিতার মেলা, দেহের বিলাসই তাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং এরা কখনও ভদ্র কন্যাদের আদর্শ হতে পারেনা। আমিও বল্‌ছিনা রম্ভা উর্ব্বশী বা সভা নর্ত্তকীদের কেউ আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের আদর্শ হোক্।

তাদের পেশাকে আর সকলের মত আমিও সমভাবে ঘৃণা করি। কিন্তু তাদের মধ্যদিয়ে ভারতের যে চিরন্তন সৌন্দর্য্যের আদর্শটি ফুটে উঠেছে, তাকে আমি কোন মতেই অশ্রদ্ধা করিতে পারিনা, তাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্যই কবি তাঁর আশ্রমে বাংলা দেশে নারী-নৃত্যের আর একটি নূতন অধ্যায় সূচনা করে দিয়েছেন।

এটা কিছুমাত্র পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ নয়। একে গ্রহণ করতে না পারাটা একান্ত দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। অবশ্য গতানুগতিকতার স্রোতে এখনও যাঁরা গা ভাসিয়ে থাক্‌তে চান, যাঁরা এখনও মনে করেন কোন অসভ্য পুরুষের বিলোপ কটাক্ষপাতে তাদের মেয়েরা অসতী হয়ে যাবেন, তাদের কথা আলাদা। তাঁরা আর কখনও একে প্রশংসার চোখে দেখ্‌তে পার্‌বেন না।

নারী-নৃত্য যে কেবল মাত্র প্রাণহীন দেহের বিলাসই নয়, এটা শুধু বারবণিতাদের পেশা-নয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার যথেষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান।

সম্ভ্রান্ত রাজকুমারীরা ও গৃহে গৃহে শিক্ষক রেখে নৃত্য-শিক্ষা কোর্‌তেন। এটা যে শুধুই রূপ কথা নয় তার প্রমাণ ভারতবর্ষের আদর্শ মহিলা "বেহুলা দেবী," তিনি নৃত্য-গীতে এতটা দক্ষতা লাভ করে ছিলেন, যে সবাই তাকে আদরের ছলে "বেহুলা নাচুনী" বলে ডাক্‌তেন। এই নৃত্যের জোরেই তিনি তাঁর সতীত্বের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরে ছিলেন। সুতরাং এই নৃত্যের প্রথাকে বিলুপ্ত হতে দেওয়া আমাদের অতীতের একটি পরম গৌরবকে বিসর্জ্জন দেওয়ার সমান হয়ে দাঁড়াবে।

মানুষের হৃদয়ের ভাবরাশি যে গানের চাইতেও নাচের মধ্যে অধিকতর মূর্ত্ত হয়ে ওঠে একথা যাঁরা আজ কাল বাঙালী মেয়েদের নাচ দেখেছেন, তারাই স্বীকার কর্‌বেন। অনেক বিশিষ্ট ঘরের বাঙালী মহিলারা আজ নৃত্য কলায় অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন। কোন বাঁধা বিঘ্নই তাদের উৎসাহকে বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন কর্‌তে:পারছেনা।

একদিন তাঁদের এই সাধনা জয়যুক্ত হবে।

বন্দিনীর ব্যথা

হোস্নে আরা বেগম

বন্দিশালার পাষাণ-ঘেরা অন্ধ ঘরের মাঝে
একলা যখন থাকি
আমার মনের গোপন সাথী নিত্য সকাল সাঁঝে
সুধায় আমায় ডাকি
'ওরেরে ক্ষ্যাপা মুক্তি-পাগল
মুক্তি পেতে পর্‌লি আগল
বন্ধ কারায় বন্ধ হয়ে কাঁদন শুধুই সাজে।"
এই কথাটাই মনের তারে সদাই আমার বাজে।

সেই সে কথার কঠিন ঘায়ে আমার সকল দেহে
অগ্নি-দাহন জ্বলে
পাষাণ-পুরীর অন্তরালে—সঙ্গীবিহীন গেহে
দাও গো আমায় বলে
ওগো ভোরের উদাস হাওয়া
নয় কি সোজা মুক্তি পাওয়া?
অন্ধকারায় বন্ধ হয়ে বাঁধন নাহি টুটে?
বন্দী রবে জননী মোদের? রবে সে ধুলায় লুটে?

চুপি চুপি যবে ভোরের আলো পশেগো পাষাণ পুরে
শুধাই তাহাকে ডাকি
ওগো দিবাকর তুমিও আজি রবে কি মরিয়া দূরে
মরমে নয়ন ঢাকি?
সাড়াটি নাহি দিল মোরে কেউ
পরাণে জাগে কাঁদনের ঢেউ
আনমনে বসি মনেতে ভাবি মুক্তি কিসে বা পাই
কেমনে ঘুচাই মোর জননীর অন্তর বেদনাই।

সহসা আমার মরম মাঝে সাড়া কেবা দিল আসি
কাণে কাণে কয় যেন—
অঙ্গেতে মোর বুলায়ে হাত বদনে টানিয়া হাসি
"বিষাদ কিহেতু হেন ?
নাইরে ভয় ঘুচ্‌বে আঁধার
দুঃখের রাতি কাটবে আবার
ওঠ জেগে ওরে বন্দিনী মা, বয়ানে আনরে হাসি
বেদনা-নাশন ভগবান হাসে কংশ কারায় আসি।"
উত্তর শুনি আপন মনে ভাবি শুধু বসি একা
ভাবি আর হাসি খালি
বাঁধন পরিয়া মুক্তি আসে—এই কি নিয়তি লেখা ?
মুছে কি ব্যথার ডালি ?
মুক্তি পেতে হ'ল বন্ধন
হাসিতে আসি করিনু কাঁদন
এই কি আছিল বিধির বিধান, এই কি ধরার রীতি !
বাঁধন নাশিতে সেই সে বাঁধন বাঁধে ফিরে নিতি নিতি।

"বিশ্বাস ও বিজ্ঞান"

স্বর্গীয় শরৎ চন্দ্র দত্ত

মনে পড়ে অনেককাল পূর্ব্বে কাশীতে দশাশ্বমেধঘাটে দেখিয়াছিলাম অনেকগুলি নরনারী গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া করজোড়ে সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। এই দৃশ্যে আমার মনে কেমন এক ঈর্ষার ভাব আসিয়াছিল। ভাবিলাম আমিও যদি ঐ প্রকার অন্ধভাবে বিশ্বাস করিতে পারিতাম! তাহা হইলে পৃথিবীর ঘাত প্রতিঘাতে যখন পথ হারা হই, তখন ঐ প্রকার সরল বিশ্বাসের আশ্রয় লইয়া সান্ত্বনা পাইতাম।

আমাদের জীবনে এইপ্রকার সরল বিশ্বাসের অন্তরায় কি? আমাদের বিজ্ঞানচর্চ্চা যে অনেকের বিশ্বাসকে শিথিল করিয়াছে ইহা আর অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য এমন অনেক আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের বিজ্ঞান-মতকে তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত মিলাইবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন না। তাঁহারা পদার্থবিদ্যায় Newton এর নিয়মত্রয়ের সত্যতা শিক্ষা করেন এবং "ভুতে ঢিল ছোড়ে" ইহাও বিশ্বাস করিতে পারেন। তাঁহাদের মাথায় যেন দুইটী ভাগ আছে। বিখ্যাত দার্শনিক Hobbes, Locke, Hume, এমন কি Descartes-এর লেখা পড়িলেও মনে হয় তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির তেজ এবং তাঁহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্মবিশ্বাসে যেন ঠিক মিলন হয় নাই। Hobbes লিখিয়াছেন, 'It is with the mysteries of our Religion as the wholesome pills for the sick, which swallowed whole, have the virtue to cure; but chewed are for the most part cast up again without effect."

আমি আপনাদিগকে Descartes-এর লেখা পড়িতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। মানবজাতির একটী বিশেষ ব্যাধি যে অল্পতেই আমাদের মাথা গরম হইয়া যায়, অল্পতেই আমরা এই বিশ্বাসে উপনীত হই যে, আমরা বিশেষ কিছু। সহজেই মনে করি যেন চন্দ্র-সূর্য্য আমাদেরই চারিদিকে ঘুরিতেছে। এই মহাত্মার লেখা পড়িলে যদি আর কিছুও না শিক্ষা করি, তবু তাঁহার একটী গুণ দেখিতে পাই—তাঁহার বিনয়, গর্ব্বের তিলমাত্র স্থান তাঁহাতে নাই।

Descartes, যিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের একজন প্রধান পথপ্রদর্শক, যিনি আমাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে সন্দেহ করিতে শিখাইয়াছেন, তিনিই ধর্ম্মবিশ্বাস বিষয়ে লিখিয়াছেন,—"I revered our theology, and aspired as much as any one to reach heaven: but being given assuredly to understand

that the way is not less open to the most ignorant than to the most learned, and that the revealed truths which lead to heaven are above our comprehension, I did not presume to subject them to the impotency of my reason; and I thought that in order competently to undertake their examination, there was need of some special help from heaven, and of being more than man." ইহা পড়িলেঃমনে হয় বিজ্ঞান তখনও সাবালক হয় নাই।

গত এক দুই শতাব্দীতে এই বিষয়ে আমাদের মত একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। না চিবাইয়া বটিকা গলাধঃকরণ করিতে আর কেহই রাজি নহেন,—অন্ততঃ যাঁহারা বিজ্ঞানের সংসর্গে আসিয়াছেন। বিজ্ঞানচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কেমন মনের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব অনুভব করি। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির এই বিষয়ে অন্ততঃ নিজের ব্যবহারের জন্য একটা মীমাংসায় আসা প্রয়োজন।

একদল লোক দেখিতে পাই, যাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসকে তাঁহাদের বিজ্ঞানের সহিত মিলাইতে পারেন না। তাঁহাদের বিজ্ঞানের শিক্ষার উপর অচলা শ্রদ্ধা, কাযেই তাঁহারা আর ধর্ম্ম-মন্দিরের নিকট ঘেঁসিতে পারেন না। কেহ কেহ ধর্ম্মকে কুসংস্কার বলিতে কুণ্ঠিত হন না। এমন কি কাহারও নিকট 'পরমেশ্বর আছে,' এই কথা মত্ত বৃষের সম্মুখে রক্তবর্ণের বস্ত্রের ন্যায়।

অপর পক্ষে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা পরমেশ্বরে বিশ্বাস করিতে চাহেন, কিন্তু পারেন না। তাঁহারা বিশ্বাস করেন, ধর্ম্মে সান্ত্বনা পাওয়া যায়, তবু নিজেরা তাহা হইতে বঞ্চিত। তাঁহাদের বিজ্ঞানচর্চ্চাই প্রধান অন্তরায়। তাঁহারা গর্ব্বিত নহেন, শুধু অসরল হইতে চাহেন না। এই প্রকার দুই এক জনকে বলিতে শুনিয়াছি, হায়, আমি যদি প্রার্থনা করিতে পারিতাম।

বিজ্ঞানপথে খানিকটা ঢুকিয়া আমাদের আর অন্য গতি নাই। যদি আমরা বিশ্বাস করিতে চাহি তবে অবিশ্বাসীর আপত্তিগুলি সর্ব্বপ্রথমে শুনিতে হইবে। এই সব আপত্তি এবং বিশুদ্ধ যুক্তি জানিয়া শুনিয়া, যিনি নিজের মনের মধ্যে বিশ্বাসের সপক্ষে মীমাংসা করিতে পারেন, তাঁহারই বিশ্বাস দৃঢ় হয় এবং পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূল বাতাসে ঐ বিশ্বাস অচল থাকিতে পারে।

কোন এক ভাষায় একটী কথা চলিত আছে,—একজন বোবা লোকে যত প্রশ্ন করিতে পারে, শত শত বিজ্ঞলোকে তার উত্তর দিতে পারে না।' তবে অনেক সময়ে প্রশ্নের যে উত্তর দেওয়া যায় না, সেটা প্রশ্নের দোষে আমাদেরই অনেক প্রশ্নের মূলে একটা ভুল ধারণা নিহিত থাকে। আপনারা সকলে বিদিত আছেন, অনেককাল পূর্ব্বে আমাদের দেশে একটী প্রশ্ন ছিল পৃথিবীকে ধরিয়া আছে কে এবং এই প্রশ্নের উত্তরে বাসুকীর সাহায্যে আহ্বান করা হইয়াছিল। বিজ্ঞান এবং দর্শনের ইতিহাসে এইরূপ অনেক প্রশ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহা বোধ হয় মানুষের স্বভাব যে আমরা যখন কোন একখণ্ড জমি দখল করিয়া বসি, তখন ক্রমে ক্রমে পার্শ্ববর্ত্তী জমির দিকে হাত বাড়াই, আমাদের প্রতিবাসীর জমিও কতকটা দখল করিতে চাই। ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বে আমার মনে হয়, মানুষের এই একই স্বভাবের প্রকাশ পাইয়াছে। এক সময়ে ধর্ম্মনেতাগণ বিজ্ঞানকে ধর্ম্মের ভৃত্য করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা তখন ভাবিতে রাজি ছিলেন না তাঁহাদের এলাকা কত দূর। আমার মনে হয়, বর্ত্তমান যুগে অনেক বৈজ্ঞানিক ঐ একই ভুলে পড়িয়াছেন, তাঁহারা ভাবিতে রাজি নহেন তাঁহাদের বিদ্যার দৌড় কত দূর, তাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসকেও তাঁহাদের ছাঁচে ঢালিতে চাহেন। সুখের বিষয় যে, ধর্ম্মযাজক এবং দার্শনিক ও বিজ্ঞানবিদের মধ্যে এমন কয়েকটী লোক আসিয়াছেন, যাঁহারা ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য না দেখাইতে

পারিলেও যে দুইএর মধ্যে বিবাদের কোন কারণ নাই তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমি বলিতে চাই না যে, তাঁহারা এমন সব তর্কযুক্তি দেখাইয়াছেন। যাহার প্রভাবে প্রত্যেকে ধর্ম্ম বিচার করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু তাঁহারা দেখাইয়াছেন বিজ্ঞানের গোঁড়ামিতে এবং অহঙ্কারে অনেকে যে ধর্ম্মকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া জগতের সমুদয় ব্যাপার অণু-পরমাণুর স্থিতি গতি বই আর কিছু নয়, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন সেটাও তাঁহাদের অধিকারের বাহিরে।

ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল আমাদের মস্তিষ্ক নহে, আমাদের হৃদয়ে। তাহার প্রধান প্রচারক জীবন ও মৃত্যু এবং যত দিন তাহারা এই প্রচার কার্য্য করিতে থাকিবে ততদিন জগতে ধর্ম্মের প্রয়োজন বর্ত্তমান থাকিবে।

আমরা এখন দেখিতে পাই, ক্রমে ক্রমে সব বিষয়ে জগতে মত কি প্রকার বদলাইয়া গিয়াছে, ধর্ম্মযাজক এবং বিজ্ঞানবিদেরা ক্রমে ক্রমে যেমন সাবধান হইতেছেন এবং নিজেদের এলাকা বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছেন।

আপনারা সকলেই অবশ্য জানেন Galileo, Copernicus, Kepler প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তাঁহাদের বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য Rome এর সহিত অল্পবিস্তর গোলমালে পড়িয়া ছিলেন। এমন কি খুব বেশী দিন হয় নাই Immanuel Kant ও তাঁহার মতের জন্য যথেষ্ট গোলযোগে পড়িয়া Konigsberg হইতে তাড়িত হইবার মত হইয়াছিলেন। Wreland তাঁহার 'বিশ্বাসে বুদ্ধির স্থান' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, 'The faith in God, not only as the first and principal source of everything, but also as the unlimited and highest legislator, Regent and Judge of mankind. forms, in conjunction with the faith in a future life after death, the first foundation of Religion. One of the most dignified and most useful Foundation of Philosophy is to support and strengthen this faith in all possible way ; nay in view of its indispensibility it is her duty. To combat this faith, and to make it shaky in the human mind with the help of all sorts of doubts and discussions or even to upset it, can not help us at all, It is really no better than a public attack on the fundamental principles of state, of which religion forms a very importrnt part, as public peace and safety depend very much on religion, I therefore have no hesita tion to give my king the following advice.

That all nonsensical and disgusting discussions against the Existence of God, or against the usually accepted proofs in its favour, if one has nothing better to offer instead as well as disputing in public the doctrine of the immortality of soul be declared as attempt against humanity and against the community and be as such prohibited by criminal law.

বিজ্ঞানের অধিকার সম্বন্ধে এ মতের খণ্ডন করিবার আর কোন প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সত্যের অনুসন্ধান, বিজ্ঞানবিদ্‌রা আর ফলাফলের দিকে তাকান না। যখন আমরা Darwinএর theoryর অনুসন্ধান করি, সেই অনুসন্ধানে আমাদের পরলোকে বিশ্বাস বাড়ে কি কমে সে প্রশ্ন বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা করে না। আমরা সকলেই Kepler এর সহিত একমত "the Bible is no text book of Optics or Astronomy." আমরা সকলেই সে বিষয়ে একমত যে ধর্ম্মযাজকদিগের বিজ্ঞানচর্চ্চাকে এ প্রকারে চাপিয়া রাখার চেষ্টা করাটা ভাল হয় নাই।

জগতের সুর এখন বদলাইয়া গিয়াছে। এখন বিজ্ঞান সাবালক হইয়াছে। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান সব সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রচারকগণ তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস যে বিজ্ঞান সম্মত তাহা প্রমাণ করিতে সচেষ্ট। আমার হীরেন্দ্র বাবুর একটি বক্তৃতার কথা মনে পড়িল, তিনি হিন্দুধর্ম্ম যে অতীব বৈজ্ঞানিক তাহা প্রমাণ করিতে যাইয়া Lord Kelvenএর Vortex theory এবং হিন্দুশাস্ত্রের সমুদ্রমন্থনের সাদৃশ্য বর্ণনা করিলেন। তাঁহারই একজন বন্ধুর মুখে মানুষের আত্মায় আত্মায় যোগ এবং Wireless Telegraphy সাদৃশ্যের কথা শুনিয়াছিলাম।

আমার মনে হয় ধর্ম্মযাজকরা বিজ্ঞানের এই সর্দ্দারীটা যে ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইয়াছেন তাহারও কোন দরকার ছিল না। পূর্ব্বে Descartes হইতে যে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিলাম, তাহা শুনিয়া সেই সময়ের Non-co-operationistরা হয়ত ইহাতে Slave-mentalityর গন্ধ পাইতেন; সেইরূপ যখন আমি শুনি যে কোন ব্যক্তি প্রমাণ করিতে যত্নবান হইয়াছেন যে তাঁহার ধর্ম্ম অতীব বৈজ্ঞানিক, তখন আমার মনে হয়, তাঁহার মধ্যেও অলক্ষিতে কতকটা Slave mentality ঢুকিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কেহ কেহ বিজ্ঞানের নেশায় এতই মত্ত যে "পরমেশ্বর আছেন" অথবা "পরমেশ্বর সত্য" এই কথা শুনিলে জ্বলিয়া উঠেন। তাঁহারা প্রমাণ চান। সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি কি প্রকার প্রমাণে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন? যদি তাঁহারা আশা করেন আমরা পরমেশ্বরকে তাঁহাদের অণুবীক্ষণের দৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে আনিয়া দিব, তাহা হইলে আমরা অক্ষম। আর বাস্তবিক যদি কেহ একদিন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলেন "আমি পরমেশ্বর" তাহা হইলেই কি তাঁহারা বিশ্বাস করিতে রাজি আছেন?

এই সব বিষয় লইয়া যখন তর্ক হয়, তখন গোড়া হইতে আমরা যে সব কথা ব্যবহার করি, সেই কথাগুলির অর্থ ঠিক করিয়া লওয়া উচিত। প্রথম কথাটি "পরমেশ্বর"। আমাদের প্রত্যেকের বিশ্বাসের মূলে একটী দার্শনিক মত নিহিত।

জড়জগতের এবং মনোজগতের যাবতীয় ঘটনা নিয়মে বদ্ধ অথবা নয় Cosmos অথবা Chaos. আমাদের দার্শনিক মত যে এ সবের ভিত্তিতে নিয়ম আছে, এবং নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যাবলি যে সব সূত্রে বাঁধা তাঁহাকে পরমেশ্বর বলি এবং তাঁহাকে স্থান এবং কালাতীত ধারণা করি। যে Cosmos এ বিশ্বাস করে না, তাহাকে Statistics দেখাইয়া প্রমাণ করিবার ক্ষমতা আমার নাই, তবে আমার মত যে ভুল তাহাও তাঁহার নিকট হইতে শুনিতে রাজী নই। দ্বিতীয় কথা 'সত্য"। অত্যন্ত কঠিন কথা। যখন আমি বলি "কাল রাস্তায় আমার রামের সহিত দেখা হইয়াছিল," সত্য কি মিথ্যা প্রমাণ করিতে হইলে আমার ঐ বচনটী অতীতের একটী ঘটনার সহিত পাশাপাশি ধরি এবং দুইএ যদি মিল হয় তবে ঐ কথাটা সত্য।

বিজ্ঞানে এক শ্রেণীর পদার্থ আছে যাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইলে আমরা যন্ত্রাদির সাহায্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে চেষ্টা করি। কিন্তু স্থানে দেখা যায় যাহা স্থান অধিকার করে। বিজ্ঞান পুস্তকে আমরা এমনও কয়েকটী জিনিষের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছি যাহা স্থান অধিকার করে তথাপি আমরা তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না, যথা Energy, Entropy, Lines of force. Energyর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ বোধ হয় কাহারও মাথায় আসে না তথাপি তাহার সপক্ষে প্রমাণ চাহিলে আমরা দিতে পারি না।

কিন্তু সব সময়ে অতীতের এক ঘটনার সহিত পাশাপাশি ধরা সম্ভব নহে। বৈজ্ঞানিক পূর্ব্বে এই সব প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামাইতেন না তাঁহারা তাঁহাদের নানাপ্রকার কৃতকার্য্যতায় এক প্রকার মত্ত হইয়াছিলেন, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের উপরে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিতে ব্যস্ত থাকিয়া নিজেদের ঘরের ছিদ্রের দিকে দৃষ্টি ছিল না।

বিখ্যাত গণিতাধ্যাপক Jacobi একবার বলিয়াছিলেন মাঝে মাঝে গণিতশাস্ত্রের গোড়াটা খুঁড়িয়া দেখা উচিত সেখানে পোকা লাগিয়াছে কি না। গণিতের মূলের উপর জগতের অসীম বিশ্বাস ছিল কিন্তু Jocobi ঐকথা বলার পর বেশী দিন যাইতে না যাইতে লোকের মনে নানাশংকার সন্দেহ আসিয়াছে।

Mority Sehlick, ইনি এখন Rostock বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ইঁহার একদিকে যেমন গণিতে এবং পদার্থবিদ্যায় জ্ঞান তেমনি অপরদিকে দর্শনশাস্ত্রে। Sehlick Einsteinএর Theory সম্বন্ধে একখানি চমৎকার পুস্তক লিখিয়াছেন। আপনারা কেহ কেহ শুনিয়াছেন Einstein তাঁহার theoryতে আমাদের পুরাতন Euclidian space সরাইয়া দিয়া Non-Euclidian space আনিয়াছেন। Schlick তাঁহার পুস্তকের এক অধ্যায়ে Euclidian space অথবা Eon-Euclidian space কোনটা বাস্তবিক সত্য এই বিচারে শেষটা এই সিদ্ধান্তে আসিয়া হাজির হইয়াছেন যে, যে ধারণার সাহায্যে আমরা আমাদের যাবতীয় Experience এবং জ্ঞানকে সরলভাবে অল্প গণ্ডীর ভিতর পূরিতে পারি তাহাই সত্য। Nrnst Mach তঁ'র বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বিষয়ে গবেষণায় লিখিয়াছেন,—বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য "Economy of thinking" অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকদিগকে এমন নিয়মাবলী এবং এমন formula বাহির করিতে হইবে যাহার সাহায্যে আমাদের বিদ্যার সিন্দুক অল্পের মধ্যে ভাল করিয়া pact করা যায়। তাহাদের মতে Energy, Entropy প্রভৃতি ততদূর সত্য যতদূর তাহারা আমাদের "Economy of thinking" কে সাহায্য করে। যদি কাল আমরা আর একটী নূতন Conception পাই যাহার সাহায্যে আমরা আমাদের বিদ্যার পুঁজি আরও ছোট বাক্সে pack করিতে পারি তাহা হইলে সেই দিন হইতেই Energy, Entropy আর সত্য থাকিবে না। যেদিন আমরা Copernican theory গ্রহণ করিলাম সেদিন Ptolemiusএর theory অসত্য হইয়া গেল। আপনারা দেখিতেছেন "সত্য" কথাটার মানে একেবারে relative হইয়া গেল।

বাস্তবিক বিজ্ঞান সত্য কথার একটা definition এখন দিতে পারে না। যে সব বৈজ্ঞানিক একটা ভাবিয়া থাকেন, তাঁহারা শীঘ্রই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন যে, প্রথমে তাঁহাদের যন্ত্রাদির যতটা ধার আছে মনে করিতেন ততটা ধার নাই। বের্লিনের দার্শনিক বিজ্ঞানবিদ Max Plant এই সব বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছেন। তিনি এই সব মুস্কিলের হাত হইতে এড়াইবার জন্য "Physically Existing "কথার সৃজন করিয়াছেন। তাহার মানে "existing for Physicists". এবং তাহার এই definition দিয়াছেন "যাহা আমরা মাপিতে পারি তাহা physically existing. Plank মহোদয়ের এই মতের গুরুত্ব আমাদের উপলব্ধি করা উচিত। Paulsen এক যায়গায় দুঃখ করিয়াছেন যে আমরা সহজে infinitely small এর আলোচনা করিতে করিতে বড় জিনিষ হারাইয়া ফেলি, Methane এবং Penthance এর অনুসন্ধানে ভুলিয়া যাই যে জগতে atom, molecule ছাড়া অন্য জিনিষও থাকিতে পারে। বিজ্ঞানবিদেরা ব্রহ্মাণ্ডের শক্তির হিসাব করিতে যাইয়া তাঁহাদের নিজেদের শক্তির দৌড় কত দূর তাহা ভুলিয়া যান।

Plankএর উপরি উক্ত মত সহজ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিলে এই বলিতে হয়, তিনি বলিতেছেন, "সত্য" এই ধারণার একটা ঠিক definition দিবার বিদ্যা বিজ্ঞানের নাই; তবে আমরা আমাদের ঘরোয়া ব্যবহারের জন্য একটা definition ঠিক করিয়া লইতেছি সুতরাং তাহা লইয়া তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই।

আমার এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে যাঁহারা অন্যের নিকট কিছুর অস্তিত্বের প্রমাণ দাবি করেন, তাঁহাদের সর্ব্ব প্রথমে ভাবিয়া দেখা উচিত অস্তিত্ব কথা দ্বারা তাঁহারা কি বুঝেন।

আর একটা কথা :—যাঁহারা প্রথমে বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহারা সহজেই এই বিশ্বাস করিয়া ফেলেন যে বিজ্ঞান সব ব্যাপারকে explain করিতে পারে। ইহা বিশেষ ভুল। এই বিষয়ে Gustav Kirchaf বলিয়াছেন, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয় "why" এর জবাব দেওয়া, ইহা কেবল "how" এর জবাব দেয় গাছ থেকে আপেল কেন নীচে পড়ে তাহা আমরা আগে জানিতাম না। এখনও জানি না। Newton আমাদিগকে শিখাইয়াছেন কি করিয়া পড়ে, অর্থাৎ কোনদিকে পড়ে এবং পড়িবার বেলায় কত সময়ের পরে কতটা তার গতি হয়।

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা Bertrand Russelএর চমৎকার পুস্তকখানি Problems of Philosophy পড়িয়াছেন, তাঁহারা appearance এবং Realityর তফাৎ বুঝিতে পারিয়াছেন। আমরা যখন একটা জড়পদার্থ দেখি, দেখি তার কি ? প্রথমে তার রং। এদিকে বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া আমাদের এইটুকু জ্ঞান হয় যে রংটা সে বস্তুর নয় ; রংএর উৎপত্তি হয় সেই পদার্থের এবং আমাদের দৃষ্টিশক্তির relationএ। যাঁহারা Dopplers Principle পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন যে আমরা যদি সেই পদার্থের দিকে দৌড়াইয়া যাই তাহা হইলে তাহার রং বদলাইয়া যায়।

বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে মকদ্দমা অনেক কাল ধরিয়া চলিতেছে তাহা মিটাইবার চেষ্টা অনেক দার্শনিক পণ্ডিতই করিয়াছেন, তাহার মধ্যে জগতের দার্শনিকদিগের সম্রাটস্বরূপ Immanuel Kantএর কথাগুলি আমার বিশেষ করিয়া মনে লাগে। তিনি একদিকে বিজ্ঞানকে অপর দিকে ধর্ম্মকে নিজের নিজের এলাকা কতদুর তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই দুইএর কার্য্যক্ষেত্র স্বতন্ত্র, এবং তাহাদের যন্ত্র (method) ও স্বতন্ত্র। সুতরাং একই জমির উপর যদি দুজনে দাবি না করেন তবে লাঠালাঠির প্রয়োজন নাই।

Kant দেখাইয়াছেন যে জগত লইয়া বৈজ্ঞানিকরা নাড়া চাড়া করেন এবং যাহার সম্বন্ধে আমরা বিজ্ঞান শাস্ত্র নিয়মাবলী আবিষ্কার করি তাহা world of appearance, world of Reality নহে, appearance কথাটাকে Denssen আমাদের ভাষায় "মায়া" বলিয়াছেন। অর্থাৎ বিজ্ঞান জগতের এক প্রকার বাহিরের খোসা লইয়া ব্যস্ত, যে জ্ঞান আমরা আমরা আমাদের চক্ষু কর্ণের সাহায্যে লাভ করি তাহা খোসা কুটিয়া শাঁসে পৌছায় না। বিজ্ঞানের কার্য্যক্ষেত্র বহির্জগত। ধর্ম্মের কিন্তু তাহা নহে। যখন আমরা খোসার কথা বলি না, শাঁসের কথাই মনে করি। আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত সত্যের কথা।

Kant তাহার Kritik of pure Reasonএ দেখাইয়াছেন যে ভগবানের অস্তিত্বের সপক্ষে সাধারণতঃ যে সব প্রমাণ দেওয়া হয় তাহাদের ততটা দাম নাই। তিনি ধর্ম্মকে আমাদের অন্তরের স্বভাবজাত নৈতিক বিবেক এর উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন।

Theosophistদের কেহ কেহ এই প্রকার প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামান যে, Mors গ্রহের লোকেরা আমাদের কথা ভাবেন কি না, তাঁহাদের নাকি আমাদের সহিত আলাপ করিতে বড়ই ইচ্ছা। এই প্রকার আরও অনেক প্রশ্ন আছে যে গুলি বিজ্ঞান আজগুবি বলিয়া মনে করেন এবং বলেন মানুষের মস্তিষ্ক এই প্রকার প্রশ্নের জবাব কোন দিনই দিতে পারিবে না। কেহ কেহ আশা করেন এই সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া ধর্ম্মের কায।

Kantএর মত তাহা নহে। আমাদের মস্তিষ্ক যে সব কেল্লা দখল করিতে না পারে, ধর্ম্ম যে একটা খিড়কির দরজা দিয়া সেই কেল্লা ফতে করিবে ইহা তার (Function) কার্য্য নয়। বিজ্ঞানের কার্য্যক্ষেত্র এবং ধর্ম্মের কার্য্যক্ষেত্রই স্বতন্ত্র। আমাদের পিতার উপর শ্রদ্ধা বিশ্বাস এবং আমাদের জ্ঞান যে পিতা কত মাহিনা পান তাহা যেমন স্বতন্ত্র তেমনি আমাদের পরমেশ্বরে বিশ্বাস এবং আমাদের বিজ্ঞানের বিদ্যা।

ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানএর শুধু যে কার্য্যক্ষেত্র আলাদা তাতা নয়, তাহাদের পদ্ধতি এবং যন্ত্রাদিও বিভিন্ন। বিজ্ঞানে আমার ঘটনাবলীকে "কারণ এবং ফলে"র সূত্রে গাঁথিতে চাহি—Cause and affect। "কারণ" যেন পিছন হইতে ঠেলিয়া "ফল" কে আনিয়া হাজির করিতেছে। কিন্তু তাহার "উদ্দেশ্য" কি সে প্রশ্ন বিজ্ঞানের এলাকায় আসে না। ধর্ম্ম সেই প্রশ্ন করে যথা মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি? আমাদের ধর্ম্মজিজ্ঞাসা সন্তুষ্ট হয় যদি আমরা জীবনের ও জগতের উদ্দেশ্য ধরিতে পারি এবং এই ধরার ভিতরে আন্তরিক সামঞ্জস্য, প্রাণে বল এবং শান্তি পাই।

ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের কার্য্যক্ষেত্র এবং পদ্ধতি বিভিন্ন। বিজ্ঞান যখন কারণ খোঁজে তখন পিছন দিকে চাহে, ধর্ম্ম যখন উদ্দেশ্য খোঁজে তখন সম্মুখে চাহে। মানুষের যেমন বিজ্ঞানের তৃষ্ণা তেমনি ধর্ম্মের তৃষ্ণা স্বভাবজাত এবং এর কোনটীকেই অবহেলা করিলে চলিবে না।

আমার ওকালতিটা অনেকটা বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ পক্ষের মত শুনাইল। তাহার কারণ, আমার মতে আজকাল অত্যাচারটা বিজ্ঞানের দিক হইতে আসিতেছে। তবে যদি কেহ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া আমাদের বিজ্ঞানের কারখানায় হস্তক্ষেপ করিতে আসেন, তাহা নিশ্চয়ই বিজ্ঞান অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে।

যেমন পূর্ব্বে দেখিলাম কয়েক জন বিজ্ঞানবিদ্ মাঝে মাঝে বিজ্ঞানের গোড়া খুঁড়িয়া অনুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহাদের বাস্তবিক এলাকা কত দূর এবং কোথায় তাঁহাদের গলদ তেমনি ধর্ম্মের দিকেও কয়েকটী লোক ধর্ম্মের programme এ অবান্তর অনেক ডাল পালা ছাটিয়া দিয়াছেন। সূর্য্য পৃথিবীর চারিধারে ঘোরে অথবা পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে, পৃথিবীটা বাস্তবিক হঠাৎ Old Testament এর অনুযায়ী সাত দিনে সৃজন হইয়াছে কি না। Jesusএর মৃতদেহ কবর হইতে স্বর্গে উঠিয়া গিয়াছিল কি না, কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন গিরি তাঁহার আঙ্গুলের উপর ঘুরাইয়াছিলেন কি না, সমুদ্রমন্থন ব্যাপারটা কি প্রকার ঘটিয়াছিল এই সব প্রশ্ন লইয়া আমরা আর মাথা ঘামাই না, এবং কেহ যদি এই সবে বিশ্বাস করিতে রাজি না থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে নরকে যাইতে হইবে ইহাও মনে করি না। এই সব নৈসর্গিক ব্যাপারের উপর মতামত দিবার ভার ধর্ম্ম এখন স্বচ্ছন্দে বিজ্ঞানের উপর ছাড়িয়া দিতে পারে।

Kant ধর্ম্মের definition দিয়াছেন—

"Religion is moral action, accomplished under the impression of the Reality of a highest being" তার মানে তিনি ধর্ম্মকে Reason থেকে Willএ আনিলেন। বিখ্যাত দার্শনিক এবং ধর্ম্মযাজক Schlier macher আরও একটু অগ্রসর হইলেন। তিনি ধর্ম্মের শিকড় Willএ না রাখিয়া Feelingএ আনিলেন। তাঁহার মতে "The root af religion is in feeling, in feeling of awe and devotion towards the Infinite and Eternal, that we realise ourselves dependent upon the Eternal God." Schliermacher Reason এবং Will ছাড়া আমাদের মনোজগতের একটা বিশেষ অংশ ধর্ম্মের নিজস্ব জমি বলিয়া ঠিক করিয়া দিলেন। যাহাকে আমাদের শুকাইয়া যাইতে দেওয়া উচিত নহে। কেননা Reason দ্বারা জ্ঞান লাভ এবং Will দ্বারা জগতের চেহারা বদলাইতে চেষ্টা করা, এই দুইতে মানুষের জীবন ফুরাইয়া যায় না। মানুষের তা' ছাড়া আছে Feeling যাহা দ্বারা সে সত্য অনন্ত অসীম অনুভব করে।

আমি জানি তর্কযুক্তিদ্বারা পরমেশ্বরের বিশ্বাস আসে না। মানবজীবন মানে শুধু Reason নহে।

যদি আমাদের Feelingটাকে বাদ দিই, অথবা তাকে Reason এর দাস করিতে চাহি, তাহা হইলে জীবন কোথায় যাইয়া হাজির হয় তাহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন।

Pessimistকে Statistics দেখাইয়া Optimism প্রাণের ভিতর আপনা হইতে আসা চাই। তেমনি পরমেশ্বরে বিশ্বাস আপনা হইতে আসা চাই। তবে অনেক সময়ে আমরা অল্প বিজ্ঞানবুদ্ধিতে আমাদের এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের মাঝে একটা বেড়া তুলি সেইটী দুঃখের বিষয় এবং আমার এই প্রবন্ধে যদি অন্ততঃ একজনের মনেও বেড়ার সেই দৃঢ়তা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিয়া থাকে এবং নিজে এই বিষয়ে একটু চিন্তা করেন তাহা হইলে আমার চেষ্টার যথেষ্ট পারিতোষিক পাইয়াছি জ্ঞান করিব। —সর্ব্বজনীন পত্রিকা

---

(২)

বাঙ্গলার উন্নতির অন্তরায়

শ্রীপ্রমোদকুমার সেন

গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীর যে বিবরণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গলা সম্বন্ধে কিছু আশার কথা আছে। প্রথমতঃ গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার জনসাধারণের জীবনযাপন-প্রণালী অনেকাংশে উন্নত হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গলায় এখনও এরূপ প্রাকৃতিক সম্পদ আছে যে, বর্ত্তমান অবস্থার সমতা রাখিয়া আমাদের মাতৃভূমি দ্বিগুণ জনসংখ্যা পোষণ করিতে পারে। সুতরাং এখন বলা যায় যে এই সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার হইলে বর্ত্তমান জনসংখ্যার স্বাচ্ছন্দ অক্লেশে বাড়িয়া যাইতে পারে। জাতিগত উন্নতিলাভ করিতে হইলে আমাদের সমগ্র দেশের অবস্থার একটা ধারণা থাকা দরকার; নতুবা জাতীয় উন্নতির একটা নির্দ্দিষ্ট পন্থা নির্দ্ধারণ করা যায় না। কাজেই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা কি, ভবিষ্যতের সম্ভাবনাই বা কি তাহা ধারণা করিয়া আমাদের উন্নতির অন্তরায়গুলি আলোচনা করিতে হইবে।

এ সম্বন্ধে বহুকাল ধরিয়া বহু গবেষণা, লেখাপড়া ও বক্তৃতা হইয়াছে ও হইতেছে। বাঙ্গলার আধিব্যাধি বিস্তর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে জাতির জীবনযাপন প্রণালী অপেক্ষাকৃত (পাশ্চাত্য আদর্শানুযায়ী) উন্নত হইয়াছে, তাহার ত' কিছু আশার কথাও আছে। কারণ এই উন্নতির উপরই যথার্থ সভ্যতা নির্ভর করে। অবশ্য অনেকে ত্যাগ মন্ত্রের কথা বলিবেন, কিন্তু জাতির পক্ষে সন্ন্যাসের আদর্শের কোন স্থান নাই। একথা বলিলে কেহ যেন মনে না করেন যে ধর্ম্মের উপর কটাক্ষপাত করা হইতেছে, কারণ বস্তুতঃ ধর্ম্ম একমুখী নহে। আর গোটা জাতিকেই যদি বৈরাগী করা যায়, তাহার ফল হয় একান্ত কর্ম্মবিমুখতা বীর্য্যহীনতা। কাজেই এ কথা বলা যায় যে, যে জাতি, সম্পদ ভোগের নানারূপ পন্থা বাহির করিতে পারে সেই জাতিই সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। অবশ্য, সর্ব্বমত্যন্তম্ গর্হিতম্—অতি মাত্রায় ভোগের ফল আমরা কয়েকটী পাশ্চাত্য ও অতি মাত্রায় পাশ্চাত্যভাবাপন্ন প্রাচ্যদেশে দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু তাহা বলিয়া ইহ-বিমুখতাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া যায় না; কারণ তাহা অতি ভোগ অপেক্ষাও সর্ব্বনাশকর। বাঙ্গলা দেশ শেষোক্ত আদর্শ একরূপ বর্জ্জন করিয়াছে, যদিও গান্ধীবাদের ঢেউ-এ সাময়িক ভাবে একটু প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছিল।

ইহা অবিসংবাদিত সত্য জাতি যে পরিমাণে জীবনযাত্রা-প্রণালী উন্নত করিতে চেষ্টা পাইবে, সেই অনুপাতেই শিল্প, বাণিজ্য ও জাতিগত কর্ম্ম-কুশলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। আজ বাঙ্গলার প্রায় ঘরে ঘরে হ্যারিকেন লণ্ঠন দেখা যায়; যে-দিন পল্লীতে পল্লীতে বৈদ্যুতিক আলোক সরবরাহ হইবে, সেইদিন হইবে বাঙ্গলার পরিপূর্ণ সমৃদ্ধি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অনেকে এই আদর্শের কথা শুনিলে, নাঁক সিঁটকান, বলেন, ও পাশ্চাত্য আলোক-ঝলকে জাতির মাথা বিগড়াইয়া দেয়, সনাতন প্রদীপই ভাল। যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহারা প্রায়ই জীবনে বেশ কিছু পুঁজি করিয়াছেন, কাজেই জনসাধারণের উপকার করিতে হইলে যে তাঁহাদেরও কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়! জাতিগত উন্নতির ব্যবস্থা করিতেও যে মাথা ঘামাইতে ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহার চেয়ে শাস্ত্র আওড়ান সহে। দরকার হইলে একটু না হয় নেতাগিরি করা গেল ও ভাবালুতার বন্যাপ্রবাহে তাক্ লাগাইয়া দেওয়া গেল।

যাক্, ঐ সব ভবিষ্যতের কথা। আদমসুমারী বিবরণীর রচয়িতারা বাঙ্গলা সম্বন্ধে আশার কথা বলিলেও, বর্ত্তমান বিশেষ আশাপ্রদ নহে। দারিদ্র্যের অভাবের, রিক্ততার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; প্রতিদিন আমরা চারিদিকেই তাহার চিত্র দেখিতেছি, সংবাদপত্রে বিবরণ পড়িতেছি। শিল্প, বাণিজ্যে বাঙ্গালীর অংশ নাম মাত্র। দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ হইলেও, বাঙ্গলার সম্পদ সৃষ্টিতে কুশলতার একান্ত অভাব। অবশ্য আলোচনাও উপদেশের অভাব নাই। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ত' এ বিষয়ে গত বিশ বৎসর যাবৎ চীৎকার করিয়া জাতির চেতনা জাগাইতে পারিলেন না। কিসের জন্য বাঙ্গলা এই ব্যর্থতা হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে না? তাহার প্রাণশক্তি ত' প্রচুর ত্যাগ করিবার ক্ষমতা অপূর্ব্ব। জাতীয়তা বিকাশের পরিচয় ত' সে যথেষ্ট দিয়াছে—এমন কি ভারতের অন্যান্য দেশকে পথ দেখাইয়াছে। তথাপি তাহার ভাগ্যচক্র কেন নিম্নদিকেই আবর্ত্তন করিতেছে?

কাজেই আমাদের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে হইবে।

বাঙ্গালীর চরিত্রের গুণগান অনেকে করিয়াছেন, নিন্দাবাদও বহু শুনা গিয়াছে। সব জাতির চরিত্রই বহু দোষগুণের মিশ্রণ। কিন্তু ইহা ধারণা করা অন্যায় নহে, ব্যক্তিগত হিসাবে বাঙ্গালীর চরিত্র যতই মধুর হউক না কেন, তাহার জাতীয় চরিত্র কিছু পরিমাণে দুর্ব্বল। তাহার প্রধান কারণই ভাবালুতা ও স্থিরবুদ্ধি ও দৃষ্টির অভাব। নতুবা বাঙ্গলাদেশে জাতীয় জাগরণের যেরূপ বিকাশ হইয়াছিল তাহার ফলে জাতীয় সংগঠনও একান্ত সুদৃঢ় হওয়া উচিৎ ছিল। জনসাধারণ নেতৃবৃন্দের আহ্বানে সাড়া দিয়াছে, কিন্তু নেতৃবৃন্দ কার্য্যের প্রারম্ভেই বিকৃতবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা দেখিয়াছেন, না হয় ভাবের ঘোর টুটিয়া গেলেই কর্ম্মের গুরুত্ব বুঝিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কথা বলা হইতেছে না—কারণ রাজনীতি জাতীয় জীবনের একমাত্র অবলম্বন নহে। রাজনীতি আরও প্রয়োজন হইতেছে অর্থনৈতিক সম্পদ ও সামাজিক সামঞ্জস্য। কাজেই বর্ত্তমান আলোচনা, রাজনীতি ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযুজ্য।

অবশ্য বাঙ্গলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে কিন্তু জনসাধারণ আশা করিয়াছিল যে, এই জাগরণের ফলে তাহাদের সম্পদ ও শ্রীবৃদ্ধির চিহ্ন দেখিতে পাইবে। কিন্তু অধিকাংশ নেতাই এই রাজনৈতিক আন্দোলনে মস্‌গুল হইয়া কোন দিনই জাতীয় সংগঠনের কথা মনে করেন না, এবং মনে করিলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার কথা দূরে যাক্ সে সম্বন্ধে কল্পনা করিতেও নারাজ। তাঁহারা জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতে চাহিয়াছেন মাত্র, এবং তাহার জন্য বাহবা পাইয়াছেন; তাহাদের যথার্থ উন্নতির উপায় ইঙ্গিত করিয়াছেন হয় ত, পথ দেখান নাই।

নেতাদের সম্বন্ধে এই আলোচনা করিতে হইতেছে এই জন্য যে, তাঁহারা ছিলেন দেশীয় এবং দেশ আশা করিয়াছিল তাঁহাদের নিকট অনেক। তাহারা মনে করে নাই যে, তাঁহারা ত্যাগের বাহাদুরী দেখাইয়া, অপরের নিকট হইতে ত্যাগ স্বীকার আদায় করিয়া, অবশেষে তাঁহারা প্রভুত্ব লাভের জন্য ছুটাছুটি ও দ্বন্দ্বকলহে তাঁহাদের বাক্যাড়ম্বর পর্য্যবসিত করিবেন।—অনেকে বলিবেন ইহা রাজনীতি। সমৃদ্ধ দেশের রাজনীতির এইরূপ প্রগতি হইতে পারে—যদিও এই নিরর্থক রাজনীতির প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ ফ্যাসিজম্, কম্যুনিজম প্রভৃতির উদ্ভব। কিন্তু যে দেশে দুর্ভিক্ষ ও মারী নিত্যসঙ্গী সেখানে এইরূপ রাজনীতি জঘণ্য স্বার্থনীতি ভিন্ন কিছুই নহে।

এই প্রভুত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা আজ যেন আমাদের জাতীয় জীবনের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। বাংলাদেশে এমন একটী প্রতিষ্ঠান নাই যেখানে এই দলাদলির বিষবাষ্প নাই। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়া বিলুপ্ত বা একেবারে করচ্যুত হইবার আশঙ্কা। শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নহে, প্রতি সার্ব্বজনীন ব্যাপারে এই অবস্থা। কাজেই জাতিহিসাবে আমরা একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি। জনসাধারণ নেতাদের নিকট হইতেই আদর্শ গ্রহণ করে. কাজেই তাহারা কিরূপ অনুকরণ করে তাহা সহজেই অনুমেয়।

জাতীয় চরিত্রের এই দুর্ব্বলতা সর্ব্বাপেক্ষা বিষময় ফল প্রসব করিয়াছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে কার্য্যের মূলনীতি হইতেছে সহযোগিতা, ঐকান্তিকতা, নির্ভরতা, বিশ্বাস ও সাধুতা। কিন্তু দেখা যায় যেখানেই প্রতিষ্ঠানটী ব্যক্তিবিশেষের না হইয়া দশ জনের, সেখানে প্রায়ই চেষ্টা হয় কি করিয়া একজন অপর কয়েক জনকে বঞ্চিত করিয়া স্বার্থপুষ্ট করিবে। সাধারণের অজ্ঞতা ও জাড্য অত্যধিক; তাহারা কখনই খোঁজ লইতে চাহে না, যাহাদের উপর প্রতিষ্ঠানের ভার আছে তাহারা কি করিতেছে। এদেশে এমন একটীও লিমিটেড কোম্পানী দেখা যায় না, যাহারা অংশীদারগণের সভায় ১০ জন অংশীদারও উপস্থিত হয়েন। আর যখন কেহ প্রতিষ্ঠানটীর সর্ব্বনাশ করিল, তখন তাহাকে অসহায়ভাবে গালাগালি করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

আমাদের দেশে আর একটী অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়। যে কোন প্রতিষ্ঠানে যাঁহারা প্রভু তাঁহাতে তাঁহার মৌরশী স্বত্ব আছে ভাবিয়া ল'ন, এবং তাহার ব্যবস্থা জমিদারী চালেই চলে। তাঁহাদের আত্মীয়, পরিজন, বন্ধুবর্গের অবাধ প্রতিপত্তি সেখানে। কুশলতা, বিচক্ষণতা, চরিত্র প্রভৃতির কোন মূল্য নাই। আবার নিজেদের জ্ঞানের অভাব ও হৃদয়হীনতায় জন্য অনিপুণের উন্নতির ইঙ্গিত বা নিয়ন্ত্রণের সমস্যাও প্রায়ই আমলে আসে না। যখনই খুসী বিদায় দিলেই ত' হইল! তাহার পর বক্তৃতায় দুঃখ ও দারিদ্র্য সম্বন্ধে চোখের জল ফেলিলেই খবরের কাগজে মোটা হরফে নাম উঠিবে। যেখানে মানুষের মূল্য এইরূপ সেখানে প্রগতি কিরূপে হইবে বলা নিষ্প্রয়োজন।

এই স্বার্থান্ধ মনোভাবের জন্যই আমাদের দেশের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ জাতির শ্রীবৃদ্ধির কোন উপায়ই কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে মনে আসে আয়র্লণ্ডের কথা, যাহার প্রশংসায় প্রত্যেকেই পঞ্চমুখ। আয়র্লণ্ডের জাতীয় সমৃদ্ধির একমাত্র কারণ কৃষিশিল্প প্রভৃতি জাতীয় সম্পদ গঠনে ঐকান্তিক ও নিয়মানুবর্ত্তী সহযোগিতা। আয়র্লণ্ড তখন স্বায়ত্ব-শাসন পায় নাই। কিন্তু ঐ সমৃদ্ধির জন্য কত শত নেতা ও কর্ম্মীর চেষ্টা ও ত্যাগ ছিল তাহা আমরা কয়জন খোঁজ রাখি? রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার বহু লেখায় এই জাতীয় সংগঠনের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা চিন্তা ও উপলব্ধি করিবার অবসর কোথায়? মহাত্মা গান্ধী জাতীয় সংগঠনের কথা বলিলে কিছু হৈ চৈ চলিবে ও নাম জাহির করা চলিবে, সুতরাং তাহাই একমাত্র জাতীয় সংগঠন। কিন্তু মিটিংএর বাহিরে তাহার দিকেও রম্ভা।

জনসাধারণের অব্যবস্থচিত্ততাও অনুরূপ। বাঙ্গালী ভৃত্য, পাচক প্রভৃতি নিম্নস্তরের কর্ম্মচারী পাওয়া যায় না। পাইলেও দীর্ঘদিন থাকে না বা বিশ্বাসঘাতকতা করে। অ-বাঙ্গালীদের মধ্যেও এরূপ প্রকৃতির লোক দেখা যায়, কিন্তু যে কোন কারণেই হউক তাহাদের প্রতিপত্তি বাঙ্গলা দেশে বাড়িয়া চলিয়াছে। কেন? বাঙ্গালী মজুর চাহিলেও পাওয়া যায় না। শ্রম করিতে আমরা সকলেই নারাজ। অন্যে অপরের উপর টেক্কা মারিতে পারিলেই আমরা জীবন সার্থক মনে করি। কাজেই আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের অনুযোগ, অবাঙ্গালী বাঙ্গালীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে, তাহার কারণ খুঁজিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, 'স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।' আমাদের নেতৃবৃন্দ কর্ম্মীগণ ও জনসাধারণ ধীরে ধীরে যদি স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের উন্নতি হওয়া সম্ভব, নতুবা কি ভাগ্যে আছে কে জানে? প্রদীপ

বিজ্ঞানাচার্য্য ডাঃ মহেন্দ্রলালের শতবার্ষিকী স্মৃতিপূজা

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব সেরিফ্, হোমিওপ্যাথ—বৈজ্ঞানিক ভারতীয় বিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠাতা, কলিকাতা জর্ণাল অফ্ মেডিসিন পত্রের প্রবর্ত্তক, **স্বর্গীয় ডাক্তারমহেন্দ্রলাল সরকার**, সি, আই, ই, এম্, ডি, ডি, এল্, মহাশয়ের শতবার্ষিকী জন্মতিথি উপলক্ষে স্মৃতিপূজার বিশেষ আয়োজন করিবার সময় আসিয়াছে।

জন্ম ২রা নভেম্বর ১৮৩৩ মৃত্যু ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৪

"সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন——"

এই মহাপুরুষ ২রা নভেম্বর ১৮৩৩ সালে হাওড়ার অন্তর্গত পাইকপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ছিলেন। ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষার পথ সুগম করিবার জন্য তিনি বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর পূজ্য ও বরণীয়। ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষার তিনি প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

হোমিওপ্যাথি প্রচার উপলক্ষে তাঁহার অপূর্ব্ব সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ ও ক্ষতিস্বীকার সর্ব্বজনবিদিত। সত্যের জন্য এমন ত্যাগ ও নিষ্ঠা জগতে কমই দেখা যায়। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। প্রখর বুদ্ধি, উন্নত চরিত্র ও গভীর জ্ঞানের সমাবেশে তাঁহার জীবন অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছিল। তাঁহার আর্ত্তের প্রতি সেবাপরায়ণ চিত্ত, তাঁহার সত্যের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, তাঁহার নির্ভীক সরলতা ও তেজস্বিতা, তাঁহার অদম্য জ্ঞানস্পৃহা, আমাদিগকে বিমুগ্ধ করে। তাঁহার হৃদয় বড় কোমল ছিল; মানুষের দুঃখে তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত। কুষ্ঠরোগীদিগের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহার দয়ার্দ্র চিত্ত ব্যথিত হইয়াছিল, তাই তিনি বৈদ্যনাথ-দেওঘরে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে একটি কুষ্ঠাশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, তাঁহার পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিনী রাজকুমারীর নামে উৎসর্গ করেন এবং তাঁহার নামানুসারে উক্ত আশ্রমের "Rajkumari Leper Asylum" নামকরণ হয়। বঙ্গের তদানীন্তন ছোট লাট Sir Charles Elliot মহোদয় এই আশ্রম বাটীকার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

তিনি জীবনে এখন অসংখ্য কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, যাহার একটী মাত্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে বহু লোকের জীবন ধন্য হইয়া যায়।

ধর্ম্মে তাঁহার প্রবল আন্তরিকতা ছিল—বাহ্য আড়ম্বর দেখাইতে তিনি জানিতেন না। শেষজীবনে তিনি যে সকল সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

বিস্তৃত কার্য্যসূচী শীঘ্রই সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হইবে। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলে যোগদান করিয়া এই অনুষ্ঠানকে সফল করুন, এই প্রার্থনা।

১নং স্ক্যাকোয়ার স্কোয়ার বিডন ষ্ট্রীট পোষ্ট, কলিকাতা
৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ সাল।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীখগেন্দ্রনাথ ঘোষ
শ্রীবঙ্কুবিহারী ঘোষ, শ্রীসতীশচন্দ্র মুন্সী, শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

তর্পণ

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১৯)

সে রাত্রে অরুণ কাকিমার বাড়ীতে শয়ন করিল না, নিজের সেই ভাঙ্গা ঘরেই শুইল।

অরুণের চোখে ঘুম নাই।

আকাশ চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল, ঘুমন্ত গ্রামখানার বুকের উপরে সে আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দূরে কোথায় পাখীরা ডাকিতেছে "চোখ গেল—চোখ গেল।"

বিছানায় পড়িয়া খানিকটা ছটফট করিয়া অরুণ উঠিয়া পড়িল।

খোলা বারাণ্ডায় নৈশ বাতাস ঝির ঝির করিয় া প্রস্ফুটিত হেনার গন্ধ বহিয়া আনিতেছে, সে বাতাসে অরুণের শ্রান্ত শরীর জুড়াইয়া গেল, মাথা জুড়াইল না।

কিংশুক—নীলা,

কিন্তু ইহাই কি সম্ভব, স্বামীকে লীলা কোন দিন স্বামী বলিয়া ভালবাসিতে পারে নাই, দুদিনের সাথীর মায়া তবু সে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু তাহার সন্তান আছে যে। যে সন্তানের সামান্য অসুখ হইলে মায়ের চোখে মৃত্যুর কালো ছায়া ঘনাইয়া আসে, মা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সন্তানকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরে; যে সন্তানের জন্য নারী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে, নিজের জীবন তাহার কাছে তুচ্ছ বোধ হয় লীলা সেই সন্তানকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল?

অরুণ স্বপ্নেও যে এ কথা ভাবিতে পারে না। লীলার মৃত্যু সে সহজেই মানিয়া লইয়াছে, কিন্তু খুকির মাতার গৃহত্যাগ সে কল্পনা করিতে পারে না।

পৃথিবী কি নূতন ধারায় চলিয়াছে, এখানকার রীতি নীতি সবই কি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে? মায়ের বুকের স্নেহ মায়া শুকাইয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, মা কি সত্যই রাক্ষসী হইয়াছে?

অরুণ আত্মবিস্মৃত ভাবে বলিয়া উঠিল, "এ হতে পারে না, কখনই হতে পারে না?"

কিন্তু কিংশুক,—সেই বা কোথায়?

এতদিন কিংশুকের কথা মনে পড়ে নাই, আজ নূতন করিয়া সে কথা মনে পড়িল।

কিন্তু এ কথাও সত্য একদিন কিংশুকের সহিত লীলার বিবাহের কথা ঠিক হইয়াছিল। সে হঠাৎ বিলাত যাওয়ায় এবং সে ফিরিয়া না আসায় তাহার আশায় হতাশ হইয়া লীলার পিতা অরুণের হস্তে লীলাকে সম্প্রদান করিয়াছেন।

কিংশুকও নেকি দেওঘর গিয়াছে।

অরুণ স্তব্ধভাবে ভাবিতে থাকে।

আজ বিশেষ করিয়া সেই অতীত দিনগুলার কথাই মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে।

হয় তো সেই জন্যই লীলা কোনদিনই স্বামীকে ভালোবাসিতে পারে নাই, স্বামীকে খুসী করিবার জন্য ভালোবাসার অভিনয়টুকুও করে নাই।

ঘরের কোণে কিসের একটা বাক্স আজও পড়িয়া আছে। এই বাক্সটা অরুণ আজ স্বচ্ছন্দে খুলিয়া দেখিতে পারে, আজ তাহার কাজে বাধা দিতে বিবেক দাঁড়ায় না।

কতদিন লীলার নামে কত পত্র আসিয়াছে, সে সব পত্রের অনেকগুলিই সে নিজে লীলার হাতে দিয়াছে, কোন দিন মনে এতটুকু সন্দেহ জাগে নাই, এ সব পত্র আর কেহ লিখিতে পারে কি না।

আজই এই প্রথম তাহার মনে হইল কিংশুকের পত্রগুলাই সে নিশ্চয় স্ত্রীর হাতে আনিয়া দিয়াছে।

অরুণ আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া লণ্ঠন জ্বালিল।

এ বাক্সটা লীলা লইয়া যায় নাই। নিশ্চয়ই একেবারে চলিয়া যাইবার কথাটা যাওয়ার সময় তাহার মনে হয়, সেইজন্যই বাক্সটা রাখিয়া গেছে।

বাক্সের গায়ে একটা মরিচাপড়া তালা ঝুলিতেছিল, অরুণ দুচার বার সজোরে টান দিতেই তালা ভাঙ্গিয়া গেল।

অরুণ লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া দেখিল, বাক্সের মধ্যে কয়েকখানি শাড়ি ধুতির কতকগুলি জামা প্যাণ্ট পড়িয়া আছে। সেগুলি টানিয়া তুলিতে নীচে কয়েকখানি পত্র দেখা গেল।

বুকের ভিতরটা জ্বলিতেছিল; অরুণ খানিকক্ষণ বদ্ধদৃষ্টিতে পত্রকয়খানির পানে তাকাইয়া রহিল।

কতক্ষণ ইতঃস্ততঃ করিয়া সে হাত বাড়াইয়া একখানি পত্র তুলিয়া লইল; খামের ভিতর হইতে পত্র বাহির করিয়া সন্তর্পণে ভাঁজ খুলিয়া প্রথমেই নীচে নামের পানে তাকাইল কিন্তু পত্রে নাম নাই।

কিন্তু এ হাতের অক্ষর চেনা, এ কিংশুকের হাতের লেখা।

দীর্ঘ পত্রে ব্যক্ত করিয়াছে তাহার অন্তরের গাঢ় প্রেম। সে লিখিয়াছে লীলা স্বামী ও কন্যা লইয়া মানুষের আকাঙ্ক্ষিত সুখ শান্তিতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহকরিতেছে, কিন্তু সে একটা হতভাগ্য তাহাকে দেখিতে কেহ নাই তাহার দুঃখ বেদনা কল্পনা করিতেও কেহ নাই। তাহাকে বিবাহ করিবার উপদেশ দিয়াছে; কিন্তু উপদেশ দিতে পারা যায়, সে লীলা নয় বলিয়াই সে উপদেশ কাজে পরিণত করিতে পারিল না। সে জানে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে,—হোক এ জীবন ব্যর্থ সে এই ব্যর্থ বোঝা মাথায় লইয়াই বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিবে।

অরুণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

কয়েকখানি পত্র, সবই এই এক ধারায় লেখা। কিংশুকের হাতের লেখা, নাম নাই। সব পত্রগুলির মধ্যেই কিংশুকের অন্তরের উচ্ছ্বাস ফুটিয়া উঠিয়াছে।

লীলা কিংশুকের, কিংশুক লীলার, মাঝখানে অকস্মাৎ ধূমকেতুর মত অরুণ আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই আবার ধৃতিকে টানিয়া আনিয়াছিল। তাহারা এ বাধা মানে নাই, পথের বাধা সরাইয়া তাহারা তাই চলিয়া গিয়াছে।

আজ স্পষ্টই মনে হইল লীলা মরিতে পারে না। সে বাঁচিয়াই আছে এবং কিংশুকের কাছে গিয়াছে।

অরুণ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বাহিরে একাদশীর চাঁদ তখন পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে, আকাশ তখনও উজ্জ্বল, পাখীটির কণ্ঠস্বর ক্রমেই নিম্নস্তরে নামিয়া পড়িতেছিল, রাত বেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বোধ হয় ঝিমাইয়া আসিতেছে।

অরুণের মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

লীলা যাওয়ার পর দীর্ঘ তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, তাহারা কোথাও হয় তো স্বামী স্ত্রী রূপে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে, আর সেই স্ত্রীর উদ্দেশে আজ ঘণ্টা দুই তিন আগে পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া দিয়াছে।

লীলার উপর সে রাগ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু রাগ করিবার অধিকারই বা তাহার কই? মায়ের উপর রাগ করিবার অধিকার আছে সন্তানের, সেই জন্যই ধৃতি রাগ করিতে পারে সে পারে না।

সে পারে না কারণ লীলা তাহার স্ত্রীর অধিকার গ্রহণ করে নাই। মনে পড়ে, একদিন সে কি কথায় বলিয়াছিল—কেবল মাত্র দুইটা মন্ত্রই মানুষকে এক করিতে পারে না, সেই জন্যই এ বিবাহকে বিবাহ বলা চলে না। সত্যকার প্রাণের মিলনই বিবাহ, তাহাতে মন্ত্রের অনুষ্ঠানের কোন দরকার হয় না, কাহাকেও সাক্ষাৎ রাখিবার দরকারও নাই।

আজ ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই কথাটাই অরুণের মনে পড়িতেছিল।

একটা দিন ছিল সেদিন ওই দুইটা মন্ত্রই হইত সকলের চেয়ে বড়, সেই মন্ত্রের বন্ধনটাকেই সকলে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে কিন্তু আজ সে দিন নাই। সে যুগ আজ চলিয়া গিয়াছে, আজ আসিয়াছে নূতন যুগ,—এযুগে মানুষ মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছে, সত্যকে লইতে সকলেই চায়, সেই জন্যই মানুষ চায় প্রাণের বন্ধন, বিবাহের অনুষ্ঠান তাই ভণ্ডামী বলিয়াই জানে।

প্রকৃত সত্যকে চাপিয়া রাখা যায় না বলিয়াই সে স্বপ্রকাশ। এযুগ সত্যকে চেনার সুযোগ দিয়াছে মানুষ যাহা চায় তাহা পাইয়াছে।

অরুণ আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

ভালোবাসা সত্য, কিন্তু তাহাব নিজের বেলাতেই সব মিথ্যা হইয়া গেছে। সে ছায়া লইয়া কায়াভ্রম করিয়াছে, মরীচিকা ছুটিয়াছে বুকে আকুল পিয়াসা লইয়া, জীবনে সে জল পাইল না।

বাক্সটা বন্ধ করিয়া সে বিছানার উপর আসিয়া বসিল।

যদি আজ সে শৈশবের সেই দিনগুলা ফিরাইয়া পায়, সে সব দিতে পারে। এই ব্যর্থ জীবনের বোঝা আর বহিতে পারে না, আর সে আঁকা বাঁকা পথে নিজেকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না।

অতীত দিনের কথা ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাহারাই যাহারা সব দিয়া চলিয়াছে, সামনে চলার পথ যাহাদের সরল সুগম নয়। আলো তাহাদের সামনে নাই, যতদূর দৃষ্টি যায় দেখা যায় নিকষ নিবিড় কালের বিরাট বিপুল অন্ধকার। পিছনে তাহাদের কে আলো একদিন জ্বলিয়াছিল, সেই আলোর দীপ্তি শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের চোখে পড়ে। তখনই তাঁহারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তাহারা চোখের জল ফেলে,—তাহারা বলে—অতীত তুমি গিয়াছ, কিন্তু তুমি যাহা দিয়া গিয়াছ মানুষের মনের ভাণ্ডারে তাহাই চিরকালের জন্য জমা হইয়া রহিল, জীবনান্তে দেহের সঙ্গে সঙ্গে তোমার দান নিঃশেষ হইয়া ফুরাইয়া যাইবে।

অতীত তাই বড় মনোরম, বড় সুন্দর। অতীতের বুক খুঁজিলে অনেক কিছু কুড়াইয়া পাওয়া যায়, নিঃস্বার্থভাবে যে যাহা দিয়াছে সেইটুকুই মাত্র সম্বল করিয়া মনুষ্য আবার নূতন উদ্যমে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দে কাটিয়া যাইতে লাগিল, অরুণ তখনও একভাবে বসিয়া।

পূর্ব্বে আকাশ অল্পে অল্পে রঙিন হইয়া উঠিতে লাগিল পাখীরা কুলার মধ্যে উস্‌খুস্‌ করিতে লাগিল; অরুণ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

(২০)

সাত বৎসরের মেয়ে ধৃতি।

আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি, সমস্ত বাড়ীখানা অশান্ত চরণক্ষেপে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

অরুণ প্রবেশ করিবার পথে ধৃতিকে দেখিতে পাইল। হাসিতে হাসিতে সে উঠিতেছিল, অরুণকে সামনে দেখিয়াই থতমত খাইয়া দাঁড়াইল।

তাহার পানে তাকাইয়া ঘৃণায় অরুণের মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল।

এই ধৃতি—তাহার কন্যা—।

কে জানে এই শিশুর ভবিষ্যৎ কি রূপ? কে জানে ভবিষ্যতে এ তাহার মায়ের পথে চলিবে কি না।

মেয়েজাতিটার উপরেই অরুণের দারুণ বিদ্বেষ জন্মিয়া গিয়াছে। সে কিছুতেই ইহাদের

আর ক্ষমা করিতে পারে না। দুনিয়ার যত ক্লেদ সব অন্তরের মধ্যে জমা করিয়া রাখিয়া ইহারা কেমন চমৎকার হাসিতে পারে, কেমন সুন্দর সকলের সহিত মিশিতে পারে।

ট্রেণে আসার সময় তাহার কামরায় পরিচিত এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক উঠিয়াছিলেন। তিনি উচ্ছ্বসিতভাবে স্ত্রীর অনাবিল প্রেমের গল্পা যখন করিয়া যাইতেছিলেন তখন অরুণ না হাসিয়া থাকিতে পারে নাই।

ভক্তিমতী স্ত্রীর মনের গোপন কোণ অন্বেষণ করিলে হয় তো আর কাহারও ছবি দেখা যাইবে, অরুণের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস।

মানুষকে সে আর বিশ্বাস করিতে পারে না, লীলা তাহার বিশ্বাস নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

ধৃতির পানে সে আর চাহিল না, সোজা উপলের গৃহদ্বারে গিয়া দাঁড়াইল।

উপল ডাকিল, "দরজায় দাঁড়ালে যে, ঘরে এসো অরুণদা।"

অরুণ প্রবেশ করিল।

হাতের সেলাইটা পাশে রাখিয়া উপল জিজ্ঞাসা করিল, "কোন খবর না দিয়ে হঠাৎ যে এসে পড়েছ বড় অরুণদা? শুনলুম নাকি বাড়ী গিয়েছিলে?"

অরুণ একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, "হ্যাঁ বাড়ীই গিয়েছিলুম, হঠাৎ এসেছি একটা বিশেষ দরকারে।"

তাহার মুখখানা বড় গম্ভীর।

উপল জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?"

অরুণ বলিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করব উপল, যদিও তিন বছর আগেকার কথা, তবু মনে হয় তুমি সে সব কথা ঠিক করেই বল্‌বে, ভুলে কখনই যাও নি। আমার মনে আঘাত লাগ্‌বে বলে তুমি কখনই মিছে কথা বল্‌বে না।"

উপল যে শঙ্কিত হইয়া উঠিল তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল; বলিল, "কি কথা জিজ্ঞাসা করবে কর"।

অরুণ খানিকক্ষণ তাহার মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, "আমি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নি উপল, তুমিও আমার সঙ্গে মিছে কথা বলবে। কিন্তু এই জীবন্ত মিথ্যাটাকে চালানোর আগে তোমার ভাবা উচিত ছিল সত্য কোন দিন গোপন থাকে না, সে কোন দিন না কোন দিন প্রকাশ হয়ে পড়্‌বেই—; ঠিক সেই কারণেই এই সত্য আজ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বল দেখি উপল,—আজ আমার মুখের পানে চেয়ে বল দেখি—লীলা কি সত্যি মারা গেছে?"

উপল মুখ ফিরাইয়া কি ভাবিতে লাগিল।

অরুণ শান্তকণ্ঠে বলিল, "এতে ভাবনার কারণ কিছু নেই। পাছে আমার মনে

ব্যথা লাগে সেই ভয়ে তুমি সত্যকে গোপন করে গেছ, কিন্তু ওই গোপন করার চেষ্টাটাই যে আমার বুকে দারুণ আঘাত দিয়েছে। তারচেয়ে—একটা সত্যকে চাপা দিতে একশোটা মিথ্যে কথা বলার চেয়ে বল্‌লেই হ'তো লীলা মরে নি, সে আত্মীয় স্বজন, স্বামী, কন্যা, ফেলে কিংশুকের সঙ্গে চলে গেছে।

উপল মুখ তুলিল,—অপ্রস্তুতের ভাব কাটিয়া গিয়াছে;

বলিল "সত্যিই তাই অরুণদা, তোমার বুকে বড় বেশী রকম আঘাত লাগ্‌বে বলে আমরা কেউ এ কথা তোমায় জানাইনি, আমরা জানিয়েছি সে নেই—মরে গেছে।"

অরুণ হাসিল, বলিল, "দেখ্‌লে তো, তিন বছর পরেও সত্য কেমন প্রকাশ হয়ে গেল। এখন বল তো ব্যাপারটা কি হয়ে ছিল?"

উপল বলিল, "আমি ভালো রকম কিছু জানিনে, জিজ্ঞাসা কর্‌তে ও প্রবৃত্তি আসে নি। আমি মোট এইটুকু জানি, সে কিংশুককে ভালোবাস্‌ত, আর কিংশুকও তাকে তেমনই ভালোবাসত। সেই ভালোবাসার জন্যেই সে কিংশুকের সঙ্গে—"

সে থামিয়া গেল।

অরুণ বলিল, "চলে গেছে—কেমন? কিন্তু উপল, আমার ধারণা ছিল—আমি জানতুম মেয়েরা মা হয়ে নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলে, তারা নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়, কিন্তু ধৃতির মায়ের বিপরীত আচরণ দেখে সত্যি আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছি।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "আমি আজ কি ভাব্‌ছি—জানো? ওই ধৃতি—সে ও ঠিক ওর মায়ের মতই মন পাবে, ওই রকমভাবে চল্‌বে, সে কথা ভাব্‌তে ও আমার বুক শুকিয়ে ওঠে। কিন্তু তাতে কি—কারণ এ ঠিক হচ্ছে, রক্তের প্রভাব কেউ এড়িয়ে চল্‌তে পারবে না। তবু বলি উপল, একটা কথা রেখো, একটা কথা শুনে যেয়ো ওকে যেন লেখাপড়া শিখিয়ো না, আর যত শিগ্‌গীর পারো ওর বিয়ে দিয়ে ফেল। লেখাপড়া শিখিয়ে ওর নিজের স্বাধীনমত গড়ে তুল্‌বার অবকাশ দিয়ে ওর মাথা খেয়ো না,—তাতে ওর ও সর্ব্বনাশ হবে, আরও অনেকের সর্ব্বনাশ কর্‌বে।

উপল শুধু হাসিল, বলিল, "কিন্তু তুমিও এটা মনে রেখো অরুণদা, সবাই লীলা নয়। সব মেয়েই যদি লীলার মত হতো তা হলে সংসার আজ গড়ে উঠ্‌তে পারত না, সমাজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেত। লীলা বল্‌ত, সমাজের এখন বৃদ্ধাবস্থা, একে নাকি ভেঙ্গে নূতন করে গড়ে তুল্‌বার দরকার, অর্থাৎ বিসর্জ্জন। সংসার, সন্তানপালন প্রভৃতি ব্যাপার গুলো মানুষ বর্জ্জন করে চল্‌বে। সে জোর করে বল্‌ত,—পৃথিবীর আদিম যুগে এ সব নিয়ম ছিল না, আজও জোর করে চালানোর কোনও দরকার নেই।"

অরুণ বলিল, "তুমি নিশ্চয়ই তার উত্তর দিয়েছিলে ?"

উপল বলিল, "দিয়েছিলুম; আমি বলেছিলুম, আদিম যুগ ছিল সৃষ্টির যুগ, যখন মানুষ সৃষ্টি করারই কেবল দরকার ছিল কোন আইন কানুনের দরকার তখন হয় নি। মানুষ যখন অনেক কিছু পায় তখন গুছিয়ে রাখাটাই তার স্বভাব হয়ে পড়ে, এলোমেলো তার চোখে বাজে। সেই জন্যেই সৃষ্টির পর্ব্ব শেষ করে আইন গড়্‌বার দরকার হয়েছিল, দেখা গিয়েছিল নিয়ম গঠন না করে দিলে বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটে। কে কার স্ত্রী দখল করে, কে কোন সন্তানের বাপ কিছু ঠিক পাওয়া যায়না ফলে নিত্য মারামারি, রক্তারক্তি ঘটে। এরই জন্যে বিবাহ, এরই জন্যে শিক্ষা, কাজেই আদিমযুগটাকে অর্থাৎ সেই বর্ব্বর অসার যুগটাকে আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারিনে, আমরা শিক্ষা পেয়েছি বলেই সমাজ, বিবাহ, সন্তানপালন সংসার-ধর্ম্ম মেনে চল্‌তে চাই।

অরুণ গম্ভীরভাবে মাথা দুলাইয়া বলিল, "ঠিক বুদ্ধিমতীর মত কথা বলেছিলে দেখ্‌ছি। নাঃ, তোমায় আমি যত বোকা ভাবতুম, সত্যি তুমি তা নও, তোমার বুদ্ধি আছে। যাক্‌, তোমার কথা শুনে সে কি বলেছিল ?"

উপল হাসিয়া বলিল, "একথার ওপর সে আর কথা বল্‌তে পারেনি অরুণদা, চুপ করে কেবল চেয়েছিল।"

অরুণ বলিল, "উত্তর দেওয়ার দবকার মনে করে নি,—না কর্‌বারই কথা, কেননা সে যা ভেবেছিল তা কর্‌বেই বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল। সমাজের সব নিয়ম সে উল্টে দিতে চেয়েছিল, নূতন নিয়ম গড়তে চেয়েছিল। ক্ষুদ্র বুদ্ধি আমার, তাতে যে আবেষ্টনীর মধ্যে মানুষ হয়েছি তাতে গভীর কোন বিষয়ের ধারণা কর্‌বার শক্তি আমার হয় না। তার ভালোবাসার গভীরতা বুঝ্‌তে পারিনি তাই আমার ভালোবাসা প্রতিক্ষণে জানিয়ে প্রতি পদে তাকে বিব্রত করে তুলেছিলুম, ভেবেছিলুম বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাকে সম্পূর্ণভাবে নিজের করে নিয়েছি, তার আমার মাঝখানে এতটুকু দূরত্ব নেই। বিয়ে জিনিসটাকে সত্যিই অত খেলো—অত হাল্‌কা ভাব্‌তে পারিনি, ঠকেছি সেই জন্যেই। নিজের জায়গা হারিয়েছি, আজ জায়গা খুঁজে পাচ্ছিনে যেখানে নিশ্চিন্তভাবে অন্ততঃপক্ষে দু মিনিট ও দাঁড়াতে পারি। আজ নিজের ভুল বুঝ্‌তে পেরেছি, তাই আর কাউকে মুখ দেখানোর ইচ্ছা করছে না উপল, মনে হয় এমন জায়গায় যাই যেখানে কেউ আমার সন্ধান না পায়, আমার নাম পৃথিবীর গা হতে মুছে যাক্‌।"

স্তব্ধভাবে সে কোনদিকে তাকাইয়া রহিল, মনটা তাহার কোথায় গিয়াছিল কে জানে।

ধীরকণ্ঠে উপল বলিল, 'এটা তোমার ভুল অরুণদা। আমি তোমার সব কথাই শুনেছি, তুমি অসঙ্কোচে একদিন আমার কাছে তোমার সকল কথাই ব্যক্ত করেছ। আমি জানি তোমরা কেউ কাউকে কোনদিন ভালোবাসতে পারনি, আজ দুজনে দুজনের কাছে থাকলেও কেউ কারও

নাগাল কোনদিন পেতে না। এ সত্যি কথা। যতদিন উপায় ছিল না সে ছদ্ম আবরণের অন্তরালে ছিল, উপায় পেয়ে সোজা পথ ধরে সে চলে গেছে। সমাজ-স্বামি-কন্যা, কিছুকেই সে গ্রাহ্য করে নি ; তুমি গ্রাহ্য কর বলেই কেবল ভোগ করাটাকেই প্রচুর পাওয়া মনে কর্‌তে পারনি, তার অন্তরালে আরও কিছু আছে সেই সত্যের সন্ধানে তুমি ছিলে। সত্যিই তোমার দুর্ভাগ্য তাই অমৃত তুমি পাওনি, পেয়েছ তীব্র বিষ যাতে সারাজীবনটা জ্বলে পুড়ে মরতে হচ্ছে। দেখো অরুণদা, তুমি দেখে নিয়ো এ ভুল তার একদিন ভাঙ্গবে, তাকেও সেদিন বুঝ্‌তে হবে প্রবৃত্তির মুখে ভেসে যাওয়ায় সুখ নেই, শান্তি নেই। সে তার বাঞ্ছিতের ধ্যানে যদি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারত, সেও হতো তার কাছে প্রচুর পাওয়া। ভালোবাসা মানুষকে উঁচু করে, জয়যুক্ত করে, প্রবৃত্তি সেখানে ঘৃণিত অবহেলিত, তাই যথার্থ যে যাকে ভালোবাসে কেবল তার ঘৃণিত ধ্বংসশীল দেহটাকেই কামনা করে না। লীলার ভালোবাসা ভালোবাসা নয়, অরুণদা, এর নাম যাদু, তা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।"

অরুণ বিস্ফারিতনেত্রে উপলের পানে তাকাইয়া রহিল, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, 'যাক্ গিয়ে, ও সব কথা যেতে দাও উপল, আমি মুক্তি পেয়েছি এ কথা ঠিক। মেয়েটার জন্যে একটু ভাবনা হয়,—বড় হয়ে সে যখন শুন্‌তে পাবে তার মা প্রেমের স্বাধীনতা রক্ষা কর্‌বার জন্যে তাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করে গেছে—'

উপল মৃদু হাসিয়া বলিল, "গর্ব্বিতা হবে—নয় ?"

অরুণ শুষ্ক হাসিয়া বলিল, 'তুমিওতো সন্তান, মায়ের সম্বন্ধে এ রকম কথা কোনদিন ভাব্‌তে পেরেছ উপল ? আমি জানি, সন্তান কোনদিন তার মায়ের কলঙ্ক সইতে পার্‌বে না। আজ আমরা তরুণ মনের ঝোঁকে যা কিছু করে যাব, নিজেরা যতখানি উচ্ছৃঙ্খল হতে পারি হব, কিন্তু আমাদের পরে যারা আস্‌বে—যখন আমরা চাইব সন্তান আমাদের শ্রদ্ধা করুক্—সম্মান দেখাক্, তখন যদি তারা আমাদের ঘৃণাই করে—"

উপল গম্ভীর হইয়া বলিল, "ওইখানেই যে ভুল করেছ অরুণদা। সন্তান কার সে প্রমাণ রাখ্‌বার তো কোন দরকার নেই কারণ তারা হবে ষ্টেটের সন্তান ওই টুকুই হবে তাদের পরিচয়। জন্মনিয়ন্ত্রণ কোনদিনই সম্ভবপর হবে না, মানুষের যে কোন দুর্ব্বলমুহূর্ত্তে এই সব সন্তানেরা আস্‌বেই। সন্তান এলে ষ্টেটের হাতে তাকে সমর্পণ এবং প্রতিপালন এটা বরং অবাধেই চল্‌বে, তাতে ভুল নেই। সংসার সমাজ—এগুলো থেকে মানুষকে ক্রমে জড় করে তুল্‌ছে, সেই জন্যেই এবার হতে এমনি ব্যবস্থা চল্‌বে—তা জানো ? যে যাই করুক সব মানিয়ে যাবে কারণ মানুষ স্বাভাবিক বৃত্তি বলেই চলেছে। এতে বৃথা ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের দরকার নেই, ত্যাগের নাম গন্ধও নেই, আছে শুধু ভোগ, নিঃশেষে ভোগ করে যাওয়া মাত্র।"

অরুণ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, আমাদের আদিম যুগ তা হলে আবার ফিরে আসছে বল ?

উপল বলিল, যারা ফিরাতে যায় তাদের সংখ্যা কমই হয়ে যাবে যদি ভোট নেওয়া হয়। আমরা অনেক ঠেকে অনেক তুলনা করে বুঝেছি, এ যুগে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি যা অন্য কোন যুগে অন্য কেউ পায় নি। আমার মনে হয়, পৃথিবীর জন্মকাল হতে যতগুলি যুগ এসেছে, সকল যুগের শ্রেষ্ঠ এই বর্ত্তমান যুগ।"

অরুণ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "নেহাৎ মূর্খ আমি, অতখানি উদার মত নিতে পাচ্ছিনে, ওর মধ্যে কতখানি ভালো রয়েছে তাও বুঝতে পারি নে। তবে আমি এইটুকু সাদা কথায় বুঝি, আজও সন্তান যখন ষ্টেটের হয় নি, বাপ মায়ের নামে আজও যখন তারা পরিচিত হয়, মায়ের স্নেহ ভালোবাসা আজ ও যখন তারা পায়, তখন সেই মায়ের—

উপল বলিল, "জ্বালালে বাপু, তুমি লেখাপড়া শিখেছিলে কেন তা আমি আজও বুঝ্‌তে পারিনে, তোমার এ যুগে না জন্মে আরও একশো বছর আগে জন্মানো উচিত ছিল, এ যুগের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে তুমি চল্‌তে পার্‌বে না।"

অরুণ একটা হাল্‌কা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'সত্যি তাই মনে হয় উপল, আমার মত লোকের এ যুগে জন্মানো উচিত হয় নি। কিন্তু আর না এখন থাক্, আমি চল্‌লুম।'

উপল জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় থাক্‌বে?'

অরুণ বলিল, 'আমি রেঙ্গুণে যাচ্ছি, থাকার জায়গার অভাব হবেনা, এক বন্ধু ওখানে আছে, সেখানেই থাক্‌ব।'

বিস্ফারিত চোখে উপল বলিল, 'একেবারে রেঙ্গুন যাচ্ছ, দেশ ছেড়ে—?'

বিষণ্ণ হাসিয়া অরুণ বলিল, 'আমার কাছে দেশ আর বিদেশ সবই সমান উপল, কাজেই দেশ ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হবে বলে মনে হয় না। উঠি উপল, আমার অনেক কিছু নিয়ে যেতে হবে সঙ্গে করে, সব কিন্‌তে হবে।'

সে উঠিয়া পড়িল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উপল বলিল, 'কতকাল দেখা হবে না অরুণদা, মাঝে মাঝে পত্র দিয়ো। সেই মায়ের মেয়ে বলে মেয়েটার পরে নিষ্ঠুর হয়ো না, মনে রেখো—পাঁকেই পদ্ম ফুটে সেই পদ্মেই দেবতার পুজো হয়।'

অরুণ বলিল, "তাই করো উপল, ও যেন পদ্ম হয়েই ফুটতে পারে, যেন দেবতার পায়েই ওর জায়গা হয়। আমি দিন রাত সেই প্রার্থনাই করি—ধৃতি যেন মানুষ হতে পারে, তাকে আমি দেবতার পায়ে যেন নিবেদন কর্‌তে পারি।"

উপল প্রণাম করিয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইল তখন তাহার বড় বড় দুইটী চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

(২১)

ম্যাট্রিকের ফল বাহির হইলে দেখা গেল, শুভ্রতা স্কলারশিপ পাইয়াছে কতকগুলি লেটার লাভ করিয়াছে।

আনন্দ রাখিবার জায়গা ছিল না, শুভ্রতা তখনই অরুণকে একখানা পত্রে এ সংবাদ পাঠাইল।

দয়াময়ী তাহাকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়া পড়াইতেছিলেন, বোর্ডিংয়ে দেন নাই। বোর্ডিংয়ের খরচ অতগুলা করিয়া টাকা মাসে মাসে যোগাইতে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইত অথচ শুভ্রতার সমস্ত খরচ অরুণ রেঙ্গুন হইতে পাঠাইয়া দিত।

তাহাকে আরও পড়ানো দয়াময়ীর ইচ্ছা নয়। অরুণকে তিনি দু' তিনখানা পত্রে জানাইয়াছিলেন, শুভ্রতার বয়স সতের আঠার হইল, আর না পড়াইয়া এখন বিবাহ দেওয়াই উচিত।

অরুণ উত্তর দিয়াছিল, পড়াটা শুভ্রতার মতের উপর নির্ভর করিতেছে। সে যদি পড়িতে চায়, অরুণ তাহাকে পড়াইবে, যদি না পড়িতে চায়—বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয়, অরুণ দেশে আসিয়া উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া বিবাহ দিবে।

দয়ামযী রাগ করিয়া পত্রখানা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, 'সবই বাহাদুরি। মেয়েরা নাকি নিজেদের পছন্দমত বিয়ে করবে,—কালে কালে আরও কত কি যে দেখতে হবে তাই ভাবছি। ওই জন্যেই না বলি মেয়েদের লেখা পড়া শিখাতে নেই, মূর্খ হোয়েই থাক, রা-টি কাড়বে না। ছিল বটে আমাদের সেকালে যার তার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হোত— মেয়ের মুখে কথা থাকত না। এ কালের সব মেয়ে নয় তো কেউটে সাপ, ফণা ধরেই আছে ছোবল দিলেই হয়। গড় করি এ কালের মেয়েদের খুরে, দরকার নেই বাবা ওদের ঘাঁটিয়ে।

ভালো মানুষ রতিনাথবাবু বলিলেন, 'সে নিয়ে অরুণ কি করবে? শুভার মা নাকি বলে গেছেন তাই সে—'

গৃহিণী ধমক দিয়া বলিলেন, 'তুমি থাম গো, তোমার আর ফোঁড়ন কাড়তে হবে না, পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বলে যায় তোমার কথা শুনলে। তোমাদের অমনি আস্কারা পেয়েই না আজকালকার মেয়েগুলো মাথায় উঠে ধেই ধেই করে নাচে। আমার ভাইপোর সঙ্গে বিয়ের কথা পাড়তে না পাড়তে না তুমি বললে—ওর সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না। কেন বিয়ে হতে পারে না জিজ্ঞেস করি। দেখতে না হয় একটু কালো, পুরুষের নাকি সে আবার দোষ? বলি তোমার চেহারা খানা একবার আয়না ধরে দেখেছ—তুমি কি কন্দর্প না কার্ত্তিক? মাস গেলে তিরিশটা করে টাকা ঘরে আনে সেই যে ওর মস্ত বড় 'সারটিফিকিট'।

আমি তো তা বলি নি। তুমি অরুণকে না জানিয়েই বিয়ে দিতে চেয়েছিলে, তাই আমি বলেছিলুম—'

দয়াময়ী দ্বিগুণ চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ; সে আমিজানি,—আমি বুঝ্‌ব, তোমার সে জন্যে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। আমি যা করি তা সকলের ভালোর জন্যেই সেটা জানো তো, চুপ করে শুধু দেখে যাও, কথা বল্‌তে এসো না।"

দয়াময়ী হঠাৎ যখন প্রস্তাব করিলেন, তিনি বাসা তুলিয়া দিয়া গ্রামে যাইবেন তখন শুভ্রতার মুখখানা বিমর্ষ হইয়া গেল।

বলিল, 'কিন্তু আমার পড়া—?'

দয়াময়ী বলিলেন, 'আর পড়েই বা কি হবে বাছা, যা পড়েছ ওই ঢের হয়েছে। অরুণ তোমার বিয়ের কথা লিখেছে, বলেছে যত শীগ্‌গির হোক্ তোমার বিয়েটা যেন দিয়ে ফেলা হয়।

শুভ্রতার বিবর্ণ মুখখানার পানে তাকাইয়া তিনি আরও বলিতে লাগিলেন, তোমার তো বুঝ্‌বার বয়েস হয়েছে বাছা, নেহাৎ খুকিটী নও, সময়ে বিয়ে হলে এ বয়সে তুমি তিনটী ছেলের মা হতে। পরের ছেলের দুঃখুটা একটু বুঝ্‌তে শেখো বাছা; তোমার মার কাছ হতে তোমার ভার নিয়েছে বলেই যে আজীবনকাল তোমার বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে তাকে—এমন লেখাপড়া করে তো তোমায় নেয় নি। ওর দিকে চাওয়া তোমার উচিত, ওকে বাঁচ্‌তে দিতে ছেড়ে দেওয়া তোমার দরকার।"

শুভ্রতা ভাবিয়া দেখিল কথাটা ঠিক। সে সত্যই ছেলে মানুষ নয় অনেক কিছু বুঝিতে পারে। অরুণ মুখে হয় তো কিছু বলিতে পারে নাই, পত্রে দয়াময়ীকে বিবাহের কথা লিখিয়াছে।

বিরস মুখেই সে বলিল, 'আমি যে বিয়ে করব না এ কথা তো বলি নি ঠাকুর মা—"

খুসি হইয়া দয়াময়ী বলিলেন, 'সে আমি জানি বাছা, সেই জন্যেই তো বল্‌ছি। দেশে চল, দেখে শুনে একটী পাত্র পেলেই বিয়েটা দিয়ে ফেলি। পড়্‌বে যে বাছা, সে তো একটা হাতীর খরচ, বলি, সেটাও তো সেই অরুণকে যোগাতে হবে। বল্‌তে নেই, তার একটী মেয়ে আছে; আজই না হয় তাকে অন্যের কাছে দিয়ে রেখেছে, আর দুদিন বাদে তাকে কাছে আন্‌তে হবে, তার আবার বিয়ে দিতে হবে সে সব খরচ ও তো বড় কম নয়।'

শুভ্রতা সকল যুক্তিই মানিয়া লইল; পরের উপর জোর করা চলে না এ কথা সে বেশই জানে।

পিতার কথা স্বপ্নের মত মনে পড়ে। তাহাকে কি ভালোই না বাসিতেন তিনি, আজ মনে হয় যদি তিনি থাকিতেন। নিজের সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তাহার নিজের বলিতে আত্মীয় স্বজন কেহ নাই, না একটী মামিমা, পিসিমা, কাকা জ্যেঠা দাদামশাই না একটী পরিচিত বন্ধুবান্ধব। সব যেন একটা রহস্যময় আবরণে ঢাকা পড়িয়া আছে। সে অনেক কথাই জানিতে চায় জানাইবে কে?

দয়াময়ী মাঝে মাঝে পিতামাতার কথা তুলে।

পিতার নাম গণপতি রায়, বাড়ীতো বরাবর কলিকাতাতেই ছিল;—মস্তবড় বাড়ী যেন রাজপ্রসাদ?

দয়াময়ী জিজ্ঞাসা করেন, "অতবড় বাড়ীখানা তোমার বাবা ঘুচালেন কি করে?"

কি করিয়া যে ঘুচিয়াছে তাহা শুভ্রতা নিজেই জানে না। দয়াময়ী নিজেই মীমাংসা করেন "দেনাপত্তর যথেষ্ট ছিল সেই জন্যেই গেছে। যাই হোক, আমার মনে হয় অরুণের হাতে তোমার বাবার টাকাকড়ি কিছু আছে, তোমার বিয়েতে সেই টাকাটাই খরচ করবে।"

শুভ্রতা সে কথা জানে না।

দয়াময়ী স্নেহপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলেন, "পাগল মেয়ে, টাকাকড়ি সম্বন্ধে এখন হতে একটু খোঁজ রাখ, অমন করে নিজের পায়ে কুড়ুল মেরো না,—ও আমার সহ্যি হয় না বাছা। তোমার জিনিষ নিয়ে পাঁচভূতে খাবে আর তুমি লোকের দোরে হাঁক পেতে বেড়াবে সে আমি দেখতে পারব না।"

শুভ্রতার হইয়া তিনি অরুণকে নিজেই একখানা পত্র দিলেন; তাহাতে লিখিলেন, শুনেছি শুভার বাপ খুব বড়লোক ছিলেন। যদিও দেনার দায়ে তাঁর বড় বাড়ী বিক্রি হয়ে গিয়েছিল, তবুও জানি শুভার মায়ের হাতে কিছু ছিল, আর তিনি মরবার সময় তোমার হাতেই সব দিয়ে গেছেন। আমি শুভার মত নিয়ে ভালো পাত্র ঠিক করেছি, এই মাসের শেষেই তার বিয়ে দেব, তাকে যাদের তা সত্বর পাঠিয়ো।"

দেশের বাড়ীতে ফিরিয়া আসার পনের কুড়ি দিন পরেই অরুণ দুই হাজার টাকা শুভ্রতার নামে পাঠাইয়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গে পত্র আসিল শুভ্রতার বিবাহ হইবে এবং সে নিজেই ইচ্ছা করিয়া বিবাহ করিতেছে জানিয়া অরুণ বিশেষ সুখী হইয়াছে। সে এ বিবাহে উপস্থিত থাকার ইচ্ছা সত্বেও আসিতে পারিলনা, বড় বেশী কাজ পড়িয়াছে, হাত ছাড়ার অবকাশ নাই। ভগবানের কাছে সে প্রার্থনা করিতেছে শুভ্রতা যেন সুখী হয়, সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। শুভ্রতার মায়ের নিকট হইতে সে বিশেষ কিছু পায় নাই, যাহা পাইয়াছিল, পাঠাইল।

দয়াময়ী মুখভার করিয়া বলিলেন, "দেখলে শুভা, আমি আগেই বলেছিলুম কিনা মরা হাতী লাখ টাকা। কিছু নেই কিছু নেই বললেও তোমার মায়ের হাতে টাকা ছিল বাবু, নেই বল্‌লে আর কেউ শুনুন—আমি শুনব না। তবে এত কম তা আমি ভাবিনি, যাকগে, এতে যেমন করেই হোক—তোমার বিয়ের খরচটা কুলিয়ে নিতেই হবে। অরুণের তবু এতটুকু ধর্ম্মজ্ঞান আছে,—কিছু নেই বলেনি—এই ঢের।"

শুভ্রতার মন অরুণের নিন্দা শুনিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, নেহাৎ সে বড় শান্ত বলিয়া মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলে নাই।

বাড়ীতে ফেরার কয়েকদিন পরে গৃহিণীর ভ্রাতুষ্পুত্র নগেন্দ্রনাথ দুইদিনের ছুটি লইয়া পিসিমার কাছে বেড়াইতে আসিল এবং সেই সময়েই শুভ্রতাকে দেখিয়া পিসিমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া, এমন কি দিন পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া সে কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া গেল।

শিক্ষিতা মেয়েটী পাছে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সম্বন্ধে কিছু ভাবিয়া থাকে, তাই দয়াময়ী আগেই জানাইয়া দিলেন, 'ওযে দেখতে কালো তাতে আর কি আসে যায়, পুরুষ ছেলে, বুদ্ধি থাকলেই হল। ওর পেটে বিদ্যে যথেষ্ট আছে বাছা, আমাদের গোপাল নগরের পাঠশালায় ওর মত বুদ্ধিমান ছেলে আর একটী ছিল না এ কথা নিজে ওর গুরুমশাই বলেছেন। লেখা পড়ায় ওর কি মাথাই ছিল, গুরুমশাই শত মুখে ধন্যি ধন্যি করতেন, বল্‌তেন—ও শাপভ্রষ্টি দেবতা, কোন পাপে এসে পৃথিবীতে জন্মেছে। এই দেখ না সেই বিদ্যের জোরেই না আজ তিরিশটাকা করে মাইনে পাচ্ছে, এ গাঁয়ে এমন ছেলে আর একটী খুঁজে পাবে না।

এত কথা বলার কোন দরকারই ছিল না, শুভ্রতা অসঙ্কোচেই আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

তাহার আত্মভিমানে যথেষ্ট আঘাত লাগিয়াছিল। অরুণকে সে কোনদিনই পর ভাবে নাই, অরুণ ও তাহাকে পর ভাবিবার অবসর দেয় নাই মায়ের মৃত্যুর পরে এই কয় বৎসরে অরুণ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। আজ সে শুভ্রতাকে দুর্ব্বিসহ ভার বলিয়া মনে করে এবং আর কাহারও উপরে এ ভার চাপাইয়া দিয়া সে নিষ্কৃতি পাইতে চায়, এই চিন্তাই শুভ্রতার অন্তর পিষিয়া দিয়েছিল।

যাহারেই হাতে হোক নিজেকে সে সমর্পণ করিয়া দিবে, অরুণকে দায়মুক্ত করিবে, এই তাহার একমাত্র অভিপ্রায়।

নবপরিচিতা একটী মেয়ে সেদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "হ্যাঁ ভাই, নগেনবাবুর সঙ্গে নাকি তোমার বিয়ে হবে?"

শুভ্রতা উত্তর দিয়াছিল, "হবে, আশীর্ব্বাদ হয়ে গেছে।" মেয়েটী বলিয়াছিল, "কিন্তু ওঁর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার চেয়ে আত্মহত্যা করে মরাও ভালো। ওঁকে দেখেছ তো? বয়স তো কম নয়, প্রায় বিয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ হবে, এর মধ্যে তিনটী স্ত্রীকে কাবার করেছেন।

শুভ্রতা হাসিয়া বলিল, "আমি হলেই চারটী পোরে, একগণ্ডা হয় কেমন?"

বন্ধু বলিল, 'মরণ তো ভালো কথা যদি ভালোভাবে মর্‌তে পাওয়া যায়। ওঁর প্রথম স্ত্রী আত্মহত্যা করে মরেছে, দ্বিতীয়টীকে এমন মেরেছিলেন যাতে তাঁকে আর উঠ্‌তে হয়নি, আর তৃতীয়টী—"

শুভ্রতা বলিল, "সেটী কি ভাবে মুক্তি পেলে?"

বন্ধু বলিল, "সেটী অত্যাচারের চোটে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে।"

শুভ্রতা হাসিয়া বলিল, "তা হলে মরণ ছাড়া মুক্তির আর একটা দরজাও আছে ?

শিহরিয়া মেয়েটী বলিল, "মাগো, ও কথা মনে করতেও পাপ, তার চেয়ে মরণই ভালো। মেয়েদের ইজ্জত অর্থাৎ তার সতীত্ব যেখানে গেলে খেলার জিনিস হয়, সেখানে যাওয়ার কথাটাও যেন কেউ ভাবেনা ভাই।"

সে ভয়াবহ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের কথা শুভ্রতা জানে। তাহারা যে খোলার ঘর আশ্রয় করিয়াছিল তাহারও পাশের দিকে এমনই কতই হতভাগিনী রূপোপজীবিনী বাস করিত। গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া সেই সব খোলার ঘরে বিকট চীৎকার প্রহারের শব্দ, ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া সে কতদিন মাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়াছে, কতদিন কত প্রশ্ন করিয়াছে—"ওদের কি কেউ নেই মা,—মা বাপ, ভাই বোন কেউ নেই, যারা ওদের বাঁচাতে পারে।"

মা নির্ব্বাক হইয়া থাকিতেন, কে জানে কেন এসব প্রশ্নের একটা উত্তর ও তাঁহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

বন্ধুর কথা শুনিয়া শুভ্রতা সেদিনকার সেই কথাই ভাবিয়াছিল, সত্যই সেখানে যাওয়ার চেয়ে মেয়েদের আত্মহত্যাও ভালো। তাহার অদৃষ্টে যদি দুঃখই থাকে, আর সে দুঃখ সহিবার মত ক্ষমতা যদি তাহার না হয়, সে আত্মহত্যা করিবে, গৌরবময় মৃত্যু বরণ করিয়া লইবে। ইহাই সে দৃঢ় সঙ্কল্প করিল।

ক্রমশঃ

গ্রন্থ-পরিচয়

শান্তি—মাসিক-পত্রিকা। সম্পাদক—শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস, সহ-সম্পাদক—শ্রীতারকনাথ দাস।

অগ্রহায়ণের সংখ্যাটী পড়িলাম। অবিনাশ ঘোষালের 'তচনচ' সমালোচনা প্রসঙ্গে যে লেখক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে 'বিয়ের কনে ও অন্য দুইটী গল্পের লেখক শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় ও সেই সম্প্রদায়েরই লেখক তাই এসম্বন্ধে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এই গল্পটী ছাড়া অন্যান্য গল্প কবিতা ও প্রবন্ধ মোটের উপর মন্দ হয় নাই। শান্তি ক্রমশঃ সুন্দর রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠুক এই কামনা।

বেদসার—শ্রীদীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী—৩১, মুক্তারাম রো, কলিকাতা।

এই বইখানা বাংলাদেশের বৈদিক সাহিত্যের অভাব দূর করিয়াছে। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর ভাষ্যকে অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের চারশ বেদমন্ত্রের পদার্থ ও সুন্দর সরল অনুবাদ এই বইখানিতে স্থান পাইয়াছে। বেদপাঠেচ্ছুগণ এই বইখানা পড়িয়া রস পাইবেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক শ্রমিক সম্মেলনে পঠিত—

অভিভাষণ—ডাঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বজবজ। ইং ১৬ই, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩ সন।

সুন্দর ও সতেজ ভাষায় শ্রমিক আন্দোলনের আগাগোড়া ইতিহাস। এ বইখানিতে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অল্প কথায় মনোরমভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাংলার শিল্পবিপ্লব ও গণজাগরণযুগের কাহিনীও ইহাতে আছে। শ্রমিকদের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাইতে হইলে সকলেরই এই বইখানা পড়া নিতান্ত দরকার।

দুন্দুভিঃ—প্রধান সম্পাদক—শ্রীবরেন্দ্রসুন্দর চট্টোপাধ্যায়।

পৌষের সংখ্যা পড়িয়া আমরা প্রীত হইলাম। ছোট্টর উপর এই পত্রিকাখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে বলিতে হইবে। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, বেতারবার্ত্তা সবই বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। আমরা এই পত্রিকাখানির শ্রীবৃদ্ধি ও বহুল প্রচার কামনা করি।

চিকিৎসা জগৎ—সম্পাদক ডাঃ শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশালয়—২৭, সি, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ৩৷৴০

ইহা এলোপ্যাথিক চিকিৎসাসম্বলিত একখানি মাসিক পত্রিকা। এ পত্রিকা পাঠে চিকিৎসক ও এলোপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষার্থীগণ বহু আবশ্যক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন।

আমরা এ চিকিৎসা শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, তথাপি কোন কোন বিষয় পড়িয়া বেশ ভাল লাগিল এবং কিছু পথ্য বিধি জানিতে পারিলাম। তবে ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা এবং কতগুলি ডাক্তারি টেক্‌নিক্যাল নামের সহিত আমাদের পরিচয় নাই বলিয়া বুঝিতে পারি নাই।

যে উদ্দেশ্য লইয়া পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ হউক ইহাই সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

প্রিয়-বান্ধবী—২৬৮ পৃষ্ঠার উপন্যাস। লিখেছেন শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল এবং প্রকাশ করেছেন, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

দাম বেশী নয় বল্‌তে পারলেই খুশী হতেম কিন্তু দাম একটু বেশী। বইখানা বার বার পড়েছি। সঙ্গত ও অসঙ্গত ঘটনার মধ্যে আমরা শ্রীমতী ও জহরের মনোলোকে প্রবেশ করার প্রয়াস পেয়েছি কিন্তু প্রবেশপথে নিরন্তর কোথায় যেন বাধা ঘটেছে।

জহরকে যৌবনধর্ম্মী বোহেমিয়ান বল্লে ভুল বলা হবে। সে নিজেকে যতখানি নিরাসক্ত সবল বলে মনে করে, আসলে ততখানি সে নয়। তার দারিদ্র্য স্বেচ্ছাবৃত নয়। ভাগ্য তাকে লাঞ্ছনা করেছে, সেও ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এইটুকু বল্‌লেই জহরের সব পরিচয় দেওয়া হয় বলে মনে করি। এই বইয়ে আমাদের জহর বহুবার বলেছে, দুঃখ নির্ম্মল আনন্দ দেয়। সে সেই দুঃখ গভীর আনন্দের মধ্যে উপভোগ করে, কিন্তু জীবনে দুঃখ তাকে পেষণ করেছে দেখ্‌তে পাই। দারিদ্র্য সবল মানুষকে হীন করে না, তাকে আবেগময় করে, তাকে চঞ্চল করে, তাকে বিদ্রোহী করে, কিন্তু জহরের বিদ্রোহ এমন শ্রেণীর নয়। যে সমাজের নির্ব্বোধ ধর্ম্মান্ধতা, অসঙ্গত অবিচার এবং অসীম হীনতা তাকে ক্ষিপ্ত করেছে, তার জীবনকে নিস্ফল ও নিরানন্দ করেছে, তার বিদ্রোহী মন সেই সমাজের অসংখ্য প্রশ্নরাজির ভীড়ে প্রবেশ করতে চেয়েছে বটে, কিন্তু আশাহীন ও দীপ্তিহীন প্রাণ নিয়ে, দরিদ্র জহর আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছে প্রকাশ পায়নি।

সিনিক্ জহরের মধ্যে লেখক যে নিরাসক্তির প্রচ্ছন্ন বিকাশ দেখাতে চেয়েছেন তাও ব্যর্থ হয়েছে, কারণ যে নিরাসক্তি সকল বন্ধনের মধ্যে প্রকাশ, সে মানুষকে উদ্দেশ্যহীন প্রকৃতির কূলে নিয়ে যায়। সে নিরাসক্তি, মনের বন্ধনহীনতা, সংসারের সকল ভালমন্দের উপর প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি এবং সেই অলব্ধ আনন্দের সাধন যা মানব মনের পরিপূর্ণ বৈচিত্র্যময় বিকাশ সাধন করে। জহরের নিরাসক্তি বিলাস মাত্র। নিঃসঙ্গ সুন্দরী নারীর সঙ্গে একত্র বাস করেও সে মোহগ্রস্থ হল না, সকল সময়ে এ সবল মনের পরিচয় নয়, তার মন মৃত অথবা ভীরু এও হতে পারে।

জহর মেয়েদের উল্লেখ করে যে নিস্প্রয়োজন দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেছে, সে সিনিকের কটুভাষণ হতে পারে। কিন্তু বীর্য্যবান পুরুষের যোগ্য নয়। এই সমস্ত উক্তি সত্য বলে ধরে নিলেও, এর প্রকাশে পৌরুষ পরিস্ফুট না।

আমাদের শ্রীমতী ঠিক এই রকম কথাই পুরুষ প্রসঙ্গে বল্‌তে পারত, কিন্তু বলেনি। সে নানা বিরূপ আবহাওয়ায় উপস্থিত হয়েছে। সে স্বামী ত্যাগ করেছে, পুরুষের সঙ্গে নির্জ্জনে রাত্রিবাস করেছে, মিথ্যা কথা বলেছে, চুরী করেছে কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই আত্মবোধ বর্জ্জিত হয় নি। যে পৃথিবীকে জহর ঘৃণা করেছে, সেই পৃথিবীর মাটিতে যুগে যুগে জন্মলাভের কামনায় সে আকুল হয়েছে। স্বামী ত্যাগের কালে তার অন্তরে যে একটা ব্যর্থতার পরিচয় পেয়েছিলেন, সে ব্যর্থতা বোধ একদিন নিমেষে অপসারিত হল। জহরকে যে দিন সে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিল, সেইদিন একখানি মঙ্গলময় ও শীতল স্পর্শ তাকে অভিভূত করেছিল। সেদিন হতে গ্রহণ ও ত্যাগ তার কাছে অভিন্ন হয়েছে। সেই দিন তার হৃদয় প্রস্ফুট হয়েছে। সেই ছোট মালতী-লতার বেড়া দেওয়া ঘরখানি তাকে অমূল্য আশ্রয় দিয়েছে, শুধু সূর্য্যকুমার নয় অতি সামান্য ভিক্ষুককে সেদিন সমান আগ্রহে গ্রহণ করতে পারত। শ্রীমতীর প্রেম তাকে প্রকৃতির বিজন প্রান্তে পরম গৌরবে প্রতিষ্ঠা করেছে। যেখান হতে

সে ব্যথাতুর সমাজকে প্রতিনিয়ত সেবার কোমল স্পর্শে নির্ম্মল হতে নির্ম্মলতর করতে পারে। সিনিক জহর, দুর্ব্বল জহর শ্রীমতীর প্রেমের যোগ্য নয় কিন্তু হায়, প্রেম অন্ধ।

প্রবোধ বাবুর রচনা সাফল্যের জন্য তাঁকে অভিনন্দিত করি।

হিন্দুত্বের পুনরুত্থান—শ্রীমতিলাল রায়। প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হিন্দুত্বের পুনরুত্থান হইবেই লেখকের এই দৃঢ় বিশ্বাসই বইটীর ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন যদিও সর্ব্ববিষয়েই হিন্দুরা নামিয়া গিয়াছে কিন্তু নূতন হিন্দুজাতির অভ্যুত্থান আসন্ন, এই আশার বাণীই লেখক আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। বাস্তবিকই বইখানা পড়িলে হতাশের প্রাণেও আশার সঞ্চার হইবে সন্দেহ নাই। ভাষা চলন সই। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

শিক্ষাসমাচার--৩৯শ সংখ্যা, সম্পাদক—শ্রীসুনৃতরঞ্জন গুপ্ত।

এখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। এই রামমোহন শতবার্ষিকী সংখ্যাটী অতি সুন্দর হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও লেখিকাগণ তাঁহার অমর স্মৃতির উপযুক্ত পূজাই করিয়াছেন। বইটী পড়িয়া আমরাও তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালী—শ্রীনলিনী রঞ্জ সরকার।

ব্যবসায়ে বাঙ্গালী কি ছিল আর এখন কি হইয়াছে তাহারই শোচনীয় বিবরণ এই বইখানিতে আছে। দিনের পর দিন পরাজিত হইতে হইতে এখন ব্যবসায়ে বাঙালীর স্থান খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। ইহার জন্য দায়ী কি? বাঙ্গালীর বুদ্ধি ব্যবসায়ে যে খোলে না তা মোটেই নয়। তাহাদের শ্রমবিমুখতা ও কেরাণীপ্রিয়তা ইহার একমাত্র কারণ। এখনও সময় আছে, ধৈর্য্য ধরিয়া ব্যবসায় চালাইতে পারিলে, এই দারুণ প্রতিযোগিতার দিনে বাঁচিবার আশা আছে ইহাই লেখক বুঝাইয়াছেন। এই সুচিন্তিত ও সুলিখিত বইখানা আমরা সকলকেই পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

প্রাপ্তি স্বীকার—

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমরা সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি, 'জীবন-বৈচিত্র্য' শ্রীনিস্তারিণী দেবী প্রণীত; 'তচ্নচ্' 'বাতায়ণ' পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত ও শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল প্রণীত। শ্রীনরেশ চন্দ্র সেন প্রণীত 'পরিণাম' প্রকাশক প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস্।

প্রতিযোগিতা

নিম্নলিখিত প্রত্যেকটী বিষয়ে একটী কুড়ি টাকার পুরস্কার দেওয়া হইবে। (১) প্রবন্ধ (২) ছোট গল্প (৩) একবর্ণ চিত্র (৪) রেখা চিত্র ১০ই চৈত্রের মধ্যে প্রবন্ধচিত্রাদি পত্রিকা কার্য্যালয়ে পৌঁছিতে হইবে, কোন বিষয়ে পুরস্কার যোগ্য প্রবন্ধ চিত্রাদি না থাকিলে, সেই বিষয়ে পুরস্কার প্রদান বন্ধ থাকিবে। প্রেরিত প্রবন্ধ গল্প চিত্র প্রকাশের অধিকার পত্রিকার থাকিবে।

রাজা রামমোহন

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

এই মোহাচ্ছন্ন দেশে একদিন যবে
সব আলো গেল নিবে, ঘোর কলরবে
পশ্চিম সমুদ্র হতে ঘন ঊর্ম্মিরাশি
কলধ্বনি করি আসে সব নিতে গ্রাসি।
তীর বুঝি গেল ভেসে চূর্ণ গৃহদ্বার
তরী পরে নাহি মেলে কোনও কর্ণধার
সম্মুখের আলো দেখি যবে আপনায়
অন্ধ মনে হয়েছিল নূতন নেশায়
পিছে যাহা আছে তাহা মনে করি মিছে
বিদেশীর হাতে যবে সমস্ত সঁপিছে
তুমি এলে নবরূপে অন্ধকার রাতে
যে কথা ভুলেছে সবে সে কথা শোনাতে।
একদিন এই দেশে যে উদাত্ত স্বর
উঠেছিল যে বারতা ভেদিয়া অম্বর
সেই ধ্বনি থেমে গিয়ে সেই আলো যবে
সহসা নিবিয়া গেল, তখনো গৌরবে
তুমি দীপ লয়ে এলে ঘন রজনীতে—
অতি ক্ষীণ শিখা মাঝে নব আলো দিতে।
বিধবার অশ্রুজলে চিতার আগুনে
উঠেছিল যে ক্রন্দন তুমি তাই শুনে
স্নেহ সিক্ত হস্ত দিয়া ব্যথা অশ্রু জল
সহসা মুছায়েছিলে। বেদনা উছল
শান্ত হল স্পর্শে তব। ঘন অন্ধকার
ক্রমে দীপ্ত হয়ে ওঠে আলোতে তোমার।
মোহাচ্ছন্ন দেশে যবে অন্ধকার ধূলি
শ্বাস রুদ্ধ করে আনে সব ধর্ম্ম ভুলি
অতিক্ষুদ্র অতি তুচ্ছ আচারে বিচারে
প্রাচীরের অন্তরালে নিশার আঁধারে
মানুষে মানুষে যত ভেদ তোলে গড়ে
দৃষ্টি আসে ক্ষীণ হয়ে অন্তরে অন্তরে
নাহি বাজে কোনও স্পর্শ; দীন চিত্ত হায়
বিশ্ব-সভা মাঝে কোনও স্থান নাহি পায়,
চিরন্তন রূপে তবে পুরাণো ভারত
তোমা মাঝে প্রকাশিতে পেয়েছিল পথ।
ক্ষুদ্রতার বর্ম্ম ভেদি নব ধর্ম্ম দিয়া
পশ্চাতের অন্ধকার ফেলিলে ভেদিয়া
মোহমুক্ত কণ্ঠে তব হৃদয়ে উদার
উদ্ভাসিল ভারতের যাহা আপনার।

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন

শ্রীসুখলতা রাও বি, এ

শত শত বৎসরের চেষ্টায় যাহা সফল হয় নাই, কোন্ যাদুকরের এক মায়াকাঠীর স্পর্শে তাহাই সম্ভব হইতে চলিয়াছে। অজ্ঞান মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া সমস্ত ভারতবাসী আপনাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইতেছে, অন্তরে কবির এই বাণী ঝঙ্কৃত হইতেছে, 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

ভারতের এই নব জাগরণের যুগে মহাত্মাজীর যে কল্যাণের এবং আশার বাণী ভারতবাসীর অন্তরে সঞ্চার করিতেছে যেজন্য তিনি জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা শতাব্দীব্যাপী জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছে।

কতদিন হইতে যে অস্পৃশ্যতা ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু মানুষের অন্তরে ইহা যে কি হীনভাবের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আজ ভাবিয়া দেখিলে দুঃখ হয়। মনে হয় ভারতের যত কিছু অবনতি যত কিছু ক্ষতি যতকিছু অপমান তাহার মূলে রহিয়াছে অস্পৃশ্যতা-বোধ। যাহারা আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় কত উপকার সাধন করিতেছে তাহাদিগকেই আমরা একপার্শ্বে ঠেলিয়া রাখিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে আহার করিবনা, তাহাদিগকে স্পর্শ করিবনা এবং তাহাদিগকে দেব-মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিবনা। আর তাহারা আমাদিগের এই ব্যবহারে আপনাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। অনেক সময় এই কথা শোনা যায় যে, ঠাকুরমা দিদিমারা দুঃখ করিয়া বলেন, 'তোদের জন্য জাত-জন্ম আর রইল না।' অর্থাৎ পরবর্ত্তী যুগের নাতি নাতিনীগণ অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের পক্ষে অধিকতর উদার মতাবলম্বী। অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল যাহারা তাহারা বলেন,—অস্পৃশ্যতা যে ঘৃণার ফল প্রসূত তাহা নহে কেবলমাত্র একটা প্রচলিত সামাজিক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই উচ্চনীচ ভেদাভেদ তাহারা মানিয়া চলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সাম্য ও স্বাধীনতার যুগে সেই অন্ধ সংস্কারের বশীভূত হইয়া থাকিলে চলিবে না। ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য অনুন্নত শ্রেণীর সর্ব্বতোভাবে উন্নতি সাধন একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়।

আজকাল অনেক উচ্চজাতের হিন্দুগণ প্রকাশ্য সভায় বা বিদ্যালয় সমূহে অস্পৃশ্যদের হস্তে জল-গ্রহণ অথবা আহার্য্য গ্রহণ করিতেছেন এবং নিজেদের যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু কেবল তাহাই যথেষ্ট নহে। অনুন্নত শ্রেণীর বালকবালিকাদিগের ভিতরে সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। প্রত্যেক শিক্ষিত নরনারী যদি এ বিষয়ে বিশেষ মনযোগ প্রদান করেন তাহা হইলেই এ আন্দোলন সাফল্য লাভ করিতে পারিবে আশা করা যায়। আজ কাল কোন কোন স্থানে সহৃদয় যুবক ও মহিলাগণের চেষ্টায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য কয়েকটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ

প্রত্যেক স্থানে যদি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় তবে বাস্তবিকই দেশের মঙ্গল হইবে। যাহারা দেশহিতৈষণার কার্য্য করিতে চাহেন—তাহাদের পক্ষে অস্পৃশ্য জাতির প্রতি যে অবহেলার ভাব তাহা প্রতিমানবের মন হইতে সম্পূর্ণ ভাবে মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

এই আন্দোলনের জন্ম যে একেবারেই নূতন তাহা নহে। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া এই আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কোন কোন সমাজ সংস্কারকগণ ও ইহার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী যখন ইহাদের জন্য আপনার জীবন বলি দিতে প্রস্তুত হইলেন তখন হইতেই আন্দোলন যেরূপ ফলপ্রদ হইয়াছে—তাহা বিস্ময়কর!

অস্পৃশ্যতা দুরীকরণের জন্য বালকবালিকাগণ ও যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিতে পারে। এই সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন,—

"The best way Indian children can help the movement is to go to untouchables' quarters under the supervision of their teachers or parents and freely mix with untouchable children say, regularly every week. Let untouchable children share their sports. This must not be done irregularly, but regularly, at stated intervals, if it is to bear fruit." অর্থাৎ ভারতীয় বালক বালিকাগণ তাহাদের শিক্ষক অথবা পিতামাতার সহিত সপ্তাহে নিয়মিতরূপে একবার করিয়া অস্পৃশ্য জাতির বাসস্থান সমূহে গমন করিলে ও তাহাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে খেলা মেলা করিলে এই আন্দোলনের যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবে অস্পৃশ্য জাতের ছেলেমেয়েরাও সকল খেলাধূলা ক্রীড়াকৌতুকে যাহাতে যোগ দিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিয়মিত রূপে মধ্যে মধ্যে এইরূপ করিলে এইআন্দোলন কার্য্যকরী হইবে।"

আমরা সমস্ত ভারতবাসী যদি এই বিষয়ে সচেষ্ট হই তবে যিনি জগৎস্রষ্টা তাঁর ও প্রীতিসাধন করা হইবে। আমরা বলিতে পারিব—

"বিশ্বজনের পায়ের তলায় ধূলিময় যে ভূমি—
সেই তো স্বর্গভূমি
সবায় নিয়ে সবার মাঝ লুকিয়ে আছ তুমি—
সেই তো আমার তুমি।"

সুইডেনে জাতি গঠন—

এই নূতন যুগের Swedeএ এক মজার জাত তৈরী হ'চ্ছে; বলিষ্ঠ শরীর, লম্বা মোট মোটা হাত, চলে যেন দানবের মত। এ যুগের ছেলেরা একটা নূতন experiment করিতেছে— অর্থাৎ বাল্যবিবাহ। সাধারণতঃ আজকাল চব্বিশ পঁচিশ বৎসর বয়স হ'লেই ইহারা Engaged হয়, মেয়ের বয়স আঠার কি কুড়ি, ছেলের বয়স হয়তো ছাব্বিশ সাতাশও হ'তে পারে (অবশ্য এটাই এদের অল্প বয়স)। যদি বাপ-মায়ের পয়সা থাকে তবে তাদের বিবাহ দিয়ে দেয় এবং বিবাহিত জীবন যাপনের খরচও দেয়। যাদের বাপ-মায়ের পয়সা নেই তারা অবশ্য বিবাহ করে না।

ইহারা বলে যে, অল্পবয়সে বিবাহ হইলে জমে ভালো। বাস্তবিক, ডেনমার্ক অপেক্ষা এদের ডাইভোর্সের সংখ্যা অনেক কম। ডেনমার্কের Statistics এ বিষয়ে মোটেই ভাল নয়। এদের মত এই যে, অল্প বয়সে বিবাহ হ'লে Adapt করবার ক্ষমতা থাকে এবং Adapt করেও। ছেলেরা যে প্রত্যেকেই রাজকন্যার জন্য ত্রিশ বত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিবে, সে দুরাশা ইহারা যেন ত্যাগ করিয়াছে। বৃদ্ধদের মতে এটা নাকি ভালই হইতেছে। তবে এটা ঠিক, মেয়েদের ও ছেলেদের মধ্যে পরস্পরকে পরখ করিয়া দেখিবার প্রকৃতি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে। They always fall in love and get engaged কলেজে যে সব ছেলে M. Sc. অথবা B. Sc.র জন্য কাজ করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা হইবে কুড়ি বাইশ জন। এর মধ্যে দু'তিনজনা ছাড়া সবাই engaged এবং ছ'টি বিবাহিত। ইহারা বলে যে, এইরূপ হওয়াতে ছেলেদের মধ্যে তাড়াতাড়ি Settled হইবার বাসনা খুব বেশী হইয়া পড়িয়াছে। এটা জাতীয়তার দিক হইতে অবশ্য ভালো। মেয়েরা আর একটা কাজ করিয়াছে ভালো। একটু ভালো মেয়ে বা ভালো ঘরের অর্থাৎ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, যে সব ছেলে Regular courseএ পাশ করে না, বা College life enjoy করিতে থাকে, তাহাদের নিকট ঘেঁসে না। এটাও অবশ্য ছেলেদের অনেকটা দুরস্ত করিয়াছে। কিন্তু মুস্কিল এই যে, খুব ভালো, ছেলেরাও আবার মেয়েদের সঙ্গে মিশিতে চাহে না। যাক, মোটের উপর চলিতেছে ভালো এবং বিবাহিত জীবনের কালটাকে ইহারা বাড়াইয়া দিয়াছে।

Education যে এদের কি করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এদের school আমাদের I. A. I. Sc. Standard, কিন্তু উপরের চারটি Classএ Dr. না হইলে কেহ পড়াইতে পারে না; এদের School laboratory ও আমাদের কলিকাতার অনেক Private college অপেক্ষাও ভাল। Schoolএর শিক্ষকদের মাঝে মাঝে ছুটি দেওয়া হয়, যদি তাহারা Research করিতে চায়। অন্য অন্য শিক্ষকেরা [আমাদের দেশের degree অনুসারে] অন্ততঃ B. T. হইবে। Primary schoolএর শিক্ষকদের L. Tর মত একটা degree চাই। এই School গুলি সত্য সত্যই দেখিবার মত। Higher Schoolএর Teacherদের কি সম্মান এখানে! আমার পুরাতন বন্ধুরা প্রায় সব Teacher হয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে রাস্তায় চলা এক বিপদ, মাথা থেকে টুপী খুলিয়া চলিতে হয়। এমন কি Universityর Professorরাও তাঁদের সম্মান করেন। কারণ তাঁদের ছেলেদের এই Teacherরাই মানুষ করিতেছেন—আর আমরা!! এই সব Teacherদের সপ্তাহে ২০ হইতে ২৫ ঘণ্টা করিয়া পড়াইতে হয় এবং ইহারা পড়াইতেও ভাল পারেন। —দেশ

যুগ-মানব রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে মিঃ জে, টি সাণ্ডারল্যাণ্ডের বাণীঃ—

আমেরিকা হইতে মিঃ জে, টি স্যাণ্ডারল্যাণ্ড রামমোহন শতবার্ষিকী উপলক্ষে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্যে যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন তাহার সারাংশ:—

ভারত-জননীর এই সুসন্তানকে আমি বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ মনে করি।

আমার মতে দুইদিকে তাঁহার কৃতিত্ব জগতে অতুলনীয়;—প্রথমতঃ ব্যাপকভাবে নিখিল বিশ্বের সেবা এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহার জন্মভূমির সেবায় একাগ্র প্রচেষ্টা।

ধর্ম্মনেতা হিসাবে তিনি যে মানব জাতির মহদুপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহ। ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনায় তাঁহার স্থান যে অন্যান্য সকলের উর্দ্ধে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ভারতবর্ষের সেবায় তাঁহার কর্ম্ম প্রচেষ্টা তিন দিকে প্রসারিত হইয়াছে:—

(১) তিনি বাংলা ভাষায় প্রাণসঞ্চার করিয়া উহাকে সতেজ, সমৃদ্ধিশালী ও স্থায়ী সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত করিয়াছেন।

(২) তিনি ব্রাহ্মসমাজ নামে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষে সংস্কারআন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

(৩) রামমোহনই সর্ব্ব প্রথম সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে বৈদেশিক শৃঙ্খলমোচনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া ভারতবর্ষকে মুক্তির বাণী শুনাইয়াছিলেন। স্বাধীন চিন্তা করিয়া স্বাধীনভাবে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবে এবং পুনরায় ভারতবর্ষ জগতের জাতিসঙ্ঘে তাহার অতীত গৌরবের আসন অধিকার করিবে—ইহাই ছিল রামমোহনের আকাঙ্খা।

রামমোহন রায় উদাত্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন,—"আমি স্বাধীন হইতে চাই,—স্বাধীনতা ব্যতীত জীবনে আমার কোনও আকর্ষণ নাই।" সমগ্র ভারতবর্ষ আজ তাঁহার সেই বাণী মনেপ্রাণে উপলব্ধি করিতেছে।

রামমোহনকে আধুনিক ভারতের জন্মদাতা বলা হয়, তাহা হইলে আরও খাঁটি অভিধান দেওয়া হয়।

আমার আন্তরিক বিশ্বাস ভারতবর্ষ অদূর ভবিষ্যতেই স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবে, সেইদিন ভারতবর্ষ রামমোহনের মহত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবে।

ভারতের যুব-আন্দোলনের লক্ষ্য ঃ—

'গিয়োরনালেত্ত ইতলিয়' নামক পত্রিকার প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকারের সময় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের জনআন্দোলনের বিষয় বর্ণনা করেন।

শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজনীতিগত ও কৃষ্টিগত কার্য্য-তালিকার বাহিরে থাকিয়া স্বাধীনতা লাভ করাই উক্ত আন্দোলনের লক্ষ্য।

"তিনটি শক্তিশালী জাতীয় দলের মধ্যে (মহাত্মা গান্ধীর যাহাদের সম্বন্ধে কোন উৎসাহ নাই)" যথা—যুবক, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন আমাদের প্রচার কার্য্য নিবদ্ধ থাকিবে।

রুশিয়াতে দ্বিতীয়বার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ঃ—

সোভিয়েট রাষ্ট্রকে সর্ব্ববিষয়ে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য দ্বিতীয়বার যে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কর্ম্মপদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে এই পঞ্চ-বার্ষিকীর মেয়াদ শেষ হইবে। এই বন্দোবস্ত অনুসারে কারখানার উৎপাদন ১৯৩২ সালের অপেক্ষা আড়াইগুণ এবং মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের অপেক্ষা ৯ গুণ বৃদ্ধি করা হইবে। ৭ হাজার মাইল নূতন রেলপথ নির্ম্মিত হয় এবং কৃষিপণ্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হইবে।

মোটর গাড়ীর সংখ্যা শতকরা ৮'৩০ ভাগ বৃদ্ধি করা হইবে। ছাত্রদের সঙ্গে শতকরা ৫০ ভাগ বর্দ্ধিত করা হইবে।

স্ত্রী-শিক্ষার জন্য দান ঃ—

কলিকাতা হাইকোর্টের য়্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার দমদম উড়ো-জাহাজের আড্ডার নিকট ৫০ বিঘা জমি স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতির জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন। তথায় শীঘ্রই একটি আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইবে। পরলোকগত রায়বাহাদুর বিহারীলাল মিত্রের প্রদত্ত অর্থ ও ঐ কেন্দ্রে ব্যয় করা হইবে।

স্ত্রী ও পুরুষের জীবনের দৈর্ঘ্য—

মিঃ জেমস ডাঙ্কান স্ত্রীলোক ও পুরুষের জীবনের দৈর্ঘ্যের যে তুলনামূলক তালিকা তৈয়ার করিয়াছেন, এই স্থলে দেওয়া গেল—

বয়স	পুরুষ	স্ত্রীলোক
০	৩৪.১২	৮৬.৬৪
৫	৪৪.৫৫	৪৭.৩৫
১০	৪২.২৭	৫৫.২৪
১৫	৩৮.৫৮	৪১.৭৮
২০	৩৫.১৩	৩৮.০৭
২৫	৩২.১৬	৩৪.৫০
৩০	২৯.৪০	৩১.৩২
৩৫	২৬.২৯	২৭.৯৯
৪০	২৩.১৬	২৫.৭১

বয়স	পুরুষ	স্ত্রীলোক
৪৫	১৯.৯৬	২১.৪৭
৫০	১৬.৮৬	১৮.৩১
৫৫	১৩.৯৩	১৫.৫১
৬০	১১.২৯	১২.৭৯
৬৫	৮.৭৩	১০.২২
৭০	৬.৭৫	৭.৯৩
৭৫	৫. ৩	৬.৪০
৮০	৪.১৬	৫.২৪
৮৫	২.৯৮	৪.২২
৯০	১.৫০	৩.১৫
৯৫	...	২.৫০

উপরোক্ত হিসাবটী যদি ঠিক হয় তাহা হইলে দেখা যায় যে স্ত্রীলোকদের জীবনের সাধারণ দৈর্ঘ্য পুরুষের চেয়ে খানিকটা বেশী।

কোন্ ধর্ম্মের কত লোক?

পৃথিবীতে ১৮৫ কোটি মানব বাস করে তন্মধ্যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীর কত লোক আছে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

খৃষ্টান	৬৮ কোটি	২৪ লক্ষ	পার্ব্বত্যজাতি	১৩ ”	৫৯ ”
কনফুসিয়ান	৩৫ ”	৬ ”	মিণ্টো	২ ”	৫০ ”
হিন্দু	২৩ ”	১ ”	ইহুদী	১ ”	৬১ ”
মুসলমান	২০ ”	৯০ ”			
বৌদ্ধ	১৫ ”	৯ ”			

—সঞ্জীবনী।

জার্ম্মাণীতে সুপ্রজনন বিষয় (Engenic) আইন:—

হার হিটলার (Herr Hitler) তত্ত্বাবিধানে জার্ম্মাণীর নাজী গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি সুপ্রজনন বিষয়ক আইন পাশ করিয়াছেন। উহাতে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, যে সকল নর ও নারী দুর্ব্বল চিত্ত (feeble minded), অত্যধিক মদ্যপানাসক্ত, অথবা পুরুষাণুক্রমিক দুঃশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত তাহাদিগকে সন্তান উৎপাদন বা ধারণের শক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে এই ব্যবস্থার ফলে সবল সুস্থ ও কার্য্যক্ষম জার্ম্মাণ জাতি সৃষ্ট হইবে। প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক যে জার্ম্মাণ সরকার জন্ম নিয়ন্ত্রণেব বিরোধী।

ভারতবর্ষে এইরূপ আইনের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। এ দেশে দুর্ব্বলচিত্ত অথবা দুঃশ্চিকিৎস্য রোগাক্রান্ত নরনারীর বিবাহ ও সন্তান উৎপাদন বন্ধ না করিলে দেশ অক্ষম ও অসুস্থ লোকে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। পিতা-মাতারাও বিবাহকালে ভাবী বর ও কন্যাকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জেদ করিবেন নতুবা পরে ভুগিতে হইবে। জন্মনিয়ন্ত্রণ ও আবশ্যক কারণ দেশে যে পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা আছে তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী জন্ম হইতেছে।

কুষ্টিয়ায় বালিকা শিক্ষার ব্যবস্থা

গত ২০শে তারিখে কুষ্টিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সমিতি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে আগামী বৎসরের প্রথম হইতেই কুষ্টিয়ায় বালিকাদিগের জন্য উক্ত বিদ্যালয়ে প্রাতঃকালে 'ক্লাশ' বসিবে। কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে এবং আমরা আশা করি সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতিতে এই উদ্যোগ আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিবে।

বসিয়া খায়

ভারতবর্ষে শতকরা ৪৪জন খাটে আর পিরের উপর বসিয়া খায় শতকরা ৫৬জন। এ জাতির উন্নতি হইবে কি প্রকারে?

সমাজের আগাছা

ভারতবর্ষে কতকগুলি লোক এমন কতকগুলি পেশা অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে যাহা অন্যদেশে দেখা যায় না—যেমন :—

(ক) ফড়িং বেচা, (খ) দেবতার মাথায় জল দেওয়া, (গ) শিলাবৃষ্টি বারণ করা, (ঘ) দূষিত রক্ত চুষিয়া লওয়া, (ঙ) দাঁতে সোণার কাঁটা বসাইয়া দেওয়া, (চ) বলদের মরা শিং ভাঙ্গা, (ছ) দোলনা দোলান (জ) পেশাদার সনাক্তকারী সাক্ষী, (ঝ) মৃতের বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ, (ঞ) মন্ত্র তন্ত্র দিয়া সংক্রামক ব্যাধি দূর করা, (ট) কানের খোল বাহির করা।

সমাজ উদ্যানের এই সকল রস শোষণকারী আগাছাগুলির ধ্বংশ না হইলে, জাতির ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী।

গান্ধী-জওহর লাল একনায়কত্বে স্বামীগোবিন্দানন্দের বিবৃতি

করাচীর কংগ্রেস নেতা স্বামী গোবিন্দানন্দ একটী বর্ণনা দান করিয়া বলেন,—"হায়দরাবাদ (সিন্ধু) কংগ্রেস কর্ম্মীগণের সম্মেলন দেশকে প্রকৃত পথ প্রদর্শন করিয়াছে। ইহার অভিমত এই যে, কংগ্রেসীদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভা আহ্বান করা কর্ত্তব্য। ইঁহারা চান যে, ধর্ম্ম, সামাজিক প্রশ্ন ও পারমার্থিক অনশন ব্রত হইতে রাজনীতি পরিত্যক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। দুইটী প্রস্তাব দ্বারা সম্মীলনী গান্ধী জওহর লাল একনায়কত্ব অস্বীকার করিয়াছেন এবং দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীকে জিয়াইয়া তুলিবার প্রস্তাব করেন। স্বামীজীর বিশ্বাস পণ্ডিত জওহরলাল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন আহ্বান করিবেন। তিনি বলেন, "দেশের বহু সংখ্যক কংগ্রেস কর্ম্মী আমার সঙ্গে এই দাবী করিতেছেন, অন্ততঃ আমার বিদ্রোহ আমার প্রদেশের পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে।"

সাবধানতা :—

বড় বাজারের মাড়োয়ারী মহিলাদের সভায় শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, ভারতের স্বাধীনতার চাবি নারীদের হাতে। নিখিল-ভারত-নারী সম্মেলনে শ্রীযুক্তা নাইডু একথাটা বল্‌লে মন্দ হতো না। মহিলাদের শুদ্ধ খদ্দর পর্‌তেও তিনি বলেছেন; এ ছোট কথাটিও সম্মেলনে মহিলাদের বল্লে পার্‌তেন।

সোনার বাংলা

নারীর প্রতি অত্যাচার

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এইরূপ উক্তি করেন যে নারীর প্রতি অত্যাচারের মাত্রা যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা সংখ্যাদ্বারা প্রমাণিত হয় না। সেদিন হাউস অব কমন্সে সহকারী ভারত সচিবকে

অনুরূপ প্রশ্ন করায় তিনিও বাংলা গবর্ণমেন্টের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করেন। কিন্তু পুলিশ বিভাগের বার্ষিক কার্য্য বিবরণীতে বাংলা দেশে নারীর প্রতি অত্যাচার সম্পর্কে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত কাহিনীই প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিবরণীতে আমরা দেখিতে পাই যে, গত বৎসরে (১৯৩১) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৬ ও ৩৫৪ ধারা অনুসারে যথাক্রমে ২১২ ও ৩৫৪টী মামলা নিষ্পত্তি হয় এবং আলোচ্য বর্ষে (১৯৩২ সালে) উক্ত উভয় ধারা অনুসারে যথাক্রমে ২৩৪ ও ৫৯৭টী মামলা নিষ্পত্তি হয় সুতরাং দেখা যায় যে ১৯৩১ সালের তুলনায় ১৯৩২ সালে ৯৪টী মামলা অধিক নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, মনে রাখিতে হইবে যে, পুলিশ যে সব অভিযোগ সত্য বলিয়া রিপোর্ট দেয় এখানে সেই সংখ্যার কথাই বলা হইয়াছে। যে সব অভিযোগ সম্বন্ধে পুলিশ ভণ্ডামি রিপোর্ট দিয়াছে, কিংবা যে সব অভিযোগ আদৌ গ্রহণ করে নাই তাহা রিপোর্ট হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে সংবাদপত্রে ও আদালতে পুলিশের বিরুদ্ধে অবহেলা ও উদাসীনতা সম্পর্কে যে সব অভিযোগ শুনা যায় তাহা বিবেচনা করিলে নারীর প্রতি অত্যাচারের মাত্রা যে দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

পুলিশের কার্য্য বিবরণীতে শুধু ১৯৩২ সালের ঘটনা সম্পর্কেই আলোচনা করা হইয়াছে। ১৯৩৩ সালের কথা এখানে বলা হয় নাই। আমরা এপর্য্যন্ত যে সব অত্যাচারের সংবাদ পাইয়াছি এবং সংবাদপত্রে এ পর্য্যন্ত যে সব ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আমি ইহা বলিতে পারি যে, পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরের অত্যাচারের সংখ্যা ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি বলিতে চাই যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে এই জটিল সমস্যা এড়াইয়া চলিলে সঙ্গত হইবে না। এই পাপকে নির্ম্মূল করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন তাহা জনসাধারণের জানিবার নিশ্চয়ই অধিকার আছে। এই সব অন্যায়কারীদিগের শাস্তি বিধানের পক্ষে বর্ত্তমান আইন যথেষ্ট নহে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। শারীরিক শাস্তি বিধান কিংবা সাধারণ দণ্ড বৃদ্ধি করিবার দাবী জনসাধারণ অনেক দিন হইতেই করিয়া আসিতেছে।

এই সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষ কি প্রতিকার করেন তাহাই আমরা লক্ষ্য করিতেছি।

জনসাধারণ নিশ্চয়ই অলসভাবে বসিয়া থাকিবে না কর্ত্তৃপক্ষকে এব বিষয়ে সজাগ করিবার জন্য তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিতে হইবে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভারসদস্যগণও স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এই বিষয় প্রস্তাব উত্থাপিত করিবেন আমরা ইহা আশা করি।

বঙ্গীয় হিন্দুসভার নারীরক্ষাসমিতি রক্ষীদল গঠন প্রভৃতি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। গত ২৬শে, ২৭শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভার উদ্যোগে নিখিল বঙ্গ নারীশিক্ষা সমিতির যে কনফারেন্স হইবে, তাহাতে অন্যান্য প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা হইবে।

অমরা আশাকরি যে, সমিতির মঙ্গলকামিগণ বিশেষতঃ যাহারাএই সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করেনা তাঁহারা অধিক সংখ্যায় সম্মিলনীতে যোগদান করিবেন এবং যাহাতে সকলের সম্মিলিত চেষ্টায়, বঙ্গ দেশ হইতে এই পাপ সমূলে ধ্বংশ হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

সনৎকুমার রায় চৌধুরি, সেক্রেটারী, নারী-রক্ষা-সমিতি

বেকার ভদ্রযুবকদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা ঃ—

ভদ্রশ্রেণীর যুবকদের মধ্যে যে বেকারসমস্যা দেখা যাইতেছে তাহা দূরীকরণার্থে নসীপুরের রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ বাহাদুর তিন বৎসরের জন্য প্রত্যেক যুবককে ষোল বিঘা করিয়া জমি বিনা খাজনায় বন্দোবস্ত

করিয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন। তিন তিন বৎসরের পর ঐ সমস্ত জমির বিঘা প্রতি বার আনা করিয়া নাম মাত্র খাজনা লইবেন।

এই উদ্দেশ্যে রাজা বাহাদুর মুর্শিদাবাদ জেলায় ১০০০ বিঘা জমি আলাদা করিয়া রাখিয়াছেন। নসীপুরের রাজার সেক্রেটারী জমী বিলির বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বিমানজগতে মার্কিননারীর কৃতিত্ব

মিসেস্ ফ্রন্সিস মার্শালিস এবং মিস হেলেন রিচি নাম্নী দুইজন মার্কিণ বৈমানিকা শূন্যমার্গে ২৩৭ ঘণ্টা ৪২ মিনিট পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া বিমান জগতে নূতন কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

ইংরাজী-ভাষা বর্জ্জন কর

বিখ্যাত আইরিশ কবি উব্লিউ বি ইয়েটস "পেন ক্লাবের"এর লণ্ডন শাখার এক অধিবেশনে বলিয়াছেন,—ভারতবর্ষকে ভাষা শিখাইয়া ইংলণ্ড ভারতীয় মনের অধঃপতন ঘটাইতেছে।

ভারতবাসীদের উচ্চতর শিক্ষা এবং সরকারী কার্য্য ইত্যাদি সমস্তই ইংরাজীভাষার মারফৎ চালাইয়া ইংলণ্ড ভারতের প্রতি ঘোরতর অনিষ্ট করিয়াছে। মায়ের ক্রোড়ে বসিয়া মানুষ যে ভাষা শিক্ষা করে, তাহা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় মানুষ বলিষ্ঠভাবে চিন্তা করিতে পারে না।"

দুইজন ভারতীয় লেখক সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ ডব্লিউ বি ইয়েটস বলেন, "আমি অনুরোধ করিতেছি যে এই ভারতীয় দুইজন ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইংরাজী ভাষা বর্জ্জন করেন এবং যুবকদের মধ্যে ইংরাজী ভাষা বর্জ্জন আন্দোলন গড়িয়া তোলেন।

পাঁচলক্ষ যুবক যুবতীর কাজের সংস্থান

জার্ম্মাণীতে কৃষিকার্য্যের উন্নতি-সাধনের চেষ্টা হইতেছে। সেচের ব্যবস্থা দ্বারা বহু অনাবাদী জমি আবাদ করা হইতেছে। উহাতে জমির উৎপন্ন মূল্যের পরিমাণ ২০ কোটি মার্ক বর্দ্ধিত হইবে। অধিকন্তু প্রায় পাঁচলক্ষ বেকার যুবক যুবতীর কাজের সংস্থান হইবে। এদিকে উৎপন্নদ্রব্যের আয় বাড়িবে; অপর দিকে বেকারদিগের জন্য যাহা ব্যয়, তাহাও কথঞ্চিৎ কমিবে।

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের ৯ম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব প্রসঙ্গে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্যার মাসুদ ভারতের প্রধান প্রধান দেশীয় ভাষাগুলিকে শিক্ষার বাহন করিবার আবশ্যকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন, তিনি বলেন, নিজ ভাষার মারফৎ মনোভাব জ্ঞাপনের অধিকার যতদিন বৈদেশিক ভাষার চাপে নিষ্পেষিত থাকিবে. ততদিন পর্য্যন্ত ভারতের প্রকৃত মুক্তি সম্ভবপর হইবে না। নারী-শিক্ষা সম্বন্ধে মিঃ মাসুদ এমন একটি শিক্ষা পরিকল্পনা সমর্থন করেন, যাহা সামাজিক, আর্থিক ও আত্মিক কল্যাণ সাধনে সক্ষম হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ সম্বন্ধে বক্তা বলেন যে, তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ভারতের অপর সকল বিশ্ববিদ্যালয়ই কেবল কাগজে কলমে বিশ্ববিদ্যালয় বস্তুতপক্ষে ঐগুলির কোন উচ্চ আদর্শ নাই। বক্তা ভারতের ভবিষ্যৎ যাহাতে বস্তুতই মহান্ ও গৌরবময় হইতে পারে, তজ্জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার দিক দিয়া কি কি করা যায়, তাহা নির্দ্ধারণ জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

দ্বাদশ সন্তানের জনক

করাচী মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের আগামী সভায় উপস্থিত করিবার জন্য মিঃ জেটলে এক প্রস্তাবের নোটীশ দিয়াছেন। উহাতে করপোরেটর ও ব্যারিষ্টার মিঃ টিকম দাস ওয়াধু মলকে দ্বাদশ সন্তানের জনক হওয়ায় অভিনন্দিত করিবার জন্য বলা হইয়াছে।

মিঃ টিকম দাস ওয়াধুমল একজন মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেটর ও একজন বিশিষ্ট সমাজসংস্কারক তিনি জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে কুসংস্কার বর্ত্তমান আছে, উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন এবং কিছু কাল আগে কর্পোরেশনে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য এক প্রস্তাব আনিয়াছিল। অবশ্য উহা অধিক সংখ্যক ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

স্বামী পরিত্যক্তা

বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের ফলে এ দেশে যদিও অনেক বিধবার বিবাহ হইতেছে তথাপি কুসংস্কার দেশ হইতে দূর হয় নাই। সমাজের মধ্যে আর এক সমস্যা দেখা যাইতেছে। বঙ্গদেশে আমরা স্বামীদ্বারা পরিত্যক্তা বহু নারী দেখিতে পাইতেছি। এই সকল নারী অশিক্ষিত স্বামীর পত্নী নহে। সুতরাং ইহা এক বড় সমস্যা বলিয়া বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই সকল নারীদিগকে হিন্দুআইন কোনও প্রকার সাহায্য করিতে অক্ষম। এই পাপ দূর করিবার জন্য আইন সংশোধনের প্রয়োজন হইয়াছে। যে সকল নারীকে তাহাদের স্বামী পরিত্যাগ করিয়া অপর একজনকে বিবাহ করে সেই সকল নারী যাহাতে বিবাহ বন্ধন ছেদন করিতে পারে এরূপ আইন গঠন করা প্রয়োজন। অথবা এই সকল নারীকে খেসারত দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

১৪৪ ধারার কবলে শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ

বিশ্ব ভারতীর শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের সহিত দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন। গত ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে তিনি বিশ্বভারতীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বীরভূমের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সম্প্রতি তাঁহার উপর ১৪৪ ধারা অনুসারে এক নোটীশ জারী করিয়া আদেশ দিয়াছেন যে, তিনি বোলপুর ইউনিয়নের মধ্যে কোন সভায় বক্তৃতা করিতে পারিবেন না অথবা এই এলাকার মধ্যে সাঁওতালগণের কোন মিছিল পরিচালনা করিতে পারিবেন না। শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ জেলা হরিজন সেবা সমিতির অনারারি সম্পাদক।

নিখিল ভারত নারী-সম্মেলন

নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের এ বৎসরের অধিবেশন কলিকাতা নগরে সম্পন্ন হইয়াছে। শিক্ষামূলক শ্রমিকসম্পর্কিত ও সামাজিক উন্নতিকর প্রস্তাব সমূহ সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বর্ত্তমানে একটি বড় সমস্যা নারীনির্য্যাতন এ সম্বন্ধে নারীদের আত্মরক্ষার কর্ত্তব্য বিষয়ে কোন প্রস্তাব সম্মেলনে আলোচিত হয় নাই।

মাষ্টার মহাশয়ের সদুপদেশ—

শ্রীমান নির্ম্মল শশী দে, পূর্ণেন্দু দাস ও পূর্ণ ভট্টাচার্য্য বর্ত্তমানে সুনামগঞ্জের পাবলিক স্কুলে অধ্যয়ন করে—১৯৩২ ইংরেজীতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিবার পর উহারা গবর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে বহিষ্কৃত হয়। গত ২০শে ডিসেম্বর তাহারা তাহাদের সার্টিফিকেট আনিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার অধুনা নিযুক্ত শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী বি, এস্ সি মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলে হেড মাষ্টার মহাশয় বলেন যে, তাহাদিগকে সর্ব্ব

প্রথম দশ দশ করিয়া বেত লইতে হইবে, তারপর তাহাদিগকে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে। তাহারা তাহাতে স্বীকৃত হয়। তখন হেড মাষ্টার অবিনাশবাবু ছেলেদিগকে স্বহস্তে দশটা করিয়া প্রত্যেককে বেত দেন—ফলে দুইটি ছেলের হাত কাটিয়া রক্ত বাহির হইয়াছে। ছেলেদিগকে বেত দিবার পূর্ব্বে হেড মাষ্টার বাবু তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া এই মর্ম্মে বক্তৃতা করেন, "তোমাদিগকে আমি জানিনা, তোমরা কি রকম চরিত্রের লোক তাহাও আমার জানা নাই। তবে স্কুলের নিয়মানুবর্ত্তিতা ভঙ্গ করিয়াছ বলিয়া—ডিরেক্টার বাহাদুর তোমাদের প্রত্যেককে দশ ঘা করিয়া বেত দিবার হুকুম দিয়াছেন। ডিরেক্টার বাহাদুর একজন বড় লোক, তিনি তোমাদের অপরাধ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়াই এই আদেশ দিয়াছেন। যাহা তোমরা করিয়াছ তাহা অত্যন্ত গর্হিত। উমা চরণ—বেত লইয়া আইস।"

বেত দিয়া সার্টিফিকেট দেওয়ার পর তাহাদিগকে বলেন—যদি তোমরা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে চাও অন্য স্কুলে যাও। এই পাব্লিক স্কুল হইতে পরীক্ষা দিবার তোমাদের সংকল্প থাকে—তবে দেখিব, তোমরা কি করিয়া পরীক্ষা দেও।—এই ভাবে শাসাইয়া হেড্মাষ্টার বাবু স্বকর্ম্মে মনোনিবেশ করেন এবং আঘাত-জর্জ্জরিত বালকগুলিও স্কুল কম্পাউণ্ড্ পরিত্যাগ করিয়া আসে।

কলিকাতার কলেজে ছাত্রী সংখ্যা

কলিকাতার কলেজের ছাত্রী সংখ্যা ৮০৩।

ডায়োসেসান কলেজে	১০৬	আশুতোষ কলেজে	১১৮
লরেটো হাউসে	৮১	বিদ্যাসাগরে কলেজে	১৭৫
বেথুন কলেজে	১৪৬	সিটি কলেজে	৫১
ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনে	২২	মেডিকেল কলেজে	২০
স্কটিসচার্চ্চ কলেজে	৬৭	পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেণ্ট	৩১

এই ৮০৩ ছাত্রীর মধ্যে ৫৫৫জন অভিভাবকের সঙ্গে থাকে। ১৭৪ জন কলেজ সমূহের হোষ্টেলে এবং অবশিষ্ট ছাত্রীরা ইয়ং উইমেন্স ক্রিশ্চান এসোসিয়েসান, গোখলে মেমোরিয়াল স্কুল, সেণ্ট টমাস স্কুল অথবা প্রাইভেট কমিটি কর্ত্তৃক পরিচালিত বোর্ড-এ বাস করে।

—আজকাল

বিয়ে করা চ'লবে না—

ইস্তাম্বুলের একটি খবরে প্রকাশ যে তুরস্কের গবর্ণমেণ্টের নতুন আইন অনুসারে এবার থেকে ওখানকার পুলিশ বিভাগে কেবলমাত্র অবিবাহিত লোকই নেওয়া হবে।

—দীপালি
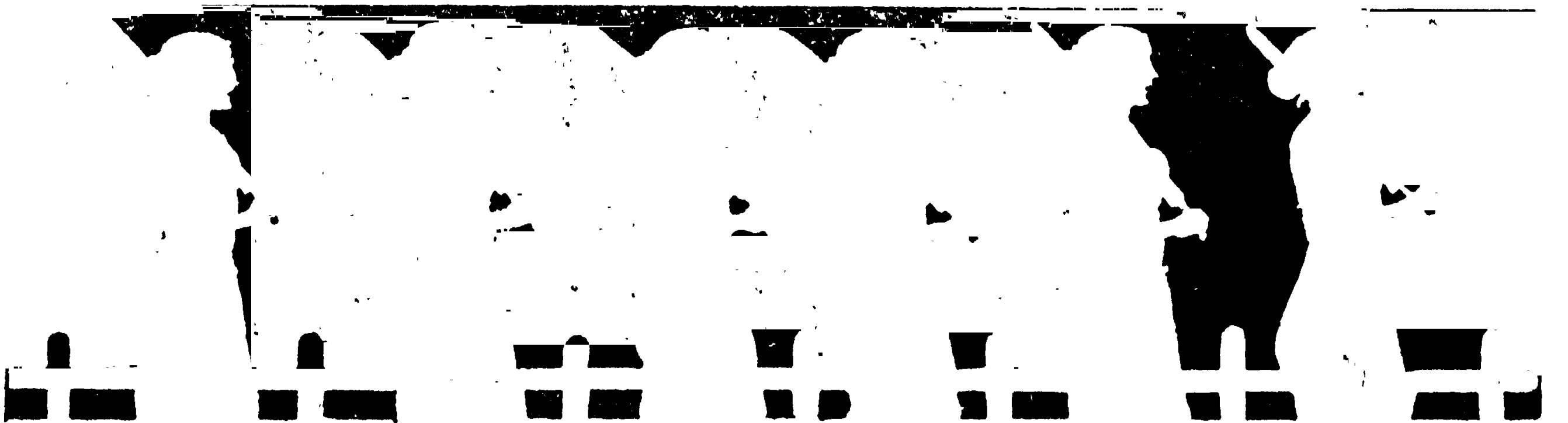
সাত সাগরের পারে

কুমারী অমলা নন্দী

পূর্ব্বেই বলেছি ১৯৩১ সালের "ইণ্টারন্যাশনাল কলোনিয়াল একজিবিশন" প্যারিস নগরীতে যে বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল, সেই প্রদর্শনীতে আমাদের ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের অলঙ্কার প্রদর্শন উপলক্ষেই আমরা য়ুরোপে গিয়েছিলাম। এবার সেই প্রদর্শনীর কথাই বলব।

এই প্রদর্শনীটী প্যারিস নগরীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে বোয়া দে ভান্ সাঁ (Bois de Vincence). অর্থাৎ ভানসাঁর বন নামক একটী বনের ভিতর হয়েছিল। এই বনটীর চারিদিকের বেষ্টন প্রায় পাঁচ মাইল। তার মাঝখানে একটী হ্রদ তার ভিতর আবার আঁকাবাঁকা দুটী দ্বীপ। এ সমস্ত নিয়েই একজিবিশনের ব্যাপার ছিল।

এই একজিবিশনটীতে প্রত্যেক স্বাধীন জাতিদের আপন দেশের এবং তাদের অধিকৃত দেশগুলির বিভিন্ন প্রকার প্রদর্শনযোগ্য বিষয় দেখাবার জন্য এক-একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করেছিল। এই সব বাড়ীর এক একটা তৈরী কর্‌তে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। প্রত্যেক বাড়ীটী তাদের দেশানুযায়ী বিভিন্ন

কুমারী অমলা নন্দী

গঠনের। বিভিন্ন প্রকারের আলো ও ফোয়ারা দিয়ে বিচিত্রভাবে সাজান হয়েছিল। রাত্রি কালের আলোকে একজিবিশনটী অত্যুজ্জ্বল চন্দ্রালোকে আলোকিত বলে মনে হত। কারণ আলোক স্তম্ভগুলির মূল আলো দেখা যেত না। তার প্রতিফলকই (reflection) সমস্ত প্রদর্শনীটাকে দীপ্তিময় করে তুল্‌ত। সেই আলোক স্তম্ভগুলি দিনের বেলায় ও শোভা সম্পাদ ছিল। প্রদর্শনীর ফোয়ারার কথা বর্ণনে কুলায় না। একেই ত প্যারিস নগরী ফোয়ারায় ভরপুর তারপর আবার এই একজিবিশনের ফোয়ারা নগরীর ফোয়ারা অপেক্ষাও বৈচিত্র্যময়। কোন কোন ফোয়ারা শতাধিক ফিট উচ্চ। কোনটী শিব মন্দিরের মত, কোনটী রথের চূড়ার মত কোনটী প্রতিমার প্রচ্ছদপটের মত, আবার কতকগুলি হ্রদের দ্বীপ থেকে ধনুকের মত হয়ে হ্রদের পার্শ্বস্থ তীরে এসে পড়ছে। রাত্রির আলোকে এই ফোয়ারাগুলি আবার প্রতি মুহূর্ত্তে লাল, নীল, সবুজ, বেগুণে প্রভৃতি বর্ণে রূপান্তরিত হত। হ্রদের মধ্যে যাত্রী ষ্টীমার ও নৌকা ছুটাছুটী করত। আবার উপর দিয়ে ছোট রকমের সুন্দর ট্রেণ সমস্ত প্রদর্শনীটী অনবরত প্রদক্ষিণ করত। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর এক একখানি ট্রেণ চলত। প্রদর্শনীতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রকমের অন্ততঃ দুশো রেস্তোরাঁ (restaurant) ছিল। এই রেস্তোরাঁ গুলি সব সময় নৃতগীত বাদ্যে মসগুল থাকত।

প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হয়েই প্রথমে সারি সারি আলোক স্তম্ভ। তার মাঝখানে প্রকাণ্ড একটী স্তম্ভ করা হয়েছিল, জগতে যাঁরা বিদেশ জয়পূর্ব্বক উপনিবেশ (colony) স্থাপন

করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন ; তাঁদের নাম শ্রেণীবদ্ধভাবে ঐ স্তম্ভের গায় উঁচু উঁচু অক্ষরে লিপিবদ্ধ ছিল। আমাদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ডুপ্লে এবং ক্লাইভের নাম দেখা গেল। যাতে গরীব দুঃখী পর্য্যন্ত সহজেই প্রদর্শনী দেখতে পারে তার জন্য প্রতিদিনের প্রবেশ ফি করা হয়েছিল মাত্র তিন ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় আটআনা। সবাই বলত একজিবিশনটী দেখ্‌লে সংক্ষিপ্তাকারে সমস্ত পৃথিবী দেখা হয়।

প্রদর্শনীতে প্রবেশ করেই সর্ব্বপ্রথম নজর পড়ত সিটি দেজ ইনফরমাসেয়ঁ (cite des Information) প্রকাণ্ড বড় বাড়ী, তার সম্মুখ দ্বারদিয়ে প্রত্যেক স্বাধীন দেশের পক্ষ থেকে এক একটী আফিস বসেছিল সেখানে ঐ ঐ দেশ সম্বন্ধে যা কিছু খবর পাওয়া যেত। ইংরেজের আফিসই বেশী। সিটি দেজ ইনফরমাশেয়ঁর মধ্যভাগে সমস্ত দেশের journalist দের যে আফিস হয়েছিল সেটী অত্যন্ত কার্য্যকরী। Indian Journalists Association এর representative রূপে বাবা (শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার নন্দী) সেখানে কিছু কিছু কাজ করেছিলেন এবং সেখানকার আবশ্যক সংবাদাদি association এ পাঠিয়েছিলেন।
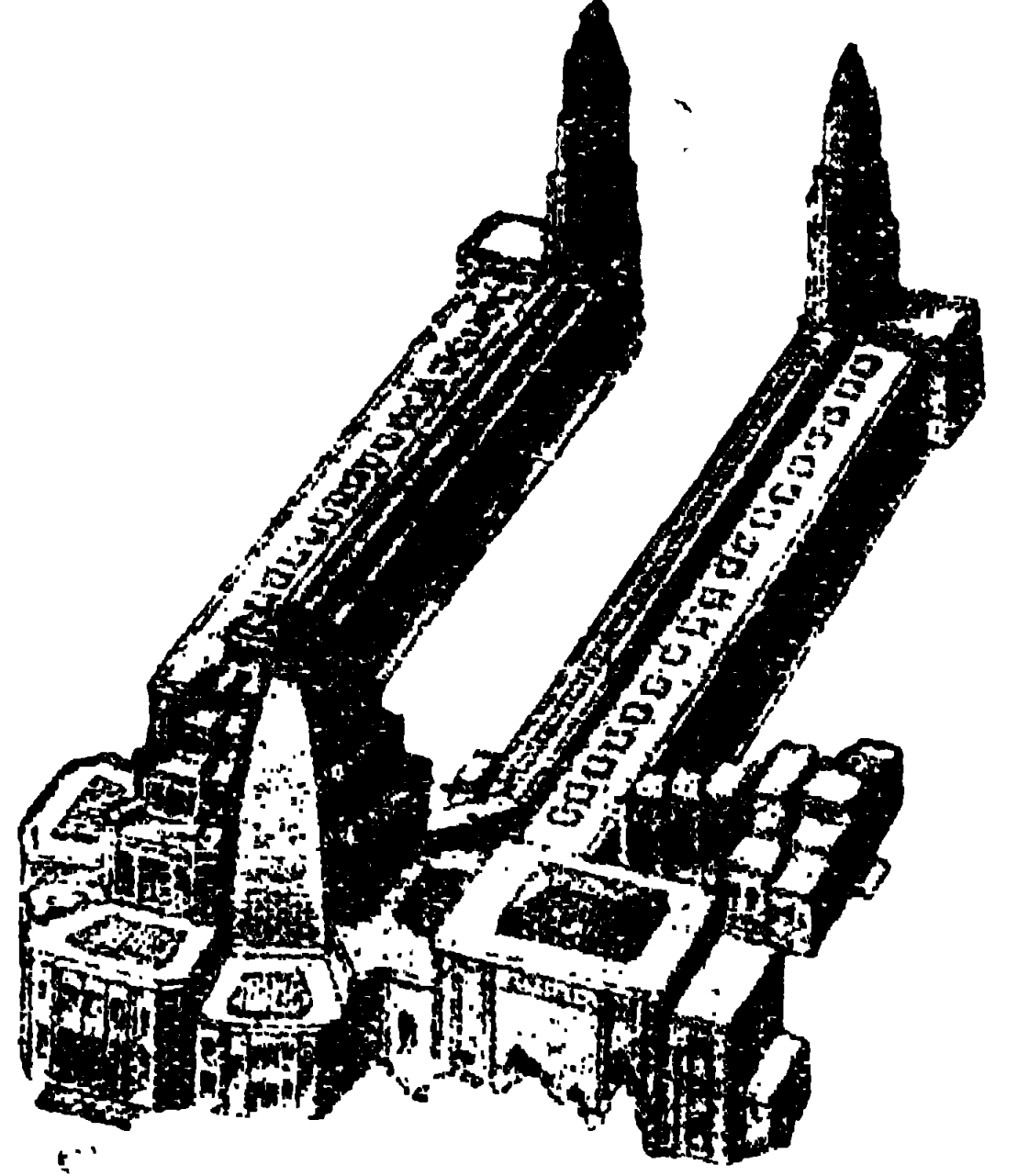
Cite Des Informations

আমরা প্রথমদিন ইণ্ডোচীন প্যাভিলিয়ন দেখতে গেলাম। ইণ্ডোচীনের বিখ্যাত ওঙ্কার মন্দিরের অনুকরণে Tample d' Ongkor নামে যে মন্দির প্রস্তুত হয়েছিল সেটী ছিল প্রদর্শনীর মধ্যে সবচেয়ে বড় দেখবার জিনিষ। বহুদূর থেকে এই মন্দিরের পাঁচটী চূড়া দেখা যেত। এবং রাত্রিকালে সেই চূড়ার উপর থেকে তীক্ষ্ণ আলো গগন ভেদ করে মেঘগুলিকেও রঞ্জিত করে তুল্‌ত। মন্দিরের গাত্রের কারুকার্য্য অতি চমৎকার ভিতরে বুদ্ধমূর্ত্তি। ওঙ্কার মন্দির দেখে মনে পড়ছিল—

Tample D' Ongkar

"শ্যামরাজ্যের ওঙ্কার ধাম মোদেরি প্রাচীন কীর্ত্তি"
(দ্বিজেন্দ্র লাল)

একজিবিশনের ওঙ্কার মন্দিরের পাশে কম্বোজ, আনাম, টঙ্কিন, প্রভৃতি অনেক মণ্ডপ হয়েছিল। সেগুলির ভিতর ইণ্ডোচীনের কীর্ত্তি ও শিল্প কলার নিদর্শনে পূর্ণ ছিল। আনাম

প্যাভিলিয়নের মধ্যে একটী বৌদ্ধ ধর্ম্ম সভার মডেল তৈরী হয়েছিল ; সেটী আমরা যতবার দেখেছি ততবারই ভক্তিতে তার প্রতি আমাদের মাথা নত হত।

এরপর আমরা ফ্রেঞ্চ ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়নে প্রবেশ করলাম। প্রবেশদ্বারের দুপাশে দুটী হস্তি-মূর্ত্তি। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করেই সম্মুখে একটী চমৎকার ধাতু নির্ম্মিত নটরাজ শিবমূর্ত্তি দেখতে পেলাম। এছাড়া কৃষ্ণ, বিষ্ণু, দুর্গা গনেশ প্রভৃতি নানারকম দেব দেবীর মূর্ত্তি। চন্দননগর, পণ্ডীচেরী, কারিকল প্রভৃতি স্থান থেকে, সংগৃহীত নানাপ্রকার আসবাব পত্র, কাঁসা পিতল ও রূপার বাসন, হস্তিদন্তের প্রস্তুত খেলনা, মাটীর খেলনা, মেয়েদের হাতের তৈরী সেলাইয়ের কাজ প্রভৃতি অনেক জিনিষ সযত্নে রক্ষিত ছিল। ভারতীয় জিনিস দেখে আমাদের বড় আনন্দ হত। ওখানকার দর্শকেরাও খুব উৎসুক হয়ে ভারতীয় জিনিস দেখত। এ ছাড়া হিন্দুস্থান প্যালেস নামে আর একটি বিরাট বাড়ী তৈরী হয়ে ছিল—সেটি ছিল ব্যবসায়ীদের জন্য।

আফ্রিকা প্যাভিলিয়নটী খুব বড় হয়ে ছিল বটে কিন্তু বাড়ীগুলির সৌন্দর্য্য তেমন কিছু ছিলনা। যেন প্রকাণ্ড এক একটী উইয়ের ঢিপি। সেখানে আফ্রিকার আনারস নারিকেল, তরমুজ প্রভৃতি নানারকমের ফল আমদানী করা হয়েছিল। ভালুকের চামড়া, সাপের চামড়া, হাতীর দাঁত নানারকম দেখলাম। কয়েকটা উট সেখানে রাখা হয়েছিল, অনেকে পয়সা দিয়ে তাতে চ'ড়ত। সেখানে আর একটী মজা ছিল—কতকগুলি সাহারাবাসী নিগ্রো পরিবারকে ছেলে মেয়ে সমেৎ সেখানে রাখা হয়েছিল, তারা দেশে যে ভাবে বাসকরে ঠিক সেই অবস্থায়। তাদের ছোট ছোট পাতার কুঁড়ে, অসম্পন্ন গঠনের মাটীর ও কাঠের গৃহস্থালী জিনিস পত্র তাদের রান্না খাওয়া গল্পগুজব, ঝগড়া, ছেলেমেয়েদের লাফালাফি সবই আমাদের কাছে অদ্ভুত লাগত।

এরপর বেলজিক কঙ্গো অর্থাৎ বেলজিয়ানদের অধিকৃত কঙ্গো দেখতে গেলাম। খুব বড় বড় বাড়ী তৈরী করা হয়েছিল খড়ের চাউনি দিয়ে। থামগুলি কাঠের তৈরী—প্রত্যেক থামের মাথায় কঙ্গোবাসীদের অদ্ভুত রকমের এক একটী মূর্ত্তি। ভিতরে নিগ্রোদের নানারকম অস্ত্র ও হাতীর দাঁত হাতীর মাথা, হরিণের শিং, কুমীরের চামড়া নানারকম কৃষিজাত শস্য নানারকম ফল। হাতীর পা দিয়ে ফুলের টব তৈরী করা হয়েছে। কতকগুলি বৃহদায়তন প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুকরণ দেখান হয়েছিল বড় চমৎকার! তার একটীতে দেখলাম—শস্য ক্ষেত—দূরে পর্ব্বতশ্রেণী গোধুলির রক্তিমাকাশে মিলিত হয়েছে কয়েকটী নিগ্রো জীবন্ত বন্য হাতী শিকার করে ঘরে ফিরছে। এই রকম বহু বহু সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র তার এক একটী ঘণ্টারপর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছা করে।

আর একদিন আমরা মাদাগাস্কর প্যাভিলিয়ন দেখলাম। মাদাগাস্করের লোকেরা নিগ্রোদের মত কুৎসিত নয়। অনেকটা আমাদের দক্ষিণ ভারতের মুসলমানদের মত। প্যাভিলিয়নের প্রবেশ-দ্বারে প্রকাণ্ড একটী চতুষ্কোণ স্তম্ভ ছিল তার চূড়ায় চারিটী বিরাটাকারের মহিষের মাথা,

সম্ভবতঃ মাদাগাস্করে প্রচুর মহিষ আছে, এ তারই চিহ্ন। প্যাভিলিয়নের সামনে প্রকাণ্ড রেস্তোরাঁ— রন্ধনকারী, পরিবেশনকারী সবই মাদাগাস্করিয়। সন্ধ্যার পর তাদের নৃত্য দেখ্‌লাম; অনেকটা আমাদের বীরভূম জেলার কাঠিনৃত্যের মত। অনেক ভারতবাসী নাকি মাদাগাস্করে গিয়ে সেখানকার স্থায়ী অধিবাসী হয়ে গিয়েছে। তাই মাদাগাস্করবাসীদের সঙ্গে আমাদের ভারতবাসীর আকৃতি প্রকৃতিতে অনেক মিল দেখা গেল।

এরপর আমরা একদিন হল্যাণ্ডের উপনিবেশ যাভা, বালী, সুমাত্রা প্যাভিলিয়ন দেখ্‌তে গেলাম। যাভা প্যাভিলিয়নে প্রচুর দেখ্‌বার বিষয় ছিল। যাভার শস্যক্ষেত্র কৃষিক্ষেত্রে প্রভৃতির মডেল সেখানে দেখান হয়েছিল। পেট্রোল ও কেরোসিন, খনি থেকে কেমনকরে তোলা হয় তা দেখান হয়েছিল। এছাড়া প্রাচীন ভারতীয় নানাপ্রকার দেবদেবী ও বুদ্ধমূর্ত্তি ও সেখানে রাখা হয়েছিল। কোনখানে কত লোকের বাস দেশের মানচিত্রের মডেল করে তা বোঝান হয়েছিল। এই হল্যাণ্ড প্যাভিলিয়নটী বহু যত্নে গড়া হয়েছিল। দুঃখের বিষয় হঠাৎ একরাত্রে আগুন লেগে এই প্যাভিলিয়নটী একেবারে ভস্মীভূত হয়ে গেল। পরদিন আমরা গিয়ে দেখ্‌লাম বিরাট প্যাভিলিয়ন এবং প্রচুর দৃশ্যাবলীর স্থলে স্তূপাকৃতি ভস্ম ধূম উদ্গীরণ করছে। চারিপাশের গাছ পালাগুলি আধপোড়া হয়ে দাঁড়িয়ে যেন শোক প্রকাশ করছে। একমাসের ভিতর এই প্যাভিলিয়নটী আবার গড়া হয়েছিল। কিন্তু যেমন গেল তেমনটী আর দেখলাম না। বালী প্যাভিলিয়নের রঙ্গমঞ্চে যে নৃত্য হত তা য়ুরোপবাসীদের বড় ভাল লেগেছিল।

একদিন আমরা মরক্কো, আলজেরিয়া, টুনিস তিনটী প্যাভিলিয়ন দেখ্‌লাম। এ তিনটী ছিল একই জায়গায়। আফ্রিকায় ফরাসীদের এই তিনটী দেশই বড় সম্পদ। মরক্কো প্যাভিলিয়নটী ছিল খুব বড়। মরক্কোর লোকগুলি কিন্তু আফ্রিকাবাসী হয়েও সুন্দর। এরা সুসভ্য এবং কাজের লোক। এরা আফ্রিকা থেকে বহু জিনিস আমদানী করেছিল। গালিচা, চামড়ার ব্যাগ আসন, কাঠের, কারুকার্য্যময় টেবিল চেয়ার প্রভৃতি আসবাব ও সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে প্যাভিলিয়ন সাজান হয়েছিল। এই প্যাভিলিয়নটীর সাম্‌নের সরোবর ও পুষ্পোদ্যান খুব দেখ্‌বার জিনিস ছিল। এখানে মরক্কোবাসীরা নানারকম খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করত। একদিন মরক্কোর সুলতান একজিবিসন দেখ্‌তে এসেছিলেন। সেদিন সৈন্যসামন্ত বাদ্যবাজনা নিয়ে খুব ধুমধাম করা হয়েছিল।

আমেরিকানরা এই একজিবিশনে খুব বড় যায়গা নিয়ে কয়েকটী বিষয় দেখিয়েছিল। তার মধ্যে প্রধান ছিল ১৯৩৩ এর ভাবী চিকাগো প্রদর্শনীর বিরাট মডেল।

আমেরিকানরা প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই এবং ফিলিপাইন এই দুই দ্বীপের জন্য দুটী প্যাভিলিয়ন করেছিল। হাওয়াই প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট্ট একটী দ্বীপ। প্রাকৃতিক শোভায় পরিপূর্ণ। সেখানকার চিত্র ও মডেল প্রভৃতি দেখে মনে হত যে এদেশে দুঃখ বা ভাবনা বলে কোন কিছুই নেই। দেখ্‌তাম, মেয়েরা প্রায় সব সময়ই পুষ্পাভরণে সজ্জিত, সর্ব্বদাই হাসিমুখী।

শরীরের গঠন সুন্দর, চেহারাও অতি চমৎকার। কালো কোঁকড়ান চুল—চোখ, মুখ, নাক অনেকটা জাপানী ধরণের। হাওয়াইয়ান বাসীদের হাতের কাজ খুব সুন্দর। প্যাভিলিয়ন এর মধ্যে কয়েকটী ঐ দেশীয় মেয়েকে দিয়ে তাঁত বোনান ও কাপড়ের উপর চমৎকার নক্সা করা দেখান হত। হাওয়াই বাসীরা এখন সভ্যতায় খুব এগিয়ে চলছে। ঐ প্রশান্ত মহাসাগরে বাস করে তারা জগতের কোন জাতির সঙ্গেই মিশতে পায় না। আমি যতবার সেখানে যেতাম আকার ইঙ্গিতে যতদূর পারত আমার সঙ্গে গল্প করত। প্যাভিলিয়নে দর্শকগণের বসবার জন্য কয়েকখানা বেতের চেয়ার ছিল। সেগুলি হাতের তৈরী। কোনখানা পেখমধরা ময়ূরের মত। কোনখানার বা উড্ডীয়মান পক্ষীর ন্যায় বিস্তৃত পাখা ইত্যাদি নানা রকমের। হওয়াই দ্বীপের রাজধানী হনুলুলু। আমেরিকা জাপান অষ্ট্রেলিয়ার ভিতর যে সব জাহাজ যাতায়াত করে তার প্রায় গুলিই হনুলুলুতে ধরে। এই হাওয়াই প্যাভিলিয়নটি আমাদের কাছে বড়ই নতুন লাগ্‌ত।
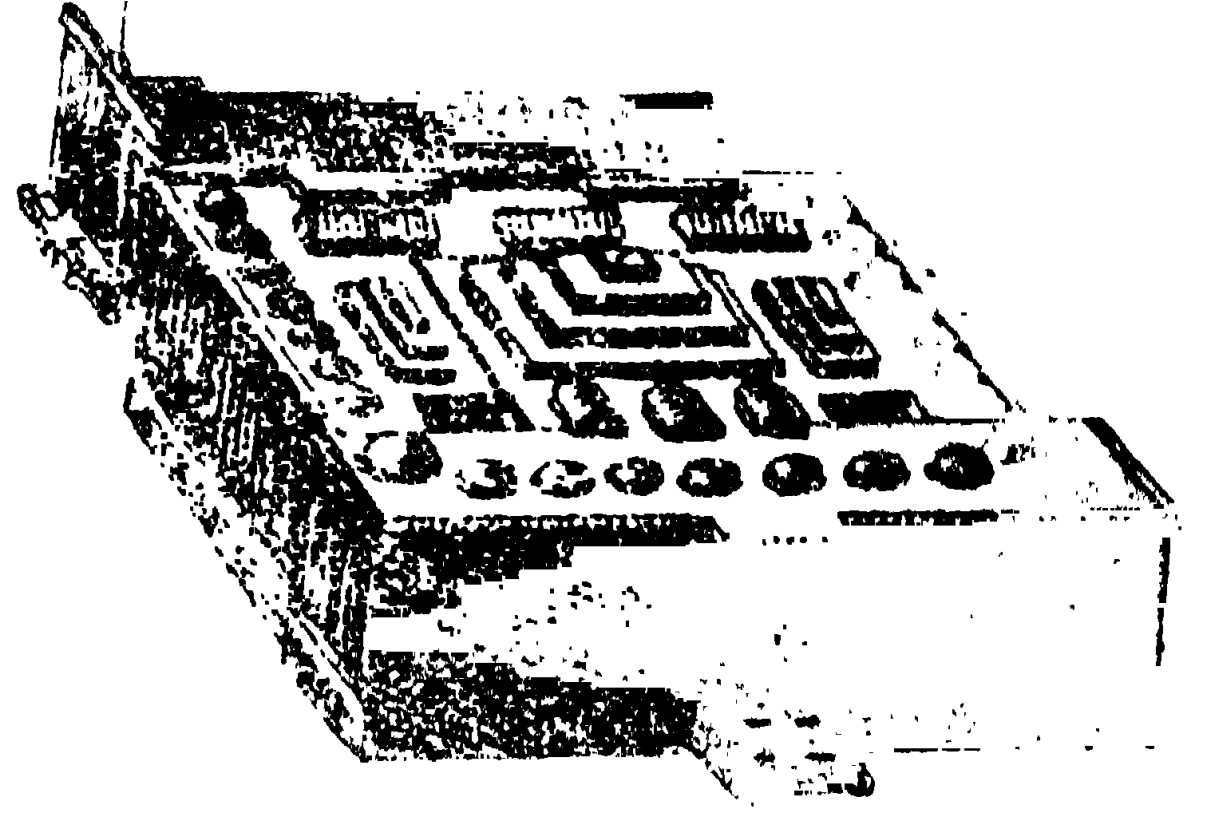
এরপর একদিন আমরা ফিলিপাইন প্যাভিলিয়নে প্রবেশ কর্‌লাম। সে প্যাভিলিয়নে অনেকগুলি প্রাকৃতিক দৃশ্য ও নগরের মডেল ছিল। একটীর কথা আমি ভুল্‌তে পারবো না। সেটা ফিলিপাইনের রাজধানী, মেনিলা নগরীর দৃশ্য, সমুদ্রতীরে প্রচুর অট্টালিকা, নদী, পুষ্পোদ্যান প্রভৃতি শোভিত মেনিলা নগরীর বিরাট মডেলটির উপর চারিদিক হতে আলোকপাত করা হয়েছিল, সেই আলোগুলি প্রতি মিনিটে ধীরে ধীরে রং বদল হয়ে সকাল থেকে পনেরো মিনিটের ভিতর চব্বিশ ঘণ্টার দৃশ্য দেখিয়ে আবার পূর্ব্বমত সকাল হত। সে কী অপূর্ব্ব বর্ণের পরিবর্ত্তন! মেনিলার সকাল সন্ধ্যা দেখ্‌তে দেখ্‌তে এতই তন্ময় হয়ে যেতাম যে কখন যে প্রদর্শনীর সন্ধ্যা আসত সেদিকে দৃষ্টি থাকত না।
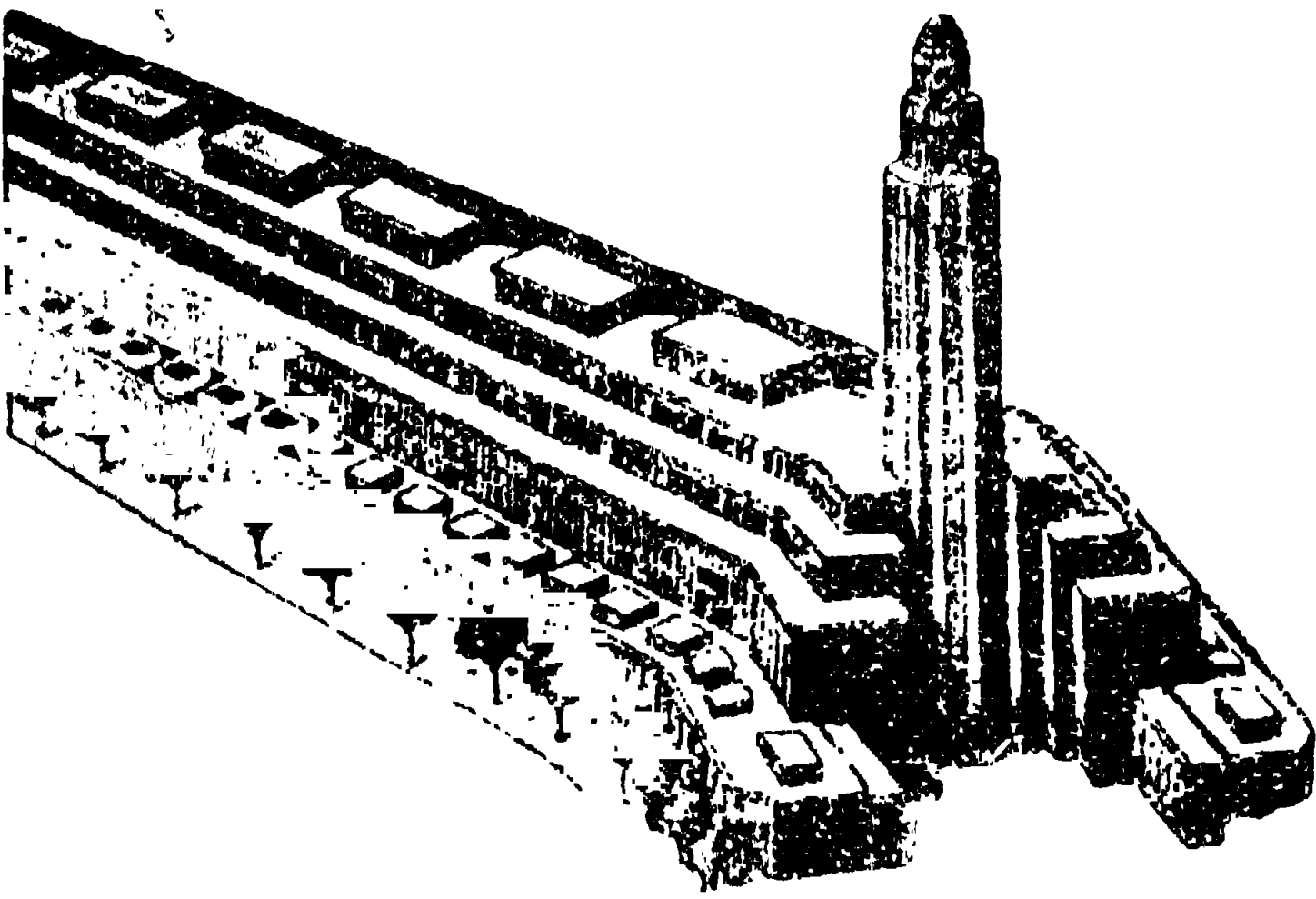
Section Metropolitaine

ফিলিপাইনের ফলের মধ্যে আমাদের দেশের নারিকেল, কলা, আম, কাঁটাল ও আঁখ দেখতাম। এখানে সুন্দর একটী ঘর করেছিল নারিকেল পাতার ছাউনি দিয়ে। তার ভিতরই

নারিকেল গাছ ও ফল থেকে যত রকম জিনিষ হতে পারে তা দেখানো হয়েছিল। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সাজান গোছান। এই ক্ষুদ্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এর অধিবাসীরাও শতকরা চল্লিশজন শিক্ষিত।

ইউনাইটেড ষ্টেটস্ (আমেরিকা) প্যাভিলিয়নে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ বাড়ী নিউইয়র্কের এম্পায়ার-ষ্টেটস্-বিল্ডিংএর মডেল করা হয়েছিল। আমেরিকার কৃষিকার্য্যের বিবরণ একটা ঘরে দেখানো হয়েছিল। কোথায়ও বিস্তৃত মরুভূমিকে সুজলা সুফলা করা হয়েছে। এসব বার বার দেখ্তাম।

এবার ইটালী সম্বন্ধে কিছু লিখি :—

এই প্যাভিলিয়নটী রোম নগরের একটী ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদের অনুকরণে করা হয়েছিল। সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি দ্বারা এর শোভাবর্দ্ধন করা হয়েছিল। এর ভিতরের দেওয়ালগুলি সুচিত্রিত ছিল। সে চিত্রগুলি দেখ্লে সহস্রাধিক বৎসরের পুরাতনের মত দেখাত। ভিতরে নানারকম শিল্পকাজ, ঝিনুকের কাজ ও প্রাচীনকালের জাহাজ ইত্যাদিতে পূর্ণ ছিল।
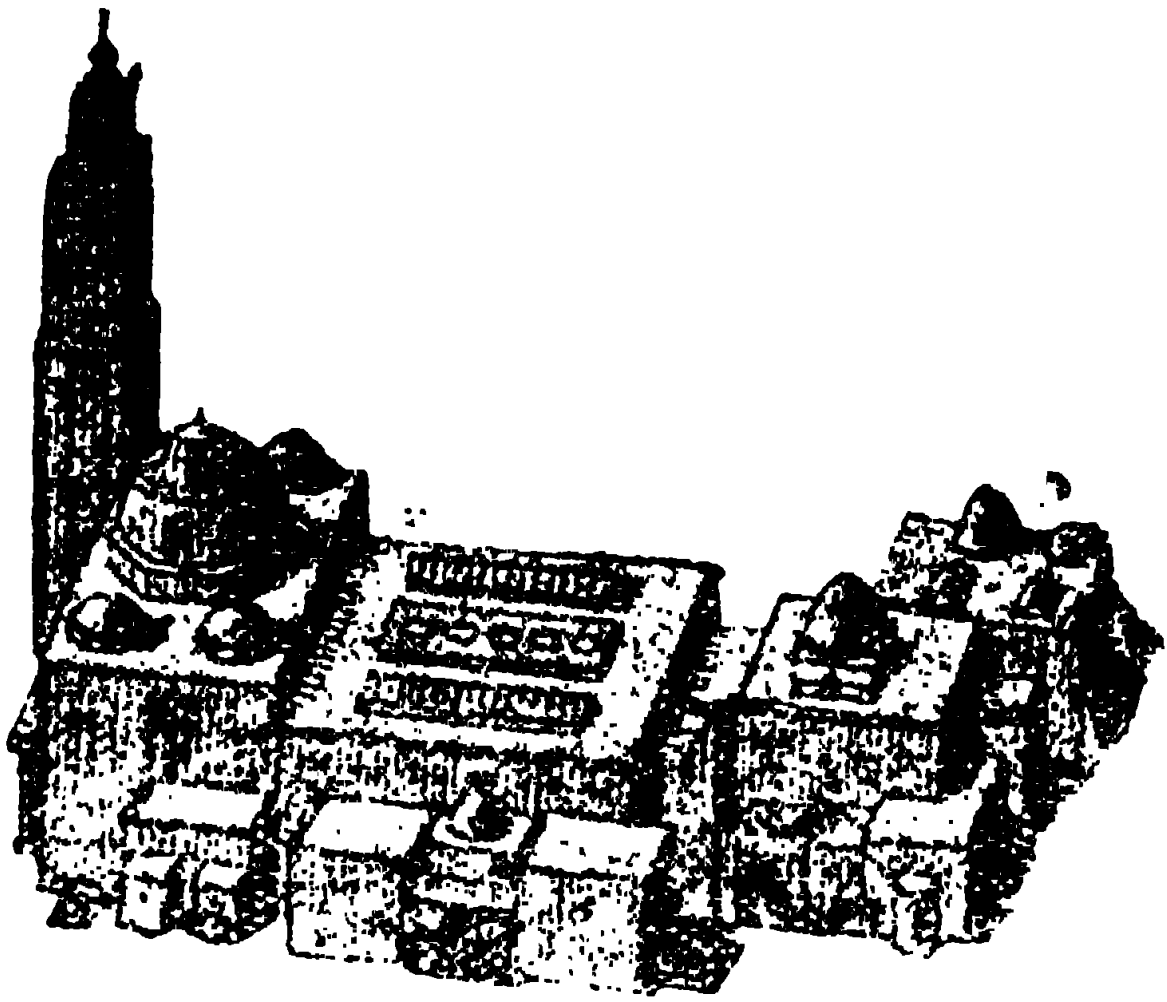
আর একদিন আমরা ডেনমার্ক প্যাভিলিয়ন দেখ্তে গিয়েছিলাম। এরা গ্রীনল্যাণ্ড দেখ্বার জন্য এই প্যাভিলিয়নটী তৈরী করেছিল। ভিতরে নানারকম বড় বড় মডেল ছিল। কোনস্থানে তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতের উপর দুটী ভাল্লুক, কোথায়ও জমাট কুকুরদ্বারা গাড়ী বরফের উপর দিয়ে চালিয়ে শিকার করছে। কোথায়ও এস্কিমোদের ঘরবাড়ী ইত্যাদিতে পূর্ণ ছিল। এছাড়া গ্রীনল্যাণ্ডের সব রকম পশু ও পাখী শীল মাছ প্রভৃতি ছিল। এটি ছিল আমাদের ইণ্ডিয়া প্যাভেলিয়নের নিকট আমি যখন তখন ছুটে এই প্যাভিলিয়নটীতে যেতাম। এখানে একটী ডেনিস রেস্তোরা ছিল। এই রেস্তোরার অধিকারিণী আমায় যে কী ভালবাসতেন সে কথা পরে যথাস্থানে লিখব।

এবার একটু প্রদর্শনীর আমোদ প্রমোদের কথা লিখি। শুক্রবার একটু বিশেষভাবে প্রদর্শনীটী সাজান হত। অন্য দিনে প্রদর্শনীর প্রবেশ ছিল তিন ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ আট আনার মত। আর শুক্রবার দিন হত বারো ফ্রাঙ্ক, প্রায় দু'টাকা। এছাড়া গাড়ী নিয়ে ঢুকলে তার জন্য ভিন্ন মুল্য দিতে হোতো। প্রায় কুড়ি টাকা।

হ্রদের দ্বীপের উপর যাতায়াতের জন্য সুন্দর রাস্তা করে দেওয়া হয়েছিল। সেই দ্বীপের উপর বাগদাদ রেঁস্তোরা ছিল প্রদর্শনীর প্রধান স্থানীয় রেস্তোরা, রাত্রে প্যারিস নগরী থেকে ধনীরা আস্তো নয়

গাড়ী করে এই রেঁস্তোরাতে খেতে। যাদের সে রকম অবস্থা নয় তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এর সৌন্দর্য্য দেখতো। এ ছাড়া সেখানে নানারকম ম্যাজিক, কৃত্রিম মোটরে চড়া, ভুতের খেলা দেখান হত।

একটী জায়গা ছিল শুধু আমোদ প্রমোদ করবারই জন্য। সেখানে কৃত্রিম পর্ব্বতের উপর দিয়ে ট্রেণে চলা, কৃত্রিম এয়ারোপ্লেনে তিন চারশ ফিট উচ্চে ওঠা, পর্ব্বতের সুড়ঙ্গ দিয়ে খাল বেয়ে নৌকায় ভ্রমণ ইত্যাদি। আমি প্রায়ই সমবয়সী বন্ধু নিয়ে পর্ব্বতের উপর দিয়ে ট্রেণে চলতাম। সে কী মজা! ছাত খোলা ট্রেণ এক এক সিটে দুজন করে প্রায় চল্লিশ জন লোক বস্‌তে পারে। প্রথমে ধীরে ধীরে ট্রেণটী পঞ্চাশ ফিট উপরে উঠত সেখান থেকে সোজা নীচে নামত এমনি করে ক্রমে দ্রুত হয়ে প্রায় দেড়শ দুশ ফিট থেকে নীচে নামা উঠা কখনও সুড়ঙ্গের ভিতর কখনও ঝরণার নীচু দিয়ে কখনও একেবারে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে চলত। ট্রেণের যাত্রী আমরা সবাই তখন আনন্দে প্রাণপণে চীৎকার করতাম। প্রথম দিন আমার একটু ভয় করেছিল, বলা বাহুল্য পরে আমার আনন্দধ্বনি কারোও চেয়ে কম ছিল না। কখনও কখনও আবার সেখানে নৌকায় উঠতাম ঐ পর্ব্বতেরই নীচ দিয়ে চার হাত চওড়া খাল করা ছিল। খালটী এঁকে বেঁকে গিয়েছে। একটী মেশিনে জলের স্রোত করে দিত, নৌকাগুলি নিজে থেকেই ভেসে বেড়াত। আর মাঝে বৈদ্যুতিক আলো ও কখনও কখনও পাশে ছোট ছোট নদী সাগর তীরস্থ নগরীর ভেনিস মার্শেলস, নেপল্‌স্‌, প্যারিস প্রভৃতি নগরের দৃশ্য দু এক মিনিট অন্তর দেখা যেত। মাথার উপর দিয়ে আবার সেই ছোট্ট ট্রেণের শব্দ আসত। একই পর্ব্বতে দুটী সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিষ। দুটোই ভাল লাগ্‌ত। কোথাও আবার কৃত্রিম ভাঙ্গা মোটর অর্থাৎ তিনটী চাকা আছে একটী নাই সেই মোটরের আরোহীদের অবস্থা দেখে হাস্‌তে হাস্‌তে অস্থির হয়ে পড়তাম। সে কী মজা! চড়ার চেয়ে দেখতেই বেশী মজা লাগতো। শুক্রবার দিন প্রদর্শনী অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করত। লোকের খুব ভিড় হত। সেই রাত্রে একটী করে মিছিল বের হত। একদিন নিগ্রোদের মিছিল বের হয়েছিল। বিভিন্ন পোষাকে বিভিন্ন রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত সঙ সেজেছিল। আর মাঝে মাঝে ইণ্ডোচীনেরা একটি ড্রাগোন সেজে বের হত। তার সঙ্গে নানারকম বাদ্যগীত নৃত্যও ছিল। বহু লোক প্রদর্শনীতে আস্‌ত এই ইণ্ডোচীনের মিছিল দেখতে। জগতের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতি সপ্তাহে বিশ লক্ষের উপর লোক এই প্রদর্শনী দেখ্‌তে আস্‌ত।

Ile De Bercy

আগামী বারে প্রদর্শনীর "হিন্দুস্থান প্যালেস" এবং সেখানে যে সকল বন্ধুবান্ধব পেয়ে আনন্দে কাটায়ে ছিলাম তাদের বিষয় লিখ্‌তে ইচ্ছা রইল।

নিখিল-ভারত-মহিলা-সম্মেলন

বিগত বড়দিনের অবকাশে কলিকাতায় নিখিলভারত মহিলাসম্মেলনের এক অধিবেশন হইয়া গেল, ভারতের ধনী, মানী, অভিজাত সম্প্রদায়ের মহিলাগণ ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে নারীজাগরণ এত দ্রুতগতিতে হইতেছে যে ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সম্মুখে নারীজাতির নানা সমস্যা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহার মীমাংসাভার নারীর হাতেই লইতে হইবে। সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা সর্ব্ববিভাগেই নারীর ভাবিবার করিবার বহু আছে। দেশও তাহার নিকট অনেক দাবী করে।

এমন সময়ে কলিকাতার অধিবেশনের কথা সংবাদপত্রে জানিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছিলাম। নারীশক্তি একত্রিত হইয়া দেশের ভাবীমঙ্গলের কি আলোচনা করেন ও কোন পন্থা নির্দ্দেশ করেন, জানিবার জন্য আমরা ব্যগ্র ছিলাম। দুঃখের বিষয় আমরা সম্মেলনের বিবরণপাঠে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়াছি।

এই নারী-সম্মিলনীকে মহিলা সমাজের প্রতিনিধিমূলক বলিয়া কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। যে সম্মিলনে দেশের সকল স্তরের মহিলার যোগ নাই, উহা যত আড়ম্বরেরই হোক্ না, দেশবাসী তাহাতে লাভবান্ হইবে না, সমর্থনও পাইবে না। এই সম্মেলনে দেশের বিশিষ্টা মহিলাগণ যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের যে বিপুল নারীশক্তি—ধীরে ধীরে অসীম ত্যাগ স্বীকার করিয়া অপূর্ব্ব অধ্যবসায়ের সহিত জাতিকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা পাইতেছে, নারীকে তার সত্যিকার আসন খুঁজিয়া পাইতে সাহায্য করিতেছে, সেই নারী সমাজের কাহাকেও তো এই সম্মিলনীতে আমরা দেখিলাম না। অশিক্ষিতা, বঞ্চিতা, রিক্ত নারীর আবেদন যারা জাতির সম্মুখে তুলিয়া ধরিবে, তাদের তো আমরা ঐ সজ্জিত, উজ্জল সভায় পাইলাম না, তাই আমরা দুঃখের সঙ্গে বলিতেছি, নিখিল ভারত-নারীসম্মিলনী তার নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে পারে নাই, এ একটা অভিজাত মহিলাদের উৎসব সভার মত হইয়াছে, তাহাদের গণ্ডীবদ্ধ সমাজের প্রতিনিধি, নারী-গণ-মনের প্রতিনিধি নয়।

সম্মিলনীতে আলোচিত বিষয়েও আমরা একথা পরিস্ফুটভাবে বুঝিতে পারি।

নারীহরণ, নারীনির্য্যাতন সম্বন্ধে সম্মিলনে কোন প্রস্তাব বা আলোচনা হয় নাই, শ্রীযুক্তা সরলবালা সরকার এবিষয়ে প্রস্তাব তুলিতে চাহিলেও বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বাধা দেওয়ার সপক্ষে আমরা কোন যুক্তিই খুঁজিয়া পাই না। দেশের সর্ব্বসাধারণ নারীহরণের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বিচলিত ও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা লইয়া দেশে আন্দোলন আলোচনাও কম চলিতেছে না! এই সেদিন নারীরক্ষা সমিতি কলিকাতায় কত সভাসমিতি করিয়া এবিষয়ের প্রতিকারে সকলকে সজাগ করিতে চেষ্টা পাইল। বিষয়ের গুরুত্বে পার্লামেণ্টে কাউন্সিলেও এ বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে। অথচ নারী-সম্মেলন, এবিষয়ে একেবারে নীরব। নারীর অপমান, লাঞ্ছনা, মর্ম্মজ্বালা, নারীরই অনুভব করিবার; নারীই রুদ্রমূর্ত্তিতে এই পাপ নিবারণে সচেষ্ট হইবেন, কিন্তু একান্ত বিস্ময়ের বিষয় সম্মিলনের নেত্রীগণ এই সামাজিক কদাচার ও অত্যাচারের প্রতি উদাসীনতা অবলম্বন করিয়াছেন। সত্য, সমাজের নিম্নস্তরে দরিদ্রশ্রেণীর ভিতর এই পাপব্যাধির বিস্তার, এর সংস্পর্শে তাঁহাদের কোনদিনই আসিতে হয় না, তাই কি তাহারা ইহার আলোচনা করা সময়ের অপব্যয় মনে করিলেন।

সম্মিলনীতে রাজনীতির চর্চ্চা হইবে না, সভানেত্রী অভিভাষণেই জানাইয়াছেন, তাহার কারণ রাজনীতিতে মতভেদ হয়। মত-ভেদ হয় না, এমন কোন্ বিষয় পাওয়া যায়? সম্মিলনীতে জন্ম-শাসন, শিক্ষা ইত্যাদি লইয়া আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে কি মত বিভিন্নতার কিছু কম্‌তি আছে? আসল কথা বোধহয় যে তাঁহারা শাসক-সম্প্রদায়ের অসন্তোষের আশঙ্কা করেন, তাহাদের মতভেদের কারণ তো বোধহয় চিরকালই থাকিবে।

কিন্তু রাজনীতিকে বাদ দিয়া বিশ্বপ্রেম, সাম্য ইত্যাদির বুলি যতই আওড়ান হোক্ না, তাহা কার্য্যকরী না হইয়া হাস্যাস্পদই হইবে মাত্র। যে নিজের ঘরে পরবাসী, সে বিশ্বকে আপন বলিয়া অভ্যর্থনা করিবে কোথায়? নারী-প্রগতির মূর্ত্তরূপ ধরিয়াছে, পাশ্চাত্য দেশে সেই নারীরা কি রাষ্ট্রের মধ্যে আপনাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় খুঁজিয়া লইতে চেষ্টা করে নাই। আমাদের দেশেই বা এরূপ অস্বাভাবিক ব্যবস্থা হইবে কেন?

স্বাধীনতার দাবী যে মহিলা-সম্মেলন মুখ ফুটিয়া উচ্চারণমাত্র করিতে পারিল না, তাহা আবার নিখিল-ভারত-নারীর সম্মিলন বলিয়া নিজেদের অভিহিত করিতে পারে, এই আশ্চর্য্য বোধ হয়।

যশোহরে দুর্ভিক্ষ

এই সেদিন সংবাদপত্রে দেখিলাম বন্যাপীড়িত উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরবাসীর কি মর্ম্মান্তিক দুঃখদুর্দ্দশা। আবার তাহার সাথে সাথেই সংবাদ আসিল যশোহরে দুর্ভিক্ষ-দানবের রুদ্রলীলা। পরাধীন দেশের অধিবাসীর দুঃখবেদনার আর অন্ত নাই, বন্যা দুর্ভিক্ষও যেন তাহাদের নিত্য সাথীরূপে দুঃখ দুরবস্থাকে দ্বিগুণতর করিয়া চলিয়াছে।

যশোহরে নড়াইল এবং মাগুরা মহকুমার অধিবাসীর আজ কি নিদারুণ দুঃখদুর্দ্দশা। তাহারা ক্ষুধায় অন্নহীন। ক্ষুধার যাতনায় শীতে অভাবে তাহারা কি ভাবে যে দিন কাটাইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। কত যে প্রাণ এই দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে অকালে বিনষ্ট হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

হৃদয়ে কত আশা লইয়া চাষী ধান বপন করিয়াছিল। কত স্থানে পাটের পরিবর্ত্তে ধান বপন করা হইল। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও কচুরীপানায় অনেক ফসলই নষ্ট হইয়াছে। আশানুরূপ ফসল ফলিল না। ফলে ঋণদায়ে অনাহারে আজ চাষী চরম দুরবস্থায় উপনীত। বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীর কর্ত্তব্য দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগকে

সাহায্য করা। রোগীর চিকিৎসা আশু দরকার কিন্তু বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন যাহাতে মানুষ সুস্থ ও নিরোগী হয়। সেইরূপ দুর্ভিক্ষ নিবারণ যাহাতে হয় সে ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক।

বাংলার চাষীর কি শোচনীয় অবস্থা তাহা কি কেহ যথার্থ উপলব্ধি করেন, তাহারা সারা বৎসর প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া আমাদেরই অন্ন যোগায়, তার বিনিময়ে কতটুকু পায়? যাহা পায় তাহাতে তাহাদের দুবেলা অন্নও জোটেনা।

বন্যা দুর্ভিক্ষ নিবারণের অনেক উপায়ই নির্দ্ধারিত হয়, কাগজেকলমে, চাষীর অবস্থা পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে অনেক বড় বড় কথা বলা হয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে, কিন্তু কার্য্যকালে কিছুই হয় না। টাকা কোথায়? সরকারী তহবিলে টাকা নাই। সৈন্যপোষণ ও সরকারী উচ্চ কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস তো কোনমতে হইতে পারে না। সুতরাং যাহারা অর্দ্ধাহারে অনাহারে রোগজীর্ণ দেহ লইয়া কায়ক্লেশে জীবন যাপন করিতেছে, তাহারা যেটুকু মৌখিক সহানুভূতি পায় তাহাই যথেষ্ট।

সিনেমা বিষয়ে ভাবনার কথা

চিত্র জগতের উন্নতি খুব বেশীদিনের কথা নয়, অতি অল্পসময়ের মধ্যে সিনেমা বায়স্কোপ যেন সভ্যতার একটা বিশেষ অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দিন দিন নানা কোম্পানী এ ব্যবসায়ে গড়িয়া উঠিতেছে, নানা রকমারীর সৃষ্টি হইতেছে, নয়ন-মন-রঞ্জনের অবধি নাই। আমরা পিউরিটান বা অতিমাত্রায় নীতিবাগীশ নই; মানব-মনের আনন্দের খোরাকে বাধা দেওয়া ক্ষুধিতের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লওয়ার মতই নিষ্ঠুরতা বলিয়া মনে করি কিন্তু তবুও এই চিত্র-জগতের বিরুদ্ধে দু'একটা কথা না বলিয়া পারিলাম না। সিনেমাতে খুব ভাল ফিলম্ দেখিতে পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু সাধারণ যে সব ফিল্ম বাহির হয়, তাহার মধ্যে কতগুলি যথার্থ দেখিবার উপযুক্ত?

নির্ব্বাচারে যে কোন দিন দেখিতে গেলে অধিকাংশ দিনই ভাগ্যে কুরুচিখ্যাত ও কদর্য্য চিত্র দেখিবার সম্ভাবনা থাকে। বিশেষ জানিয়া না গেলে এইরূপই হয়। অথচ সাধারণতঃ যাহারা উহা দেখিয়া থাকেন তাহাদের এরূপ নেশা হইয়া পড়ে, যে ভালমন্দ বাছিবার আর ধৈর্য্য থাকে না, যে কোন নূতন ফিল্ম আসিলেই তাহারা দেখেন; অধিকাংশ দর্শক তরুণ বয়স্ক! স্কুলকলেজের ছাত্র, তাহারা দিনের পর দিন এই বিষ পান করিতেছে। অথচ এর সেন্সার বোর্ড আছে। কতগুলি আবর্জ্জনা শিল্প-নাম লইয়া চলিতেছে, এর প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য সুরুচি ও কুরুচির মধ্যে একটা ভেদরেখা টানা কঠিন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ফিলমের সংস্কারের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত। ইহাতে সকলের সহানুভূতি অর্জ্জন করিয়া লাভবান্ হইবেন সিনেমার মালিকগণ।

পাশবিকতার দণ্ড

সম্প্রতি সংবাদ পত্রে প্রকাশ একটী দেড় বৎসরের শিশুর প্রতি পাশবিক অত্যাচার হওয়াতে শিশুটী মারা যায়; বিচারক অপরাধীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়াছেন। তাহার রায়ে প্রকাশ, বেত্র দণ্ড দিলে পাঁচ বৎসরের অধিক কারাদণ্ড দিতে পারিতেন না, সুতরাং বেত্র-দণ্ড দেওয়া হইল না। এইরূপ অমানুষ অপরাধে যাহারা দোষী তাহাদের জন্য আইনের ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।

জার্ম্মানীতে হিট্‌লার পঙ্গু, ব্যাধিগ্রস্ত লোক যাহাতে বংশ বৃদ্ধি করিতে না পারে সেজন্য তাহাদের প্রজননশক্তি রহিতের ব্যবস্থা করিবার আইন করিয়াছেন, আমাদের দেশ ততদূর না গেলেও আদর্শ শাস্তি হিসাবে নারী-ধর্ষণ কারীকে এরূপ শাস্তি-বিধান করিলে ফলপ্রসূ হইতে পারিবে। কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে

উহাতে প্রতিহিংসার ভাব থাকিতে পারে, কিন্তু এই আইনের প্রয়োগে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে, আর দুরারোগ্য রোগ হইলে তাহার চিকিৎসা সেইরূপ কঠোরভাবেই করিতে হয়।

নিখিল-ভারত-নারীসম্মেলন ও সংবাদপত্র

সম্মিলনের সভানেত্রী স্বীকার করিয়াছেন, মহিলা-পরিচালিত সংবাদ-পত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে, এ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"আর একটী দিকেও কাজ করিতে হইবে। সংবাদপত্রের মারফতে জোর প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে। বর্ত্তমানে সংবাদপত্র পরিচালনার সম্পূর্ণ ভারই পুরুষের হাতে। আমি তাহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ নহি! তাহারা সহানুভূতির সহিত আমাদের পক্ষ হইতে প্রচারকার্য্য করেন। আমি বলিতে চাই যে, মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রেরও প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন প্রচলিত সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াও মহিলারা নিজেদের দাবী ও মতামত দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিতে পারেন। উর্দ্দু, হিন্দী এবং অন্যান্য দেশীয় ভাষায় পরিচালিত কতিপয় সাময়িক পত্র মহিলারা সম্পাদন করেন। এই সমস্ত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র আরও শক্তিশালী হউক এই সমস্তের আরও উন্নতি হউক, ইহাই আমি চাই।"

সাধু ইচ্ছা সন্দেহ নাই, কিন্তু কলিকাতায়ই অধিবেশনে বাংলার মহিলা-পরিচালিত সকল সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের কি আহ্বান করা হইয়াছিল? অন্ততঃপক্ষে সাধারণ ভাবে সম্মেলনের কার্য্যসূচী ও অন্যান্য বিষয় তাহাদের কি জ্ঞাপন করা হইয়াছিল? তা না হইয়া থাকিলে বক্তৃতার সময় তাহাদের উপযোগিতার সম্বন্ধে এত বাক্যব্যয় করিলে কথা ও কার্য্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, মনে হয় কথার ছলে বাহবা পাওয়া-ই এর উদ্দেশ্য।

প্রাচুর্য্যে উপবাস

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভারতে আজ মানুষ দুই মুষ্টি অন্নের ভিখারী ইহাকেই বলে অভিশাপ। কৃষক নিজের হাতে জমি চাষ করিয়া ধান জন্মাইয়াছে কিন্তু তাহা উপযুক্ত দাম দিয়া কিনিবে কে? রাশি রাশি ধানের সামনে থাকিয়াও ভাতের চিন্তায় তাহারা আকুল ম্লান এ দুর্দ্দশা কি সহ্য করিবার? সারা বিশ্ব ঘুরিয়া আজ বৈষম্য ও দৈন্যের হাহাকার। একে অন্যকে প্রাণপণে ঠকাইয়া নিজে অর্থ জমা করিতেছে। এইরূপে দেশের অর্থ মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে দিয়া জমা হইয়াছে। ব্যাঙ্কের সুদ ক্রমে কমিতেছে কিন্তু টাকার প্রাচুর্য্য সেখানে যথেষ্ট। এই অস্বাভাবিক উপায় দূর করিবার উপায় কিন্তু আমাদের নিজেদেরই কাছে। নিজেরা যেদিন এই সর্ব্বনাশী সুপ্তি হইতে সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠিয়া প্রতিকারের ভার নিজেরা তুলিয়া নিব—সেদিনই আমাদের দুঃখ দূর হইবে ইহার আগে নয়।

ভারতের সামরিক ব্যয়

অন্ন বস্ত্র ও শিক্ষার জন্য উপযুক্ত অর্থ ব্যয় করা যেখানে কিছুতেই সম্ভব হয় না সেই দরিদ্র ভারত হইতে সেখানকার ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনী পোষণের জন্য বার্ষিক দেড়কোটি টাকার অধিক শোষণ করা হয়। এই সৈন্যবাহিনী কিন্তু ভারতসেবার জন্য নয়, ব্রিটিশের স্বার্থরক্ষার জন্যই তাহারা ভারতে টহল দিয়া ফেরে তা সত্ত্বেও তাহাদের ব্যয়ভার ভারতের উপর। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনেক দিন আন্দোলন হওয়ার পর ইহার মীমাংসার জন্য গত বৎসর 'ক্যাপিটেশান রেট ট্রাইবিউনাল গঠিত হয়। ট্রাইবিউনাল সমস্ত বিষয় তদন্তের পর জানুয়ারী মাসেই রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন কিন্তু সাময়িক কারণের দোহাই দিয়া সেই রিপোর্ট সম্পূর্ণ প্রকাশিত করা

হয় নাই। অনেক গবেষণার পর ব্রিটিশের কর্তৃপক্ষ ঠিক করিয়াছেন যে ভারতবর্ষ সাময়িক ব্যয় বাবদ বার্ষিক দেড় কোটি টাকা সাহায্য পাইবে। এতদিন ধরিয়া এই অন্যায় শোষনের মূল্য হইল, মাত্র বার্ষিক দেড়কোটি টাকা। নূতন ব্যবস্থা আগামী এপ্রিল হইতে প্রবর্ত্তিত হইবে। এই অর্থ পাইয়া উল্লসিত হইবার কোন কারণ নাই বরং ইহাতে এদেশে ভারতের স্বার্থবিরোধী ব্যবস্থাই কায়েমী হইবার সম্ভাবনা, বিশেষতঃ যাহারা এখন টাকা জোগাইবেন, তাহাদের অঙ্গুলি হেলনেই সব চালাইবার বেশ ভাল অজুহাত পাওয়া যাইবে।

সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী ভারতের বড়লাট

এদেশের শাসক সম্প্রদায়ের কথা ও কাজের মধ্যে যে কিছু মাত্র সামঞ্জস্য নাই তাহার পরিচয় অনেকক্ষেত্রে পাওয়া যায়। তাঁহারা বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অনেক উদার নীতির কথা বলেন কিন্তু কার্য্যকালে তাহার ঠিক বিপরীত নীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। সুতরাং সম্প্রতি ভারতের বড়লাট লর্ড উইলিংডন ত্রিবাঙ্কুর ও মাদ্রাজে সাম্প্রদায়িকতার তীব্র নিন্দা করিয়া যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হই নাই।

ত্রিবাঙ্কুরের নূতনরাষ্ট্রসভার গৃহভিত্তি স্থাপনউপলক্ষে বড়লাট তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "সাম্প্রদায়িকতার কুসংস্কারে এদেশের ঐক্য ও উন্নতি প্রবল পরিপন্থীস্বরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমি আশাকরি, এই অনিষ্টকর মনোবৃত্তি ক্রমেই অপসৃত হইতে থাকিবে এবং ত্রিবাঙ্কুরের রাষ্ট্রসভায় সদস্যগণ সকলে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে রাষ্ট্রের মঙ্গল সাধনের প্রেরণায় সমভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিবে।"

১৫ই ডিসেম্বর মাদ্রাজে একটি বক্তৃতাতেও তিনি বলিয়াছেন, তিনি মনে এই পোষণ করেন যে, নূতন শাসনসংস্কার দেশে প্রবর্ত্তিত হইলে সকল সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান হইবে এবং সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে না হইয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক মতামতের উপর দল গঠিত হইয়া উঠিবে।

বড়লাট বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতায় খুবই উদার ও সাম্প্রদায়িক বিরোধী ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন সত্য কিন্তু ইহা খুবই দুঃখের বিষয় যে আজ পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাকে কার্য্যকালে এই উদারনীতি অবলম্বন করিতে দেখিনাই। বরং অনেকক্ষেত্রে তিনি সাম্প্রদায়িক বিষ বিস্তারে কম সহায়তা করেন নাই। কয়েকবৎসরের রাজনৈতিকক্ষেত্রে তিনিও তাঁহার পরামর্শ দাতাগণ এরূপ অনেক কার্য্য করিয়াছেন যাহাতে সাম্প্রদায়িকতাই অধিক প্রশ্রয় পাইয়াছে। গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে লর্ড উইলিংডন স্বার্থান্ধ মুসলমান নেতাদিগকে নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। এই নেতারা বিদেশে গমন করিয়া সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার্থ জাতির স্বার্থকে পর্য্যন্ত বলি দিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। সরকারী নানা কার্য্যের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক রীতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং সম্প্রতি বড়লাট যে সাম্প্রদায়িক-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা তিনি নিজের কার্য্যক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট নীতিরূপে গ্রহণ করিবেন কি?

মধ্যবিত্ত লোকের অন্নসমস্যার সমাধান

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোম্পানীর-প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ,—এই দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে এই অনুষ্ঠান অনেকাংশে অন্নসমস্যার সমাধান করিতেছেন এবং ভারতবাসী এবং বিশেষ করিয়া বঙ্গবাসী নরনারীকে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহে সহায়তা করিতেছেন, গৃহের সুখস্বাচ্ছন্দ উপভোগ করিতে করিতে এই অনুষ্ঠান তাহাদের বুননের ফলদ্বারা অনশনক্লিষ্ট বেকারদের অন্নবস্ত্রের অভাব অনেকাংশে লাঘব করিয়া তাহাদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস করিতেছেন, সামান্য কিছু মূলধন লইয়া যে কোন ব্যক্তি তাহাদের বিভিন্ন রকমের

গেঞ্জী, মৌজা প্রভৃতির বুননের কলের যে কোন একটি ক্রয় করিয়া দৈনিক ৩৲ হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতে পারেন, এই কোম্পানীর কল হাল্‌কা ও দীর্ঘকালস্থায়ী, ইহাদিগকে যে কোন স্থানে স্থাপন করিয়া কাজ চালান যাইতে পারে।

এই অনুষ্ঠান শুধু কল-সংক্রান্ত শিক্ষাপ্রণালী শিক্ষা দেন না; পরন্তু সূতা সরবরাহ করেন এবং তাহাদের কলে প্রস্তুত জিনিষসমূহ ক্রয় করিয়া থাকেন। আমরা এই অনুষ্ঠানের প্রতি স্বদেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইহা বোম্বে ও কলিকাতার ১২এ।১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে এবং সমস্ত ভারত সাম্রাজ্যব্যাপী ও ব্রহ্মদেশে ইহাদের এজেন্সী আছে।

ভুল সংশোধন

গত পৌষের জয়শ্রীতে 'সহশিক্ষা' শীর্ষক লেখাটিতে কয়েকটী ছাপার ও লেখার ভুল আছে, অনুগ্রহ করে পাঠিকারা সংশোধন করে পড়ে নেবেন।

৯৯৭ পাতার চতুর্থ প্যারায় "পূজার আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় সামান্য একটু বলেছেন শিক্ষাসম্বন্ধে" স্থলে "পূজার অ্যাড্‌ভান্স পত্রিকায়" হবে।

৯৯৯ পাতায় (ঐ লেখায়ই) দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ ৩৪ লাইনে "সেই ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার সেই ক্ষেত্রে (যদি মন্দ প্রভাব থাকে) প্রভাবই একমাত্র প্রভাব নয়, একথা অতি অশ্রদ্ধেয়", স্থলে বিদ্যালয়ে সহশিক্ষার (যদি মন্দ প্রভাব থাকে) প্রভাবই একমাত্র প্রভাব, একথা অতি অশ্রদ্ধেয়" হবে।

১০০০ পাতায় ষোলোর লাইনে (দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ) "এর পরে কীপার বয় দ্বারা পৃথক পাঠ নেয় শুনেছি" স্থলে "এর পরে পৃথক ক্লাশ করে পৃথক পাঠ নেয় শুনেছি" হবে।

১০০৩ পাতায় স্কটিশ চার্চ্চের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ আর্কুহার্ট সাহেবের বক্তৃতার কথার মাঝে ছাত্রীদের কৃতকার্য্যতার বিষয়ের সমর্থনে "অধ্যয়ন" স্থলে সর্ব্বত্র সহ-অধ্যয়ন" হবে।

Printed & Published by Bibhati Sen, 23 Wyer Street, Wari, from Wari Printing Works, Dacca.

কবি কামিনী রায়।
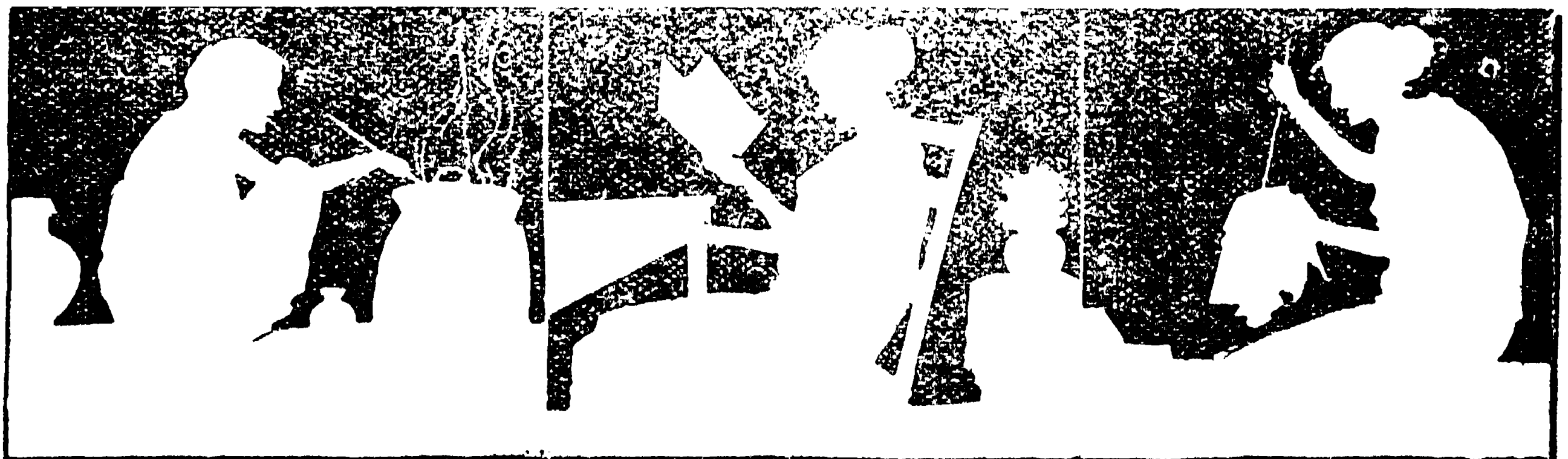
তৃতীয় বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৪০ | একাদশ সংখ্যা

বসন্ত

শ্রীরাধারাণী দেবী

১

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নক্ষণ, ফাল্গুনের দিন ;
শীতের সঙ্কীর্ণ স্মৃতি হয়েছে বিলীন
বিমল বাসন্তী রৌদ্রে। মলয় বাতাসে
চূত-মঞ্জরীর মদগন্ধ ভেসে আসে।
পল্লব-সম্পদভার ঝরায়ে নিঃশেষে
মহুয়া পলাশ শুষ্ক সর্ব্বহারা বেশে
দাঁড়ায়ে সন্ন্যাসী সাজে রিক্ত মূর্ত্তি ধরি।
কচি কিসলয় দলে নব সজ্জা করি।
পুলকে শিহরি কাঁপে শ্যাম নিমশাখা।
ঝিরি ঝিরি ঝরে বনে জীর্ণ ঝাউ পাখা।
জ্বলিছে রক্তিম শিখা কিংশুকের শিরে।
রোমাঞ্চ জাগায়ে তৃণে অরণ্যানী ঘিরে
দুরন্ত দক্ষিণ হাওয়া ফেরে উল্লসিয়া,
স্পর্শে তার জীর্ণ যাহা পড়িছে খসিয়া॥

২

মলয় মদির স্পর্শ নিয়ে আসে আজ!
মধু মাধবীর কুঞ্জে সলাজ সৌরভ!
বনলক্ষ্মী অঙ্গে নব বিবাহের সাজ
পুষ্প অলঙ্কার পুঞ্জে। অরণ্য-গৌরব
দিকে দিকে উচ্ছ্বসিছে আনন্দ নিঃস্বনি'!
আকাশে বাতাসে বাজে মিলনের বাঁশী!
বিহঙ্গ বধূরা দেয় কল-হুলুধ্বনি
কাকলি-কূজিত কণ্ঠে। দিগন্ত উদ্ভাসি'
নবীন অঙ্কুর নব মুকুল পল্লবে
তরুণ হয়েছে তরু, শ্যাম তৃণদল।
কোন্ অর্ঘ্যে লবে বরি' পরাণবল্লভে
ধরণী ভাবিয়া হোলো অধীর চঞ্চল!
বসন্ত আসিছে যেন বিবাহের বর,
রচিত হয়েছে মর্ত্তে উৎসব-বাসর।

নিউইয়র্ক ষ্টেটের একটী নূতন প্রতিষ্ঠান

শ্রীকমলা মুখার্জ্জি

বিশ্বের বাজারে নানা সুপ্রতিষ্ঠানের সুনামে আমেরিকার নাম বড় কম নয়। যা কিছু নূতন অদ্ভুত বিরাট, বিশাল সবই যেন আমেরিকার একাধিকার সম্পত্তি; আর কেউ যেন আগে যেতে না পারে। হয়ত আর কেউ বোধহয় এমন করে পারেনা। তার কারণ আংশিকরূপে অর্থের জোর হোলেও, এদের সব সদনুষ্ঠানেই একটী বিরাট প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। তাই বোধহয় এদের সকল অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান এমন সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়। সব রকম কাজেই এদের বিরাট উৎসাহ এবং এরা সব কাজই সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ কর্‌তে ব্যস্ত।

আজ যে প্রতিষ্ঠানটীর কথা লিখ্‌ব এটা নিউইয়র্ক ষ্টেটের নব-জাত শিশু। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ হয়ে জন্ম লাভ করেছে। অন্যান্য ষ্টেট্‌ প্রতিষ্ঠান গুলির সঙ্গে এর পার্থক্য ও বিশেষত্ব অনেকটা আলাদা রকমের বলেই এর কথা কাগজে ও লোকের মুখে প্রায়ই শোনা যায়। শুন্‌বার মত কথাও বটে! আমাদের একটী বিশেষ বন্ধুর কাছে এর খবর যখন প্রথম পেলাম, তখন মে মাস। প্রতিষ্ঠানটী তখন আংশিকভাবে শেষ হয়েছে ও ছেলেদের রাখ্‌বার জন্য খোলা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটী তৈরী করার খরচ বাবদ যে অঙ্কটা শুন্‌লাম তাতে প্রথমে ভেবেছিলাম বন্ধুটী মার্কিন তাই বোধহয় একটু বাড়িয়েই বল্‌ছেন; কিন্তু তার আন্তরিকতায় শেষটা বিস্ময় ও বিশ্বাস না করে পারলাম না। তাছাড়া এই বন্ধুটী স্বনামধন্য তাই নিজের অসীম কৃতিত্ব দেখিয়ে ষ্টেটের নিকট হতে এই প্রতিষ্ঠানটী তৈরী করার দায়ীত্ব নিয়েছেন, শুনে দেখ্‌বার আগ্রহ প্রকাশ না করে পারলাম না। যথাসময়ে প্রতিষ্ঠানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের (বন্ধুটীর ভাই) নিমন্ত্রন চিঠি এল এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে একখানা সুন্দর মোটর আমাদের নিয়ে যাবার জন্য হাজির হ'ল। নিউইয়র্ক সহর ছাড়িয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে আমাদের গাড়ী ছুট্‌লো এবং দেড় ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের ৬০ মাইল দূরে Warwick নামে ক্ষুদ্র গ্রামে নিয়ে হাজির কর্‌ল। এই প্রতিষ্ঠানটা এইখানে বিরাট "পাহাড়ের মালার মধ্যে একটী অতিশয় সুন্দর স্থানে অবস্থিত। প্রথমে দেখে মনে হয়েছিল যে এটা কোন ষ্টেট্‌ ইনষ্টিটিউসান কখনই নয়; কোন খেয়ালী বড় লোকের সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থানে বিরাট রাজ-প্রসাদ ও খেলার মাঠ। নামটী জানা না থাক্‌লে এ রকম মনে হওয়া অন্যায় ও নয়।

প্রতিষ্ঠানটীর নাম The State Training School for Boys. ইহার উদ্দেশ্য যে সব ছেলের বয়স ১২ থেকে ১৬ বৎসরের মধ্যে, তাদের চুরি, ডাকাতি বা অন্য কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হ'য়ে আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে, সাধারণ জেলে পাঠিয়ে না দিয়ে, এই খানে তাদের শারীরিক মানসিক যোগ্যতা হিসাবে ট্রেনিং দিয়ে সমাজের জন্য যোগ্যতর করে তোলা।

প্রতিষ্ঠানটীতে ৫০০ শত ছেলেকে রাখবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটী তৈরী ক'রতে ৭ শত একার জমিতে ৫,০০০,০০০ ডলার খরচ হয়েছে। আমেরিকায় কোন জিনিষই ছোট খাট রকমে হতে পারেনা, কাজেই এ রকম প্রতিষ্ঠানে এমন লম্বা খরচ আমাদের কাছে অদ্ভুত লাগলেও এরা এটা স্বাভাবিকই মনে করে। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্য আমেরিকা বিশ্ব-বিখ্যাত। সমাজের উন্নতি ও দেশের উন্নতির জন্য এরা নিত্য নূতন পন্থা ও উপায় আবিষ্কার ও অবলম্বন করেছে; এখানেও তার নানারকম নূতনত্বের আভাস পেয়ে এদের বাহাদুরী না দিয়ে ও প্রশংসা না করে পারলামনা।

ছেলেরা যে কারণেই দোষী হোক্ (Juvenile Delinquents) যাতে তারা চরিত্র সংশোধন ও গঠন করতে পারে এই জন্য কলম্বিয়া ইউনিভারসিটির Teachers' College এর ৯০ জন সহযোগী শিক্ষক এদের শিক্ষার ভার নিয়েছেন। এছাড়া Education কমিটীতে বিখ্যাত ডাক্তার William H. Vilpatrick, Goodman, Watson ইত্যাদি কয়েক জন বিশ্ববিখ্যাত লোকের নাম ও দেখা দিয়াছে। মোট কথা ছেলেরা যত রকমে দোষীই হোক্ না কেন তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে সমাজে যোগ্যতর করে তুলতে হবে। তবে এই শিক্ষা পুঁথি পুস্তকের চেয়ে "হাতে কলমে" দিবারই বিশেষ বন্দোবস্ত দেখলাম। শিক্ষার সঙ্গে ছেলেদের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। কলম্বিয়ার মেডিক্যাল সেণ্টারের (Medical center) বিখ্যাত Psychiatrists ও চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক ছেলেকেই শারীরিক ও মানসিক পরীক্ষা দিতে হয় ও সেই মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এখান একটী আধুনিক রকমের সুন্দর হাঁসপাতাল ও Dental clinic আছে। দরকার মত সকলেই চিকিৎসা ও সেবা যত্ন পায়। হাঁসপাতালের অপারেশন রুমটী কোন দামী প্রাইভেট হাঁসপাতালের তুলনায় কম নয়। আধুনিক সকল রকম যন্ত্র পাতিই তাতে সাজানো আছে। চিকিৎসার সমস্ত খরচ ষ্টেটই বহন করে, সে কথা বলা বাহুল্য।

প্রতিষ্ঠানটীর বাড়ীগুলোর বিশেষত্ব এই যে কোনটীই দোতালার বেশী উঁচু নয় এবং সবগুলিই আকারে এক রকম, একটু সেকেলের ফ্যাসান বা ছাঁচে লাল ইটের তৈরী। দূর থেকে দেখলে মনে হয় এটী একটী সুন্দর নির্জ্জন শান্ত পল্লী। দুঃখ, দৈন্য যেমন নাই, ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্য ও কিছু নাই, কেবল পরস্পরে প্রীতি, ভালবাসা ও একতাই এদের একত্র করেছে। ছেলেদের দেখেও খানিকটা সেই রকম মনে হয়েছিল, অটুট স্বাস্থ্য, হাসিখুসী মুখ দেখে মনে হয়নি এরা এখানে অসুখে আছে বা আত্মীয় স্বজন ছেড়ে স্বীয় অপরাধে ম্রিয়মাণ! জেলের যে ভয়াবহ লৌহদণ্ড প্রতি জানালাতে থাকে এখানে তার কোন নাম গন্ধও নাই!!! লৌহ দণ্ড কয়েদীর প্রাণে ভীতি জাগায় বলেই উহা এখানে বর্জ্জন করা হয়েছে। ছেলেদের "ডরমেটরি" বা বাসস্থানে প্রত্যেক বিছানার কাছে একটী করে কাঁচের জানালা আছে, কিন্তু জানালাগুলি কৌশলে এমন ভাবে তৈরী

যে দরকার হ'লে হাওয়ার জন্য আংশিকরূপে খোলা যেতে পারে কিন্তু পুরো খুলে বা আংশিক খুলে শরীর গলিয়ে পালিয়ে যাওয়া নিতান্তই অসম্ভব। কাজেই "বন্ধন হীন কারাগার" হলেও কেউ পালিয়ে যাবার সাহস করেনা; ইচ্ছা থাক্‌লেও বোধহয় অসম্ভব বলে কেউ চেষ্টা করে না।

প্রতিষ্ঠানটী তৈরী করতে ছেলেরা বিস্তর সাহায্য করেছে। অনেকগুলি বাড়ী, গির্জ্জা রাস্তা ছেলেরা অতি উৎসাহের সহিত নিজেদের হাতে তৈরী করেছে। স্কুলটির জন্য মোট ৫,০০০,০০০ ডলার খরচ হলেও ভবিষ্যতে এটী সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী (Self-supporting Institution) হবে বলেই সকলে আশা করেন। সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হবার যে আয়োজন দেখ্‌লাম তাতে মনে হ'ল এ স্কুলটীর পক্ষে বড় বেশী দেরী লাগ্‌বেনা, বছরের সমস্ত শাক, সব্‌জি, ফল, মূল ছাড়া গরু, ভেড়া, শূয়র মুরগী সমস্তই ওখানে তৈরী ও পালন করার ব্যবস্থা আছে। খাবারের জন্য বাইরের থেকে বিশেষ কিছু কিনে আনা দরকার হবেনা। এত অল্প সময়ের মধ্যে ছেলেদের নানারকম সুন্দর হাতের কাজ দেখে বিশেষ মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে এ দোষ অনেকের জীবনের গতি বদলাবে এ আশা দুরাশা নয়। এবং এই আশা ও ভরসা নিয়েই মানুষের চরিত্রগত দোষ ও তার উপযুক্ত সংশোধন ও জীবন গঠনের জন্য আমেরিকা এই বিরাট আয়োজন কর্‌ছে। ভাল খাবার, ব্যবহার, থাক্‌বার ও সময়ে উপযুক্ত শারীরিক মানসিক্ চিকিৎসা পেলে এই সব ছেলেরা (Juvenile Delinquents) ভাল পথেই অগ্রসর হবে বলে আশা করা যায়।

রংবিদ্বেষ বা নিগ্রোবিদ্বেষ আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে থাক্‌লেও এই প্রতিষ্ঠানে যতগুলি বালক দেখ্‌লাম, ইহার অধিকাংশই নিগ্রো, বাকী ইটালীয়ান, ইহুদী ও অন্যান্য বিদেশীয় আমদানী। নিগ্রো সংখ্যায় বেশী থাকার কারণ ইহারা অধিকাংশই অতিশয় গরীব এবং বাপ মায়ের শিক্ষার অভাবে, কুশিক্ষায় ও প্রচণ্ড অভাবে নানা প্রলোভনে নিগ্রো সন্তান সহজেই কুপথগামী হয়। আমেরিকার বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক ও মনস্তত্ব বিশারদদের মত যে এই সব হতভাগা ছেলেদের যদি সময়ে সংশোধনের ভার নেওয়া যায় তবে বড় হয়ে এরা criminals না হ'য়ে বেশ ভালভাবেই অন্যান্য নাগরিকদের মত জীবন যাপন কর্‌তে পারে। কিন্তু শুধু ইহাদের তত্ত্বাবধান কর্‌লেই হয়না, ইহাদের পারিবারিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ও বিশেষ দরকার; তাই যখনই কোন বালককে State Institution এ পাঠান হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে স্যোসাল্ সার্‌ভিসের (Social Service) লোক বালকের ঘরের প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান ক'রে যতদূর সম্ভব তার তত্ত্বাবধানের ভার নেয়। মা বাপ সন্তানপালনে অক্ষম হলে বালকের দায়িত্ব ষ্টেটই সম্পূর্ণ বহন করে। ছেলেদের শিক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্যোসাল সারভিস্ ডিপার্টমেণ্ট চেষ্টা করে। সাদা, কালো সকল রং ও "জাতি নির্ব্বিশেষে" সকল ছেলেই যাতে এই "কারাগার" মুক্ত হয়ে সদুপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারে সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়।

নানা অবস্থার নানা দুর্ভাগা ছেলে মেয়েদের শারীরিক, মানসিক, আর্থিক পরিবর্ত্তনের জন্য

কত রকম জন-হিতকর প্রতিষ্ঠানে কত নূতন নূতন ব্যবস্থা এদেশে চল্‌ছে দেখ্‌লে অবাক্ হতে হয়। সমাজের, দেশের জাতের উন্নতির জন্য প্রতিদিন নূতন নূতন কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করতে এরা কুণ্ঠিত হয় না।

বাংলা দেশে এরকম Juvenile Delinquents বালকবালিকাদের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা আমার জানা নাই। তবে আমাদের জীবন যেমন দিন দিন "মূল্যহীন" হয়ে পড়েছে তাতে মনে হয় না এরকম কোন সুব্যবস্থা আছে বা এই নিয়ে কেউ বড় মাথা ঘামান। অথচ আমাদের দেশে যে এ সমস্যা আছে এ কথাও অস্বীকার করা চলে না। আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের জন্য যা খরচ করেন তা অন্য কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট বোধহয় করেন না। এদের এই সব সদানুষ্ঠানগুলো দেখে মনে হয় ঠিক এদের অনুকরণ না করেও আমরা কতকটা এদের এই সব অভিজ্ঞতা নিজেদের সামাজিক সমস্যার কাজে লাগাতে পারি। ছেলে, এজাতিতে ছোটই হোক আর বড়ই হোক তাকে সৎপথে এনে মানুষ করবার অধিকার শুধু নয়, দাবীও সমাজের আছে।

তর্পণ

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

ইন্দিরা হঠাৎ প্রস্তাব করিল, "আমি মেহেরপুর যেতে চাই বউদি, আশা কর্‌ছি এতে আপত্তি কর্‌বে না।"

অপরাজিতা উত্তর দিল না, কেবল দুইটী চোখ বিস্ফারিত করিয়া তাহার প্রতি তাকাইয়া রহিল। ইন্দিরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে অবিচল থাকিয়া অবিচলভাবেই বলিল, "বাস্তবিকই আমি চলে যেতে চাই, এখানে থাকা আমার অসহ্য মনে হচ্ছে।"

অপরাজিতা ধীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, এতকাল এখানে রয়েছ, অসহ্যবোধ হয় নি, আজই হঠাৎ এত অসহ্য মনে হওয়ার কারণ?"

ইন্দিরা এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "অসহ্য অনেককাল ধরেই হয়েছে বউদি,—যে পর্য্যন্ত দাদা গেছেন—সেই পর্য্যন্ত তবুও এখানে থাক্‌তুম, একপাশে থাকতুম, কোন কিছুর মধ্যে জড়াতে চাইতুম না। তবুও এতদিন অপেক্ষা করেছি, তোমার হয়তো পরিবর্ত্তন দেখ্‌তে পারি, তারুণ্য চিরদিনই তোমার অভিভূত করে রাখতে পারবে না—সেই দিনটী দেখবার আশায়—যেদিন তুমি নিজেকে নিজে, চিন্‌তে পারবে। কিন্তু সে দিন এলো না বউদি, সাতাশ আটাশ বছর তোমার পর দিয়ে বয়ে গেলেও আজও তুমি ঠিক তেমনি আছ,

. তোমার উচ্ছৃঙ্খলতা দিনদিন বাড়ছে বই কমছে না। আমি আর দেখতে পারছি নে, সহ্য করতে পারছি নে, তাই আমি চলে যেতে চাচ্ছি।"

অপরাজিতার মুখখানা গম্ভীর হইয়া উঠিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি উচ্ছৃঙ্খলতা দেখতে পেয়েছ ইন্দিরা?"

ইন্দিরা উত্তর দিল, "সব তাইতেই বাড়াবাড়ি। বউদি, তোমার সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক নেই, দাদা তোমায় বিয়ে করেছিলেন, সেই সম্পর্ক আজও তোমায় আমায় জড়িত করেছে। বল দেখি, আমার সেই দাদা—যিনি তোমার সৌভাগ্যের অঙ্গশিরে বসিয়ে রেখে গেছেন, তাঁর স্মৃতির অপমান আমি কি করে সহ্য করব?"

অপরাজিতা হাসিল,—"স্মৃতির অপমান? আমি তাঁকে মনে করিনে তাই ভেবেছ তো ইন্দিরা? ভুল বুঝেছ, আমি তাঁকে সর্ব্বক্ষণ মনে করি তবে পরম বন্ধুরূপে নয়, আমার জীবনের সুখশান্তি বিনষ্টকারী পরম শত্রুরূপে।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া অপরাজিতা বলিল, তাঁকে আমি কতখানি ঘৃণা করি তা তুমি বুঝবে না ইন্দিরা, কোন স্ত্রী তার স্বামীকে এতখানি ঘৃণা করতে পারে না বলে মনে করি। পাছে সেই ঘৃণা আমায় ছাপিয়ে প্রকাশ হয়, তাই আমি বাইরের আড়ম্বর নিয়ে ভুলে থাকতে চাই। কিন্তু যদি তোমায় দেখাতে পারা যেত ইন্দিরা—দেখাতুম—আমার বুকের মধ্যে কিছু নেই, সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।"

ইন্দিরা জিজ্ঞাসা করলে, কেন ঘৃণা কর জানতে পারি কি?

অপরাজিতা উত্তর দিল, "জানবে বই কি,—সময় হলেই, জানতে পারবে।"

ইন্দিরা খানিক চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "তবু আমার তো এখানে থাকা চলে না বউদি; ঘৃণাই কর আর ভক্তিই কর—যথেচ্ছাচার আমি সইতে পারব না।"

অপরাজিতা শান্তভাবে বলিল, "তোমার থাকার জন্যে আমি জোর করছিনে ইন্দিরা, তোমার ইচ্ছা না হয়—তুমি থেকো না, চলে যেয়ো। তোমায় শুধু এই কথাটুকু বলি—সেখানে তোমার কেউ নেই, নিজের পরে নিজে নির্ভর করে দাঁড়াতে যে শক্তির দরকার, তোমার তা নেই, সেই জন্যে—"

তরল হাসি হাসিয়া ইন্দিরা বলিল, "তোমার এ উপদেশের জন্য ধন্যবাদ বউদি। তোমার মত পুঁথিগত শিক্ষা হয়তো আয়ত্তও করতে পারি নি তবু স্বামী যেমনই হোন—তাঁকে যে দেবতা বলে' পূজা করতে পারা যায়, আর সেইটা যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা তা আমি জানি—এই শিক্ষাই ছোট বেলা হতে পেয়েছি, আর সেই শিক্ষার পরে চরিত্র গঠন করে নিয়েছি। আজ আমি পথ পিছলে যাওয়ার ভয় করিনে, আমার পথ পিছল নয়, কিন্তু তোমার পথ পিছল, যে কোন মুহূর্তে পিছলে পড়তে পার—সে কথা মনে রেখো। আর একটা কথা

বলি,—কেবল বাইরে চেয়ে ফিরো না, ঘরের পানে চেয়ো—; নিন্দায় এদিকে কান পাততে পারা যাচ্ছে না, সেদিকে একটু কান দিয়ো, মানুষকে মানুষ বলে ভেবো।"

একরকম জোর করিয়াই ইন্দিরা মেহেরপুরে চলিয়া গেল।

বিকাশ দত্তের সহিত অপরাজিতার মেলামেশা কেবল তাহারই চোখে পড়ে নাই, সকলের চোখেই পড়িয়াছিল। লোকে যে পাঁচ কথা বলিতেছে ইন্দিরা তাহা সহ্য করিতে পারে নাই।

অপরাজিতা কলিকাতায় এইরূপ কথা শুনিতে পাইয়া গ্রামে আসিয়াছে, তাহার আসার কয়েক দিন পরে বিকাশ দত্তও চলিয়া আসিয়াছে।

সে নরেন্দ্রনারায়ণের পরম বন্ধু ছিল এবং তাঁহার জীবনের অনেক কাহিনীই সে জানিত।

পাকা ব্যবসায়ী লোক সে, ভারতবর্ষের নানাস্থানে তাহার কাঁচের কারবার চলিতেছিল। সকলের উপর সুবিধা ছিল—সে সু-পুরুষ যুবক, আজও সে অবিবাহিত। এতদিন শিক্ষার জন্য সে দেশ-বিদেশে ঘুরিয়াছে, বিবাহ করিবার কল্পনা কোন দিনই মনে জাগে নাই।

অপরাজিতার উপর তাহার আকর্ষণ আসিয়া পড়িয়াছিল, অপরাজিতাও তাহা বুঝিয়াছিল এবং সেই জন্যই সে বিকাশকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

ইন্দিরা অপরাজিতার ধ্বংস চোখে দেখিতে পারিবে না, সেইজন্যই সে সরিয়া গেল।

তবুও যাইবার সময় সে অপরাজিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ঝর ঝর করিয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া গেল, "তোমার মোহ দূর হোক, তুমি যেন মানুষ হও, আমি যাওয়ার বেলায় এই প্রার্থনাই করে যাচ্ছি বউদি। আমায় শিগ্‌গীরেই ডেকো—আমি সে দিনের আশায় দিন কাটাব।"

সে দিনে অপরাজিতার অস্বাভাবিক মুখের ভাব দেখিয়া বিকাশ স্তম্ভিত হইয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে মিসেস রায়, আপনার শরীর ভাল আছে তো?"

জোর করিয়া মুখের উপর একটুকরা হাসি ফুটাইয়া অপরাজিতা বলিল, "বেশ আছি, দত্ত, এ শরীর কোন দিন খারাপ হওয়ার নয়। আমাদের দেশের বিধবারা বড় সহজে মরে না তাদের কঠিন ব্যায়াম হয়, এ কথা বোধ হয় জানেন না। জানবেনই বা কি করে? শুনেছি আপনার জীবনটা ইউরোপেই কেটেছে, এদেশের কয়টা কথাই বা সে দেশে সত্যি করে গিয়ে পৌঁছায়?"

বিকাশ বলিল, "বাঙ্গালী বাঙ্গালীর ঘরের খবর সবই রাখে মিসেস রায় কাজেই এসব খবর আমায় জানতেই হয়েছে। বিধবারা নিজেদের জীবনের মূল্য এতটুকু দেয় না,—কিন্তু তাদের জীবনই যে বেশী মূল্যবান, মিসেস রায়। আচ্ছা, বলতে পারেন কেন এদেশের বিধবারা নিজেদের এমন অসার বলে ভাবে? এইতো বিলেতে মেয়েরা বিধবা হলে ও তারা নিজেদের জীবন ব্যর্থ হতে দেয় না,—তারা আবার সংসার পাতে, আবার—"

অধীর হইয়া উঠিয়া অপরাজিতা বলিল, "তেলে জলে মিশ খাওয়াবেন না,—ওদের কথা ছেড়ে দিন। যারা ভোগটাকেই জীবনে কাম্য বলে জানে তাদের সঙ্গে এদেশের যে কোন লোকের সঙ্গেও তুলনা করা যেতে পারে না।"

বিকাশ রাগ করিয়া বলিল, তাঁরাও বুঝি ত্যাগ করেন নি, না কর্‌তে জানেন না ?"

অপরাজিতা বলিল, "মনের ইচ্ছায় করে—ধর্ম্ম বলে নয়। লোকের চোখে মহান্ প্রতিপন্ন হতে অতি ক্ষুদ্র দানও তাঁদের মহিমামণ্ডিত হয়ে ইতিহাসের পাতা জুড়ে থাকে। আমাদের এদেশে যুগ যুগ ধরে কত কোটি কোটি লোক সত্যিকার ত্যাগ করে যাচ্ছে, তা লিখ্‌তে গেলে একখানি বই হয়—কোটি কোটি বই লিখ্‌তে হবে তা জানেন বোধ হয়। ইতিহাসের পাতা উল্‌টে যান, দেখ্‌তে পাবেন কয়েকটী বড়লোকের কীর্ত্তি, কিন্তু ছোট যারা তারা কত দিয়ে ধূলোয় মিশে গেছে, তার হিসেব কেউ রাখে নি। এদেশের ত্যাগ জিনিষটা মজ্জাগত, কাউকে এ মন্ত্রে দীক্ষিত কর্‌তে হয় না, এ স্বাভাবিক। না, ওদেশের সঙ্গে এদেশের তুলনা করা চলে না, চল্‌তে পারে না।"

সে উঠিয়া গেল।

জীবনে বিকাশের মত অনেক লোকের সংশ্রবে তাহাকে আসিতে হইয়াছে, একদিন এই সংশ্রব তাহাকে যথেষ্ট আনন্দ দিয়াছিল, আজ দিতেছে মর্ম্মান্তিক বেদনাজ্বালা।

আজ ইন্দিরা তাহাকে বেদনা দিয়া গিয়াছে, নিজের পানে তাকাইয়া সে আজ দেখিতে পাইয়াছে কোথা হইতে কোথায় সে আজ নামিয়া আসিয়াছে, আর একপা অগ্রসর হইলে সে একেবারে অতল অন্ধকারে নিমগ্ন হইবে সেখানে আলোর ক্ষীণতম রশ্মিটুকু পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পায় না।

বিছানার উপর শুইয়া পড়িতে দৃষ্টি পড়িল, সাম্‌নে দেয়ালে নরেন্দনারায়ণের বৃহৎ তৈল চিত্রখানির পানে। স্বামীকে সে ভালো করিতে পারে নাই ইহা সত্য এবং এই সত্য সে অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়াছে, চাপাদিয়া রাখিয়া নিজকে সতী নামে পরিচিতা করিতে সে চায় নাই। তাহার মধ্যে সেই ছিদ্রটুকু পাইয়া বিকাশের মত কত জনই না তাহার কাছে আসিয়াছে।

স্বামীকে সে ভাল বাসিতে পারে নাই কিন্তু শ্রদ্ধা কি এতটুকু ও দিতে পারে নাই ? তাহার স্বামী যদি অন্য পুরুষের মত হইতেন—?

তিনি অপরাজিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এইমাত্র তাঁহার অপরাধ, কোনদিন তো স্বামীর দাবী লইয়া তিনি দাঁড়ান নাই। তিনি তাহাকে নিজে খরচ দিয়া পড়াইয়াছেন, সে যখন গ্রামে আসিয়াছে তিনি কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় সে বোর্ডিংয়ে থাকিয়াছে, কোন দিন তিনি স্ত্রীকে নিজের কাছে তো ডাকেন নাই, অথচ তাঁহার ডাকার অধিকার ছিল।

তিনি মহানুভব নহেন কি ?

তাহার সকল অভাব দূর করিয়াছেন, তাহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন, এমন কি মরণের সময় তাঁহার প্রচুর সম্পত্তি তাহাকেই দান করিয়া গিয়াছেন।

এই সৌভাগ্যের জন্য—কাই, সে তো কোন দিন এতটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নাই।

চিরদিন সে তাঁহাকে শত্রু বলিয়াই জানিয়াছে। যখনই স্বামীর কথা মনে হইয়াছে, সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে; সে মনে করিয়াছে—সে তো এই অসীম ঐশ্বর্য্য চায় নাই; সে দরিদ্র স্বামীর পত্নী হইয়া জীবন কাটাইয়া যাইবার কল্পনাই করিয়াছিল। সম্ভবত হইত যদি দেশের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ তাহার পাণিপার্থী না হইতেন।

জীবনে পূজার সময় বহিয়া গিয়াছে যখন তাহা সে জানিতেও পারে নাই, পূজা তাহার হয় নাই। যে ফুল পূজার জন্য ফুটিয়াছিল তাহা আজ ঝরিয়া গিয়াছে, রহিয়া গিয়াছে সে যে ফুটিয়াছিল সেই বেদনাময় স্মৃতি।

অপরাজিতা দুই হাত যোড় করিয়া ললাটে রাখিল, আজ প্রথম তোমায় প্রণাম করছি,—দেবতা বলে নয়,—স্বামী বলেও নয়, আমার উপকারী বন্ধু বলে। পথ চল্‌তে কোন দিনই আমায় পাশে নিতে চাও নি, তার জন্যে আর আমার মনে এতটুকু দুঃখ নেই কারণ তুমি ডাক্‌লেও আমি যেতুম না—যেতে পারতুম না, তোমার প্রাপ্য দাবী এড়াতে আমায় মৃত্যুর হাতে জীবনটাকে ডালি দিতে হতো। তুমি আমার পরে সে সদয় ব্যবহার করেছ, তার জন্যে বাস্তবিকই আজ তোমায় আমার শ্রদ্ধাভক্তি অর্ঘ্য দান করছি, তোমায় প্রণাম করছি।"

(২৩)

আজ শুভ্রতার বিবাহ,

জাঁক জমক এতটুকু নাই, কোনক্রমে পাত্রস্থ করা মাত্র। দয়াময়ী পাড়ার পাঁচটী সধবা মেয়েকে মাত্র নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, ইহারাই বিবাহের মাঙ্গলিক আচরণ করিবে।

কলের পুতুলের মত শুভ্রতা চলিতেছিল, যে যাহা বলিতেছিল বিনা আপত্তিতে তাহাই করিয়া যাইতেছিল, একটী দ্বিরুক্তি সে করে নাই।

খুসী হইয়া দয়াময়ী বলিলেন, "না, মেয়েটী বেশ ঠাণ্ডা প্রকৃতির, এতটা লেখাপড়া শিখেও আজকাল মেয়েদের মত উদ্ধত নয়। আমাদের পাড়াগাঁয়ের লোকেরা মেয়েমানুষের লেখাপড়া করার নাম শুনলে আতঙ্কে ওঠে, যেন ওরা লেখাপড়া শিখ্‌লেই জাতজন্ম গেল। তা হয় ও বাছা, অনেক সময় তাই হয়ও বটে। আমি তো শুভ্রা ছাড়া আর কোন মেয়েকে এমন বাধ্য হতে দেখি নি, এ কথা হাজার মুখে বল্‌ব।

সন্ধ্যার পরই কন্যা বর পুরোহিত নাপিত ও দুচার জন বরযাত্র সহ আসিয়া পৌঁছাইলেন। বাড়ীতে কেবল উলুধ্বনি হইল, কয়েকবার শাঁখ বাজিল, রতিনাথবাবুর বাড়ীতে যে সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েটী আসিয়াছে, আজ তাহার বিবাহ হইতেছে।

সম্প্রদানের সময় শুভ্রতার হাতখানা নগেন্দ্রনাথের হাতের উপর রাখিতে সে চমকাইয়া উঠিল,—এত ঠাণ্ডা মানুষের হাত হয় ?

শুভ্রতা ঠিক সেই সময়টীতে হাতখানা একবার টানিয়া লইতে গিয়াছিল তাহার সমস্ত দেহখানা একবার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

সে পতিতা মায়ের মেয়ে, কিছুদিন আগে হইতে এই সরল সত্য তাহার অন্তরটাকে কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছিল ; সে দিন দিন বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল ; এই জীবন্ত সত্য সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না, কতবার তাহার মুখে এ কথা আসিয়া আবার ফিরিয়া গিয়াছে, মায়ের কলঙ্ক সে মুখে আনিতে পারে নাই।

নিজের মুক্তির পথ তাহার ছিল না বলিয়াই সে অরুণকে মুক্তি দিতে চায়। এতকাল অরুণ যে তাহার ভার বহন করিয়া আসিয়াছে. এই তার পরম সৌভাগ্য।

আজই সে অরুণের একখানা পত্র পাইয়াছে, অরুণ লিখিয়াছে, তাহার আসিবার ইচ্ছা ছিল, হঠাৎ কয়েকটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ তাহার উপর আসিয়া পড়ায় সে আসিতে পারিল না। সে শীঘ্রই দেশে আসিয়া শুভ্রতাকে একবার দেখিয়া যাইবে। সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছে, শুভ্রতার জীবন যেন শুভ্রতাতেই পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহার হাতের দীপ যেন নির্জ্জন আলোই বিকীর্ণ করিয়া দেয় ইত্যাদি।

রতিনাথবাবু কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিবাহের পর বাসর ঘর,—সেখানেই বাসর বর ও বধূ ছাড়া সে ঘরে আর কেহই ছিল না,—কেবল নিয়ম রক্ষা মাত্র একপাশে জড়ভাবে বসিয়া শুভ্রতা। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে তাহার দুইটী চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল। মনে পড়িতেছিল ; তাহার কুমারীজীবনের কথা। বোর্ডিংয়ের সামনেই যে বাড়ীটা ছিল, তাহাতে থাকিত দেবব্রত। ধনীর সন্তান, পড়াশুনা করিত, অথচ বিলাসিতা যতটা থাকা সম্ভব ততটা তাহার ছিল না। সে নাকি অরুণের পরিচিত, অরুণকে মামা বলিয়া ডাকিত, প্রায়ই সে অরুণের সহিত বোর্ডিংয়ে আসিত, কখনও কখনও অরুণ না আসিতে পারিলে দেবব্রতকে পাঠাইত।

কবে যে শুভ্রতার কুমারীহৃদয়ে এই সুপুরুষ তরুণ ছেলেটী নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল তাহা শুভ্রতা অনেককাল নিজেই জানিতে পারে নাই, জানিতে পারিলে তখন যখন দেবব্রত সম্মানের সহিত ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একদিন হাসিমুখে তাহাকে সংবাদ দিয়া গেল সে এলাহাবাদে চাকরী পাইয়াছে, এবং দুই এক দিনের মধ্যেই সেখানে চলিয়া যাইতেছে, সম্ভব শুভ্রতার সহিত তাহার আর এখন দেখা হইবে না। তবে যখনই সে বাংলায় আসিবে শুভ্রতাকে দেখিয়া যাইবে ইহা নিশ্চিত।

সেইদিন প্রথম শুভ্রতা বুঝিতে পারিয়াছিল যে দেবব্রতকে সে ভালোবাসে।

সেই দেখা, তাহার পর এত কালের মধ্যে আর তাহার সঙ্গে দেখা হয় নাই। কিছুদিন আগে অরুণের পত্রে শুভ্রতার বর্ত্তমান ঠিকানা পাইয়া সে একখানি পত্র দিয়াছিল হয়তো মাস খানেকের মধ্যে সে সাত দিনের জন্য বাংলায় আসিবে, তখন শুভ্রতার সহিত দেখা হইবে।

সে আসিবে, হয় তো দেখাও হইবে, তখন সে শুভ্রতার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবে। সে আসিয়া দেখিবে শুভ্রতা কুমারী নহে, তাহার সিঁথায় উজ্জ্বল সিন্দুর জ্বলিতেছে; সে এক গৃহস্থ গৃহের বঁধু, স্বামীর স্ত্রী, রন্ধন করে, স্বামীকে সযত্নে আহার করাইয়া প্রসাদ পায়, সংসার।

হাঁ, ইহাই তাহার ভবিষ্যৎ; কিন্তু যদি কোন মুহূর্ত্তে তাহার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়া যায়—

সাধের ঘর এক নিমেষে ভাঙ্গিয়া পড়িবে, প্রাসাদ ধূলায় মিশাইয়া যাইবে,

ভাবিতে চোখের জল শুকাইয়া যায়। অদূরে তাহার স্বামী নগেন্দ্রনাথ স্থূলাকায় লোকটী পরম নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইতেছে, তাহার নাসিকা গর্জ্জনে সমস্ত ঘর শব্দায়িত।

ওই শুভ্রতার স্বামী, উহারই সংসারে শুভ্রতা হইবে গৃহিণী। মাসিক ত্রিশ টাকা বেতন হইতে গুছাইয়া সংসার চালাইতে হইবে, আবার ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ও করিতে হইবে।

ভগবানের নির্দ্দয় পরিহাস, কিন্তু শুভ্রতা সবই মানিয়া লইবে; ভগবানের অসীম দান বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইবে, কিন্তু যদি তাহার জন্মকাহিনী প্রকাশিত হয়—

হঠাৎ নগেন্দ্রনাথের নাসিকা গর্জ্জন থামিয়া গেল, পাশ ফিরিয়া শুইতে গিয়া সে অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল, শুভ্রতা তখনও সেই একভাবে বসিয়া আছে।

বিস্মিতকণ্ঠে সে বলিল, "তুমি এখনও বসে রয়েছ যে, শুয়ে পড় নি? আবার কাল সকালেই রওনা হতে হবে; সারাদিন কষ্ট সয়ে বাসায় পৌঁছবে সে রাত্রে, পরশু সকালেই কাজে লাগতে হবে, দেরী করা চলবে না। এই বেলা একটু ঘুমিয়ে নাও, কাল আর ঘুম হবে না।

শুভ্রতা নড়িল না যেমন বসিয়াছিল তেমনই বসিয়া রহিল। নগেন্দ্রনাথ খানিক তাহার পানে তাকাইয়া থাকিয়া আবার চোক মুদিল, দু তিন মিনিটের মধ্যে আবার তাহার সুগভীর নাসিকা গর্জ্জন শোনা গেল।

ভোরের আলো যখন পৃথিবীর মুখে চুম্বন রেখা আঁকিয়াছিল, তখনও নগেন্দ্রনাথ ঘুমাইতেছে।

অঞ্চলের গ্রন্থি খুলিয়া ফেলিয়া শুভ্রতা ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

পূর্ব্বাকাশ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিতেছে পাখীরা জাগিয়াছে, কুলায় এখনও ত্যাগ করে নাই। কেবল একটা দোয়েল কুলায় ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং সামনের একটা আমগাছের সরু ডালে নাচিয়া নাচিয়া শীষ দিতেছে।

সামনে পল্লীপথ পথিকত্যক্ত, এখনও গ্রামে কেহ জাগে নাই, পথে কাহারও চরণ-রেখা অঙ্কিত হয় নাই।

শুভ্রতা উজ্জ্বল পূর্ব্বাকাশের পানে তাকাইয়া দুইটী হাত কপালে ঠেকাইল,—

দেবতা আজিকার এ দান যাহা তুমি দিয়াছ তাহা সে মাথা পাতিয়া লইল। নিজের সত্ত্বা সে যেন ভুলিয়া যাইতে পারে তুমি কেবল সেই আশীর্ব্বাদ কর। সে সেখানকার সব দুঃখ সব কষ্ট মাথা পাতিয়া লইবে, কেবল হে দেবতা, হে অসীম করুণাময়, তাহার জন্মকাহিনী যেন গোপন থাকে ; সে সব, হারাইয়া সব দিয়া কেবল এইটুকু লইবার প্রার্থনাই করে।

দয়াময়ী কখন উঠিয়া ঘাটে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া শুভ্রতাকে চুপ করিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "ওকি শুভা, গাঁটছড়ার চাদর বুঝি খুলে রেখে এসেছ ? ওমা, একি অকল্যাণ গো গাঁটছড়া বুঝি খুলতে আছে ? লেখাপড়া তো শিখেছ বাছা, এ টুকু জ্ঞান হয় নি, এ পর্য্যন্ত কোথাও দেখ ও নি ?"

শুভ্রতা নির্ব্বাকে কেবল তাকাইয়াই রহিল, একটী কথাও বলিল না।

বিদায়ের সময়ও সে নির্ব্বাকে বিদায় লইল, প্রণাম করিতে হয় বলিয়াই প্রণাম করিল।

গরুর গাড়ীর দরজা চাপিয়া বসিল নগেন্দ্রনাথ। সারাপথ তাহার মুখে কথা ফুরায় না ; পিছনে উপবিষ্টা অবগুণ্ঠনবতী শুভ্রতার পানে মাঝে মাঝে সে তাকাইয়াছিল, এক একবারে মনটা দমিয়া পড়িতেছিল।

কি জানি, শুভ্রতা তাহাকে স্বামীরূপে মানিয়া লইবে কি না। সে নিজে শিক্ষিত নয়, অথচ তাহার স্ত্রী অতখানি লেখাপড়া শিখিয়াছে, মনে করিতে আনন্দ যেমন হয়, ভয়ও তেমনি করে।

ভরসা এইটুকু হিন্দুর ঘরের মেয়ে, স্বামী নিরেট মূর্খ হোক, বদমাইস হোক, স্ত্রীর নিকট সে দেবতা। সেকালের অনেক মেয়ে অনেক মূর্খকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ঔদ্ধত্য কোনদিনই তাঁহারা প্রকাশ হইতে দেন নাই। নগেন্দ্রনাথ এই একটী কথা ভাবিয়া তবুও কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছিল।

২৪

ইছামতী নদীর তীরে নগেন্দ্রনাথের বাসা বাড়ী।

দুইখানি মাত্র ঘর। বারান্দার একটা দিক বেড়া দিয়া ঘেরা, সেখানে রন্ধন হয়। উপরে খড়ের চাল, বেড়ার গায়ে মাটি দিয়া লেপা দেয়াল, গোটা দুই চারটা জানালাও ইহার মধ্যে আছে, একটী নদীর দিকে পড়ে।

নগেন্দ্রনাথ এক ব্যবসায়ীর আড়তে চাকরী করে, মাসিক ত্রিশ টাকায় একরকমে দিনটা কাটিয়া যায়, কারণ বাহুল্যতা এ সংসার-যাত্রার মধ্যে একটুও ছিল না।

পথেই সে নববধূকে পরিচয় দিয়াছিল সংসারে আছেন তাহার এক বিধবা দিদি, যশোহর জেলার এক পল্লীগ্রামে তাঁহার বাড়ী, নগেন্দ্রনাথ অনেক বলিয়া কহিয়া কয়টা দিনের জন্য তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে আনিয়াছে।

নগেন্দ্রনাথের দিদি তাহারই অনুরূপ ; হাত ধরিয়া তিনি নূতন বউকে নামাইয়া লইলেন। বিস্ময়ে তিনি কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, বাপ রে,—এত বড় মেয়ে এতদিন কি করিয়া ইহাকে ঘরে রাখিয়াছিল ?

মুখ ফুটিয়াই তিনি কথাটা বলিয়া ফেলিলেন. "হ্যাঁরা, এত বড় মেয়ে,—তোর যে মাথা সমান হয়ে উঠেছে নগা, বে'তে পাক দিলে কি করে ?"

শুভ্রতার শুভ্র-মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে মুখ নত করিল।

নগেন্দ্রনাথ বাঁকাচোখে একবার স্ত্রীর পানে তাকাইয়া বলিল, "সহরে মেয়েরা লেখাপড়া শেখে কিনা, তারা বড় না হলে তাদের বিয়ে হয় না। এ কি তোমরা গোপালনগর পেয়েছ যে পাঁচ সাত বছরেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে ?"

নূতন বউয়ের বরণ হইল না, দুধ-আলতার পাথরে সে দাঁড়াইল না, কেহ একটা উলু দিল না। শাঁকটাও বাজাইল না। এ যেন শুভ্রতার চিরকালের ঘর, সে যেন কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিল তাক্তুঘরে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

বউকে দিদির হাতে সাঁপিয়া দিয়া নগেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হইল ; চুপি চুপি বলিয়া দিল, "ওকে যেন যাতা বলোনা দিদি, বউ আর সকলের মত নয়—ভারি লেখাপড়া জানে, ইংরিজিতে কথা বল্‌তে পারে। সহুরে মেয়ে ওরা তোমার গোপালনগরের প্যান্‌পেনে নোলকপরা মেয়ে নয়, মনে রেখো।"

দিদি মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "জানিরে জানি, তোকে আর বউয়ের হয়ে অত বল্‌তে হবে না। ভারি তো লেখাপড়া জানা মেয়ে,—ভারি তো বউরে। সব ঢিট্‌ হয়ে যাবে এখানে দু'পাঁচ দিন থাকলে, ইংরিজি চুলোয় দিতে হবে দেখে নিস্‌।"

আপনা আপনিই বলিলেন, "বাবা, বিয়ে করে আন্‌তে আন্‌তেই এই, এখনও অনন্তকাল বাকি রয়েছে।"

কিন্তু যাহাকে লইয়া এত কাণ্ড সে রহিল একেবারেই উদাসীন, তাহার মন কোথায় পড়িয়া থাকে কে জানে।

সাহস করিয়া স্ত্রীর বেশী কাছে নগেন্দ্রনাথ যাইতে পারে নাই। একই গৃহে সে থাকে, কিন্তু অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে, তাহার সেই গম্ভীর নির্লিপ্ত মুখের ভাব দেখিয়া রাগও হয়, ভয়ও হয়। অথচ সে কথাবার্ত্তাও বলে, তবে অপ্রয়োজনে নয়। তাহার মুখের পানে চাহিতে নগেন্দ্রনাথ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, কাছে যাইতে সাহস হয় না।

মাসের বেতন গত মাসে দিদির হাতে নগেন্দ্রনাথ দিয়াছিল, এবার দিল স্ত্রীর সাম্‌নে।

বারাণ্ডায় বসিয়া শুভ্রতা রাত্রের তরকারী কুটিতেছিল আর কি ভাবিতেছিল তাহা সেই জানে। নগেন্দ্রনাথ তাহার পাশে টাকা রাখিয়া জানাইয়া দিল, "টাকাটা আগে তুলে রাখ।"

শুভ্রতা একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র, যেমন তরকারী কুটিতেছিল তেমনই কুটিয়া যাইতে লাগিল, উঠিবার উদ্যোগে তাহার দেখা গেল না।

তাহার অনাসক্ত ভাব দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ অস্থির হইয়া উঠিল, বলিল, "আমার এ মাসের মাইনে, ওটা আগে তোল। এখন হতে তুমিই হাতে করে এ সব খরচপত্র করবে, দিদি ও মাসে বড় বেশী খরচ করে ফেলেছে, উল্টে ধার করতে হয়েছে। এবার হতে তোমার সংসারের ভার তোমার হাতেই নিতে হবে জেনো।"

বলিয়া সে পরম খুসি মনে হাসিতে লাগিল।

রুদ্ধকণ্ঠে শুভ্রতা বলিল, "না, ও টাকা দিদির হাতেই থাকবে, আমি নিজে খরচ করতে পারব না।"

যেন অবাক্ হইয়া গিয়া নগেন্দ্রনাথ বলিল, "সে কি, তোমার সংসার—"

বঁটিখানা কাত করিয়া রাখিয়া শুভ্রতা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "বরাবর যার হাতে সংসার খরচ দেওয়া হচ্ছে, তার হাতে দেওয়াই আমি ভাল বলে মনে করি।"

ধীরে ধীরে সে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

নগেন্দ্রনাথ খানিক তাহার পানে তাকাইয়া রহিল, সে রাগ করিবে না দুঃখ করিবে তাহাই ভাবিয়া পায় না। তথাপি এই ভাবেই দিন চলে। কোনও বৈচিত্র্য নাই এই জীবন যাপনের সবই একঘেয়ে।

শুভ্রতা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিতে পায়, ইছামতীতে জেলেরা মাছ ধরে, রাত্রিও তাহাদের নৌকায় ঠকাঠক শব্দ শোনা যায়। পালতোলা, ভারবাহী বা যাত্রীবাহী নৌকাগুলি হেলিয়া দুলিয়া চলে। পাশের পুলটার উপর দিয়া কত লোক, কত গাড়ী যাওয়া আসা করে, কত লোক জলে সাঁতার কাটে, ডুব দেয়।

ওপারে গাছওয়ালা নদীর জলে ছায়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া থাকে; বাতাসে পাতা দোলে শুধু পাতা ঝরিয়া পড়ে ও দাঁড়িয়া দাঁড় টানিতে টানিতে ভাটিয়াল স্বরে গান গায়।

আকাশে কালো মেঘ সাজিয়া আসে, নদীর জল তাহার ছায়ায় আ ও কালো দেখায়। চাঁদ ওঠে, তারা ভাসে, নদীর কালো জলে তাহার ছায়া পড়ে।

দেখিয়া দেখিয়া দিনের পরে দিন যায়।

নিজের পানে তাকাইয়া শুভ্রতার হাসি পায়।

এ দিনের ছবি সে স্বপ্নে ও মনে আঁকে নাই; তাহার ভবিষ্যৎ ছিল বড় উজ্জ্বল, কল্পনার তুলিতে রঙ্গে রঙ্গিন।

তাহার স্বপ্ন টুটিয়া গিয়াছে,—আজ সে এই অপরিচয় স্থানে বন্দিনী, বাহিরের ওই মুক্ত স্থান তাহার জন্য নয়। আজ সে শুভ্রা নয়, আজ সে গৃহস্থ ঘরের সামান্য একটী বঁধূ।

দেবব্রতের পত্র সে আর পায় নাই, নিজেও আর দেয় নাই। অরুণের দু'খানা পত্র আসিয়াছে।

সে জানে না শুভ্রতার বিবাহ কি রকমে কাহার সহিত হইয়াছে। দয়াময়ী জানাইয়াছেন, পাত্রটী সচ্চরিত্র, উপার্জ্জনক্ষম, বেশ ভালো কাজ করে, তাহাতেই ভারি খুসি হইয়া অরুণ পত্র দিয়াছে, তুমি নিজে যখন পছন্দ করে বিয়ে করেছ শুভ্রা, আমার তাতে কোন কথাই বল্‌বার মত নেই। এখন বল্‌ছি আমার ইচ্ছা ছিল তোমায় বিয়ে না দিয়ে তোমায় লেখাপড়া শিখাবার, কিন্তু মানুষের মনের বাসনা তো পূর্ণ হয় না বোন—যাক, ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তোমার সাংসারিক জীবন সুখের হোক।

বড় দুঃখেও হাসি আসে।

শুভ্রতা হাসিয়াছিল; পত্রখানা কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া জানালাপথে উড়াইয়া দিয়াছিল, নদীর চঞ্চল বাতাস সে টুকরাগুলিকে খানিকদূর টানিয়া লইয়া গিয়া ছড়াইয়া দিয়াছে।

কিন্তু শান্তিতে থাকাও তো পোষায় না। বিবাহিতা স্ত্রী এতটা তফাতে থাকে, নাগাল পাওয়া যায় না, নগেন্দ্রনাথ এ দূরত্ব রাখিতে চায় না।

দিন দিন সে যে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে তাহা শুভ্রতা বেশ বুঝিতেছিল।

অবশেষে ওই লোকটারই বাহুবেষ্টনে তাহাকে ধরা দিতে হইবে ভাবিতেও গা শির শির করিয়া উঠে।

সে দিন অন্ধকার রাত্রে নিজের পাশে কাহার অস্তিত্ব অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে ধড় ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল। দেশালাইটা বালিসের তলায় ছিল, দপ্‌ করিয়া একটা কাঠি জ্বালিতেই দেখা গেল পার্শ্বে আর কেহ নহে, স্বয়ং নগেন্দ্রনাথ।

প্রদীপ জ্বালাইয়া শুভ্রতা উঠিয়া দাঁড়াইল, তীব্র কঠোর দৃষ্টিতে সে খানিক এই লোকটার পানে তাকাইয়া রহিল। নগেন্দ্রনাথের মধ্যে আজ সঙ্কোচের লেশমাত্র ও ছিল না। শুভ্রতা পা বাড়াইতেই নগেন্দ্রনাথ ডাকিল, "শোন, একটা কথা আছে।"

ঘৃণাপূর্ণ কণ্ঠে শুভ্রতা বলিল, 'না, একটী কথাও আমি শুন্‌তে চাইনে, আমি ওঘরে চল্‌লুম।

নগেন্দ্রনাথ পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল, কঠিন সুরে বলিল, "আমি আজ একটা কথা জান্‌তে চাই শুভ্রতা, তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী কিনা; তোমার ওপর আমার অধিকার আছে কিনা?'

শুভ্রতা দুইটী চোখে আগুণ জ্বালিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তুমি আমায় দুইটী মন্ত্র বলে গ্রহণ করেছ, তাই বলে তুমি যে আমার দেহের পরে অধিকার স্থাপন করবে এ আমি সহ্য করতে পারব না। তোমার ঘরে এসেছি—কাজ করব, তুমি আমায় খেতে পরতে দেবে, এইমাত্র তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক।

স্থূলবুদ্ধি স্থূলদেহ নগেন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া শুধু হাঁপাইতে লাগিল।

শুভ্রতা কঠিন ভাবে বলিল, "পথ ছেড়ে দাও"। নগেন্দ্রনাথ নিঃশব্দে সরিয়া যাইতে শুভ্রতা বাহিরে চলিয়া গেল।

শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদখানা তখনও আকাশের গায়ে জাগিয়া আছে, তাহার শুভ্র আলো সমস্ত

পৃথিবীর গায়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নদীর ওপারে কোথা হতে নাম না জানা একটা পাখী সেই গভীর রাত্রে কি গান গাহিতেছিল কে জানে।

শুভ্রতা বারিন্দার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। চাঁদের আলোর উজ্জ্বল আকাশের পানে চাহিতে চাহিতে কখন তাহার চোখ ছাপাইয়া জলধারা ঝরিয়া পড়িল।

আজ প্রথম তাহার মনে হইল, কেন সে বিদ্রোহ করিল না, কেন সে সমাজের শাসন মানিয়া লইল? সে তো সমাজের কেহই নয়, সমাজ কি তাহাও সে কোন দিন জানে নাই। কেন সে স্কুলে দিদিদের দ্বারস্থা হইল না, কেন সে অরুণকে জানায় নাই সে বিবাহ করিবে না, সে পড়িবে?

অরুণদা তো এ ভাবে তাহাকে মুক্তি দিতে চায় নাই, অরুণদা ও যে তাহার জন্মের পানে তাকাইয়া তাহাকে পড়াইবে ঠিক করিয়াছিল। জীবনে তাহার মুক্তি আর সম্ভব হইবে না, সে এমন ফাঁদে জড়াইয়া পড়িয়াছে, সে ফাঁদ হইতে আর কেহই তাহাকে মুক্তি দিতে পারিবে না।

"মাগো—এমনি করেই আমার জীবনটাকে ব্যর্থ করে দিয়েছ তুমি, আমার সারা জীবনই এর জের টেনে চল্‌তে হবে—?"

দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

২৫

পোস্টম্যান আসিয়া খামেমোড়া যে পত্রখানা নগেন্দ্রনাথের হাতে দিয়া গেল সেখানা খুলিয়া পড়িয়া সে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল।

পত্র লিখিয়াছেন দয়াময়ী।

তিনি লিখিয়াছেন, অরুণ যে এমন করিয়া সকল দিক দিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবে তাহা তিনি স্বপ্নে ও ভাবেন নাই। যে দিন সে শুভ্রতাকে লইয়া তাঁহার দরজায় দাঁড়াইয়াছিল, সেদিন তিনি যদি বিশেষ করিয়া খোঁজ লইতেন, তাহা হইলে এ সর্ব্বনাশ হইত না, তাঁহার পিতৃকুল নরকে যাইত না। তাঁহার জাতিধর্ম্ম তো গিয়াছে, তাছাড়া বেশ্যার কন্যার সহিত নিজের একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ পর্য্যন্ত দিয়াছেন। তিনি জানিতে পারিয়াছেন, শুভ্রতার মা জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের রক্ষিতা ছিল, বিবাহিতা পত্নী ছিল না।

"শুভা—"

শুভা ভাতের ফেন ঝরাইতেছিল, বিধবা দিদি সেদিনে কি কি তরকারী হইবে তাহারই হিসাব করিতে ছিলেন।

নগেন্দ্রনাথের আহ্বান শুনিয়া শুভা মুখ ফিরাইল। পত্রখানা তাহার কাছে ফেলিয়া দিয়া নগেন্দ্রনাথ বলিল, "কাজ থাক্, আগে পত্রখানা পড়।"

শুভ্রতা পত্রের পানে ফিরিয়াও চাহিল না। চেঁচাইয়া উঠিয়া নগেন্দ্রনাথ বলিল, "আমার মাথার দিব্য শুভা, আগে পত্রখানা পড়, ভাতের হাঁড়ি ছেড়ে দাও। ভাত সুদ্ধ ও হাঁড়ি যখন ইছামতিতেই ফেল্‌তে হবে, ওর মমতা করা মিছে।"

পুরীর মিউজিয়াম

শ্রীসুলতিকা পাল বি, এ,

ভক্ত-বৃন্দের নিকট পুরীর জগন্নাথ যেরূপ প্রিয়, স্বাস্থ্যকামীদের নিকট পুরীর সমুদ্র যেরূপ প্রিয় আশাকরি সুধীবৃন্দের নিকট পুরীর মিউজিয়াম ও তদনুরূপ আদরণীয় হইবে। পুরীর সংগ্রহাগারটী ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে গঠিত হইয়াছে বলিয়া অধিকতম আনন্দ দান করে।

এই মিউজিয়ামের স্বত্বাধিকারী কনট্রাক্টার ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ রায়। পুরীতে যত গুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান আছে, প্রায় প্রত্যেকটীর সহিত ইনি জড়িত। ইঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় অনুকরণযোগ্য। এই মিউজিয়ামের বিষয় বলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ইহার প্রতিষ্ঠাতার সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ হইবে বলিয়া বোধ হয়।

ধীরেনবাবু বহরমপুর কলেজের ছাত্র। ছাত্রাবস্থায় চক্ষুরোগে আক্রান্ত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাঁহার নিকট আত্মীয় ৺ রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র রায়ের নিকট তিনি ঐতিহাসিক গবেষণায় দীক্ষিত হন্। এই সকল প্রাচীন গৌরবের বস্তু সংগ্রহ করিতে বীরেনবাবুকে যে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। এই সকল আবিষ্কার করিবার সময় তাঁহাকে গভীর অরণ্যে কখন শ্বাপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, কখন সর্পের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। বিস্ময় উৎপাদনকারী এই ঘটনাবলী শ্রবণ করিলে কাল্পনিক কাহিনী বলিয়া ভ্রম হয়। যাহা হউক দ্বাদশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার ফলে এই মিউজিয়াম অধুনা উন্নতিশীল অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকে। উড়িষ্যার কৃষ্টি অতি প্রাচীন এবং ইহাতে ঐতিহাসিক উপাদানও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অনন্তবর্ম্মন্ চোড়গঙ্গ প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথের মন্দির তদীয় বংশধর নৃসিংহ বর্ম্মন্ চোড়গঙ্গের কোণারকের সূর্য্যমন্দির ভুবনেশ্বরের মন্দির, অজন্তা ও ইলোরার ন্যায় বিশ্ব-বিখ্যাত হইয়াছে, ও শিল্পানুরাগীগণের
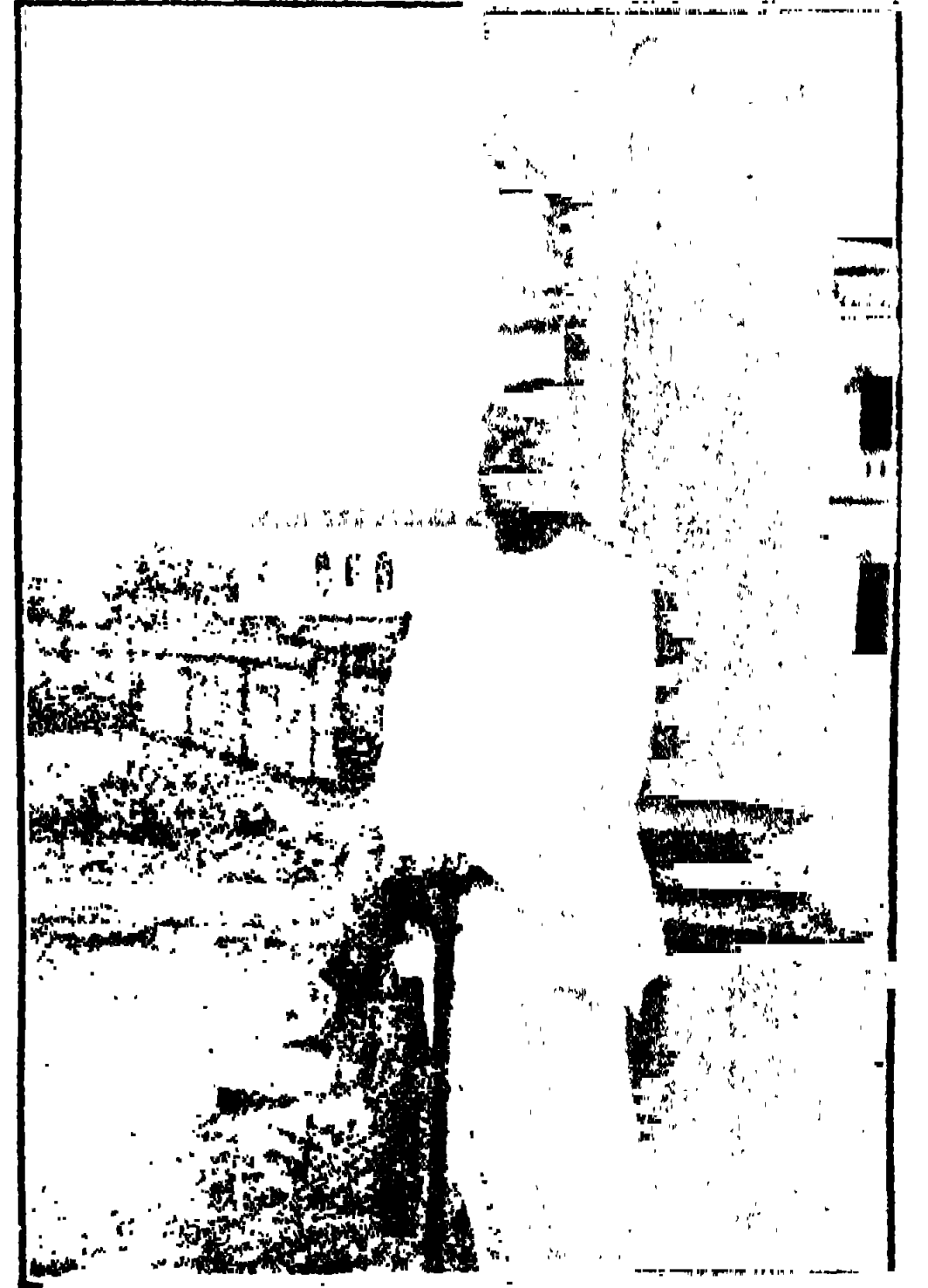
মিউজিয়মের দ্বারে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়

তীর্থস্থলে পরিণত হইয়াছে। এই সকল মন্দিরের কারুকার্য্য স্থাপত্যশিল্পের চূড়ান্ত নিদর্শন। ইহারই কিয়দংশ বীরেনবাবু জনসাধারণের সম্মুখে ধরিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ইনি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, আশা করি আমাদের দেশের উৎসাহী যুবকগণ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া উড়িষ্যার কৃষ্টির পুনরাবির্ভাবের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হইবেন।

এই সংগ্রহাগারটী বীরেনবাবুর নিজ বাসভবনেই স্থাপিত হইয়াছে। চিত্রে এই বাসভবনের সম্মুখ দৃশ্য প্রদত্ত হইল। প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, ও তৎপার্শ্বে বৃহৎ বুদ্ধ মূর্ত্তিটী অবস্থিত। মিউজিয়ামে প্রথম প্রবেশ করিলে প্রস্তর-

মিউজিয়ামদ্বারস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি

যুগল নারীমূর্ত্তি

নির্ম্মিত নানাবিধ মূর্ত্তি নয়নপথে পতিত হয়, সকল মূর্ত্তি বিভিন্ন যুগে প্রস্তুত হইয়াছে। ও ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তরে নির্ম্মিত। প্রাচীন যুগের পদার্থ সকলের একত্র সমাবেশ আমাদের হৃদয় হরণ করে। এই সকল মূর্ত্তি নিচয়ের মধ্যে বৌদ্ধযুগের ধ্যানরত বুদ্ধমূর্ত্তি অধিক পরিলক্ষিত হয়। মিউজিয়ামের দ্বারে যে বুদ্ধমূর্ত্তি সমাসীন উহাই দর্শকের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করে। প্রস্তর-নির্ম্মিত নৃত্য-পরায়ণা যুগল নারীমূর্ত্তি মনোমুগ্ধকর। প্রস্তরে খোদিত নৌবিহারের দৃশ্যও পরম রমণীয়। প্রস্তরে খোদিত অসংখ্য হস্তী ও উল্লেখযোগ্য। পরবর্ত্তী শৈব ও বৈষ্ণব যুগের দেবতাগণ যথা কৃষ্ণ, নারায়ণ, গণেশ প্রভৃতির মূর্ত্তি ও দর্শনযোগ্য।

প্রস্তর-নির্ম্মিত, জগন্নাথের মন্দির ও ভুবনেশ্বর মন্দির শোভা পাইতেছে। প্রস্তর ব্যতীত গজদন্ত নির্ম্মিত, পিত্তলনির্ম্মিত স্বর্ণের কারুকার্য্য শোভিত মূর্ত্তি ও বিদ্যমান। বৌদ্ধ যুগের বহু পূর্ব্বে, এমন কি পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন অক্ষরের প্রচলন ছিল না, চিত্রের সাহায্যে লিখনের কার্য্য সম্পন্ন হইত, সেই সকল অতীত যুগের চিত্রলিপি সংগৃহীত হইয়া এই স্থানে বিরাজ করিতেছে। এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তি উড়িষ্যার কণারক, যাজপুর, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি বহু স্থান হইতে আনীত হইয়াছে।
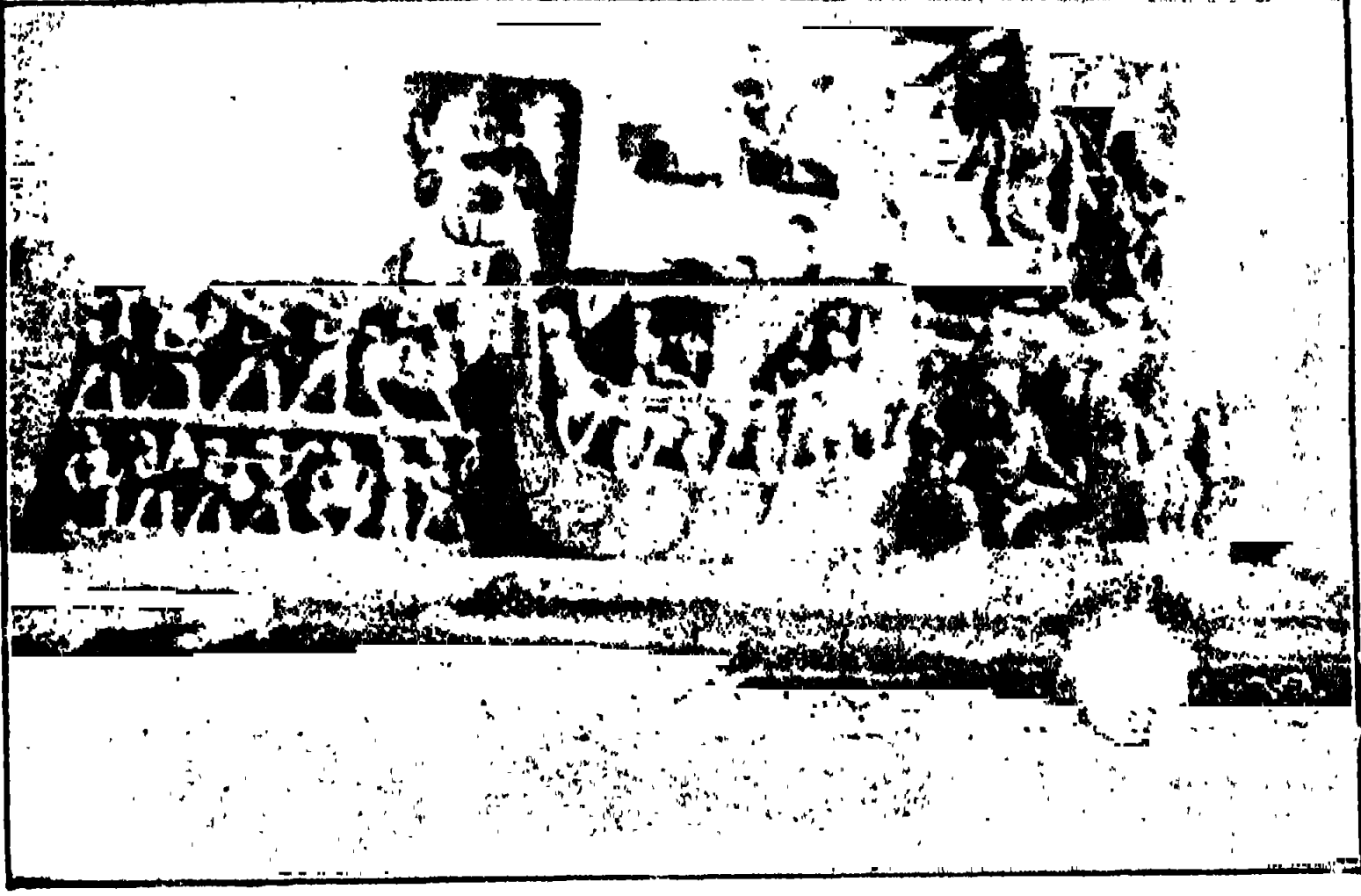
প্রস্তরখোদিত নৌবিহার দৃশ্য

তৎপরে প্রাচীন মুদ্রা বিভাগে বিভিন্ন যুগের মুদ্রা বহুপরিমাণে সংগৃহীত হইয়া দর্শকের কৌতুহল উৎদ্রেক করিতেছে। বৌদ্ধযুগের পার্শিভাষায় লিখিত তাম্র মুদ্রা সকল কাচাধারে রক্ষিত হইয়া দর্শনীয় বস্তুরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কুশান্, পার্শিয়ান্, মৌর্য্য প্রভৃতি হিন্দু বংশের রাজগণের নামাঙ্কিত মুদ্রা ও বহু পরিমাণে আছে। পরবর্ত্তী যুগের, মুসলমান আমলের, আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান প্রভৃতি মোগল সম্রাটের নাম খোদিত বহুসংখ্যক মুদ্রা দেখা যায়। কতক গুলি মুদ্রাতে উর্দ্দু ভাষায় নাম লিখিত আছে। কয়েকটী মুদ্রাতে 'তাজমহল' অঙ্কিত দেখা যায়। কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বহু বস্তু আছে, তন্মধ্যে ভুবনেশ্বরের মন্দির ও অরুণ স্তম্ভ ও কৃষ্ণহস্তী বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য, এগুলি শিল্পী দ্বারা নির্ম্মিত। ভূগর্ভস্থ কক্ষে চিত্রিত কাষ্ঠ-ফলকও স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। এগুলির কারু-কার্য্য অতি সূক্ষ্ম ও নিপুণ:।

কাষ্ঠনির্ম্মিত ভুবেনশ্বর মন্দির

প্রাচীন পুঁথির ও অপূর্ব্ব সমাবেশ দৃষ্ট হয়। শান্তি-নিকেতনে সাধারণ পাঠাগারে বহু প্রাচীন পুঁথি দেখিয়াছি সত্য, কিন্তু এই সকল প্রাচীন পুঁথির বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলি ব্যক্তি বিশেষের উদ্যমে ও আগ্রহে আনীত হইয়াছে। বাংলা, উড়িয়া, পালি ভাষায় লিখিত, বল্কল, ভূর্জ্জ পত্র তাল-পত্রের পুঁথি গুলি দেখিলে মন প্রফুল্ল হয়। বহুচিত্র-শোভিত তালপত্রের একখানি রামায়ণ দর্শনীয় বস্তু। একখানি তালপত্রে দ্বারসংযুক্ত জগন্নাথের মন্দির অঙ্কিত। বস্তুতঃ এই সকল দ্রব্য পরম প্রীতিপ্রদ।

বিভিন্ন দেবমূর্ত্তি

এতদ্ব্যতীত প্রাচীন কালের যুদ্ধের উপকরণ ও যথা ঢাল, তরবারি, বর্ম্ম প্রভৃতি সজ্জিত আছে। চিত্রিত চীনা মাটির তৈজস পত্র ও সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

এস্থানে মিউজিয়াম-স্থিত সমস্ত দ্রব্যের নামোল্লেখ করিতে হইলে প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং সংক্ষেপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এই প্রদর্শনী তিনটী বা চারিটী প্রকোষ্ঠেই পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে, কিন্তু ইহার পশ্চাতে কত সহিষ্ণুতা, নীরব সাধনা লুক্কায়িত আছে তাহা চিন্তা করিলে আমাদের মস্তক শ্রদ্ধায় অবনত হয়।

প্রাচীন মুদ্রা

নারীর উন্নতি সম্বন্ধে দু' চারটী কথা
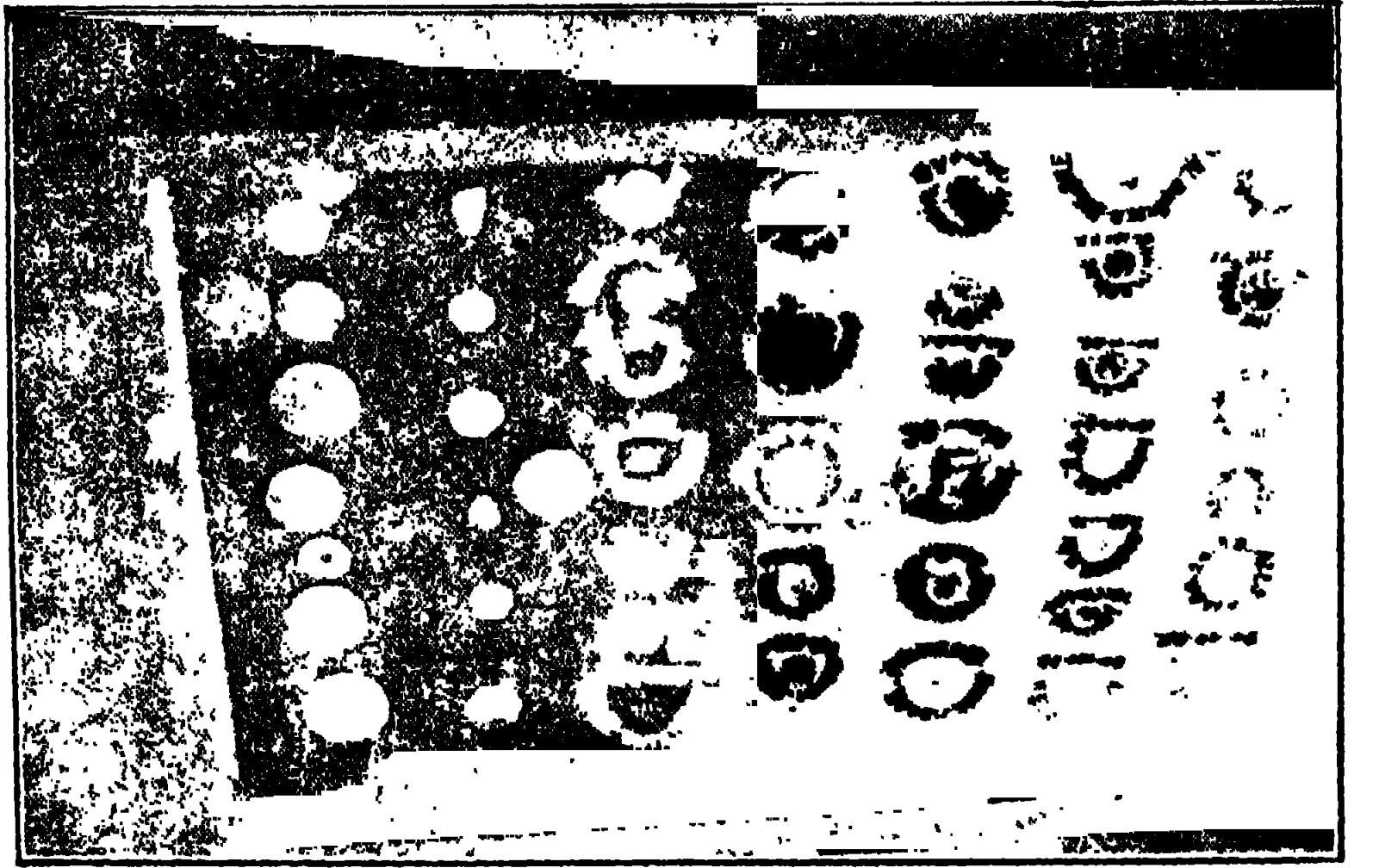
শ্রীনিস্তারিণী দেবী সরস্বতী

মাননীয়া ভদ্র মহিলাগণ !

আজ আমার সুপ্রভাত। আমি যে এমন সুযোগে আসিয়া আপনাদের সহিত শুভ মিলনের অধিকারী হইব ইহা স্বপ্নাতীত। এই প্রকার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমি পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম।

এ সকলি আপনাদেরই অনুগ্রহের ফল। আমি নিতান্ত নগণ্যা, আমি বিদূষী বা জ্ঞানবতী নহি। আমার বিদ্যাবুদ্ধি অতি সামান্য। আমার সকল ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করিবেন। আপনারা যে আমাকে এমন আসন দিয়াছেন তজ্জন্য শত শত ধন্যবাদ দিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি, আমি আপনাদিগকে কোন নূতন তথ্য শুনাইব এমন আশা ও নাই। সেই থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়। তবে এই সাহিত্য-সম্মিলনীর উপর আমার চিরদিন শ্রদ্ধা আছে, এবং বিশেষ প্রীতি। ঐ স্থানেই যে এতগুলি ভগ্নিগণ একত্রে একাসনে বাণীপূজায় যোগদানে সমর্থ হইয়াছেন। অদ্য এই গোরক্ষপুর-সাহিত্যপ্রাঙ্গণে অন্তঃপুরিকাগণ শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি দিয়া এই ভূমিকে নবভাবে পবিত্র করিলেন। এই গোরক্ষপুরের সন্নিকটে লুম্বনী বনে, মহাত্মা বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। সে আজ যুগ যুগান্তরের কথা, এই সুদীর্ঘ ক্ষণের মধ্যে কত রাজার উত্থান পতন হইল, কত ধর্ম্মাবতারের আবির্ভাব তিরোভাব ঘটিল, সে সকল কথা ইতিহাস নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া ভারত গৌরব রক্ষা করিতেছে। আজিকার এই শুভ মুহূর্ত্তে সে সকল পুণ্যশীলগণের স্মৃতিকথা আলোচনা করিয়া বঙ্গ নরনারী ধন্য হইলেন।

বহুকাল গত হইল, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, আমি এই গোরক্ষপুরে আসিয়া আমার প্রিয় পরিজন মধ্যে মাসাধিক কাল বাস করিয়া গিয়াছি। সেই অতীতের দিনের সহিত আজ কত প্রভেদ! সময়ের পরিবর্ত্তনে মানবের কত রূপান্তর ঘটে। আমার প্রাণ হর্ষ বিষাদে যুগপৎ ভাবে আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে। আমি সেই অবসরে আসিয়া একটিও বঙ্গীয় ভগিনীর বদন সন্দর্শন করিতে সক্ষম হই নাই। আজ তাঁহাদের পরবর্ত্তীগণেরা অন্তঃপুরে রুদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া পরস্পরের হৃদয়ের আকর্ষণে এখানে শোভমান হইয়াছেন। কি সুন্দর দৃশ্য! ইহা যুগ-মাহাত্ম্য। আমাদের অর্থাৎ মানবযুগের প্রারম্ভ হইতে, বিবর্ত্তন বাদের প্রভাবে উন্নতি অবনতির দ্বন্দ্ব চলিতেছে। সুখ লাভ ও দুঃখনিবারণ, বা নিকৃষ্ট অবস্থা হইতে উৎকৃষ্ট পথের সন্ধান, অথবা পাপ ক্ষালনপূর্ব্বক, পুণ্য অর্জ্জন করিয়া মুক্তির লাভ

করা, ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস মানবের চিরন্তন স্বভাব দেখা যায়। ইতিহাস ও পুরাণাদিতে সকল অতীত কাহিনী ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক মানব জীবনে কালের চিত্রে ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শিত হয়। দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য প্রভৃতি নিত্য নূতন অধিকার দ্বারা জগৎকে চমৎকৃত ও মুগ্ধ করিতেছে। তথাপি জ্ঞান বিস্তীর্ণ ও মানব জীবন সঙ্কীর্ণ। জ্ঞানের সীমা নাই। এই অপরিসীম জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে মানবশিক্ষা দ্বারা যাহার যেমন বুদ্ধি ও ক্ষমতা সেই পরিমাণে জ্ঞান আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে। শিক্ষাই স্কুল। মনুষ্য জন্মিয়াই শিখিতে আরম্ভ করে এবং শেষকাল পর্য্যন্ত শিক্ষা করে। সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর, এই জগতে এরূপ ভাবে প্রচুর জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার নৈসর্গিক শোভায় পরিপূর্ণ করিয়াছেন যে, আমরা সেই সমুদায়ের তথ্য নির্দ্ধারণ কিম্বা কোন বিষয়ের বিশেষ মহিমা সম্যকভাবে অনুভব করিতে পারি না। তন্মধ্যে যেটুক আয়ত্তাধীন সে সকলি শিক্ষা দ্বারায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর সেই শিক্ষা, বিদ্যাসাপেক্ষ। বিদ্যা না শিখিলে কোন মতেই জ্ঞান লাভের উপায় থাকে না। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, "বিদ্যাহীনাঃ ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ।" সেই বিদ্যাদ্বারা উত্তম জ্ঞান শিক্ষা মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। একথা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। কারণ ছোট বড় নর নারী সকলেই ইহার আবশ্যকতা অন্তরের সহিত অনুভব করেন।

অতীতের সহিত বর্ত্তমানে তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, মানবের চিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতির প্রয়াসী হইয়া উঠিতেছে। যদিও বহু প্রাচীন যুগ হইতে, প্রতীচ্য মহাদেশ অপেক্ষা, ভারতবর্ষ জ্ঞানে ধর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে গরীয়ান। ইহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। এবং সেই প্রাচীন কালে ভারতে পুরুষের সহিত রমণীগণের শিক্ষা সম্বন্ধে কোন বৈষম্য ছিলনা। বরং সমতাই ছিল। বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা, জ্ঞান বিকাশ হইয়া বুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত, ও রুচি বিকাশ করে।

অতএব উহা নরনারীর সমভাবেই প্রাপ্য। শুধু একের লাভে সুপ্রতুল ঘটেনা।

আর্য্যনারীগণের চরিত্র ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। তাঁহাদের বিদ্যা ও ধর্ম্মের খ্যাতি এখনও পরিম্লান হয় নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ হিন্দুযুগের অবসান হইল, বিধর্ম্মী যুগের প্রাদুর্ভাবেই ভারত নারীর ভাগ্যাকাশে অন্ধ তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ভারতনারী অন্তঃপুরে নিরক্ষরা অবস্থায় আবদ্ধা হইয়া, সীমাবদ্ধ ব্যবহারিক সাংসারিক জ্ঞান ছাড়া, আর কোন প্রকার শিক্ষা দ্বারা জ্ঞান আয়ত্ত করিবার সন্ধান পাইলেন না। সে সময় সীতা সাবিত্রীর যুগের অবসান হইয়াছে। কিন্তু এজগত চক্রবৎ পরিবর্ত্তিতে। চিরদিন এক নিয়মে চলিতেছে না। পতনের পর, উত্থান হইল। ইংরাজের রাজত্ব আরম্ভ হইল, নূতন আইন কানুন প্রচলন হইয়া দেশের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন ঘটিল। শিক্ষার ও প্রয়োজন বোধ হওয়াতে, ছেলেদের পরে মেয়েদের জন্য, শ্রীরামপুরে খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণ দ্বারায়, জেনানা মিশন নামে, অন্তঃপুর শিক্ষাদ্বারা মেয়েদের বাঙ্গলা লেখাপড়ার হাতে খড়ি আরম্ভ হইল। সেই সঙ্গে বালিকা বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পর অন্যান্য স্থানে আরও কিছু স্কুল স্থাপিত

হইয়াছিল কিন্তু ১৮৪৯ সালে কলিকাতায় জে, ই, ডি (J. E. D Bethune) বেথুন বহু চেষ্টায় হিন্দু ফিমেল স্কুল নামে (Hindu Female School) একটি মেয়েদের স্কুল স্থাপিত করেন। এই স্কুলই কালক্রমে কলেজে পরিণত হইয়াছে। স্ত্রীগণের উচ্চশিক্ষার পথ সেই সময় হইতে উন্মুক্ত হইল। কিন্তু প্রথমে বেথুন সাহেবকে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের স্কুলে শিক্ষা দিবার জন্য আনিতে অনেক বেগ পাইতে হয়। পরে দেখিতে দেখিতে প্রায় আশী বিরাশী (৮০.৮২) বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশ ও অন্যান্য স্থানে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার হইয়াছে। উচ্চশিক্ষায় নারীগণের উৎসাহ ও দেখা যাইতেছে। আজ আমরা সেই শিক্ষার কল্যাণে নিকট এবং দূর দেশ হইতে আসিয়া এখানে একত্রিত হইয়াছি। পরস্পরের ভাবধারা লইয়া আদান প্রদান করা, এই সম্মিলনের যোজনা। নরনারীর সমবেত সাহিত্য সেবার ফলে দেশে জ্ঞান বৃদ্ধির আশায় আমাদের হৃদয়ে পুলক সঞ্চার করে তুলিতেছে কিন্তু একটু প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করিলে দেখিতে পাই যে, এই শিক্ষা যে ভাবে অগ্রসর হইতেছে উহার গতি ও দ্রুত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমানে নারীগণের এই সকল বিষয় কেবল পুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া জড়বৎ থাকিলে চলিবে না। তাহাদের যেখানে যতটা অভাব তৎসমুদয়ের নিবারণ নিজেদের শক্তি দ্বারাই সমীচীন। ভারতবর্ষের (৩৫) পঁয়ত্রিশ কোটি নরনারীর মধ্যে সংখ্যা করিলে, কত অল্পসংখ্যক উচ্চশিক্ষিতা রমণী পাওয়া যায়। তাহার পর অর্দ্ধ-শিক্ষিতা বা স্বল্প-শিক্ষিতা এবং অশিক্ষিতার অংশ সমধিক। যাঁহারা শিক্ষিতা বা উচ্চশিক্ষিতা তাঁহাদের সাহায্যেই শিক্ষার প্রসারতা হওয়া উচিত। শিল্প সম্বন্ধেও উহাই প্রযুজ্য। যদিও আজ কাল ঘরে ঘরে মেয়েরা শিল্পের প্রাচুর্য্য জাগাইয়াছেন। প্রায়ই গৃহস্থ সংসারে ছেলেদের জামা ইত্যাদি ও সেলাই কাঠ ছাট করিয়া থাকেন। এ সকল সত্ত্বেও কেন কোন কোন স্থলে দেখা ও শুনা যায়, যে বর্ত্তমানের নারী শিক্ষার প্রতি তাহারা, "এখনকার মেয়ে" বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন। তাঁহার উপর আরও স্বার্থপরতা, শ্রমবিমুখতা, অলসতা, বিলাসিতা লজ্জাহীনতা ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিতা করিয়া থাকেন। অথচ বর্ষে বর্ষে নবীনারা University ইউনিভারসিটির আশীর্ব্বাদী জয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন।

আমার মনে হয় উক্ত মন্তব্যের জন্য রমণীগণকে দায়ী হইতে হবে। যেন কোন স্থানে অসন্তোষের কারণ জন্মাইবার আশঙ্কা হইয়াছে। শিক্ষার স্রোত কোন মুখী? ভারত দরিদ্র দেশ হইয়া পড়িয়াছে, এখন তদুপযোগী শিক্ষাই মেয়েদের হইবে উপকারী। নারী যতদূর সম্ভব বিলাসিতা বর্জ্জিত ও নারীত্ব বজায় রাখিবেন। উহা ভুলিয়া গেলে চলিবেনা। আর বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া শ্রমশীলতা অর্জ্জন করিতে হইবে। তিনি যতই কেন জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হউন না। তাঁহার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য গৃহ-সংসার লইয়া, তাহার পর বাহিরের কাজ। সুকন্যা, সুমাতা ও সুগৃহিণী হইতে হইবেই। প্রথমে শিক্ষার পরীক্ষা সেই খানেই। ঈশ্বরের নারীজাতি সৃজনের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। উহাদের দ্বারায় যেন জগতে অশেষ কল্যাণ সাধন হয়। নারী একথা

স্মরণ রাখিবেন, দেশ কাল পাত্র অনুসারে সকলকেই চলিতে হয় অতএব বর্ত্তমান সময়ের সহিত রমণীকেও চলিতেই হইবে। পুরুষের সহিত নারীর ধর্ম্ম ও কর্ম্ম যোগ না করিলে সংসারে সুমঙ্গল আসেনা। সর্ব্বত্র আচার ব্যবহারে উপযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষিতা নারী নিজের ও পরের কল্যাণকামী হইবেন। তাঁহার জ্ঞানের প্রভাবে ঘরে বাহিরে উজ্জ্বল করিবেন। তিনি স্বদেশ, বিদেশ, সকল স্থানেই শিক্ষার লক্ষ্য রাখিবেন ও দেশ কালের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নীর ত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষীর গ্রহণ করিবেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ কহেন, শিক্ষা বহু প্রকার. তন্মধ্যে প্রধান এই তিন প্রকার। শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক। শরীরের প্রতি যত্ন অত্যাবশ্যক এটার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখার কথা কেননা বঙ্গনারী শিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা যেমন হউন সকলেই উহাতে উদাসীন দেখা যায়, স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। অতএব স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অগ্রাহ্য অথবা অত্যাচারী হইলে কেহ কোন বিষয়ই কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব নহে। দ্বিতীয় মানসিক শিক্ষা মনের সহিত শরীরের অতি নিকট সম্বন্ধ এবং মন সূক্ষ্ম। মনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করাই মনের শিক্ষা ও বুদ্ধির প্রখরতা জন্মাইলে ঈঙ্গিত বস্তু অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়। ইহার পর সকল শিক্ষার সার আধ্যাত্মিক শিক্ষা। অর্থাৎ ধর্ম্ম শিক্ষা। ধন, জন, যৌবন সকল সুখ সম্পদ অপেক্ষা ধর্ম্মই প্রধান। ধর্ম্মহীন জীবন অসার। ধর্ম্ম নর নারী উভয়ের পক্ষে সমভাবে আচরনীয়। নারী ধর্ম্মশীলা না হইলে সংসারে মঙ্গল সমীরণ বহেনা। মানবের স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়াই সংসার রচিত, ইহাঁরাই পরিবার নামে অভিহিত। প্রথম শিক্ষা মানবের পরিবার হইতে জন্মে। এই পারিবারিক বিদ্যালয় শিক্ষার কেন্দ্র। পিতামাতা ভ্রাতা ভগ্নির মধ্যে যে শিক্ষা হয় উহাই মজ্জাগত শিক্ষা, সুশিক্ষা যা কুশিক্ষা ঐ আবেষ্টনার মধ্যে প্রথম জীবনে একবার যে ছাপ পড়ে উহাই চিরকালের জন্য বীজ বপন করে। উহাই চিরসম্বল। দ্বিতীয় সমাজ—সমাজ সংসারের নেতা স্বরূপ যাহারা যে সমাজে বাস করেন উহার উন্নতি অবনতিতেই তাহারা পরিচালিত হন। এজন্য সেই সমাজের সংস্কার ও আবশ্যক হইয়া পড়ে। সমাজ শাসন করে, পালন করে। ইহার পর পুস্তক। সদ্‌গ্রন্থ আর একটি উপদান। সুরুচিপূর্ণ পুস্তক পাঠে মনোবৃত্তি উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কুরুচিপূর্ণ পুস্তকে নিকৃস্টবৃত্তি জাগিয়া উঠে। একবার কুঅভ্যাস ধরিলে সহজে নিষ্কৃতি নাই। অপর আধ্যাত্মিক শিক্ষা যাহা মানব জীবনের সার আধ্যাত্মিক শিক্ষা ধনজনযৌবন সকল সম্পদের সার ধর্ম্মশিক্ষা। অধুনা শিক্ষোন্নতিযুগে উহার অভাব পরিলক্ষিত হইয়া ব্যথিত করে। বলিতে ব্যথা লাগে যে এখনকার তরুণগণ যেমন কতক কার্য্যগতিকে এবং কিছু পুরাতনের প্রতি অনেচ্ছা ঘটায় তাহাদের যেমন শ্রদ্ধা লোপ পাইল, উচ্চশিক্ষিতা নারীগণ ও তদনুসরণে ধাবিত হইলেন। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সামঞ্জস্য ও সুসংস্কার পূর্ব্বক নীর ত্যাগ করত ক্ষীর গ্রহণ একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রাচ্যপ্রতীচ্যর মধ্য হইতে সারাংশ গ্রহণ করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষার সুফল তাহাকেই বলা যায় যদ্দ্বারা হৃদয়ে সাধুভাব উদ্দীপ্ত করে জ্ঞানালোক

যাঁহার দৃষ্টি বিশ্বনিয়ন্তার দিকে ধাবিত হয় ও যিনি বিবেক দ্বারা বিচার করিয়া আত্মদর্শনে সফলকাম হয়েন।

প্রাচীন কালের নারীগণের বিদ্যাশিক্ষা না হইলেও তাহারা ধর্ম্মপ্রাণা ছিলেন। সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক প্রাতঃকালের প্রথম কাজ ইষ্টদেবের পূজা। বালিকারা মাতার সঙ্গে পূজার ঘর পরিমার্জ্জন করিত। ফুলচন্দনে পুষ্প সজ্জিত দেবসেবার অনুষ্ঠানে সেই ক্ষুদ্র মনে ধর্ম্মাচরণের ছাপ পড়িত। এখন মেয়েরা জানেন না যে তাহাদের পিতামহী, মাতামহী বা মাতারা কী পূজা করেন অথবা কুল প্রথার আচার অনুষ্ঠান বা কি? একজন মনীষী বলিয়াছেন যাহাদের বুদ্ধি জড়ভাবাপন্ন জ্ঞানালোক দ্বারা চিন্তা বা বস্তুবিষয়ক শক্তি বিকাশিত হয় নাই গভীররূপে প্রকৃতি পুঞ্জের তত্ত্বালোচনা, করা অভ্যাস নাই, তাহারা এই সকল ধর্ম্মনিয়মকে সত্য বলিয়া প্রতীতি করিতে পারেন। ধর্ম্মে বিশ্বাস না করিলে মানব সকল প্রকার দুষ্ক্রিয়া করিতে পারে।

যে সংসার ধর্ম্মঅধিষ্ঠিত হয় তথায় ভক্তি ভালবাসা একতা, দয়া মায়া আপনি আসিয়া প্রবাহিত হয়। সংসার কল্যাণময়ী নারী, তিনি ধর্ম্মহীন জীবন যাপন করিলে আর কাহার দ্বারায় আশা? উচ্চশিক্ষার জ্ঞান যাহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা মুষ্টিমেয় হইলেও তাহাদের এখন ভাবিবার সময় আসিয়াছে যে আমরা কি করিতেছি অথবা কি করা উচিত। পাশ্চাত্য দেশ জলধি পার হইতে বিদুষীগণ আসিয়া ভারতকন্যাদের মূর্খতা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া কত অর্থ সামর্থ্য ব্যয় করিয়াছেন। বহুদূরে যাইতে হইবে না এই বারানসীস্থ সেন্টাল হিন্দু কলেজ ও বালিকা বিদ্যালয় এবং থিয়সফিকেল Women's College উইমেন'স কলেজ স্কুল তাহার জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন ডাক্তার এনি বেশান্তের নাম প্রায় সকল শিক্ষিত নর নারীর অবিদিত নাই। সম্প্রতি তিনি লোকান্তরিত। সে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্না বাগ্মী রমণীর পাণ্ডিত্য ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত তাঁহার পরাবিদ্যার গভীর জ্ঞান ও গবেষণাযুক্ত বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, এই বারানসী এখন যে স্থলে সমুদয় ইউপির মধ্যে নারীশিক্ষার কেন্দ্রস্থল হইয়াছে, উহা সেই পুণ্যবতী পণ্ডিতা ডাক্তার এনিবেশান্তেরই কীর্ত্তিধ্বজা স্বরূপ।

ইহাঁর সহিত আরও দুটি ব্রহ্মচারিণী ইয়োরোপীয়ন মহিলার নামোল্লেখ না করিলে অন্যায় হয়। মিস এ্যারেণ্ডল ও মিস পামর। তাহারা একান্ত যত্ন ও পরিশ্রম ও অর্থ সাহায্য দ্বারায় উল্লিখিত স্কুল ও কলেজগুলির বীজ বপন বারি সিঞ্চন করিয়া নবীন বৃক্ষ উদ্গত করিয়া গিয়াছেন। যাহা এখন ফলফুলে সুশোভিত তাঁহাদের অনুকরণীয় শুধু ভাষা শিক্ষা উদ্দেশ্য ছিলনা। স্বভাব চরিত্র গঠন যাহা সুশিক্ষার বাঞ্ছনীয় উহাই আদর্শভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বালিকাগণের শিক্ষাব্যতীত অনাথা বিধবাগণকে বৃত্তি দান করিয়া শিক্ষিত করিতেন। ইহাছাড়া অবরোধের গণ্ডী রক্ষা করিয়া সম্ভ্রান্ত ঘরের বহু রমণীগণের সহিত মেলা মেশা সমিতি গঠন ইত্যাদি

নির্ব্বিবাদে করিয়াছেন, পর্দ্দা প্রথা রহিত আবশ্যক জানিয়া জানিয়া ও সেজন্য কোন সমাজের বিশৃঙ্খলতা ঘটিতে দেন নাই। অথচ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানে কাশীতে অবরোধ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অবরোধ ভঙ্গ হওয়ার মধ্যে দু'একটি অন্তরায় আছে। প্রায় স্থলে দেখা যায় যে যুবতী ও কিশোরীরা অবাধে পুরুষের সহিত মেলা মেশা করিতেছে এবং সর্ব্বত্র নিঃসঙ্কোচে গমনাগমন করিতে অভ্যস্ত, কিন্তু বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়ারা এখনও প্রাচীন প্রথা রক্ষা করিতেছেন। ইহা অতি অশোভন এবং অসঙ্গত বলা যায়।

সম্ভ্রান্ত ভদ্র এবং চরিত্রবান পুরুষগণের সহিত নিজের সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া মেলা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বর্ত্তমানে সকল রমণীগণের পক্ষেই কিন্তু সর্ব্বত্রই তাঁহার নিজের ধর্ম্ম ধরিয়া থাকিবেন।

আর এক কথা রমণীগণের বিচারের সময় উপস্থিত এখন, ছেলে মেয়ের সহশিক্ষা। শিক্ষা বিস্তারের উপায় ইহা নিঃসন্দেহ কিন্তু দশ কিম্বা বার বৎসরের ছেলেমেয়ে নিম্নশিক্ষা হইতে পারে। আমাদের নৈতিক শিক্ষার জ্ঞান জীবনের প্রথমকাল হইতে দেওয়া উচিত। পাশ্চাত্যদেশের সহিত এ বিষয়ে সামঞ্জস্য হইতে পারেনা ইহার বিশেষ কারণ আছে।

এই সঙ্গে দুটি কথা আরও বলিয়া শেষ করিব। বর্ত্তমান ভারতে যে আবার প্রাচীন প্রথা জাগরিত হইয়াছে, নারীগণের সঙ্গীতশিক্ষা ইহা পরম সুখকরী নিশ্চয় এই সঙ্গীত দ্বারায় রোগী ও শোকার্ত্তের প্রাণে সান্ত্বনা আরাম দেয়। সঙ্গীতবিদ্যা অতি চিত্তবিনোদনকারী সেই সঙ্গে নৃত্যের ও প্রচলন দেখা যায়। ইহা নিজ পরিবারের বাহিরে হওয়া উচিত নহে। তরুণী ও যুবতীগণ অর্দ্ধঅঙ্গ অনাচ্ছাদিতভাবে সজ্জিত হইয়া অঙ্গভঙ্গী করা বাহিরে অপরের সম্মুখে লজ্জার বিষয় কি নহে। একথা সকল মাতা ভগিনীর বিবেচ্য।

গোরক্ষপুর-সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত।

দুই-নারী

শ্রীআশালতা দেবী

১৪

পরিমিত ক্লান্তিতে মানুষের সহজেই ঘুম আসে। গাঢ় ঘুম। কিন্তু ক্লান্তির একটা সীমা পেরিয়ে গেলে, যখন হয়ত বিশ্রামের সবচেয়ে প্রয়োজন তখনই বিশ্রাম হয়ে উঠে দুর্লভ। সুজাতারও আজ তাই হয়েচে। সে যথেষ্ট ক্লান্ত। কিন্তু ওর মানসিক আলোড়ন ক্লান্তির সেই সীমাকে ছাড়িয়ে গেচে।

তাই এত রাত্রিতে শয্যা আশ্রয় করেও ওর কিছুতেই ঘুম আসচেনা। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে ভাবের দিকে তার তন্দ্রার মত এসেছে। কিন্তু ওইটুকু লঘুঘুমও স্বপ্নমথিত। স্বপ্নের প্রথমের দিকে দেখ্‌লেঃ—সরোজ ওর খোলাচুলের রাশি নাড়াচাড়া করতে করতে বল্‌চে '—সু, ছিঃ, এ তুমি কী কর্‌লে বলোত? আমাদের কত সখের থিওরি—, সেই বাঁশি আর তার রন্ধ্রপথ। ভরপুর মিলনের মাঝে মুক্তির ছিদ্রের অবকাশপথে—আকাশের সঙ্গীত শোনা। আমাদের কতোদিনের হাসিতামাসা, মান-অভিমান দিব্যি দিলেশ—দিয়ে গাঁথা··· এই সব বড় বড় আইডিয়ালিজমকে তুমি টান্ মেরে ধূলোয় শুইয়ে দিলে। এত অভিমান কেন হোল রাণি? অবশেষে আমার হার হোল সেই মিঃ ফরেস্টারের কাছে। সেও ত এবার আমাকে হেসে বলবে, 'Roy, you also marry only to divorce!' এরচেয়ে পরাজয় আর কি আছে বলত?'

সুজাতা অভিমানের মাত্রা আরও চড়িয়ে তাকে কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছে, ইতিমধ্যে কোথাও কিছু নেই, কোন সংলগ্নতা কোন পূর্ব্বাপরতা নেই, হঠাৎ সরোজ ভর্ত্তি মাতাল হয়ে এসেচে। ওর মুখের গন্ধে সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য!

সুজাতার বাঁ-হাত থেকে একটা আংটি, টান্ মেরে খুলে নিতে নিতে ও বলচে—ঃ 'দিয়ে দাও আমার আংটি তোমাকে পরতে হবে না। এখনও যে বড় পরে রয়েচে, লজ্জা করচে না? ন্যাকামী কর্‌তে লজ্জা হচ্ছে না?······কী বলচ?······গুরুতর কারণ ঘটেচে।······গুরুতর কারণটা কী······শুন্‌তে পাইনে? কী বললে আমি মদ খাই! বাঃ, এমন মজার কথা! যেন বড় একটা সর্ব্বনেশে কাজ করেচি। মাইডিয়ার, মদ খায়না কে? আচ্ছা, থাক্, থাক আর খুলে দিতে হবে না। সুন্দর আঙ্গুলে হীরের আংটিখানা মানায়। মাইডিয়ার ওই আংটি পরা সুন্দর হাতে করে আমায় এক গ্লাস মদ ঢেলে দিতে পার? পারোনা তাইতো আমাকে ঘুরতে হয় অন্য মেয়ের কাছে। নিজের হাতে মদ ঢেলে খেতে মজা কই?···আহা সব মেয়েই

যেন তোমার মত হীরের আংটি পরে…অবশ্য যদি তোমার মতই সুন্দর আঙুলই হয়। আর কিনবার পয়সা থাকে। Of course পয়সা থাকা চাই। আচ্ছা—না থাকলেও ক্ষতি নেই। আমাকে খুসী রেখে একটু আবদার করে ধরলেই কিনে দেব।……কী বলচ?…এর চেয়েও শক্ত কারণ আছে।

Oh Shame! এত বিদুষী হয়েও তোমার মুখে এই কথা! ওকাজ করে না কে? প্রেয়সী, শুধু বসে বসে জানালাতে জালিকেটে ফুলের লতা উঠাও। বাইরের জগতটাকে বলি দুচোখ দিয়ে তাকিয়ে কখনো দেখবে কী? আমি যা করচি তা করেনা কে? But have I not practised contraception althrough, my dear!

যে দিন তোমাতে আমাতে মিলে ডোরা রাসেলের একটা বই পড়ছিলুম মনে নেই তোমার? রাসেল সাহেবের স্ত্রী বড় সত্যি কথা লিখেচেন: যে স্বামী বছরে বছরে স্ত্রীকে সন্তান উপহার দিয়ে রুগ্ন অকর্ম্মণ্য করে দেয়, তার চাইতে যে স্বামীতে কালেভদ্রে এক-আধবার অন্যমেয়ের আঁচল ধরে marital happinessএর স্বাদ মেটায় তাকে সহ্য করা ঢের সোজা! উঠেছিল কোন প্রসঙ্গ থেকে মনে আছে, ডিয়ার?

রাসেল আর তার স্ত্রীতে মিলে আলোচনা করছিলেন, ডাইভোর্সের আইনকানুনের হাস্যাস্পদতা নিয়ে যে, স্বামীতে একটা-আধটা বিবাহচ্যুত সুখাস্বাদ করেচে, তার বিরুদ্ধেই আনা যায় মামলা, আর যে করলে না ব্যবহার contraception method, করে দিলে স্ত্রীর যৌবনকে বিকৃত বিপর্য্যস্ত, জীবনকে আনন্দহীন তার বিরুদ্ধে কেনইবা আনা যায় না, তাঁদের মতে এক-একটা পাজ্‌লিং কথা! তুমিও সুন্দরী সেদিন তাঁদের সঙ্গে গলাসেধে বলেছিলে: তাই বটে! ভারি খাঁটি কথা! কেন? কেন মডার্ণ হবার সাধ? যখন মডার্নিমের খোরাক জুগিয়ে উঠ্‌বার মত শক্তি নেই। যখন বেদনা নেবার মত সম্বল হাতে নেই, তখন কেনইবা ট্র্যাজিডির পার্ট নেওয়া! ট্র্যাজিক্ ত হতেই পার না। ট্র্যাজিডি হয়ে ওঠে মেলোড্রামা! যে কথা শক্তি-মতীর মুখে সাজে, অশক্তের মুখে তাই শোনায় হাস্যকর।

'But you must admit dear, আমি তোমার কথা অক্ষরে পালন করেছি। ভেবে দেখ, তোমার একুশ বছরের যৌবনকে আমি অক্ষত সুন্দর করে রেখেচি। রাতদিন তোমার আঁচল ধরে ঘুরে বেড়িয়ে—এই দু'বছরে আমি কি দিতে পারতুমনা তোমাকে দু'টি সন্তান উপহার? আর পারতে তখন আমার নামে, এই দোষের জন্যে ডাইভোর্সের মামলা আনতে? উঃ, কী বোকা তুমি! 'and you only contradict your self. But that's not only your fault. "frailty, thy name is woman!" আহা খাসা কবি ছিল বটে সেক্সপিয়র! বলি বিদুষী সুন্দরী, সেক্সপীয়র পড়েচ ত; বিতৃষ্ণায় ঘৃণায় ঘুমের স্বপ্নের মধ্যেও সুজাতার গা শিউরে উঠ্‌ল; ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখনো ভোর হয়নি। পায়ের

কাছের শালটা টেনে নিয়ে, ভালো করে গায়ে দিয়ে, পাতলা অন্ধকারের দিকে ঠাণ্ডা হাওয়ায় চোখমেলে চাইতেই ওর নীরেনের কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়তেই একটি স্নিগ্ধ মিষ্টতায় মন তার ভরল। ওর সদ্য ঘুম ভেঙ্গে ওঠা সকাল বেলাটি সেই মাধুর্য্যে নিচেষ্ট হয়ে যেতে চাইলে।

ভোরেরদিকে সুজাতা আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন ঘুম ভাঙ্গল বেশ বেলা হয়েচে। গত রাত্রির অনিদ্রার এই বারে তার সুদসমেত ঘুচিয়ে নিয়েছে। প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। স্নানের ঘরের উদ্দেশ্যে যেতে যেতে পথিমধ্যে বেয়ারা এসে বললে:—'দিদিমণি একজন বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলে বাইরের ঘরে বসে রয়েচেন।'

'তুই তাঁর কার্ড আনলিনে কেন?'

এক হাতে শাড়ী তোয়ালে সাবান নিয়ে সেইখানেই বাথ্রূমের দোর গোড়ায় সুজাতা অপেক্ষা করে রইল।

বেয়ারাটা কার্ড আনতে গেচে। একটু পরে ফিরে এসে বল্লে:—'তিনি কার্ড দেননি, এই কাগজে নিজের নাম লিখে দিয়েচে।'

সুজাতা দেখলে, একটুকরো কাগজের কোণে ছোট্ট করে লেখা: 'নীরেন।'

মিনিট দশেকের মধ্যে একটু তাড়াতাড়ি স্নানসেরে বাইরের ঘরে এসে দেখলে: নীরেন কোণের দিকের একটা চেয়ারে বসে টাইম টেবিলের পাতা ওল্টাচ্ছে। সুজাতা একটা লালপাড়ের সাদা সাড়ি পরেছে। গায়ে একটা ঘন লালসিল্কের জামা। সেইমাত্র স্নানসেরে ওঠা দীর্ঘ চুলের রাশি থেকে, তখনও বিন্দু বিন্দু করে জল পরচে। কাল অনেক রাত্রি জাগার কালে কালো ঘন পাঙ্কার তলায় চোখের কোণে ঘনতর কালো রেখা পড়েচে।

নীরেন নমস্কার করে বললে:—'বসুন। কেমন আছেন?' যেন কতোদিন পরে ওদের দু'জনের দেখা। যেন কাল রাত্রি নটা অবধি ওরা দুজনে পাশাপাশি মোটরে বসি থাকে নি। সুজাতা হেসে বললে:— 'হঠাৎ সকালে উঠতে না উঠতেই, আপনার দেখা পেলুম?'

'আপনি এখনই উঠলেন!'

'হ্যাঁ, আজ দেরী হয়েচে উঠতে। কাল অনেক রাত্রি অবধি ঘুম আসেনি। কিন্তু কাল আপনারা থিয়েটার দেখে ফিরলেন কখন? সেও ত বোধ হয় অনেক রাত্রি হয়েছে।

'কাল থিয়েটারই যাই নি।'

'বাঃ—সেই রকম কথাই শুনে এলুম না?'

'যেয়ে শুনলুম: সুধীরার শরীর হঠাৎ অসুস্থ বোধ হওয়াতে ও বাড়ী চলে গেচে। মামীমা একলা আর গেলেন না।'

সুজাতা গম্ভীর হয়ে গেল। নীরেন হঠাৎ বললে: 'কিন্তু কাল আপনি আমাকে কিছু

ভাবেন নি ত? আমার কোন ব্যবহারে অসঙ্গত কিছু করে ফেলিনি ত? সারারাত্রি এই সন্দেহ নিয়ে মনে একটুকু শান্তি পাইনে। আর তাই সকালে উঠেই আপনার কাছে এসেচি।' তবুও সুজাতা চুপ।

'উত্তর দেবেন না! আমার সঙ্গে কথা বল্‌তেও বুঝি বাধা আছে।'

'কীযে বলেন! কী এমন হয়েচে যার জন্যে মনে মনে এত উদ্বেগ পেয়েচেন? সাদাকথাকে বসে বসে ঘোরালো করাই দেখচি আপনাদের অভ্যেস।' নীরেন একদৃষ্টে ওরদিকে চেয়েরইলঃ অভিমানে আর্দ্রদৃষ্টি।

'তা'ত বলবেনই এখন দুপাঁচ কথা। এদিকে আমার সারারাত্রি ঘুম হয়নি কেবল আপনার কথাভেবে, তাজানেন? কখনো জানেন না। কিন্তু শুধু এইটুকু জবাবদিন যে আমার কালকের ব্যবহারে যদি লেশমাত্র আপনার মনে আঘাত দিয়ে থাকি……

'আঃ থামুন না।'

নীরেন থেমে ওরদিকে চাইলে। দু'মিনিট চুপ করে রইল তারপর চোখ নামিয়ে বললে 'আচ্ছা আমি চললুম। আর না থাকাই ভালো। আপনি হয়ত মনে করচেন লোকটা মেলোড্রামা সুরুকরলে। কিন্তু ক্ষমা করবেন কিনা সেটাও কী জানাতে পারতেন না?'

নীরেন উঠে দাঁড়াতেই, ওর চাদরের খুঁটটা চেপেধরে সুজাতাবল্লে; 'বসুন না। এখনও দেখচি আপনিই আমার উপরে রাগ করেচেন।'

তারপরে একটু হেসেবল্লে 'জোর করে ক্ষমাকথাটা উচ্চারণ করাবেন না কি? কিন্তু আগে বলুন আমাকে নিয়ে এত উতলা হচ্চেন কেন? আমি ভয়ানক অপয়া—তাজানেন কী? মূর্ত্তিমতী দুর্ভাগ্য; আমার সংস্পর্শে এত আসেন কেন? এতে হয়ত আপনাদের মুখেও ছায়া পড়চে। আরতা যদি হয় বাস্তবিকই সেটা আমার পক্ষে কতোদূর কষ্টের কারণ হবে বলুনত?'

'কিন্তু আমি যদি আপনার কাছে কেবল কষ্টই পাই তবুও সেটাই যে আমার কাছে অমূল্য নয়—তা জানলেন কী করে?'

কিন্তু এসব কথা এমন করে ভাব্‌তে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় নীরেনবাবু। আর আপনি নিজের কথাটাই ভাবচেন! আর সবায়ের কথা বাদে। কিন্তু তাদের—যাদের জীবন অনেকটা আপনার সঙ্গে মিশে গেচে, তাদের কথাও আপনার খেয়াল করা উচিত।'

নীরেন উঠে পড়ে দরোজার কাছে গিয়েছিল, একটু দাঁড়িয়ে ফিরে তাকিয়ে বল্‌লে 'রাতদিন আমি অন্য লোকের কথা ভাবিনে। অন্য লোক আমার কে? কেন, আমার নিজের গোটা স্বাধীন একটা সত্তা নেই নাকি? দয়া করে আর আমাকে লেক্‌চার শোনবেন না। তা শোন্‌বার জন্যে এখানে আসিনি। এসেছিলুম আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব বলে, কিন্তু দিলেনত তাড়াতাড়ি বিদায় করে। তবুও ভাবে বোধ হচ্চে বেশিক্ষণ রাগ করে থাক্‌বেন না।'

নীরেন চলে গেল। ওর আসা এবং যাওয়া দুটাই সমান আকস্মিক আর সমান ছেলেমানুষি। কিন্তু ও যেটুকু সুর রেখে গেল তারই সূত্রধরে সুজাতার নানা কথা মনে পড়তে লাগল। একজন প্রায় নিঃসম্পর্কীয় পরের কাছে ও এই মাত্র যে অস্ফুট অভিমান অসীম স্নেহের পরিচয় পেলে, তাতেই ওর সরোজের কথা বেশি করে মনে পড়ে গেল। সরোজের উপর ওর অভিমানের সমুদ্র ফেনিল হয়ে উঠল। বস্‌বার ঘর থেকে উঠে যেয়ে, নিজের নির্জ্জন ঘরের জানালার কাছে একটা চৌকি টেনে নিয়ে বস্‌তেই ওর মনের অধ্যায় গুলো আত্মবিস্মৃত হওয়ায় একটার পর একটা উড়ে চলল।

১৬

সরোজ! সরোজ! ওনামটা ও মনে মনে যতই উচ্চারণ করে, প্রবল অভিমানে ওর দুচোখ জ্বালা কর্‌তে থাকে। সরোজ, তুমি যদি অধিকাংশ স্বামীর মত আমাকে কেবল পুরোহিতের হাত থেকে নিতে তাহলে যে আমি তোমার ওপরে একটুও রাগ করতুম না। কারণ তখন নেওয়াটাই হোত ষোল আনা ফাঁকি, প্রথমথেকেই যা আগাগোড়া ফাঁকি দিয়ে আসা—তা নষ্ট হলেই বা কী যায় আসে? কিন্তু আমি ছিলুম ব্রাহ্মঘরের মেয়ে। তুমি হালফ্যাশানের হিন্দু হলেও রীতিমত ব্রাহ্ম ছিলেনা। আমার মধ্যে তুমি এমন কী দেখেছিলে সরোজ···যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জন দিলে? পুরোহিতের হাত থেকে নেওনি—নিজের বলিষ্ঠ সবল সস্নেহ দুই বাহু দিয়ে আমাকে জোর করে তোমার কাছে টেনে নিলে। কিন্তু তারপরে দু'বছরের মধ্যেই এমন কী হোল যে যাকে তুমি নিজের জোরে নিজের কাছে নিয়েছিলে, তাকে দূরে ফেলে দিলে।

সরোজ তুমি কী মনে কর, আমি এই সব বিশ্রী মোকদ্দমার আবর্ত্তে নেমেচি, তোমার সুনামকে টানমেরে প্রকাশ্যতায় লাঞ্ছিত করতে? তা যদি মনে করে থাক ভুল করেচ। আমার হাতে আর যে কোন অস্ত্র নেই। আমাকে বাদ দিয়েও তুমি সুখী, একথা যে আমি নিজের মধ্যে সহ্য করব কী করে যদি না নিজের অভিমানে বসে বসে পালিশ দিই? অন্ততঃ অভিমানকেও দৃঢ়তর করে তোমাকে না দেখাতে পারি যে তোমাকে বাদ দিয়েও আমার জীবনে কাজ আছে। হোক না সেকাজ যতই অর্থহীন! আমার এমন হয়েচে, যা কিছু দেখচি শুনচি সমস্তর থেকেই অবশেষে তোমারই কথা মনে পরচে।

ও সপ্তাহে কলকাতা থেকে ব্যারাকপুর যাবার পথে ট্রেনের আমাদের কামরায়, আরও একটী ছেলে আর মেয়ে উঠেছিল। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই মেয়েটি ওর স্বামীকে ফ্লাস্ক্‌ থেকে চা ঢেলে খেতেদিলে। রুমালটা খুলে ফেলতেই তার থেকে বাহির হোল আঙ্গুরের গুচ্ছ আর গোটা কয়েক কমলালেবু। ওরা দু'জনে যখন দুজনকে খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করচে, ওদের দুজনের যখন হাতে হাত ঠেকে যাচ্ছে, ইচ্ছে করেই আঙ্গুলগুলো যেন পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে তখন বোঝা যাচ্ছে অন্য লোকের সামনে ওরা চেষ্টা করচে যথাসাধ্য নিজেদের লুকুতে······সংবরণ করে নিতে। কিন্তু পারচেনা। পারে এমনকী ওদের সাধ্য!

সরোজ, তুমিত আমার চেয়ে কতোদূরে রয়েচ। তবুও ওদের দেখেই আমার মনে পড়ে গেল তোমার কথা। বারাকপুরে পৌছেও' সারা সকাল বেলাটা আমার কাটল ওই আবেশ নিয়েই। না দেখলুম ব্যারাকপুরের বাড়ীর গঙ্গার দৃশ্য আর বাগান। বসে বসে কেবল তোমাকেই ভাবলুম। ট্রেণের পাঁচমিনিটের দেখা সেই মেয়েটির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে, মনে তোমার হাতে আঙ্গুরের গুচ্ছ থেকে এক একটি করে ফল ছাড়িয়ে দিলুম। সেদিন রাত্রিতে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' খুলে বসেছিলুম পড়্‌ব বলে কিন্তু সেটা হাতে তুলে নিতেই অন্যমনস্ক হয়ে গেলুন। একদিন তুমি আর আমি দু'জনে মিলে এক সঙ্গে এই বইটি পড়েছিলুম। যেখানে যেখানে তোমার বিশেষ ভালো লেগেছিল সেখানে তোমার হাতের দেওয়া চিহ্ন ছিল। যেখানে রয়েচে 'যখন চন্দ্রনাথবাবুর জীবনের বাতায়ন থেকে সত্যকে দেখতে পাই, তখন ও-গনের মানে একেবারেই বদলে যায় তখন মনে হয় ; বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঁয়ায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া।

যতো দুঃখ যতো ভুল সব যে ঐ সত্যকে না পেয়ে। সেই সত্যকে জীবন ভরে না নিয়ে দিনরাত এমন করে কেমনে কাট্‌বে ? তুমি এরই পাশে পেন্সিল দিয়ে ছোট ছোট করে লিখেচ সত্যকে কখনও পাওয়া যায় কি ? তাকে কি চিরদিনই খুঁজ্‌তে হয়না ? আমি তোমার ভুলধরে বলেছিলুম, 'তোমাদের বিজ্ঞানের ফিজিক্সের সত্যকে হয়ত চিরদিনই খুঁজ্‌তে হয়···কিন্তু জীবনটাও আর আগাগোড়া বিজ্ঞানের সঙ্গে সুরমেলানো নয়। জীবনের রসের সত্যকে প্রেমের সত্যকে মানুষে যে চিরদিনই চরমরূপে বুঝে এসেচে। একটু থেকে তোমার দিকে চেয়ে বলেছিলুম, ধর আমি যেমন করে তোমাকে পেয়েচি, বলতে হবে কি এতেও সত্য ধরা পড়েনি ? প্রত্যেক দিনই আবার তাকে খুঁজে পেতে বার করতে হবে ? আমি যে জা ননে যে দিন তোমাকে পেয়েচি, সে দিনই তোমার সত্যকে পেয়েচি।' তুমি তামাসা করে আমার একটা হাত ধরে ফেলে বলেছিলে, 'অত গর্ব্ব ভালো নয়—সু। আমাকে পাওয়ার সত্যতায় তুমি এতই নির্ভরশীল। আর যদি কোন দিন তোমার মুঠো ছাড়িয়ে পালাই ? একেবারে উধাও হয়ে যাই। তখন মান্‌বে ত যে যাকে পরম সত্য বলে দু'চোখ বুজে নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলে—সেটাও মিথ্যা। কেবল প্রমাণ করতে সময় লাগে।' সেদিন আমি রাগ করে ওকথার জবাব দিইনি। আজ যদিও বাইরের লোকে বল্‌চ যে সত্যিই সেটা একটা মিথ্যাছিল, আর আমিও তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়েচ। তবুও থেকে থেকে কেমন অন্য মনস্ক হয়ে যাই। এইমাত্র— যে উষ্ণ মনোযোগ পেলুম তাতে ওঁর ওপরে খুব পবিত্র ভাবে চটে উঠতে পারলুমনা। কিন্তু ওঁর মনোযোগের আতিশয্যে আমার মনে পড়ে গেল তোমাকে। যেদিন তুমি আমার একটু খানির জন্যে ঠিক ওই রকম ব্যস্ত হয়ে উঠতে। সময় সময় তোমাকে সামলানো দায় হয়ে পড়ত। অবশেষে আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হোত, 'সরোজ তুমি কথায় কথায় মেলো ড্রামা নিয়ে অত ঠাট্টা, কিন্তু নিজের ব্যবহার খানাই যে মাঝে মঝে মেলোড্রামার চরম সীমানায় যেয়ে ঠেকে।

সে খবর পাওনা বুঝি ?' আমি জানি সরোজ, সেদিনের তুমি মরে গেচ⋯তবুও সেকথাটা সত্য বলে মেনে নিতে সমস্ত মনে, সমস্ত শরীরে টান ধরে।

১৭

সুধীরা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় সাজসজ্জা করে উগ্র বিলিতি এসেন্সের ঝাঁঝালো গন্ধে হাওয়াকে মাতিয়ে মোটর থেকে নেমেই বল্লে, 'মাসীমা— আপনি সেদিন 'ষোড়শী' থিয়েটার দেখতে যাব বলেও গেলেন না কেন ? ভারি অন্যায় কিন্তু! আমার শরীর খারাপ হয়েছিল ত কী হয়েছিল! চলুন, আজ আমরা যাব। জ্ঞানদাকে বলেই রেখেচি। সে তৈরী। ⋯ একটু শীগ্‌গীর করু⋯ বেশি দেরী হয়ে গেলে কিন্তু সুরু হয়ে যাবে।'

ওর অতিরিক্ত তাড়া হুড়ায় মাসীমা মনে মনে একটু হেসে বললেন, 'কিন্তু নীরেন ও যে বলেচে যাবে।'

সুধীরা গম্ভীর হয়ে বললে 'তাতে আমার কি ? উনি যেদিন খুসী নিজেই যেতে পারবেন। আমার জন্যে আটকাবে না। নিন ওসব বাজে কথা রেখে, চট্ করে তৈরী হয়ে আসুন।'

নীরেনের কথা আবার ওর কাছে কবে থেকে বাজে কথা হয়ে দাঁড়িয়েচে, তাত আমরা জানিনে।

মাসীমা একটু মুচকে হাসলেন। দাঁড়াও, কথাটা বার করে নিতে হচ্চে। দু'জনে মিলে নিশ্চয়ই একটা কিছু গোলমাল করেচে। মুখে মিষ্টি করে হেসে বললেন; 'এত তাড়া কেন সুধীরা। একটু বোসনা। পরশু রাত্রিতে মাথা ধরেচে বলে জিদ করে চলে গেলে, তারপর নীরেন এসে আমাকে এক চোট বকাবকি করলে। বললে আর দু'মিনিট রাখ্‌তে পারলেনা ? আমার সঙ্গে দেখা করে গেলেই তার মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত ? কেন এ বাড়ীতে কি বিছানা ছিল না ? আর ওডিকলোনের আধ ডজন শিশি ত আলমারীতে ঠাসা হয়ে রয়েচে। তার একটু ও কি কাজে লেগে যেতে পারত না ?' ঈশ্বর জানেন এতগুলো লাইন ওর মাসীমা সম্পূর্ণ বানিয়ে বললেন।

সে রাত্রিতে ফিরে এসে নীরেন সুধীরার নামোল্লেখ অবধি করেনি। বরঞ্চ থিয়েটার যাওয়ার হাত থেকে রেহাই পেয়ে সে রাত্রিতে ওর যা আনন্দ হয়েছিল, একটা খুব ভালো কবিতা লিখে ফেললেও সে রকম আনন্দ হোতনা। সে রাত্রিতে ওকে যদি থিয়েটারে যেতে হোত, তাহলেই ও মনে মনে ইংরেজী শপথ উচ্চারণ করত, যা ও কোন কালে করেনা। অর্থাৎ জীবনে হয়ত দু' তিন বারের বেশি করেনি। সেরাত্রিতে যে হঠাৎ সুধীরার শরীর খারাপ হয়েছিল, সেজন্যে ও দৈবকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলে। ......কিন্তু মাসীমা স্রেফ্ এতগুলো কথা তৈরী করে বললেন। ধন্য মেয়েদের উদ্ভাবনী শক্তি!

সুধীরা স্বচ্ছন্দে কাবার্ডের উপরে সাজানো টি সেট্‌টার দিকে চেয়ে বললে 'সেদিন-উনি উনি কখন ফিরলেন ?'

'কখন ?…তোমার যাওয়ার মিনিট পাঁচ পরেই। তোমার মোটরটা বোধহয় ল্যান্সডাউন রোডের মোড় ছাড়িয়েচে তখনই নীরেন ফিরে এল।' (আসলে নীরেন তার পুরো আধ ঘণ্টা পরে এসেছিল)।

সুধীরা ওর হাতের রিস্ট ওয়াচের দিকে চেয়ে যেন মনে মনে কী হিসেব করেছিল। অবিশ্যি খুব সংগোপনে। বাইরে থেকে তাকে শুধু একটু চিন্তাকুলা দেখাচ্চে। হিসেব করে দেখ্‌লে ; সুজাতার বাড়ীতে সোজা তাকে পৌঁছে দিয়েই চলে আসতে, ভদ্ররকমে তাকে যতটা সময় দেওয়া যায়—সুধীরা মাথাধরার ছল করে বাড়ী চলে যাবার অনেক আগেই—নীরেন তা পার হয়ে গেছিল। আরও পাঁচ মিনিট তার পরে—বরশ্চ বাড়তির ভাগ অপরাধ। তবুও যতদূর পারে গলার আওয়াজে নির্লিপ্ততার আমেজ এনে ও বল্‌লে ; 'এখনই কী হয়েচে তাতে! আমার শরীর খারাপ হয়েছিল, আমি চলে গিয়েছিলুম তারজন্যেও আবার কারোকাছে জবাবদিহি করতে হবে নাকি ? মজামন্দ নয়! তা ছাড়া পরের বাড়ীতে মাথায় ওডিকলোন নিয়ে সীন্ বাধাতে আমার মোটেও ইচ্ছে করেনা।'

পরের বাড়ী! মামীমার সামনে ও কথাটা দস্তুর মত রূঢ়। তবুও সুধীরা যেন ওই কথাটার উপরেই বেশি করে জোর দিলে। যেন ওই কথাটার তলাতেই আণ্ডারলাইন। পরের বাড়ী! মামীমা দু'বার করে মুচকে হাসলেন। পাশের ঘরে নীরেনের পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। মামীমা চট্‌করে উঠে পড়ে বললেন ; 'ওইত নীরেন এসে পড়েচে দেখচি। যদি আমাকে যেতেই হয় তবে তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মত, ওকে এক পেয়ালা চা তৈরী করে দাওত দেখি। বেয়ারা গরম জল নিয়ে যাচ্চে। আমি ততক্ষণ কাপড় বদলিয়ে আসি।'

সুধীরা শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। কাবার্ড থেকে চায়ের কেৎলী, পেয়ালা ইত্যাদি চায়ের সরঞ্জাম নামিয়ে নিয়ে এল, তেমনি গম্ভীর নিঃস্পৃহমুখে। যেন কোন রকম করে একটা অপ্রিয় কর্ত্তব্য ওকে শেষ করতেই হবে। দোরের দিকে পিছন করে, ও কাঁচের কেৎলীতে চায়ের পাতা দিয়ে গরম জল ঢালচে ; পিছন থেকে নীরেন এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। সুধীরার হাত থেকে ঝলকে একটু গরম জল ওর আঙুলে পড়ে গেল। যাক্‌গে ও কেয়ার করেনা। কাপড়ের খুঁটে করে সেই আঙুলটা একবার জড়িয়ে নিয়ে আবার খুলে দিলে। নীরেন অন্যমনস্ক হয়ে, জানালাদিয়ে দেখা যায়, সুমুখের সেই পার্কটার দিকে চেয়ে রয়েচে। একটা ঘাস ছাটার কল নিয়ে, একজন লোক ক্রমাগত এদিক ওদিক ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ওরদিক থেকে ও যেন চোক ফিরাতেই পারচেনা। একটা জিনিষ প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়, মনের নিবিড় চিন্তা বা গভীর অন্যমনস্কর সময়ে কোন ক্রিয়াশীল বস্তুর দিকে চেয়ে থাকাই সুখ। তেমনি অন্যমনস্ক হয়েই নীরেন জিজ্ঞেস করলে ; 'কেমন আছ ?' খানিকক্ষণ খাপছাড়া রকম চুপ করে থেকে ; 'সেদিন রাত্রিতে শুনেছিলুম, মাথা ধরেছিল এখন শরীর ভালো আছেত ?'

'ভালোই আছি। তোমার চায়ে ক' চামচ চিনি দেব ?'

'দু চামচই দাও।'

অভিমানে সুধীরার চামচ নাড়াবন্ধ হয়েগেল। মনে পড়ল, একদিন ওদের বাড়ীতে নীরেনের জন্যে চা তৈরী করতে করতে ওকে এই একই প্রশ্ন করেছিল, তোমার চায়ে ক'চামচ চিনি দেব?' প্রত্যুত্তরে ও হেসে ফেলে বলেছিল 'তোমার কথাশুনে মোপাসাঁর গল্পের এক কেরাণীকে মনে পড়ে গেল সুধীরা। সে বেচারা একদিন অফিস্ যাবার আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে হঠাৎ আবিষ্কার করলে; ও একাদিক্রমে পঁচিশবছর ধরে রোজ জামার বোতাম লাগিয়েচে। একই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পঁচিশবছর ক্রমাগত একভাবে চুল আঁচড়িয়েছে কী দুঃসহ আবিষ্কার বলত? দেখো, সুধীরা, শেষে যেন আমাকে মোপাসাঁর গল্পের সেই কেরাণী বানিওনা। শেষে আমাকেও না একদিন পস্তাতে হয় যে: পঁচিশ বছর ধরে রোজ দুবেলা তোমাকে বলেচি; আমি চায়ে ক'চামচ চিনি খাই।'

ফ্যানটা খুলে দিয়ে এসে, নীরেন আবার বসে বললে, 'শুনলুম তোমরা না কি থিয়েটারে যাচ্চ?' 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু জ্ঞানকে সঙ্গে নিয়ে গেলেইত পারো। আজ আমার বাইরে একটু কাজ আছে।'

'তাইত যাব।'

নীরেন একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বললে: আমি আস্তেই কিন্তু মামীমা অন্যরকম বললেন, যেন তোমাদের সবই তৈরী কেবল আমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েচ।'

'উনি ভুল বলেচেন। যে এড়িয়ে যেতে চায় তার পিছনে পিছনে ছুটে তাকে আমি বাঁধতে চাইনে।' 'একথার মানে?'

'মানে যে কী তা তুমি নিজেই ভালোকরে জান। তুমি আমার উপর রাগ করতে পার, আর আমি তোমাকে বাদ দিয়ে চলতে পারিনে, তাই মনে করেচ নাকি?'

'রাগ! হঠাৎ তোমার ওপরে রাগ করতে যাব কেন? ওঃ—সেরাত্রির ব্যাপার। মজা দেখ দিকি তোমার শরীর খারাপ হয়েচে, বাড়ী যেতে পাবেনা তুমি? তাতেও আমার অনুমতির অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে নাকি? ছিঃ সুধীরা, তোমার মেয়েরা মুখেই কেবল স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে লাফাও। কিন্তু যখন তা পাও কাজে খাটাতে পারোনা।'

সুধীরা মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, কথাটা অন্যভাবে সুরু করচে। ও নিজেইত রাগ করেচে—নীরেনের সেরাত্রির ব্যবহারে—তাই ও বলতে চেয়েছিল, কিন্তু মুখদিয়ে বেরিয়ে গেল অন্যরকম। নীরেনের তোলা মেয়েদের অপরিসীম স্বাধীনতার প্রসঙ্গে তাই সে লেশমাত্র আরাম পেলেনা। তৈরীচায়ে চামচ নাড়তে নাড়তে বললে, 'কেন আমার ওপরে রাগকরতেও তোমার বাধা আমি কি তোমার রাগেরও অযোগ্য?' অনেককষ্টে চোখের জল সামলিয়ে রেখেছিল এবারে তার দুফোঁটা ঝরেই পড়ল। নীরেন ক্রমশঃ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলে। আশ্চর্য্য হয়ে বললে; 'ও কী

সুধীরা! হয়ত কি কথা থেকে কি এসে পড়েচে। মনে যদি কষ্ট দিয়ে থাকি, ক্ষমাকর। চল না হয়, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই। ষোড়শী দেখ্‌বার ইচ্ছে অনেকদিন থেকেই আছে।'

'না—যেতে হবেনা। অত অনুগ্রহে কাজ নেই। তার চেয়ে যেখানে যেতে প্রাণ চায় সেখানেই যাও। যেখানে গেলে মনে শান্তি পাবে। অবশ্য শেষ অবধি পাবে কিনা সন্দেহ।'

'কী বলচ তুমি! কদিন থেকে তোমার ব্যবহার যেন হেঁয়ালির মত হয়ে উঠেচে। কী বল্‌তে চাও?' সুধীরা চুপ করে রয়েচে। মুখ নামানো। 'যা বলতে চাও, আরও একটু স্পষ্টকরে বললে ক্ষতি আছে কি?'

'হাঁ আছে বই কি! তোমার আচরণে প্রকাশ্য নির্লজ্জতায় সীমা যতোদূর খুসী স্পষ্ট করতে পার তোমার হয়ত তাতে কিছু যায় আসে না—কিন্তু আমরা যে লজ্জায় মরে যাই। মুখে স্পষ্টকরে বলতেও আমাদের বাধে।'

নীরেন উত্তপ্তকণ্ঠে বললে, 'তোমার যা খুসী তুমি আমাকে তাই বল্‌বে! তোমাকে এ অধিকার কে দিয়েচে শুনি?'

আবেগে সুধীরার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। মুখের ভাব বৈলক্ষণ্য ধরা পড়তে পারে বলে, ও মুখ নামিয়েই রইল। নীরেনের চড়াসুর শোনা যেতে লাগ্‌ল।

'কে দিয়েচে তোমাকে এ অধিকার? তোমাকে আমি যা ভেবেছিলুম—তুমি তার চেয়ে অনেক হীন অনেক ছোট।'

সুধীরার মুখ ক্রমশঃ বিবর্ণ হয়ে উঠচে, একবার ইচ্ছে হোল বলে, 'কে দিয়েছিল এ অধিকার তুমিই একদিন দাওনি কি?' কিন্তু না ওকথা বলা অসম্ভব। তাছাড়া ওর মনের জ্বালা আর কিছুতেই নিজেকে চাপতে পারলে না। অত্যন্ত হিংস্র আকারে তা বেরিয়ে এল।

'হয়ত তুমি আমাকে যতটা বাড়িয়েচ, আমি আর যোগ্য নই। কিন্তু তা বলে তোমার মতন ও নীচ নই, একথা তুমি ছাড়া আর বোধ করি কেউ অস্বীকার করবে না।'

নীরেন অবাক্ হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল। এই সেই সুধীরা—যে একদিন ওর কাছে বসে থাকতে চায়নি। কেবল ওর খুব কাছে বসে থাকার যে অসহ্য সান্নিধ্য মাদকতা, তাই ওকে করেছিল ভীত, পলায়নপর। কিন্তু ও বদলে গেল কেন এত শীগ্‌গীর সেই কারণটা খুঁজতে যেয়ে, বিতৃষ্ণায় ও থেমে গেল। সন্দেহ! ঈর্ষা! নীরেনের মন সাধারণের চেয়ে এইখানে একটু অন্যরকম। ঈর্ষাকেও পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণা করে। যাকে ভালোবাসি তাকে ভালোবাসা দিয়ে বাঁধব—সে যদি আর কারুকে ভালোবাসে তাতে ক্ষতি কী? মনে কষ্ট হবে? এইনিয়ে ও কতদিন কত ভেবেচে, কত তর্ক করেচে। লোকে বলে—ওর বন্ধুরা বলে, দেখ নীরেন বাড়াবাড়ি কোরোনা। তুমি আর্টিষ্ট মানলুম। কিন্তু মানুষ! বলি একথাটা অস্বীকার করনা ত? যতই ভালো ভালো কথায় দোহাই দাও, মানুষের মনের আদিম প্রাণীটা যখন ক্ষুধায় কাঁদে, বেদনায় জর্জ্জরিত হয় তখন

তাকে সভ্যতার কোন ফুংফুরে খোলসের তলায় চাপাদেবে শুনি? ইস্, ঈর্ষার কথা উঠতেই উনি হেসে কুটোপাটি হ'ন। যেন উনি অ-মর্ত্তলোক থেকে নেমেএসেচেন। সৌখীন ভালোবাসা ছেড়েদিয়ে, সমস্ত শরীর মন দিয়ে কারুকে ভালোবাস, তখনই বুঝতে পারবে সখা, কাকে বলে ঈর্ষা। যখন কারুকে এত ভালোবাসবে যে তাকে স্মরণ করাই একটা শারীরিক যন্ত্রণা—তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা একটা মোহময় মূর্চ্ছা তাকে কেবল দুচোখ দিয়ে দেখা, মরণের চেয়েও রহস্যময়—তখনই বুঝতে পারবে, যে তাকে হারাবার আশঙ্কা মাত্রেই কেন মানুষে সমস্ত সভ্যতার আচরণ সমস্ত যুক্তিকে জলাঞ্জলিদিয়েও পাগলের মত কাড়াকাড়ি করে।

নীরেন ওসব শুনে হাসে। হাসিছাড়া আর ও কীই বা করতে পারে! আমাদের মনে হয়, আজও তেমন করে ও কোন মেয়েকে ভালো বাসেনি। মেয়েদের ও চট্ করে কড়া কথা বলতে চায়না—ওর ব্যবহারে এখনও শিভাল্রির আমেজ পাওয়া যায়, কিন্তু ও এখনও কোন মেয়েকে সবদিয়ে ভালোবাসেনা...এমন করে ভালোবাস্‌লে না যাতে ঈর্ষা কথাটার মানে ওর কাছে স্পষ্ট হয়। সুধীরাকে ও ভালোবাসে। কিন্তু মনে হয় সুধীরাকে সে সুধীরা বলে ভালো বাসেনা—সুধীরা দেয় তাকে প্রেরণা। তোমার এই কবিতাটা অসামান্য হয়েচে! তোমার এই উপন্যাসটা এতো সুন্দর যে সুন্দর বল্‌তেই ভয় হয়। এই ধরণের কথাই বরাবর শুনে এসেচে ওর মুখে। ও যেন তার ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণতা দেবার, তার আত্ম-প্রত্যয়কে দৃঢ় করবার একটা আশ্রয় মাত্র।

নীরেন অবাক্ হয়ে সুধীরার দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু সুধীরা থামলে না, ও বলেই চল্‌ল; 'এতক্ষণ কোথায় গিয়েছিলে শুনি? সত্য কথা বলার সাহস আছে?'

'কেন থাক্‌বেনা। আমি এতক্ষণ হাইকোর্টে বসেছিলুম। আজ সুজাতার ডাইভোর্স কেস্‌টা উঠ্‌বার কথাছিল, কি হয় দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। কিছুই হোলনা। ডিস্‌মিস হয়ে গেল।'

সুধীরা যেন ওর কথা শুন্‌তেই পায় নি। নিজের ঝোঁকে বলে চলেছে; 'তোমার লজ্জা করেনা ওর পিছন পিছন ছুট্‌তে। যে তোমাকে চায় না—যে নিজের সমস্যায় নিজের জীবনের ক্লেশে আত্মজর্জ্জর, অবসন্ন—তার কাছে যেয়ে যেয়ে রাত্রিদিন তাকে বিরক্ত করতে তোমার রুচিতে আটকায় না?'

এটাই সুধীরার শেষ অস্ত্র। এবং এটাই হোল নীরেনের পক্ষে মর্ম্মান্তিক। সে চম্‌কে উঠল। সে ভাব্‌লে, সুজাতা তাকে চায়না—সে কাছে গেলে ও বিব্রত হয় একথা কী করে নেব আমি? একেত ওর অনেক কষ্ট। ওকে একা একা সহ্য করতে হচ্চে অনেক। এই টুকুই আমি এক এক সময় সইতে পারিনে, তার উপর আবার যদি বিশ্বাস করতে হয় যে আমি ওর ক্লেশ লেশমাত্র কমাতে না পেরে, কেবল বাড়িয়েই চলেছি, তাহলে সে আমি সহ্য করব কী করে। একথাকে মনের মধ্যে নেব আমি কেমন করে। চায়ের পেয়ালাটা শেষ করে ও উঠে পড়্‌ল। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বললে; 'আমি এখন চললুম। নানা কারণে আজ তোমার মন ভালো নেই। খুব

উত্তেজিত হয়ে রয়েচ। তাই যা বলচ, তা যে কোন শিক্ষিত ভদ্র স্ত্রীলোকের মুখেই মানায় না। আমারও এখন কাজ আছে, আর তোমাদের ত বোধ করি থিয়েটারে যাবার সময় হয়ে এল। যদি কখন শান্ত হয়ে আমাকে কিছু বল্‌তে চাও পরে বোলো।'

সুধীরা শক্ত হয়ে ঘাড়টা একদিকে বাঁকিয়ে বল্‌লে; 'যাবে—যাও। কিন্তু আমি মিছে কথাও বলিনি, আর অভদ্র কথাও বলিনি। শান্ত হবারও আর আমার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া কথা বল্‌তে বার বার তোমার পিছনে তাড়া করে বেড়াব, আমার সময়ও অত সস্তা নয়। আমার যা বলবার ছিল, বলেচি।'

সিন্ধু-শকুন

শ্রীবেলা দেবী

নীল সায়রের সুদূর পারে ঢেউয়ের দোলা দোলে
হাজার-হাজার বুকটি জুড়ে লক্ষ ফেনাই চলে,
বুকেতে যার অসীম মাণিক দেখছো নাকো চেয়ে
তীরে বসে গুণ্‌ছো ঢেউ আস্‌ছে আঁধার ছেয়ে,
সিন্ধু শকুন, সিন্ধু-শকুন করুণ কেন আঁখি,
ঢেউগুণে কি দিনটি গেল জীবনটাকি ফাঁকি!
সাগর দোলায় দুলিয়ে দেহ কাট্‌ছে যাদের দিন
দূর গগনের নীল নীলিমায় বাজ্‌ছে মনের বীণ,
যেথায় খুসী যাচ্ছো হেথায় মুক্ত, স্বাধীন প্রাণ,
আমার প্রাণে জাগাও তুমি নিরুদ্দেশের গান!
সাধ হয় মোর ঝাঁপিয়ে পড়ি' নীল সায়রের কোলে,
কুড়িয়ে আনি লক্ষ মাণিক অসীম কলরোলে!
আঁধার যবে ঘনিয়ে আসে কোন পাহাড়ের চূড়ে
বাজায় প্রলয় কালের বিষাণ উর্ম্মিমালা দূরে,
মুখের কবির ছন্দে তখন গাইছো নীরব গীতি
পড়্‌ছে কি আজ মনে কভু কোন সুদূরের স্মৃতি!
সিন্ধু-শকুন, সিন্ধু-শকুন আমায় নিয়ে যাও,
দোদুল দোলায় দুলিয়ে দিয়ে বেদনা ভোলাও।

সজল-সুরের মত্তলীলায় ঝঞ্ঝা আসে যবে
উতল চোখে চেয়েই থাকো মেঘের আকুল রবে,
কেউনা জানে কোন নিশানা, কোথায় যে তার শেষে
মরণ-নদীর ওপারে কি সন্ধ্যারাণীর দেশ!
সাত সাগরের কূলে কূলে সপ্তসুরের গীতি,
চক্ষুমুদে শুনছো বসে,—জাগ্‌ছে মলিন স্মৃতি।
আমার প্রাণে বাজ্‌ছে আজো যউবনেরি গান,
সিন্ধু-শকুন হারিয়ে গেছে তোমার পরাণ,—
তাই গো তুমি এম্‌নি নিতি মৌনসাঁঝের বুকে,
ডাকছো কারে অসীম পারে পাওনিকো সন্ধান,
মিশিয়ে গেল ওই যে দূরে যউবনেরি গান।
এম্‌নি সুরের ব্যাথার তরী ভাসিয়ে দিয়ে জলে
নিরুদ্দেশের পথে মোরা যাবই কুতূহলে,
কোন সাগরের কূলে সে দেশ কোন অজানার তীরে,
ভাস্‌ব মোরা অগাধ জলে আস্‌বনা আর ফিরে!
সিন্ধু-শকুন, সিন্ধু-শকুন চল মোরা যাই,
দুঃখ-ব্যথা মৃত্যু-জরা যেথায় কিছুই নাই!

শরৎ সাহিত্যের মেরুদণ্ড

শ্রীরাধারাণী দেবী

পূজনীয় শরৎচন্দ্রের জন্মদিন ৩১শে ভাদ্র তারিখটী ষড়ঋতুর বাৎসরিক চক্রে এবার আটান্ন সংখ্যা পরিক্রমণ কর্‌লো। এই উপলক্ষ্যে তাঁর দীর্ঘজীবন ও শুভকামনা করে—তাঁর প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা প্রীতি নিবেদন কর্‌বার জন্য যাঁরা এই সভানুষ্ঠান করেচেন তাঁদের পক্ষ থেকে আমার কাছে অনুরোধ পৌঁছুলো, শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু লিখ্‌তে হবে।

শরৎসাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করা দরকার, ঐ চিন্তা বহুদিন আগে থেকেই আমার মনে জাগ্রত রয়েচে।

যদিও বাংলাদের বহু সুধী সমালোচকেরা শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে অনেক আলোচনা

করেছেন ও কর্‌ছেন; আজও এর স্বপক্ষ এবং বিপক্ষ সমালোচনার অন্ত নেই,—তবুও কেন এ'সম্বন্ধে আমাদের অর্থাৎ মেয়েদের লেখা উচিত বলে মনে হয়, তা'বলি।

এ'কথা বোধহয় নিঃসংশয়ে বলা চলে যে শরৎ-সাহিত্যের মেরুদণ্ড হচ্চে 'নারীচরিত্র'।

নারীচরিত্র গুলিকে বাদ্‌দিয়ে যদি শরৎ সাহিত্যের আলোচনা কর্‌তে যাওয়া হয়, তা'হলে দেখা যাবে, আমরা মরুভূমিতে এসে পড়েচি। ইন্দ্রনাথ, জীবানন্দ, সব্যসাচী প্রভৃতি দু'চারটি মহীরুহ ছাড়া আর যা আমরা পাবো তা সুন্দর হলেও সাধারণ। নারীচরিত্র বাদ দিলে এদের সকলকারই মূল যাবে শুকিয়ে, রং হবে বিবর্ণ। তাতে না থাক্‌বে রস, না পাওয়া যাবে জীবনের বিচিত্র বিকাশ। শরৎচন্দ্রের রচনার প্রাণই হচ্চে নারী। নারীচরিত্রের বিশিষ্টতা ও অসাধারণত্বের জন্যই শরৎ-সাহিত্য অসাধারণ হয়ে উঠ্‌তে পেরেছে বলে মনে হয়।

যে নিবিড় দরদ্ ও অসাধারণ সূক্ষ্ম অন্তঃদৃষ্টি নিয়ে এই রসশিল্পী নারীজাতির অন্তরের মূল পরিচয় দিয়েচেন তাঁর সাহিত্যে,—তা প্রকৃতই বিস্ময়কর। কোনোখানেই তাকে মিথ্যা বলে কল্পিত বলে মনে হয়না, বরং মনে হয় এটিই নারীর আসল সত্যস্বরূপ, যা হয়তো ঢাকা পড়ে আছে জীবনের অবস্থা ও ঘটনার নানাবিধ আবরণ জালে।

সেইজন্যই বহুবার মনে হয়েচে আমার,—শরৎ-সাহিত্য মহিলাদের দ্বারা সমালোচিত হওয়ার বোধহয় বিশেষ একটি মূল্য আছে।

তিনি তাঁর সাহিত্যে এঁকেছেন যে-নারীদের, তারা এই বাংলাদেশেরই মেয়ে। গাঁয়ের মেয়ে, শহরের মেয়ে, প্রবাসিনী বাঙ্গালী মেয়ে, শিক্ষিতা, অর্দ্ধশিক্ষিতা অশিক্ষিতা। তারা আমাদেরই মা বোন স্ত্রী কন্যা ভ্রাতৃবধূ পুত্রবধূ, খুড়ি, জ্যাঠাই, বৌদিদি, দিদি, প্রতিবেশিনী, দূরসম্পর্কীয়া, নিঃসম্পর্কীয়া। তারা কেবলমাত্র ভদ্রগৃহস্থের ও সম্ভ্রান্ত ধনীপরিবারের মেয়েই নয়। পতিতা ও দাসী প্রভৃতি নিম্নস্তরের নারীদেরও অন্তরের আনন্দ বেদনা এবং হৃদয়ের রঙ্গে শরৎসাহিত্য অনুরঞ্জিত।

নারীর মনের গহন গোপন অন্তঃপুরের সকল মহলের যথার্থ খবর শরৎচন্দ্র তাঁর গভীর অন্তঃদৃষ্টির বলে ও অসামান্য লিপিকুশলতার গুণে এমন নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন যে, সে ছবি দেখে নারীর নিজেরই আজ বিস্ময়ের অবধি নেই।

নারীমনের স্বপ্ন ও কল্পনা নারী অন্তরের আলোছায়ার বিচিত্র বর্ণলীলা, মনোজগতের জটিলতত্ত্ব, চরিত্রের বিভিন্ন বিকাশ তার নানা পৃথকরূপ, তার দুর্ব্বার আকর্ষণ ও প্রভাবকে কেন্দ্র করে শরৎ-সাহিত্যের আশপাশের পুরুষ চরিত্র গুলি গড়ে উঠেচে। ষোড়শীকে বাদ্ দিয়ে জীবানন্দের মনুষ্যত্ব ফুট্‌বার অবকাশ মেলে না। তার পশুত্বটাই বড়ো হয়ে দেখা দেয়। অন্নদাদিদিকে হারাবার সঙ্গে সঙ্গেই অসাধারণ বালক ইন্দ্রনাথও অদৃশ্য হয়েচে।

নারী চিত্তবৃত্তির যে বিশেষতর ভাবধারা, নারীর স্বকীয় প্রকৃতিজাত যে হৃদয়াবেগের স্ফূরণ তারই বর্ণজাল তারই চেতনারস শরৎ-সাহিত্যকে সুন্দর ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

শরৎচন্দ্র যে নারীদের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, তাদের ঠিক সাধারণ নারী বলা চলে না। তারা বাইরের দিক্ থেকে যেমন অতিবাস্তব, একান্তই এই বাংলাদেশের মাটীর মেয়ে, অন্তরের উৎকর্ষের দিক্ দিয়ে আবার তারা তেমনই উন্নত ও অপ্রত্যাশিত প্রকৃতির। আমাদের বাস্তব সংসারে ঠিক সে প্রকৃতির মেয়ে হয়তো সদাসর্ব্বদা চ'খে পড়ে না। কিরণময়ী, সাবিত্রী, পার্ব্বতী, চন্দ্রমুখী, অভয়া, রাজলক্ষ্মী, সুনন্দা, কমললতা প্রভৃতিকে যেখানে সেখানে দেখ্‌তে পাওয়া সম্ভব নয়। ওরা সাধারণ মেয়ে বটে—কিন্তু ওদের প্রকৃতি অসাধারণ। সুতরাং এ কথা মান্‌তে হবে যে শরৎচন্দ্র যে সকল নারীচরিত্র এঁকেছেন, তাদের মধ্যে দীপ্ত হয়ে উঠেছে নারীর মানস প্রকৃতির রূপ,—তার বাইরের আবরণ নয়। তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন যা তাদের একান্তই অন্তরের বস্তু। তাই তারা এমন করে আজ আমাদের অন্তর স্পর্শ কর্‌তে পেরেচে।

বাস্তব সংসারে পার্ব্বতীর মত দুর্জ্জয় সাহস হয়তো সকল মেয়ের না থাক্‌তে পারে, কিন্তু অমনিতর গভীরভাবে ভালবাসার উপলব্ধি মেয়েরাই করিতে পারে এবং করেও থাকে যেখানে সে যথার্থ ভালবাসে।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য আজ বাংলার নারীজাতিকে আত্ম-শ্রদ্ধা ও আত্মপ্রত্যয় দান করেছে। তাই তিনি আমাদের শুধু আত্মীয় নন্—বন্ধুও।

সমাজে নারীর দৈহিক স্খলন ঘট্‌লে সে যে আর কখনও কোনও দিনই মনুষ্যত্বের উন্নত মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌তে পারেনা, এইটাই এক সময়ে আমাদের সাহিত্যে একান্ত সত্যবস্তু ছিল। কিন্তু শরৎসাহিত্য এসে একে শুধু অস্বীকার করেনি,—এযে কত বড় ভ্রান্ত ধারণা তা' নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ করে দিয়েচে।

প্রথম যৌবনে জীবনের আকস্মিক ঘটনাবর্ত্তের মধ্যে বা প্রলোভনের প্রভাবে দৈহিক অশুচিতা ঘটেছিল বলেই পুরুষের সমগ্র জীবন যেমন ব্যর্থ ভস্মস্তূপে পরিণত বা দূরপনেয় কলঙ্কে পঙ্কিল হয়ে যায় না, তারুণ্যের সে অপরাধ তার সমস্ত মনুষ্যত্বকে যেমন চিরদিনের জন্য পঙ্গু ও নিস্ফল করে দেয় না, নারীর পক্ষেও যে ঐ সত্য সমান অবিসম্বাদি,—শরৎসাহিত্যেই তার প্রথম সন্ধান ও প্রমাণ পেয়েচি আমরা। নারীও যে তার চরিত্রের উন্নততর বিকাশে ও ঔজ্জ্বল্যে অতীতের ত্রুটী বিচ্যুতিকে মুছে ফেলে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ আসনে বস্‌বার অধিকার অর্জ্জন কর্‌তে পারে, বাংলা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম এ সত্য ঘোষণা কর্‌তে সাহস করচেন। তিনি দেখিয়েচেন, যে নারী তার দৈহিক বিচ্যুতিকে নিজেই সহজে ক্ষমা কর্‌তে পারে না এবং সেজন্য কঠোর সংযম দুঃখ ও সবচেয়ে বড় ত্যাগ স্বীকার করে তার মূল্য দিতেও তারা কৃপণতা করে না।

বিরাজ-বৌয়ের বেদনা আমাদের ব্যথিত করে। অচলার অচলস্পর্শী দুঃখ আজন্ম স্নেহ-প্রেম-বঞ্চিতা কিরণময়ীর সকরুণ পরিণাম আমাদের ভীতিগ্রস্ত কর্‌লেও, কাতরও করে তোলে। সাবিত্রীর মত ঝি বাস্তব সংসারে হয়তো একান্ত দুর্লভ কিন্তু তার অন্তরের বাণী—প্রিয়ের প্রতি

সত্য প্রেমনিষ্ঠ নারী অন্তরেরই বাণী। সাবিত্রীর মধ্য দিয়ে নারী-অন্তরের সত্য ও গভীর ভালবাসার রূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেচে।

মনোরমার মত মেয়ে শিবনাথকে ভালবাসতে পারে কিনা, তরুণী নীলিমার পক্ষে বৃদ্ধ আশুবাবুর প্রতি অনুরক্তা হওয়া সম্ভব পর কিনা, রাজলক্ষ্মীর অন্তরের ছবি আমাদের অপরিচিত এ আলোচনা না করে আজ শুধু এই কথাই বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই যে, শরৎ-সাহিত্যে নারী-চরিত্র বহু ও বিচিত্র হলেও, তাদের সকলের মধ্যেই আমরা একটি তেজস্বিনী আত্মপ্রত্যয়শীলা দৃঢ়চিত্তা সুচরিতা নারীকেই বিশেষভাবে দেখ্‌তে পাই। ইনিই শরৎচন্দ্রের মানসী। তাঁর সাহিত্যের আদর্শা নারী। পণ্ডিত মশায়ে কুসুম, বিরাজবৌয়ে বিরাজ, বিন্দুর ছেলের বিন্দু, নিষ্কৃতির শৈলজা, পরিণীতার ললিতা, পথনির্দ্দেশের হেমনলিনী, দেবদাসের পার্ব্বতী, দেনাপাওনার ষোড়শী, চরিত্রহীনের সাবিত্রী, শ্রীকান্তর রাজলক্ষ্মী, অভয়া, সুনন্দা কমললতা ইত্যাদি এই যে বিশেষ ধরণের অসামান্য আত্মপ্রত্যয়-সম্পন্না নারী,—শরৎসাহিত্যের এরাই প্রাণ ও মেরুদণ্ড

শরৎচন্দ্রের অষ্ট-পঞ্চাশৎ জন্মদিন উপলক্ষে সম্বর্দ্ধনা-সভায় হাওড়া টাউনহলে পঠিত।

প্রলয়-লীলা

শ্রীমমতা মিত্র

প্রকৃতির একি তাণ্ডব লীলা হেরি চারিধারে আজি,
মরণের হাতে প্রলয় বিষাণ মহা তেজে উঠে বাজি।
রাজার প্রাসাদ ভেঙে পড়ে, ভাঙে গরীবের কুঁড়ে ঘর,
সংহার ত্রাস পৃথিবীর বুকে, টলমল চরাচর।
ছুটাছুটি করে বাঁচিবার তরে শত শত নর-নারী,
কত শব হায় রাজপথ পরে পড়ে আছে সারি সারি।
কোলের ছেলেরে বাঁচাইতে গিয়ে জননী দিয়েছে প্রাণ,
স্বামীরে খুঁজিতে পেল কোন সতী শুধু শবদেহ খান।
সোনার সহর শ্মশান হ'য়েছে, কোলাহল গেছে থেমে,
মহানিদ্রার আবেশ সহসা ভুবনে এসেছে নেমে।
হাজার হাজার গৃহ গেছে পড়ে, হ'য়ে গেছে ভূমিসাৎ,
তাহারি তলায় কত না মানুষ মুদেছে নয়ন পাত।

মরিয়াছে পতি, মরেছে পুত্র, স্বামী-সন্তান-হারা
স্পন্দবিহীন, অবিরল শুধু ঝরিছে আঁখির ধারা।
নিদারুণ ছবি চোখে আসে জল, হৃদয় ব্যথায় ভরে,
ভৈরব একে করাল রূপেতে নিষ্ঠুর খেলা করে?
মরণ-যজ্ঞে জীবন আহুতি দেয় সবে দলে দলে,
বিভীষিকাময় একি এ দৃশ্য হেরি আজ ধরাতলে!
ধরণী হ'য়েছে ক্ষুধায় কাতর মহাবলি লয় তাই,
মানুষের সে যে জননী সেকথা আজি আর মনে নাই।
মৃত্তিকা ফুঁড়ে উঠিছে উপরে কর্দ্দমময় জল,
গন্ধক-ধাতু বিকটগন্ধে করে সবে বিহ্বল।
নিমেষের মাঝে প্রলয়কর ভাগ্যবিপর্য্যয়,
বিপন্নগণে কে করিবে ত্রাণ কেবা দেবে বরাভয়?
লেলিহান জিভ্ মেলিয়া অনল দূর হ'তে কাছে আসে,
সঙ্কটকালে অভাগা সকলে কোথা যাবে কার পাশে?
কল কারখানা চূর্ণ হ'য়েছে শত শত লোক লয়ে,
বাঁচিয়াছে যারা রয়েছে তাহারা ভয়ে দিশাহারা হ'য়ে।
প্রচণ্ড কাল ধরেছে আজিকে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
সমগ্র দেশ বিনাশ করিছে মেলি মুখ-গহ্বর।
বেঁচে আছে যারা তাদের দেখিলে চোখে জল রাখা দায়,
আকাশের তলে খোলা মাঠ পরে তাহাদের দিন যায়।
সব বাড়ী ঘর হ'য়েছে ধ্বংস, চিহ্ন নাহিক' আর,
সান্ত্বনা-বাণী শোনায় এমন লোক পাওয়া অতি ভার।
আশ্রয়-হারা, অন্নবিহীন অন্তর জ্বলে শোকে,
দুরন্ত শীত দুঃখ বাড়ায়, ভয়ে ঘুম নাই চোখে।
থেকো না ঘুমায়ে এ সময়ে কেহ, জাগো জাগো দেশবাসী,
দুর্গত-জনে সাহায্য কর, দাঁড়াও পার্শ্বে আসি।
ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে যারা দুঃখে হ'তেছে সারা
সমবেদনায় তাহাদের ওগো মুছাও নয়নধারা।

বেহার ভূমিকম্প উপলক্ষ্যে লিখিত।

মার্শল হনিস্থইট

শ্রীআমোদিনী ঘোষ

ওদের সৈন্য ও আমাদের সৈন্য পাশাপাশি চলেছে। ওরা তাকায় আমাদের দিকে, আমরা তাকাই ওদের দিকে। মনে জাগে নিস্ফল আক্রোশ। যেন কাণকাটা লড়াইয়ের কুকুর। অপর পক্ষের টুঁটিছেঁড়ার ইচ্ছাটা চোখের কোণায় পুরোপুরি ব্যক্ত, তবু চুপ করে আছে নিজের টুঁটির মায়ায়। কারো কারো মুখে এই অদ্ভুত ব্যাপারে হাসির রেখাও ফুটে ওঠে।

আমাদের পাশে ছিলেন একজন ইংরেজ সার্জ্জেণ্ট ও আমার দলের একজন জেনারল। ওরা এমন রোষ-কষোয়িত নেত্রে পরস্পরের দিকে তাকায়, ওদের মুখে এমন জিঘিংসা ফুটে ওঠে যে আমি ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলি পাছে ওরা কোন অসতর্ক মূহুর্ত্তে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে।

ওরা একটু আলাদা ধাতের লোক। স্বভাব ওদের কড়া অভ্যাসের ছাঁচে। চিন্তার প্রভাবে ওদের বদ্ধমূল ধারণা একদিনে ওরা বদলাতে পারে না। শুধু তাই নয়। জেনারলের এক মাত্র ভাই এই সেদিন মাত্র ইংরেজদের হাতে নিহত হয়েছে। তার মনে সেই শোকের দাহও ছিল সুপ্রচুর।

উপত্যকার শেষ ভাগে রাস্তাটা ঘুরে উঠেচে একটা উঁচু জায়গায়। তার ওপিঠে আরেকটা উপত্যকা। আমরা ওর মাথায় আস্‌লুম। আমাদের সম্মুখে মাইল তিনেক দূরে একটা সহর দেখা গেল, সেখানে পাহাড়ের পাশে বিপুলায়তন একটা বাড়ী।

সন্দেহ রইল না যে ঐটেই য়্যালমিক্সালের ধর্ম্মমন্দির ঐখানেই ঐ দুর্বৃত্তদের দল আশ্রয় নিয়ে রয়েছে। কি অসীম সাহসিক কাজে যে প্রবৃত্ত হয়েছি, এতক্ষণ পরে তার পূর্ণ হৃদ্বোধ হোল। গিরিগাত্রে ঐ বাড়ীটি হচ্ছে একটি যে সুদূর দুর্গ, তা বেশ বোঝা গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও বেশ বোঝা গেল, যে অশ্বারোহী একদল সৈন্যের পক্ষে বলপূর্ব্বক ওখানে প্রবেশ করা সাধ্যাতীত কাজ।

ইংরাজ জেনারল আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "তুমি-ই যখন এখন প্রধানতম যোদ্ধা,—তখন সৈন্য চালনার ভার তোমাকেই দিলুম। তার পর অবশ্য দেখা যাবে, দু'দলের ভিতর কোন দল কৃতী হয়।"

বল্লুম, "যে আজ্ঞা। দেরী করার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই, কেননা আমার ওপর হুকুম রয়েছে, আজই রাতে য়্যাব্রেণ্টস্ এ ফিরে যাওয়ার। কিন্তু আক্রমণ করার পূর্ব্বে আমাদের আরো কিছুই বর জেনে নেওয়া দরকার।"

পথের ধারে চুণকাম করা টোকো একটা বাড়ী। তার দরজার ওপরে সাইনবোর্ড দেখে বোঝা গেল যে ওটা গর্দ্দভচালকদের সরাইখানা। দরজার মাথায় বড় একটা লণ্ঠন ঝোলানো। তার নীচে দুজন লোক দাঁড়িয়ে কথা বল্‌ছিল, একজনের গায় আলখোল্লা দেখে বোঝা গেল সে

লোকটি সন্ন্যাসী, আরেক জনের কটিবাস দেখে চিনে নিলুম, সে এই সরাইখানার মালিক।

ওরা আমাদের দেখ্‌তে পাওয়ার আগে আমরা ওদের ওপর গিয়ে প'ড়লুম। সরাইওয়ালাটা ভয়ে ছুট্ দেবার যোগাড়ে ছিল, কিন্তু সৈন্যদের মধ্যে একজন চুলে ধরে ওকে টেনে রাখ্‌ল।

লোকটা চীৎকার করে বল্‌তে লাগ্‌ল, দোহাই তোমাদের আমায় ছেড়ে দাও। আমার হোটেলে একবার ফরাসীরা একবার ইংরাজরা লুটতরাজ করে গেছে। ডাকাতগুলা দিয়েছে আমার পা পুড়িয়ে। আমি শপথ করে বল্‌ছি তোমাদের, যে আমার সরাইখানায় টাকাও নেই, খাবারেরও কিছু নেই। জিজ্ঞাসা করে দেখ, তোমরা এই মোহান্তবাবাকে না খেতে পেয়ে উনি সরাইখানার দুয়োর কামড়ে পড়ে আছেন।'

পরিষ্কার ফরাসী ভাষায় মোহান্তবাবা বল্লেন, 'দেখ, এ লোকটা যা বল্‌ছে তা সত্য কথা। যুদ্ধে যে সব হতভাগ্যেরা সব খুইয়ে বসে আছে—এ লোকটা তাদের মধ্যে একজন। তবে অবশ্য আমার ভাগ্যের তুলনায় ওর কিছুই হয় নি। কেনইবা ওকে তোমরা ধরে রেখেছ—ওকে ছেড়ে দিলেও ওর পালাবার সামর্থ্য নেই।"

লণ্ঠনের আলোতে মোহান্তর দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম। লোকটি দেখিতে অসাধারণ। লম্বায় যেমন, চওড়ায় ও তেমন। বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ। মুখ শ্মশ্রু আবৃত, শ্যেনবৎ তীক্ষ্ণদৃষ্টি। মুখে দুঃখের কালিমা, কিন্তু ভঙ্গী তার গর্ব্বদৃপ্ত ভূপতির মত। আমাদের ভাষায় যখন সে আমাদের মত অনায়াসলব্ধ স্বাচ্ছন্দ্যে কথা কইতে লাগ্‌ল, তখন এও বুঝ্‌লুম, যে লোকটা নিরক্ষর নয়।

সরাইওয়ালার দিকে ফিরে চেয়ে আমি বল্লুম, 'তোমার কোন ভয় নেই।'

তারপর মোহান্তকে বল্লুম, দেখুন, আমরা কয়েকটি কথা জান্‌তে অভিলাষী আমার মনে হচ্ছে, আপনি-ই আমাদের খাঁটি খবর বল্‌তে পার্ব্বেন।' মোহান্ত ঈষদ্ধাস্যে বল্লেন, 'কায়মনোবাক্যে আমি তোমাদের সাহায্য কর্ত্তে প্রস্তুত আছি বৎস। কিন্তু কথাটা হচ্ছে কি জান, না খেতে পেয়ে আমার মুখ দিয়ে কথা সর্‌ছে না। আমায় তোমরা সামান্য কিছু খাদ্য দাও, আমি একটু সুস্থ হয়ে তোমাদের সব কথার উত্তর দেব।'

আমাদের সঙ্গে দু'দিনের রসদ ছিল। কাজেই মোহান্তকে খাওয়াতে আমাদের কোনো অসুবিধা ঘট্‌ল না। ওঁকে যে মাংস খেতে দেওয়া গেল, তা উনি এমন বিকট গ্রাসে খেতে লাগ্‌লেন, যে তা দেখ্‌তে ভয়ঙ্কর মনে হতে লাগ্‌ল।

আহার শেষ হ'লে আমি বল্লুম, 'আমাদের সময় নেই, কাজেই কালবিলম্ব না করে কাজের কথা বলা যাক্। আপনার কাছে আমরা যা জান্‌তে চাই তা হচ্ছে এই যে এই মন্দিরের কোন্ জায়গাটা সব চেয়ে অ-পোক্ত। আর ওখানে যে দস্যুরা বাস কর্চ্ছে, ওদের সম্বন্ধে কিছু জান্‌তে চাই।'

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে দুইহাত যুক্ত করে, ঊর্দ্ধনয়নে চেয়ে মোহান্ত বল্লে, 'ভগবান,

আমার প্রার্থনা শুনেছ তা হ'লে! ঐ মঠের আমি হচ্ছি মোহান্ত। আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে আমাকে ওরা পথে বার করে দিয়েছে! আজ আমার মাথা রাখ্‌বার জায়গা নাই, এক মুঠো খাওয়ার সংস্থান নাই!'

দুঃখের আবেগে মোহান্তের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

আমার পাশ থেকে জেনারল বল্লেন, "কাঁদ্‌বেন না,—কালকে সূর্য্যাস্তের আগে আপনার মঠ আমরা আপনার হাতে প্রত্যার্পণ কর্ব্ব নিশ্চয় জান্‌বেন।'

আমার নিজের জন্য দুঃখ কচ্ছিনে, বা যে হতভাগ্য লোকগুলি ওখানে আমাকে আশ্রয় করে ছিল—তাদের জন্যও দুঃখ কচ্ছিনে—যুগযুগান্তর থেকে খ্রীষ্টের যে পবিত্র চিহ্নগুলি ওখানে আছে—দস্যুদের অপবিত্র হাতে পড়ে যে সেগুলি নষ্ট হবে—সেই দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।"

সগর্ব্বে বল্লুম—আগেই হতাশ হচ্ছেন কেন! দস্যুদের অপবিত্র হাতে পড়ে নষ্ট হবার আগে ও ত আমরা সেগুলি উদ্ধার কর্ত্তে পারি। মঠে ঢুক্‌বার রাস্তা একবার আমাদের দেখিয়ে দিন্, তারপর আপনার আর কোনো ভাব্‌বার কারণ থাক্‌বে না।'

মোহান্ত অতি সংক্ষেপে সকল কথা বল্লেন। কিন্তু তাতে আমাদের ভাবনা বাড়্‌ল ছাড়া কম্‌ল না। মঠটি চারিদিকে চল্লিশ ফিট উঁচু প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। তার গায়ে ছোট জানালাগুলি অতি দৃঢ় অর্গলের দ্বারা বন্ধ। সমস্ত মঠটা ঘিরে গোল ছিদ্রপথে সারিস রি কামানের মুখ রয়েছে লাগানো। ওরা চলে সামরিক নীতিতে, চারদিক ঘিরে ওদের এত রক্ষী আছে যে হঠাৎ কোনো জায়গা দিয়ে প্রবেশ করা বা আক্রমণ করা অসম্ভব কাজ। একদল পদাতিক সৈন্য আর এক জোড়া আর্টিলারি গান্ ছাড়া আমাদের কিছুই কর্ব্বার জো নেই।

শুনে আমি ভ্রূকুঞ্চিত কল্লুম, ইংরাজ সেনাপতি শীষ্ দিতে লাগ্‌লেন।

একটু পরে বল্লেন, 'যা ঘটে ঘটুক,—চেষ্টা একবার আমাদের কর্ত্তেই হবে।'

হুকুম পেয়ে আমাদের সৈন্যেরা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে তাদিগে জল খাইয়ে নিজেরাও জলযোগে বসে গেল। কি উপায়ে আমরা কি কর্ব্ব তা আলোচনা করার জন্যে আমরা মোহান্তর সঙ্গে সরাইখানার ভিতরে গেলুম।

আমি বল্লুম, 'আমরা যে এসেছি তা ঐ র‍্যাস্কেলেরা মোটেই জানে না। আমার মনে হচ্ছে, আমরা যদি এখানে কাছাকাছি কোনো বনে লুকিয়ে থাকি, তা'হলে ওদের ফটক খোলার সময় অতর্কিতে এসে ওদের ওপর পতিত হয়ে রাস্তা সাফ্ করে নেওয়া যেতে পারে।'

আমার সঙ্গী বল্লেন, 'তাই হোক্।' কিন্তু মোহান্ত সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে বল্লেন, 'ওতে ও তোমাদের মুস্কিলে পড়্‌তে হবে। ঐ দিকে এই সহরটি ছাড়া এই মঠের এক মাইলের মধ্যে ও এমন জায়গা নেই, যেখানে একটা মানুষ কি একটা ঘোড়া লুকিয়ে থাক্‌তে পারে। সহরের

লোকদের ত বিশ্বাসই করা চল্‌বে না। তার পর, ওরা যে কড়া পাহারা রেখেছে, তাতে তোমাদের ওখানে মাথা গলানোর আশা সুদূর পরাহত।'

আমি বল্লুম, অন্য পথ কি আছে, তাত আমি দেখ্‌ছি না। আমার সৈন্যসংখ্যাও ত এমন বেশী কিছু নয় যাতে ওদের নিয়ে আমি এই চল্লিশ ফিট উঁচু দেয়াল ও শ'খানেক পদাতিক, তাই আক্রমণ কর্ত্তে যাব।

'আমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী—তবু একটা পরামর্শ তোমাদের আমি দিতে পারি। ও দুর্বৃত্তদের আমি চিনি—এবং ওদের ধরণ ও জানি। এই এক মাস ধরে এই বনে মানবহীন স্থানে আমার দিন কেটেছে ঐ মঠের দিকেই চেয়ে। আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনা যে এ আমার একান্ত আপনার ধন। দুঃখে বুক আমার ফেটে যায়। আমি হ'লে এস্থলে কি কর্ত্তুম তা আমি তোমাদের বল্‌তে পারি।"

আমরা দুজনে এক সঙ্গে বলে উঠলুম, 'বলুন, বলুন, তা-ই আমাদের বলুন।'

'তোমরা জান বোধ হয়, বহু ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্য ওদের জাতীয় পতাকা ত্যাগ করে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে এখানে এসে ভিড়েছে ও ভিড়্‌ছে ও। তোমরা যেন তাদেরই একদল—এমনি ভাণ করে মঠে ঢুকে পড়্‌তে পার।'

এত সহজে এত বড় একটা কঠিন ব্যাপারের নিষ্পত্তি হয়ে গেল দেখে আনন্দে আমি মোহান্তকে আলিঙ্গন কল্লু্ম।

কিন্তু আমার সঙ্গী আপত্তি উত্থাপন করে বল্লেন, প্রস্তাবটা আপাততঃ বোধ হচ্ছে খুব মনোরম,—কিন্তু ঐ লোকগুলি—আপনি যে রকম ব্যাখ্যা করেছেন—সে রকম যদি হয়—তবে শস্ত্রধারী শ'খানেক অশ্বারোহীকে দুর্গের মধ্যে নির্ব্বিবাদে যে ঢুক্‌তে দেবে তাও ত আমার মনে হয় না। মার্শল হনিস্থইটের সম্বন্ধে আমিও যা শুনেছি, তাতে তার বুদ্ধির অভাব আছে বলে ত বোধ হয় নি।"

আমি বল্লুম, 'আচ্ছা এক কাজ করা যাক্‌না কেন। পঞ্চাশ জন আগে ঐ ভাবে মঠে প্রবেশ করুক, তারাই পরে রাত্রি শেষে বাকি জনকে দুয়োর খুলে প্রবেশ করিয়ে নেবে।"

অনেকক্ষণ ধরে তর্ক চল্ল। অশ্বারোহী সৈন্যের দুজনে তরুণ সেনাপতি না হয়ে আমরা যদি সেই প্রবীণ রণবীর ওয়েলিংটন ও মশিনা হতুম তা হলে ও বোধ হয় এর চেয়ে বেশী বুদ্ধি খরচ হোত না।

অবশেষে ঠিক্ হোল পঞ্চাশ জন ঢুক্‌বে মঠে আগে—কিন্তু আমাদের দুজনের একজন যাবে তার সঙ্গে তারপর নিশা অবসান কালে তারা বাকি লোকদের প্রবেশের জন্য ফটক খুলে দেবে।

আমাদের দ্বিধা বিভক্ত হয়ে কাজ করা সম্বন্ধে মোহান্ত কিছু আপত্তি দেখালেন, কিন্তু যখন দেখ্‌লেন যে আমাদের দুজনেরই এই মত, তখন সে কথা ছেড়ে দিয়ে বল্লেন, 'একটা কথা

শুধু আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা কর্ত্তে চাই—তোমরা যদি এই শয়তান হনিসুইটকে বন্দী কর্ত্তে সক্ষম হও, তবে তোমরা তাকে কি কর্ব্বে?'

বলে উঠলুম,' ফাঁসী দেব।'

'ফাঁসী, সেত সুখের মৃত্যু হে! এক পলকে প্রাণটা বেরিয়ে চলে যাবে। ও লোকটা যদি আমার হাতে পরত তা'হলে—কিন্তু উঃ! আমি এ কি বল্ছি! ভগবানের সেবক হয়ে আমি হৃদয়ে একি পাপ চিন্তার প্রশ্রয় দিচ্ছি!'

অসম্বরণীয় দুঃখে উদ্‌ভ্রান্তবৎ মোহান্ত কপালে করাঘাত করে দুই চক্ষু ঢেকে সহসা নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

কিন্তু আমাদের আর একটা কথা নিষ্পত্তি হওয়ার বাকী রইল। মঠে প্রথম প্রবেশ লাভের গৌরব কোন্ পক্ষে ঘটবে! সঙ্কটের কালে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার অন্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া আর যে পারে পারুক—এটিনি জেভ়াড´ তা কখনো পারে নি।

গোল বাঁধাল আমার সঙ্গীটি। অনুনয় করে তিনি বল্লেন, যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ আমার চেয়ে ওঁর জুটেছে এত কম যে এই যুদ্ধটা যদি আমি তাঁকে ছেড়ে দি, তাহ'লে আমার বীরত্বের পরিচয় দেবার অবকাশ না ঘট্‌লেও ঔদার্য্যের পরিচয় দেবার খুব শুভ অবসর হবে।

এর ওজর আপত্তি আর করা চলে না; কাজেই হাসিমুখে হ্যাণ্ডসেক্ করেছি মাত্র এমন সময় সরাইখানার সম্মুখ থেকে এমন ভীষণ চীৎকার আর্ত্তনাদ ও অভিসম্পাতের রব উঠ্‌ল যে দস্যুরা আমাদের আক্রমণ করেছে ভেবে আমরা তরবারি হস্তে সেদিকে ধাবিত হলুম।

কিন্তু সেখানে পৌছে যা দেখলুম তাতে আমাদের বিস্ময়ের অবধি রইল না। আমাদের অনুপস্থিতির অবকাশে আমাদের উভয়পক্ষের সৈন্য পরস্পরের উপর আপতিত হয়ে তাদের মনের ক্ষোভ মিটিয়ে লড়াই কর্ত্তে সুরু করেছে।

ধম্‌কিয়ে টেনে হিঁচ্‌ড়ে ওদের সবাইকে পৃথক করে দিলুম। রক্তাক্ত অঙ্গে পরস্পরের দিকে রোষরক্তিম চক্ষে চেয়ে দাঁড়িয়ে তারা ফুঁস্‌তে লাগ্‌ল।

নিবারণ করে রাখ্‌লুম, শুধু নিষ্কাশিত তরবারির সাহায্যে। বেচারী মোহান্ত এই সব দেখে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ভয়ে থর্ থর্ করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল।

আসলে এ গোলটা বেঁধেছিল ওঁরই বোকামির জন্যে। সৈনিকদের মনস্তত্ত্বে উনি ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যেমন সহজভাবে উনি ইংরাজ সার্জ্জেণ্টকে বলেছেন যে দেখে তাঁর ভারী দুঃখ হচ্ছে, যে এ পক্ষের সৈন্যেরা ফরাসীর পক্ষের সৈন্যের মত উৎকৃষ্ট নয়।

কথাটা ওঁর মুখ থেকে বেরুতে না বেরুতেই ইংরাজ পক্ষের একজন রুখে ফরাসী পক্ষের একজনকে দিলে ধাক্কা, অমনি চোখের নিমিষে হুড়মুড় করে যে যেখানে ছিল, এ ওর ঘাড়ে বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু করে দিলে!

এই ঘটনার পর এদের ওপর আমার বিশ্বাস গেল উড়ে। কিন্তু আমার সঙ্গী কালবিলম্ব না করে ওঁর সৈন্যদের সরাইখানার সম্মুখে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন, আমার সৈন্যেরা রইল সরাইর পিছনে।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ইংরাজরা ভ্রুকুটি করে চেয়ে রইল। আমার সৈন্যেরা শূন্যে ঘুঁষি উঁচিয়ে মনের ঝাল ঝাড়্তে লাগ্ল।

আমরা ভেবে দেখ্লুম, আমাদের প্ল্যান যখন সব ঠিক্ হয়ে গিয়েছে তখন আর বিলম্ব না করে আমাদের কাজ আরম্ভ করাই ভাল। কে জানে আবার কখন কোন্ কি কিছু ঘটে বসে।

ইংরাজ সেনাপতি তাঁর বেশভূষার সামান্য একটু পরিবর্ত্তন করে নিয়ে মঠের উদ্দেশ্যে যাত্রা কর্লেন। যাবার আগে তাঁর সেনাদের তিনি বুঝিয়ে দিলেন, ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে, এবং তাদের কি কর্ত্তে হবে। কিন্তু ওরা আমাদের সৈন্যদের মত না কর্লে তাকে অস্ত্র তুলে অভিবাদন, না দিলে সামান্য একটা জয়ধ্বনি। কিন্তু তবু ওদের শান্ত সৌম্য মুখে এমন একটা ভাবের ধারা ফুটে উঠ্ল, যে ওদের সম্বন্ধে সেনাপতির ভরসাহীন হওয়ার কোন কারণ আছে বলে মনে হোল না।

ওদের বুকের বোতাম সব দেওয়া হোল খুলে, শিরস্ত্রাণ ও তরবারির খাপ করে দেওয়া হোল ধূলোমাখা, ঘোড়ার পিঠের সাজ শিথিল ও বিসদৃশ যেন বিশৃঙ্খল ছত্রভঙ্গ ওদের দেখ্লে কারুর মনে সন্দেহ না থাকে যে এরা রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছে।

কথা রইল, ভোর ছটায় দুর্গদ্বার ওরা অধিকার কর্বে, আর সেই সময় আমি আমার সৈন্যদল নিয়ে হানা দেব।

ওরা চলে গেল। আমার পক্ষের সার্জ্জেণ্ট প্যাপিলেট আরো দুজন লোক সঙ্গে নিয়ে ওদের পিছনে পিছনে কতকদূর গেল তার পর ফিরে এসে বল্লে, ওরা মঠের ভিতর ঢুক্তে পেরেছে।

গোলমাল কিছুই হয়নি। শুধু ওরা বাতি দিয়ে একবার এদের দেখ্লে, দুটো চার্টে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্লে। নিশ্চিন্ত হলুম শুনে। ক্রমশঃ

সমাজ-সংস্কার

অশিক্ষিতদের হাতে স্বাধীনতা দিয়ে তাদের উচ্ছৃঙ্খল করে তোলবার আগে উক্ত দেশনেতারা শিক্ষার আলোকে তাদের উদ্ভাসিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন সর্ব্বতোভাবে। হরিজনের জন্য সে শিক্ষার কোনো বন্দোবস্তই নাই। যুগ যুগ অবলম্বিত সংস্কার শুধু জ্ঞানালোকেই অপসারিত হবে যথাসময়ে। মন্দির প্রবেশের তুচ্ছ প্রয়োজন কি ভারতের বর্ত্তমান কূট-সমস্যার চেয়ে বেশী মূল্যবান হ'ল? এই মন্দির প্রবেশাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এবং সর্ব্বসাধারণের অনুমোদনের জন্য আইন সভারও সাহায্য নিতে হচ্ছে। কোন মতবাদকে জন-নির্বিবশেষে প্রতিষ্ঠিত করতে আইনের আবশ্যককে আমরা অস্বীকার করি না। সর্দ্দা-বিলই বাল-বিবাহের একমাত্র অমোঘ অস্ত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যারা কৌন্সিল-বর্জ্জন-নীতি অবলম্বন করে কৌন্সিল ত্যাগ করলেন সেই কৌন্সিলেরই সাহায্য ভিক্ষার জন্য তাঁরা এত উদগ্রীব কেন? এতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, গান্ধিজী রাষ্ট্র-সমস্যা পরিত্যাগ করে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়েছেন। এ ভালো কথা, সমাজ-সংস্কারও দেশের কাজ। গান্ধিজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁকে বহু অর্থ সংগ্রহের সাহায্য করেছে। কিন্তু এই ব্যক্তিত্বের সুযোগে আজ যদি তিনি বিধ্বস্ত বিহারের আর্ত্তজন ও যশোহরের দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট জীবের যথাযথ সেবা করেন তবে সমাজ ও দেশ দুয়েরই যথেষ্ট কল্যাণ করা হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

—খেয়ালী

ভারতে জাপানী পশমী-বস্ত্র

ভারতবর্ষে জাপানী পশমীবস্ত্র ক্রমেই বেশী পরিমাণে আমদানী হইতেছে। ১৯৩১-৩২ সালের প্রথম ছয় মাসে জাপান হইতে ভারতবর্ষে ২২ হাজার টাকার মূল্যের ৩৮ হাজার গজ পশমী কাপড় আমদানী হয়। ১৯৩২-৩৩ সালের প্রথম ছয় মাসে আমদানী হইয়াছে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা মূল্যের ৫ লক্ষ ৬৯ হাজার গজ। বর্ত্তমান বৎসরে উহার পরিমাণ আরও বাড়িয়াছে। ১৯৩৩-৩৪ সালের প্রথম ছয় মাসে ৮ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা মূল্যের ১৩ লক্ষ ৬১ হাজার গজ পশমী-বস্ত্র আমদানী হইয়াছে।

বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী

গত ১০ই জানুয়ারী বোম্বাই হইতে "কার্থেজ" জাহাজে ৯৬ লক্ষ ৪২ হাজার ৪০ শত ৬৬ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ইউরোপে ও আমেরিকায় চালান হইয়াছে। ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করার পর এপর্য্যন্ত মোট ১৫৬ কোটী ৬৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫ শত ৪৫ টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইল।

বাংলায় বিভিন্নরোগে মৃত্যুসংখ্যা

কলেরা	৮১০৯০	প্রতি ঘণ্টায়	৯.৪টী মারা যায়
বসন্ত	২০৪০৭	”	২.৩টী ”
ম্যালেরিয়া	৭১৩৫৩১	”	৪১.৪টী ”
আমাশয়	৩৭১৫৬	”	৪.১টী ”
হৃদ্‌রোগ	৫২৮৪৩	”	৬টী ”
অন্যান্য	১৮৯২৩৬	”	২১.৩টী ”

এইরূপ মৃত্যুসংখ্যার হ্রাসকল্পে দেশবাসী ও স্বাস্থ্যপরিষদের সচেষ্ট হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

রাশিয়ায় জনসাধারণে সামরিক শিক্ষা

রাশিয়ায় লেনিন গ্রাডের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কুলী, মজুর, এবং যুবকদিগকে সামরিক শিক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ আদেশ করিয়াছেন, প্রত্যেক ফ্যাক্টরী এবং শস্যকুঠীতে প্রত্যেক কুলী, মজুর ও কৃষকের নিকট পঞ্চাশ মিটার রেঞ্জের রাইফেল থাকিবে।

লেনিন গ্রাডে মহিলা অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট

মিসেস হালিফাক্স, মিসেস হাতেম তায়াবজী, ও মিসেস মণি নেহতা নাম্নী এই সহরের তিনজন মহিলা এই বৎসরের জন্য অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মনোনীত হইয়াছেন।

বাংলায় রাজবন্দীর সংখ্যা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তরে হোম মেম্বার বলেন, বর্ত্তমানে বাঙালায় রাজবন্দীর সংখ্যা ১৭৪৯ জন। ৭৬৬ জন বন্দীকে বন্দী-নিবাসে রাখা হইয়াছে এবং ৬২৪ জন জেলে ও দেউলী বন্দী নিবাসে আছে, এতদ্ব্যতীত ২৫৫ জনকে গ্রামে অন্তরীণ করা হইয়াছে ও ১০৪ জন নিজগৃহে অন্তরীণ।

রায় বাহাদুর এস. কে. দাস বলেন, ব্যয় সংক্ষেপের অনুরোধে গ্রামে অন্তরীন সংখ্যা হ্রাস করিয়া তাহাদিগকে নিজ গৃহে অন্তরীন করা আবশ্যক। তদুত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন এই বিষয়টী সাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রশ্নের সহিত জড়িত সুতরাং এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গবর্ণমেণ্টই করিবেন।

চট্টগ্রামে সৈন্য রক্ষার ব্যয়

চট্টগ্রামে সৈন্য মোতায়েন করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বাবদ ২৫১৩৭ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই টাকা ১৯৩১-৩২ সালের ব্যয়ের জন্য। আরও ৪২১৩২ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে।

মেদিনীপুরের অধ্যাপক বিদায়

মেদিনীপুর কলেজের অস্থায়ী প্রিন্সিপাল ও অধ্যাপক শ্রীযুত থাকপদ বিশ্বাস এবং আরও দুইজন অধ্যাপককে বিপ্লব দমন আইন অনুসারে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মেদিনীপুর ত্যাগের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে স্কুল মাষ্টার উক্ত সহর হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। এবার তিনজন অধ্যাপকের উপর উক্ত আদেশ জারী হইল।

জাপ-ভারত চুক্তি

জাপানের সহিত ভারতের বাণিজ্য-চুক্তিতে আমরা যতদূর বুঝিলাম, তাহাতে জাপানী বস্ত্রের প্রসার বৃদ্ধি ক্রমশঃই ভারতে বৃদ্ধি হইবে। এক লাঙ্কাশায়ারেই রক্ষা ছিল না তাহার উপর জাপান দোসর হইল। এতদিন জাপানী কাপড় প্রকাশ্যে চলিতে ছিল না। এখন ভারতের বাজারে তাহা রীতিমত জোরেই চলিবে। পূর্ব্বে মহা-

জনেরা স্বনামে বা বেনামে সুকৌশলে জাপান হইতে বস্ত্র আনাইয়া বেচিতেছিলেন কিন্তু এই চুক্তির পর জাপান গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন। ভারতের মহাজনেরা আর বিশেষ অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে না। এবং ভারতের টাকা বেশী পরিমাণে বিদেশে চলিয়া যাইবে, এই চুক্তিতে ইহা স্থির হইয়াছে যে জাপান ভারতের তুলা খরিদ করিবে তাহাতে বুঝানো হইয়াছে যে জাপান ভারতের লাভ ব্যতীত লোকসান নাই। কিন্তু এই চুক্তি না হইলে ও জাপান যে ভারতীয় তুলা লইত এমন নহে কেননা এখান হইতে তাহার যথেষ্ট সুবিধা আছে। ভারতে বহু কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ও উহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। কাপড় ও যথেষ্ট প্রস্তুত হইতেছে পরন্তু তাহার মূল্যও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। এমতাবস্থায় জাপানের সহিত ভারতের এরূপ চুক্তি যুক্তিযুক্ত হয় নাই।

—নায়ক

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত

বসুবিজ্ঞানমন্দিরে স্যার জগদীশ বসু যে সব গবেষণা করিয়াছেন তাহা জার্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। রুশদেশীয় একজন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ রুশীয় ভাষায় ঐ গবেষণার একটি বর্ণনা বাহির করিয়াছেন। এইরূপ প্রকাশ যে বসুবিজ্ঞানমন্দিরের যে সব গবেষণা করা হইয়াছে তাহা পোলিশ ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য অনুমতি চাওয়া হইয়াছে।

সরকারী চাকুরীতে বিবাহিতা মহিলা

ব্যবস্থা পরিষদে স্যার হ্যারী হেগ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ডাক ও তার বিভাগের চাকুরীতে ১১৯টী বিবাহিতা মহিলা নিযুক্ত আছেন ; এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হেড কোয়ার্টারে নিযুক্ত .আছেন ; ৩৪টী বিবাহিতা মহিলা। শেষোক্ত ৩৪ জনের মধ্যে তিনজন অস্থায়ী এবং আর একটী মহিলা একজন পাকা কর্ম্মচারীর স্থানে অস্থায়ীভাবে ব-দল দিতেছেন।

নারী-শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ

প্রয়াগ মহিলা বিদ্যা পিঠের সমাবর্ত্তন সংস্কারে পণ্ডিত জওহর লালের সুন্দর অভিভাষণের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। পণ্ডিতজী নারী-শিক্ষার উদ্দেশ্যও আদর্শ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা নারী সমাজের অবশ্য চিন্তনীয় ও গ্রহণীয় বিষয়।

"পুনরুত্থান যদি আমাদের জাতীয় কামনা হয় তবে জাতির অর্দ্ধাংশ নারী-সমাজ অজ্ঞ ও নিরক্ষর থাকিতে সে কামনা কিরূপে পূর্ণ হইতে পারে? জননীরা যদি আত্মনির্ভরশীলা ও নিপুণা হন তবে সন্তানেরা কিরূপে আত্মনির্ভরশীল ও নিপুণ হইবে?

সমাজ ব্যবস্থার দোষে নারী তাহার গুণগ্রাম বিকাশের সুযোগ লাভ করে নাই।

ক্রমে কোনও কোনও পাশ্চাত্য দেশে নারী কিছু কিছু স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষের নারীর নিকট প্রগতির আহ্বান আসিলেও আজও সে পশ্চাৎপদ, বাহ্য সামাজিক দুর্নীতি দূর করিতে হইলে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা যে সংস্কারে জড়িত, তাহা সবলে ভাঙ্গিতে হইবে।

আমাদের প্রত্যেকের সমক্ষেই আজ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা ভারতের জনগণের গুরুভার অপসারণ। কিন্তু ভারতীয় নারী সমাজের সম্মুখে আর একটি অতিরিক্ত সমস্যা আছে, তাহা পুরুষের সৃষ্ট বন্ধন শৃঙ্খল মোচন। আত্মপ্রচেষ্টায় তাহাদিগকে দ্বিতীয় সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে।

আজিকার অনুষ্ঠানে যে সকল বালিকা ও তরুণী উপস্থিত তাহাদের অনেকেই পাঠ সমাপনপূর্ব্বক ডিগ্রী ধারণ করিবেন এবং তৎপর বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবেন। কোন্ আদর্শের বাণী তাঁহারা বিশাল

কর্ম্মক্ষেত্রে বহন করিয়া লইয়া যাইবেন? কোন্ অন্তর্নিগূঢ় ইঙ্গিতে তাহাদের জীবন ও কর্ম্ম-শক্তি নিয়ন্ত্রিত হইবে? আমার আশঙ্কা হয়, অনেকেই জীবনের দৈনন্দিন কর্ত্তব্যে বিব্রত হইয়া পড়িবেন—মহত্তর আদর্শ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইবেন। আবার অনেকেই জীবিকার্জ্জন ব্যতীত অন্য কোনও চিন্তা মনে স্থান দিবেন না।

পণ্ডিতজী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্বন্ধে বলেন, "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ছাত্রদিগকে দুর্গম পার্ব্বত্য পথে আরোহণ করিতে উৎসাহ দেয় না। নির্ব্বিঘ্ন সমতল ক্ষেত্রে পড়িয়া থাকিতেই প্ররোচনা দেয়। আমাদের শাসকজাতির তরুণদের মত ছাত্রদিগকে নির্ভীক স্বাধীন চিন্তা শিক্ষা দেয় না। উপরিওয়ালার শৃঙ্খল ও শাসন অবনতশিরে মানিয়া লইতে শিক্ষা দেয়। সুতরাং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ যে নৈয়াগুকর জড় পঙ্গু এবং সংগ্রামশীল জগতের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? যদি জাতীয় শিক্ষা বিস্তার করিতে হয় তবে সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে।

অনেকে বলিয়া থাকেন, পুরুষের শিক্ষা অপেক্ষা নারীর শিক্ষার ধারা স্বতন্ত্র হওয়া কর্ত্তব্য। সাংসারিক কর্ত্তব্য ও বিবাহরূপ বৃত্তির উপযোগী শিক্ষালাভই নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু শিক্ষাকে এইরূপ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ করিতে আমি অক্ষম। আমার মতে, নারী যাহাতে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারে, এইরূপ ব্যাপক শিক্ষা পুরুষের ন্যায় তাহার পক্ষেও অত্যাবশ্যক। রাজনৈতিক অবস্থা অপেক্ষা অর্থনৈতিক অবস্থার উপরই স্বাধীনতা অধিকতর নির্ভরশীল।

নারী যদি আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারে তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই স্বামী অথবা অপর কোনও পুরুষ আত্মীয়ের অধীন হইয়া থাকিবে।

নর নারীর সাহায্য সমানাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য—এতদ্ব্যতীত যে সাহায্য তাহা একের উপর অন্যের প্রভুত্ব মাত্র।

জাতিভেদ দূরীকরণে আইন

বরদা ষ্টেট কাউন্সিল জাতিভেদ অত্যাচার দূরীকরণে আইন পাশ করিয়াছেন।

শক্তিশালী বাঙালী মেয়ে

কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রামমোহন প্রদর্শনীতে ১৫ বৎসর বয়স্কা কুমারী অরুণা ব্যানার্জ্জি ১টা ৪ সিলিণ্ডারের ১১ ঘোড়ার শক্তিবিশিষ্ট মোটর গাড়ীকে টানিয়া রাখিয়া আপনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

মিশরীয় বৈমানিকার কৃতিত্ব

মিশরীয় তরুণী. বৈমানিকা এথনাদী লুৎফিয়া কাইরোতে বিমান প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়াছেন। কাইরো হইতে আলেকজান্দ্রা পর্য্যন্ত ২৩০ মাইল পথ দ্রুততম বেগে গমন করিয়া লুৎফিয়া শীর্ষস্থান দখল করিয়াছেন।

বাঙ্গালোরে মহিলা কাউন্সিলার

শ্রীযুক্তা আনন্দ বাই সঞ্জীব বিত্রবিল বাঙ্গালোর মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

অসমীয়া মহিলা এম, বি

গৌহাটির শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা তিলোত্তমা দাস এবার এম বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি আসাম উপত্যকার মহিলাদের মধ্যে দ্বিতীয় এম-বি। তার পূর্ব্বে শ্রীযুক্তা রজনী প্রভা দাস এম বি পরীক্ষায় পাশ করিয়াছিলেন।

বেকার সমস্যা সমাধানে পণ্ডিত জওহর লালের অভিমত

গত ১৮ই জানুয়ারী কলিকাতায় বঙ্গীয় বেকার যুবক সমিতি পণ্ডিত জওহরলালকে যে মানপত্র প্রদান করে তাহার উত্তরে পণ্ডিত জওহরলাল বলেন, যে বেকার সমস্যা শুধু বাংলার নহে পরন্তু বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা। কিন্তু বাংলার শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারসমস্যা যেরূপ প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে ভারতবর্ষে অন্য কোন প্রদেশে সেরূপ আকার ধারণ করে নাই।

পণ্ডিতজী এই মত প্রকাশ করেন যে, বেকার সমস্যা সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে বর্ত্তমান জগতের সামাজিক ব্যবস্থার কয়েকটী মূল বিষয় পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

তাঁহার মতে ধনতন্ত্রবাদ হইতেছে, বেকারদের দুঃখদুর্দ্দশার মূল কারণ। বেকার সমস্যার অনিষ্টকর প্রভাবের মূলচ্ছেদ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে সমাজের বর্ত্তমান, ধনতন্ত্রমূলক ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। যাহাতে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে সেইরূপ ভাবে কাজ করিতে যুবকদের পরামর্শ প্রদান করেন। পণ্ডিতজী বলেন, বেকার সমস্যার সমাধানে একটি অর্থ-নৈতিক বিপর্য্যয়ের প্রয়োজন। এই ইপ্সিত বিপর্য্যয় যাহাতে শীঘ্র আসিতে পারে তজ্জন্য প্রত্যেক যুবককে সেইরূপ ভাবে কাজও আন্দোলন করা আবশ্যক।

বেকার ইন্সিওরেন্স কিম্বা সরকারী সাহায্য দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন না। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় শিল্প ও কৃষিবিষয়ক কার্য্য তালিকা গ্রহণ দ্বারা কয়েক সহস্র লোকের অন্নের সংস্থান হইতে পারে মাত্র কিন্তু সমগ্র সমাধান সম্ভবপর হইবে না। বাংলার যুবকদের পক্ষে এই মুহূর্ত্তে কিরূপ কার্য্য-তালিকা অবলম্বন করা উচিত তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে পর উত্তরে পণ্ডিত জহরলাল বলেন যে, বাংলার বেকার যুবকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের দাবী উপস্থিত ও আন্দোলন করিতে হইবে। বেকার যুবকেরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্য্যয় ঘটাইবার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপাদান স্বরূপ।

তিনি আরও বলেন ক্রমাগত বেকার থাকার ফলে দুঃখকষ্ট ভোগও অনাহারে আত্মহত্যা করা অপেক্ষা বেকার সমস্যার মূল কারণ সমূহ নির্ম্মূল করিতে গিয়া মৃত্যুবরণ করাও অধিকতর শ্রেয়ঃ।

গান্ধীজি ও বিহারের বিধ্বস্ত জন-সাধারণ

হরিজন সমস্যাই ভারতের মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখিতে পাই। প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে বা গোষ্ঠিগত জটলাতে সব যায়গায়ই কেবল হরিজন সমস্যার কথা। গান্ধীজি দেশসেবার সুদীর্ঘ তালিকার বিস্তৃত শাখা পরিত্যাগ করে' হরিজন সমস্যা নিয়ে ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছেন। সর্ব্ব-সাধারণের মন্দির প্রবেশের প্রয়োজন এখন ভারতের সকল সমস্যাকে দূরে ঠেলে রেখেছে। মহাত্মা তাঁর সব কার্য্য-তালিকা ছেড়ে বহু কষ্ট স্বীকার করে' ভারত অভিযানে বেরিয়েছেন, অনুন্নত হরিজনদের মুক্তি মন্ত্র শোনাতে। পৃথিবীর সুসভ্য জাতিমাত্রই এই একই প্রথা অবলম্বন করেছে কিন্তু মূলতঃ পার্থক্য রয়ে গেছে এক মারাত্মক বিন্দুতে। ইটালী, জার্ম্মানী বা রুশিয়াতে অশিক্ষিত জন-সাধারণের উন্নয়নের পন্থা দেখি অন্য রকম।

বিহারের বিপর্য্যয় সম্বন্ধে গান্ধীজীর অভিযোগের প্রতিবাদ

অস্পৃশ্যতা সমর্থকগণের কার্য্য ফলেই বিহার বিধ্বস্ত গান্ধীজীর এইরূপ উক্তিতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন:—

যাঁহারা অন্ধভাবে অস্পৃশ্যতার পক্ষপাতী তাঁহাদের কার্য্যের ফলেই বিহারের কোন কোন অঞ্চলে এই নিদারুণ দৈব দুর্ব্বিপাক ঘটিয়াছে; মহাত্মা গান্ধীকে এইরূপ অভিযোগ করিতে শুনিয়া আমি দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিরুদ্ধ এই শ্রেণীর মতামত আমাদের দেশের বহু লোক অনায়াসে গ্রহণ করে। এই জন্যই মহাত্মাজীর এরূপ উক্তি অধিকতর দুঃখের কারণ হইয়াছে। সমস্ত বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই আমি আজ বলিতে বাধ্য যে, এরূপ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের মূলে কতিপয় প্রাকৃতিক ঘটনার সমন্বয় অপরিহার্য্য। এই সমস্ত সমন্বয় না হইলে আকস্মিক দুর্য্যোগ ঘটে না। বিশ্বের নিয়মাবলী অপরিবর্ত্তনীয়; এই সমস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া ভগবান তাঁহার সৃষ্টি বিপন্ন করেন না; ইহাই যদি আমাদের বিশ্বাস হয় তাহা হইলে ইদানীং বিহারে মহা অনর্থ ঘটিয়াছে, তাহাও যে ভগবানেরই বিধান, একথা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। নীতিগত প্রশ্নের সহিত যদি প্রাকৃতিক ঘটনাবলির ঘটনাবলীর সামঞ্জস্য করিতে চাই, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, যে বিধাতা প্রচণ্ড দৈব দুর্য্যোগ দ্বারা লোকশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে চান, তাহা অপেক্ষা মানুষই অনেকাংশ শ্রেষ্ঠ। কারণ, এমন কোন সভ্য শাসনকর্ত্তার কথা আমরা কল্পনাও করিতে পারিনা যিনি বহু দূরে অবস্থিত অপরাধীদিগকে সমুচিত শিক্ষাদানের অভিপ্রায়ে যুবাবৃদ্ধ ও শিশু নির্ব্বিশেষে অস্পৃশ্য সম্প্রদায়েরও বহুলোকের প্রাণনাশ করিতে পারেন।

কোন যুগই অন্যায় অবিচার হইতে একেবারে বিনির্ম্মুক্ত নহে। অন্যায় অবিচারে পূর্ণ দুর্গপ্রাকার এখনও অবিকম্প অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। যে সমস্ত কলকারখানা বুভুক্ষু কৃষকের দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতার উপর নিতান্ত নির্দ্দয়ভাবে দণ্ডায়মান, জগতের নানাস্থানে যে সকল কারাগার নির্দ্দয়তা ও নৃশংসতায় পরিপূর্ণ হইয়া আছে তৎ-সমস্তই এ পর্য্যন্ত অবিরল রহিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয়, মাধ্যাকর্ষণ সংক্রামক নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। মহাত্মার বিরোধীরাও বলিতে পারেন, মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী দলের কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপই ভগবান বিহারের ভূমিকম্পের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সে যাহাই হউক আমাদের বিশ্বাস এই যে, আমাদের ভ্রান্তি এবং পাপের মাত্রা যতই অধিক হউক না কেন, তাহা কিছুতেই ভগবানের সৃষ্টিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভগ্নস্তুপে পরিণত করিবার মত প্রবল শক্তিসম্পন্ন নহে। পাপীও নিষ্পাপ এবং গোড়াও সংস্কারপন্থী সকলেই এই কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন।

শ্রমিকদের প্রশংসনীয় দান

কানপুর ফ্লেক্স জুতার কারখানার কর্ম্মচারীও শ্রমিকেরা মিলিয়া ২২০০৲ সংগ্রহ করতঃ কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতিতে প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রমিকেরা আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য চাঁদা করিয়া ৪০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। ভূমিকম্প পীড়িতদের দুর্দ্দশার কাহিনী তাহাদের কর্ণগোচর হওয়ায় তাহারা তাহা বন্ধ রাখিয়া সংগৃহীত টাকা সাহায্য ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

অদ্ভুত আইন

ইষ্ট ইণ্ডিজের অন্তর্গত তাইমুরলোৎ প্রদেশে আইন আছে পুরুষের সামনে নারী এক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিবে। দুই চোখ কদাপি খুলিয়া রাখিবে না।

নবাবের সখ

ভাওয়ালপুরের নবাব পুতুল কিনিবার জন্য লণ্ডন গিয়াছিলেন। তিনি একদিনে ১০১২৫ টাকার পুতুল কিনিয়াছিল। মানুষ অর্থের কত ভাবেই না অপব্যবহার করে।

ইংলণ্ডে পার্লামেণ্ট সভায় প্রশ্নোত্তর

বিলাতে পার্লামেণ্টে সভায় মিঃ ডেভিস গ্রেনফেল জিজ্ঞাসা করেন,—মেদিনীপুর জেলায় কাঁথিতে গাড়োয়ালী সৈন্যদের কুচকাওয়াজের সময় হাজির থাকিবার জন্য কেন জনসাধারণকে আদেশ করা হইয়াছিল? কেন তাহাদিগকে বৃটীশ পতাকা অভিবাদন করিতে বলা হইয়াছিল? কোন আইন বলে সাধারণ অধিবাসীকে সামরিক প্যারাডে উপস্থিত থাকিতে বলা হইয়াছিল? এই আদেশ অমান্য করার জন্য কয়েকজনকে দণ্ডিত করা হইয়াছিল কিনা?

উত্তরে ভারতসচিব সার স্যামুয়েল হোর বলেন, এবিষয়ে সমস্ত তথ্য অবগত হইবার জন্য আমি ভারতগবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিতেছি। আশাকরি আগামী সপ্তাহে উত্তর দিতে পারিব।

পৃথিবীর দুর্ভিক্ষ

খৃঃ পূঃ ৪৩৬ সালে—রোমে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।

খৃঃ পূঃ ৪২ সালে ইজিপ্ট সহরে ভীষণ দুর্ভিক্ষের ফলে অগণিত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১০৫৫ ও ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে দুর্ভিক্ষ হয়।

১১৪৮—১১৪৯—১ বৎসর ব্যাপী মিশরে দুর্ভিক্ষ।

১১৬২ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষ হয়। ভারতবর্ষে—৯৫১, ১০২২, ১০৩৩ খৃঃ ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় এই সমস্ত দুর্ভিক্ষে জনসাধারণ এমন কি গাছের পাতা খাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছে। ১৭৫৯—১৭৭০—বাংলায় দুর্ভিক্ষ—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, ১ কোটীর অধিক লোকের মৃত্যু হয়।

এই দুর্ভিক্ষের কারণ দেখাইতে গিয়া মার্কস্ বলিয়াছেন—

Between 1769 and 1770 the English manufactured a famine by buying up all the rice and refusing to sell it again except at fabulous price.

১৭৯০-৯২—ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ, এত লোক মারা যায় যে তাহাদের পোড়াইবার লোক পাওয়া যাইত না।

১৮৪৬-৪৭—আয়র্ল্যাণ্ডে

১৮৯১-৯২—রাশিয়ায়

১৮৭৬—বাংলা ও উড়িষ্যায়

১৮৯৯-১৯০১—ভারতবর্ষে ১০ লক্ষের মৃত্যু

১৮৭৭-৭৮, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, মহীশূর—৫০ লক্ষ মৃত্যু

১৯২১-২২—রাসিয়ায় ২০ লক্ষ

১৮৭৭-৭৮, উত্তর চীন, ৯০ লক্ষ ধ্বংস

বর্ত্তমান ভারতের নিত্য দুর্ভিক্ষ প্রায় ৫ কোটী লোক একবেলা খাইয়া থাকে। ১০ লক্ষ লোক আমের আটী, ইত্যাদি খাইয়া কোনমতে জীবন বাঁচাইয়া রাখে।

———

রূপকথা

শ্রীসুকৃতি সেন

সেই গান—সেই সুর ; সেই বিস্মৃত-প্রায় গানের একটি মাত্র চরণ আজ তাহাকে উদাস করিয়াছে, পাগল করিয়াছে! পরিস্পূর্ণ যৌবনের প্রস্ফুট প্রসূণ ঘিরিয়া কেবল গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে—তুমি এসোগো এসো।

অতি করুণ সে সুর—দূরাগত একটি বংশীধ্বনির কোমল মুচ্ছর্নার মত, উদাস করে পাগল করে! উন্মেষ উন্মুখ যৌবনে যে গান সুরশিল্পির কণ্ঠ-স্পর্শে মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে আনমনা করিয়াছিল আজ যৌবনের পরিপূর্ণতার তাহাই মুগ্ধ করিয়াছে, আকর্ষণ করিতেছে।

কে গো তুমি অ-জানা সুর-শিল্পি তুমি কে? ওগো ব্যথাতুরা নারী বিরহিনী—কে তুমি? কণ্ঠস্বর তোমার এমন করুণ কেন শিল্পি, কুশলী শিল্পির সুর-সাধনা এ নয় তো! বেদনাপ্লুত হৃদয়ের এ যে করুণ আর্ত্তনাদ ; অতৃপ্ত বাসনার মর্ম্মান্তিক হাহাকার।

রাজকুমারের হৃদয় মথিত করিয়া দীর্ঘশ্বাস যেন প্রার্থনা করে ;—আমার কণ্ঠে সুর দাও—হে ভগবান্ ; সুরে সুর মিলাইয়া, আকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করি—কেন এ কান্না ; ওগো ক্রন্দন-পরা! তুমি কে গো, তুমি কে?...

মুক্তিপুরের রাজকুমার, হে যুবক রাজকুমার। মনের শান্তি তাহার হারাইয়া গেছে। বন্ধুবর্গের উছল অট্টহাস্য তাহার অটুট গাম্ভীর্য্যের নিকট হার মানিয়াছে—বন্ধুবর্গ আর আসেনা।

নর্ত্তকীর নুপুর নিক্কণ, লাস্যলীলা, তাহার স্তব্ধ হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিয়া অপরিসীম লজ্জায় অন্ধকারে আত্ম-গোপন করিয়াছে। প্রমোদভবন নিস্তব্ধ পরিত্যক্ত। মালাগুলি ম্লান হইয়া গেছে, পুষ্প-পাত্রে রজনীগন্ধা নিষ্প্রভ হইয়া ধীরে ঝরিয়া পড়িতেছে। শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পির শিল্প-সৃষ্টি আজ ভাব-হীন, অর্থহীন। কিছুই সে চাহেনা—কিছুই তার প্রয়োজন নাই।

দীর্ঘ রাত্রি অবসানে কুয়াসাচ্ছন্ন প্রভাতের আবির্ভাব হয়, তাহার পর যে মধ্যাহ্ন তাহাও ম্লান, স্তিমিত ; আসে ধূলায় মলিন গোধূলি—ধূসর সন্ধ্যা, অবশেষে তিমির নিবিড় স্তব্ধ রাত্রি।

...অর্থহীন—বৈচিত্র্য-বিহীন।...অসংখ্য ভ্রমণকারীদের কাহিনী সংগ্রহ করিয়া রাজপুত্র পাঠাগারে স্তূপাকার করিয়াছে। তাহাদের সহিত দেখিয়াছে, কোথায় দুর্গম গিরিশ্রেণী মাথায় সাদা বরফের শিরস্ত্রাণ—আকাশের সহিত লুকোচুরি খেলা করে। দিবসের প্রদীপ্ত আলো যেখানে রাম-ধনুর স্বপন রচিয়াছে। কোথায় ও দেখিয়াছে গিরিদরী বিদীর্ণ করিয়া নামিয়া আসে পার্ব্বত্য নদী অবাধ উচ্ছৃঙ্খল গতি। যেথায় পায় বাধা—গর্জ্জন করে—আবর্ত্ত সৃষ্টি করে অথবা কলসঙ্গীতে নৃত্য করিয়া সপিল গতিতে ছুটিয়া চলে। তাহারই বাঁকে বাঁকে শ্যামল সজল শস্য ক্ষেত্র ; হয়তো শান্ত-স্নিগ্ধ ঋষিদের আশ্রম ; হরিণ শিশুরা নির্ভয়ে খেলা করে, আশ্রম বালিকারা তরু-মূলে জল সেচন করে, প্রাতে ও সন্ধ্যায় আশ্রম বালকদের স্তোত্র গানে বনভূমি মুখর হয়।

আবার কোথাও দিগন্তপ্রসারিত মহাসমুদ্র—সগর্জ্জনে বালুকাময় তীরভূমিতে আছড়াইয়া পড়িতেছে;—দূরে রাশি রাশি তরী সাদা পাল তুলিয়া অনুকূল বায়ুভরে ছুটিয়া চলে; কোথায় তাহারা যায় কে জানে।

দেখিয়াছে —উত্তপ্ত মরুভূমি, তুহিন শীতল মেরুদেশ।

অন্ধকার বিজন অরণ্যাণী—উন্মুক্ত-উদার প্রান্তর দেশ।

কিন্তু, সে কোথায়? সে অতুলনীয়া কমনীয় কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী যে? কে সে কোথায় তাহার বাস?

স্তূপীকৃত পুস্তক ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া রাজকুমার ছুটিয়া বাহির হইয়া আসে—একেবারে রাজ-প্রাসাদের উচ্চতম শিখরে।

আলিসায় হেলিয়া উদাস দৃষ্টিতে রাজপুত্র চাহিয়া থাকে দূর দিগন্তে; আকাশ যেখানে মাটির উচ্ছ্রিত বাহু-বন্ধনে নিবিড় হইয়া ধরা দিয়াছে। তবু কোথায় সে?...

বাতাসে কান পাতিয়া শোনে—অস্পষ্ট অথচ মধুর সেই সুর—এসো গো তুমি এসো।

উদ্‌গ্রীব হইয়া রাজপুত্র শোনে···বুঝি সেই অজানাকে চিনিয়া লইতে চায় এই বাতাস হইতে—সে বাতাস তাহার রুক্ষ চুলগুলি লইয়া খেলা করে, কানে অস্ফুট রহস্যের আভাষ দিয়া হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে। তবু কে সে? ওই যে—শ্বেত রাজহংসের দল উড়িয়া চলিয়াছে শ্বেত পাখায় ভর করিয়া ক্ষণ পরে যাহারা অসীমের বুকে লীন হইয়া যাইবে; কোথা হইতে তাহারা আসে—কোথায় বা যায়? ওরা কি জানে ওরা কি দেখিয়াছে সে বিশ্ববাঞ্ছিতাকে, অপরূপ যার রূপ আমার মানসপটে অস্ফুট রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার জন্য আমার প্রেমের প্রদীপ উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলে? হয়তো দেখিয়াছ হয়তো নয়।...

তারপর, রাত্রির জোয়ারে দিবা অবসান হয়—রাজকুমার পাঠাগারে ফিরিয়া আসে; এমনি করিয়াই দিন যায়।

স্তব্ধ অতন্দ্র রাত্রে রাজকুমার বাঁশী বাজায় যেন প্রার্থনা করে;—তোমায় তো আমি পেলেম না লক্ষ্মী। আমার বাঁশীর সুর যেন তোমার সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হয়। সুরের খেলায় আমার কামনা নিবেদন, তোমার উদ্দেশে, তুমি সাড়া দিওগো দিও।

বাঁশীর সুর নিষ্ফলে দিগন্ত হইতে কাঁদিয়া ফিরিয়া আসে। কাঁদিয়া, শ্রান্ত হইয়া অবশেষে বিশ্বব্যাপী নিস্তব্ধতায় কোথায় হারাইয়া যায়, বৃথা! বৃথা!

ব্যথাতুর রাজপুত্র, উন্মুক্ত প্রান্তরে নতজানু হইয়া প্রার্থনা করে, অগনণ জ্যোতিষ্কের নিকট,—আমায় বল কোথায় সে।

পথের কথা আমাকে বলিয়া দাও; আমার ব্যথা তোমরা গ্রহণ কর, বিশ্বে দাও পরিব্যাপ্ত করিয়া;—সেখানে যাক, যেথায় বাতায়ন তলে সে বসিয়াছে আমারি প্রতীক্ষায়;—আমারি তম

দিবসরাত্রি আনন্দ-উৎসব ম্লান করিয়া জাগিয়া আছে একটি মাত্র কামিনী আমাকে পাইবার, আমাকে জয় করিবার কামনা আমার প্রেমের কামনা।

রাজা বলেন মন্ত্রি, কাল শয়ন মন্দিরে-মহিষীর চোখে জল দেখ্‌লাম। সভাসদগণের দুশ্চিন্তার আর সীমা থাকেনা।

রাণী অভিযোগ করলেন যে রাজকুমার সেন উদাসীন। শিল্পাচার্য্যেরা বিদায় প্রার্থনা করেছেন। প্রমোদভবনে নর্ত্তকীদের নৃত্যলীলা স্তব্ধ হয়ে গেছে, পুষ্প-উদ্যান আগাছায় ছেয়ে গেল বলে। রাণী তোমারও অন্যমনস্কতা দোষের অভিযোগ করলেন, মন্ত্রী।

মন্ত্রি বলেন, আদেশ করুণ মহারাজ, রাজকুমারকে এই সভায় ডেকে পাঠাই।

রাজার পাশেই রাজপুত্রের আসন। রাজা বলেন, কুমার, আমি বৃদ্ধ জরাগ্রস্থ। শক্তিমান তুমি, তুমি রাজদণ্ড গ্রহণ কর। বহু বিস্তৃত রাজ্য বিপুল ঐশ্বর্য্য, অগণিত সৈন্যসামন্ত আমার, উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত করে আমি বানপ্রস্থ অবলম্বন করবো, শাস্ত্রের এইবিধান।

রাজকুমার বলে, ভেবে দেখ্‌বো। মনে মনে বলে, তোমার সোনার শৃঙ্খলে আমি ধরা দেবনা তো।

মন্ত্রী বলেন, রাজকুমার, এইবার চল দ্বিগ্বিজয়ে, আমরা মদ্রদেশ জয় করবো, বলদর্পী গান্ধারের দর্প কর্‌বো চূর্ণ—আর—রাজপুত্র উল্লসিত হয়ে বলে, চলুন, তাই চলুন।

রাজা বলেন, গোপন প্রকোষ্ঠের আলেখ্যগুলি এইবার রাজকুমারকে দেখাও, মন্ত্রি।

মন্ত্রী বলেন,—সে আদেশ।

কত দেশ বিদেশের রাজকন্যাদের, শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের আলেখ্য রহিয়াছে—প্রকোষ্ঠের ভিত্তি গাত্রে।

ওইতো মদ্ররাজকন্যা, হাসিতে যার পদ্মফুলের প্রস্ফুট প্রফুল্লতা। পাশেইতো গান্ধার রাজকন্যা ললাটে যার অপূর্ব্ব নির্ম্মলতা। মৃগনয়না কোশল রাজকন্যা তো ওই। এমনি আরো আরো কত! কেহ মীনাক্ষী ক্ষীণাঙ্গী কেহবা, কেহ সুতনু সু-মধ্যমা; কাহারো বা আগুলফ্‌ লম্বিত কেশদাম, কাহারো দেহে শ্যামল সরসতা কিন্তু সে কোথায়? সেই অরূপা, অতুলনীয়া তবে তুমি কে গো তুমি কে?

মেঘবরণ তোমার কেশ, ললাটে তোমার শরৎ আকাশের নির্ম্মেঘ প্রশান্তি, দুটি নেত্র কণিকায় তমিস্র রাত্রির অবগাঢ় কালিমা। চাঁপার কলির মত দুটি ঠোঁটের ফাঁকে প্রবালের দাঁত, বিম্বফল ওষ্ঠ। দেহে ভরা-নদীর উচ্ছল যৌবন—সর্ব্ব অবয়বে কুসুমের পেলবতা কোমলতা। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য তিলে তিলে চয়ন করিয়া তোমার সৃষ্টি। ওগো তিলোত্তমা বুঝি আলেখ্য বন্ধনে তোমায় ধরা যায় না। হয়তো নয়ন অন্তরালে কোন ঝর্ণার ধারে বিহগ কুজন মুখর অরণ্যে তোমার বাস—কিম্বা কোন সাতমহলা রাজপুরীর সুগুপ্ত অন্তঃপুরে!...

গোপনে প্রাসাদের উচ্চতম শিখরে আসিয়া সুদূরের পানে চাহিয়া রাজপুত্র বলে,—এসো, সাড়া দাও। বল, আমায় বল, কোথায় তুমি থাক কোন সুদূরে কোন দুর্গম পাহাড়ের গুহায় অথবা কোন দুস্তর মরুভূমির পরপারে। কোথায়, ওগো কোথায়? পাতালের কোন অন্ধতম গুহায় তোমায় শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছে কি—কোন দৈত্য দানব অথবা যক্ষ? এসো বল, বল!

বাতাসে তোমার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসুক। আমি সুদূরকে জয় করিব, হেলায় অতিক্রম করিব দুর্গম দুস্তর সীমা! অগণিত সৈন্য আমার, বক্ষে সাহস, বাহুতে অমিত শক্তি।

রাজপুত্র উৎকীর্ণ হইয়া বসিয়া থাকে, পত্রমর্ম্মরে, ঝিল্লিস্বননে—অরণ্য ছায়ে উতল বাতাসের উদ্দাম নৃত্য, রাজপুত্রকে আনমনা করে—সচকিত করে, আবার নিস্তব্ধতা!

রাণী মন্দিরে ষোড়শ উপচারে পূজা মানস করেন। ষষ্ঠীতলায় মহাধূমধামে পূজা হয়। গ্রহ-দেবতার মন্দিরে রাণী প্রার্থনা করেন, আমার কুমারের মনে শান্তি দাও ঠাকুর, ষোড়শ উপচারে তোমার পূজা করিব। গ্রহ দেবতার পদরজ কুমারের মাথায় স্পর্শ করান, কুমার হাসে। দেবতার বেদীর পাশে নিবেদন করে আমায় শান্তি তুমি দিওনা দেবতা, শান্তি আমার কাম্য নয়। শুধু তাহাকে আমি চাই, যে সকরুণে আমাকে আহ্বান করে; ডাকিয়া পাগল করে, উদাস করে। দীর্ঘরাত্রি বিনিদ্র থাকিয়া রাজকুমার হয়তো বা স্বপ্ন দেখে ঃ—

হয়তো কোন সুদূর দেশের এক প্রান্তে অরণ্য ছায়ে একটী গৃহ। ছায়াবন বিহারিনী বুঝি সেখানে অবসর যাপন করে। কিন্তু, তাহার বাসগৃহ সেখানে নয়তো। সেই অচেনা দেশের প্রান্তে যে সুদুর্গম গিরিশ্রেণী—তাহারি উপর শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত তাহার বাস-গৃহ। পাহাড় কাটিয়া সিঁড়ি ধাপে ধাপে নামিয়াছে নিম্নে হ্রদ পর্য্যন্ত। দিনের শেষে পশ্চিম আকাশের রক্ত আভা যখন শ্বেত সোপানাবলী রক্তরাগ রঞ্জিত করে তখন সে নামিয়া আসে হ্রদের জলে, আবাহন করে, জল-সারসীর সাথে করে খেলা। স্নানশেষে সোপানের উপর আসিয়া বসে পা দুখানি জলে ডুবাইয়া দিয়া, অস্তাচলের আলো রশ্মির পানে চাহিয়া থাকে।

ম্লানায়মান দিনের আলোর ব্যথাতুর সেই মুখখানি যেন রাজপুত্র দেখিয়াছে, স্বপ্নে, কল্পনায়-কতবার।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামে পৃথিবীর বুকে যে গান করে, সেই গান কী করুণ সে সুর। কত সঞ্চিত ব্যথা যেন সুরে সুরে ঝরিয়া পড়ে—যেন বিশ্বের সুপ্ত মর্ম্মব্যথা সচকিত হয় সেই সুরে সচেতন হইয়া ওঠে তার পর সে উঠিয়া আসে শ্বেত সোপানের বুকে রাঙ্গাচরণ পথের চিহ্ন আঁকিয়া দিয়া আপন গৃহে।

কক্ষের ম্লান-প্রদীপ আলোকে বসিয়া বাজায় বীণা। রাগরাগিণী, মীড়মুর্চ্ছনা ব্যাপ্ত করিয়া ধ্বনিত হয় একটি মাত্র সুর-—তুমি এসোগো এসো তাহারি উদ্দেশে। অথবা বাতায়ন পাশে আসিয়া দাঁড়ায়; বুঝি বীণার তার ছিঁড়িয়া গেছে—কণ্ঠে সঙ্গীত স্তব্ধ হইয়া গেছে। তাই

জ্যোতিষ্কের নিকট নিঃশব্দে ব্যথা জানায় না পাওয়ার ব্যথা নিষ্ফল প্রতীক্ষার কথা তাহারি মত। দুরাবগাহ দুটি চক্ষু তারকায় কাজল কালো রাত্রির বেদনা নিবিড় হইয়া আসে।

তন্দ্রাভাঙ্গিয়া রাজপুত্র বলে, বল সে কোনদেশ—যেথায় তুমি থাক, পথ দেখাইয়া দাও অঙ্গুলি সঙ্কেতে। দিনের নগ্ন আলোয় স্বপ্ন চূর্ণ হইয়া যায়।

সেদিন মেঘেঢাকা অমাবস্যার নিবিড় নিকষ কালো রাত্রি; বাঁধনহারা উতল বাতাসের হাহাকার; নীরব নিস্তব্ধ রাজপুরী!

রাজপুত্র অলিন্দে আসিয়া দাঁড়ায়, এতদিনে সে ধরা দিবে কি? বুঝি ব্যথা তাহার আজ সত্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে—তাই বাতাসে এত হাহাকার করে, রাত্রির মুখ বিষাদে কালো এত। তাহারি দীর্ঘশ্বাসে বাদল ঘনায়—তবু সংশয় জাগে, মায়ার খেলা এ নহে তো? স্বপ্ন? মোহ?

কিন্তু সংশয় সত্য নয়। সুদূরিকার যে আকুল আহ্বান মর্ম্মবীণার ঝঙ্কার তুলিয়াছে তাহাই সত্য এক…একমাত্র সত্য তাই! মাতার রুদ্ধ ঘরের সম্মুখে প্রণাম করে বলে, মাগো, যদি ফিরি আশীর্ব্বাদ কোরো—যেন তাকে নিয়েই ফিরতে পারি।

পিতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলে—অপরাধ নিওনা—তোমার বিপুল ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে তাকে পাওয়া যায় না। না—ই যদি তাকে পেলাম, আমার জীবনের মুল্য কোথায়? নিঃশব্দে রাজপুরী হইতে বাহির হইয়া আসে আর একবার ফিরিয়া বলে—বিদায়! বিদায়!…

কানন বীথি পার হইয়া রাজপথ। শেফালি বলে;—'কোথায়, কাকে খুঁজবে, যে আমার ডাক্‌লো কান্নার সুরে'। বনপতি মাথা ঝাঁকায়, বলে, যেওনা কুমার।…

ছিঃ…বাঁধা—দিওনা বনস্পতি; দেবতা তুমি আশীর্ব্বাদ কর। শেফালি বলে, আমার ছায়াতলে একটু বসো ভাই। আমি তোমাদের অপেক্ষায় পথচেয়ে থাকবো। রাজপুত্র শেফালি তলায় বসে, পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করে; বলে, আসি বন্ধু—। কৃষ্ণচুড়া বলে, আমি যে রিক্ত, কুমার! তোমায় কী দেব ভাই। রাজপুত্র বলে অমনি আশীর্ব্বাদ করো। মাধবী বলে, আবার তুমি ফিরে এসো, তোমাদের জন্য কুঞ্জ রচনা করে বসে থাক্‌বো।

আস্‌বো ভাই। …রজনীগন্ধা দেয় সুবাস; ভুইচাঁপা দেয় ফুলের মালা।

রাজপুত্র কানন বীথি পার হইয়া আসে। উতল বাতাস হাহাকার করে, মেঘ ডাকে, গুরু গুরু, বিজলী ঝিলিক হাসে…

. রাজপুত্র যাত্রা করে নিরুদ্দেশের পানে—অজানার ডাকে।

রাজপুত্র আর ফিরিয়া আসে নাই। আজো নিস্তব্ধ রাত্রে মুক্ত প্রান্তরে কান পাতিয়া থাকিলে দুটী স্বর শোনা যায়। একটী যেন উন্মুখ আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, কে গো তুমি? কোথায় তুমি? সে কণ্ঠস্বরে শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, অন্যটী যেন করুণ অতি করুণ সুরে আহ্বান করে, এসো গো তুমি এসো। বুঝি এ আহ্বান অনন্ত কালের…

ভূমিকম্প।

শ্রীভুবনভদ্রা দেবী।

জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে যে প্রাকৃতির বিপর্য্যয় হতভাগ্য ভারতের দুর্দ্দশাকে চরম পরিণতি দিয়েছে তার মর্ম্মভেদ কাহিনী লোকমাত্রেরই অন্তর বেদনার ভরে তোলে।

ক্ষুদ্র মানুষের শক্তি যে প্রকৃতির কাছে কত অকিঞ্চিৎকর ও হাস্যাস্পদ আজ এই নিদারুণ ভূমিকম্পের ফলে মানুষ তা মর্ম্মান্তিকভাবে অনুভব কর্‌ছে।

যুগে যুগেই মানুষ প্রকৃতির খেয়ালের কাছে আত্মবলি দিয়ে এসেছে সত্য, কিন্তু এবারের সঙ্গে তার তুলনা নাই। এ যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু এসেছিল, সেই মহাকালের আদেশ নিয়ে হরণ করে নিয়ে গেল লক্ষ লক্ষ নরনারীর তাজা প্রাণ আর তাদের বংশানুক্রমে আহরিত সম্পত্তি যা তারা বহু যুগ ধরে তিল তিল করে সঞ্চিত করেছিল। আজ ভারতে এক অংশ শ্মশানে পরিণত হয়েছে। সাজান নগর নিমেষে মানুষের সকল অহঙ্কার চূর্ণ করে ধরণীর বক্ষে লুটিয়ে পড়েছে। একমাস আগেও যে সহর সভ্যতার ধ্বজা উড়িয়ে গর্ব্বিতভাবে দাঁড়িয়েছিল আজ একেবারে বিধ্বস্ত।

এখনও ঐ ভগ্নস্তূপের নীচে কত শত শত নরনারীর দেহ না জানি সমাহিত আছে। যারা প্রকৃতির এই রুদ্রলীলার হাত এড়িয়ে বেঁচে গেছে তারা খাদ্য ও আশ্রয়াভাবে আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা কর্‌ছে। তারা কাকে জানাবে তাঁদের ব্যথা। এ যে ভগবানের মার, প্রাণ দিয়ে—একে গ্রহণ কর্‌তেই হবে—এই হচ্ছে তাঁর বিধান।

দুঃখ হয়, এই মনে করে যে সরকার পক্ষ ইচ্ছা কর্‌লে হয়ত মৃত্যুসংখ্যা এর চাইতে কিছু কমাতে পারতেন কারণ যারা গৃহ চাপা পড়েছেন তারা সকলেই তৎক্ষণাৎ মরেননি। ১০।১৫ দিন পরেও জীবন্ত মানুষ স্তূপের নীচে পাওয়া গেছে। হয়ত সময়োচিত ব্যবস্থা হলে কিছু লোক বাঁচান যেত।

বিহারে যে সকল অঞ্চল ভূমিকম্পের ফলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার পরিমাণ ৩০ বর্গমাইল। তন্মধ্যে উত্তর বিহার বিশেষতঃ দ্বারবঙ্গ, মজঃফরপুর, চম্পাবন ও সারন জেলা এবং ভাগলপুরের উত্তরাংশ গুরুতরভাবে বিধ্বস্ত।

এই বিধ্বস্ত অঞ্চলের ক্ষতির পরিমাণ বহুবিধ এবং ব্যাপক। দীর্ঘকাল ধরে সেবা ও সাহায্য আবশ্যক। এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন ভাণ্ডারে যে অর্থ সংগৃহীত হয়েছে এবং যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান

সেবা কার্য্যে ব্রতী হয়েছিল যদিও অবস্থার তুলনায় তা খুবই সামান্য তবুও এ দুঃখের দিনে বহু দেশবাসীর মহাপ্রাণতার পরিচয় পেয়ে দেশ আশান্বিত।

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জহরলাল নেহেরু ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইত্যাদি দেশনায়কগণ দেশকার্য্যে ব্রতী হয়ে দেশবাসীর দুঃশ্চিন্তার অনেকটা লাঘব করেছেন। তাঁহাদের ঐকান্তিকতা ও কর্ম্মকুশলতা ভারতের সমস্ত শুভেচ্ছা ও সমস্ত বেদনা কেন্দ্রীভূত হয়ে বিপন্ন অসহায় নরনারীকে আবার জীবন পথে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে।

মা

সেদিন কি ভেবেছিলে, স্বপ্নেরো অতীত কল্পনায়,
জঠরে বহিলে যারে' একান্ত কঠোর তপস্যায়,
নহে যে বিলাসলভ্য—ক্রন্দনের সিন্ধু বিমথিয়া
যে ইন্দু উঠিল উলসিয়া,
বজ্ররূপে গরজিয়া দিবে হায়! দেখা
তারি কর রেখা!
হে আদি জননী আজি! তব কৃচ্ছ্র সাধনা সময়ে
সেদিন কি শুনেছিলে স্তব্ধ চিত্তে নিতান্ত বিস্ময়ে,
"তুমি মা, আমারে চাও সে শুধু তোমার প্রয়োজন
মোরা তব কামনার ধন,
"তোমারে কে চায় বল, জননীরে কে চেয়েছে কবে
জীবন উৎসবে?"
সেদিনও কি বলেছিলে, "হায়রে সন্তান,
তোরা মোর দেবতার দান!"
দেবতার দান? মাগো, দেবতা কি ভরি ভিক্ষাঝুলি
ক্ষুধিত তৃষিত তোমা দিয়েছিল এ গরল তুলি?

আরম্ভ হইতে হায়, যতদিন না হ'বে মা শেষ,
ছন্দে বন্ধে বেদনা অশেষ!
হাসিমুখে তারে দিলে এতই সম্মান,
"দেবতার দান!"
সেদিনো তুলিলে অঙ্কে পঙ্ক হ'তে অনায়াসে তুলি'
চিন্তাবলী রেখাঙ্কিত ললাটে লেপিলে পদধূলি;
সংসার আহবে যেতে, চুমিলে তেমনি সন্তর্পণে—
যেমন সে শৈশব-স্বপনে
উঠিত চমকি' যবে প্রশান্ত-হৃদয়ে,
ধরিতে অভয়ে!
যেদিন সন্তান বক্ষে মায়া-সৌধ করেছ নির্ম্মাণ
শূন্য লোকে হায় মাতা, সেদিন কি পেয়েছিল স্থান
অন্তর অমৃত ধামে, সে কভু ভুলিবে মাতৃস্নেহ,
ভুলিবে সে, তুমি তার কেহ!
ভুলিবে সম্পদে কিম্বা দুখের সংগ্রামে,
ছিল কি 'মা' নামে—
অফুরন্ত সুধাউৎস শান্তি মন্দাকিনী
কে সে দেবী, স্বর্গ-শরীরিণী!
ভোল মা সে স্বপ্ন তব, ভোল মা সে কল্পনা-উৎসব
যৌবন মদিরামাখা অমরার আনন্দ বিভব;
বৃন্দাবন বনানীরে ননীচোরা ভুলিয়া যে যায়,
যশোদারে কে কহ ভুলায়
মা শুধু হাসিতে এসে শেষে ভেসে ভেসে যায়
অশ্রুর বন্যায়!

———

একখানি চিঠি

শ্রীঅর্চ্চনা সেন

স্নেহের লীলা!

তোমার চিঠিতে তোমার খোকার অসুখের কথা শুনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হলাম। সে কেমন আছে জানাইও।

তুমি দুঃখ করে লিখেছ, ননী দেশের কাজেও দশের কাজে আত্মজীবন সমর্পণ করে দেশের কত উপকার করছে। আর তুমি গৃহকোণটীতে বসে, রুগ্ন ছেলে কোলে নিয়ে আপনার সুখ দুঃখের চিন্তা নিয়েই বিভোর আছ।

তোমার এ কথাটী পড়ে একটু ক্ষুণ্ণ হলাম, কারণ তোমার কাজটী যে নিতান্ত ছোট বা হেয়, তা মনে কর্‌বার কোন কারণ দেখি না। অল্পকাল স্থায়ী একটী জীবনে মাত্র দুটী হাতে তুমি যে কাজ কর্‌তে পারবে, তার চেয়ে মায়ের মতন মা হয়ে, ভাল পাঁচটী সন্তান গ'ড়ে যদি দেশমাতৃকার চরণে উপহার দিতে পার তবে তারা তাদের দশটী হাতে পাঁচটী জীবনে অনেক বেশী কাজ করতে পার্‌বে। কালে আবার তাদের কাছ থেকেও মহামানবের অভ্যুত্থানে বিশ্বের মাঝখানে শক্তির উৎস দেখা যেতে পারে। যারা নিজের সুখ দুঃখকে তুচ্ছ করে বিশ্বের কাজে, জগতের সেবায়, নিজেকে বিলিয়ে দিতে যায়, পথ যদি তাদের সত্যভ্রষ্ট না হয়, তবে তাদের জীবন যে অতীব মহৎ যে বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছুই নাই। তাই বলে ঘরে বসে যারা সন্তান সন্ততি পালন করে তাদের কাজ বা দায়িত্ব যে নেহাৎ কম বা জীবন তাদের তুচ্ছ তা মনে কর্‌বার কোন কারণ নাই।

বরং তাদের জীবনের দায়িত্বই বেশী। তা অনন্তকাল স্থায়ী হ'তে চায়। ভাল সন্তান পাবার জন্যও সাধনা চাই। অনেক সংযম, আত্মত্যাগ, এবং মানসিক শক্তি আয়ত্ত করতে পার্‌লে তবে ভাল মা হবার যোগ্যতা হয়। সন্তান গর্ভে এসেছে জান্‌তেই মাকে মনে কর্‌তে হবে তিনি ব্রতনিরতা। তখন থেকে অসৎ আলোচনা, অসৎ চিন্তা, হতে নিজেকে অনেকখানি দূরে রেখে কেবলি দেহ মন প্রফুল্ল এবং সৎচিন্তা যুক্ত ক'রে তুল্‌তে হবে। তাকে কেবলি মনে কর্‌তে হবে এবার গর্ভে আমার নিশ্চয়ই কোন উদার, মহান্ মহাপুরুষ আস্‌ছে। সে হবে বিদ্যাসাগরের ন্যায় মহৎ, আশুতোষ মুখার্জ্জীর ন্যায় ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ন্যায় আত্মত্যাগী, বিবেকানন্দের ন্যায় সত্যের জ্বলন্ত প্রতীক।

তুমি আমার এসব কথা পড়ে নিশ্চয়ই খুব হাস্‌ছো হয়ত বা মনে কর্‌ছো, মাসিমা পাগল হয়েছে তাই এসব অলীক কথা ভাব্‌তে বলে। কিন্তু তা নয় লীলা! এসব ভাব্‌বার ফল আছে।

ভাল ভাল লোকের জীবনী পড়ে তাদের সদ্‌গুণাবলীর চিন্তা কোরে নিজের দৃঢ় বিশ্বাস আন্‌তে হবে আমারও এমনি সন্তান হবে।

তোমার মনের ইচ্ছা, শক্তি, তখন তোমার সন্তানকে শক্তিমান কোরে তুল্‌বে। ব্রতশীলারা যেমন অনেক অসুবিধা, অভাব অভিযোগ অগ্রাহ্য করে তাদের ব্রতটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার প্রয়াস পায়—সন্তানব্রতরতা মায়েরও তেমনি সংসারের অভাব অভিযোগ যথাসম্ভব অগ্রাহ্য করে অসুবিধাকে সুবিধায় পরিণত করে, দেহ ও মন যাতে সুস্থ এবং সবল থাকে তার জন্য সর্ব্বদাই যত্ন নিতে হবে।

আগেকার লোক নাকি কত যুগ যুগ ধরে ভাল সন্তানের কামনায় তপস্যা করেছেন। এ যুগে তোমরা না হয় মাত্র দশটী মাস তপস্যা করো। তপস্যার ফলে তিলোত্তমা যেমন দেবতাদের সকলের সৌন্দর্য্যের সার ভাগ তিল তিল করে নিয়ে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী সৃষ্ট হয়েছিলেন, তোমাদের সন্তান তেমনি সকলের মহৎ জীবনের সদ্‌গুণ চয়ন করে মহাশক্তিমান মহামানব সৃষ্ট হয়ে আস্‌বে। দেশের এই দুর্দ্দিনে সাহসী, আকাশের মত উদার, প্রাণসম্পন্ন, মেরুদণ্ডবিশিষ্ট হাজার হাজার ছেলের দরকার। তোমরা সব মেয়েরা মিলে, সকল প্রতিবন্ধক ঠেলে ফেলে বদ্ধপরিকর হও, ভাল সন্তান সৃষ্টির জন্য। সন্তান প্রসবের সময়ও যেমন মায়ের যত্ন দৃষ্টি চাই, সন্তান পালনের সময় চাই তার চেয়ে অনেক বেশী।

আজো এ দেশের মেয়েরা চায় তার ছেলেটী হোক্ একটী মাটীর পুতুল। উঠ বল্লে উঠ্‌বে আর বস বল্লে বস্‌বে। সে যে মাটীর পুতুল নয়, তার মধ্যে যে একটী সজীব মানবতা বিরাজ কর্‌ছে একটা স্বাধীন প্রকৃতি, আপনার ইচ্ছাশক্তি যে তার আছে তা মায়েরা মোটেই মান্‌তে চায়না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিজেদের ইচ্ছাশক্তি জাহির কর্‌তে ব্যস্ত হন। এর ফলে হয় এই—হয়ত ছেলে হয়, ভয়ানক অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল, নয়ত সে হয় সর্ব্বকর্ম্মে পরমুখাপেক্ষী ভীরু।

স্বাধীন চিন্তা বা স্বাধীন মনোভাব বঞ্চিত হয়ে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহীন পরের কথাতেই জীবনমৃত্যু স্থির করে। এমনি ধারা ছেলেকেই আমরা লক্ষ্মীগোপাল বলে প্রশংসা করে থাকি। কিন্তু আজকালকার এত অন্নসমস্যা, বস্ত্রসমস্যা এমনকি জীবনের সমস্যার দিনে আর এমনি ছেলে হলে সে নিজের এবং পরের কোন কাজেই লাগ্‌বে বলে মনে হয় না।

ছেলে ছোট হলেও মায়ের মনে রাখ্‌তে হবে জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই যে বিধাতার কাছ থেকে মানবতার সকল অধিকারের যোগ্য হয়েই এসেছে। প্রত্যেকটী কাজে প্রত্যেকটী ইচ্ছায় তাকে বাধা দেবার অধিকার তোমাদের নাই। অনেককে দেখি নিজের মনের দুর্ব্বলতার জন্য ছেলেমেয়েদের অকারণ শাসন করে কষ্ট দেয়। "এই যেমন গাছে চড়িস্ না, পড়ে যাবি বেশীজলে নামিস্ না ডুবে যাবি, খেলতে যাস্‌না যদি বুকে বল এসে লাগে"। বিশ্বকবি বুঝি এইজন্যই গাহিয়াছেন—

"পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিওনা ভাল ছেলে কোরে।"

এমনি করে সহস্র আবেষ্টনের মাঝে তাদের লক্ষ্মী ছেলেটীকে ক্রমশঃ তারা লক্ষ্মীতর হতে লক্ষ্মীতম দেখ্‌তে চান। কিন্তু তাদের মনুষ্যত্বের বিকাশের পথে যে সবটুকুই রুদ্ধ হয়ে থাকে। এটুকুই তারা বোঝেন না।

সত্য সত্যই যারা গাছে চড়ে এবং সাঁতার কাটে, বল খেলে তাদের পক্ষে বেঁচে থাকা বিষম দায় হত যদি কিনা এতে এত আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া আপনাকে রক্ষা করার চেষ্টা আপনাকে বাঁচাবার ইচ্ছা সে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছে।

যার যতটুকু শক্তির দরকার সে ঠিক ততটুকু শক্তি প্রয়োগকরে। মানুষ অনন্তের অংশ। তার ভিতর অনন্ত শক্তি লুকিয়ে আছে। দরকার হলেই যে তার ক্রমবিকাশ করে অসীমশক্তি প্রকাশ করতে পারে। স্কুলের ছেলেরা যতদিন মায়ের কাছে থাকে ততদিন কোথায় বা থাকে তার কাপড় কোথায় থাকে জামা। কিছুরই খবর সে রাখেনা। সহসা হয়ত মার কাছছাড়া হয়ে বোর্ডিং এ পড়তে গেল অমনি দেখ্‌বে সে খোঁজ করছে তার জামাটা কোথায়, বইগুলি ঠিক আছে কিনা।

এ শক্তি তার মনের কোণে লুকান ছিল, এতদিন দরকার হয় নাই তাই বের করেনি, আজ যখন দরকার হোল তখন আপনা থেকেই বেরিয়ে এল। তাই মায়ের এমন শিক্ষা চাই যাতে করে দেশের বুকে এমন কতগুলি ছেলে জন্মায়—যাদের মন হবে বজ্রের মত শক্ত, মাংসপেশী হবে ইস্পাতের দ্বারা তৈরী, আর প্রাণটা হবে আকাশের মত দরাজ। তবেই এদেশে বিবেকানন্দের যুগ ফিরে আস্‌বে। স্নেহ নিও।

ইতি—
তোমার মাসী মা

প্রতিযোগিতা

নিম্নলিখিত প্রত্যেকটী বিষয়ে একটী কুড়ি টাকার পুরস্কার দেওয়া হইবে। (১) প্রবন্ধ (২) ছোট গল্প (৩) একবর্ণ চিত্র (৪) রেখা চিত্র (৫) ভাবধারা বিভাগে—প্রবন্ধ (লেখকগণের জন্য) চৈত্রের মধ্যে প্রবন্ধচিত্রাদি পত্রিকা কার্য্যালয়ে পৌঁছিতে হইবে, কোনবিষয়ে পুরস্কার যোগ্য প্রবন্ধ চিত্রাদি না থাকিলে, সেই বিষয়ে পুরস্কার প্রদান বন্ধ থাকিবে। প্রেরিত প্রবন্ধ-গল্প চিত্র প্রকাশের অধিকার পত্রিকার থাকিবে।

গ্রন্থ-পরিচয়

যুগের বাংলা—শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ ঘোষ, প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকার বাংলার সমস্যাকে নিপুণভাবে সকলের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। বুদ্ধি, বিদ্যা ও শক্তিতে উপযুক্ত হইয়া ও বাংলা বিশ্বের মাঝে কেন তাহার স্থান করিয়া নিতে পারিতেছে না তাহারই কারণ বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। বেকার সমস্যা সমাধানের উপায়ও গ্রন্থকার বলিয়া দিয়াছেন। বাংলা আজ ঘুমঘোর কাটাইয়া তাহার অবস্থা উপলব্ধি করিয়াছে। বাংলার নারী ও আজ ঘরের কোণে মুখ লুকাইয়া বসিয়া নাই। তাহাদের দাবী লইয়া তাহারাও আজ ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। লেখকের বিশ্বাস, বাংলার সুদিন আসিতে আর দেরী নাই,—চতুর্দ্দিকে সাড়া যখন পড়িয়াছে—আর ভাবনা কি? আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে ইহা বিশ্বাস করি। এই সুযুক্তিপূর্ণ ও সুলিখিত বইখানা সকলের নিকট সমাদর লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। প্রচ্ছদ-পটটী সুন্দর, ছাপা ও বেশ ভাল।

শ্রীসুহাস দেবী

বাংলার সব্জী—শ্রীঅমর নাথ রায়। গ্লোব নার্শারী হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১৷৷০

ইহা উৎকৃষ্ট সব্জী উৎপাদনের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত একখানি বই।

কৃষিসাহিত্য আমাদের চোখে খুব কম পড়ে, সুতরাং এ বইখানি সাগ্রহে পড়িলাম। কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ সব্জী-বীজ বপন করিতে হয়; কিরূপ জমি সার প্রয়োজন, কোন্ সব্জী হইতে কত সার থাকে ইত্যাদি বহু জানিবার বিষয়গুলি বিশদ ভাবে এ বইএ লিখিত আছে।

বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট দিনে সব্জী চাষ করিয়া বহু ব্যক্তি যে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। বাংলার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও গৃহে প্রয়োজন উপযোগী শাক সব্জী উৎপন্ন করিয়া স্বল্পব্যয়ে উৎকৃষ্ট ভাইটামীনযুক্ত তরকারী পাইতে পারেন।

যাহারা এ লাভবান্ ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক এবং যাহারা গৃহে শাকসব্জী উৎপন্ন করেন তাহাদের বাংলার সব্জী' পড়িতে অনুরোধ করি।

শ্রীরমা দাস

শান্তি-সোপান—খান বাহাদুর, কে, এ, সিদ্দিকী প্রণীত, ইহা হজরত এমাম গাজ্জালী রচিত মেন্হাজোল আবেদিন ও ছেরাজোছ ছালেকিন নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। গ্রন্থখানি ধর্ম্মতত্ত্বমূলক, ইহাতে একটী উপক্রমণিকা, সাতটী অধ্যায় ও একটী পরিশিষ্টে সমাপ্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থকার ভূমিকাতে বলিয়াছেন, "আমাদের সমগ্র ধর্ম্মগ্রন্থই, আরবী, পারসী বা উর্দ্দুতে লিখিত, বর্ত্তমান ছেলেদের মধ্যে কেহ কেহ উহা পাঠ করিতে পারিলেও অধিকাংশ তরুণ ও অ-তরুণই উহার রসাস্বাদন করিতে অসমর্থ, এই সমস্যার সমাধান করিতে

আমায় এই ক্ষীণ প্রচেষ্টা"। তাঁহার উদ্দেশ্য সমধিক প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। গ্রন্থ-খানির ভাষা আরও সরল হইলে, এবং উর্দ্দু বা আরবী কথাগুলি পুস্তকের মধ্যে মধ্যে না দিয়া ফুটনোটে দিলে উহা সর্ব্বজনবোধ্য ও আরও সুখপাঠ্য হইত।

শ্রীরেখা রায়

ভাবী-কাল—রামমোহন স্মৃতিসংখ্যা। পত্রিকাখানিতে মহাত্মা রাজা রামমোহন রাঁয়ের জীবনের নানাদিক আলোচিত হইয়াছে; নানাভাবে তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হইয়াছে। পত্রিকাখানি সুখপাঠ্য এবং সুন্দর, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিতে পারিতেছি না।

কোন মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করিতে আমরা তাঁহাদের আংশিক ভাবেই বুঝিতে চেষ্টা করি, তাঁহাদের ভাবে অনুপ্রাণিত না হইলে তাঁহাদের সমগ্র জীবনের ধারণা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। এই পত্রিকাখানিতেও রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মজীবন, শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কারের পরিচয় বিশেষ ভাবে পাই নাই।

সত্যজ্ঞান, আত্মজ্ঞান এবং বিশ্ব-চৈতন্য জ্ঞান, ভারতবর্ষে উদ্বোধিত হইয়া শত শত শতাব্দীর অত্যাচারে লাঞ্ছনার দুঃখে গুপ্ত, লুপ্ত এবং বিকৃত হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের অপরিমেয় প্রজ্ঞা যুগযুগান্তরের সঞ্চিত জঞ্জাল ভেদ করিয়া সেই জ্ঞান মাণিক্যের সন্ধান পাইল এবং আপনার বৃহৎ প্রাণের আবেগ সংযোগে তাহা সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করিয়া শতাব্দীর জড়তা দূর করিয়া জীবনে স্পন্দন আনিতে সক্ষম হইয়াছিল।

কত বড় কঠোর সাধনায় এই মহাসাধক এমন দীপ্ত সূর্য্যতুল্য জীবন লাভ করিয়া এই মহীয়সী শক্তি লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা আমাদের ধারণা করার সাধ্যাতীত।

তাঁহার জীবনের মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম্ম, ভগবানে জ্বলন্ত বিশ্বাস; সে বিশ্বাস ভাবের আবেগমাত্র নয়, ধ্যান পরায়ণ ঋষির অবিচলিত নিষ্ঠা। তিনি ছিলেন শক্তি মন্ত্রের উপাসক, ভগবদ্‌প্রেম তাঁহার সেই শক্তি।

তাঁহার অপূর্ব্ব মনীষা সেই মহাশক্তির সহায়তায় সার্ব্বভৌম নীতি প্রবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী প্রসার, সমাজের ক্ষুদ্র বৃহৎক্ষেত্রে তাঁহার বিশাল প্রাণের আবেগ সংযোগ, শিক্ষায়, সংস্কারে তাঁহার বলিষ্ঠ হস্তের অপর্য্যাপ্ত দান; সৎকার্য্যের মূলেই এই ধর্ম্ম-বিশ্বাস নিহিত দেখিতে পাই।

এই ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহার শুধু জ্ঞানগত নয়, বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা তাঁহার জীবনের মূল, জীবনের ব্রত।

যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজীবন এই ব্রত একান্তমনে পালন করিয়া মৃত্যুশয্যায় ও ব্রহ্মোপাসনায়ই নিমগ্ন রহিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্বরচিত সঙ্গীত তাঁহার ধর্ম্মজীবনের জীবন্ত সাক্ষ্য। কি ধর্ম্মতত্ত্বে, কি শিক্ষায়, কি সমাজ তত্ত্বে কি যুগসমন্বয় প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বত্রই তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহ প্রদীপ্ত আগ্নেয়গিরি তুল্য হৃদয়ের পরিচয় পাই, তাহা শুধু তাঁহার মত মহামানবেরই সম্ভব।

তাঁহার বিশ্বজনীন উদার ভাব, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মহৎ আদর্শ, ইহার মূলে তাঁহার জীবন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাসের পরিচয় পাইতেছি।

এই যে মহাপুণ্যস্মৃতি ইহা আমাদের মনকে স্পর্শ করিতে পারে, এমনি ইহার মহতী ঐশ্বরিক শক্তি আছে। বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, ধর্ম্মজীবনের জড়তা আসিয়াছে; এই পুণ্যস্মৃতি আলোচনা যদি আমাদের জড়তাযুক্ত জীবনে স্পন্দন আনিতে পারে তবেই ইহার সার্থকতা।

শ্রীসুনীতি দেবী।

ছায়ার মায়া

শ্রীমায়া দেবী

সৌরভ সোমেশের নিকট হ'তে প্রতিমার মৃত্যুখবরের তারটী এক রকম জোর ক'রে টেনে এনে পড়ে ফেল্ল। পড়েও কিন্তু এ সংবাদ, সহসা যেন কিছু অনুধাবণ কর্‌তে না পেরে অনেকটা সম্বিতহারার মত হয়ে গেল। অবশেষে ছাত্রদের ব্যথাভরা দৃষ্টির মাঝখানে এবং তাদের ভাঙ্গা ভাঙ্গা সান্ত্বনার বাণীর মধ্যেও সৌরভ লুটিয়ে পড়ে রইল, সোমেশের কোলের উপর। পরের দিন ও সৌরভ মাথা গুজেই পড়ে ছিল, শেষে রুক্ষ চুলে বাড়ী চলে গেল, তাহারি প্রতিমার একান্ত অভাবিত মৃত্যুর প্রহেলিকা শোন্‌বার আশায়।

তাহার পর দু'বছর চলে গিয়েছে—ল' ক্লাশের নিকটতম বন্ধুরা সবাই আছে। মেসটী তাদের প্রিয় পুরাণর আস্তানা ছেড়ে কোথাও যায় নি। সম্মুখে হাঁড়িবাধা খেজুর গাছটী অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিল, সেই বৃদ্ধ বৃক্ষের স্বল্প ক্ষরিত রসটুকু সকলের গায় ফোঁটা ফোঁটা ক'রে গঙ্গা জলের ফোটার মত শীতল রস ছিটায়ে দিত। রাস্তার মোড়ে বৃদ্ধ মামুদের ছাতা মেরামতের দোকান। তাহার পর পর কয়েকটা বড়ো বড়ো বাড়ী, তাহার পর দুরন্ত শীর্ণকায়া নদীর রেখা সমস্তই ঠিক আছে, কেবল মেসের পার্শ্বে ছাড়া ময়দানের মালিকের চিহ্নিত অনুচ্চ বেড়ীটুকু ভেঙ্গে আর একটা বাড়ী মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ায়ে উঠেছে, তাদের মেসের দালানের সমান উচ্চতায়। ও বাড়ীর জানালার পর্দ্দা মাঝে মাঝে উড়ে গেলে ও বাড়ী অনেক কিছু আসবাবপত্র দেখা যায়। আর দুপুরের নিস্তব্ধতায় ও বাড়ীর গল্পগুজবের গুঞ্জন স্পষ্টই শোনা যেত। আরও কোন কোন সময় একটি মেয়ের মিষ্টি হাসির লহর ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তো, তা টেনে আন্‌তো বাতাসে এদিকে তার মুখখানা জানি কত মিষ্টি, তাই ছাত্রেরা অনেক সময় দৃষ্টি দিয়ে রাখতো ঐ দিকে, একের অপরের অসাক্ষাতে।

ছেলেদের সময়োচিত খাওয়ার জন্য উড়ো বামুনের তাগিদের উপর তাগিদ, তাস খেলার জোরালো আড্ডা, সায়াহ্নের উৎসব, গান বাজনার মজলিস সবই চল্‌ছে। সেই ত পুরাতন পিয়ন রামসিং চিঠি দিয়ে গেলে, ছেলের দল হুড়মুড় ক'রে বে'রিয়ে এসে ক্ষিপ্রহস্তে চিঠি ছিড়ে পড়্‌তে আরম্ভ ক'রে দেয়। প্রিয়ার, পিতার, মাতার, ভাইবন্ধু আত্মীয়স্বজনের চিঠি। উৎসুক দৃষ্টির মাঝখানে ধরা পরে যায় এ...কার চিঠি...কেউবা একের অনুপস্থিতে বা উপস্থিতিতে চিঠি ছিড়ে, কেঁড়ে নিয়ে, লুকিয়ে রেখে পরে অন্য চিঠির ভাঁজ বা ব্যঙ্গচিত্র ঢুকিয়ে রেখে সবগোল বাধিয়ে তোলে, তাদের মধ্যে সোমেশ রায় ছিল প্রধান পাণ্ডা, শান্ত সুন্দর অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চেহারা। সৌরভের অশৈশব বন্ধু।

এখন ও সৌরভ এ সমস্ত আনন্দ আয়োজনে বড় বেশী ঘেঁসিতে পারে না। পিয়ন এসে চলে গেলেই তাহার অন্তরের নিতল প্রদেশ পর্য্যন্ত আন্দোলিত হ'য়ে প্রতি কক্ষে কক্ষে যেন দোল

উঠ্‌তো দীর্ঘ নিশ্বাস ছেঁড়ে তাহায় নিভৃত কক্ষে বসে উদাস দৃষ্টিতে মামুদের দোকানের আদান প্রদান দেখে, কিংবা সেই শীর্ণকায়া নদীর রূপালী আভার সুপ্রসারিত সাদা ফাঁকা ধূঁয়ার রেখা দেখিবার জন্য মনখানাকে সংযোজিত করে দেয়, তা ও বেশীক্ষণ নয়।

আর সেই ফটো, সত্যিই প্রতিমা প্রতিদিনই খানিকক্ষণ ঐ ফটোর কাছে বসে থাক্‌তো। সৌরভ লুকিয়ে আঁড়ি পেতে দেখে শেষে এসে সম্মুখে দাঁড়ালে লজ্জিত প্রতিমার চম্‌কানো সেই হাসি।

আর সেই কয়গাছি চুল। সৌরভ ব'লেছিল, এমন চুলের জালে তুমি আমায় আটকে রেখেছ। যখন আমি দেখি, তোমার মুখখানার দিকে তেমন দৃষ্টি দিতে পারিনি। সেই আজানুলম্বিত তোমার কুঞ্চিত কেশদাম। এ বিশ্বের অনেক বহুমুল্যবান জিনিষ আমার কাছে ছোট হ'য়ে যায়। চুল ছেড়ে যখন তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়ালে আমি অনিমেষ চোখে বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে তাই দেখেছিলাম। এমন অপর্য্যাপ্ত চুল! প্রতিমা পুলক হেসে অমনি কতগাছি চুল কেটে এনে দিল তাকে উপহার, বল্লে, রেখে দিও তোমার সামনে, চোখের কাছে, আমি যখন দূরে থাক্‌বো।

আজ তাহার কক্ষে আছে মস্ত কাঁচে বাঁধানো সুদীর্ঘ সেই কয়গাছি চুল। তারি চিরসাথী, এঁকে বেঁকে রয়েছে তারই ব্যথার গাথা, তারই চিহ্ন। এ স্মৃতি কত সান্ত্বনার বাণী বেদনার ইঙ্গিত বলে দিয়ে যায়। বার বার সজল চো'খে চেয়ে থাকে ঐ দিকে। তাকায়ে তাকায়ে চোখ ঝাপসা হয়ে যায়।

* * * * *

আরো অনেক দিন চ'লে গিয়েছে—

একদিন সৌরভ সন্ধ্যায় ঘুরে এসে দেখে, একখানা ফটো আর একখানা সোমেশের হাতের চিঠির টুক্‌রো প'ড়ে রয়েছে তার টেবিলের উপর। সোমেশ লিখেছে, ভাই, তোমারি প্রতিমার ছায়া, সেই ছায়া বলে যদি একে গ্রহণ করতে পারো তবে আমার একান্ত অনুরোধ। অন্যমনস্ক ভাবে জামা জুতো ছেড়ে কয়েকবার পায়চারি করে, নিজের একপ্রকার অজ্ঞাতসারে গা এলায়ে দিয়েছে ইজি চেয়ার খানার উপর। মনের কোণের ভাঙ্গা ভাঙ্গা চিন্তা রাশি ভেসে উঠ্‌লো, অবশেষে ভাঙ্গা ভাঙ্গা চিন্তাই জোড়া লেগে একরাশ চিন্তায় পরিণত করে তাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। সৌরভ আবিষ্টের মত পড়ে রইল।

ফটো খানা একবার তুলিল, আবার পরমুহূর্ত্তে রেখে দিল। দেখ্‌বার আকুল ইচ্ছা বা প্রেরণা তার আর নেই। তবু আবার তুলে নিজের সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় একবার একটু দেখে নিল।

সুনীল আকাশের গায় তারকার বাতি জ্বলে উঠেছে, মহানগরীর সন্ধ্যায় প্রতি কক্ষে কক্ষে বিজলীর মালা জ্বলিয়া উঠিল, একটি অপরিচিত পাখী সৌরভের পরিচিত কাকুলি তুলে চলে গেল অতিদূরে ঘনচ্ছায়ায়। ক্রমে দূরের অস্পষ্ট তানটী মিশে গেল শূন্যে, বাতাসে রেখে গেল এক বিপন্নের আকুতি।

কালো অতি কালো আঁধারের মধ্যে সে হাঁপায়ে উঠিছে, কিসের একটু বাতাসে লেগে হাল্‌কা হয়ে গেল। বের হয়ে এলো অশ্রু কয় ফোটা, ফুটে উঠ্‌লো একটু আলোর আভা, মনে হয় সেত অনেক দিন নিবে গিয়েছে, আঁধারের কোণে আধার ঘন হয়ে ঘনায়েই আসে, বিয়োগ বধুর ব্যথার দোলনায়, দোল দিয়ে যায়। বহুদিনের বন্ধ দুয়ার উদ্ভাসিত হয়ে উঠে আলোর ছায়ায়। নিকটে আস্‌তে চায়, অতি নিকটে সে ছায়া, কত দিনের পর দুটি মনের কথা বলে হাল্‌কা হতে···কার নিপুণ তুলিকা সম্পাদনে তার এলোমোলা চিন্তার দাগ মুছায়ে ফুটায়ে তোলে নূতন রঙ্গিন্ রেখা।

যদি সত্যিই তার এ শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন হৃদয়ে শান্তির জল ঢেলে তার এ দুঃসহ যাতনা, মনের এত বড় হাহাকার, এমন শূন্যতা, একটু লাঘব করে দিতে পারে কেউ তার এতো তার প্রশান্তির বন্ধন, এ বন্ধনে বাঁধা পড়িলে ক্ষতি কি? অপরিমিত অর্থের মাঝে ও সে যে একা নিঃসহায়। এছন্নছাড়া জীবনত বেঁচেই থাক্‌বে, চিন্তায় উদ্বোলিত হয়ে অনুসন্ধানে খুঁজে বেড়ায় এক সুখময় স্নেহসিক্ত স্পর্শ···কত স্নেহের কত করুণার স্নিগ্ধ মথিত প্রশান্ত চোখ একান্ত সহানুভূতিমাখানো চাউনি বল্‌বে, ওগো আমি তার এতটুকু প্রতিদ্বন্দি নই, তারই প্রতিভূ তাই তোমার পার্শ্বে এসে দাঁড়ায়েছি, একবার চেয়ে দেখ, অমনি শ্রান্ত ক্লান্ত দেহের ও মনের পূঞ্জীভূত সঞ্চিত মেঘের আঁধার সরে যায় আবার চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠে তারই মুখ তারই কথা···আবার সোমেশ্বর একান্ত অনুরোধ বার বার অনেক করে বল্‌ছে, জানো সৌরভ প্রেমের নৈষ্টিক পূজারিকে সে বড় শ্রদ্ধার চোখে দেখে না, সে এক্ষুনি উঠে পড়্‌বে, বল্‌বে বন্ধু, তোমার এ দান বড় আশায় গ্রহণ কর্‌লাম। হঠাৎ ও বাড়ীর পর্দ্দার আঁড়ালে কাকে দেখা যাচ্ছে, উজ্জ্বল বিজলীর আলোতে? ঐত মূর্ত্তি? না?

* * * * *

ফুলশয্যা রাতে মেয়েদের আনন্দের আনুষাঙ্গিক অনুষ্ঠান অনেকক্ষণ হয় শেষ হয়ে গেলে ও কেউ কাহাকে আহ্বান কর্‌লো না, কেউ কারোর সাথে পরিচিত হলো না, পরস্পরের এত নিকটতম সান্নিধ্যের মাঝখানে কে যেন মৌন স্তব্ধতার প্রাচীর তুলে দিয়ে উভয়কে অনেক দূরে ঠেলে দিল। তবু একটি প্রাণ মহা বিস্ময়ে ভাব্‌ছিল, নাই বা হলো তার জীবনের প্রথম রঙিন রাতে আনন্দের আরতি কিন্তু অবরুদ্ধ সজল চোখের নিবেদিত প্রেমের দুটি কথা তাও বা কই? যাক্ কর্ত্তব্যের বাঁধাধরা পদ সে চায় না, তাতে তো সুখী হতো না। তবু নিশুতি রাতে সলজ্জ দুই আঁখি জোড়া একবার খুঁজে নিতে চাইল সৌরভকে। ছায়া দেখলো, সৌরভের অতি নিকটে বাহুর মধ্যে বেষ্টিত হয়ে রয়েছে, একখানা ফটো··· আর সেই ফটোর কাঁচের উপর জ্বল্‌ছে, ধ্যানরতা স্বামীর কয়ফোটা অশ্রু...

ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স অটোয়া চুক্তি ও ভারতবর্ষ

শ্রীসুধীন্দ্রমোহন মজুমদার

সংরক্ষণ (Protection) ও Preferential Tradeকে একই নীতির ভিন্ন রূপ ব'লে অনেক সময় অভিহিত করা হ'লেও এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন। সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো অন্য দেশের আমদানী নিবৃত্তি করা অপর পক্ষে Preferential এর মুখ্য অভিপ্রায় হ'চ্ছে, কতক দেশের বাণিজ্যে বিঘ্ন ঘটিয়ে অপর কতক দেশের বাণিজ্যে উৎসাহ দেওয়া এবং এরূপ উৎসাহ দিয়ে সেই দেশগুলির বাজার হাত করা। সংরক্ষণ আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বিঘ্ন ঘটায় Preference আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যবর্দ্ধনের সহায়তা করে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ অর্থনৈতিকগণ এই ভাবেই Imperial preference এর ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন। এ প্রকার উক্তি কতদূর সত্য এখন দেখা যাক্। এটা দেখ্‌তে গেলে কি ক'রে এর জন্ম হ'লো ও কোন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ইংরাজ অর্থনৈতিকগণ এর প্রবর্ত্তন ঘোষণা কল্লেন, সেটাই আলোচনা ক'র্ত্তে হয়।

একথা সর্ব্ববিদিত যে মাতৃভুমির উৎকর্ষসাধনের জন্য উপনিবেশগুলিকে শোষণ করাই ছিল, ইংলণ্ডের প্রথম যুগের Colonial Policy. এর রূপ পেয়েছিল উপনিবেশগুলির উপর নানা প্রকার কর নির্দ্ধারণে। আমেরিকান উপনিবেশগুলির সফল বিদ্রোহের পূর্ব্বপর্য্যন্ত এ ব্যবস্থার কোন নড়চড় হয় নি। এর পরের যুগকে ইংরাজের পুঁজিতে উপনিবেশগুলিকে শিল্পক্ষেত্রে গ'ড়ে তোলার ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে নিকট সম্বন্ধ স্থাপনের যুগ বলা যেতে পারে। ইংরাজ পুঁজির অধিকাংশই ব্যয়িত হ'য়েছিল, রেলওয়ে বিস্তার প্রভৃতি অনুষ্ঠানে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর উপনিবেশগুলি তাদের ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজন বিশেষ ক'রে অনুভব ক'ল্লে। একদিকে যেমন তারা সংরক্ষণ ও সরকারের সাহায্যে নিজেদের শিল্প-প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলতে লাগল, অন্য দিকে তেমনি United Kingdom ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য প্রসারের পথ খুঁজ্‌তে লাগল। এই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হ'য়েই সাম্রাজ্যের নানা জটীল প্রশ্ন সমাধানের জন্য অনুষ্ঠিত প্রত্যেক Imperial conference এ তাঁরা Imperial preference এর নীতি প্রচার ক'র্ত্তে থাকেন। শিল্পবাণিজ্যের অধিনায়কত্ব গর্ব্বে গর্ব্বিত, অবাধ বাণিজ্যের পথপ্রদর্শক ও প্রচারক ইংলণ্ড উপনিবেশদের এ প্রকার প্রস্তাবে কর্ণপাতই কল্লে না। উপনিবেশজাত পণ্যের বৃটীশ পোতে কম শুল্কে ছাড়্‌বার কোন আগ্রহ ইংলণ্ডের তরফ থেকে দেখা

গেল না। ভবিষ্যতে হয়ত বা তাদের এ আর্জ্জি মঞ্জুর হবে, এ আশায় উপনিবেশরা ১৮৯৭ সালে তাদের বাজারে কম শুল্কে ইংলণ্ডজাত পণ্যকে ঢুকতে দিলে। অনেকে আবার ঠিক এই সময়েই নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। এই সময়কে Empire Economic Policyর তৃতীয় যুগ বলা যেতে পারে।

ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞগণের মধ্যে কিন্তু তখনই এক ব্যক্তি বুঝতে পেরেছিলেন যে এ নীতি অনুসরণ কল্লে ইংলণ্ডের লাভ, লোকসান হবে না। এই বিশ্বাসই স্যর জোসেফ চেম্বারলিনকে শুল্ক-সংস্কারের কার্য্যে মনোনিয়োগ করায়, এবং এই চেষ্টার ফলেই ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দলের মধ্যে এই নীতি প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা বিগত মহাযুদ্ধের আগেই অনুভূত হয়। মহাযুদ্ধই একে কার্য্যে পরিণত করার প্রথম সুযোগ দেয়। ১৯১৫ সালের Mckenna duties রাজস্ব আদায়ের অজুহাতে নির্দ্ধারিত হলেও আকারে সম্পূর্ণ সংরক্ষণশীল ছিল। গত কয়েক বৎসরের United Kingdom এর রাজনৈতিক অবস্থা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে লেবার গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনের সময়টুকু বাদ দিলে আর বাকী সময়ই ইংলণ্ডের ঝোঁক ছিল সংরক্ষণ ও Imperial preference এর দিকে। এর স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় Safeguarding of Industries Act, Dyestuff Importation act, Churchill duties প্রভৃতি থেকে। এদের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের চিরন্তন অর্থনৈতিক চালের আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য Imperial Economic Committee ও Empire Marketting Board এর সৃষ্টি হয়। এর পরিসমাপ্তি ঘটলো ১৯৩১ সালে, যখন অধিকসংখ্যক রক্ষণশীল সভ্য নিয়ে National Government গঠিত হ'লো। গেল বছরকার Import duties Act এ নষ্ট শিল্প উদ্ধারের জন্য সরকারের হাতে আমদানী শুল্ক নির্দ্ধারণ করবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এই হ'লো অবাধ বাণিজ্যপন্থী ইংলণ্ডের রক্ষণপন্থীতে পরিণত হবার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস!

১৯১৯ সালে উপনিবেশজাত কোন কোন পণ্য কম শুল্কে ইংলণ্ডে প্রবেশ ক'ত্তে দিয়ে ও নব প্রবর্ত্তিত Import duties Act এর ক্ষমতা পেয়ে Imperial Preference এর ভিত্তি চিরস্থায়ী হয়ে যাতে গড়ে উঠে, এই অভিপ্রায়েই Imperial Economic Conference এর একটী বিশেষ অধিবেশনের জন্য বৃটীশ মন্ত্রীসভা ব্যস্ত হ'য়ে উঠেন। যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে শিল্পবাণিজ্যের অগ্রদূত ইংলণ্ড উপনিবেশদের এ প্রস্তাবে রাজি হয়নি। কিন্তু এখন তার অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। যুদ্ধের পর ব্যবসা বাণিজ্যে শৈথিল্য ও বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি তাকে এই পথে এগোতে বাধ্য ক'রেছে। শিল্প ও বাণিজ্যের অবস্থা অবনতির চরম সীমায় এসে পৌছেছিল এবং বেকারের সংখ্যা যাচ্ছিল দিনকে দিন বেড়ে। দেশময় এমন একটা হাহাকার পড়ে গিয়েছিল যে এ অবস্থার আশু পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হ'য়ে উঠেছিল। মহাযুদ্ধের পর থেকেই ইংলণ্ড এ অবস্থার দিকে দ্রুতবেগে ধাবমান হচ্ছিল। Mckenna duties, Safeguarding of the Industries Act এর কারণ নিয়ে ও এর গতি রোধ ক'ত্তে পাল্লেনা। বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবার ও তার বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় কোনমতে টিকে থাকবার জন্য ইংলণ্ড সর্ব্বোপরি স্বর্ণমান পর্য্যন্ত ত্যাগ করলে। এত ক'রেও যখন দেখা গেল বিশ্বের বাজারে ইংলণ্ডজাত পণ্যের কাটতি ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে, তখন অটোয়াতে Imperial Economic Conference ডাকা হ'লো। ইংরাজকে নৈরাশ্যজনক অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে তুলতে এইটে ছিল তার শেষ সম্বল। সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি ও মঙ্গলবিধানের জন্য এ চুক্তিতে আবদ্ধ হ'য়ে তাকে সমূহ ক্ষতি স্বীকার ক'রতে হয়েছে বলে ইংলণ্ডের যে বড়াই শুনতে পাওয়া যায় একথা সম্পূর্ণ অমূলক। কেননা আর্থিক দুর্গতির শেষ সীমায় পৌছেও দুনিয়ার বাজার ক্রমশঃই তার হাত থেকে ফস্কে যাচ্ছে দেখে নষ্ট বাজার আবার হাত করবার জন্য এরকম একটা ব্যবস্থা

ছাড়া তার গত্যন্তর ছিলন।। তাই এতে অবাক্ হবার কিছু নেই, যে জন ষ্টুয়ার্টমিল ও ব্রাইটের জন্মভূমি তাদের অবাধ বাণিজ্যের চিরন্তন নীতি ছেড়ে সংরক্ষণের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স হ'চ্চে আমাদের স্বদেশী নীতিরই একটা বিস্তৃত রূপ। স্বদেশী নীতির উদ্দেশ্য হ'লো ভারতে প্রস্তুত জিনিষ কেনা; ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্সের উদ্দেশ্য হ'লো সাম্রাজ্যজাত জিনিষ ব্যবহার করা। তবে দুইয়ে তফাৎ হ'চ্চে স্বদেশী জিনিষ আমরা নিজের ইচ্ছেই কিনি, জোর করে আমাদের দেশী জিনিষ কিন্‌তে কেউ বাধ্য করেনা; কিন্তু ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স আমাদের আইনের সাহায্যে সাম্রাজ্যের বাইরে অন্য দেশের উৎপন্ন পণ্য না কিনে সাম্রাজ্যজাত পণ্য কিনতে বাধ্য করে। অন্য কথায় সাম্রাজ্যের বাইরে উৎপন্ন পণ্যের উপর শুল্ক বসিয়ে তাকে সাম্রাজ্যজাত পণ্য অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান ক'রে সেগুলিকে বাজারের বাহির করবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্সে যোগদান করলে ভারতবর্ষের লাভালাভ কি হয় তাই এখন দেখা যাক্। ১৯০৩ সালে এপন্থা অবলম্বনের যখন প্রথম চেষ্টা হয়, ভারতবর্ষের পক্ষে লাভবান হবে না বলে তখন ভারত সরকার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন; Indian Fiscal Commission এর সন্ধানের ফলে এ মতই বহাল থাকে। ১৯০৩ সালে ভারতের আমদানী দ্রব্যের শতকরা ৭৫ ভাগ এসেছিল সাম্রাজ্য থেকে, ১৯২২ সালে সেটা দাঁড়ায় ৬৬·৬ ভাগে। ভারতবর্ষ থেকে সাম্রাজ্যে রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণ এভাবে ক্রমশঃ কম্‌তে থাকে। ১৯০৩ সালে যেটা ছিল, শতকরা ৪৭ ভাগ ১৯২২ সালে সেটা গিয়ে দাঁড়াল ৩৭·৩ ভাগে। রপ্তানি দ্রব্যের শতকরা ২৫ ভাগ United Kingdom এ পাঠান হয়েছিল ১৯০৩ সালে, ১৯২২ সালে সেটা ক'মে দাঁড়াল ১৯.৭ ভাগে মোটামুটী দেখা যাচ্ছে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে। ১৯৩১ সালে ভারতের রপ্তানীদ্রব্যের শতকরা ৪০ ভাগ পাঠান হয়েছিল সাম্রাজ্যে অর্থাৎ ১৯০৩ সাল অপেক্ষা ৭ ভাগ কম।

সাম্রাজ্য থেকে ভারতবর্ষে আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ ১৯৩১-১৯৩২ সালে ১৯০৩ সাল অপেক্ষা শতকরা ৩০ ভাগ কমে গেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষ তার আমদানী দ্রব্যের অর্দ্ধেকের ও কম আমদানী করে সমগ্র ব্রিটীশ সাম্রাজ্য থেকে ও এক তৃতীয়াংশের কিছু বেশী U, K থেকে এবং রপ্তানী দ্রব্যের পাঁচ ভাগের দু'ভাগ পাঠায় সমগ্র সাম্রাজ্যে এবং এক চতুর্থাংশের কিছু বেশী পাঠায় U, K. তে।

ভারতের বহির্বাণিজ্যের একটা বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় আছে যে U, Kর বাণিজ্যসম্বন্ধ ক্রমশঃ শিথিল হয়ে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সেটা দৃঢ়তরভাবে স্থাপিত হচ্ছে। যুদ্ধের পর থেকে ভারতের বাণিজ্যের গতি এই ভাবেই চলে আস্‌ছে। ১৯২৮ সাল থেকে এটা অবশ্য আরো প্রবল আকার ধারণ করেছে। ১৯৩১ সালে ভারত সরকারের হিসাব মতই U. K. ভারতবর্ষ থেকে ৫৪·২ কোটী টাকার জিনিষ কেনে ও অন্যান্য দেশ কেনে ১৩৬·২ কোটী টাকার জিনিষ। অন্য কথায় আমাদের রপ্তানী দ্রব্যের শতকরা ২৪ ভাগ কেনে U, K. ও ৬০ ভাগ কেনে অন্যান্য দেশ।

সুতরাং এটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ব্রিটীশ সাম্রাজ্য ও ইউনাইটেড কিংডামের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের (আমদানী ও রপ্তানি উভয়েরই) ক্রমশঃ হ্রাস হচ্ছে ও সাম্রাজ্যের বাইরে অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ১৯০৩ সালে U. K. র সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এখন তাও নেই। তখন যদি ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্সকে ভারতের মঙ্গল হবেনা ব'লে প্রত্যাখ্যান করা হ'য়ে থাকে তাহ'লে এখনত আরো বেশী ক'রে এ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার সময় এসেছে।

১৯৩১-৩২ সালে ভারতের আমদানী দ্রব্যের শতকরা ৬৫ ভাগ ছিল তৈরী মাল। তার নিজের রপ্তানি দ্রব্যের শতকরা ২৮ ভাগ ছিল তৈরী মাল ৪৩ ভাগ ছিল কাঁচা মাল আর বাকী প্রায় ৩০ ভাগ ছিল খাদ্যদ্রব্য পানীয় ও তামাক। এক কথায় বল্‌তে গেলে ভারতবর্ষ তৈরী মাল আমদানী করে ও রপ্তানী করে কাঁচা মাল। প্রেফারেন্সে কাঁচা মালের চাইতে তৈরী মালেরই লাভ হয় বেশী। কেননা বিদেশী বাজারে তৈরী মালের প্রতিযোগিতা হচ্চে প্রবল, কাঁচা মালের বেলায় কিন্তু তা নেই। কাঁচা মাল সব বাজারেই বিনা শুল্কে প্রবেশ কর্‌তে পায় তার প্রেফারেন্সের কোনো দরকারই নেই। কাঁচা মালের বাজার সহজেই পাওয়া যায় কিন্তু তৈরী মালের বাজার হাতকরা বহু পরিশ্রমসাপেক্ষ। আমাদের যে সব জিনিষের প্রেফারেন্স দেওয়া হ'চ্চে, বিদেশী বাজারে তার প্রতিযোগিতা U. K র জিনিষের চাইতে অনেক কম। এ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ভারতের পণ্যকে কম শুল্কে U. K তে প্রবেশ কর্‌তে দিয়েও আমাদের বিশেষ কিছু লাভ হ'চ্ছে না। কেননা তার রপ্তানি দ্রব্যের কোনো দেশ থেকেই শুল্ক প্রাচীর খাড়া ক'রে আট্‌কাবার কোন ভয়ও নেই, সেজন্য অন্যদেশে কম শুল্কে প্রবেশ করবার জন্য ভিক্ষারও কোন প্রয়োজনই নেই। তার ওপর ভারতের কাঁচামালের চাহিদা এদেশে নবনব শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে সেজন্য ভারতের ব্রিটেনকে তার জিনিষ কেনবার জন্য প্রলোভন দেখাবার কোন হেতুই নেই। ব্রিটীশ পণ্যের চাহিদা বিশ্বের বাজারে খুবই কমে গেছে Preferential tariff এ ভারতের কাঁচা মালের পরিবর্ত্তে তার তৈরীমাল দিয়ে ভারতের বাজার হাত করার বিশেষ সুবিধা হবে। এক্ষেত্রে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষকে দিতে হ'চ্ছে বেশী ও পাচ্ছে সে কম অপর পক্ষে ব্রিটেন দিচ্ছে কম কিন্তু পাচ্ছে বেশী।

Imperial Preference আমাদের বাণিজ্যের স্বচ্ছ গতির পথে বাধা প্রদান কর্‌ছে। আমাদের বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি হ'চ্ছে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করা, শুধু ব্রিটেনের সঙ্গে নয়। এরূপ কৃত্রিম উপায়ে আমাদের বাণিজ্যের ধারাকে বাধা দিয়ে আমাদের আরও পরমুখাপেক্ষী ক'রে তোলা হ'চ্ছে। ভারতের উৎপন্ন পণ্যকে সাম্রাজ্যের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রেখে আর একটী নূতন বিপদের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা বেশীর ভাগ কৃষিজ দ্রব্য রপ্তানি করি। কৃষিজ দ্রব্যের উৎপন্নের পরিমাণ প্রতিবৎসর সমান হয় না। কোন বৎসর অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য সাম্রাজ্যের গণ্ডীর মধ্যে সে পরিমাণ জিনিষের প্রয়োজন না থাকায় আমাদের পণ্যের মূল্য অতিমাত্রায় কমে যাবে এবং এতে ঘন ঘন অর্থ-সঙ্কট (Crisis) হওয়ার সম্ভাবনা।

ভারতবর্ষ শিল্পক্ষেত্রে সবে প্রবেশ করেছে। শিল্পক্ষেত্রে উন্নতি বিধানের জন্য এখনও তার জাপান আমেরিকা, জার্ম্মানী প্রভৃতি উন্নত দেশের কাছ থেকে শিল্পবিজ্ঞানের কলাকৌশল সম্বন্ধে শেখ্‌বার অনেক কিছু আছে। তাই ঐ সকল দেশের পণ্যের উপর এখন উচ্চহারে শুল্ক বসান কতদূর হানিকর সহজেই অনুমান করা করা যায়।

সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশের সঙ্গেও এ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ভারতের কোনরকম লাভের আশা নেই। কেননা তারাও আমাদেরই মত খাদ্য দ্রব্য ও কাঁচা মাল উৎপাদন করে থাকে। ভারতবর্ষ তাদের উৎপন্ন কোন প্রকার পণ্যই চায়না তারাও ভারতের পণ্যের প্রত্যাশী নয়।

এ-চুক্তিতে রাজি হয়ে আমাদের প্রতিশোধের (retaliation) আশঙ্কা প্রতিনিয়তই আছে। জাপান, জার্ম্মেনী আমেরিকা ফ্রান্স ও ইটালি যাদের যাদের সঙ্গে এতকাল আমাদের বাণিজ্য ক্ষেত্রে বৈরিতা ছিলনা, তাদের পণ্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক বসালে তারা নিশ্চয়ই এর প্রতিশোধ নেবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে জাপান আমাদের কাছ থেকে তুলা কেনা বন্ধ কর্‌তে পারে, আমেরিকায় আমাদের চামড়ার বাজার বন্ধ হতে পারে।

এ চুক্তিতে সবচেয়ে মজার জিনিষ হ'চ্ছে যে যে দেশগুলো সমষ্টীগতভাবে আমাদের সবচেয়ে বড় খরিদ্দার (তারা যে আমাদের রপ্তানীদ্রব্যের বেশীর ভাগই কেনে শুধু তাই নয়, তারা এখানে যে পরিমাণ পণ্য বেচে তার চেয়ে অধিক ভারতবর্ষের জিনিষ তারা কেনে) তাদের জিনিষ না কিনে আমাদের বাধ্য করা হয়েছে এমন সব দেশের জিনিষ কিন্‌তে, যারা ১৯৩১—৩২ সাল পর্য্যন্তও ভারতবর্ষের পণ্য যা ক্রয় করেছে তার চাইতে ভারতবর্ষে তার পণ্য বিক্রয় করেছে অনেক বেশী। এই ব্যবস্থাকে ভারতের বাণিজ্য বৃদ্ধির সহায়ক ব'লে মেনে নিতে কোন পক্ষপাত-বিহীন অর্থ-নৈতিক নিশ্চয়ই রাজী হবেন না।

এই হলো মোটামুটী ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্সের জন্মকথা ও এতে যোগদান করার ফলে ভারতেই কি পরিণাম হতে পারে তার বিবরণ। সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিকগণ একে বাণিজ্যবর্দ্ধনের সহায়ক বলে অভিহিত করেছেন। ব্রিটেনের পক্ষে এ প্রকার ব্যবস্থা যে খুব লাভজনক সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। দুনিয়ার সব বাজারে প্রতিযোগিতায় হঠে গিয়ে তার পণ্যের জন্য আর কোন বাজার হাত করতে না পেরে শেষে এ নীতির আশ্রয় নিয়ে ভারতবর্ষের বাজার হাত করার জন্যই এ প্রচেষ্টা কর্‌ছে। এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তখনই যখন ঐ চুক্তিতে দুয়েরই লাভালাভ হয় সমান। এ চুক্তিতে একপক্ষে লাভ হ'চ্ছে প্রচুর আর পক্ষের হ'চ্ছে সর্ব্বনাশ। পরাধীন ভারতবর্ষকে তার আপত্তি থাকা স্বত্বেও জোর করে তাকে এ প্রস্তাবে রাজী করান হয়েছে। এ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ভারতবর্ষ রসাতলে যাক তাতে কি এসে যায়, ব্রিটেনের বাণিজ্য রক্ষা ত হলো সাম্রাজ্যবাদীদের অভীষ্ট লাভ ত হলো।

ভাবীকাল

গান

শ্রীবেলা দেবী

সাথী আমার, স্মরণ পারের আমায় ভুলিও!
ভুলের দেশে জ্যোৎস্না রাতে দুয়ার খুলিও!
আপন ভোলা শূন্য প্রাণে
বেড়াই ঘুরে উদাস গানে,
সুদূর থেকে তারার সাথে দোদুল দুলিও!

দেখ্‌বো চেয়ে আকুল হয়ে, বিদায় দিয়ো, নিয়ো,
নীলাকাশে উড়্‌বে তোমার আঁচল খানি প্রিয়,
তোমার বাঁশী বাজ্‌বে রাতে
গোপন সুরের জাল বোনাতে
সে কথা আজ ঘুমের ঘোরে জাগিয়ে তুলিও!

সাহিত্যের ধারা

শ্রীআশালতা দেবী

(১)

ষ্টাইল ও বিষয় বস্তু

সম্প্রতি সাহিত্য আসরে সাহিত্যের রীতি এবং নীতি কি প্রকারের, কোথায় কতদূর তাহার সীমানা, সংযমের গণ্ডীটা তাহার কোনখানে, সাহিত্য মানে নিছক গল্প, না নিছক তর্ক, না নির্ভেজাল তত্ত্ব এই সকল জটিল প্রশ্নোত্তরমালার আর অবধি নাই। তাই মনে হয়, সাহিত্যে হয়ত একটা পরিবর্ত্তনের যুগ আসিয়াছে তাই চারিদিকে যে যেখানে ছিল সশস্ত্র এবং সতর্ক হইয়া উঠিয়াছে। তর্কেরও বিরাম নাই এবং প্রশ্নের শেষ নাই।

এ সমস্ত বিষয়েই সকলের আপন আপন মতামত আছে। অনেকের সহিত অনেকের মেলে না। একজন যাহাকে যে ভাবে দেখে অপরে তাহা দেখে না। কাজেই এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব নয়। সে চেষ্টা করিবার মত শক্তি কিংবা জ্ঞান আমার নাই। কেবল নিজের যাহা মনে হয় তাহাই বলিব।

সাহিত্যের মজলিসে প্রথম তর্কটা হইতেছে:—সাহিত্যে বিষয় বস্তু বড় না প্রকাশ ভঙ্গী বড়। ষ্টাইলের পক্ষ হইয়া যাঁহারা ঝগড়া করেন, তাঁহারা বলেন বিষয়বস্তু লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজনটা কোনখানে? যিনি ছবি আঁকিতে জানেন, তাঁহার হাতের যাদুতে একটা সামান্য জিনিষের ছবিও যেমন জীবন্ত নিখুঁত হইবে অসামান্য বিষয়ের তাহাই হইবে। তাঁহার ঐ জীবন্ত করিবার ক্ষমতাটাই আসল। কী উপলক্ষ্য করিয়া সেটা প্রকাশ হইয়াছে তাহার কথা অত শত ধরিতে গেলাম কেন? এমন কি নিজে রবীন্দ্রনাথও কিছুকাল পূর্ব্বে একখানি চিঠিতে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন, রাঁধুনীর হাতের যাদুটাই আসল। তাঁহার হাতের যাদুতে পাকারুই মাছের কালিয়া ভালোই হয় বটে কিন্তু নিরামিষ তরকারীও একেবারে অপাংক্তেয় হইতে পারে না। কথাটা এক হিসাবে সত্য। যিনি প্রকাশ করিতে জানেন, তিনি সামান্য বস্তুকেই অবলম্বন করিয়া বৃহৎ এবং বিচিত্র আনন্দ বেদনার সমাবেশ করিতে পারেন। কিন্তু এ কথাটাও ঠিক যে, জগতে যাঁহারা চিরস্মরণীয় বই লিখিয়া গেছেন, তাঁহাদের রচনার বিষয়বস্তু এমন কিছু আশ্রয় করিয়া আছে যাহা সামান্য নয়। অবান্তর নয়। যাহা সেই জাতির প্রাণবস্তু। যাহা বহুকাল হইতে বহুজনের মনকে নানাভাবে সমস্যায় আন্দোলিত, বেদনায় ব্যথিত এবং আনন্দে অধীর করিয়াছে। এমন যে হইতেই হইবে। কারণ সাহিত্য তো

(ফরিদপুর সাহিত্য-সাম্মলনীতে পঠিত)

ব্যক্তি বিশেষের সামগ্রী নয়। কেবল কোন এক বিশেষ সময়ে কোন এক বিশেষ প্রতিভাকে আশ্রয় করিয়া সেই যুগের এবং সেই জাতির প্রবহমান আশা আকাঙ্ক্ষার ধারাকে রূপ দেওয়া মাত্র। তাই যে বিষয়বস্তুতে যে আখ্যানে সমস্ত জাতির প্রাণের সাড়া এবং সায় পাওয়া যায় তাহাই যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকারদের নিকট সমাদর পাইয়াছে। সেই বিষয় অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা রস এবং আনন্দ পরিবেষণ করিয়াছেন। একথাটা খুব পুরাতন হইলেও চিরনূতন। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির কয়েকখানি কথা মনে পড়িয়া গেল ঃ—

"এই যে যুগ যুগান্তর লোকলোকান্তর হইতে বহমান অনুভূতি ইহা মিথ্যা কল্পনা নহে, সুদৃঢ় সত্যে প্রতিষ্ঠিত। শুকতারার জ্যোতি আমাদের মনে ক্ষণিক সুখ সঞ্চার করে বলিয়া তাহাকে সুন্দর বলি না, কিন্তু যুগ যুগান্তর ব্যাপী চিরন্তন মানব হৃদয়কে উহা সংক্ষুব্ধ, আকুলিত বা আশ্বস্ত করিয়া আসিয়াছে বলিয়া উহা সুন্দর। আমরা যখন উহার সৌন্দর্য্য অনুভব করি, বিশাল গভীর মানবহৃদয় তখন আমাদের সহিত সায় দেয় এবং তাহার স্পন্দনগুলি আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে।" —যিনি যত বড়ই সাহিত্যিক হোন, যাঁহার লেখায় এই সম্মিলিত মানবহৃদয়ের ধ্বনিত স্পন্দন নাই তাহা মহাকালের দরবারে আসন পায় না।

এই কথাটা মানিয়া লইলেও ষ্টাইল অথবা রচনারীতির প্রভাবকে তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ করিয়া দেখা হয় না। ষ্টাইল হইতেছে একটা ভঙ্গী, প্রকাশ করিবার একটা সৌন্দর্য্যময় রূপ, বিশেষ মনের একটা বিশেষ চেহারা। সাহিত্যিক মাত্রেরই স্ব স্ব স্বতন্ত্র ষ্টাইল আছে। সেটা তাঁহাদের মনের রূপ। এবং রূপ মাত্রেই আমাদের প্রিয় ও উপভোগ্য। কত রকমের আইডিয়া কত বিভিন্ন ভাবরাশি আকাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কত কালের কত কালোপযোগী সমস্যা, কত যুগের কত চিরন্তন সমস্যা বাতাসে বাতাসে সঞ্চারিত হইয়া আছে। তাহারা নিরাকার, মহাব্যোমের অতলতায় সেই সকল ভাসমান আইডিয়ার পশ্চাদ্ধাবন করিবার মত মনের গঠন সকলের নয়। কিন্তু যখনই কোন এক প্রতিভাময় বিশেষ মনের আকর্ষণে তাহারা আসিয়া একত্র হইয়া মিলে, সেই মনের ধাঁচ অনুসারে একটা বিশেষ আকার পাইয়া আবির্ভূত হয় তখন সেই রূপের মাঝে আমরা পাই রস, পাই আনন্দ। যাহা ছিল অ্যাব্‌ষ্ট্রাকট্ আইডিয়া তাহাদেরকেই চারিপাশের অতি অপরিচিত মানব মানবীর সুখ দুঃখ হাসি ক্রন্দনের মধ্যে বিরাজমান দেখিতে পাইয়া আপনার বলিয়া সহজে চিনিতে পারি; বুঝিতে পারি। অরূপকে এই যে রূপের বন্ধনে বাঁধিয়া দেওয়া এইটে সকল সাহিত্যিককে আপন আপন মনের ধাঁচ অনুসারে করিয়া থাকেন। তাহাকেই আমরা বলি ষ্টাইল। সাহিত্যে রচনা ভঙ্গীর গৌরব যে খুব বেশি সে কথা রসবোদ্ধা মাত্রেই জানেন। কথার ম্যাজিকে সম্মোহন সৃষ্টি করা...কেবলমাত্র গুটিকতক শব্দ হইতে এমন বাক্য রচনা কর যাহা বাক্য নয়, বাণী সে তো কেবল সাহিত্যকারের অপূর্ব্ব প্রকাশ ভঙ্গীর জোরেই হয়।

কিন্তু আজকাল সকল কথাকে লইয়াই তর্ক করা আমাদের মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তাই আমরা ক্রমাগত বসিয়া বসিয়া বিচার করিতেছি, ষ্টাইলটা বড় না বিষয়বস্তুটা বড়। এ আর কিছুই না, সেই ধরণের চিরন্তন অমীমাংসিত তর্ক পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র। কিন্তু কলরব হইতে আসল বস্তুটি চিনিয়া লওয়া দুষ্কর। ষ্টাইল এবং বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বহুপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়া গেছেন, এই ভীড়ের কোলাহল হইতে তাহা মনে আসিতেছে ঃ—"সাহিত্যে বিষয়টা শ্রেষ্ঠ না ভঙ্গীটা শ্রেষ্ঠ ইহা বিচার করিতে হইলে আমি দেখি কোনটা অধিক রহস্যময়। বিষয়টা দেহ ভঙ্গীটা জীবন। দেহটা বর্ত্তমানেই সমাপ্ত, জীবনটা একটা চঞ্চল অসমাপ্তি তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে, তাহাকে বৃহৎ ভবিষ্যতের দিকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, সে যতখানি দৃশ্যমান তাহা অতিক্রম করিয়াও তাহার সহিত অনেকখানি আশাপূর্ণ নব নব সম্ভাবনা জুড়িয়া রাখিয়াছে। সাহিত্যকারের ষ্টাইল তাঁহার সেই গতিভঙ্গী। একটি ছোট গল্পের মধ্যে কিংবা একখানি উপন্যাসের পরিসরের মধ্যে মানব জীবনের কূলহীন অপারতার ইঙ্গিত নিহিত করিয়া দেওয়া কঠিন কাজ। গল্পটা দু'কথায় শেষ হইয়া গেল, কিন্তু তাহার রস সমাপ্তির কূল উল্লঙ্ঘন করিয়া চিরকাল প্রবাহিত হইয়া সকলকে আনন্দ দিতে লাগিল। একটা জিনিষ শেষ হইয়া যাইবার পরেও তাহার গায়ে চিরনূতনের বিস্ময় লাগিয়া রহিল, একাজটা কি সোজা? ইহার চেয়েও কঠিন কাজ সংসারে কম আছে। সাহিত্যিক এই শক্ত কাজ সহজে সম্পন্ন করেন তাঁহার প্রকাশ ক্ষমতার ঐশ্বর্য্যে, তাঁহার রচনা রীতির লীলায়। ষ্টাইল তো বাহির হইতে একটা ফলাইয়া তোলা জিনিষ নয়, কবি যেমন মন হইতে কবিতা পান সাহিত্যিক ও নিজের সৃজন করিয়া তোলেন। দেহ এবং জীবন যেমন পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধজালে জড়িত, কে বড়, কে ছোট, কে আগে কে পিছনে সে তর্কই উঠিতে পারে না তেমনি ষ্টাইল ও বিষয়বস্তুর তর্কটাও অনাবশ্যক। সাহিত্যের দরবারে সাহিত্যিকের প্রতি কেবল মাত্র একটি আবেদন আছে, তিনি যাহা বলিতে চান তাহা আন্তরিকতার সহিত সমস্ত অস্তিত্ব দিয়া বলিতে চাহিবেন! তাঁহার দৃষ্টিতে থাকিবে অসীম স্নেহ এবং প্রকাশের মধ্যে থাকিবে আন্তরিক আবেগ। এই আবেগ এই সত্যনিষ্ঠাই তাঁহার ভাষাকে দিবে রূপ তাঁহার বক্তব্যকে করিবে সংযত এবং মধুর। গভীর চিন্তাশীল আলডুস হাক্সলিও ষ্টাইল এবং বিষয়বস্তুর কথা চিন্তা করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন,—

"You must point with passion and the passion will stimulate your intellect to create the right formal relations."

(২)

আর্ট ফর আর্টস সেক্.

আর্ট ফর আর্টস্ সেক তর্কখানাও আজকাল সাহিত্যিক আসরে খ্যাতি পাইয়াছে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে কেবল আনন্দ দেওয়া, আর কিছুই নয় সে কথাটাও সত্য। আবার একথাটাও

লেশমাত্র মিথ্যা নয় যে, সাহিত্যের যাহা কিছু উদ্দেশ্য তাহা সে কেবল আনন্দের মধ্য দিয়াই সম্পন্ন করে। সেই জন্যই কোন জাতির আসল সম্পদ তাহার সাহিত্য। কিন্তু সাহিত্য কেবল আনন্দ দেয় তাহার কাছে আর কিছু চাহিতে যাওয়া বোকামি—এ কথাটার সত্য মিথ্যা বিচার করা কঠিন। কেবল এইটুকু মনে হয় সাহিত্য আমাদের সাংসারিক সামাজিক চাওয়া পাওয়ার বাহিরে। আমাদের নিজেদের তরফ হইতে তাহার কাছে কিছুই চাহিতে হয় না, চাহিতে গেলেও পাওয়া যায় না। সে যা দেয় নিজের নিয়মে দেয়। তাহার যা কিছু গভীর উদ্দেশ্য সে সমস্তই আনন্দের সহিত সে এমন করিয়া মিলাইয়া লয় যে বাহির হইতে কোন ভাগরেখা চোখে পড়ে না। তবে আর্ট ফর আর্টস সেক কথাটা লইয়া আজকাল সর্ব্বদাই যাঁহারা বাড়াবাড়ি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথার মাঝে হয়ত এইটুকু সত্য আছে:—আমাদের প্রকাশ করিবার ক্ষমতা এত সীমাবদ্ধ যে কোন একটা কথাকে ভালো রকমে প্রকাশ হইতে দেখিলেই আমাদের সমস্ত মন আনন্দে চঞ্চল হইয়া ওঠে। প্রকাশ করিতে পারা…সুন্দর করিয়া মধুর করিয়া প্রকাশ করিতে পারা কেবলমাত্র তাহারই একটা অনিবার্য্য আকর্ষণ আছে। "যখন দেখি কোন মানুষ একটা কঠিন কাজ অবলীলাক্রমে করিতেছে তখন তাহাতে আমাদের আনন্দ হয়। কিন্তু যখন দেখি কোন কাজ নয়, কিন্তু যে কোন তুচ্ছ উপলক্ষ্য লইয়া কোন মানুষ আপনার সমস্ত শরীরকে নিপুণভাবে চালনা করিতেছে —তখন সেই তুচ্ছ উপলক্ষ্যের গতিভঙ্গীতেই সেই লোকটার যে প্রাণের বেগ যে উদ্যমের উৎসাহ প্রকাশ পায়, তাহা আমাদের ভিতরকার প্রাণকে চঞ্চল করিয়া সুখ দেয়। সাহিত্যের মধ্যেও হৃদয়ের প্রকাশ ধর্ম্মের লক্ষ্যহীন নৃত্যচাঞ্চল্য যথেষ্ট স্থান পাইয়াছে।" তাই যদি আমরা আজ দেখিতে পাই, আমাদের সাহিত্য সমাজে আর্ট ফর আর্টস সেক কথাটা লইয়া কথঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি হইতেছে তাহা হইলে এই মনে করিয়া পুলকিত হইতে হইবে যে, আমাদের আধুনিক বাংলা ভাষা সমস্ত কৃত্রিমতা পরিহার করিয়া মেদবর্জ্জিত সুন্দর সাবলীল স্বাস্থ্যবান্ দেহের মত প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এবং নবশক্তির এই উত্তেজনায় প্রকাশ ক্ষমতার এই প্রচুরতায় মনে একটা অকারণ আন্দোলন জাগিতেছে। পুলক চঞ্চলতায় মনে হইতেছে, যাহা তাহা একটা কিছু উপলক্ষ্য করিয়া স্বাস্থ্যের এই জ্যোতিতে বিচ্ছুরিত করিতে পারাটাই মহৎ গৌরব। গৌরব সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বাস্থ্যের আভা যখন আকাশের বায়ু এবং সূর্য্যের আলোর মত সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইবে, তখন নিজেই উপলব্ধি হইবে, যদিচ প্রকাশ করিতে পারাটাই যথেষ্ট উত্তেজনা এবং সুখের কারণ তথাপি আর্টের মাঝে আছে ইহার চেয়েও বড় আনন্দ ইহার চেয়েও বিপুল গৌরব। এবং এই কথাটা আপনা আপনি যেদিন বুঝতে পারা যাইবে সেদিন আর্ট ফর আর্টস সেক লইয়া অযথা সমস্ত বাড়াবাড়ি নিজেই থামিয়া যাইবে।

কিন্তু এই কথাটাই ভাবিতেছিলাম, আর্টের জন্যই আর্ট একথাটার আরও হয়ত কতই না সঙ্গোপন অর্থ রহিয়া গেল তাহা না হইলে লোকে এই কথাটা লইয়া আজকাল এত তর্ক করে

কেন? হাতের কাছে ছিল রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূত তাহারই একটা খোলা পৃষ্ঠা চোখে পড়িল। সেই স্থানটা পড়িবার পরে চোখের সুমুখে ভাসিয়া উঠিল, কত নিষ্ঠাবতী বর্ষীয়সী বিধবাকে দেখিয়াছি দুর্জ্জয় শীতেও পুণ্যের জন্য গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া দু'ঘটি জল মাথায় ঢালিয়া নিয়া চোখ কাণ বুজিয়া কোনক্রমে ফিরিয়া আসেন। তাহার পরে সমস্ত দিন রাত্রির কত আলো আঁধার কত জোয়ার ভাঁটা গঙ্গাবক্ষের উপর ভাসিয়া যায়—তাঁহাদের নিশ্চেতন মনে সে অসীম সৌন্দর্য্যের ধারা স্পর্শ মাত্র করে না। কেনই বা করিবে, তাঁহাদের পুণ্যের কাজ সে তো সারা হইয়া গেছে। সেই দৃশ্যের স্মরণের পরে আবার করিয়া রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূত লেখা সেই কয়েকটি অনুপম কথা পড়িলাম, "ইহকালের সম্পদ এবং পরকালের পুণ্য, হে জাহ্নবি, আমি তোমার নিকট চাহি না এবং চাহিলেও পাইব না। কিন্তু শৈশবকাল হইতে জীবনের কতদিন সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তে, কৃষ্ণপক্ষের অর্দ্ধচন্দ্রালোকে ঘনবর্ষার মেঘশ্যামল মধ্যাহ্নে আমার অন্তরাত্মাকে যে এক অবর্ণনীয় অলৌকিক পুলকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছ সেই আমার দুর্লভ জীবনের আনন্দ সঞ্চয়গুলি যেন জন্মজন্মান্তরে অক্ষয় হইয়া থাকে। পৃথিবী হইতে সমস্ত জীবন যে নিরুপম সৌন্দর্য্য চয়ন করিয়াছি, যাইবার সময়ে যেন একখানি পূর্ণ শতদলের মত সেইটি হাতে করিয়া লইয়া যাইতে পারি এবং যদি আমার প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ হয় তবে তাঁহার করপল্লবে সমর্পণ করিয়া দিয়া একটি বারের মানবজন্ম কৃতার্থ করিতে পারি।"

মনের মধ্যে এই দুইখানি বিপরীত ছবি পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলাম, আর্ট ফর আর্টস সেক লইয়া অনেক সুচিন্তিত সুলিখিত প্রবন্ধ পড়িয়াও যাহা ধরিতে পারি নাই তাহাই দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আর্টকে যাঁহারা এমনই করিয়া সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্যের অতীত আনন্দের একটি বিকশিত শতদলের মত জীবনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারেন তাঁহারাই দিনশেষে প্রিয়তমের হাতে সেই দুর্লভ আনন্দ সঞ্চয়গুলি তুলিয়া দিয়া ধন্য হ'ন।

(৩)

সাহিত্যের স্বরূপ

একদা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোন এক প্রবন্ধে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন, আজকাল পাশ্চাত্য জগতের অনেক উপন্যাস ভারবাহী মাল গাড়ীর মত। তাহাতে অশেষবিধ সমস্যা এবং অজস্র চিন্তার পিণ্ড তাল পাকান আছে। তাহারা আকারে প্রকাণ্ড কিন্তু প্রকারে সাহিত্যিক পর্য্যায়ে পড়ে না।

তাঁহার এই ধরণের উক্তি শুনিয়া কত লোকে প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছে, মডার্ণ যুগখানা যে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্ যুগ। এ যুগে কেবল গল্পে মন ভিজে না। চাই তর্ক, চাই চিন্তা। চাই নানা সমস্যার আলোড়ন। কিন্তু যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের উক্তির প্রতি রাগিয়া প্রবন্ধ

লিখিতেছেন, তাঁহারাই যদি একবার স্থির হইয়া বসিয়া তাঁহারই রচিত উপন্যাস গুলা মন দিয়া পড়েন তবে এ কথার সবচেয়ে প্রাঞ্জল উত্তর পাইবেন।

চিন্তার শক্তি যে উপন্যাসে বাড়ায় না, জীবনের এবং জগতের অনেক সংগুপ্ত স্রোতোপথের দিকে আমাদের চিত্তের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয় না, যে উপন্যাসে কেবল গল্প বলা ছাড়া লেখকের অন্তর্লোকের বিশেষ পরিমণ্ডল, আত্মার দ্যুতি উদ্ভাসিত করিয়া দেখায় না, সত্যই সে উপন্যাস কখনো প্রথম শ্রেণীর হইতে পারে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে বস্তুর বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছেন সে উপন্যাসের মধ্য দিয়া চিন্তার স্রোত কিংবা আত্মার দীপ্তিকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য নয়। কারণ তাঁহারই 'গোরা', তাঁহার 'ঘরে বাইরে' এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার 'চতুরঙ্গের' মত একটি অত ছোট উপন্যাসের মধ্য দিয়া এত চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে যে, গল্প বলার ফাঁকে তেমন করিয়া মনকে নাড়া দেয় বিশ্বসাহিত্যের কয়টা উপন্যাস ? কিন্তু 'চতুরঙ্গে' যে সকল তথ্য এবং নিরতিশয় সুকঠিন তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে তাহার একটাও উপর পড়া হইয়া বলা নয়। তাহার লেশতম অংশমাত্র অবান্তর নয়। গুটি কতক লোকের মুখে বড় বড় কথা বসাইয়া দেওয়া নয়। শচীশ, দামিনী এবং শ্রীবিলাসের জীবনে সেই সকল কথা যদি এমন সত্য এমন বৃহৎ এত একান্ত হইয়া না দেখা দিত, তবে সে যত চিন্তার বস্তুই হউক না কেন উপন্যাসে তাহার স্থান ছিল না।

যে সকল সুবিপুল পাশ্চাত্য উপন্যাসের কথা কবি বলিয়াছেন তাহাতে, এই বস্তুরই অভাব। সেখানে চরিত্র সৃষ্টির চেয়ে তর্কসভাই আসন জুড়িয়াছে অধিক! আমি যে কথাটা বলিতে চাই, সে কথাটা এইচ্‌ জি, ওয়েলস্‌য়ের ওয়ার্ল্ড অফ্‌ উইলিয়াম ক্লিসোল্ড এর মত উপন্যাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসখানির তুলনা করিলে কিংবা দু'খানা উপন্যাস পর পর পড়িলেই খুব স্পষ্টরূপে বোধগম্য হইবে। দু'খানা উপন্যাসই প্রকাণ্ড। এবং তাহাতে খাঁটি নির্ভেজাল গল্প ছাড়া আরও অনেক কিছু আছে। কিন্তু যে শক্তির অভাবে ওয়েলসের বইখানা রাজ্যের খবর, সমস্যা এবং চিন্তার একখানা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া দাঁড়াইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের গোরায় আর্টিস্টের সেই শক্তি পূরোপূরি থাকায় রস-সাহিত্যে গোরার স্থান অনেক উপরে।

গোরা উপন্যাসে গোরা এবং বিনয়ের যে সকল আশাআকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শবাদ তাহাদের জীবনের সহিত অস্থিমজ্জায় মিশিয়া গেছে, তাহারই সঙ্গে সেই উপন্যাসের সমস্ত চিন্তা এবং সমস্যার আলোড়নের একটি নিগূঢ় যোগ আছে। সে যোগ এত অভিন্ন এমন করিয়া পরস্পর সংবদ্ধ যে কোনখানে ভাগরেখা চোখে পড়ে না। এইখানেই আর্টিস্টের শক্তি। আমাদের জীবনের যে একটি লক্ষ্য আমাদের সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের সমস্ত ভাবনা, কামনা বেদনার ধারা যে লক্ষ্যে গিয়া মিশিতেছে সমগ্র ভাবে তাহাকে শক্তি দিয়া ফুটানই শক্ত। সে করিতে গেলে আর্টিস্টের চক্ষে আমাদের দেখিতে

হইবে। খাড়া দাঁড় করাইয়া আমাদের মুখে কলে ছাঁটা কতকগুলা কথা বসাইয়া দিলেই চলিবেনা। রবীন্দ্রনাথ এই প্রাণহীন তর্ক এবং তত্ত্বের স্তূপের বিরুদ্ধেই আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। সাহিত্যিক যখন সাহিত্যের এক একটা চরিত্র সৃষ্টি করেন তখন সে অনুনয় করিয়া কহিতে থাকে, 'আমি দার্শনিক তত্ত্ব নই, আমি ছাপার বই নই, তর্কের সুযুক্তি অথবা কুযুক্তি নই, আমার বন্ধুরা আমার আত্মীয়েরা আমাকে সর্ব্বদা যাহা বলিয়া জানে আমি তাই। আর আমাকে তাহারা যাহা বলিয়া জানেনা অমনকি অনেক সময় আমি নিজেও নিজেকে যাহা বলিয়া জানিনা আমি তাহাও। আমার সামান্য দৈনন্দিন জীবনধারার অন্তরে অন্তরে আমার জীবন বিধাতার যে একটি সুগোপন অভিপ্রায় আছে, যাহাকে বাহির হইতে নানা অবাস্তবতায় সকল সময়ে দেখা যায় না আমি যে তাহাও। তুমি আমার জীবনের সেই সমগ্রতাকে সমস্ত তুচ্ছতার মধ্যেও বৃহৎ করিয়া দেখাইবে, সমস্ত অবাস্তবতার মাঝেও একটি ঐক্যের সন্ধান নির্দ্দেশ করিয়া দিবে তাইতো বিশ্বজগত তোমার কাছে ঋণী তাই জন্যই যে পি, এইচ, ডির হাজারটা থিসিস পড়িয়াও লোকে যাহা বুঝিতে না পারে তোমার সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মাঝে তাহাকে নব নব বিস্ময়ে এবং আনন্দে উপলব্ধি করিয়া কণ্টকিত হইয়া উঠে।

(৪)

সাহিত্যে রিয়ালিজম্

কিন্তু আসল কথাটাই যে এড়াইয়া গিয়াছি। একটা ঘটনার কথা স্মরণ হইতেই সেই ভুলিয়া যাওয়ার কথাটা মনে পড়িল। সেদিন এক আত্মীয় লিখিয়াছেন,—'অমুক আধুনিক রিয়ালিষ্টক্ লেখকের লেখা তুমি সহ্য করিতে পারনা কেন?...তাঁহার লেখার ভাল্গারিটি আছে? ...তা সেক্সপীয়র আর কালিদালের কাছে ভাল্গারিটিতে তিনি তো শিশু! তবে কালিদাসের শকুন্তলাই বা পড় কি করিয়া এবং কুমার সম্ভবের সপ্তমসর্গ অবধি পড়িয়াই বই বন্ধ করনা কেন?' ভাবিয়া দেখিতে লাগিলাম কথাটার সত্যতা কোনখানে? সত্যইতো কালিদাস সেক্সপীয়রের তুলনায় এই সব রিয়ালিষ্টিক্ লেখকেরা সাহসিকতা এবং ভাল্গারিটিতে যে শিশু। কিন্তু কথাটার অপর একটা দিকও আছে। সত্যের যে অসংশয় জোর কল্পনার যে বৃহত্তরতা থাকিলে সমস্ত চিত্রই শুচিস্মিত হইয়া দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথের 'বিবসনা'র মত কবিতা কিংবা বিজয়িণীর মত কবিতায় নারী রূপের নিবিড় পরিপূর্ণ বর্ণনাও যেখানে অস্খলিত সৌন্দর্য্যে আপন মহিমায় আসন করিয়া নেয়, তেমনি কল্পনার জোর, সৃষ্টির তেমনি নিবিড়তা, সত্যের প্রতি তেমনই অবিচল নিষ্ঠা, তেমনি শুচিস্নাত নির্ব্বিকার নিরাসক্ত সাহিত্যিক ঔৎসুক্য...এ সকল বাহির করিতে না পারিলে শুধু বাস্তবতার দোহাই দিয়া কি ভাল্গারিটির হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়? শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন বইতে কিরণময়ী এবং দিবাকরের যে বহু-খ্যাত কথোপকথন আছে তাহাতে রিয়ালিজম্ এবং ভাল্গারিটির

এই দিকটা স্পষ্ট করিয়া দেখান আছে। কিরণময়ী বলিতেছেন, 'কিন্তু সেকালের শকুন্তলাকে কেন যে একালের কোন নর নারীই অন্তরে অন্তরে মন্দ বলে ঘৃণা করতে পারেনা, এইটেই বিচিত্র। ঘৃণা কেন যে কর্‌তে পারেনা জানো? পারেনা এই জন্যেই যে, মিলন তাঁর যে ভাবেই হোক মিলনের আদর্শকে তিনি খাঁটি রেখেছিলেন। যে বন্ধনে একমুহূর্ত্তেই নিজেকে চিরদিনের মত বেঁধে ফেলেছিলেন সে বন্ধন পাকা নয় বলে মনের মধ্যে কোন সংশয় কোন সঙ্কোচ রাখেন নি। তা যদি রাখতেন তাহলে কালিদাস যত বড় এবং যত মধুর কোরেই লিখুন না, কোন মানুষের হৃদয়কেই এমন করে টান্‌তে পারতেন না। আসল কথাটা যে কোনখানে একবার ভেবে দেখ দিকি।'...এই আসল কথাটার মধ্যে সত্যের যত বড় জোর আছে সেই জোরেই কালিদাসের সাহিত্যকে কোন দিন ম্লান হইতে দেয় নাই। কোন দিন তাহা পড়িবার পরে আমাদের রুচি মুখভার করিয়া খুঁত খুঁত করিতে ব'সে নাই। সত্যের এই অসন্দিগ্ধ প্রভাব ছিল বলিয়াই অভয়া এবং রোহিণীর কথা প'ড়িবার পরেও আমাদের সাহিত্যিক রুচি এতটুকু ম্লান হয় নাই। অভয়ার যিনি সৃষ্টি কর্ত্তা তিনি তাহার মুখ দিয়া বলিয়াই গেছেন, 'আমার সন্তানদের দিয়ে যাবার মত জিনিষ হয়ত কিছুই থাক্‌বেনা। কিন্তু, তাদের মা তাদের এই বিশ্বাসটুকু দিয়ে যাবে যে, তারা সত্যের মধ্যে জন্মেচে, সংসারে সত্যের বড় সম্বল তাদের আর কিছু নেই।'

আধুনিক সাহিত্যের অতিরিক্ত বাস্তবতা প্রীতির স্রোত কোনদিকে, খাদ আছে তাহার মধ্যে কতখানি সে সকল কথার আলোচনা বহুবার বহু মান্য গণ্য লোকে করিয়াছেন তাই সে কথা আর তুলিবনা। কেবল একদিন পূজনীয় বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাস মনোযোগ দিয়া পড়িবার পরেই শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়িলাম। তখনই বুঝিতে পারা গেল পরিবর্ত্তনটা ঘটিয়াছে কোন দিকে। যে বাস্তবতায় আছে সত্যের দীপ্তি, যাহাতে আছে মনুষ্যত্বের নব নব বিস্তার সেই পথেই শরৎচন্দ্রের এই বাস্তবতা গিয়াছে। যদি আধুনিক সাহিত্যের বাস্তবতার ধারা এই পথ অনুসরণ করিয়া চলে বোধকরি তাহার ভালোই হইবে।

পরিবর্ত্তনটা যে কোনখানে ঘটিয়াছে এইবারে সেই কথাটাই বলিব। বঙ্কিমচন্দ্রের যে রোহিণী দৃপ্তা আত্মমর্য্যাদাময়ী অতুল প্রেমশালিনী ছিল, যে শুধুমাত্র ভালোবাসিয়াই বারুণীর জলতলে প্রাণ দিতে গিয়াছিল, সে যখনই গৃহত্যাগের পথে পা বাড়াইল অমনি তাহার চরিত্রের পূর্ব্বাপরতা গেল নিশ্চিহ্ন হইয়া। যে রোহিণী রহিল, সে কেবল এসংসারের পুণ্যের জয় এবং পাপের পরাজয় দেখাইতে পারে, আর কিছু পারে না। তাই প্রেমাস্পদের জন্য যে একদিন মরিতে গিয়াছিল সেই আর একদিন নিশানাথকে মিনিট পাঁচেক দেখিবার পরেই গোবিন্দলালকে বলিতে বলিতে পারিল, 'যতদিন তুমি পায়ে রাখ ততদিন তোমার, তার পর যে রাখে তার।'

যে নারী সমাজের বাহিরে পা দিয়াছে তাহার মন্দভাগ্য হইতে পারে কিন্তু সকল দিক হইতে তাহাকে আরও মন্দের দিকে অহর্নিশি বুঝাইয়া দিবার যতগুলা ফন্দীআছে শরৎচন্দ্র তাহার

একটাও গ্রহণ করেন নাই। মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের বিকাশ যে বৃহৎ এবং বিচিত্র, কোন দিনের কোন মুহূর্ত্তের গভীর অপরাধও যে তাহার চিত্তাকাশকে নিশিদিন কালিমাময় করিয়া রাখিতে পারেনা, এবং স্ত্রীলোকের পক্ষেও যে এই কথাটা নিরতিশয় সত্য...সমাজ সংস্কারের আসনে বসিয়া শরৎচন্দ্র একথাটাকে কোনদিন চাপিয়া দিতে চাহেন নাই। রাজলক্ষ্মীর প্রসঙ্গে তাঁহার স্বচ্ছ উদার সত্যান্বেষী দৃষ্টি দিয়া এই দেখাই তিনি দেখিয়াছে—'শুধু এইটুকু জানি দু'জনের মর্ম্মেও কর্ম্মে চিরদিন কোন মিল কোন সামঞ্জস্যই ছিলনা। চিরদিন উভয়ে পরস্পরের উল্‌টা স্রোতে বহিয়া গেছে, তাই একের নিভৃত সরসীতে যখন শুদ্ধ সুন্দর প্রেমের কমল ধীরে ধীরে অনুক্ষণ দলের পর দল মেলিয়াছে তখন অপরের দুর্দ্দান্ত জীবনের ঘূর্ণাবায়ু সেখানে ব্যাঘাত করিবে কি প্রবেশেরই পথ পায় নাই।'

ইহার চেয়ে বড় রিয়ালিজম্ আর কি হইতে পারে? এবং ইহার চেয়ে সত্যই বা আর কী আছে? মানুষের আশ্চর্য্য মন যে কত উলটা পালটা, সেখানে কত বিরোধ কত অসামঞ্জস্য কত সংঘাত সে কথা তো সমাজ সংস্কারকদের বুঝিবার কথা নয়। তাঁদের বুঝিলে চলেই বা কি করিয়া তাঁদের প্ল্যানের কাঠামো শক্ত, রাস্তা সোজা। যে বস্তু একটা সুসংবদ্ধ প্যাটার্ণের মধ্যে না পড়ে ওঁদের কাঠামে সে বস্তু ধরান শক্ত। কিন্তু মানুষের মনের গহন গভীরে সারাদিনমান এই যে কত আবর্ত্ত কত তরঙ্গ, তাহার ধ্বনি আর্টিস্ট কান পাতিয়া শুনেন। সে সঙ্গীতের সুর তাঁহার মনের সোনার তারে নিশিদিন ঝঙ্কার তুলিতেছে। তাইতো তাঁহার আসন জাতির মনে এত দৃঢ়বদ্ধ, তাইতো সকলের চেয়ে তিনিই প্রিয়। কিন্তু বেশি কথা বলিবার আর প্রয়োজনটাই বা কোনখানে। কেবল এইটুকু বলিয়া শেষ করি আজ অবধি সাহিত্য রিয়ালিজমের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যতকথা শুনিয়াছি যত লেখা পড়িয়াছি—সে সমস্ত প্রশ্নোত্তরের অবসান হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের নূতন সৃষ্টি বাঁশরীর মুখের একটি কথায়—

'সীতা ভাব্‌লেন, দেবচরিত্র রামচন্দ্র উদ্ধার করবেন রাবণের হাত থেকে, শেষকালে মানব-প্রকৃতি রামচন্দ্র চাইলেন তাঁকে আগুণে পোড়াতে। একেই বলে রিয়ালিজম্, নোংরামিতে নয়।'

প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত

বিহারে ভূমিকম্প

গত ১লা মাঘ সোমবার অপরাহ্নে যে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে তাহার কম্পন বেগ বাংলা, বেহার, ছোট-নাগপুর, ইউপি, প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তেই অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু নেপাল ও উত্তর বিহারে ইহার প্রকোপ যেরূপ ভয়ঙ্কর সে তুলনায় অন্যত্র কিছুই নহে। মুঙ্গের, দ্বারবঙ্গ, মজঃফর জামালপুর, সমস্তীপুর, সীতামারি, মধুবণী, পাটনা ভাগলপুরও পূর্ণিয়ার কিয়দংশ, এই সমস্ত সহরগুলি প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। নেপালের রাজধানী কাটামুণ্ড ও আরও দুইটি বৃহৎ নগর পাটন ও ভাটগাঁ একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। মৃত্যু যে কত লোকের হইয়াছে তাহা বোধহয় এখনও নির্ভুল করিয়া বলা চলে না। সরকারী সংবাদে প্রকাশ সমগ্র বেহারের মৃত্যু সংখ্যা ৬ হইতে ৭ হাজারের মধ্যে। কিন্তু বে-সরকারী সংবাদে জানা যায় শুধু মুঙ্গেরেই মৃত্যু সংখ্যা আনুমানিক ১০,০০০, মজঃফরপুর ৫০০০, দ্বারবঙ্গ ১,০০০, জামালপুর ২০০, পাটনা ১২৩ আর আহতদের সংখ্যার কোন গণনা হয় নাই, তাহার সংখ্যাও কম নহে। মোটের উপর যে কি খণ্ড প্রলয় হইয়া গিয়াছে তাহা চিন্তা করিতেও পারা যায় না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বোধহয় এইরূপ বিস্তীর্ণ ভূভাগ ব্যাপিয়া এতোবড় ভূকম্পনের ধ্বংসলীলা ইতিপূর্ব্বে আর লিখিত হয় নাই। কত পরিবারের চিহ্ন মুছিয়া গিয়াছে, যাহারা গিয়াছে তাহারা তো সব দুঃখ সুখের হাত এড়াইয়া গিয়াছে, কত পরিবারের আপনার জন কতক গিয়াছে আর অবশিষ্টরা জীবনভর শোকাক্রান্ত জীবন বহন করিবার জন্য বাঁচিয়া আছে, ইহাদের অবস্থা আর ভাবা যায় না। যদি তখন তখনই ভগ্নস্তূপ সরাইবার ব্যবস্থা করা যাইত! তাহা হইলে কত জীবন রক্ষা পাইতে পারিত, কত মাতা বাঁচিয়া আছে আর তাহার প্রাণাধিক সন্তান ভগ্নস্তূপের মধ্যে তিলে তিলে মরিয়াছে, এখন যেরূপ কায চলিতেছে তখনই যদি এইরূপ কায হইত! পণ্ডিত জহরলাল বলিয়াছেন, দুর্ঘটনার চারদিন পরে সরকারী কায আরম্ভ হইয়াছিল, প্রথমতঃ যাতায়াতের পথই ঠিক হয় নাই। আক্রান্ত স্থানের সংবাদ লওয়ার জন্য এক্সপ্রেস টেলিগ্রামও তিনচার দিনের পূর্ব্বে পাঠান যায় নাই। সহরেরই এই অবস্থা আর পল্লীগ্রামের কথা তো ধর্ত্তব্যই নহে। অবশ্য কয়েক দিনের মধ্যেই কায আরম্ভ হইয়াছে এবং বেহার সরকার, সরকারী কর্ম্মচারীগণ বে সরকারী সেবাসঙ্ঘসমূহ, হিন্দু-মহাসভা ও স্বয়ং রাজেন্দ্র প্রসাদ নিজ পরিচালিত লোকদের লইয়া প্রাণপণ করিয়া আর্ত্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

ভূমিকম্পে ভূমির অবস্থা

সকলের আগে লোকের নজর পড়ে সহরের উপর, সহরের বড় বড় বাড়ীগুলি প্রায় সবই পড়িয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত। বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানের ৭টি চিনির কলের বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া উত্তর বেহারের কৃষিক্ষেত্রগুলির ও কম দুর্দ্দশা হয় নাই। বিহার সরকারের ইস্তাহারে প্রকাশ, ভূমিকম্পের দরুণ ভাগলপুরের উত্তর দিককার ভূমির আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া কোথাও উচ্চ কোথাও বা নিম্ন হইয়া গিয়াছে। রেলওয়ে লাইন পুল ও রাস্তাগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে লোকের অবস্থা কেমন হইবে এই সব ভূমি চাষের উপযুক্ত থাকিবে কিনা কিছুই বলা যায় না।

কৃষি ও শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া জানাইয়াছেন যে হাজিপুর হইতে মজঃফর পুরের মধ্যকার অর্দ্ধেক কৃষি ক্ষেত্রের উপর এক হইতে চারি ইঞ্চি পুরু ভূগর্ভোত্থিত বালুকার স্তর পড়িয়াছে এই ভূভাগের এক তৃতীয়াংশ জমিতে সংস্কার না করিয়া কৃষিকার্য্য করা সম্ভবপর হইবে না। ভূকম্পনের সময় সীতামারী মতিহারী অঞ্চলে ভূমি ফাটিয়া এতো জল উঠিয়াছিল যে বন্যায় ন্যায় দেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, আবার কোথাও বালুকা উঠিয়া দেশ মরুভূমির মত হইয়াছে। স্থানে স্থানে মাটি ফাটিয়া ধুম ও নির্গত হইয়াছিল, কূপ পুষ্করিণী প্রভৃতি নিম্নস্থান বালুকাতে পূর্ণ হইয়া পানীয় দুর্লভ হইয়াছে।

এই দুর্ঘটনার পরে যাহারা গৃহহীন হইয়াছে তাহারা কোনওরূপে বস্ত্রাবাস নির্ম্মাণ করিয়া আছে, আর যাহাদের গৃহ আছে, তাহারাও ভয়ে গৃহে বাস করিতে পারিতেছেনা, সকলেই ওদেশের এই প্রচণ্ড শীতে মাঠে কোনরূপে বস্ত্রাবাসে দিন কাটাইতেছে। তাহার উপর বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা, ভূমিকম্পের ২।৩ দিন পরেই বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া এই শীতার্ত্ত গৃহহীনগণকে যে কিরূপ পীড়িত করিয়া ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভারত সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া আর্ত্তের বন্ধু প্রফুল্লচন্দ্র রায় পর্য্যন্ত সকলেই সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছেন, চারিদিক হইতে সকলেই সাধ্যানুরূপ সাহায্য পাঠাইতেছে, বিদেশ হইতেও সাহায্য আসিতেছে সব দেশ হইতেই সেবকসঙ্ঘ গিয়াছে, যাহারা জীবিত আছে তাহাদের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা সকলে মিলিয়াই করিতেছেন। বাংলা দেশেও অর্থও সামর্থ্য দ্বারা তাহার যথাসাধ্য করিতেছে।

শুনিয়াছি ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরেই সেই রাত্রেই মুঙ্গেরের অন্যান্য স্থান হইতে বাঙ্গালীযুবকগণ বড়বাজারের আর্ত্তগণের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছিল।

ভূকম্পনের লীলা এখনও নিঃশেষ হয় নাই। আক্রান্ত প্রদেশে এখনও প্রায়ই মধ্যে মধ্যে কম্পন অনুভূত হইতেছে। লোকে যে কিরূপ ভয় ও উদ্বেগে দিন যাপন করিতেছে তাহা অবর্ণনীয়।

দানে সাম্প্রদায়িকতা

বিদেশ হইতে যে সমস্ত দান আসিয়াছে তাহার মধ্যে বৃটেনের রেডক্রিসেণ্ট সোসাইটি দুর্গতদের সাহায্যার্থে ১৫০ পাউণ্ড দান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের দানের একটি সর্ত্ত এই যে এই টাকা মুশলমান দুর্গতদের জন্য দান করিতে হইবে। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! লোকে যখন এমন দুর্দ্দশায় পড়ে, তখন কি কেহ কে কোন্ সম্প্রদায় তাহাই মনে রাখিতে পারে? যে ক্ষুধার্ত্ত তাহার মুখে আহার, যে গৃহহীন তাহাকে গৃহ, কেহ জাতি শুনিয়া দেয় না।

ঢাকা ইডেন কলেজে শিক্ষয়িত্রীনিয়োগে আপত্তি

আমরা কিছুদিন হইল ঢাকা ইডেন কলেজ সম্বন্ধে নানরূপ অভিযোগ শুনিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি দেখিতে পাইলাম ইতিহাসের অধ্যাপিকা শ্রীযুক্ত বীণাঘোষ গত দোসরা জানুয়ারী তারিখে কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার পদত্যাগ করার কারণ জানা যায় নাই। আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে সুযোগ্য শিক্ষয়িত্রী কর্ম্মপ্রার্থী থাকা সত্বেও একজন অবিবাহিত যুবককে অস্থায়ী ভাবে এই কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহা স্কুল কমিটির জ্ঞাতসারে হইয়াছে কিনা আমরা জানি না। শ্রীযুক্তা করুণাকণা গুপ্তা এম্ এ যিনি এই পদের একজন প্রার্থী ছিলেন, তিনি এই ইডেন স্কুল ও কলেজ হইতেই পাশ করিয়াছেন এবং ম্যাট্রিক হইতে আরম্ভ করিয়া এম্ এ পর্য্যন্ত ফাষ্টক্লাস ফাষ্ট। আমরা বলি, প্রথানকথা সাধারণতঃ মেয়েদের শিক্ষানিকেতনে স্ত্রীলোক শিক্ষয়িত্রী পাইতে পুরুষ রাখা উচিত নহে; দ্বিতীয়তঃ মেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্র এতোই সঙ্কীর্ণ তাহার উপর যদি মেয়েদের কলেজেও মেয়েরা কায না পায় তাহা হইলে প্রতিবৎসরই যে মেয়েরা পাশ করিয়া বাহির হইতেছে ইহারা কি করিবে?

ভারতীয় তুলা ও ল্যাঙ্কাসায়ার

আমাদের দেশের কৃষিজীবিদের মত দুর্দ্দশাপন্ন মানব বোধহয় পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই, ইহারা গ্রীষ্মের কাটফাটা রৌদ্রে, বর্ষার অবিরল ধারা বর্ষণে শীতে আবরণ হীন দেহে নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম করিয়া সমগ্র দেশের খাদ্য উৎপাদন করে। কিন্তু পরিবর্ত্তে তাহারা উদরের অন্ন, আচ্ছাদনের বস্ত্র, আশ্রয়ের গৃহ, অবসরের আনন্দ কিছুই ভোগকরিতে পারে না; পুত্র পিতৃঋণ স্বীকার করিয়া জীবন যাত্রা সুরুকরে, আর কৃচ্ছতার ভিতর দিয়া জীবন অবসান করে। এমন অসহায় যে তাহাদের এ দুরবস্থা কেন, আর কিসে ইহার প্রতীকার হইবে কিছুই জানেনা ও বোঝেনা আমাদের দেশের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যখন প্রয়োজন, তখনই ইহাদের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ হইয়া ওঠেন ও ইহাদের দুঃখের কাহিনী গাহিয়া আপন আপন স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লন— যেমন একদল ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ধনী বস্ত্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের তুলা লাঙ্কাসায়ারে কলওয়ালাদের নিকট, তাহাদের প্রস্তুত মোটাকাপড় কিনিবার চুক্তিতে বিক্রয় করিবার জন্য কথা তুলিয়াছেন। দেখাইতেছেন যে তাহা হইলে আমাদের দেশের তুলা উৎপাদনকারীরা লাভবান হইবে।

ভারতবর্ষের একদিন ছিল যখন ভারত কাঁচা মাল রপ্তানী না করিয়াও আপন আপন অন্নবস্ত্র যোগাইয়াও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শিল্প জাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া ধন আহরণ করিয়াছে। যেদিন হইতে কাঁচা মাল রপ্তানী করিয়া বিদেশ হইতে বিলাস দ্রব্য হইতে আরম্ভ করিয়া নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনা সুরু হইয়াছে সেইদিন হইতেই বেকার সমস্যার উদ্ভব—বর্ত্তমান কালে যখন সব দেশ আপন আপন বেকার সমস্যার সমাধানে মাথা খাটাইতেছেন, তখন আমাদের দেশের বুদ্ধিমানগণ কাঁচামাল কাটাইবার আরও ব্যবস্থা করিতেছেন। আমরা কি চিরদিনই কাঁচা মালই যোগাইয়া যাইব? বর্ত্তমানে তো আমাদের দেশে কলের সংখ্যা নিতান্ত স্বল্প নহে, ভারতোৎপন্ন ছোটআঁশের তুলাদ্বারা ভারতবর্ষেই মোটাবস্ত্র উৎপাদন করিয়া যাহাতে লোকে অল্প মূল্যে কাপড় কিনিতে পারে, দেশীয় কলে প্রস্তুত অল্পমূল্যের মোটা সুতা কিনিয়া দেশের সাধারণ তাঁতি জোলারা প্রয়োজনীয় জিনিষ তাঁতে বুনিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই কি উচিত নহে?

আজ ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল যাহাতে দেশে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য দেশেই উৎপন্ন করিতে পারে তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা হইতেছে। আর আজ প্রায় ১৫ বৎসর হইতে চলিল, মহাত্মা গান্ধী নিজ হাতে

বোনা বস্ত্র তাহাও সম্পূর্ণ নহে অর্দ্ধাচ্ছাদিত ভাবে পরিধান করিয়া দেশে যাহাতে লোকে নিজেদের আচ্ছাদনের জন্য পরমুখাপেক্ষী না হয় তজ্জন্য প্রাণপণ করিতেছেন, দেশের প্রধান প্রধান লোক খদ্দরকে পরিধেয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, আর আমরা তুলা বিক্রয়ের অজুহাতে পুনরায় ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র ভারতের বাজারে আমদানীর পথ খুলিবার চেষ্টা করিতেছে।

অন্য যায়গার কথা জানিনা, ঢাকার বাবুর হাটের তাঁতীরা অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত যে ভাবে বস্ত্র উৎপন্ন করিতেছে ও অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতেছে তাহাতে স্থানীয় কলওয়ালা গণের ভীতি উৎপন্ন করিয়াছে। ইহারা সাধারণ হাট হইতে সুতা কেনে, দেশী কি জাপানী কিছুই জানে না, যদি ইহাদের সুতা সরবরাহ করার জন্য সুপরিচালিত ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইতে ভারতে অনেক বাবুর হাটেরই উদ্ভব হইতে পারে ও বিদেশে তুলা রপ্তানী করার প্রয়োজন থাকে না।

বাংলায় মহাত্মা গান্ধীর আগমন

মহাত্মা গান্ধীজীর বাংলায় আগমন লইয়া কিছুদিন হইতেই আলোচনা চলিতেছে। মহাত্মাজী হরিজন সমস্যাকে যেভাবে দেখিয়া থাকেন, বাংলাদেশে সে জাতীয় অস্পৃশ্যতা দেখিনা বলিয়াই মনে করি। হিন্দুমুসলমান সমস্যাকে যেমন করিয়া রাজনৈতিক বুদ্ধি দ্বারা জন্মদান করা হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে তাহাকে যে ভাবে পরিপুষ্ট করা হইয়াছে অনেকে মনে করেন এই অস্পৃশ্যতা আন্দোলনের ফলে বাংলায়ও হিন্দু সমাজে ঐরূপ আরেকটি জিনিষের উদভব হইবে যাহার ফলে হিন্দুদের মধ্যেও ভেদনীতি প্রবল আকার ধারণ করিবে। বাংলায় নিজগৃহে বসিয়া কেহ কাহার হস্তপৃষ্ঠ অন্নগ্রহণ করুক বা না করুক, সাধারণ কোনও প্রতিষ্ঠান হইতে কাহাকে দূরে রাখা হয় নাই। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের ব্যবহারের যতই কেন নিন্দা প্রচার না হউক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুলকলেজ প্রভৃতি যাহার অধিকাংশই উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের জন্য সমাজ প্রবেশাধিকার দিয়াছে, ছোট জাতি বলিয়া স্কুলে পড়িতে দেওয়া হয় নাই এমন কথা আমরা শুনি নাই, বাংলায় অভিজাত ও গোঁড়াহিন্দু ঘরের ছেলেরাও তাহাদের বাড়ীর মুসলমান পেয়াদার ছেলে অথবা স্বগ্রামের মুচির ছেলের সহিত এক স্কুলে এক বেঞ্চে বসিয়া বাল্যশিক্ষা লাভ করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। আবার ঐরূপ স্কুল হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অতি নিম্নবর্ণের কৃতিপুত্র শিক্ষক ইহার অধ্যাপনা করিতেছেন এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। বাংলা সম্বন্ধে এমন কথা কেহই বলিতে পারেনা যে উচ্চবর্ণীয় হিন্দু কাহাকেও তাহার অগ্রগতিতে বাধা দিয়াছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের অর্থে স্থাপিত ও পরিচালিত শিক্ষালয়ে অবাধে মুশলমানরা শিক্ষালাভ করিয়া গিয়াছে, কোন হিন্দু তাহাকে মুসলমান বলিয়া অবজ্ঞা করে নাই, সে ক্ষেত্রে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সম্বন্ধে কোন প্রশ্নতো উঠিতেই পারে না।
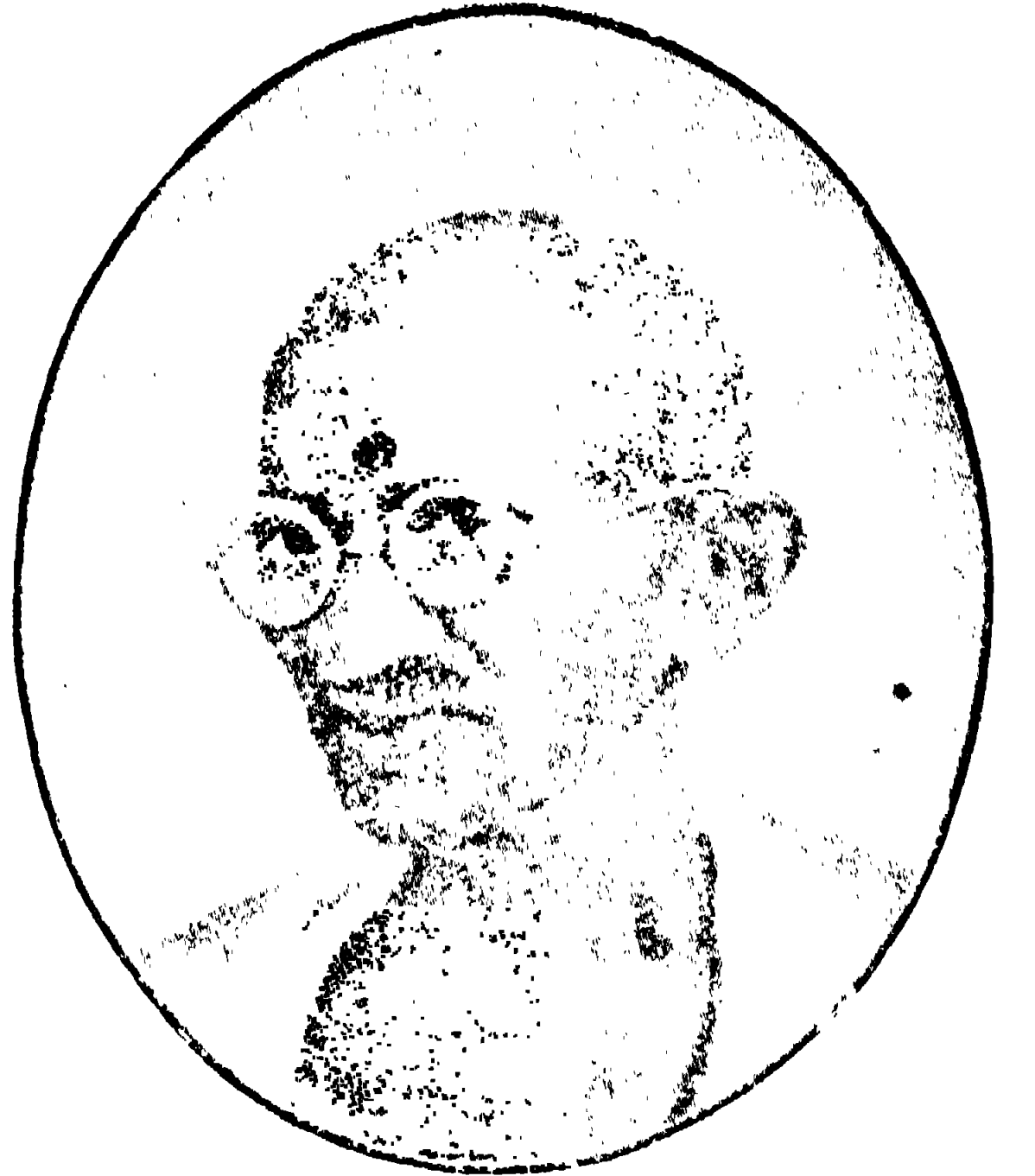
মহাত্মা গান্ধী

আমাদের দেশে যাঁহারা জলাশয় খনন করেন সে জলাশয় পিতা মাতা বা স্থানীয় কাহারও নামে উৎসর্গ করিবার প্রথা আছে, উৎসর্গ না হওয়া পর্য্যন্ত জলাশয়ের জলে কোন দেবকার্য্য হয়না অর্থাৎ জলশুদ্ধ হয়না। উৎসর্গ করার মানেই দশের নামে দান করা, উচ্চবর্ণের অর্থে খণিত তাহাদের পিতামাতার নামে উৎসর্গীকৃত অথচ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব শ্রেণীর সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার অধিকার। সেদিন দেখিলাম, মধ্যপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট ইস্তাহার জারী করিয়াছেন যে সরকারী অথবা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে হরিজনদের প্রবেশাধিকার দিতে হইবে। বাংলায় বোধ হয় ইংরেজ রাজত্ব সূচনা হইতে আজ পর্য্যন্ত এরূপ ইস্তাহার জারী করিতে হয় নাই। বাংলায় এ প্রশ্ন কোনদিন কাহারও মনে আসে নাই।

বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় বাঙ্গালী সহিষ্ণুতার শেষসীমায় আসিয়া পঁহুছিয়াছে। গান্ধীজী হরিজন সেবায় সমগ্র মনপ্রাণ নিয়োজিত করায় ভারত তথা বাংলা যে আদর্শ লইয়া এতোদিন চলিতেছিল, সে আদর্শ কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে তাই গান্ধীজীর বাংলায় আগমন সংবাদে কিছু বিরুদ্ধ মতবাদের উদ্‌ভব হইয়াছে। বর্ত্তমান ভূমিকম্প ব্যাপারে তাঁহার কতকগুলি উক্তি কতক কতক লোকের মনে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহার জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও প্রতিবাদ প্রকাশ করিতে হইয়াছে। তবে গান্ধিজীর ব্যক্তিগত মতামত ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে যতই মতদ্বৈধ থাকুক না কেন বাংলা তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা করিবে; এবং রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া বাংলার জন সাধারণের নিকট যে আবেদন জানাইয়াছেন তাহা নিষ্ফল হইবে না। বাংলা তাঁহাকে উপযুক্ত সংবর্দ্ধনা করিয়া নিজে গৌরবান্বিত হইবে।

সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র

সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র গত ৯ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার অপরাহ্নে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নিজে ধনী এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং নিজেও হাইকোর্টে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহার জীবী ছিলেন, এই সময় তিনি রাওলাট কমিটির মেম্বর নিযুক্ত হন। তৎপরে দ্বৈত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে তিনি এবং সার সুরেন্দ্রনাথ বাংলায় প্রথম মন্ত্রীত্বপদ গ্রহণ করেন, এবং ১৯২৮ সনে শাসন পরিষদের মেম্বর নিযুক্ত হন। মৃত্যুকালে তিনি শাসন পরিষদে ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি বাংলার উদারনৈতিক দলাবশিষ্ট গণের মুখপাত্র ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু যেমন অভাবনীয় তেমনি আকস্মিক। সেদিন বেলা একটা পর্য্যন্ত সেক্রেটেরিয়টে আপন কর্ম্ম করিয়া বাড়ীতে আসেন ও কাউন্সিলের মিটিংয়ে উপস্থিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে-ছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হন ও সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণবিয়োগ ঘটে। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় দুই গোলটেবিল বৈঠকেই সভ্য মনোনীত হইয়া যোগদান করেন, তৃতীয় বৈঠকে আর যোগদান করেন নাই। গোলটেবিল বৈঠকে তিনি প্রধান মন্ত্রীর অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। যদিও তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই তথাপি তাঁহার এই চেষ্টা দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে উদারনৈতিক দলই যে শুধু একজন নেতা হারাইল, তাহা নহে দেশবাসীও শোকসন্তপ্ত হইয়াছে।

রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার

রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার আর ইহ-জগতে নাই, তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের সংবাদপত্রগণের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৭ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের হিন্দুপত্রিকার সহকারী সম্পাদক হইয়া সংবাদপত্রের সেবা আরম্ভ করেন। এবং আজীবনই সংবাদপত্রের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নয় বৎসর হিন্দু পত্রিকার সহকারীরূপে কায করিয়া ও পদত্যাগ করিয়া খ্যাতনামা তামিল দৈনিক পত্রিকা

স্বদেশ মিত্রম্ সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন, এবং পুনরায় ১৯২৮ খৃঃ হিন্দুপত্রিকার সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ইহার সম্পাদকের কায করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্বে হিন্দুপত্রিকার যশঃ এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে অনেকের মত লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকার সহিত তাঁহার পরিচালিত হিন্দুপত্রিকা সমকক্ষতা লাভ করিবার উপযুক্ত।

তিনি এক সময়ে একজন নামজাদা কংগ্রেসকর্ম্মী ছিলেন এবং তিন বৎসর কংগ্রেসের সেক্রেটারী, ভারতীয় আইনসভার সদস্য ও স্বরাজ্য দলের সম্পাদকতা করিয়াছেন। তৎকালে আইনসভায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মদন মোহন মালব্য প্রভৃতি খ্যাতনামা রাজনীতিজ্ঞ গণও ছিলেন তাঁহারা রঙ্গ স্বামী আয়েঙ্গারের মতামতকে বিশেষ মূল্যবান বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু সংবাদপত্র পরিচালকগণই নহে, রাজনৈতিক দলও একজন বিশেষ কর্ম্মী হারাইল। তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত রাজনৈতিক ব্যাপারে মতানৈক্য থাকিলেও তাঁহার বিশেষ ভক্ত ছিলেন। দেশের এই দুর্দ্দিনে তাঁহার মত লোকের অভাব সহজে পূরণ হইবার নহে।

বাংলায় বিপ্লব দমন আইনের নব কলেবর

গত ৩১ শে জানুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিপ্লব দমন সম্পর্কে আরও কঠোর একখানি আইনের খসড়া পেশ হইয়া সিলেক্ট কমিটির উপর আলোচনার জন্য ন্যস্ত হইয়াছে। অচিরেই এই আইন পাশ হইবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। টেরোরিষ্ট দমন গভর্ণ্মেণ্টের যেমন একটি প্রধান কর্ত্তব্য, শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য দেশের পক্ষেও তেমনি প্রয়োজনীয় এবং সকলেরই তাহা আকাঙ্ক্ষণীয়। কিন্তু এই আইনের ধারাগুলি এমন ভাবে প্রনয়ন করা হইয়াছে, যাহাতে সাধারণের মনে ভীতির সঞ্চার হওয়া অনিবার্য্য। বিচার এবং শাসন বিভাগের পার্থক্য যেটুকু আমাদের দেশে ছিল, তাহা আইনের পর আইনের কঠোরতায় এক রকম লোপ পাইয়াছেই বলিতে হয়। বর্ত্তমান শাসক দিগের হস্তে আরও অপরিমিত ক্ষমতা ন্যস্ত হইতেছে, সেই ক্ষমতার অপব্যবহার হইলে, তাহা নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন উপায় থাকিবে না। প্রস্তাবিত আইনে একটি ধারা এই যে যাহার নিকট আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যাইবে তাহারই প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারিবে, তাহা ব্যবহার করুক বা না করুক। অবশ্য বিধান আছে যে দেখিতে হইবে যে যাহার কাছে এই অস্ত্র পাওয়া যাইবে, তাহার হত্যা করিবার কিম্বা হত্যায় সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য ছিল কিনা, অথবা হত্যার উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহৃত হইবে ইহা জানা ছিল। বিচার সাধারণ আইন আদালতে হইবে না—শ্রীযুক্ত ফজলল হক বলিয়াছেন যে তিন জন কমিশনার বিচারের জন্য নিযুক্ত হইবেন তাহার মধ্যে থাকিবেন একজন সিভিল সার্ব্বিসের লোক, একজন সাবজজ ও একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি মনে করেন যে তাঁহারা এই গুরুতর বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিবার উপযুক্ত নহেন। তাঁহাদের সামান্য ভুল ভ্রান্তিতে একজন লোকের ফাঁসী হইতে পারে। এই বিলে যে জনসাধারণের প্রতি অবিশ্বাসের ভাবই প্রকাশ পায় তাহা নহে, গভর্ণ্মেণ্টের নিজেদের বিচার আদালতের উপরও অনাস্থা প্রকাশ পাইতেছে।

প্রেস সম্বন্ধে যে আরও কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবে তাহাতে সংবাদ পত্র চালান প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হইবে। ক্রমে যেসকল আইন হইয়াছে, তাহাতেই সংবাদপত্র সেবীগণ অতি মাত্রায় শৃঙ্খলিত, এই বিলে নিয়ম হইতেছে কোন নিষিদ্ধ পুস্তক যদি কাহারও নিকট পাওয়া যায়, তাহার তিনবৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হইবে তাহার কোন বিপ্লবাত্মক উদ্দেশ্য থাকুক আর নাই থাকুক। আর একটা কথা যদি কোন সংবাদ পত্র পৃথিবীর যে কোন স্থানের কোনরূপ 'রেভোলিউসনারী মুভমেণ্ট' সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রচার করে তাহা হইলে সেই সংবাদপত্রের কর্ত্তৃপক্ষ প্রেস আইনে দণ্ডনীয় হইবেন। এমন কি রাজবন্দী আত্মীয় স্বজনদের খবর না পাইয়া ব্যস্ততা প্রকাশ অথবা তাহাদের কোন অভাব অভিযোগ লইয়া আন্দোলনও এই আইনে দণ্ডার্হ।

বিলটি যখন কাউন্সিলে উপস্থিত করা হয় তখন আইন সভায় কতক কতক লোক বলিয়া ছিলেন যে আইনের কঠোরতা বৃদ্ধি করিতে করিতে যতদূর বাড়াইতে হয় বাড়ান হইয়াছে কিন্তু কিছুতেই এই ধরণের ঘটনার নিবৃত্তি হইতেছে না—কাযে কাযেই অন্য কি উপায় অবলম্বন করা যায় তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার সময় আসিয়াছে।

Printed & Published by Bibhabati Sen, 23 Wyer Street, Wari, from Wari Printing Works, Dacca.

অন্ধ বাউল

শ্রীমন্দাকিনী চাটার্জি

[শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন সেনের সৌজন্যে]

তৃতীয় বর্ষ	চৈত্র, ১৩৪০	দ্বাদশ সংখ্যা

বাংলার শিশুরা হাসে না?

শ্রীকমলা মুখার্জ্জি।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "তোরা ভাব্‌ছিস্ আমরা শিক্ষিত? ছ্যা! ছ্যা! এর নাম আবার শিক্ষা! তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? কেরাণীগিরি না হয় একটা উকিল হওয়া, না হয় বড় জোর, কেরাণীগিরিই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরি চাক্‌রী—এই ত? এতে তোদেরই বা কি হল আর দেশেরই বা কি হল? একবার চোখ খুলে দেখ্ স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকার উঠেছে! পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়্‌তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর।"

স্বামী বিবেকানন্দ যে সময়ে একথা বলেছিলেন, সে সময়ে অন্নের জন্য হাহাকার থাক্‌লেও বাঙ্গালীর বর্ত্তমান হাহাকারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক কম ছিল। 'স্বর্ণ-প্রসূ ভারত ভূমিতে "আজ শুধু অন্নের হাহাকারই নয়, তার মধ্যে নানা রোগের বীজ বাঙ্গালীর এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে ক্ষীণ হতে আরো ক্ষীণতর করে তুলেছে। তাই কলিকাতা সহরে যেখানে ধূলো ও ধোঁয়া একসঙ্গে সারা দিন রাত খেলা করে, যেখানে আলো ও হাওয়া বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে কোনমতে প্রবেশ কর্‌তে পারে না, সেখানে প্রতি মিনিটে একটী করে শিশু যক্ষ্মারোগে প্রাণ হারায়। বাঙ্গালী সহরে বাস করার মায়ায় ও প্রলোভনে পড়ে আজ—

পশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে মাটী খোঁড়া দূরে থাক, সেকালে অতি সাধারণ নিয়মে লাঙ্গল দিয়ে যে মাটি খুঁড়তে শিখেছিল, তাও আজ অনেকে ভুলে গেছে! তাই কলিকাতার অন্ধকার গলির সেৎসেঁতে বাড়ীর অন্ধকারটুকুই আজ বাঙ্গালীকে আকর্ষণ কর্‌ছে বেশী। বড় বড় সহরের আকর্ষণে পড়ে বাঙ্গালী অন্নের সংস্থান কর্‌তে পার্‌ছে না, স্বাস্থ্যও অটুট রাখ্‌তে পারছে না, তাই ঘরে ঘরে তীব্র হাহাকারে পরিপূর্ণ; এবং এই হাহাকারের তীব্র জ্বালা আজ বাঙ্গালীকে সকল দিক দিয়া ছোট করে ফেলেছে, তাই বাঙ্গালীর সকল শক্তি আজ পঙ্গুপ্রায়। এই সব অভাব অনাটন দেখেও বাঙ্গালী সহরের মোহ ছেড়ে পল্লীতে বাস করতে কেন যে ছুটে যায় না এইটা আশ্চর্য্যের বিষয়। পল্লীর শান্ত, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ভাবুক বাঙ্গালীকে আকর্ষণ করাইতো স্বাভাবিক! সেখানে আর কিছু না হোক্ অন্ততঃ দুটী অন্নের সংস্থান করা সম্ভব ও রোদ ও হাওয়ায় শারীরিক উন্নতিও খুবই স্বাভাবিক! তবু কেন করে না?

একাধিক আমেরিকানের মুখে শুনেছি, "পৃথিবী ভ্রমণে বেড়িয়েছিলাম, সকল দেশের শিশুদের খেলার মাঠে খেল্‌তে দেখেছি, কিন্তু তোমাদের দেশে তা বড় দেখ্‌লাম না। তোমাদের শিশুরা হাস্‌তে পর্য্যন্ত জানে না। কলিকাতার রাস্তায় সে সব ছেলেদের দেখ্‌লাম, তাদের দেখেই আমার এ বদ্ধমুল ধারণা।" বলে কি? সত্যই কি তাই? সত্যই কি বাংলার শিশুরা হাস্‌তে জানে না? হবেও বা। বাংলার ঘরে শিশু জন্মায় অসীম দারিদ্র্যতার মধ্যে অনন্ত ক্ষুধা নিয়ে, তাই বোধ হয় আজ তাদের খেলার মাঠে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না; তারা হাস্‌তে জানে না; তাই খেল্‌তেও জানে না; পেটের জ্বালা নিয়েই তারা কাঁদে। বাঙ্গালীর ঘর দুয়ার, বাজার, মাঠ, রুগ্ন, শীর্ণ, ক্ষুধিত শিশুতে পরিপূর্ণ। স্বল্পায়ু নিয়ে এ পৃথিবীতে জন্মেছে; এদের না আছে থাক্‌বার জায়গা, না আছে ঘরে খাবার, না আছে শিক্ষার ব্যবস্থা না আছে খেলার জন্য "তেপান্তরের মাঠ। "বাংলার" শিশুরা শিশুকালের মাধূর্য্যটুকু কি তা জানে না—তাই তাদের পৃথিবীর অন্যান্য জাতের শিশুদের মত হাসি খেলায় বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। অথচ শিশুর জীবনগঠন ও বর্দ্ধনের জন্য ইহা যে কত বড় দরকার তা বোধ হয় কেহ অস্বীকার কর্‌বেন না।

বাংলার প্রায় প্রতিঘরে আজ ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা ইত্যাদি ছাড়া আর বড় কিছু নাই। তাই মাছির মতই বাঙ্গালী অকাতরে প্রাণ দেয়। অথচ এই অনাবশ্যক মৃত্যুর হাত থেকে চেস্টা কর্‌লে অনায়াসে আমরা অনেকটা নিস্তার পেতে পারি তবু করি না। স্বীকার করি যে সমস্যাটী বড় এবং মীমাংসাটী তার চেয়ে কিছু ছোট নয়, তবু মনে হয় আত্ম-পর ভুলে সকলের সাহায্যে সহানুভূতিতে ও উৎসাহে অচিরেই অনেক পরিবর্ত্তন করা যায় এবং সেটা খুব বেশী কষ্টকর ব্যাপার নয়। বাংলার ঘরে আজ যখন অন্নের হাহাকার, ক্ষুধিত শিশুর করুণ আর্ত্তনাদে যখন ধরণীর বুক কেঁপে উঠে, তখন বাঙ্গালীকে আজ সহরের মোহ ছেড়ে লাঙ্গল ধর্‌তে

শিক্ষা করতে হবে, অন্নের সংস্থান করতে হবে, সন্তান সংখ্যা কমাতে হবে, পল্লীশ্রী বাড়াতে হবে, নইলে বাঙ্গালী কোন সাহসে কিসের অধিকারে সমান আসন সকল সভ্য জাতের সঙ্গে দাবী করবে ?

স্বাধীন দেশের জমকালো জিনিষের সঙ্গে পরাধীন, পরামুখাপেক্ষী, বাংলা ও বাঙ্গালীর অবস্থার তুলনা করতে আমার কোনদিনই রুচি হয়না, কেন না তফাৎ বড় বেশী। কিন্তু এখানে একটু আমেরিকার শিশুদের খেলার ঘর বা মাঠের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। খাওয়া শোওয়া, লেখাপড়া যেমন শিশুদের শারীরিক মানসিক বর্দ্ধন ও গঠনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় প্রতিশিশু, বালক, বালিকাদের স্বাস্থ্যসম্পন্ন করবার জন্য প্রতিদিন কয়েকঘণ্টা খেলাধূলো করাটাও আমেরিকার বাপ মায়েরা অতি আবশ্যক মনে করেন। তাই আমেরিকায় এমন ছোট গ্রামটী পর্য্যন্ত নাই, যেখানে সুন্দর পার্ক ও ছেলে মেয়েদের খেলার মাঠ দেখতে পাওয়া যায় না। প্রতি স্কুলের সঙ্গে বালক বালিকাদের খেলবার জায়গা আছে এবং সেখানে একজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর নজরে খেলারত বালক বালিকারা অনায়াসে, বিনা গোলযোগে খেলতে পারে। এই সব ছোট্ট স্কুলের "মাঠে" ছেলে মেয়েদের খেলার কতরকম সরঞ্জাম রয়েছে দেখলে অবাক্ হতে হয়। আমেরিকায় যে শুধু শিশুরাই খেলে তা নয়—তাদের বাবা, মায়েরা, দিদিমা, ঠাকুমারা ও স্বাস্থ্য অটুট রাখবার জন্য দিনের কিছুটা কাল বাইরের খোলা হাওয়া ও রোদে খেলতে ও বেড়াতে যান। আমেরিকার ছোট বড় সব জায়গাতেই এ সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। এদের দেখে মনে হয় এরা সবই জানে, সব রকম ভোগই করতে পারে। এদের স্বাস্থ্য, সচ্ছন্দতা এদের ভোগ বিলাসের জন্যই যেন এ পৃথিবীটা অমূল্য সম্পদ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল, তাই সব জিনিষের অধিকার ও দাবী যেন এদেরই আছে আমরা শুধু দুয়ারে দাঁড়িয়ে, "শূন্যমনা কাঙ্গালিনী" হয়েই এদের দিকে তাকিয়ে আছি।

বাংলার শিশুদের মুখে আজ হাসি ফোটান দরকার। আবার স্বামী বিবেকানন্দের কথাতেই বলছি, "আগে ভিতরের শক্তি জাগ্রত করে দেশের লোককে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করা, উত্তম অশন বসন উত্তম ভোগ আগে করতে শিখুক, তারপর সর্ব্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কি করে মুক্ত হতে পারবে বলে দে।" আজ আমাদের তাই বড় দরকার হয়ে পড়েছে। অনাহারক্লিষ্ট জরা ব্যাধিগ্রস্ত কোটি কোটি ভারত-সন্তানকে শৌর্য্যে বীর্য্যে উপযুক্ত মানুষ হতে হলে সত্যি সত্যিই উত্তম অশন, বসন, উত্তম ভোগ চাই। কেউ যেন মনে না করেন আমি কেবল বাংলার কথা লিখে প্রাদেশিকতা দেখাচ্ছি, তা নয়। তবে বাংলার সঙ্গে যার আজন্মের পরিচয় তার বাংলার স্মৃতিই আগে জেগে উঠে, এবং সেইটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক বোধ হয়।

আজ যারা মাতৃকোলে শিশু, তাদের সর্ব্বপ্রকারে সুস্থ ও শক্তিমান পুরুষ করে তুলতে হলে, তাদের চাই যথেষ্ট পরিমাণে স্বাস্থ্যকর খাদ্য, খেলার মাঠ ও শিক্ষালয়। বাঙ্গালী প্রাণে ভাব, মস্তিষ্কে বুদ্ধি, জীবনে আদর্শ নিয়েও কি শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে পারবেনা ? জাতীয় গঠন ও বর্দ্ধন করতে হলে ধর্ম্ম, বর্ণ নির্ব্বিশেষে শক্তিমান পুরুষ ও নারী তৈরী করা দরকার বাঙ্গালী কি আজ তা ভুলে গেছে ?

গ্রাম্যগীতি

শ্রীবেলা দেবী

বিদাশেতে দেইখ্যা আইলাম কাজল মেঘের চুল !
বাতাসে তা' উইড়া খেলে নাচে দোদুল দুল !
ডাগর ডাগর কালো চোখে চাইয়া থাকে সে,
পাইয়া মোরে একা ওগো (মন) ভুলাইল বিদেশে,
ফারাক বইস্যা ভাবি এখন কেন্ সে গাঙের কূল !
সাধ হয় তার বুকের মা ঝে বইস্যা কেবল থাকি
কার কথায় সে ভাইব্যা মরে আমায় দিল ফাঁকি,
নীলশাড়ী তার হইতাম যদি উইড়া রে বাতাসে
কইতাম সবায় কার তরে সে চোখের জলে ভাসে,
চোখের তারা হইতাম যদি গো (ঠাওর পাইতাম) ক্যামন
মনের ভুল ।

তর্পণ

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

দিদি একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন, "ওমা, তুই ও কি অলক্ষুণে কথা বলছিস্‌রে নগু, হাঁড়ি ইছেমতীতে ফেল্‌তে হবে কেন ? হাঁরে, কারও কিছু হল নাকি, অশৌচ নিতে হল ?

মুখ বিকৃত করিয়া নগেন্দ্রনাথ বলিল, "হাঁ, অশৌচই বটে। চিরকালের মত জাত গেল—ধর্ম্ম গেল, এখন প্রাচিত্তির কর—বামন খাওয়াও, তবে যদি জাতজন্ম ফিরে পাও।"

দিদি অর্থ বুঝিতে না পারিয়া নির্ব্বাক, শুধু তাকাইয়া রহিলেন।

ধীরে সুস্থে ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া পত্রখানা তুলিয়া লইয়া শুভ্রতা ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। নগেন্দ্রনাথ উন্মত্তের মত অস্থিরভাবে কতক্ষণ বারাণ্ডায় ছুটাছুটি করিয়া যে ঘরে শুভ্রতা ছিল সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

জানালার উপর বাহু রাখিয়া তাহারই উপর মাথা পাতিয়া অত্যন্ত ক্লান্তভাবে শুভ্রতা বসিয়াছিল, তাহার মুখখানা অত্যন্ত নিষ্প্রভ দেখাইতেছিল। আঘাতটা যে আসিবেই তাহা সে জানিত, তথাপি সে আঘাত যে এত শীঘ্র এমন ভাবে আসিয়া পড়িবে তাহা সে জানিতে পারে নাই।

আজ সে ভালো করিয়া নিজের কথা ভাবিতেছিল।

তাহার এক মাকে সে দেখিয়াছে. সে মা গৃহস্থঘরের বধূ ছিলেন না ? কিন্তু তিনি তো তাঁহার মা ছিলেন—তাহার স্বর্গাদপি গরিয়সী মা—

নগেন্দ্রনাথকে দেখিয়াই সে নিজেকে সামলাইয়া সোজা হইয়া বসিল।

তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধ আক্রোশে ফুলিতে ফুলিতে নগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, 'এর মানে কি তা আমি এখনও বুঝ্‌তে পারছিনে। তুমি ছেলেমানুষ নও. সব কথাই জানো তোমার মা কে ছিল, কি রকম অবস্থায় তোমার জন্ম, জেনে শুনে এমন করে আমাদের ধর্ম্ম জাতি নষ্ট করবার প্রবৃত্তি তোমার কেন হল ?"

কি একটা শক্ত কথা শুভ্রতার মুখে আসিয়া ছিল, সে তাহা চাপিয়া ফেলিয়া জানালাপথে বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল।

নগেন্দ্রনাথ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, "যার যা জাত ব্যবসা সে তা কোনকালেই ছাড়্‌তে পারে না। আজ এতদিন তোমায় বিয়ে করেছি, তোমায় কাছে পাইনি, সেটা যে কেবল তোমার ঘৃণা তা আমি জানি। তোমার পথ তো খোলাই ছিল শুভ্রা, এই গরীবের ঘরে গৃহস্থ বধূ সাজ্‌বার ছলনাটুকু না কর্‌লেই পারতে।"

দৃপ্তনেত্র তাহার মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া দৃপ্তকণ্ঠে শুভ্রতা বলিল, "আমার মায়ের কথা আমি জানি, তোমরা কেউ জানো না। কে বল্‌লে, আমার মা কলঙ্কিনী ছিলেন। কে এ কথা বলে—"

তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

ক্রূর হাসি হাসিয়া নগেন্দ্রনাথ বলিল, "তাই বটে। অভিশাপ দেবে তো দাও ; সতী মায়ের সতী মেয়ের অভিশাপ, ওর মূল্য আছে জানি। যাই হোক্, ওসব কথা যাক্, আমার কথা শোন, এসব ব্যাপার নিয়ে আমি আর কেলেঙ্কারী করতে চাই নে, তুমি তোমার অরুণদার কাছে ফিরে যাও। আমি তোমায় চাইনে. তোমার মুখদর্শন করাও মহাপাপ।"

আর্দ্রকণ্ঠে শুভ্রতা বলিল, "হ্যাঁ, আমিও তাই চাই। এতদিন যখন অপেক্ষা করেছ, আর তিনটী দিন অপেক্ষা কর এর মধ্যে আমি উপায় করে নিয়ে চলে যাচ্ছি।"

সেই দিনই সে দেবব্রতকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইল ; সে বড় বিপদগ্রস্তা, দেবব্রত যেন পত্রপাঠ চলিয়া আসে। আর একটুও দেরী হইলে শুভ্রতার সহিত তাহার আর দেখা হইবে না।

দিদি সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া প্রায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন।

অনেকক্ষণ একেবারে স্তম্ভিতভাবে বসিয়া থাকিয়া তাহার পরে চৈতন্য পাইয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, "আশ্চার্য্য ব্যাপার বটে। শুনেছি নাকি কাশী আর কলকাতায় অনেক লোক এমনি করে ভদ্দর লোকের জাত মারে। ওমা, গল্পে যা শুনেছি, আমাদের কপালে তাই হল সত্যি? আমি বিধবা মানুষ, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছি, তিনসন্ধ্যে আহ্নিক না করে জল খাইনে, আমারই জাতজন্ম সব খেলে গা? কখনও এ পর্য্যন্ত কারও জলটুকু নেই নি, তোর বউ বলে ওই বেশ্যের মেয়ের হাতের ভাত পর্য্যন্ত আমায় খাওয়ালি নগু? এ পাপ যে আমার হাজার বার গঙ্গাস্নানেও কাটবে না রে, একশোবার প্রাচিত্তির করলেও না।"

শুভ্রতা সবই শুনিতেছিল, সে যেন বাড়ীতেই নাই। কৃষ্ণের জীব বাড়ীতে অনাহারে থাকিবে বলিয়া দিদি দুইবেলা দুই থালা ভাত দরজার কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া যান মাত্র, তাহার সহিত একটা কথা বলেন না, একবার তাহার মুখদর্শন করেন না।

নগেন্দ্রনাথ তাহার আগের দিন কলিকাতা গিয়াছে, সম্ভব শুভ্রতার সম্বন্ধে সত্য প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্যই।

* * * * *

প্রথম দর্শনেই দেবব্রত ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি শুভ্রতা, কি বিপদ তোমার, তোমার যে বিয়ে হয়েছে আমি তাই জানি নে, নেমতন্নের পত্র তো দাও নি, কাজেই দেশে ফিরে এ কথা শুনে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। সে যাক্ গিয়ে, আমার আশ্চর্য্য হওয়া না হওয়ায় তোমার কিছু আসবে যাবে না, আমি শুধু জান্‌তে চাই, তোমার কি বিপদ?

শুভ্রতা মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে যখন মুখ তুলিল তখন তাহার চোখ দুইটী অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "আমি এখান হতে চলে যেতে চাই দেবব্রতবাবু, আপনার বাড়ীতে আমার এতটুকু জায়গা হবে না কি?"

"এখান হতে চলে যেতে চাও—মানে?

দেবব্রত বড় বড় দুইটী চোখ বিস্ফারিত করিয়া শুভ্রতার পানে তাকাইল।

মলিন হাসির এতটুকু রেখা ঠোঁটের উপর ফুটাইয়া তুলিয়া শুভ্রতা বলিল, "মানে অনেক অথচ সে মানে আমি বল্‌তে পারব না। কারণ আমি নিজেই জানিনে,—জানেন অরুণদা, আপনি আমায় মাসখানেক জায়গা দিন. আমি তার পরে অরুণদার কাছে চলে যাব।"

দেবব্রত খানিক নিস্তব্ধভাবে তাহার শুষ্ক মুখের পানে তাকাইয়া রহিল; একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ঠিক এই জন্যেই মামা তোমার বিয়ে দিতে চায় নি; কিন্তু শুনলুম, তুমি স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছ, সেই জন্যই তোমার কাজে বাধা দেওয়ার কোন দরকার

হয় নি। আমি কিন্তু এখানে আসার পথে ঠিক এই কথাটাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে এসেছি শুভ্রতা, আমি ঠিকই জেনেছিলুম তোমার সাংসারিক জীবনের শেষ হয়ে গেছে, তাই তুমি আমায় ডেকেছ !"

আর্দ্রকণ্ঠে শুভ্রতা বলিল, "দেখ্‌ছি আপনিও সব জানেন অথচ আমায় কেউ ঘুণাক্ষরেও এ কথাটা জানান নি। দেবব্রতবাবু, আপনি জানেন কি। দেবব্রতবাবু, আপনি জানেন, আমার মা জমিদার "নরেন্দ্রনারায়ণের—"

মায়ের কলঙ্কের কথা উচ্চারণ করিতে সন্তানের জিহ্বা এড়াইয়া আসে।

দেবব্রত অন্যদিকে চাহিয়া ধীরকণ্ঠে বলিল, "সব সত্য শুভ্রতা, আমি অরুণ মামার মুখে সব শুনেছি।"

শুভ্রতার মুখখানা সাদা কাগজের মত হইয়া গেল, সে যখন হাত সরাইয়া মুখ তুলিল, তখন তাহার মুখে প্রশান্তভাব ফিরিয়া আসিয়াছে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "তা হলে আপনার বাড়ীতে ও তো আমার জায়গা নেই, আমার মত পতিতার মেয়েকে আপনিও তো জায়গা দিতে পার্‌বেন না।"

দেবব্রত হাসিল, বলিল, কে পতিতা আর কে স্বর্গের দেবী তা জান্‌বার দরকার আমার নেই শুভ্রতা। তুমি জানোইতো সংসারে আমি একা বাড়ীতে থাকি, কয়েকটা চাকর ছাড়া আর কেউ বাড়ীতে নেই সেই জন্যই তোমায় সেখানে রাখ্‌তে পারব না।

খানিক ভাবিয়া সে বলিল, "কিন্তু আমার এক কাকিমা আছেন ; তার কাছে তোমায় রাখ্‌তে পারি। কিন্তু তুমি—তুমি যদি রাজি হও, তাই ভাব্‌ছি।

শুভ্রতা ব্যগ্র হইয়া বলিল, "আমি খুব থাক্‌তে পারব, যেখানেই হোক,—একটা আশ্রয় পেলেই আমি বেঁচে যাই।"

দেবব্রত বলিল, "তিনি নরেন্দ্রনারায়ণের বিধবা স্ত্রী, নরেন্দ্রনারায়ণ আমার নিকট সম্পর্কীয় কাকা ছিলেন।"

শুভ্রতা মলিন হাসিল।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, "হাস্‌লে যে ?"

শুভ্রতা বলিল, "তিনি এই পতিতার মেয়েকে নিজের কাছে স্থান দেবেন কি ? বিশেষ আমার মা তাঁরই স্বামীর—"

দেবব্রত বলিল, "সে আমি বুঝ্‌ব শুভ্রতা, তুমি তাঁকে চেনো না তাই একথা বলছ, কিন্তু আমি তাঁকে চিনি বলেই তাঁর সম্বন্ধে এমন একটা কুৎসিত ধারণা কর্‌তে পারিনে, আমি তাঁকে তোমার সত্য পরিচয় দেব, যদি সে সব কথা শুনে তিনি তোমায় আশ্রয় না দেন, আমি অরুণ মামাকে তখনি টেলিগ্রাফ করে দেব, তিনি যেমন করেই হোক তোমায় নিজের

কাছে নিয়ে যাবেন! জগতের সকলেই তোমায় ত্যাগ করলেও তিনি যে ত্যাগ করবেন না এটা তো তুমি জানো শুভ্রতা।"

অরুণদার নাম করিতে শুভ্রতার চক্ষু দুইটী সজল হইয়া উঠিল।

শুভ্রতা সেই রাত্রেই দেবব্রতের সহিত রওনা হইল, পরণের কাপড় ছাড়া তাহার কাছে আর কিছুই রহিল না।

বিধবা দিদি গালে হাত দিয়া বসিয়া ব্যাপার দেখিতেছিলেন, একবার মুখ ফুটিয়া বলিলেন, "তা বাপু যাবেই তো,—নগেন বাড়ী আসুক, তাকে একবার না হয় বলেই যাও।"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেবব্রত বলিল, "আমাদের বলে যাওয়ার দরকার নাই, আপনিই তাঁকে জানিয়ে দেবেন শুভ্রতার একবন্ধু এসেছিল, তার সঙ্গেই সে চলে গেছে।"

মুখ ফিরাইয়া সে বলিল, "এসো শুভ্রা আমাদের এই ট্রেণ ধর্‌তেই হবে, ভোরের ট্রেণ ধরা চল্‌বে না। আর দেরী কর্‌লে এ ট্রেণ পাব না, একটু পা চালিয়ে চলে এসো।"

২৬

জানালার পাশে বসিয়া অপরাজিতা অন্যমনস্কভাবে বাহিরের পানে তাকাইয়াছিল।

আকাশ আজ সকাল হইতেই মেঘাচ্ছন্ন মাঝে মাঝে কালো মেঘের বুক হইতে ঝর ঝর করিয়া বৃষ্টি ধারা নামিয়া আসিতেছিল।

কাল সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর যে তাণ্ডব নৃত্য হইয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্ন আজও প্রকৃতির বুকে জাগিয়া রহিয়াছে। কাল বৈকালে সাম্‌নে কৃষ্ণচূড়া গাছটী লালফুলে সাজিয়া কি সুন্দর দেখাইয়াছিল, আজ তাহা মাটীতে পড়িয়া আছে।

ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে মাঝে মাঝে সূর্য্যের দেখা মিলিতেছে; চকিতে চমক দিয়া উঠিয়া চক্ষু ধরিয়া দিয়া তখনই সে লুকাইতেছে। অদূরে নদীর জলে মেঘের কালো ছায়া পড়িয়া জল দেখাইতেছে, আরও ঘন কালো সূর্য্যের ক্ষণিক আলো তাহার বুকেও চমক দিয়া যাইতেছে।

পিছনে দরজার উপর একটা শব্দ শুনিয়া অপরাজিতা মুখ ফিরাইল।

দাসী দাঁড়াইয়াছিল, তাহার পাশে কে একটী মেয়ে দাঁড়াইয়াছিল, স্পষ্ট দেখা গেল না।

অপরাজিতা জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাকে কিছু বল্‌তে চাও বিন্দুর মা?'

দাসী উত্তর দিল, 'হ্যাঁ দিদিমণি আপনার কে এক আত্মীয় ভদ্রলোক এই মেয়েটীকে সঙ্গে করে এসেছেন, তিনি এখনই আস্‌ছেন বলে গেলেন।'

'আমার আত্মীয়—?'

তবে কি অরুণ? কিন্তু সে তো রেঙ্গুণে রহিয়াছে, তবে তাহার আসিতেই বা কতক্ষণ?

দাসী সরিয়া যাইতেই সাম্‌নে পড়িল শুভ্রতা।

অনেক দিন আগে একদিন এই মেয়েটীকেই অপরাজিতা গঙ্গার ঘাটে অরুণের পাশে

দেখিয়াছিল। সে সময়টা মুহূর্ত্তের জন্য হইলেও সে এমন স্পষ্টভাবে, শুভ্রতাকে চিনিয়া রাখিয়াছে; যত কালই গত হোক, শুভ্রতাকে সে আর ভুলিবে না।

শুভ্রতাও বিস্ফারিত নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কবে কোথায় যে দেখিয়াছে তাহা আজ তাহার মনে পড়িতেছে না :

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কতটা আপন মনেই অপরাজিতা বলিল, 'বুঝেছি—'

অরুণই যে রেঙ্গুণ হইতে আনিয়াছে এবং শুভ্রতাকে তাহার কাছে পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছে, তাহাতে তাহার অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এই অরুণের সর্ব্বতোভাবে পরাজয়, অরুণ শুভ্রতাকে অবশেষে তাহারই হাতে সমর্পণ করিতে আনিয়াছে।

অপরাজিতার মুখখানা দৃপ্ত হইয়া উঠিল। খানিক চুপ করিয়া সে শুভ্রতার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, 'অরুণদা তোমায় এনেছেন ?'

শুভ্রতা মাথা নাড়িল, না, তিনি আসেন নি, আপনারই আত্মীয়ের সঙ্গে আমি এসেছি।'

আত্মীয়টী যে কে তাহাই অপরাজিতা বুঝিতে পারে না।

বলিল, পাশের ঘরে যাও, আমি পরে তোমায় ডাক্‌ছি।'

দাসী শুভ্রতাকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

অপরাজিতা নিস্তব্ধে সামনের তৈলচিত্রখানার পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার দুইটী চোখে তখন আগুণ জ্বলিতেছিল।

'আমায় ডাক্‌ছো কাকি মা—'

অপরাজিতা ফিরিল,

'এ কি, দেবব্রত যে তুমি এখানে কবে এলে ? শুনেছিলুম তুমি নাকি এলাহাবাদে প্র্যাক্‌টিস করছ ?

সুদর্শন ছেলেটী তাহাকে প্রণাম করিয়া একখানা চেয়ার দখল করিয়া বসিল, বলিল, 'তবু ভালো কাকিমা, চিন্‌তে পার্‌লে। আমি ভেবেছিলুম, চিনতে পারবে না, সেই জন্যেই সাহস করে হঠাৎ ঢুক্‌তে পারিনি। বাঃ, উঠে দাঁড়ালে কেন, বসো, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে যে।'

অপরাজিতা বসিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'কি এমন কথা আছে বল দেখি ?'

কোন ভূমিকা না করিয়াই দেবব্রত বলিল, 'যে মেয়েটী আমার সঙ্গে এসেছে, তাকে নাকি তুমি খুব ভালো চেন কাকিমা ?'

অপরাজিতা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল, 'না ওকে আমি চিনি নে।'

যেন আকাশ হইতে পড়িয়া দেবব্রত বলিল, 'সে কি রেঙ্গুন হতে অরুণ মামা যে পত্র দিয়েছেন তুমি একে বেশ চেন।'

অপরাজিতার বুকের রক্ত গরম হইয়া উঠিল, কি একটা কথা উত্তেজিতভাবে বলিতে গিয়া সে নিজেকে সামলাইয়া লইল, বলিল, 'হয় তো চিনি, তাতে কি হয়েছে? চিনি বলেই ওকে আমার কাছে আনার কোন দরকার দেখি নে।'

দেবব্রত বলিল, 'আমি অবশ্য কোন কথা জানিনে, কাজেই এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বল্‌তে পারছিনে; তবে কেবল অরুণমামার জন্যেই আমার ওকে নিয়ে আসা। তিনি আজ কদিন হল রেঙ্গুন হতে আমায় এক পত্র দিয়েছেন, তাতে অনেক কথাই লিখেছেন, নইলে কোন কথাই জান্‌তে পারতুম না। আচ্ছা কাকিমা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রাগ করো না বাপু,—যে রাগী মেয়ে তুমি তাইতেই ভয় হয়। তোমার রাগ তো বিশেষ অজানা নেই আমার,—বিয়ের পর যখন এলে বাপ্‌রে, যেন কেউটে সাপ। তখন আমার সঙ্গেই না ছিল তোমার বেশী বন্ধুত্ব, ছোবলটাও পড়্‌তো বেশী করে আমার ওপর। যাক, বল দেখি একটা কথা বিয়ের আগে তুমি জান্‌তে পারোনি কাকাবাবুর চরিত্র এ রকম, তাঁর একটী মেয়ে পর্য্যন্ত আছে?"

অপরাজিতা স্থির দৃষ্টি তাহার মুখের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি যে তখন এখানেই থাক্‌তে দেবব্রত, তুমি কিছু জান্‌তে?'

দেবব্রত মাথা নাড়িল।

অপরাজিতা একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'আমি ও জান্‌তে পারি নি।'

দেবব্রত একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমি ও তাই ভাবি। লোকে অনেক কথাই বলে, কিন্তু আমি বলি কাকাবাবুর স্বভাব চরিত্র এবং একটী মেয়ে আছে জেনে ও সামান্য বিষয় সম্পত্তির লোভে তুমি কখনই তাঁকে বিয়ে কর নি, কিছু না জেনেই বিয়ে করেছিলে।'

উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া অপরাজিতা বলিল, 'এ কথা কে বলে দেবব্রত?'

দেবব্রত উত্তর দিল, 'মানুষের মুখ, বন্ধ করে তো রাখ্‌তে পারা যায় না কাকি মা, ওরা তো এমনি ছিদ্র খুঁজেই বেড়ায়। যারা বড় তাদের দিকে সহজেই চোখ পড়ে বলে মানুষ তার সম্বন্ধেই বেশী খোঁজ করে। বল্‌ছে বলুক না, আমায় তো বলে না, বলে তোমায়—কাজেই মনে কর তুমি কতখানি বড়, কত লোকে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে' অপরাজিতা মুখ বিকৃত করিল।

দেবব্রত বলিল, 'একটা কথা ওর হয়ে বল্‌তে এসেছি কাকিমা। বেচারা মেয়েটার একে মা বাপ কেউ নেই, তার ওপরে মা বাপের অপরাধে শুনলুম ওকে তুমি অপরাধিনী করেছ—।'

বিরক্ত হইয়া উঠিয়া অপরাজিতা বলিল, 'ওর সঙ্গে তোমায় দেখেই আমি বুঝেছি, তুমি ওর হয়ে বেশ দু'দশটা কথা বল্‌বে। অরুণদার তবু এটুকু দুর্ব্বলতা ছিল, নিজেই সে ওর হয়ে কথা বলতে এসেছিল, ওকে নিয়ে কোন দিন আমার কাছে আসবার সাহস করে নি; কিন্তু তুমি নাকি একেবারে বেপরোয়া—পরম সাহসী, তাই ওই জারজা মেয়েটাকে সঙ্গে করে একেবারে এসে

উঠেছে। আমি কোন দিনই ভুলব না দেবব্রত ওর মা ছিল একটী অতি সাধারণ মেয়ে; যার মর্য্যাদার দাম এক কাণা কড়ি ও নয়।'

শান্ত কণ্ঠে দেবব্রত বলিল, 'মেনে নিচ্ছি তাই হল, কিন্তু মেয়েটীর তাতে কি বল দেখি? বরাবর ও সম্বন্ধে কিছু শোন নি, এড়িয়ে গেছ, আজ না শোনা ছাড়া কিন্তু উপায় নেই কাকি মা। অরুণ মামাকে তাড়াতে পেরেছ, আমায় পারবে না এ কথাটা তোমায় আগে হ'তে আমি শুনিয়ে রাখ্‌ছি।

হতাশ ভাবে চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া অপরাজিতা বলিল, জানি তোমার কাছে নিস্তার নেই। বল দেখি কি বল্‌তে চাও।'

দেবব্রত একটু হাসিয়া বলিল, 'তুমি নরমের কাছে বাঘ তা আমি জানি। হ্যাঁ, এই মেয়েটীর কথা বলছিলুম,—এর বিয়ে হয়ে গেছে দেখেছ?'

অপরাজিতা যেন চমকাইয়া উঠিল—'বিয়ে?'

দেবব্রত বলিল, 'হ্যাঁ, এর বিয়ে হয়ে গেছে, সে একটা বড় দুঃখময় কাহিনী, বল্‌লে হয়তো তোমারও একটু কষ্ট হবে।'

অপরাজিতা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না, টেবলের উপর হইতে একখানা বই টানিয়া লইয়া নীরবে তাহার পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল।

২৭

দেবব্রত খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'অবশ্য অরুণ মামা কোন কথাই জানে না। সে যখন রেঙ্গুণে যায় তখন তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে শুভ্রতাকে রেখে যায়, তারাই জোর করে ওর বিয়ে দিয়েছে।'

অপরাজিতা চুপ করিয়া থাকিতে পারিলনা, দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, 'জোর করে বিয়ে দিলে আর সে চুপ করে রইল? ছোট মেয়ে নয় যে যা করাবে তাই করবে, ওর নিজের মত নেই, নিজেকে নিজে রক্ষা করার ক্ষমতা নেই—?'

দেবব্রত বলিল,—'যো নেই, কেননা ও একেবারেই নিঃসহায়া। বিয়ের আগে সে পালিয়ে যেতে পারত, কিন্তু কোথায় যাবে কে ওকে আশ্রয় দেবে? যেখানেই যাবে ওর জন্মকলঙ্ক সঙ্গে সঙ্গে চলবে,—ও যে দাগী হয়ে গেছে কাকি মা, মায়ের পাপ যে ওকেই ছেয়ে রেখেছে।'

অপরাজিতা বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল।

দেবব্রত আবার বলিল, 'হয়েছে ও ঠিক তাই। অরুণমামাকে মুক্তি দেওয়ার জন্যেই শুভ্রতা বিয়েটা করে ফেলেছিল,—ওর মত মেয়ে একটা জানোয়ারের গলায় বরমাল্য দিয়েছিল, অত কষ্ট করে ও দিন চালাচ্ছিল। কিন্তু অদৃষ্টই নিতান্ত খারাপ কিনা, তাই কি জানি কেমন করে ওর কলঙ্ক কথা সেখানে গিয়েও পৌঁচেছে।'

মুখ তুলিয়া অপরাজিতা জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর—?"

শান্তস্বরে সে কথা বলিলেও তাহার কণ্ঠস্বরে প্রচুর ব্যগ্রতা ফুটিয়া উঠিতেছিল, অতি চতুর দেবব্রত তাহা সহজেই ধরিয়াছিল।

নিতান্ত নিরীহভাবে সে বলিল, "তারপর আর কি? খাঁটি হিন্দুর ঘর তুমি দেখেছ কাকি মা, যেখানে তোমার আমার মত লোক গেলে সকলে সতর্ক হয় পাছে ছোওয়া পড়ে, তারপর বাড়ীর বার হতে না হতে গোবরজল ছড়ায়? বুঝ্‌তেই পারছ সেই রকম ঘরে শুভ্রতা বউ হয়ে গিয়েছিল আর এই কথাটা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কি রকম নির্য্যাতন সইতে হল?"

অপরাজিতা হাতের বইখানা সরাইয়া রাখিয়া বলিল, "কি রকম শুনি?"

দেবব্রত বলিল, সেটা যদি সময় হয় ওকে জিজ্ঞাসা করেই উত্তর পাবে। ব্যাপার গুরুতর দেখেই ওকে আমি ওখান হতে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি তোমার কাছে, হয়তো তোমার কাছে হতে এ দয়াটুকু চাইবার অধিকার ওর আছে।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অপরাজিতা বলিল, "অধিকার আমার কাছে?"

মুহূর্ত্ত মাত্র নীরব থাকিয়া সে বলিল, "এ কথা যদি ভেবে থাক দেবব্রত, জেনো ভুল করেছ। অরুণ দা অনেক দিনই ওদের জন্যে অনেক কথাই বল্‌তে এসেছিল, আমি কোন কথা শুনি নি। কেন শুনি নি জানো? ওর মা যে পাপ করেছিল তার শাস্তি ওকেই বইতে হবে সেই জন্যে। ওদের দয়া করা মহাপাপ, আমি ওদের দেখ্‌তে পর্য্যন্ত চাইনে।"

দেবব্রত হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "বেশ বেশ, আজকাল কাকিমার পুণ্যকাজের দিকে ঝোঁক পড়েছে দেখে সত্যি ভারি খুসি হয়েছি। পাপে ঘৃণা আর পুণ্যে আসক্তিই নাকি মানুষকে ধর্ম্মের পথে নিয়ে যায় আর, ওই থেকেই নাকি দেবতা ব্রাহ্মণে বিশ্বাস আসে। কবে দেখ্‌তে পাব, কাকিমা, প্রকাণ্ড বড় প্রতিমা গড়িয়ে পূজো করছে আর বামন খাইয়ে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছে।"

অপরাজিতা তাহার পানে তাকাইয়া রহিল, নিজের কথায় সে নিজেই ধরা পড়িয়া গিয়াছে, সংশোধন করিবার কোনও উপায় নাই।

দেবব্রত কণ্ঠস্বর বড় কোমল করিয়া বলিল, "কিন্তু যাক্‌ ও সব কথা কাকি মা,—যদি পাপ পুণ্য জ্ঞানটাই আজ তোমার মনে জেগে থাকে, তবে ওকে দয়া করাই উচিত কারণ ওর মত দুঃস্থা আর কেউ নেই। আজকে ও এখানে এসেছে একথা তোমার গ্রামের সবাই জেনেছে, আজ যদি ওকে আশ্রয় না দাও—"

বাধা দিয়া অপরাজিতা বলিল, "তুমি বল্‌ছো কি দেবব্রত আমার প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে ওই জারজা মেয়েকে আমার কাছে আমি রাখ্‌ব?"

দেবব্রত বলিল, "জারজা কিন্তু সে কি মানুষ নয়, মানুষ হিসাবে সে কি তোমার এ দয়াটুকু পেতে পারে না কাকিমা? জারজা,—কিন্তু তোমার স্বামীরই সন্তান সে তার মা তোমার স্বামীর

স্ত্রীরূপেই পরিচিতা ছিল,—রক্ষিতা বলে কেউ জান্‌ত না,—কাকাবাবু নিজেও সে কথা কোনদিন কারও কাছে প্রকাশ করেন নি। তবু বলি হোক সে জারজা তবু সে মানুষ তোমার মধ্যে যে সত্যসুন্দর বিরাজ করেছেন তার মধ্যে ও তিনি রয়েছেন। মানুষকে সকলের ওপরে স্থান দিয়ো কাকিমা, মানুষকে কোনওদিন হেলা করো না। আরও এক কথা—শুভ্রতা তোমার কাছে বেশীদিন থাকবেনা আমি অরুণ মামাকে জানালেই তিনি এসে ওকে নিয়ে যাবেন। আমি ওকে নিয়ে যেতে পারতুম, কিন্তু ওখানে কোনও মেয়ে নেই ওকে একা রাখ্‌তে পারব না বলেই নিয়ে যেতে পারলুম না। একটা মাস ওকে রাখ, একমাস পরেই ওকে যেখানেই হোক্‌ নিয়ে যাওয়া হবে।"

অপরাজিতা অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতে লাগিল, তাহার পর মুখ তুলিল, বলিল, "যদি অরুণদা না আসে তা হলে ওর কি উপায় হবে, আমি বেশীদিন ওকে আমার কাছে রাখ্‌তে পারব না, লোকের কাছে পরিচয় দিতে আমার মাথা কাটা যাবে।

দেবব্রত উত্তর দিল 'যাতে তোমার মাথা কাটা না যায় সে উপায় আমি কর্‌ব কাকি মা। যদি অরুণ মামা এর মধ্যে এসে না পৌঁছান আমিই ওকে নিয়ে যাব, যেখানেই হোক রাখ্‌ব।'

অপরাজিতা বলিল, 'বেশ, আমি রাজি।

দেবব্রত উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, আমার এ কথা সর্ব্বদাই মনে থাক্‌বে কাকিমা, আমি আজই অরুণ মামাকে লিখ্‌ছি।

সে বাহির হইল। পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়াছিল শুভ্রতা।

দেবব্রত তাহার সামনে গিয়া দাঁড়াইল বলিল, আমি এখন এলাহাবাদে যাচ্ছি, শুভ্রতা মাসখানেক তোমায় যেমন করেই হোক্‌ এখানে থাক্‌তে হবে। হয়তো অনেক কথা সইতে হবে, অনেক কষ্টও পেতে হবে, তবু সব সয়ে যেয়ো, মনে দুঃখ করো না যতক্ষণ অরুণমামা বেঁচে আছেন ততক্ষণ তোমার কোনও ভাবনা নেই শুভ্রা ততক্ষণ তুমি সব রকমে নিরাপদ। আমার ওপর নির্ভর কর্‌তে তোমার বলতে পারিনে শুভ্রতা আমি ইচ্ছা সত্বেও তোমায় এলাহাবাদে নিয়ে যেতে পারলুমনা, কেবল তোমার সম্ভ্রমের দিকে তাকিয়ে, পাছে কেউ কোন কথা বলার সুযোগ পায়।"

শুভ্রতা অধর দংশন করিল—

"কিন্তু এখানে আমি তো বেশীদিন থাক্‌তে পারব না দেবব্রত বাবু—"

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

শুভ্রতা বলিল, এতটা ঘৃণা অবজ্ঞা সয়ে আমি থাক্‌তে পারব না, এ আমার অসহ্য। আমি বাস্তবিকই পতিতা, আমার মা পতিতা, আমি এখানে টিকতে পারবনা।'

জোর করিয়া দেবব্রত বলিল, 'থাক্‌তে হবে, থাক্‌ব না বল্‌লে চল্‌বে না। আমায় পত্র দিয়ো, হঠাৎ কোন না ভেবে চিন্তে কোন কাজ করে বসো না।'

শুভ্রতা প্রস্তর প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিল, দেবব্রত চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ

নন্দনের আনে যে সংবাদ

হোস্‌নে আরা বেগম

পাশ্চাত্যের জনৈক বিখ্যাত নাট্যকার লিখেছেন ঃ—স্বপ্নরাজ্যের নীল কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশের কোলে অসংখ্য দেবশিশু ধরার বুক আলো কর্‌বার জন্য আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা কর্‌ছে। তারা প্রতীক্ষা কর্‌ছে, কবে দেবলোক ছেড়ে ধরণীর মানুষের ঘরে এসে জরা-মৃত্যু-শোক-পীড়িত দুনিয়ায় অমরার আনন্দ-কোলাহল জাগাবে।

যখন সময় আসে—অমরার বৃদ্ধ দ্বারী স্বর্গরাজ্যের সুবৃহৎ ফটক খুলে দেয়, আর অমনি স্বর্গের দূত সারস তার প্রকাণ্ড ঠোঁটে করে ধরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে দেবশিশু পূর্ণ ছোট্ট একটী পুঁটলি নিয়া, মানুষের কুটীরের পানে।

সদ্য স্বর্গ-পরিত্যক্ত দেবশিশু জানে না নীলাকাশের হেম-কুয়াসার মায়া-বিজড়িত স্বপ্নরাজ্য ছেড়ে চলেছে সে কোন অজানা-লোকের অচেনা মানুষের ঘরে।

কবি-কল্পিত স্বপ্নলোকের এই দেব-শিশুরাই আমাদেরই বাস্তব পৃথিবীর অনাগত মানব-সন্তান। এই সব মানব-শিশু যখন মায়ালোক ছেড়ে ধরার বুকে আসে নেমে, তখন তার অভ্যর্থনার জন্য আমরা ধরার মানুষ—কতটুকু আয়োজন করি, আর কতটুকু আয়োজনই বা করা দরকার সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলার চেষ্টা কর্‌ব।

প্রত্যেকটী শিশুই বিলাসিতাপূর্ণ ধনীর ঘরে জন্মাতে পারে না, কিন্তু প্রত্যেকটী শিশুই স্বাস্থ্যবান্ আবহাওয়ায় ও পরিচ্ছন্ন গৃহে জন্মাবে—এ তাদের আইনতঃ ও মানবতার সঙ্গত দাবী।

স্বাস্থ্যবান্ আবহাওয়ায় ও আনন্দ মুখরিত গৃহে যদি শিশু জন্মায় তাহা হইলে সেই শিশুর আগমন যে কেবল সেই গৃহের পক্ষে আনন্দদায়ক হয় তাহা নহে—বরং তা জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গল সূচিত করে। একটী প্রাসাদের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব যেরূপ ভাল চূণ সুরকী ও সিমেণ্টএর উপর নির্ভর করে—একটী জাতির মঙ্গল-ভবিষ্যৎও সেরূপ স্বাস্থ্যবান শিশুদের উপর নির্ভর করে। শিশুরাই ভবিষ্যৎ জাতির প্রাণ।

কোন প্রাসাদের ভিত্তি যদি সুপ্রতিষ্ঠিত না হয় তা হলে তার উপর গৃহনির্ম্মাণ যেরূপ বাতুলতা—সেইরূপ দুর্ব্বল, রুগ্ন শিশুদের নিয়ে ভবিষ্যতের সুসভ্য শক্তিশালী জাতি গঠনের স্বপ্ন দেখাও বাতুলতা মাত্র।

ভারতে—বিশেষ ক'রে বাঙ্গলায় হাজার হাজার শিশু অনাবশ্যকভাবে মরে। সহস্র সহস্র শিশু জীবনের অগ্রপথে চল্‌তে গিয়ে পিছিয়ে পড়ে; তাদের রোগজীর্ণ দুর্ব্বল পদ-যুগল তাদের যাত্রা পথের বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। সহস্র অপূর্ণ মানব-শিশু জন্মের পর হতেই জগতের সৌন্দর্য্য

উপভোগ হতে বঞ্চিত হয়—অকালে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে। সহস্র শিশু তাদের মায়ের কোলে শুয়েও ঘুম-পাড়ানি গান শুন্‌তে পায় না—অকালে শ্রবণ-শক্তি হারিয়ে।

এখন দেখি যে সব নরনারী জীবনের যাত্রাপথের একেবারে পশ্চাৎভাগে পড়ে রয়েছে—জগতের সকলপ্রকার সুখ-শান্তি যাদের কাছ থেকে নিয়েছে চির-বিদায়;—তাদের এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? এ প্রশ্ন মনে স্বভাবতই জাগে। একটু গবেষণায় জানা যাবে যে এই হতভাগ্যরা শৈশবের ন্যায্য দাবী হতে বঞ্চিত হয়েছিল, এবং সেই জন্যই তাদের এ দুর্দ্দশা।

ভবিষ্যতের সন্তানের জনক ও জননী হবেন যাঁরা, তাঁরা একটু কাণ পেতে শুন্‌লে,—মেটারলিঙ্কের ভাষায় বলি,—শুন্‌তে পাবেন যে, স্বপ্নরাজ্যের দেবশিশুরা তাদের অনাগত দিনের জনকজননীর কাছে স্বাস্থ্যকর গৃহের দাবী জানাচ্ছে।

সুখের বিষয় জাতি এ ডাকে সাড়া দিতে আরম্ভ করেছে। স্কুল সমূহ জাতির ভবিষৎ মায়েদের সত্যিকার মা হিসেবে গড়ে তুল্‌বার জন্য ব্যবস্থার উদ্যোগ কর্‌ছে;—হাসপাতাল সমূহ প্রসবাগার খুলেছে; শহরগুলি শিশু ও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী খুল্‌তে ব্যস্ত। সংবাদপত্রও সাময়িক পত্র সমূহ শিশু-মঙ্গল বিষয়ে পত্র ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে।

এ সব কিন্তু আরম্ভ মাত্র। জাতির মঙ্গল-ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এখনও ভালভাবে ক্ষেত্র তৈরী হয়নি। শিশুরাই জাতির প্রকৃত ও নিরাপদ ভিত্তি। প্রতি ঘরে স্বাস্থ্যবান্ আবহাওয়ার মধ্যে নিটোল স্বাস্থ্যসম্পন্ন শিশু হোয়ে জন্মানোর অধিকার প্রতি শিশুরই আছে। তবে জনক-জননীর সাহায্যের প্রয়োজন এতে খুব বেশী।

সত্যকার জাতিগঠন ততদিন সম্ভবপর হবেনা, যতদিন না, প্রত্যেক মা, প্রত্যেক পিতা ও প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের গৃহকে স্বপ্নলোকের দেব-শিশুদের আগমনের উপযোগী করে না তোলেন।

শিশুর খাদ্য

শিশুর খাদ্য-সমস্যা আধুনিক মায়েদের পক্ষে এক বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একথ অবশ্য সর্ব্ববাদীসম্মত যে, স্তন্যদুগ্ধ শিশুদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য। জগতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ এই মত প্রকাশ করছেন যে, এমন কোন খাদ্যের সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি, যা মাতৃদুগ্ধের সমকক্ষতা লাভ কর্‌তে পারে। আজকাল সাধারণতঃ যে সব artificial food শিশুদের খাওয়ানো হয় তা শিশুদের স্বাস্থ্যোপযোগী ত নয়ই বরং অপকারী। এমন অনেক দেখা গিয়াছে যে artificial food খাইয়ে শিশুর স্বাস্থ্য, আপাততঃ ভাল হচ্ছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য রাখ্‌লে দেখা যাবে যে অদূর ভবিষ্যতে তাদের শরীর এমন অবস্থায় এসে পড়েছে যাকে স্বাস্থ্যবান্ একেবারেই বলা যায় না।

Statistics নিয়ে দেখা গিয়েছে যে স্তন্যপায়ী শিশুদের মধ্যে মৃত্যুহার সব চেয়ে কম। স্তন্যপায়ী শিশুরা নির্দ্দোষ অমৃত পান করে, পক্ষান্তরে নকল দুগ্ধ পান করার সময় শিশুরা অনেক

সময় রোগ-বীজাণুরূপ বিষ ও পান করে থাকে। স্তন্যপায়ী শিশুরা রোগাক্রমণ হ'তে রক্ষা পাওয়ার যে সাধারণ ক্ষমতা পেয়ে থাকে অন্য শিশুরা তা'হতে সদা-বঞ্চিত।

যে সব শিশুরা সাধারণতঃ দুর্ব্বল স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মে তাদের জন্য স্তন্য দুগ্ধ খুবই দরকার এ না হ'লে ঐ ধরণের শিশুদের বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম। যদি শিশুর মায়ের স্তনে দুগ্ধ না থাকে তবে অন্য কোন দুগ্ধবতী নারীর স্তন্যদুগ্ধ তাকে পান করাতে হবে।

স্তন্যদুগ্ধ পান করানো শিশুর মায়ের পক্ষেও খুব সোজা কাজ। কোন পরিশ্রম নেই—কোন উৎকণ্ঠা নেই। বার বার feeding bottle পরিষ্কার করার ঝঞ্ঝাটও নেই। খাদ্য তৈরী করার সাবধানতার ও কোন দরকার হয় না। অথচ নির্ব্বিকারচিত্তে শিশুকে জগতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ খাদ্য খাওয়ানো হয়। জননীর জানা উচিত যে সন্তানের সুন্দর, মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ গঠন করতে হলে তার স্বাস্থ্য গঠন করা আগে দরকার! সুন্দর ও অটুট স্বাস্থ্য গড়তে হলে মাতৃদুগ্ধ একমাত্র প্রয়োজনীয় খাদ্য।

কয়েক শ্রেণীর মেয়ে সাধারণতঃ চোখে পড়ে যারা শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ পান করায় না বা করাতে চায় না। প্রথমতঃ, এক শ্রেণীর মেয়ে অলসতার জন্য শিশুকে স্তন্য দুগ্ধ পান করাতে অনভ্যস্ত হয়, অজ্ঞতা ও এজন্য কম দায়ী নয়। কোন কোন মেয়ের স্তনে আদৌ দুগ্ধ না থাকায় তারা সন্তানকে স্তন্যদুগ্ধ পান করাতে অক্ষম। আর এক শ্রেণীর মেয়ে দেখা যায়, যাঁরা আধুনিক সভ্যতার আওতায় আসিয়া শিশুকে স্তন্য দান করা সভ্যতা-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন। তাঁরা জানেন না যে ভগ্ন-স্বাস্থ্য শিশুর জননী হওয়াও সভ্যতা বিরুদ্ধ! এই শ্রেণীর মেয়েদের সংখ্যা অবশ্য কম। যে সকল মায়েরা নানারূপ সংক্রামক ব্যাধির জন্য সন্তানকে স্তন্য দান করিতে অক্ষম তাঁরা অবশ্য সমালোচনার বাইরে। সংক্রামক রোগগ্রস্ত মায়ের স্তন্যদুগ্ধে রোগ বীজাণু সংক্রামিত হয় না, অনেক ডাক্তার এই মত প্রকাশ করেছেন। তবে মায়েরা যদি ইচ্ছা না করেন তবে সেরূপ ক্ষেত্রে সন্তানকে স্তন্যদুগ্ধ না দেওয়াই সমীচীন।

শিশুদের চরিত্র গঠন ও শিশু মনের উন্নতি সাধন বিষয়ে পরে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

নিরুদ্দেশ

শ্রীপাপিয়া বসু

সংসারে চারটী প্রাণী। পরেশবাবু, একমাত্র কন্যা সুহিতা, সৌরীন তার ঘরজামাই, আর ছোট্ট দু'বছরের শিশু ঝাণ্টা!

পরেশবাবু প্রৌঢ়, শান্ত প্রকৃতির ভদ্রলোক। কিন্তু এ বয়সেই দেখ্‌তে বৃদ্ধের মত মনে হয়। চোখে মুখে একটা বেদনার রেখা পরিস্ফুট, কালের গতি যেন ছাপ মেরে রেখে গেছে। বহু আয়াসেও সে ভাবটা তিনি মুছে ফেল্‌তে পারেন নি। মনে হয় প্রচণ্ড রকম একটা শেলের ঝাপ্‌টা বয়ে গেছে তার জীবনের উপর দিয়ে। কিন্তু কিসের ব্যথা তা কেহই জানে না, এমন কি তার আদরিণী সুহিতাও নয়। তিনি আজ বিপত্নীক অনেকদিন, স্ত্রীকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভাল বাস্‌তেন, বিগতা পত্নীর সেই স্মৃতিই যে তাকে দিনের পর দিন এমনি ক্লিস্ট করে ফেল্‌ছে, এটাই সকলের অনুমান!

সুহিতার মাকে মনে পড়ে না। সে নাকি তখন বছর খানেকের ছিল মাত্র। এদিকে সর্ব্ববিষয়ে সে সুখী, বড় লোকের মেয়ে, উপযুক্ত স্বামীর সহধর্ম্মিণী ছোট্ট একটি সুন্দর শিশুর মা। কিন্তু নিজের মার জন্যে আজ পর্য্যন্তও মন তার ফুঁপিয়ে কাঁদে।

মায়ের অভাব যেন সে বুঝ্‌তে না পারে, তার সমস্ত আয়োজন, সর্ব্বপ্রযত্নে বাবা করেছেন চিরদিন। কিন্তু তাতে সত্যি সত্যি কি তার মায়ের তৃষ্ণা মিটেছে! মা···সে যে স্নেহের অফুরন্ত উৎস্, করুণার অনাবিল প্রস্রবণ! না, না সে তৃষ্ণা কি তার মিট্‌তে পারে! সে তৃষ্ণা যে চির তৃষ্ণার্ত্ত সাহারার চেয়েও ভয়ঙ্কর!

এমনি করেই দিনের পর দিন কেটে যায়। লোকের মনের দিকে চেয়ে সময় বসে থাকে না, তার গতি উদ্দাম, অফুরন্ত! তাই তাদের সময়ও বসে রয় নি।

সংসারে এখন দু'টি খণ্ড। এক খণ্ডে ওরা স্বামী স্ত্রী, আরেকটিতে দাদা নাতি মিলে সময় কাটে! মার চেয়েও বেশী আদুরে ঝাণ্টা তার দাদুর। দাদার সাথে চলে অবুঝ শিশু আলাপ আলোচনা, নানা রকম গল্প! বোঝে না কিছু, তবু হাসে। পরেশবাবু প্রাণ দিয়ে উপভোগ করেন সেই হাসিটুকু।

সেদিন কি একটা কাজে দিন তিনেকের জন্যে পরেশবাবুকে অন্যত্র যেতে হোল। বিশেষ প্রয়োজন নইলে এবাড়ী ছেড়ে তিনি বড় একটা কোথাও যান না। আজ রবিবার, সন্ধ্যার গাড়ীতে বাবা ফির্‌বেন। কিছুই তার ভাল লাগ্‌ছে না এখন। তার উপর সেই ভোর থেকে ভিখারীগুলোর যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গেছে সে আরো বেশী! একজনের পর একজন আস্‌ছেই, যেন

পালা করে সার বেঁধে। ভিক্ষা তার নিজের দিতে হয় না সত্য, চাকরের দ্বারাই সে কাজ সম্পন্ন হয়, কিন্তু অনবরত টেও টেও শব্দে যেন দিশেহারা করে দেয়!

তখন ঠিক দু'টো কি আড়াইটার মত হবে। সৌরীন বেরিয়ে গেছে কি একটা কাজে। ঝান্টাও ঘুমিয়ে পড়েছে। সুহিতা সেলাই করছিল, ওটা হাতে নিয়েই উঠে এসে দাঁড়াল, দ্বিতলের বারান্দায়। এমনিই এসেছিল হয়ত, কিম্বা গরম লাগার দরুণও হতে পারে। কিন্তু হঠাৎ তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হোল নীচের তলে একটা ভিখারীর উপর। এদিক ওদিক নড়ে চড়ে চোরের মত কি দেখছে যেন। আরও মিনিট দুই তেমনি দাঁড়িয়ে সে দেখতে লাগল, শেষ পর্য্যন্ত ভিখারিণীটা কি করে। ওর কি রকম একটা কৌতুহল হোল। ভিখারিণীটা ধীরে ধীরে উঠল এসে একেবারে বারান্দার উপর। স্বামী বাড়ী নেই, বাধ্য হয়ে সুহিতা নিজে গিয়েই চাকরকে জাগিয়ে তুললে। বলতেই চাকরটা হৈ চৈ করে ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল, চোর হাতে হাতে কিন্তু ভিখারিণীটা যেন মুহূর্ত্তে কি রকম হয়ে গেল, ; সারা মুখ ফ্যাকাশে!

সুহিতাও এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখে ভিখারিণীটা অধিকতর কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। সুহিতা কিছুক্ষণ অপলক নয়নে তার পানে তাকিয়ে রইল। কালে যে সে একজন অসামান্যা রূপের অধিকারিণী ছিল তা স্পষ্ট ধরা পড়ে, কিন্তু দারিদ্র্যের কষাঘাতে এবং বয়সের দরুণ এবং হয়ত নানা প্রকার অত্যাচারের জন্যেও তা এখন ম্লান হয়ে গেছে। মনে হয় সে যেন একদিন ভদ্র ঘরেরই মেয়ে ছিল। তাকে দেখেই সুহিতার কেমন একটু মমতা হলো। চাকরকে ছেড়ে দিতে আদেশ দিয়ে নিজে আরও সামনে এসে শুধোলে, তুমি এখানে কেন এসেছিলে গো?

ভিখারিণীর চোখে জল। 'আমি চুরী করতে আসি নি মা!'

'তবে কেন এসেছিলে, ভিক্ষে নিতে?'

ভিখারিণী মাথা পেতে সায় দিল। কাউকে না দেখে আমি মানুষ খুঁজছিলাম। সত্য আমি চুরি করতে আসি নি। বাবুরা জানতে পেলে······

সুহিতা তাড়াতাড়ি বললে, না, না, তোমার ভয় নেই, বাবুরাও বাসায় নেই কেউ! কিন্তু তোমাকে কয়েকটি কথা আমি জিজ্ঞেস করব। এস আমার সাথে ভেতরে!

ভিখারিণী কেমন করে তাকাচ্ছে যেন।

সঙ্কোচে সে বললে, কিন্তু বাবুরা কেউ নেইত মা?

'না নেই, তুমি এস! আর থাকলেই কি, আমি থাকতে তোমার ভয় নেই কিছু।'

ভিতরে এসে সুহিতা বললে, 'তুমি এমনি করে চারদিকে তাকাচ্ছিলে কেন বলত?'

ভিখারিণী নত মুখে বললে, 'শুধু ভিক্ষার জন্যেই মা, অন্য কোন খারাপ উদ্দেশ্য আমার ছিল না!'

তাহলে বাইরে থেকেই কেন ডাক দিলে না, বারান্দায় এসে উঠলে কেন?

এবার আর ভিখারিণী কোন উত্তর দিলেনা। এক মুহূর্ত চুপ থেকে সুহিতা বল্‌লে, আচ্ছা, যাক সে কথা, তার জন্যে তোমায় ডাকিনি, ডেকেছি অন্য কাজে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব, বল সত্যি উত্তর দেবে?'

ভিখারিণী নতমুখে বল্‌লে, মা, মিছে কথা কেন বল্‌ব?

সুহিতা বল্‌লে, তোমার সঠিক পরিচয় আমায় বল্‌তে হবে। প্রথম থেকে দেখে তোমাকে মনে হচ্ছে আমার, তুমি চিরদিনই ঠিক এমনি ছিলে না। নিশ্চয়ই কোন ভদ্র ঘরে তোমার জন্ম! এ অনুমান কি আমার সত্যি নয়?

ভিখারিণী বল্‌লে, না মা এ তোমার ভুল! আমি চিরদিনই এমনি ভিখারিণী! জন্মের থেকেই!

কিন্তু সুহিতা বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লে না। ভিখারিণীর কথায় মন তার সায় দিল না এতটুকু। সে ঠিক বুঝে গেল, ওর কথায় কোথায় যেন একটা ফাঁকি রয়ে গেছে। আর বল্‌তে বল্‌তে মুখের যে রকম একটা ভাব হোল তার, যাতে সন্দেহটা গাঢ় হোল বেশী করে। বল্‌লে, তোমার কথায় আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার কাছে লুকিয়ো না তুমি, সত্যি করে বল! শোন, তাহলে সত্যি কথাই তোমায় খুলে বলি। আমি মাহারা, মাকে আমি জীবনেও দেখিনি! বাবা বলেন, এতটুকু থাকতে নাকি মারা গেছেন। সেই মার জন্যে দিনের পর দিন ক্ষণে ক্ষণে প্রাণ আমার কেঁদে উঠ্‌ছে। সে কান্না আজ ও থেমে যায় নি। মা কি জিনিষ সে আস্বাদ আমি পাইনি জীবনে। কিন্তু আজ তোমাকে দেখে অবধি আমার প্রাণ উচ্ছ্বাসিত হয়ে কেঁদে উঠছে। সত্যি করে বল তোমার পরিচয়; তুমি কে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি সাধারণ একজন ভিখারিণী নও।

ভিখারিণী একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে সুহিতার মুখের পানে তাকাল। যেন তার কথা শুনে সে কিছুটা বিস্মিত হয়েছে। কিন্তু চোখ নাবিয়ে নিল আবার তখনই, সুহিতা বল্‌লে, তুমি হয়ত বল্‌তে পার, তোমার পরিচয় জেনে আমার লাভ কি! সে হারাণ মাকে ত আর ফিরে পাব না; তবু জান্‌তে আমার ইচ্ছে কর্‌ছে।

সুহিতা লক্ষ্য করেনি, তার কথা শুনে পর্য্যন্ত ভিখারিণী নীরবে কাঁদছে। হঠাৎ চকিত হয়ে বললে, একি কাঁদছ তুমি?

ভিখারিণী বললে, সে কথা শুনে তোমার লাভ কি মা?

'না, না লাভ ত আমি চাই না!' তাড়াতাড়ি সুহিতা বল্‌লে। আর সে আশাও আমার নেই! শুধু জান্‌তে চাই, তোমার জীবনের ইতিহাসটুকু।

ভিখারিণী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘরের চারিদিকে একবার লুব্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্‌লে,—কিন্তু তোমার পরিচয় ত আমার কিছুই জানা হোল না মা!

সুহিতা বললে, কি-ইবা পরিচয় দেব আমার! আচ্ছা শোন, বাপের একমাত্র মেয়ে আমি সুহিতা, সংসারে মা নেই; পিতা পুত্রির সংসার।

ভিখারিণী বললে, তা জানি, তার পরের টুকু এখন জানতে চাই!

সুহিতা আশ্চর্য্য হয়ে বললে, জান, তার মানে?

ম্লান করুণ একটু হাসল ভিখারিণী। 'হ্যাঁ, ওটুকু জানতুম, অনেকদিন একবার এসেছিলুম কি না!'

ওঃ! সুহিতা হেসে বললে, তারপর আর বিশেষ কিছু নয়। দেখছই ত বিয়ে হয়েছে, তারপর একটি শিশু এসেছে ঘরে।

ভিখারিণী বললে, শিশু একটি এসেছে? ওটা জানবার জন্যেই আমার এত গুলো কথা! ওকে আনবে একটু; কোলে নেব আমি? ভিখারিণীর চোখ ছলছলিয়ে এল।

সুহিতা আশ্চর্য্য হোল একটু কিন্তু আপত্তি করলে না।

ঝান্টাকে কোলে নিয়ে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত আদর করে তারপর ভিখারিণী বললে, 'জীবন আমার সুখের নয় মা, চির দুঃখের একথাও আমি স্পস্ট করে বলতে পারি নে, কারণ সুখ একদিন আমার ছিল এবং ভাল করেই ছিল! তুমি যা অনুমান করেছ তা মিথ্যে নয় এতটুকু। ভদ্র ঘরের মেয়েই একদিন ছিলুম, এবং বিয়েও হয়ে ছিল ভদ্র ঘরেই বড় লোক স্বামীর সাথে!

সুহিতা নীরবে শুনছে!

'স্বামী আমায় ভালবাসতেন হয়ত তার নিজের চেয়েও বেশী!......আমারও একটি মেয়ে ছিল ঠিক তোমার মতই, এমনি সুন্দর, এমনি শান্ত!...কিন্তু বলতে যখন আরম্ভ করেছি, তখন সমস্তই খুলে বলব। লজ্জার মাথা খেয়েছি, আমি অনেকদিন আগে,...হা, শোন! সংসারে অনেকেই স্বামীর ভালবাসা পায়, সিক্ত হয় অনাবিল প্রেম রসে, কিন্তু আমি যা পেয়েছি মনে হয় তেমনি ভালবাসা জগতে বড় বেশী মেয়ে পায় নি। রূপ আমার ছিল কিনা জানি না, তবে এখন যে একেবারেই নেই সেটা ভাল করেই জানি। কিন্তু স্বামী বলতেন, আমার মত রূপসী নাকি তিনি জীবনেও দেখেন নি! স্বর্গের অপ্সরাদের সাথেই তিনি আমার তুলনা করতেন। সেটা যে তার সহস্রগুণ বাড়িয়ে বলা তা আমি বুঝতুম কিন্তু রূপ যে সত্যি সত্যি ছিল তা আগে জানতে না পারলেও একদিন জানতে পেরে ছিলুম মর্ম্মান্তিকভাবে।

সংসারে আমার কোন দুঃখ ছিল না বাপের একমাত্র পুত্র ছিলেন আমার স্বামী। শ্বশুর জীবিত ছিলেন, শাশুরীও, তারাও যা ভালবাসতেন আমায় তারও তুলনা হয় না। হয়ত এক ছেলের বউ বলে একটু বেশী করেই। মোট কথা জীবন আমার সব দিক দিয়েই পরিপূর্ণতা লাভ করে ছিল। কিন্তু সে সুখ ভগবানের সহ্য হোল না, অকালে ভেঙ্গে দিলেন।

এসব কথা আমি ভুলেই ছিলাম এতদিন শত সহস্র ঘটনা, যা আমার জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে, ব্যস্ত ছিলাম এতদিন তাদের জের সামলাতেই, এই একটী জীবনে যে কত বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, তা গুণে বলা অসম্ভব, তুমি ধারণা কর্‌তে পার না, এবং আশীর্ব্বাদ করি তেমন ধারণা যেন কোনদিন তোমার কর্‌তেও না হয়! তুমি হয়ত ভাবছ, আমার আশীর্ব্বাদের আবার মুল্য কি! সামান্য একটা ভিখারিণী পথের কাঙ্গাল! কিন্তু সত্যিই ত আর চিরদিন আমি এমনি ছিলুম না। তোমার মতই এ রকম ফুলে ফলে ভরে উঠে ছিল আমারও সংসার। আজ সব গেছে, তা গেছে মানি, কিন্তু বুকের সে স্নিগ্ধ ভাবটুকুও ত যায় নি মা। তাই আশীর্ব্বাদ তোমায় আমি কর্‌তে পারি, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস জগতে কারুর আশীর্ব্বাদের চেয়ে তা হীন হবে না মা।

সুহিতা বিহ্বলের মত হয়ে গেছে। ওর মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন দেখ্‌ছে এখন। মনে হচ্ছে যেন এই ওর মা ওর সাম্‌নে এসে বসেছে, তারই আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হচ্ছে তার স্নিগ্ধ আঁখি থেকে। শান্ত কণ্ঠে বল্‌লে, আমারও মনে হচ্ছে তাই। তোমার আশীর্ব্বাদই আমার জীবনে হবে সবচেয়ে বড় জিনিষ!

ভিখারিণী বললে, তাই হোক মা। এ কাঙ্গালিনীর আশীর্ব্বাদ, বুকের সমস্ত স্নেহ নিংড়ান আশীর্ব্বাদ তোমায় চির আয়ুস্মতী করে রাখ্‌বে। ধনের তোমার অভাব নেই, আমার আশীর্ব্বাদে জনের অভাবও তোমার পূর্ণ হবে। আর এই ছেলে, এই খোকা—একটা গাঢ় চুম্বন সস্নেহে গণ্ডে এঁকে দিয়ে বল্‌লে,—হবে এবংশের রত্ন, গৌরব! উজ্জ্বল করবে সকলের মুখ। এযে সোনার যাদু আমার···হঠাৎ ভিখারিণী চমকেই যেন থেমে গেল।

সুহিতা বল্‌লে, কি তোমার?

ভিখারিণী ম্লান একটু হাসল। সে হাসি যেন কান্নার চেয়েও সহস্রগুণে তিক্ত! সুহিতার মনে হোল, না হেসে যদি সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠ্‌ত, সেই হোত অনেক ভাল।

ভিখারিণী বলে চল্‌ল, সমস্তই আমি ভুলে ছিলাম এতদিন। ভুলেছিলাম অর্থ জোর করে যবনিকা টেনে দিয়েছিলাম অতীত জীবনের স্মৃতির উপর। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম জীবনের এক সময়ে যে আমাকে সুখের ভাগ গ্রহণ করতে হয়েছিল, সে কথা একেবারে ভুল্‌ব। মনে করব, চিরদুঃখী আমি, এমনি পথের কাঙ্গাল হয়েই ভুমিষ্ঠ হয়েছি পৃথিবীতে কিন্তু তা হোল না। আজ আবার একে একে সমস্ত স্মৃতিই কল্পলোকে আমার আনাগোনা সুরু করেছে। সেই ভুলে যাওয়া স্মৃতিই আজ আবার জ্বালিয়ে দিচ্ছে সারাবুক।

সুহিতার চোখে জল কিন্তু নীরব, শুন্‌ছে!

ভিখারিণী বল্‌লে,—সংসারে সুখ দুঃখ দু'টোই আছে। আমি-ও যে তা না জানতুম তা নয় কিন্তু এমনি দুঃখ সে আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল। বুক চিরে যদি তোমায় দেখাতে পারতুম,

তাহলে দেখতে সারাবুক আমার কালিয়ে গেছে। ঝঙ্কার ধরে গেছে একেবারে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, এমনি দুঃখ জগতে যেন আর কেউ না পায়! সে যে কি ভীষণ, কি জ্বালা, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না মা।

সুহিতা আঁচলে চোখ মুছে নিলে।

ভিখারিণী বলতে লাগল, স্বামীর প্রেমে শ্বশুর শ্বাশুরীর ভালবাসায় দিনের পর দিন আমার স্বপ্নের ভেতর দিয়ে কেটে যাচ্ছিল। স্বামী সুখে ছিলুম আমি গরবিনী। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কত শত সহস্র ছোট খাট ঘটনাকে অবলম্বন করে প্রেম আমাদের ছুটেছিল বাঁধভাঙ্গা স্রোতের জলের মত। সে সব অনেক কথা! কিন্তু দুঃখ ছিল সংসারে একটি! এত সুখের মাঝে শুধুই একটি। কিন্তু সেই একটিই মনে মনে তখন আমার প্রচণ্ড হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সকলেই মনে প্রাণে চায়, কুড়ীবছর বয়সেও সে রত্ন আমি কাউকে দিতে পারলুম না। এজন্যে একটা চাপা অশান্তি সকলের মনেই যেন কেঁপে উঠছিল।

মনে মনে সে যে একটা কি অশান্তি, অত বয়সেও যার ছেলে না হয়েছে শুধু সেই জানে! সে সময় অত সুখেও সেটা ছিল আমার একটা বড় রকমের দুঃখ। শ্বশুর শ্বাশুরীর মুখের পানে চাইতে আমার ক'দিন পর্য্যন্ত ভয় করত দস্তুরমত। কিন্তু সত্যি বলতে এর জন্যে মুখ তাদের কালো দেখিনি একদিনের জন্যেও। তবু মনে মনে আমি বুঝতুম সবই। কিন্তু এমনি সংশয়ে ভগবান আমায় অনেকদিন রাখেন নি! আমি সন্তানসম্ভবা হলুম একুশ বৎসর বয়সে। সেদিন যে স্ফুর্ত্তি দেখেছিলুম সকলের মুখে, তেমনটি আর কোনদিন দেখিনি। যেন মহোৎসব লেগেছিল!

তারপর যথাসময়ে একটি মেয়ে হোল আমার, ভিখারিণীর স্বরটা যেন কেঁপে গেল। রূপে পৈরী কখনো দেখিনি, যা শুনেছি, মনে হোল তার মতই। একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠল সারা সংসারটা! শ্বশুর শ্বাশুরীর মুখে হাসি, স্বামীর মুখে হাসি, আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম কিন্তু পরিপূর্ণ আনন্দ ভগবান কখনো কাউকে দেন না! একটা অঙ্গ ভেঙ্গে দেন, কখনো বা নিবিয়ে দেন সমস্তটাই। আমাদের বেলাও তাই হোল। বজ্রপাত হোল সহসাই। তিনটি মাস কাটল না এক মাসের মধ্যে শ্বশুর শ্বাশুরী উভয়েই পরপর চোখ বুজলেন। সারা সংসারে বয়ে গেল একটা শোকের ঝাপটা। স্বামীর সে করুণ মুখখানা মনে হলে, আজও আমার বুক ফেটে যায়।

দুটি মাস কেটে গেল। স্বামীর সে মুখের ম্লানিমা তখনো কেটে যায় নি। পর পর দু'টো শোকে তাকে একেবারে মুহ্যমান করে দিয়ে গেছে। তবু তার ভেতর যে আনন্দটুকু আমাদের ছিল সে শুধু ঐ ছোট্ট শিশুটিকে নিয়ে।

দিনের পর দিন শশীকলার মত শিশু বড় হতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে রূপ বাড়তে লাগল তার চতুর্গুণ। খল খল তার হাসির শব্দে, কান্নার সুস্নিগ্ধ মাধুর্য্যে সারা বাড়ীখানা যেন ভরে উঠল।

দেখে দেখে শুনে শুনে প্রাণে কি রকম একটা আনন্দ শিহরণ জেগে উঠ্‌ত তা তুমি বেশ বোঝ এখন। তুমিও যে এই ছোট্ট শিশুর মা! একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভিখারিণী বললে, সেই শিশুকে নিয়ে ধীরে ধীরে আমরা ভুলে গেলুম অতীতের সমস্ত ব্যথার স্মৃতি। স্বামীর মুখের সে ম্লানিমা কেটে গেল; আমি হয়ে উঠলুম যেন হাসির ফোয়ারা। শিশুর মুখের সে আধ আধ কণ্ঠ স্বর যেন দিশেহারা করে দিত উভয়কে।

কিন্তু আনন্দ···এই আনন্দেই চিরদিন অভিশাপ ডেকে এনেছে আমার জীবনের উপর ভেঙ্গে দিয়েছে সারাবুক কিন্তু এবার যে অভিশাপ সরে এল, তার প্রচণ্ড বেগে আমি ভেসে গেলুম একেবারে। কোথায় পড়ে রইল আমার স্বামী, কোথায় পড়ে রইল প্রাণের প্রতিমা সেই শিশু, আমিভাস্‌তে ভাস্‌তে এগিয়ে চললুম। কতদিন ভেসে গেছি জানিনা, যখন একদিন কুলের রেখা পেলুম, আর্ত্তনাদ করে উঠল সারা বুকটা মনে হোল, কেন আর এ মায়ার মরীচিকা! জীবনই যদি আমার ব্যর্থ হোল, তাহলে এ কুলের রেখার আর আমার কি প্রয়োজন! সর্ব্বস্ব-হারা আমি অভাগিনী! আতকে উঠলুম নিজের পানে চেয়ে, একি মূর্ত্তি আমার! মনে হোল চারদিকে যেন আমার অসংখ্য পিশাচের সুতীব্র নিশ্বাস, রাক্ষসের মত তাদের লক্‌লকে জিহ্বা কামনায় ভরা তীক্ষ্ণ চোখের অসহ্য চাউনী। আমি পাগল হয়ে গেলুম। কোথায় আমার স্বামী কোথায় সেই শিশু! কোথায় আমার সেই প্রাণাধিকা, ভিখারিণী আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল!

তড়িৎ-পৃষ্ঠের মত সুহিতা লাফিয়ে উঠে বল্‌লে, কি নাম ছিল তার?

সামলিয়ে নিয়ে ভিখারিণী বলে,—নাম? হাঁ, নামটা আজ আর ঠিক মনে করতে পারছি নে! তবে বেছে বেছে সুন্দরই একটা নাম রেখেছিলাম তার দু'জনে মিলে। ঠিক তোমার মতই এমনি সুন্দর!

সুহিতা বুঝ্‌লে, ভিখারিণী নামটা গোপন করতে চায় তার কাছে। তাই সেও আর পীড়াপীড়ি না করে বল্‌লে,—কেমন করে এরকম হয়েছিল?

হয়েছিল? হাঁ, সেটাই আসল প্রশ্ন! কিছুই নয়, হাস্‌তে হাস্‌তে খেল্‌তে খেল্‌তে হঠাৎ! মাস ছয়েক পরে, খুকী তখন মাস পনরের হবে, উনি একদিন বললেন, চল একবার কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসা যাক! আমি আহ্লাদে রাজি হলুম। কিন্তু কোথায় যাব তা ঠিক করতেই কেটে গেল আরো কয়েক দিন! তারপর ঠিক হোল দার্জ্জিলিং যাওয়া হবে। কিন্তু বাপের বাড়ী অনেক দিন যাওয়া হয়নি, তাই ঠিক হোল যাবার পথে সেখানে থেকে যেতে দু'দিন! সেই অনুযায়ী সমস্ত বন্দোবস্ত হয়ে গেল, যথা সময়ে শিশুকে বুকে নিয়ে সর্ব্ব প্রথম বাপের বাড়ী রওনা হলুম।

কিন্তু দার্জ্জিলিং আর যাওয়া হোল না। কপাল ভাঙ্গল আমার বাপের বাড়ীতেই।

আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি প্রথম জীবনের ষোলটি বছরে যেখানে নিসঙ্কোচে, নির্ভাবনায় কাটিয়ে দিলুম, সেখানে এমনি শত্রু আমার কেমন করে হল! কিন্তু এল, সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গল আমার কপাল!

সেদিন রাত্রিটা ছিল জ্যোৎস্না। উভয়েরই প্রাণে আমাদের একটা আনন্দের ভাব আপনার জেগে উঠেছিল। উনি বল্‌লেন,—চল নদীর ধার থেকে একটু বেড়িয়ে আসিগে। আমি সানন্দে সম্মত হলুম। আমার মনও সেদিন এমনি একটা কিছুই চাচ্ছিল বার বার। কিন্তু সে ইচ্ছার ভেতরে যে সর্ব্বনাশী রাক্ষসী মুচকে মুচকে হাসছিল, তা তখনো জান্‌তে পারিনি!

খুকী রইল তার দিদির কাছে, আমরা বেরিয়ে পড়লুম। চলতে চলতে অনেক কথাই আমাদের হতে লাগল। তিনি অনেক কবিতা আওড়ালেন, উপমা দিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, চাঁদের সাথে কোথায় কোনটায় মিল রয়েছে এমনি সব। অনেকক্ষণ ধরে বেড়ালুম! বেড়িয়ে বেড়িয়ে সাধ যেন আর মিটতে চায় না। সেদিনের জ্যোৎস্নাটাই কি রকমই যেন অদ্ভুত আকর্ষণ করছিল। কিন্তু সেটাই আমার সর্ব্বনাশ করলে শেষ পর্য্যন্ত!

বুক ফেটে যায় মা সে কথা ভাব্‌তে। আমার সোনার সংসার, স্বপ্নভরা সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ভেঙ্গেচুড়ে মিশে গেল মাটির মাঝে। চমকে দেখলুম, এক সময় আমি সর্ব্বস্ব হারা হয়ে পথের উপর এসে দাঁড়িয়েছি। আমি মাতৃত্ব থেকে, সতীত্ব থেকে, জীবনের যা কিছু নিজস্ব সমস্ত থেকে জীবনটাই শুধু একটা কঙ্কালের বোঝা।

গল্প কর্‌তে কর্‌তে এক সময় এসে বসলুম, কতকগুলো ঘাসের উপর। নদীর উপর জ্যোৎস্নার সে প্রাধান্য দেখে মনে হচ্ছিল, এ যেন মরীচিকার মহামায়া! ছুট্‌তে ইচ্ছে হয় তার পেছনে পেছনে কিন্তু সে কি করে! উনি বললেন, একটা গান কর। প্রতিবাদ করলুম না, অন্য সময়ে হলে হয়ত করতুম, কিন্তু এখন আপনার থেকে এসে গেল।

রাত্রি তখন কটা হবে ঠিক নেই। জ্যোৎস্নাটা যেন বৃষ্টির মত ঝড়ে পড়্‌ছে। এমনি অনাবিল স্নিগ্ধ। গানের অর্দ্ধেকটাও তখন শেষ হয়নি, উনি বিভোর হয়ে শুনে চলছেন, আমিও গেয়ে যাচ্ছি আবিষ্টের মত। চারদিকে আমাদের যেন মায়াজাল সৃষ্টি হয়ে ছিল। হঠাৎ... উঃ, একেবারে অতর্কিত কে এসে আমার মুখ চেপে ধরলে, সঙ্গে সঙ্গে ওরও। স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম। চার পাঁচটী দস্যু মিলে ওকে বেঁধে ফেল্‌লে। আমি হয়ে গেলুম বিহ্বলের মত কিন্তু ধস্তা-ধস্তি কর্‌তে ছাড়লুম না কিন্তু ব্যর্থ হোল সমস্ত, চীৎকার দেবার প্রয়াস পেলুম, তাও পারলুম না। সমস্ত গেল, মান সম্ভ্রম, আশা আকাঙ্ক্ষার সমস্ত স্বপ্ন ভেসে গেল মহূর্ত্তে! জ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌লুম! কিন্তু তার পূর্ব্বে শুনলুম একবার শুধু তার ক্ষীণ কণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ তারপর আর কিছুই জানি না। যখন জ্ঞান ফির্‌ল, তখন পিশাচের কবলে আমি লাঞ্ছিতা, উপেক্ষিতা জগতের দ্বারে, পথের জঞ্জাল।

বুকের ভেতরটা মোচর দিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস সুহিতার বেরিয়ে গেল, উঃ কি ভীষণ!

সিঁড়িতে জুতার খট্ খট্ শব্দ শোনা গেল, পরক্ষণেই কোঠায় প্রবেশ করলে সৌরীণ। কিন্তু থমকে দাঁড়াল একমুহূর্ত্ত ভিখারিণীকে দেখে! ভিখারিণী চঞ্চল হয়ে গেছে। সৌরীন উঠে গেল উপরে।

ভিখারিণী বল্‌লে, ইনিই বুঝি তোমার স্বামী?

সুহিতা সায় দিলে।

তোমার বাবা কি আজই ফির্‌বেন?

হ্যাঁ, সন্ধ্যার গাড়ীতে।

আবার একটু সময় চুপ চাপ। হঠাৎ উপর থেকে ডাক এল। সৌরীণ ডাকছে। সুহিতা বল্‌লে, তুমি একটু বোস, আমি এখনি আস্‌ছি কথা শুনে।

তারপর মিনিট দশেকের ব্যবধান। স্বামীর কথা শুনে সুহিতা ফিরে এল কিন্তু ভিখারিণী নেই। দাঁড়িয়ে আছে শুধু ঝাণ্টা। বুকটা আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ল তার নিজেরই অজ্ঞাতে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আস্‌ছে। সুহিতা নীচতলে সেই কক্ষেই বসে আছে স্তব্ধের মত, সৌরীন গেছে ষ্টেশনে শ্বশুরকে এগিয়ে আন্‌তে।

সুহিতা ভাব্‌ছে, সেই ভিখারিণীর কথা। সুখৈশ্বর্য্যের কোলে পালিতা নারী আজ পথের কাঙ্গালিনী। জগতে কত ভীষণ দুঃখই না ভগবান সৃষ্টি করেছেন, আশ্চর্য্য ভিখারিণীর কথা ভেবে ভেবে বুকটা তার শির শির কর্‌ছে। সেই সঙ্গে তার নিজের সাথে তুলনা জেগে উঠেছে আরেকটি নারীর, সেই তার কন্যার। তার বুকটাও নিশ্চয়ই এমনি করে কেঁদে মর্‌ছে দিনের পর দিন।

গেটে এসে গাড়ী থাম্‌ল। নাম্‌লেন পরেশবাবু, সঙ্গে সঙ্গে সৌরীণ। কিন্তু কোঠায় প্রবেশ করে উভয়েই আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। সুহিতা তখনো তেমনিভাবে বসে আছে। মার ব্যথাটা আজ আবার নূতন করে বাজ্‌ছে তার বুকে, পরেশবাবু এগিয়ে এসে একখানা হাত ধরে বল্‌লেন, কি হয়েছে মা, এমনি করে বসে আছিস্ যে?

সুহিতা নির্লিপ্তের মত উঠে দাঁড়াল! 'কিছু নয় বাবা উপরে চল।'

উপরে এসে পরেশবাবু বল্‌লেন, 'না মা, কিছু একটা তোর নিশ্চয় হয়েছে। নইলে মুখখানা অমন মলিন কেন, কেমন যেন অন্যমনা। কি হয়েছে, আমায় খুলে বল মা?'

সুহিতা ম্লান হেসে বল্‌লে, সত্যি বাবা কিছু নয়, আমি ভাব্‌ছি শুধু একটা ভিখারিণীর কথা।

'ভিখারিণীর কথা—সে আবার কি?'

'বড় দুঃখী এক ভিখারিণী। ওর জীবনের সমস্ত কাহিনীটাই আমায় বল্‌লে। শুনে অবধি মনটা একটু খারাপ হয়ে আছে।'

পরেশ বাবু একটু কৌতুহলী হয়ে বললেন, জীবন কাহিনী? সে কথা শুনে মন তোর এতটা খারাপ হয়ে গেছে? বল্‌ত খুলে আমার কাছে কি বল্‌লে?

আচ্ছা, বলব আগে তুমি খেয়ে নাও।

খাওয়া পরে হবে, আগে তুই বল।

কিন্তু খিদে যে পেয়েছে তোমার।

না পায়নি, তুই বল। পরেশ বাবু হেসে বললেন, বুড়ো বাপকে তুইত কেবল খাওয়াতে পারলেই বাঁচিস্।

সুহিতা এবার আর প্রতিবাদ কর্‌লে না। মৃদুহেসে পিতার পাশে বসে পড়্‌ল। তারপর বলে চল্‌ল, ধীরে ধীরে সেই তার প্রথম বিবাহিত জীবন থেকে, লাঞ্ছিত জীবনের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত কিন্তু সে লক্ষ্য করেনি শুন্‌তে শুন্‌তে পরেশবাবুর মুখ সাদা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে যেন এতটুকু রক্ত নেই। হঠাৎ বলে উঠ্‌লেন ব্যস্ত হয়ে, 'ওর গালের কিনারে একটা কালো দাগ ছিল নারে?'

সুহিতা অতিমাত্রায় আশ্চর্য্য হয়ে পিতার মুখের পানে এক মুহূর্ত্ত অপলক নয়নে তাকিয়ে থেকে বললে, হ্যাঁ, ছিল ত, তুমি জানলে কেমন করে?

পরেশ বাবু শয্যায় লুটিয়ে পরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লেন। 'উঃ, কি সর্ব্বনাশ করেছিস্। মা, তাকে ধরে রাখতে পারলিনে? এমনি করে পেয়েও আবার হেলায় হারালি?'

সুহিতার সর্ব্বশরীর কাঁপছে ঠক্‌ঠক্ করে। চোখে মুখে অন্ধকার। 'সে কি বাবা?'

'বুকে আঘাত পাবি বলেই তোকে বল্‌তে পারিনি, কিন্তু সে যে এক প্রচণ্ড মিথ্যা মা। আজ সুদীর্ঘ আঠার বছর আমি তার প্রতীক্ষায় পথের পানে চেয়ে আছি। সেই যে তোর মা সুহিতা, তোর স্নেহময়ী মা।'

'মা! আমার মা!' সুহিতা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, পরক্ষণেই সংজ্ঞা তার লুপ্ত হয়ে গেল।

ভিখারিণী তখন কোন দূরে, কোথায় চলে গেছে তা কে জানে!

অচিন্ত্যকুমারের 'অমাবস্যা'

শ্রীকমলা সেন

'অমাবস্যার' বিস্তৃত সমালোচনা লেখা এখানে সম্ভব নয়, তবুও কিছুটা জানাই। বইখানাকে আগাগোড়া পড়িয়া শুধু একটি কথা বলা যায়—চমৎকার। এই কথাটাকে যুক্তি দিয়া প্রমাণ করা ও একেবারে শক্ত নয়। সমস্ত কবিতার আড়ালে একটি প্রেমিক-মনের ক্রমবিকাশ আছে, আর এই প্রেম প্রকাশের ভঙ্গীটুকু বাংলাসাহিত্যে একেবারে নূতন। সাধারণ মানুষ, কবি, দার্শনিক সকলেই বইখানি পড়িয়া আনন্দ পাইবে। এতকাল যে প্রেমকান্না শুনিয়াছি তাহা প্রথম পরিবর্ত্তন পায় নজরুলের মাঝে। তারপর দেখি অভাবনীয় সুর। প্রথম কবিতাখানি কবির শ্রেষ্ঠ কবিতা, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যতের ছায়া পড়িয়াছে; 'বিদ্রোহীতে' নজরুল আত্মপ্রচার করিয়াছেন। অচিন্ত্যের প্রথম কবিতাখানি ও তাই। এটাকে বড় করিলেই সমস্ত কবিকে পাই,—

"আমার পরাণে ভাই
কোটি মানবের অশ্রু জলের জোয়ার শুনিতে পাই।"

তারপর—'রহেনি কোথাও ফাঁক
আমার পরাণে জমেছে বিশ্ববেদনার মৌচাক।'

কবিতার আলোচনায় সেখানে গোলমাল হয় সেটি ভাব অথবা অর্থ। অনেক সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও সমালোচকের অর্থ করিতে কখনও কখনও ভুল হয় তার কারণ কবি যখন যে মন নিয়া কবিতা রচনা করেন সমালোচক কিরূপে তার সেই মন ও সেই আবহাওয়া পাইবেন? তাই কবিতা বুঝিতে গেলে কবিকেও জানা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের কোনও একটি কবিতার অর্থ লইয়া একবার তিনজনের মধ্যে বিবাদ হয়। অবশেষে বিচারের জন্য তিনজন একসঙ্গে কবির, নিকট উপস্থিত হন, কবি হাসিয়া উত্তর দেন, 'তখন কি ভাব নিয়ে লিখেছিলাম তা' ও মনে নেই, এখন মনে হচ্ছে তোমাদের তিনজনের কথাই ঠিক।' এই সান্ত্বনা নিয়াই আমিও আজ অর্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রতিপাদ্য বিষয়টি এই—কবি একজন রমণীকে ভাল বাসিতেন এবং প্রতিদান ও পাইয়াছিলেন কিন্তু কিছুদিন পরে কবিপ্রিয়া আর একজনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হ'ন। কবি কল্পনায় কখনও সেই মেয়েটির সঙ্গে কখনও তার ঘরের অতিথির সঙ্গে কখনও বা নিজের মনের সঙ্গে কথা বলিয়া চলিয়াছেন। প্রেম কবিতায় যাহা থাকা দরকার এখানে সে সবই আছে। মিলন, বিরহ, ব্যর্থতা, বিদায়, স্মৃতি, কল্পনা, প্রকৃতি ও মনের একাত্মতা, তিক্ততা, মনে রাখিবার জন্য অনুরোধ, গভীর অনুভূতি অবশেষে নিজের মনকে সান্ত্বনা দান। কিন্তু একটা জিনিষ এই

বইখানিতে বেশী আছে সেটি কবির উদারতা। নজরুল তা'র প্রিয়ার দ্বিচারিতায় অভিশাপ দিয়াছেন;—

'যেদিন আমি হারিয়ে যাব
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে।'

এখানে কিন্তু কবি অভিশাপ দিবার কথা মনেও আনিতে পারে নাই বরং হাসি মুখে ক্ষমা করিয়াছেন ;—

'অবিচার ক'রে ক্ষমা করিলাম তোমার এ দ্বিচারিতা।'

মিলন রাতের কবিতাটি একটি মুক্তার মত সম্পূর্ণ ও সুন্দর, ইহার অর্থ করিবার উপায় নাই।

'মিলনের রাতে উঠানের কোণে জ্বলিছে বিরহ বাতি
জ্যৈষ্ঠের রোদে কপাল কুটিছে অমাবস্যার রাতি।'
'থেকোনাকো ভুলে যেয়ে
তোমার বাসর ঘরের দুয়ারে কাঁদিছে বিধবা মেয়ে।'
'নব কদম্ব হেরিয়া ভুলোনা কেয়ার কাঁটার ক্ষত।'
'হেথায় জ্বলিছে চিতা
সেই আলোতেই তোমার রাত্রি হয়েছে দীপান্বিতা।'

পাশাপাশি contrast কে এত সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে আর কেহ পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

সুখেও দিনে অতীতের দুঃখ মানুষ ভুলিয়া যায় তাই কবি দুঃখ করিয়া গাহিয়াছেন,—

'দিনের আলোকে আঁধার ভুলেছো ভুলেছো রাতের তারা
নিদয় নিদাঘে ভুলেছো যেমনি নেমেছে শ্রাবণ-ধারা।'

প্রিয়ার এই বর্ত্তমানের প্রতি আকর্ষণ ও অতীতকে বিস্মরণ এই দুইটাতেই কবি আঘাত পাইয়া ব্যর্থ হইয়া ধীরে বিদায় নিতেছেন ;—

'আমি আসিবনা ফিরে
আমি চ'লে যাই তীর্থ পথিক তিমির তমসাতীরে।'

কিন্তু আবার নিজেকে মনে রাখিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছেন ;—

'বসিয়া তাহার বামে
একবার শুধু ভুল ক'রে তা'রে ডাকিও আমার নামে।'

ইহাই রক্তমাংসের মানুষের কাছে স্বাভাবিক। ভালবাসায় তৃতীয়ের আগমন সহ্য করিতে পারিলেও স্নেহাস্পদের মন হইতে নিজেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন নিলোপ করিবার ধারণা কেহই সহ্য করিতে পারে না। মেঘলা দিন দেখিলেই মানুষের মনে বিরহ জাগে। এখানেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

'ছোট গ্রামখানি লাজুক শ্যামল নব বধূটির মত
শূন্যতাভারে বিরহী আকাশ চুম্বনে অবনত
জেগে ব'সে মেঘগর্জ্জন আর জল কল্লোল শুনি
শ্রান্ত শ্রাবণ নয়নে ও নভে নাই ফুল ফাল্গুণি।'

প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা বোধ প্রকৃতিতে মানবে একাকার করিয়া দেওয়ার যে ভাবটি রবীন্দ্রনাথ বসুন্ধরায় আঁকিয়াছেন অথবা মধুসূদন মেঘনাদবধকাব্যে প্রকৃতিকে মানবের সুখ দুঃখে যে ভাবে হাসাইয়াছেন, কাঁদাইয়াছেন এখানে সে ভাব প্রকাশটি কোনও অংশে ছোট হয় নাই।

"রজনীতে আর জীবনে বিরাজে বিস্তৃত স্তব্ধতা
শুধু মনে পড়ে তোমার মুখের মধুর মিথ্যা কথা
ভালবাসি-বলেছিলে
নিমেষে আকাশ ভ'রে উঠেছিলো নয়ন ভুলানো নীলে
রোমাঞ্চ তুলি মাঠে জেগেছিল তরুণ তৃণাঙ্কুর
নভ সীমন্তে হয়েছিল গাঢ় সন্ধ্যার সিন্দূর
হয়েছিল আঁখিতারা ও তারায় সুদূর সম্ভাষণ
বুকে বেজেছিল সাগর সজ্ঞ কাননের কঙ্কণ।"

অবসর সময়ে বসিয়া অতীতের স্মৃতি মনে করিতে সকলেই ভালবাসে। অতীতের সমস্ত খুটিনাটি ভাবিয়া কবি আনন্দ লাভ করিতেছেন। প্রত্যেকটি কবিতা স্মৃতিপুজায় ভরা। কবি শুধু স্মৃতি নাড়াচাড়া করিয়াই খুসী, প্রিয়াকে ফিরিয়া পাইবার ইচ্ছা আর নাই।

'নাই আর কোন সাধ
তবু ত একদা বলেছিলে তাই জানাই ধন্যবাদ।'

shelley কিংবা কালিদাস তাঁহাদের লেখায় কল্পনাকে যে ভাবে মুক্তি দিয়াছেন এখানেও কল্পনারি বিকাশ তাহার চেয়ে কম নয়।

'কামিনী ধানের ক্ষেত ভ'রে আজি জল নির্ঝর বাজে,
আমিও আকাশ দুজনে আজিকে একেবারে একেলা যে
বুকে মোর ব্যথা খুব
ডুবারি হইয়া চোখের বারিতে একবার দিবে ডুব?'

কোন জিনিষে ব্যর্থতা আসিলে মানুষের কাছে পৃথিবীর সব জিনিষ তিক্ত হইয়া যায়। আশা করিবার যখন আর কিছু থাকেনা তখন জীবনের আনন্দও কমিয়া যায়। কবি অনেক জায়গায় এই তিক্ততার আভাস দিয়াছেন;

'ভৃঙ্গার ভ'রে মদ রেখেছিনু, জানিনে কখন হায়
তুতের মতন তিতা হ'য়ে গেছে তাতল সে রমণীয়
জুঁই জ্যোৎস্নায় ফুলের ফরাসে বিছানা বিছাল বিছা
গোধূলির ঘরে গরীব রবির গর্ব্ব হয়েছে মিছা।'

মুখরতার চেয়ে স্তব্ধতা যে গভীর অনুভূতি জাগায় সে ভাবটি কবি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন ;—

"স্তব্ধতা দিয়ে অনুভূতিটিকে করিয়া রাখিও গাঢ়।" কবির অন্তরের স্নেহ, ভালবাসা, মায়া, মমতা, লীলায়িত ছন্দে ধরা দিয়াছে।

'কোন নীল নীর নিরালা নদীর নিবিড় মমতামাখা।'
'কঠিন উপল হ'ল উৎপল উতল চোখের জলে।'

জয়দেবের পরে এমন সহজ ও সুন্দর ভাবে অনুপ্রাসের ব্যবহার বোধহয় আর কেহ করে নাই।

এই সমস্ত আদান প্রদান শেষ করিয়া কবি কবিতার অর্ঘ্য প্রিয়াকে দান করিয়াছেন,—

'এই কবিতার প্রতিটি আখরে পড়েছে তোমায় ছায়া। ভালমন্দ অনেক কথাই কবি বলিয়াছেন, সে সব হয়ত কবি-প্রিয়াকে বিচলিত করিয়াছে হয়ত করে নাই তবু কবি শেষ নিবেদন জানাইয়াছেন ঃ—

'সাধ অবিনশ্বর
হে দূরচারিণি, মুখর প্রাণের লহ এই উত্তর।'

কবি বিদায় লইতেছেন কিন্তু তবু ও একটা পাথেয় চাই যাহা তাহার সমস্ত জীবনের সম্বল হইবে। প্রিয়ার স্মৃতি তাহার সমস্ত মনকে অসীম পরিপূর্ণতায় ভরাইয়া রাখিবে, প্রিয়ার জীবনের বৈচিত্র্য তাহাকে অসীমের দিকে পথ দেখাইয়া দিবে, প্রিয়ার ঘরের স্বল্প পরিসর কবির মনকে আকাশের সুদূর ব্যাপ্তিতে নিরুদ্দেশ হইতে ঈঙ্গিত করিবে, এই সান্ত্বনা নিয়া কবি আজ মুসাফিরের মত পথ চলিলেন,—

'সঙ্কেতময়ি। প্রার্থনা করি হয়োনা আবিষ্কৃত
তোমার মাঝারে যেন অনুভবি জীবন অপরিমিত।'

খেলার সাথী

শ্রীজয়শ্রী দেবী

নিশীথ লগনে সুন্দর মোর,
বাঁশীটী বাজালে কি সুরে ;
সুপ্তি টুটিয়া নয়ন চুমিয়া
ঘর হতে আনো সুদূরে।
আধো আলো আধো ছায়া ভরা ধরা
নয়নে জড়ানো ঘুমঘোর
ভালো করে পথ চিনি কি চিনিনে
হাত ধরে লও সাথী মোর।
এ আঁধার রাতে সাথীটীর সাথে
এ কোন্ খেলার আয়োজন
শুধু গান গাওয়া ? শুধু ফুল তোলা ?
ভরেছে কি আজ ফুলবন ?

কণ্ঠে দোলাবে মল্লিকা মালা ?
কঙ্কন নব বকুলে
ঝুমকা কি হবে মধু মাধবীর ?
মঞ্জীরা হবে কি ফুলে ?
মরি মরি মরি ! সুন্দর মোর
চির জনমের সাথী গো
আমার এ ছোট খেলাঘরটীতে
একি খেলা দিন রাতি গেল
ঐ ডাক্ শুনে সব ভুলে যাই
সাথী হই ফুল চয়নে ;
তোমারি গলার মালাখানি গাঁথি
ভরি দিয়ে মোর স্বপনে।

দুইনারী

শ্রীআশালতা দেবী

(১৮)

সুজাতাদের বাড়ীতে ঢুক্‌তেই, নীরেনের প্রথমে দেখা হোল, ওর জামাইবাবু এইচ, এল ঘোষের সঙ্গে। বাইরে মোটর দাঁড়িয়ে রয়েচে, বেরিয়ে যাবার পোষাক পরে তিনি কোথায় যেন যাচ্ছেন। টুপিটা তুলে বল্‌লেন ঃ—'নীরেন বাবু যে! সুজাতা আপনাকে দেখ্‌লে ভারী খুসী হোত। বেচারার শরীর খারাপ হয়েচে ভয়ানক। তার উপরে বড্ড একলা একলা থাকে। বিশেষ জেদাজেদি না কর্‌লে, বেরোয় টেরোয় না। কিন্তু ওরা এই কিছুক্ষণ হোল লেকের দিকে গেচে। বস্‌তে পারবেন না একটু।'

নীরেন একটু অপ্রস্তুতের মত হয়ে বল্‌লে ঃ 'বস্‌বার দরকার হবে কি? বিশেষ কিছুই নয়। উনি একটা অল্ডাসের বই চেয়েছিলেন, দিতে এসেছিলুম। 'বেশত। একটু বই-টই পড়্‌লেও অন্যমনস্ক থাক্‌তে পারে। But who is Aldous? মাপ কর্‌বেন, আমি আদৌ সাহিত্যিক নই।'

মনের মত একটা প্রসঙ্গ পেয়ে নীরেন দু'কথা গুছিয়ে বল্‌বার উপক্রম কর্‌তেই; উনি মোটরের পাদানিতে একটা পা রেখে বল্‌লেন ঃ 'কিন্তু নীরেন বাবু, মিনিট কুড়ি কি বস্‌তে পারেন না? তা হলেই ওরা ওঁরা এসে পড়েন। তবে যদি বিশেষ প্রয়োজনে চলে যান তা হলে দয়া করে, ওঁর বরাতি বইটি ওঁর ঘরেই রেখে আস্‌বেন। যেন উনি ফিরে এসেই সঙ্গে সঙ্গে পান।'

নীরেন ঘরে গেল। এর আগেও যতবার এসেচে সাধারণতঃ বাইরের বস্‌বার ঘরে কিংবা ভিতরের ড্রইং রুমে বসেচে। সুজাতার ঘর ড্রইং রুমের বাঁ দিকে। জানালার ধারে একটি চেয়ার। ঘরের মাঝামাঝি একটা টেবিল, তাতে লিখ্‌বার সরঞ্জাম ও গুটিকতক বহি। দক্ষিণ পাশে একটি আলনাতে, গুটি তিন চার সাদা শাড়ি ও নানারঙের ব্লাউস্। মাঝখানের দোরে একটি সবুজ পর্দ্দা ঝুল্‌চে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, পাশেই আর একটি ঘর আছে। সে ঘরটি বোধ হয় ওর শোবার ঘর। ঘরে ঢুক্‌তেই একটি মৃদু সুগন্ধ পাওয়া গেল। যে গন্ধ বিশেষ করে, সুজাতাকেই মনে পড়িয়ে দেয়।

কী সুন্দর সাদাসিধে ঘরখানি! এর পূর্ব্বে সুধীরার ঘরে দু' একবার যাওয়া ছাড়া, কোন ঘর কেমন হয় তা ও দেখেনি। কিন্তু এ ঘরের সঙ্গে সুধীরার সে ঘরের কথা তুলনা করতেই, ওর মনটা মুখ ফিরিয়ে নিলে। সেখানে সে কী অনাবশ্যক প্রাচুর্য্য! এখানে একটা সোফা, ওখানে একটা মার্ব্বেল দেওয়া টেবিল। অয়েল পেন্টিংএর ময়ুরআঁকা প্রমাণ সাইজের সুবৃহৎ আয়না। দেয়ালের আলমারিতে কৃষ্ণনগরের পুতুল থেকে, মাথার হেয়ার ক্লীপ, জামায় বসাবার পুঁতি কিছুই

যায়নি। নাঃ—সুধীরা একেবারে যাকে বলে নির্ভেজাল মেয়ে। রঙচঙ, অনাবশ্যক খুঁটিনাটি, সস্তা রুচি এসবই ওর মাঝে প্রচুর। কিন্তু সুজাতার পরিষ্কার শান্ত ঘর ততোধিক সুমার্জ্জিত স্বল্প গৃহোপকরণ। আর কী স্নিগ্ধ একটি গন্ধ। আসলে সুজাতা সকল সময়েই ভায়োলেট্ এসেন্স ব্যবহার করে। সন্ধ্যের হাওয়ায় আলনায় রাখা ওর শাড়ি এবং জামার থেকে একটু একটু ভেসে আস্চে তারই ক্ষীণ সুগন্ধ।

অবশ্য নীরেন বাড়িয়েচে···একথা স্বীকার কর্তেই হবে। যে যখন যাকে ভালবাসে তাকে বড্ড বাড়ায় এটা একটা মধুর সত্য। পর্দ্দা ঠেলে ও যদি সুজাতার শোবার ঘরে ঢুক্ত, তাহলেই দেখ্তে পেত—সেখানেও কিছু অনাবশ্যক আড়ম্বর আছে। বড় আয়না মেয়েদের শোবার ঘরে না থাক্লে ভারি অসুবিধে হয়। সুজাতার ঘরেও তা ছিল। আমাদের শাস্ত্র বলে, 'আত্মানাংবিদ্ধি।' নিজেকে জান্বার একটা মস্ত বড় উপায় হচ্ছে, শোবার ঘরে বড় আয়না রাখা। কেবল নিজের মুখ-ভাবকে নানা চিন্তা এবং আবেগের পরিবর্ত্তমান রূপায়িত নানা তরঙ্গের মধ্য দিয়ে দেখ্লে সে কাজের অনেকটা সহায়তা হয়।

হ্যাঁ, ও যদি পর্দ্দা সরিয়ে শোবার ঘরে ঢুক্ত, তা হলে ওর মত বদলাত বই কি। মেয়েদের স্বভাবই যে অলঙ্করণ। নানা সৌখীন টুকি টাকি, নানা অতিরিক্ত পরিপাটি, তা যে ওদের স্বভাবেরই মজ্জাগত। কিন্তু নীরেন তা কর্লে না। শয়ন কক্ষে ঢুক্বার অদম্য ইচ্ছাকে ও প্রাণপণে সংবরণ কর্লে। বিংশশতাব্দীর পক্ষে সে একটু অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসী বল্তে হবে। এর থেকেই সে মনে মনে একটা ভাব সম্বন্ধ আবিষ্কার করে ফেল্লে। মনে মনে বল্লেঃ—সুজাতা তোমার মনের নির্জ্জন অন্তঃপুরে আমি প্রবেশ করতে চাইনে। অত দম্ভ আমার নেই। যদি কেবল তোমার এই ছোট্ট সুন্দর ঘরটিতে ; যে ঘর তোমার নিরালা শোবার ঘরের ঠিক পাশেই অথচ···অথচ—উপযুক্ত প্রতি-শব্দের অভাবে ওর মানসিক কথোপকথন থেমে গেল। কিন্তু ভাবটা বোঝাই গেল। সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেচে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে, আকাশের তারাগুলি এক একটি করে উজ্জ্বল হয়ে ফুটচে।

(১৯)

'নীরেন বাবু যে! কখন এলেন ?' আগের ক্ষীণ গন্ধের চেয়ে আরও একটু তীব্র ভায়োলেটের গন্ধ পাওয়া গেল, সুজাতা এসে এক পাশে দাঁড়িয়েচে।

'বেশিক্ষণ না। আপনার জন্যেই বসে আছি।'

'আমার ভাগ্য।'

'কথাটা বল্লেন যারা প্রফেসন্যাল্ মিষ্টি কথা বলে তাদের মত করে। একটুও আন্তরিকতা নেই।'

সুজাতা হাসি চেপে বল্লেঃ—নেই নাকি ?

'তা না ত কি! আমি জানি আপনি আমাকে একেবারে সহ্য কর্তে পারেন না।'

'এমন কথা! এযে দস্তুর মত আমার মানহানি কর্‌চেন। বলুন দেখি, এমন কথা আপনাকে আমি কবে বলেছি'?

'সব সময়ে বলারও দরকার হয় না।'

কথাবার্ত্তা চালাতে চালাতে সুজাতা অন্যমনস্ক হয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। নানাকারণে আজ তার মন ভালো নেই। সকালের দিকে সরোজের এক চিঠি পাওয়া গেচে। তাতে রয়েচে প্রভুত্বের দর্প প্রচ্ছন্ন ব্যক্ত। সুজাতার নিজের উদ্ধত বিবেচনাহীনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া নিয়ে বেশ দু'চার পাতা কড়া বক্তৃতা। ভাবখানা এই যে শেষ অবধি ত তোমাকে আস্‌তেই হবে, আমার কাছে কিন্তু ইতিমধ্যে এত দর্প ভালো নয়! তখন থেকে ওর মন বিতৃষ্ণায় নীল হয়ে গেচে। যাকে ভালোবাসি, সে ভালোবাসার যোগ্য নয়—এ আবিষ্কার একটা দুঃসহ আবিষ্কার! সুজাতা নিজের মনের সম্ভবাতিরিক্ত ক্লেশে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেচে। কেন? কেন এত কষ্ট! সরোজ তাকে আর ভালোবাসেনা—সেই কথাটায় বেশি ব্যথা না, সরোজ আর তার ভালোবাসার যোগ্য নেই এ ভাবনায় বেশি ক্লেশ?

তাই একটু অন্যমনস্ক হয়েই ও উত্তর দিলে, 'ভারি হেঁয়ালীর মত করে কথা বলচেন যেন। মেয়েমানুষ হলে স্বচ্ছন্দে বলতুম কথার মারপ্যাঁচে একটু হাল্কারকম ফ্লার্ট করে নিচ্চেন।' নীরেন মুখতুলে ওরদিকে চাইলে। তারপরে জানালার গরাদে দুটো হাত রেখে তারমধ্যে মাথা গুঁজ্‌লে। সুজাতা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ও বুঝতে পারলে নীরেন কষ্ট পাচ্চে। প্রতিকারহীন, অদ্ভুত, নিজের থেকে ডেকে আনা কষ্ট! আজ সুজাতার মনটা একেবারে বিচ্ছিন্ন পরিষ্কার হয়ে গেচে। খুববড় রকম একটা বিতৃষ্ণা ভোগ করবার পরে মনের এই রকম অবস্থা হয়। যাকে আজ একজন মদোদ্ধত অন্যায়ের দর্পে অপমান করেচে, তারই একটি মুখের সামান্য কথায় আর একজনের অভিমানের পার নেই, বেদনার শেষ নেই। কী বিস্ময়কর অবস্থা! সরোজের শক্ত নিষ্ঠুরতার পরেই, রাত্রির স্তব্ধ প্রগাঢ়তায় নীরেনের এই অভিমানের আবেশ তার কাছে কেমন মিষ্টি লাগল। জানালা দিয়ে আকাশে দু'একটা তারা কাঁপচে, চোখে পড়্‌চে।

এগিয়ে এসে নীরেনের চুলে হাত রেখে বল্‌লে, 'উঠুন না কী ছেলেমানুষী কর্‌চেন। তামাসা করে একটা কথা বল্‌লেও বুঝি ধর্‌তে পার্‌বেন না? সবাই মিলে আমার উপর রাতদিন রাগ কর্‌তে থাকলে, আমি বাঁচি কি করে বলুনত?' বল্‌তে বল্‌তে ওর নিজেরই কেমন মোহ লাগল, মুখটা আরও নামিয়ে এনে কানে কানে কথাবলার মত করে বল্‌লে, 'তাহলে আমি বাঁচ্‌ব কী করে, বাঁচি কী করে বলুনত?'

নীরেন মাথার উপর রাখা ওর হাতটা ধরে ফেলে বল্‌লে, 'আমি কিছুতেই উঠ্‌ব না। আমি যখন মরে যাচ্ছি তখনই তুমি দিব্যি নিষ্ঠুরের মত বল্‌লে, তোমার সঙ্গে ফ্লার্ট কর্‌চি। কিসের জন্যে উঠ্‌ব? তুমিত আমার মুখ দেখ্‌তে চাওনা। আমি

এখনই চলে যাচ্ছি।' কী দারুণ ছেলেমানুষ। সুজাতার সমস্ত মন ছাপিয়ে এই কথাটারই মধুর স্রোত নিরন্তর বয়ে যেতে লাগল। ছোটছেলে মার উপর অভিমান করে, যখন যা খুসী তাই বলে মানে নেই, পারম্পর্য্য নেই। ওর ইচ্ছে হোল নীরেনের মাথাটা টেনে নেয়, দুহাতে করে জড়িয়ে ধরে বলে 'ছোটছেলের মত আর রাগ-অভিমান করতে হয় না। ওঠ-নাগো' কিন্তু ও কিছু বল্‌লেনা। চুপকরে দাঁড়িয়ে রইল। নীরেন ওর হাতটা ছেড়ে দিয়ে বল্‌লে, 'আমার সমস্ত জীবন বিরস করে দিয়ে একটু নির্ভরও কি দিতে পারো না?' সুজাতা সরে এসে চেয়ারে বসে বল্‌লে, 'তা দিতে পারি আমার এমন কী সাধ্য নীরেনবাবু।'

নীরেন মুখতুলে সোজা হয়ে বসে বললে 'কেন পারেন না? তারমানে এইত যে স্বামী আপনাকে অপমান করেচে, বঞ্চনা করেচে, আপনি এখনও মনে মনে তাকে পূজো করেন। তার কাছে ফিরে যেতে উৎসুক। রবীন্দ্রনাথের নতুন কাব্যের বই মহুয়া ছিল জানালার সামনের টিপয়ে। সেইটে তুলে নিয়ে নীরেন তার পাতা ওলটাতে লাগল। একটা ছোট পোস্‌কার্ডের সাইজের ফটো বাহির হোল। নীচে ছোট্টকরে লেখা 'সুকে' সরোজ।

সেইটের দিকে চেয়ে চেয়ে নীরেনের চোখ যেন আর ফির্‌তেই চায় না। তবুও সেটা যথাস্থানে রেখে বইটা মুড়ে বল্‌লে, 'কেমন এই না?'

'নীরেনবাবু ওসব কথার আলোচনা হয় তা আমি চাইনে।' 'কেন চাননা? যে প্রত্যেক মিনিটে আপনার কথা ভাবে। আপনার জীবনের জটিলতার কথা যে অহোরাত্রি আলোচনা করচে মনে মনে, আর ক'রে কত কষ্ট পাচ্চে। তাকেওকি আপনি সব ঢাক্‌বেন? তার কাছেও বড় হোল লৌকিকতার বাধাটা? রেখে দিন ওসব বাজে কথা। আমি শুন্‌বই।'

'কীআর শুনবেন, মডার্নিজ্‌মের শিখচূড়ায় আমাকে দেখে ভেবেচেন, আমি ধুয়ে মুছে একেবারে নির্জলা সাফ্‌ হয়ে গেছি। কিন্তু যাদের মডার্ণ হবার সখ রয়েচে, অথচ যথেষ্ট বেদনা একলা একলা দাঁড়িয়ে সহ্য করবার ক্ষমতা নেই, তাদের জীবনের কথাটা যে কীরকম গোলমেলে, এবং হাস্যকর ভাব-করুণ তা জানবেনইবা কী করে?'

'আঃ—সোজা করে কি কথা বল্‌তে পারেন না? দোহাই আপনার—আমার কাছে না হয় অত গুছিয়ে কথা নাই বা বল্‌লেন। এইত বলতে চান—যে আপনার স্বামীর কাছে দুর্ব্যবহার পেয়েচেন, তবুও 'মহুয়া'র কবিতা পড়ব্‌ার সময়, মনে মনে তাঁকে ধ্যান করেন। তাই না?'

সুজাতার মুখ লাল লয়ে উঠ্‌ল। ও কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চোখ পড়ল, নীরেনের মুখের উপরে। এতক্ষণ পর সোজা হয়ে মুখ তুলে বসেচে। ইলেক্‌ট্রিক্ আলোতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—সে মুখের প্রত্যেকটি রেখা। এই ক'দিনে কী রকম বদ্‌লিয়ে গেচে নীরেনের চেহারা। নারীর প্রেম যে পুরুষের রূপকে শতগুণে উজ্জ্বল করে—সে কথা একদিন সুজাতা মধুর আবেগে বারংবার স্মরণ করে কণ্টকিত হয়ে উঠেছিল। ওদের বিয়ের

মাস খানেক পরে সরোজ একদা এসে বলেছিল, 'লোকে যে আমাকে দিবারাত্রি উদ্ব্যস্ত করে তুলেচে—সু—। বন্ধুদের তামাসার জ্বালায় গেলুম। তারা বলে, তুমি কি তোমার প্রিয়ার টয়লেট্ টেবিলে ভাগ বসিয়েচ না কিহে? নয় ত দিন দিন এত সুন্দর হতে লেগেচ কী করে?' এ কথার উত্তর ওদের কাছেই দিয়ে দেবার লোভ হচ্ছিল বটে এক একবার। কিন্তু সে উত্তর রেখেচি জমিয়ে, যেই সন্ধ্যেটি সুরু হবে, তোমার কাণে কাণে বল্‌ব বলে। আমি কেন এত সুন্দর হয়েচি জান—সু? এত সুন্দর, যে কখনো কখনো আমার নিজেকে দেখে নিজেরই মোহ আসে! তোমার প্রেমই আমাকে সুন্দর করেচে।' নীরেনের মুখের দিকে চেয়ে, সেই অর্দ্ধেক ভুলে যাওয়া কথাটা আবার সুজাতার মনে ঘা দিলে। নীরেন দেখতে কী সুন্দর হয়েচে! ওর মুখের প্রত্যেকটি রেখা আরও সুকুমার আরও ঢের সেন্‌সিটিভ্ (Sensitive) হয়েছে। কিন্তু এ কাকে আশ্রয় করে? খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বললে সুজাতা—: 'ডাই ভোর্সের মামলা আন্‌তে দেখে হয় ত আপনি মনে করেছেন, আমি মডার্ণ মেয়েদের প্রান্ত সীমায় পোঁছে গেছি। কিন্তু তা পারিনি নীরেনবাবু। তাই যে কোন কথার যে কারো কাছেই উত্তর দিতে হবে, এমন কথা আমি মনে করিনে। 'আজও যে কোন প্রসঙ্গ নিয়ে অবাধে love's subtle psychology চর্চ্চা কর্‌তে আমার বাধে। কথায় কথায় ইডিপাস্ কম্‌প্লেক্স নিয়ে মাথা ঘামাতে সঙ্কোচে মাথা কাটা যায়।'

'মানলুম, আপনি খুবই মহীয়সী মেয়ে। কিন্তু আমি যে, 'যে কেউ নই' তা আপনিও জানেন এবং আমি ও জানি। আপনার কথা যে কেউ তুলে উঠানোর চেয়ে আমার কাছে ঢের ঢের বড়, তাও আপনি নিশ্চিত জানেন। অতএব আমার আচরণের জন্যে আমি কিছুতেই ক্ষমা চাইব না।'

এবারে সুজাতা হেসে ফেলে বললে—: 'বেশ নাই চাইলেন। কিন্তু কেবল আমার কথা ভাবচেন কেন? আর নিজের কথা ভাব্‌চেন কেন? মনের মধ্যে তলিয়ে দেখুন ত সেখানে কি আর কারুকে সুখী কর্‌বার জন্যে আপনার একটা প্রকাণ্ড দায়িত্ব নেই? তাকে লেশমাত্র অসুখী করা কি আপনার উচিত?'

'আপনি জানেন, আপনার মুখ থেকে ওসব বড় লেক্‌চার—উচিত, অনুচিত বোধের জন্যে বড় সার্‌মন্ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারিনে। তবুও বলবেন ওই সব? ছি, ছি, আপনার এ স্বভাব কী কিছুতেই যাবে না! টল্‌স্টয়ের শেষ জীবনটা কেটেছিল, আর্টের মধুর ক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়ে, মরালিটির ভালো ভালো সার্‌মন্ শুনিয়ে। আপনার ও দেখ্‌চি, যত কথাবার্ত্তা শেষের দিকে এসে তারা ঠেক্‌বেই সেই একই বক্তৃতায়। এ অভ্যেস কি আপনার কিছুতেই যাবে না? তা ছাড়া যখন ভালো করে জানেন—: আপনার মুখ থেকেই বিশেষ করে এ জিনিষ আমি কিছুতেই বরদাস্ত কর্‌তে পারি নে।'

সুজাতা হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করলে; 'কেন আমার অপরাধ?' 'টলস্টয়ের ও যা অপরাধ ছিলো।'

'আমাকে যা বললেন বলুন—কিন্তু টলস্টয়কে নিয়ে টানাটানি কর্‌চেন কেন? ওঁর মত মহামানব.........'

'বাঃ, মহামানব বলেই ছেড়ে কথা কইব নাকি? যিনি এক সময়ে লিখেছিলেন, 'অ্যানা ক্যারেনিনার মত' উপন্যাস। যিনি একদিন লিখ্‌তে পেরেছিলেন 'আইভান্ ইলিচের মৃত্যুর মত গল্প; তিনিই হতে গেলেন মরালিস্ট! Oh Shame! জগতে কি আর মরালিস্ট হবার হত লোক ফুরিয়ে গিয়েছিল? আর কি কেউ ছিল না? মহাত্মা গান্ধী হতে পারেন মরালিস্ট, ওঁকে আমরা সহ্য কর্‌ব। ওঁর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মিষ্টি কথা, প্রশান্ত পবিত্র আধ্যাত্মিকতাময় গদ্‌গদ কথা আমরা কষে শুন্‌বো। কিন্তু টলস্টয়ের কাছ থেকে! কক্ষণো না।''

সুজাতা হেসে বল্‌লেঃ—'বেশ ওঁর বিরুদ্ধে আপত্তি শুন্‌লুম কিন্তু আমার বেলায় আপত্তির ধারাটা কোনদিকে?'

'কী নাছোড়বন্দা আপনি! বল্‌লুম ত ওই একই কারণে তবুও যদি শুন্‌তে চা'ন বেশ আমি পরিষ্কার করে বল্‌চি। আপনার মত করে ভালোবাসতে ক'টা মেয়েতে পারে? এত ঐশ্বর্য্য কার? যে পারে, তার কাছে ওসব লেক্‌চার শোনা অসম্ভব।'

'অসমসাহসিকতার মাত্রা এত চড়াবেন না, নীরেনবাবু!'

'বাঃ, আমি কি করব! আপনি শুন্‌তে চাইলেন কেন? আপনি নিজেই ত নাছোড়বন্দা কিছুতেই না শুনে ছাড়্‌লেন না।' দু'জনের দিকে তাকিয়ে দু'জনেই হেসে ফেল্‌ল। নীরেন বল্‌লেঃ 'এবার ত'হলে উঠি। আপনাকে যথেষ্ট ত্যক্ত করেচি।'

'তা,ত উঠ্‌বেনই! আমার অনেক কিছুই সহ্য কর্‌তে পারেন না জানি, কিন্তু আমার হাতের তৈরী এক পেয়ালা চা'ও কি সহ্য করতে পারবেন না? উঠে পালাবেন না কিন্তু, আমি এই এলুম বলে।......আর......আর দোহাই আপনাকে, খাবার সময়ে দয়া করে তর্ক করবেন না। তা যদি করেন তা'হলে আমি আগের থেকেই হার মেনে ওঘরে চলে যাব।'

২০

সুধীরার ধরণ ধারণ থেকে ক্রমশঃ বোঝা যাচ্ছে যে হাল্কা মেঘ নয়। নীরেনের সঙ্গে ওর বিশেষ একটা কিছু হয়েচে সে হওয়ার মাত্রাটা এতোদূর, যে হয়ত ওদের দু'জনের জীবন মিল্‌বার কাছাকাছি বিন্দুতে এসেও আবার সরে যাবে। ঠেক্‌বে না। তারপরে কে কোন দিকে হারিয়ে যাবে। কিন্তু এই হারিয়ে যাবার ভয়ে নীরেন যেন একটুকু উদ্বিগ্ন নয়। ও যেন কী আবেশময় তন্দ্রার মধ্যে দিয়ে চলেচে। হাতের কাছের, ঘরের কাছের, এই সব ছোটখাট কথা, ছোটখাট আত্মনিবেদন, তুচ্ছ অভিমান রাগ—কিছুই ওর চোখে পড়্‌বে না।

কেন পড়বে না। তার কারণটাকে স্থির মর্ম্মভেদী দৃষ্টিতে চোখাচোখি দেখতে পারে এত মনের জোর সুধীরার নেই। ও কেবল পালিয়ে বেরাচ্ছে। অবশ্য বাইরে ও এমন ভাব দেখাচ্চে যেন তারও এতে কিছুই যায় আসে না। অনায়াসে, অবলীলাক্রমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফাইন্ প্লে সহ্য করছে। এতে তার আর আমোদ বই আর কিছু নয়। খেলায় কে কবে রাগ করে থাকে! কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে তাকে সমস্ত শক্তি একত্র করে কান্না চাপতে হচ্ছে, সে কথা ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ হয়ে পড়বে।

নীরেনের বন্ধুদের কাছেও কথাটা ক্রমশঃ স্পষ্টরূপে নিচ্চে। একদিন নীপেশ এসে ওকে ধরে পড়লে 'আমার ছুটি ফুরিয়েচে, ও সপ্তাহে ঢাকা যাচ্ছি। চলনা আমার সঙ্গে? বস্তুতঃ এবারে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব বলেই সংকল্প করেচি। কিছুতেই ছাড়ব না, কতবারই ত বলো যাব। অথচ সত্যিকরে যাওয়া একবারও ঘটে ওঠে না।'

নীরেন একটু বিস্মিত একটু বিরক্ত হয়ে বললে, 'এখন আমার হাতে বিশেষ জরুরি গোটা কতক কাজ আছে। তাই আমাকে মাপ করতে হবে, এখন কিছুতেই কলকাতা ছাড়তে পারব না। তবে তোমার আন্তরিক নিমন্ত্রণ আমার মনে থাকবে বই কি।' সময় এবং সুবিধে করে উঠতে পারলেই যাব।'

নীপেশ যে উদ্দেশ্য নিয়ে কথাটা পেড়েছিল তা সফল হোলনা। তবে সে যে তাতে মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হয়েছে এমন বোধ হয় না। কিছুদিন পূর্ব্বে সন্ধ্যাতে সুধীরাদের বাড়ী বেড়াতে যেয়ে ওর সঙ্গে নীপেশের নানা কথা হয়েছিল। সুধীরার মনটা প্রত্যাঘাত বেদনায় এমন উপ্চে পড়া গোচের হয়ে ছিল, যে এতটুকু সহানুভূতির হাওয়া বইলেই তা ঝরে পড়বে। নীপেশের কাছে করুণ সমবেদনার আভাস পেয়ে ও অনেক কথাই খুলে বলে ফেল্‌লে।

নীপেশ আশ্বাস দিয়ে বললে, 'কিছু ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনার প্রভাব যার মনে একবার পড়েচে, সে কি তা মুছে ফেলতে পারে? কখনো নয় এ দাগ কি মোছা যায়! অমন হয়ে থাকে। হাঁ, অমন সাময়িক চিত্তবিলোপের কারণ ঘটেই থাকে। তাই বলে কি মানতে হবে, আপনার মত চিত্তের একনিষ্ঠ সাধনার কোন দাম নেই?'

একটু থেকে গলার আওয়াজটা আরও উদাত্ত করে নিয়ে ও ফের বলতে লাগল, 'আপনাদের মত মেয়েরা যাদের নিষ্ঠা, সংযম ধৈর্য্য সকল দেশের মেয়েদের আদর্শস্থল—আপনাদের ঐকান্তিক তপস্যা কি কখনো বিফল হয়? আপনারাই ভারতবর্ষের গৌরবকে এতদিন জাগিয়ে রেখেচেন। আপনার মত মেয়েরাই ত এদেশের ট্রাডিশন।'

সুধীরা বেঁচে গেল। নীপেশের বাহবা ওকে বাঁচালে। নীরেনের ভালোবাসা হাতের মুঠোথেকে আলগা হয়ে গেল বলে তার তত্টা মর্ম্মান্তিক হয় নি; যতটা হয়েছিল সুজাতার সঙ্গে—প্রতিযোগিতায় হেরে গেল বলে। প্রথম দিন অলক্ষ্যেই যেদিন ওদের দ্বন্দ্ব সুরু হয়েছিল—ওরা

দু'জনে একত্র যেদিন বায়স্কোপ দেখতে গিয়েছিল, সেদিন সুজাতার অসম্ভব সৌন্দর্য্যের কাছে ও মনে মনে পরাজয় স্বীকার করচে। নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হয়েচে। সেদিন ওর গলার আধ-নকল সিরো পার্লের মালাটা আর হাতের অনাবশ্যক অতিরিক্ত আংটিগুলো, সুজাতার বিনা অলঙ্কারেরই রূপ দেখে আপনাদের লজ্জায় লুকোতে চেয়েছে—সেদিন থেকেই সুরু হয়েচে ওদের নিঃশব্দ অদৃশ্য প্রতিযোগিতা। মনে মনে, সৌন্দর্য্যে নিজেকে সুজাতার চেয়ে খাট বলে জান্‌লেও, সেদিন যদি নীরেন আগের মত বার কয়েক ওকে বলত, 'সুধীরা, তুমি আজকাল লাভ্‌লি হয়েচ দেখ্‌তে। যা পর তাতেই তোমাকে এমন মানিয়ে যায়।' তাহলে ও নিঃসন্দেহই মনে মনে বল পেত। পরাভবের লজ্জার মেঘ বেমালুম কেটে যেত। কিন্তু নীরেন সেদিন তা বলেনি। আর যত দিন যাচ্ছে—ওর তা বলা ততই কমে আসচে। ওর মুখের এন্‌কোর এন্‌কোর ধ্বনি ক্রমশঃই ক্ষীণ হয়ে আসচে। এমন কি ওর মুখ থেকে এখন বিপরীত বাণী বেশি শোনা যাচ্চে। এই ধরণের সব কথা 'সুধীরা, আমি তোমাকে যা বলে জানতুম, তুমি তা নও। তার চেয়ে অনেক ছোট অনেক হীন!' এই গোছের কথা সহ্য করা ওর পক্ষে সবচেয়ে কঠিন। এক এক ধরণের মেয়ে থাকে যাদের আপনার যোগ্যতায় উপরে আপনার ভর নেই। সংসারের নানা লোকের কাছে ওদের যে দাম ধরা পড়েচে সেইগুলো এক জায়গায় জড়োকরে গেঁথেই যেন ওরা নিজের দাম বুঝ্‌তে পারে। সুধীরার প্রকৃতি অনেকটা এই রকম। বাইরের হাওয়ায় যতক্ষণ এন্‌কোর এক্সেলেণ্ট্ বাজতে থাকে, ততক্ষণ ও থাকে ভালো। কিন্তু যেই উৎসাহ একটু ক্ষীণ হবার উপক্রম হয়, অমনি ওর মনটাও নিভে আসে।

আজ তাই নীপেশের প্রদীপ্ত প্রশংসা তাকে বাঁচালে। নীপেশের কথায় ও নিজেকে খুঁজে পেলে। ওর মন বল্‌লেঃ 'আমারও দাম আছে। যে মূঢ় তা বোঝে না, ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করুন।' কিন্তু ইতিমধ্যে মূল্য বোঝবার খরিদ্দার জুটে গেচে। এটাই আশার কথা। নীরেনের এন্‌কোর এন্‌কোর রব থেমে যাবার পরে কতদিনই ত ওর কেটে গেল—ঃ নিরবলম্ব বায়ু ভূত শূন্যে। প্রতিবাদ করা দূরে থাক, তখন যে ওর নিজেরই মন নিজেকে তীক্ষ্ণ সন্দেহ করতে লেগেছিল; 'তাই ত সত্যিই কি আমি ছোট। ওর চেয়ে ঢের ঢের নীচু। এমন—যে তুলনাই হয় না—এত নীচু। আপন মহিমা সম্বন্ধে এমনিতর সংশয় পোষণ করে যখন অনেক অশান্তিতেই ওর দিন কাটছিল; যখন কারো মুখ থেকে কোন নিঃসন্দিগ্ধ বাণী শোনবার জন্যে ও উৎসুক হয়ে ছিল; যখন ভক্তের আলোবিশ্বাসে মণ্ডিত স্তব গানের মত কোন স্তব গান নিজের সম্বন্ধে ওর না শুন্‌তে পারলেই চলছিল না, ঠিক সেই সময়েই নীপেশ ওকে বাঁচালে।

যে auto-suggestion এর অটো-সাজেস্‌চনের পুঁজি ওর পূর্ব্বতন ভক্তের উদাসীনতায় ক্ষয় হয়ে এসেছিল; নীপেশ ফুঁ দিয়ে দিয়ে তাকে আবার বাড়িয়ে দিলে।

সুধীরার মত একনিষ্ঠতা ভারতবর্ষের বহুযুগের তপস্যার ফল। ওর মত মেয়ে ভারতবর্ষের অনাদিকালের ট্রাডিশন। বাস্তবিক এত আন্তরিক স্তুতি নীরেনও ওকে কোনদিন শোনায় নি।. অনেকদিন পরে আবার ওর মুখখানি হাস্যপ্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল। তবুও চশ্‌মা মুছ্‌বার ছল করে একবার আঁচল দিয়ে দু'টি চক্ষু মার্জ্জন করে নিয়ে বল্‌লে—ঃ 'আপনাদেরই বন্ধু। আমার চেয়ে বোধ করি আপনারাই তাঁকে চিন্‌বেন বেশি। তবু বলতে ইচ্ছে করে—ঃ একনিষ্ঠতার তপস্যাটা কি এ যুগে কেবলই এক তরফা? মনে এক এক সময় সন্দেহও জাগে। তবুও আমি মানি। হাঁ, মনে প্রাণে মানি। এই বিজ্ঞানসর্ব্বস্ব যুগেও মান্‌বার স্পর্দ্ধা রাখি যে দুনিয়াতে soul-force বলে ও একটা বস্তু রয়েচে। আর তার জোরেই হয় ত একদিন তাঁকে আমার কাছে ফিরে আস্‌তে হবে।'

বল্‌তে বল্‌তে ও নিজেই অভিভূত হয়ে গেল। ওর মাথার আঁচল সন্ধ্যার বাতাসে বাতাসে খুলে পড়্‌ল। গ্রীবা উন্নসিত হয়ে রইল, সান্ধ্য আকাশের সমস্ত মহিমা ওর দোদুল্যমান কানের লাল দুল দুটিতে এসে মিশাল। নীপেশ মুগ্ধ হয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, আশ্চর্য্য ! আপনার মত মেয়ে জগতে একটা বিস্ময় আর তার চেয়েও আশ্চর্য্য, যারা একবার আপনার মত মেয়ের সংস্পর্শ পেয়েচে, তারাও আবার কী করে অন্য মেয়ের কাছে ছোটে।'

আমেরিকার হলিউডে বিশেষ বিশেষ চিত্র-অভিনয়ের সময় বিশেষ বিশেষ মনোবেগকে প্রকাশ করবার কালে, অঙ্গের ঐক্যতান বাজনায় আর এক ডিগ্রি লঙ্কামরিচের উগ্র প্রেরণা যেমনকরে ঠুসে দেয়, সুধীরা ওর প্রভাবটাকে আরও নিবিড়তম কর্‌তে আকাশের দিকে চেয়ে যেন কতকটা আত্মগত ভাবে বল্‌লে, 'আমাদের ইস্ট্‌ (East) চিরদিনই চরিত্রের পূজা করে এসেচে, আমাদের দেশে আধ্যাত্মিকতার শক্তি, soul-force চিরদিনই সব চেয়ে আগে পূজা দাবী করে এসেচে। আমাদের দেশে দেশনেতা হতে গেলে কেবল ম্যাকডোনাল্ডের মত বড় পলিটিসিয়ান হলেই চল্‌বে না, হতে হবে তাকে গান্ধীর মত আধ্যাত্মিকতায় শক্তিমান। নীরেশ গদগদ হয়ে সমর্থন কর্‌লে। 'আপনার মত করেই যদি সবাই ভাবতে পারত।' ওর মুখদিয়ে সপ্রশংস বিস্ময় বাহির হোল।

একটু করুণ সুরে সুধীরা আবার বল্‌লে, 'দেখুন মেয়েরা যতই শিক্ষা দীক্ষা পাক, তাদের চরিত্রের সঙ্গেই যে তাদের সারাজীবনটা জড়িয়ে রয়েচে। একথাটাত একদণ্ডের জন্যেও ভুল্‌তে পারিনে।'

নীপেশ উদ্দীপ্ত হয়ে বল্‌লে, 'ভুলতে যাবেন কোন দুঃখে? আর তাই যদি ভুল্‌বেন, আপনাদের মত মেয়েরাই যদি এটা ভুলে থাকবে তবে ভারতবর্ষ কাদের জোরে টিকে থাক্‌বে বলুনত? কাদের মহিমার চারণ-গীতি গেয়ে ভারতবর্ষের কবি ধন্য হবে?'

একসন্ধ্যের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছিল, তাই নীপেশ বিদায় গ্রহণ কর্‌লে। কেবল উঠে আস্‌বার সময় একটি আবেদন জানিয়ে গেল, 'আপনি যে স্নেহকরে বিশ্বস্ত ভাবে আপনার সবকথা আমাকে খুলে বল্‌লেন, কামনা করুণ যেন আমি তার যোগ্য হতে পারি।'

ক্রমশঃ

শোকার্ত্ত

শ্রীমমতা মিত্র

ডেকো না আমারে ডেকো না গো কেহ
রাখ অনুরোধ ক্ষীণ,
পরাণ ও ডাকে সাড়া নাহি দেয়,
চরণ শকতিহীন।
হৃদয় আমার হয়েছে শ্মশান,
সদা করে ধূ ধূ, নাহি নির্ব্বাণ,
ধ্বংস স্তূপের মাঝখানে বসে
কাটাই রাত্রি দিন।
ভয়াল রুদ্র করেছে ধ্বংস
ছিল যত প্রিয়জন,
হাহাকারে মোর ভরেছে বক্ষ,
শূন্য করেছে মন।
আঁখির আড়াল করি নাই যারে
কোথায় সে আজ ছাড়িয়া আমারে ?
পলক ফেলিতে গিয়েছে হারায়ে
অতুল স্নেহের ধন।
স্মরণ করিতে হিম হ'য়ে আসে
সারা দেহ মন মম,
দুর্দ্দিন এল সহসা নিকটে
করাল মৃত্যু সম।
কাঁপিল ধরণী টলমল করি,
নর নারী সবে কাঁপে থরথরি,
তাসের ঘরের মত গেল পড়ে'
কত বাড়ী মনোরম।
দিনের আলোয় নয়ন সমুখে
কত লোক দিল প্রাণ
প্রমোদ পুরীর নাহিক চিহ্ন,
গৌরব অবসান।

প্রলয়ের শেষে দেখিলাম চেয়ে
নাই প্রিয়া মোর, নাই ছেলে মেয়ে,
রুদ্রের হাতে এক সাথে সবে
করেছে জীবন দান
এইখানে তারা মুদেছে নয়ন
ধূলায় নিয়েছে ঠাঁই,
শেষ নিঃশ্বাস হেথা আছে মিশে
ধ্বনি তার আজো পাই।
ব্যাকুল তাদের বাঁচিবার আশা
করুণ কণ্ঠে পেয়েছিল ভাষা,
সে সকল স্বর স্তব্ধ হ'য়েছে
কোথাও আজিকে নাই।
কণ্ঠ তাদের বাণীহারা হায়
নীরব সকল স্থানে,
ছিল এক দিন সাধভরা প্রাণ
আজি কেহ নাহি জানে।
শুধু বুকের অন্তর মাঝে
নিরবধি সেই স্বরগুলি বাজে
কাতর দৃষ্টি মেলি কত আঁখি
চায় যেন মোর পানে।
তাই আমি আছি বসিয়া হেথায়
আপন জনের কাছে,
অনিমেষ চোখে দেখি চেয়ে চেয়ে
কে আমার কোথা আছে।
এই ভাবে মোর দিন চলে যায়,
ধীরে মৃদু পায়ে রজনী ঘনায়,
আহার নাহিক, নিদ্রা ভুলেছি,
নাহি চাহি আগে পাছে।

ডেকো না আমারে কেহ ডাকিয়ো না,
যেতে ত পারি না আমি,
জীবন আমার এইখানে এসে
সহসা গেছে যে থামি।
প্রাণের দোসর স্নেহের পুতলি
ফেলিয়া হেথায় কোথা যাব চলি ?
জীর্ণ পাঁজর গুঁড়া করে দেয়
আকুল অশ্রু নামি।

বিহার ভূমিকম্পের একটি সত্যঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

সুরের মায়া

শ্রীপুষ্পময়ী বসু

উষা সবে মাত্র দেখা দিয়েছে রাতের ছায়া তখনও কাটেনি।

সন্ন্যাসী মাঠের পথে চলে—অকলুষ মুখখানি এক স্বর্গীয় দীপ্তিতে মণ্ডিত।

.........পাতার আড়ালে দোয়েল প্রভাতী গান্ গেয়ে ওঠে। সন্ন্যাসী থমকে দাঁড়ায় নির্ব্বাক বিস্ময়ে—কোন্ দেবলোক হ'তে এ সুধাস্রোত ঝরে পড়ে ? সর্ব্বত্যাগী হয়ে, ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে শুষ্ক শাস্ত্রের মীমাংসায় ওর দিন গিয়েছে। পৃথিবী যে রূপ, রস, গন্ধের অজস্র আয়োজন নিয়ে ওর সাম্‌নে লুটায় তার সন্ধান রাখার অবকাশ ওর শাস্ত্রচর্চ্চার ফাঁকে মেলেনি এতদিন।

............ধীরে ধীরে ওর সমস্ত চেতনা লীন হয়ে যায় দোয়েলের গানে। মিলিয়ে যায় ওর পায়ের তলার কঠিন মাটী, ওর অতীত, ওর ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ওর শাস্ত্র-মীমাংসা। সুরের মায়া ওকে ঘিরে অমৃতলোকের সৃষ্টি করে তোলে।

কখন কথা থেমে যায়। ওর চেতনা ফিরে আসে—আশ্রমের দিকে পা বাড়ায়। কিন্তু অবাক্ হয়ে যায় অপরিচিত দ্বাররক্ষক যখন এসে ওর পরিচয় সুধায় ; অন্য সন্ন্যাসীরাও আসে—তেমনি অপরিচিত। ও নিজের নাম বলে—কিন্তু এ নাম তারা কখনও শুনেছে বলে তাদের মনে হয় না।

তারপর নিরুপায় হয়ে আশ্রমের খাতাখানার পৃষ্ঠা ওল্টান হয়। একের পর এক পৃষ্ঠা উল্টে চলে নিষ্ফল প্রয়াসে। অবশেষে একশত বৎসরের পুরোনো পৃষ্ঠায় সত্যানন্দ সন্ন্যাসীর নাম দেখা যায়। কেউ বুঝ্‌তে পারে না—।

ক্ষুদ্র পাখীটীর গান ওর বিপুল কালকেও হরণ করে নিয়েছিল।

(J. M. Barrier "while he listened to the Lark" হইতে)
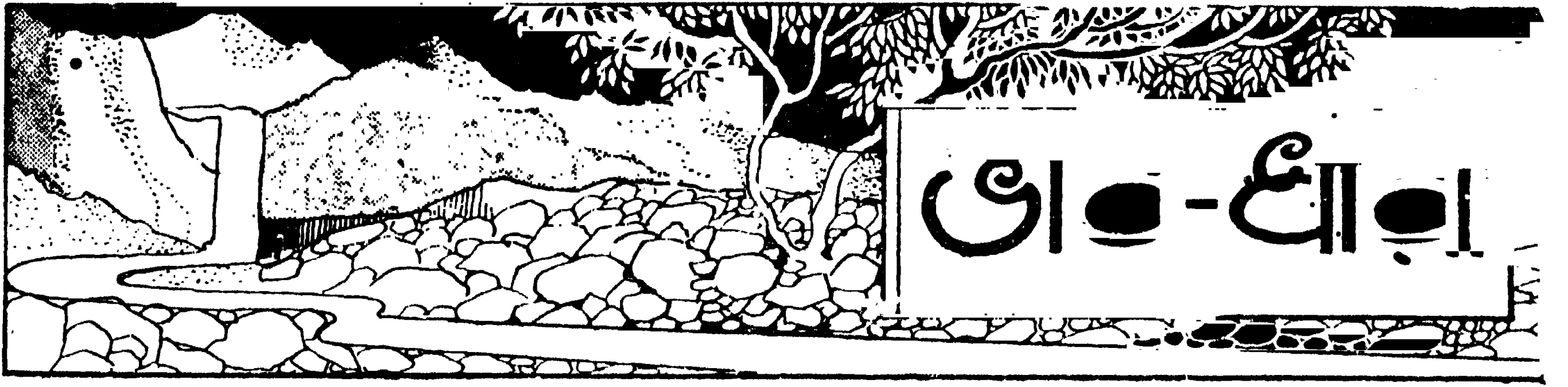
সমাজ-তন্ত্রে কার্ল মার্কস্

শ্রীহর্ষনাথ ঘোষ

সমাজ-তান্ত্রিক ভাবধারায় সারা ইতিহাস জুড়ে কার্ল মার্ক্স্ এমন একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন যে এতে তাঁর খ্যাতি অতুলনীয়। Machiavelli ও Rousseau ছাড়া আর কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি এমন ক্ষমাহীন নিন্দার পাত্র হন নি; আর Rousseauর মতই কার্ল মার্কস্ মৃত্যুর পর তাঁরই চিন্তাধারায় প্রবর্ত্তিত, তাঁর নামে পরিচালিত এক বিরাট বিপ্লবের অধিনায়ক হ'তে পেরেছেন। একদল লোকের কাছে মার্কস্ এর লেখা বইগুলো এমন নিবিড় গবেষণার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন বাইবেল ও ডিজেস্ট (Digest), এসব সত্ত্বে ও যে কারণে সমাজ-তন্ত্রীদের মধ্যে আজ এক বিশিষ্ট স্থান তিনি অধিকার ক'রে আছেন, তা' মূলতঃ বিশেষ জটিলতায় পূর্ণ। তাঁর অর্থনৈতিক মতবাদ তদ্ পূর্ব্ববর্ত্তী একদল ইংরেজের অনুসৃত মতবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তবতার চোখ দিয়ে মানুষের ইতিহাসকে বিচার ক'রে স্পষ্ট বুঝ্তে —Harrington ও James ও Radison এর মত লেখক মার্ক্স্ এর চেয়ে কোন ক্রমে কম ছিলেন না। মার্ক্স্ এর শ্রেণী-বিদ্বেষের কথা Saint Simon আগেই চিন্তা ক'রে গেছেন। এমন কি মার্ক্স্ এর কৃষক ও মজুরদের ব্যর্থ জীবনের নীরব আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি ও Charles Hall, Owen. John stuart mill এর চেয়ে গভীরতর ছিল না।

ঐতিহাসিক ঘটনা সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে বিচার না কর্লে সমাজ-তন্ত্রের (Socialism) অনুষ্ঠানে মার্ক্স্ এর স্থান কোথায় ঠিক উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। দুইটী বিপ্লবের মাঝামাঝি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; তাই ফরাসী-বিপ্লবের সেই মাত্রাহীন অত্যাচারের দৃশ্য থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি নিজ মতবাদের ভিত্তি স্থাপন কর্তে পেরেছিলেন। আদর্শবাদী হেগেলের শিষ্য তিনি—তিনিই প্রথম তাঁর গুরুর প্রভাব হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন এবং তাঁরই দার্শনিক মন্ত্র সামাজিক সমস্যার বিশ্লেষণে প্রয়োগ করেছেন। যে অবলম্বনে তিনি তার মতবাদ প্রচার করেছিলেন তা' ও কম উল্লেখযোগ্য নয়। যখন ধনবাদের (Capitalism) পূর্ণস্বরূপ লোকচক্ষুর অগোচর রহিল না, এমনি সময়ে লেখনি ধারণ ক'রে, তিনি ধনবাদের অর্থনৈতিক ভয়াবহ রূপকে অন্যায় ও

ধর্ম্মবিরুদ্ধতার প্রমাণ ব'লে প্রচার করেন। তাঁর এই প্রমাণ লোকের কাছে যথেষ্ট বলে মনে হয়েছিল; এবং সামাজিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটী নূতন শাসন-তন্ত্রের স্বপ্ন, তৎকালীন জনসাধারণের সশঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন চিত্তের কাছে অবশ্যম্ভাবী এবং অনুকূলই হয়েছিল।

হিগেলের মতবাদ নিয়ে আন্দোলনের ফলে দার্শনিক রক্ষণশীলতাকে নূতন ক'রে অনুমোদন করা হয়েছিল। বৈপ্লবিক যুদ্ধ সমূহের সংঘাতে হিগেলের মন স্থায়ী শাসন-বিধি সমর্থনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। এ দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে, হিগেল ছিলেন আকস্মিক পরিবর্ত্তন পন্থী যারা—তাদের বিরোধী; সুতরাং এ থেকেই বার্ক (Burk) ও savignyর সহিত তাঁর সম্বন্ধ স্পষ্ট হ'য়ে উঠে। কিন্তু হিগেলের মতবাদের মূল—তাঁর ক্রম-বিকাশের (Evotution) আদর্শ। তাই, যে যুগে চিরস্থায়ী সামাজিক মূল-বিধি প্রযোজনে সবাই ব্যগ্র,—তখন হিগেলের মতবাদ মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিবর্ত্তনশীলতাকেই সমর্থন ক'রে থাকে। তাঁর মতে, সব যুগই পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যা' ছিল মানব-প্রকৃতির বিশেষ লক্ষণ, এ যুগে তাঁর বিরুদ্ধ ভাবের উৎকট প্রবণতাই বড় হ'য়ে দেখা দেয়। প্রবল ধর্ম্ম-প্রবণতার পর, পরবর্ত্তী যুগে আসে ধর্ম্মের প্রতি মানুষের নিদারুণ ঔদাস্য। অসঙ্গতির বিরুদ্ধে যুদ্ধই জীবনের বিধি; ফলে হয় নূতনের জন্ম। হিগেলের মতে তাঁর এ দার্শনিক নিয়ম, গানের ছন্দের মত; কঠিন কোন কোন সংস্কারের আঘাতে স্বাভাবিক পথে যেতে না পেরে বিভক্ত হয়ে বিভক্ত পথে চলে যায়। তারপর অতি স্বাভাবিক সংযোজনার পথে চলে এসে নূতন চিন্তা ও ভাবধারার সৃষ্টি করে।

দার্শনিক হিগেলের এই যে পরিবর্ত্তনের রীতি, মার্কস্ এর মতবাদে একেই বড় ক'রে মেনে নেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ ইহা দ্বারা, যে কোন প্রচলিত সামাজিক বিধিকে মূলগত ভাবে নিন্দা করা যেতে পারে। কারণ যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় যে, কোন নির্দ্দিষ্ট যুগের ভাবধারা শুধু সাময়িক ভাবে সত্য, তা'হলে সেই ভাবধারার পরিপন্থী সমস্যা ও লোকে বড় করে প্রচার কর্‌লেই নূতনের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, হিগেলের মতবাদ হয়ত প্রুসিয়া (Prussia) সরকারের নীতি পরায়ণতার সমর্থন করে; কিন্তু ঐ মতবাদের জোরেই আবার তরুণ জার্ম্মাণি তার প্রজা-স্বাধীনতার পথে বাধার বিরুদ্ধে দারুণ প্রতিবাদ কর্‌তে পারে। হিগেলের মতবাদ যেখানে, বংশ পদমর্য্যাদার সমর্থন করে গেছে, তরুণ জার্ম্মানি ও সেখানে দরিদ্র জন-সাধারণের জীবনের নির্ম্মম ব্যর্থতার ইতিহাসের কথা তুল্‌তে পারে। এই মতবাদ যেখানে ধর্ম্মের মূল্য খুব বড় ক'রে দেখিয়েছে—নবযুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সেখানে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ভিত্তির প্রতিই অনেক সন্দেহের কথা বল্‌তে পারেন। প্রকৃত পক্ষে হিগেলের শিষ্যগণ তাঁরই মতবাদ দ্বারা হিগেলের নিষিদ্ধ পথে সিদ্ধ হ'তে চেয়েছেন। Stranss, Fenerlech, Bruno Baner ও Heine—এরা মূলতঃ একই সাধারণ চিন্তা ধারার অনুগামী; মার্ক্‌স্ এর সঙ্গে এদের প্রভেদ এই যে এদের এই নবতর চিন্তার সামাজিক ব্যবহারের রূপ মার্ক্‌স্ ছাড়া আর কেউ পান নি। মার্ক্‌স্ এর চ'খে প্রথম

থেকেই তা ধরা পড়েছিল। হিগেলের দার্শনিক তত্ত্ব তাঁর হাতে প'ড়ে, প্রচলিত সামাজিক বিধির মুলোচ্ছেদের প্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলেছিল।

বাস্তবিক পক্ষে, ঐ সময়টাই, ঐরূপ ভাবধারার বিশেষ অনুকূল ছিল; এবং তার নায়ক হয়েছিলেন মার্ক্‌স্‌। পর পর দুইটী বিপ্লবের কালো ছায়া বিরাট দৈত্যের মত সারা ইয়োরোপ জুড়ে বসে ছিল। বিপ্লব দমনের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও আবার যে কোন সময়ে, অন্ততঃ কিছু কালের জন্য ও বিপ্লব জেগে উঠ্‌তে পারে এমন সুযোগ বর্ত্তমান ছিল। জন-সাধারণের মন সততই ছিল বিরস ও বিপন্ন। ইয়োরোপের সর্ব্বত্র, প্রচলিত শাসন পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা হচ্ছিল। ফ্রান্সে Saint Simon, Fourier, Eufantin—এরা দেখিয়েছেন বিপ্লব কিরূপ নব-ফল-প্রসূ হয়েছিল। এই বিপ্লবের প্রভাব Sismondia উদারনৈতিক আন্দোলন Lamennais এর ক্যাথলিক এক্‌স্‌পেরিমেণ্টে ও কম প্রভাব বিস্তার করে নি। ইংলণ্ডে ও ভেতরে ভেতরে এ আন্দোলনের সাড়া, বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে পড়েছিল, যদিও তা' বাহিরে প্রকাশিত হয়ে উঠেনি। অতঃপর সেখানে Menthem উঠে দাঁড়ালেন এবং তারই তীব্র প্রতিবাদের তাড়নায় ইংরেজ-প্রতিষ্ঠান সমূহ মধ্যবিত্ত রাজসরকারের হাতে এসে পড়্‌ল। Feudalism এর ধ্বংসাবশেষ অবশেষে Ricardo এবং তার মতবাদীদের আক্রমণের কাছে পরাজয় মেনে নিল। নবাগত যান্ত্রিকতা, যদিও একে বিজ্ঞলোকেরা Calvir এর ভয়ঙ্কর মতবাদের শুধু, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তিত আকার বলেই মনে করে নেন, তথাপি ইহাই সেদিন সামাজিক জীবনের ধারাকে সম্পুর্ণরূপে বদ্‌লাইয়া দিতে সমর্থ হয়েছিল।

একথা সত্য, বিনা বাধায় বিপ্লবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি। ১৮০৫ খৃঃ ও এই নূতন সভ্যতার বিরুদ্ধে Charles Hall একটী উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ করে গেছেন, এবং ঐ অর্দ্ধবিস্মৃত অর্থনীতিশাস্ত্রবিশারদগণ যারা Bentham এর ব্যক্তিত্ববাদ ও Queen এর "সহযোগিতা"র মধ্যে ও সম্বন্ধস্থাপন কর্‌তে চায়, তারা সামাজিক ন্যায়রক্ষার নাম করে একটা নূতন বাঁধা টেনে আন্‌বার চেষ্টা করেছিল। জন-সাধারণ ১৮৩২ খৃঃ Reform Act কে বৃহত্তর জনসমূহের একান্ত মঙ্গলের কারণ বলে মনে করেছিল। তাদের অসন্তোষ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল, বণিকসঙ্ঘের (trade union) বৈপ্লবিক কার্য্যাবলীর মধ্যে এবং chartist আন্দোলনের গঠনকার্য্যে। William thompson এবং J. F. Braya মত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, Francis place এবং William Lovett এর মত উদার আন্দোলনকারী—এরা ও Lancashire ও yorkshire এর বৃহৎ বণিক ও মেসিনের ন্যায় নূতন ধনবাদ প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ পরিচয় দিয়ে থাকেন।

অতঃপর Industrial revolution সমস্ত লোককে অসহনীয় নিরাশার অন্ধকারে চুর্ণ বিচুর্ণ করে দিল এবং ধ্বংসের স্বপ্নই হল তখন, এই ধনিক সভ্যতার করাল কবলে যারা পড়েছিল তাদের একমাত্র ভরসাস্থল। এই ধ্বংসের স্বপ্নগুলো অবলম্বন করেই কাল মার্ক্‌স্‌ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন; তারাই মার্ক্‌স্‌কে তাঁর সামাজিক দর্শন (Social philosophy) প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা করে দিয়েছিল।

Harold. J. Laskyর প্রবন্ধ অবলম্বনে (ক্রমশঃ)

মার্শল হনিস্থইট

শ্রীআমোদিনী ঘোষ

নিশ্চিন্ত হলুম শুনে।

মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি, থেকে থেকে বৃষ্টি পড়্‌ছে ; চারিদিক অন্ধকার। ভাব্‌লুম ভালই হোল, এতে ওদের চোখে আমরা সহজেই ধূলো দিতে পার্ব্ব।

প্রত্যেক দিকে দু'শ হাত তফাতে তফাতে আমার চরদের দাঁড় করিয়ে দিলুম, পাছে হঠাৎ কেউ আমাদের মধ্যেও এসে পড়ে আর মঠে গিয়ে সেই সংবাদ পৌঁছে দেয়!

আউ্ডিন আর প্যাপিলেটের রইল পালাক্রমে পাহারা দেওয়ার কথা, আর সবাই মস্ত একটা কাঠের গোলাবাড়ীতে আশ্রয় নিল। বন্দোবস্ত যা করার তা সব ঠিকঠাক্ মত হয়েছে দেখে আমি গিয়ে সরাইতে আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শুয়ে পড়্‌লুম, এবং শীঘ্রই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে গেলুম।

সাহসিকতা যে সৈনিকের অত্যাজ্য গুণ তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু এছাড়া তার আরো একটা গুণ তুল্যরূপেই অত্যাজ্য—সেটা হচ্ছে তার সতর্ক নিদ্রা কিন্তু আমার শৈশব থেকে আমার ঘুম ছিল এত ভারী যে একবার নিদ্রাগত হ'লে আমায় জাগাতে পার্ত্ত না। আমার এই দোষেই ঘট্‌ল আমার সর্ব্বনাশ।

মাঝরাতে হঠাৎ আমার বোধ হোল যেন আমার শ্বাসরোধ ঘটেছে। ডাক্‌তে চেষ্টা কর্লুম কাউকে, কিন্তু মনে হোল কিসে যেন আমার মুখ বাঁধা—একটু শব্দ ও মুখদ্বারা নির্গত হোল না। চেষ্টা কর্লুম উঠে বস্‌তে—তাতেও আমি অপারগ হ'লুম। চমক্ দিয়ে ঘুম ছুটে গেল। দেখি খাটের সঙ্গে অস্টেপৃষ্ঠে আমি বাঁধা—হাতে, কব্জায়, বুকে, কোম্‌রে, পায়, হাঁটুতে সব দিকেই বাঁধ! খোলা শুধু চোখ দুটো। আর আমার পায়ের দিকে ল্যাম্পের তলায় দাঁড়িয়ে কথা কইছে সেই সরাইওয়ালা আর সেই মোহান্ত!

এই সরাইওয়ালাকে আগের দিন সন্ধ্যাবেলা প্রথম যখন দেখি—তখন মনে হয়েছিল, লোকটা নির্ব্বোধের একশেষ। কিন্তু অবাক্ হয়ে আমি এখন দেখ্‌লাম ওর সমস্ত মুখে শঠতা ও জঘন্য পাশবিকতা এমন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, যে আমার জীবনে তা আমি দেখিনি। লোকটার হাতে একটা ছোরা, তাতে কোনো ঔজ্জ্বল্য নেই।

মোহন্তের চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। মর্য্যাদাময় বৈশিষ্ট্যের ছাপমারা তার সর্ব্বাঙ্গে। অর্দ্ধেক খুলে ফেলা আলখোল্লার নীচে পর্টুগীজ সেনাপতির সামরিক সজ্জা প্রকাশমান।

আমার চোখে চোখ পড়ায় তিনি খাটের কাঠের রেলিংএর ওপর ঝুঁকে নীরবে হাস্য করিলেন। ফরাসী ভাষায় বল্লেন শেষে—"আমার হাসিটা মাপ কর্ব্বেন—কর্ণেল

জেরার্ড, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে আপনার মুখে যে ভাবটি ফুটে উঠ্‌ল, তাহাতে আমার কৌতুক বোধটা সম্বরণ করা সহজ হোল না। যোদ্ধা আপনি বেশ চমৎকার, এ আমি স্বীকার কচ্ছি, কিন্তু বুদ্ধিকৌশলে মার্শল হনিস্যুইটকে পরাস্ত করার মত লোক আপনি নন। আপনি ধরে নিয়েছেন, আমি লোকটি অতি বুদ্ধিহীন, কিন্তু তাতে আপনার নিজের বুদ্ধির অভাবটাই শুধু প্রকাশ পেয়েছে। সত্য কথা বল্‌তে কি, যে কাজ হাঁসিল কর্‌তে আপনি এসেছেন, আপনাদের দলের মোটাবুদ্ধি ঐ ইংরাজ সেনাপতিটি ছাড়া আপনাদের দলের আর কারুরই ও রকম গুরুতর কাজ নির্ব্বাহ কর্ব্বার যোগ্যতাই নেই।"

এই অতি তিক্ত এবং অসহনীয় কথাগুলি তিনি বল্লেন—অতি মিষ্ট মধুর স্বরে। বুঝলুম নামটি ওঁর যথা যোগ্যই বটে।

নিরুত্তরে রইলুম। কিন্তু তপ্ত ধাতু স্রাবের মত স্ফুটিত আমার মনোভাব আমার দৃষ্টির ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ যে কর্ল্লে তা নিশ্চিত। কেননা যে লোকটা আমাদের কাছে হোটেলওয়ালা বলে পরিচয় দিয়েছিল, সে উঠে মার্শলের কাণে কাণে কিছু বলায় মার্শল বলে উঠ্‌ল, 'না হে চেনিয়ার, না, এ লোকটাকে জীবিত রাখ্‌লেই এর দাম হবে বেশী।'

তারপর আমার দিকে ফিরে বল্ল, 'দেখুন কর্ণেল, ভাগ্যিস্‌ ঘুমটি আপনার গভীর হওয়ায় আপনি কোনো গোল কর্ত্তে পারেন নি নইলে আমার এই বন্ধুবর এতক্ষণে আপনার গলা কেটে সাবাড় করে দিত। আমি আপনাকে একটা সৎপরামর্শ দিচ্ছি এই যে, এই ব্যক্তির সুনজরে থাক্‌বার চেষ্টাটা আপনি কর্ব্বেন। ইম্পিরীয়াল লাইট্‌ ইন্‌ফ্যান্‌ট্রির এই সার্জ্জেণ্ট চেনিয়ার আমার চেয়ে ও ভয়ানক লোক আপনাকে বলে দিলুম।'

চেনিয়ার তার ছোরাখানা আমার মুখের কাছে নেড়ে আকর্ণ বিস্তৃত হাস্য কল্লে। সম্রাটের একজন পদস্থ সৈনিকের এ রকম জঘন্য হীন বৃত্তিকতায় আমার মন যে অশ্রদ্ধা ও বিতৃষ্ণায় ভরে উঠ্‌ল, তা আমি ওদের কাছে প্রকাশ কর্ত্তে বিন্দুমাত্র ও কুণ্ঠিত হলুম না।

মার্শল তার সেই মিষ্টি গলায় বল্লে, 'একটা কৌতুকের কথা আপনাকে আমি বল্‌ব। আপনাদের দুজনারই এ অভিযানের সংবাদ আমরা সুরু থেকে বরাবর সব জানতুম। চেনিয়ার আর আমি চাল যে চেলেছি চমৎকার—তা আপনার স্বীকার কর্ত্তেই হ'বে। আমাদের এই মঠ দুর্গে আপনাদের একশ জনকেই অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলুম। ঢুকেই যে আঙ্গিনাটায় সকলে দাঁড়াতেন, তার চারিদিক ঘিরে কামানের সারি বসানো—কাজেই ওখান থেকে কেউ আর অমনি ফির্ত্তেন না। হয় মৃত্যু নয় আমাদের হাতে আত্ম-সমর্পণ আমি আশা করি আপনার বন্ধু যে পঞ্চাশ জন সৈন্য নিয়ে ওখানে ঢুকেছেন, তিনি বিজ্ঞের মত শেষোক্ত পন্থাই অবলম্বন করেছেন, একবার ওঁদের দেখ্‌তে আপনার ইচ্ছে কচ্ছে নিশ্চয়ই। একবার তার মুখখানি আপনাকে দেখিয়ে আনি।

ওরা তখন পরস্পরের সঙ্গে ফিস্‌ফিসানি সুরু কল্লে, শেষটা মার্শল বল্লেন, গোলাবাড়ীর পেছন দিকটা সব পরিষ্কার আছে কি না আমার দেখে নিতেই হবে। ইনি যদি কোনো গণ্ডগোল করেন, তা হ'লে যা কর্ত্তে হবে তা ত তুমি জানই।"

মার্শল চলে গেল। ঘরে রইলুম আমি আর সেই বিশ্বাসঘাতক খুনী লোকটা।

বিছানার একধারে বসে সে তার বুটের তলায় শান দিতে লাগ্‌ল। এই দেয়ালের ওপিঠে আমার খুব সন্নিকটেই আমার পঞ্চাশ জন বীর যুবক অবস্থান কচ্ছে, তবু আমার বিপদের কথা তাদের জানাবার সাধ্য মাত্র নেই। আর এ ঘটনা আমার নিজের দোষেই। আমার দুঃখের না আছে কোনো সান্ত্বনা, না আছে কোনো পরিমাণ!

শত্রু হস্তে বন্দী যে কখন ও হইনি তা নয়। কিন্তু একদল্ দুরাচার দস্যুর দ্বারা ধৃত ও শৃঙ্খলিত হয়ে আমি ওদের আড্ডায় নীত হব—ওদের হাতে পড়ে আমি যে কী রকম আহাম্মক বনে গেছি—তার উল্লেখ করে ওরা সবাই বিদ্রূপের হাসি হাস্‌বে—এ অসহনীয় একেবারে অসহনীয়! এর চেয়ে ঐ লোকটা ও হাতের ছুরীটা যদি আমার বুকে এখনি বসিয়ে দিত, তাও আমার ঢের ভাল ছিল।

চেষ্টা কল্লুম হাত পা'র বাঁধটা একটু আল্‌গা কর্ত্তে। কিন্তু সে বজ্রআঁটুনি একটু ও এদিক সেদিক হোল না। যে বেঁধেছে সে নিজের কাজ খুব ভাল ক'রেই করেছে।

মুখে ছিল একটা রুমাল পোরা। সেইটে ফেল্‌বার চেষ্টা কর্ত্তেই ঐ লোকটা ছোরা উঁচিয়ে এমন ভীষণ করে চাইলে, যে সে নিস্ফল চেষ্টা তখনই ত্যাগ কল্লুম।

চুপ করে শুয়ে ওর ষাঁড়ের মতন গ্রীবার দিকে চেয়ে ভাবছিলুম, ঐ গলায় এক গাছি রশি জড়াবার ভাগ্য কি আমার হবে না—এমন সময় সিঁড়িতে মার্শলের ফেরার শব্দ পাওয়া গেল।

কি মন্তব্য শোনাবে এসে ঐ লোকটা? আমি যদি ঐ ভাবে মঠে নীত হ'তে অস্বীকার করি, তবে ওরা এই দণ্ডে আমায় বধ কর্ব্বে না কি?

করেই যদি, ভয় কর্‌লে তাতে এ অবস্থা থেকে যত শীঘ্র মুক্তি পাওয়া যায়, ততই ভালো!

নিরতিশয় অবজ্ঞা ভরে দরজার দিকে চাইলুন—কিন্তু এত সেই দীর্ঘ বপু ঘোরালো বর্ণ, ব্যঙ্গ দীপ্ত নেত্র মর্কট মোহান্তের মুখ নয়, ঐ ধূসর বর্ণের ক্লোক ও প্রকাণ্ড গোঁফ জোড়া যে আমার প্রিয় সার্জ্জেণ্ট প্যাপিলেটের!

তখনকার দিনের ফরাসী সৈন্যের অভিজ্ঞতার অবধি ছিল না। ওরা সহজে কিছুতে বিস্মিত হোত না। এক পলকেই প্যাপিলেট বুঝে নিলে ব্যাপারখানা। ওর হাতে মুক্ত তরবারি ঝক্‌মক্ করে উঠ্‌ল।

ছোরা বাগিয়ে ধরে চেনিয়ার একলাফে ওর কাছে গিয়ে পড়্‌ল, কিন্তু পরক্ষণেই সে অভিপ্রায় পরিবর্ত্তন করে আমার উপর লাফিয়ে পড়্‌ল।

ওর উদ্দেশ্য ছিল আমার বুকে ছোরা বসিয়ে দেবার। কিন্তু আমি খাটের আরেক দিকে সরে যাওয়ায় কম্বল ও চাদরের ভিতর দিয়ে ছোরাটা আমার পাশের খানিকটা চামড়া মাত্র তুলে নিল।

পর মুহূর্ত্তেই একটা গুরুভার দ্রব্য পতনের শব্দ হোল। বুঝলুম প্যাপিলেট ঐ নারকীটাকে ঘায়েল করেছে। আমার বাঁধ ছাদ কেটে প্যাপিলেট আমাকে মুক্ত করে দিলে। মুখ খুলতেই জিজ্ঞাসা কল্লুম—আমার আদেশ ঠিকমত পালিত হয়েছে কি না।

প্যাপিলেট জানাল, হ্যাঁ তা হয়েছে। ওরা এদিক্‌কার ঘটনা কিছুই টের পায় নি। ওর যায়গায় আউভিন আসাতে ও এসেছিল আমার কাছে খবরাখবর সব জানাতে, মোহান্তকে ওরা দেখেনি।

বল্লুম, 'তা হলেত ও লোকটা যাতে পালাতে না পারে—কাল বিলম্ব না করে আমাদের তার বন্দোবস্ত কর্ত্তে হয়।' কিন্তু আমার মুখের কথা শেষ না হতেই সিঁড়িতে মৃদু পদশব্দ পাওয়া গেল।

কাণে কাণে প্যাপিলেটকে, লোকটাকে বধ করা সঙ্গত হবে না বলে—ওকে দিলুম দরজার একটা পাটের আড়ালে ঠেলে, আমি রইলাম আরেকটা পাটের আড়ালে ওৎ পেতে।

ক্রমশঃ ওর পায়ের শব্দ নিকটবর্ত্তী হতে লাগ্‌ল, অসহ্য উৎকণ্ঠায় আমার বুক ঢিব্‌ ঢিব্‌ কর্ত্তে লাগ্‌ল, মনে হতে লাগ্‌ল যেন লোকটা আমারি বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে আস্‌ছে।

চৌকাটের কাছে ওর ধূসর রঙ্গের ক্লোকের প্রান্ত ভাগ দেখা যেতে না যেতে আমরা দুজনে ওর উপর পড়্‌লুম লাফিয়ে।

ধ্বস্তাধ্বস্তি চল্ল কতক্ষণ। ও একলা।—আমরা দুজন। তবু লোকটা শার্দ্দূলবিক্রমে যুঝ্‌তে লাগল। তিনবার আমরা ওকে মাটিতে পাড়্‌লুম,—তিনবারই ও উঠে দাঁড়াল। শেষটা প্যাপিলেট তার তরবারি নিষ্কাশিত করে ওর কণ্ঠের ওপরে ধরাতে লোকটা হৃদয়ঙ্গম কর্ল্লে, যে আর চেষ্টা বৃথা।

যে দড়িতে ওরা আমায় বেঁধেছিল সেই দড়ি দিয়ে আমি ওকে তেমনি করেই আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধলুম। কাজ শেষ করে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে হেসে আমি বল্লুম, 'পাল্লা ত উল্টে গেল মশাই, আমার কাজ এবারে আমি ভাল করেই বাগিয়ে নেব দেখ্‌বেন।'

লোকটা স্থির ভাবে বল্লে, 'আহম্মকদের ভাগ্যেই দৈবকৃপা জুটে থাকে। দয়া করে আমাকে ঐ খাটটার ওপর যদি তুলে দিন, তবে আমি পরম উপকৃত হ'ব। পর্টুগীজ সরাইগুলোতে মেজের উপর শুয়ে থাকা ভদ্রলোকের অসাধ্য ব্যাপার।'

এই আকস্মিক পরাভবেও লোকটার এই অবিচলিত প্রশান্ততায় ও অকুতোভয়তায় বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে গেলুম।

প্যাপিলেটকে দুজন সৈনিককে আন্‌বার হুকুম দিয়ে আমি নিষ্কাশিত তরবারি মার্শলের ওপর ধরে দাঁড়িয়ে রইলুম।

কতক্ষণ পরে মার্শল বল্লে 'আশা করি আপনার লোকেরা আমার সঙ্গে যোগ্য ব্যবহার কর্বে।'

বল্লুম, "আপনার যা প্রাপ্য তা আপনি পাবেন নিঃসন্দেহরূপেই।"

'এর বেশী আমি কিছু চাইও না। জন্ম আমার উচ্চ বংশে, জানেন আশা করি। দেখুন, এই দড়ি গুলোর বাঁধে আমার চামড়া কেটে যাচ্ছে—একটু আল্গা করে দিতে পারেন কি?'

'আপনার হিসাবে ত আমি আহাম্মক মাত্র। আহম্মকের একটু সাবধান থাকা ভাল।'

'আমার উপদেশে আপনার কিঞ্চিৎ বুদ্ধির উদয় দেখা যাচ্ছে। যাক্, আপনার লোকেরা ও এসে পড়েছে, এখন আমার বাঁধ আল্‌গা করুন আর না করুন তাতে কিছুই আসে যায় না।

সৈনিকদের বন্দীর পাহারায় নিযুক্ত করে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম, এখন কোনদিকে অগ্রসর হব। আমার বন্ধু সদলবলে পড়েছে ওদের হাতে; তাকে আগে উদ্ধার করা চাই। ভাগি্‌স্ সব লোক শুদ্ধ আমরা তার অনুবর্ত্তী হই নি—তাইলে একটি লোককেও ওখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফির্‌তে হোত না। ঐ মঠ দুর্গটি অধিকার করে ওদের উদ্ধারের আশা বাতুলতা মাত্র। রাত্রি অবসান হয়েছে, সৈন্যরা শয্যা ত্যাগ করে উঠেছে। ওদের দলপতির জন্যে ওরা কতটা কি করে—তারি ওপর এখন সমস্ত ব্যাপার নির্ভর কর্চ্ছে।

ঊষার অস্পষ্ট আলোতে আলোতে আমার বিউগলার বিউগল বাজিয়ে সকলকে আহ্বান কর্ল্লে। আমরা সবাই খোলা মাঠটাতে এসে চল্‌তে সুরু কর্ল্লুম। মঠের দ্বার থেকে একটু দূরে ছিল একটা প্রকাণ্ড গাছ আমরা সবাই তারি তলায় দাঁড়ালুম। ওরা যদি কপাট খুলে আমাদের আক্রমণোদ্যত হোত তা হলে আমি ওদের উপর পড়ে রাস্তা সাফ করে নিতুম। কিন্তু ওরা তা না করে আমরা কি করি তাই দেখ্‌তে লাগ্‌ল, দেয়ালের ওপর দিয়ে মাথা বাড়িয়ে বিদ্রূপ করে যা খুসী তাই বল্‌তে লাগল।

দু' একটা কামান ও কেউ দাগল, কিন্তু যখন দেখল, গোলা আমাদের কাছে পৌঁছায় না—তখন বেহুদা বারুদ খরচার ভয়ে সে চেষ্টা ত্যাগ কর্ল্লে। ইংরাজ, ফরাসী, পর্টুগীজ সব জাতিরই সব রকম শ্রেণীর লোক ওখান থেকে মাথা বার করে মুখ ভঙ্গিমা করে আমাদের ঘুষি দেখাতে লাগ্‌ল। ওদের নানা রকম পোষাক, নানা রকম বর্ণ ও মুখ মিলে দৃশ্যটি হোল এক অতি অদ্ভুত!

কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে আমরা সরে গিয়ে ওদের দেখ্‌তে দিলুম আমাদের হাতে কোন্ মানুষটি ধৃত হয়েছে—সেই মুহূর্ত্তে ওদের সব হাসাহাসি, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, চীৎকার নিঃস্তব্ধ হয়ে গেল।

তার পরেই ক্রোধে ও দুঃখে ওরা বিদ্ধ বন্য জন্তুর মত ভীষণ চীৎকার করে উঠ্‌ল। উন্মাদের মত কেউ কেউ ছুটোছুটিও কর্ত্তে লাগল। মার্শলকে এই দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগুলির একটা অনুরাগের পাত্র দেখে আমি একটু বিস্মিতও হ'লুম।

সঙ্গে একটা দড়ি আনা হয়েছিল, সেটা আমি গাছের একটা উঁচু ডালের সঙ্গে বাঁধতে আদেশ দিলুম। বিনয়ের ভাণ করে মাথা নুইয়ে প্যাপিলেট বন্দীকে বল্লে, "মশাই আপনার গলার কলারটা এখন খুলে ফেল্‌তে হচ্ছে।"

মার্শল উত্তর দিলে "তোমার হাতটা যদি পরিষ্কার থাকে—তা হ'লে আমার কোন আপত্তি নাই।' শুনে সবাই হো হো করে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

মার্শলের গলায় দড়ি বাঁধ্‌তেই মঠ থেকে আবার এক দফা চীৎকার শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণস্বরে একটা বিউগ্‌ল বেজে উঠ্‌ল, এবং মঠের বৃহৎ লৌহ কপাট মুক্ত করে এক দল লোক শুভ্র পতাকা হস্তে আমাদের দিকে দৌড়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।

আমরা নীরবে দাঁড়িয়ে রইলুম, এগিয়ে গিয়ে আমাদের আগ্রহ ব্যক্ত হ'তে দিলুম না। তবু একজনকে তার সাদা রুমালটা মাথার ওপর ঘোরাতে আদেশ দিলুম। লোকগুলি দৌড়াতে দৌড়াতে আমাদের কাছে এ'ল।

গলায় দড়ি বাঁধা, হস্ত শৃঙ্খলিত—মার্শল তার ঘোড়ার ওপর তেমনি অবিচলিত প্রশান্ত ভাবে বসে রইল। এ অবস্থায় পড়্‌লে এর চেয়ে বেশী ধৈর্য্য দেখানো বোধ হয় কারোই সম্ভব হোত না।

ওখান থেকে বার্ত্তা বহন করে যারা এল, তারা এক অদ্ভুত রকমের দল। একজন হচ্ছে, পোর্টুগীজ তার পরিধানে এক ঘোর বর্ণের ইউনিফর্ম, দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন ফরাসী, সে পরেছে ফিকে সবুজরং এর এক পোষাক, তৃতীয় জন একজন ইংরাজ আর্টিলারী ম্যান, তার পোষাক নীলের ওপর সোণালী রং এর।

ওরা এসে অভিবাদন কল্লে। ফরাসী লোকটি কথা কইলে, বল্লে; "তোমাদের সাঁইত্রিশ জন লোক এখনো মঠে জীবিতাবস্থায় আছে। তোমরা যদি আমাদের মার্শলকে ফাঁসী দাও, তবে তাদের প্রত্যেকটিতে আমরা ঐ দেয়ালের ওপর থেকে ফাঁসী লটকাব।"

বিস্ময়ে আমি বলে উঠ্‌লাম, "সাঁইত্রিশ জন! সে কি? একান্নজন লোক ওখানে গিয়েছিল যে?"

"গিয়েছিল একান্নজনই। কিন্তু চৌদ্দজন লোক ধৃত হ'বার আগেই নিহত হয়েছিল।"

'আর সেই ইংরাজ সেনাপতি?'

'তিনি আত্ম-সমর্পণের বদলে মৃত্যুবরণ কল্লেন, আমরা তার আর কি কর্ব্ব।'

আমার সমস্ত মন হাহাকার করে উঠ্‌ল। লোকটির সঙ্গে আমার দুবার মাত্র দেখা তারি মধ্যে আমার হৃদয়ানুরূপ বন্ধু আমি পেয়েছিলাম, এবং তারই জন্য সমস্ত ইংরাজজাতি, আমার প্রীতিভাজন থাক্‌বে চিরদিন!

কিন্তু লোকটার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করে প্যাপিলেটকে পাঠালুম, সঠিক সংবাদ জেনে আস্‌তে। প্যাপিলেট এসে জানাল সংবাদ সত্য, এখন মৃতের চিন্তা ছেড়ে জীবিতের চিন্তা হয়ে পড়েছে অবশ্য কর্ত্তব্য!

জিজ্ঞাসা কল্লু্ম, "তোমাদের দলপতিকে যদি ছেড়ে দি—তবে সেই সাইত্রিশ জন লোককে কি তোমরা মুক্তি দেবে?"

'দশ জনকে দিতে পারি।'

চেঁচিয়ে আমাদের লোকদের বল্লাম 'লটকাও ফাঁসি।'

ফরাসী লোকটা বল্লে—"আচ্ছা নাও বিশজনকে দেব"। বল্লাম "আর বাক্য ব্যয়ে দরকার নেই; দড়িতে টান দেও তোমরা।"

মার্শলের গলার দড়ে ধরে ঝোলাতে গিয়েও একটু ইতস্ততঃ কর্ত্তে লাগ্‌লুম। যেই মুহূর্ত্তে এই লোকটাকে আমরা বধ কর্ব্ব, সেই মুহূর্ত্তে ওরা ঐ সাঁইত্রিশ জনের প্রাণ ও যে বধ কর্ব্বে!

একটুখানি ইতস্ততঃ ও মতদ্বৈধের ভাব ওদের মধ্যেও ছিল। পরস্পর মন্ত্রণা করে ওরা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,—'তোমাদের সব লোকই আমারা ফিরিয়ে দেব।'

জিজ্ঞাসা কল্লু্ম, 'অস্ত্র ও অশ্ব সমেত দেবে ত?'

ওদের ওটা ইচ্ছা ছিল না, হাঁড়িপানা মুখ করে বল্লে, 'আচ্ছা তাই দেব।'

আমাদের লোকদের ওরা তখন বাইরে এনে ছেড়ে দিলে। আমরা ও মার্শলকে মুক্তি দিলাম।

মার্শল বল্ল, "কর্ণেল, বিদায় তা হলে এখন। মশিনা আপনার কাজে যে এবার বড় খুসী হ'বেন তা মনে হয় না। তবে আপনার পক্ষে বাঁচোয়া এই যে আপনার দিকে এখন মনোযোগ দেবার তাঁর বিশেষ অবকাশ হবে না। কেন না, তিনি নিজে এখন দলবল নিয়ে দেশে ফেরার ব্যাপারে ব্যস্ত আছেন। শেষ এইটুকু বলি, যে বিপদে আপনি পড়েছিলেন, তার থেকে খুব সহজেই আপনি নিষ্কৃতি লাভ কোরেছেন। এতে আপনি যথেষ্ট সাবাসি দেখিয়েছেন বটে। আপনার জন্য আমি যদি কিছু কর্ত্তে পারি তবে বাধিত হব অনুগ্রহ করে যদি কিছু ব্যক্ত করেন—'

"একটা বিষয়ে আপনার অনুগ্রহ আমি চাই।'

"বলুন, কি।"

"নিহত ইংরাজ সেনাপতি এবং তাঁর লোকদের যথাযোগ্যরূপে যদি আপনি সমাধিস্থ করান তা হলে আমি পরম বাধিত হ'ব।"

'আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে তা কর্‌ব।'

'আরেকটি প্রার্থনা আছে।'

"বলুন।'

"আমার সঙ্গে পাঁচ মিনিটের জন্য একবার অসি যুদ্ধে নাম্‌বেন।"

"তাতে হয় আপনার জীবনের উচ্চাশা সব আমি সমূলে ধ্বংশ করে দেব নয় ত নিজে জীবন বিসর্জ্জন দেব। কি লাভ হবে আর ওতে। তা ছাড়া আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে এই মাত্র আমার গলা থেকে উদ্বন্ধন রজ্জু উন্মোচন কোরেছেন। এক্ষণি আমাকে যুদ্ধ কর্ত্তে বলা আপনার উচিত হচ্ছে না।'

আমার সৈন্যদের একত্রিত করে আমি শ্রেণীবদ্ধ করে যাত্রা কল্লুম। মার্শেলের দিকে ফিরে একবার অসি নিষ্কাসিত করে বল্লুম, "চল্লুম তবে এখন। আবার যদি কখনো দেখা হয়, তখন এত সহজে নিষ্কৃতি পাবেন না।"

মার্শল হেসে বল্লেন, "বিদায় বন্ধু, বিদায়। সম্রাটের কাজে আপনার যদি কখন ও শ্রান্তি আসে—তা হলে আমাদের কাছে চলে আস্‌বেন। আমরা আপনাকে লুফে নেব।"

আসাম সরকারের সার্কুলার

প্রকাশ যে, আসাম গবর্নমেণ্ট এই মর্ম্মে এক সার্কুলার জারী করিয়াছেন যে, গবর্নমেণ্টের চাকুরীয়াগণ মহাত্মা গান্ধীর আসাম প্রদেশ পরিভ্রমণ সম্পর্কিত কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগদান করিতে পারিবেন না।

ইউনাইটেড প্রেস

বিপ্লবীকেই আন্দামানে পাঠান হয়, রাজবন্দীদিগকে নয়

কমন্স সভায় মিঃ ডেভিড গ্রেণফেলের একপ্রশ্নের উত্তরে মিঃ বাটলার জানান যে, কোন রাজবন্দীকে আন্দামানে পাঠান হয় নাই বা হইতেছে না। মিঃ বাটলার বিশেষ জোর দিয়া বলেন যে, বৈপ্লবিক কয়েদীদিগকেই আন্দামানে পাঠান হয়। রাজবন্দীদিগকে পাঠান হয় না। —রয়টার

নাজি নেতার চক্ষে মহাত্মাজী

জার্ম্মাণীর নাজি নেতাদের অন্যতম হার গোয়েরিং একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি হিটলারের দক্ষিণহস্ত রূপে কাজ করিতেছেন, এরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমানে তিনি রিষ্টাগের প্রেসিডেণ্ট, প্রুশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ও সরাষ্ট্র সচিবের কাজ করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি বৃটিশের সহিত জার্ম্মাণীর সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দিয়াছিলেন। ইহার বিবরণ ইউরোপের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি মহাত্মা গান্ধীর সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন,—"আমার সম্মুখে আসিয়া কেহ গান্ধীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধা বলিয়া প্রচার করিবে, ইহা আমি কখনও সহ্য করিব না। আমি তাহাকে ভারতবর্ষে অবস্থিত বৃটিশ বিরোধী বলশেভিক এজেণ্ট বলিয়া মনে করি। কিছুদিন পূর্ব্বে কোনও এক সভায় আকস্মিকভাবে গান্ধীর একজন সহকর্ম্মী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হই নাই।"

শিক্ষার বাহন

অনেকদিন হইতে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য শিক্ষাবিদগণের মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল। বর্ত্তমানে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ই এ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। কাশী-বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দীভাষাকে কলেজে প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিকশ্রেণীতে শিক্ষাদান ও পরীক্ষার বাহনরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আপাততঃ ইতিহাস, ন্যায়, পৌরবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং সংস্কৃত হিন্দীভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে। হিন্দীভাষায় কলেজে পাঠোপযোগী পুস্তকের

অভাব দূর করিবার জন্য গ্রন্থকার বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। মিঃ ঘনশ্যাম দাস বিরলা ৫০ হাজার টাকা বোর্ডের হস্তে দান করিয়াছেন। বোর্ড ইতিমধ্যে ১২ খানা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

আশাকরি কাশীবিশ্ববিদ্যালয়ের এ সদৃষ্টান্ত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও গ্রহণ করিবেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলসমূহে বাংলাভাষা শিক্ষার বাহন করিবার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট উহা এ পর্য্যন্ত অনুমোদন করেন নাই। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ্‌গণেরও শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

নারীসচিব মিসেস ফ্রান্সিস পারকিন্স

আমেরিকার সর্ব্বপ্রথম নারী সচিব মিসেস পারকিন্স। আমেরিকায় জাতীয় উন্নতিকল্পে এই নারীই প্রথম প্রস্তাব করেন যে গবর্ণমেণ্টের কারখানাজাত দ্রব্যসম্ভার নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা থাকা উচিত। শ্রমিকদের কার্য্যকাল নির্ণয় করিয়া তাহাদের উপযুক্ত বেতন দেওয়া হউক এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের কাজ করিতে দেওয়া উচিত নহে।

প্রথমে মিসেস্ পারকিন্সের প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় নাই, কিন্তু আজ আমেরিকার আর্থিক উন্নতিকল্পে এই মহিলার প্রস্তাবগুলি অনেকাংশে কার্য্যে পরিণত হইতেছে।

মিসেস পারকিন্স প্রথমে শিক্ষয়িত্রীরূপে জীবন আরম্ভ করেন। শিক্ষয়িত্রী কার্য্য শেষ হইলে তিনি শ্রমিক-উন্নয়ন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহারই ছয়বৎসরের পরিশ্রমে ৩০০টী ফ্যাক্টরী আইন বিধিবদ্ধ হয়।

১৯২৩ সালে তিনি ষ্টেট্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯২৯ সালে তিনি কমিশনের সর্ব্বময়কর্ত্রী হন। তখন তাহার অধীনে ১,৮০০ কর্ম্মচারী কার্য্য করিত। ১৯৩৩ সালে মার্চ্চ মাসে তাহাকে আমেরিকার ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট সচিবের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছেন।

শ্রমিক সমস্যার সমাধান, সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি সংক্রান্ত ব্যাপারে মিসেস্ পারকিন্সের অভিমতের উপর আমেরিকায় অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সিংহলে সিভিল সার্ভিসে নারীর অধিকার দাবী

সিংহলে নারী ভোটাধিকার সঙ্ঘের এক অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, আইন ব্যবসায়ে যখন নারীর অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে তখন সিভিল সার্ভিসেও তাহাদের প্রতিযোগিতা করিবার অধিকার প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। অধুনা পুরুষ ছাড়া নারীদের সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতা করিবার অধিকার নাই।

মেয়েদের ট্রেনিং কলেজ

কলিকাতার ডাওসেসন কলেজে মেয়েদের ট্রেনিং (বি, টি) পড়িবার বন্দোবস্ত ছিল। সম্প্রতি ব্যয় সঙ্কোচের নিমিত্ত উক্ত ডায়োসেসন কলেজ উঠাইয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে মেয়েদের ট্রেনিং পড়ার পথও বন্ধ হইতেছিল। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, স্কটিস চার্চ্চ কলেজের এ বৎসর হইতে মেয়েদের ট্রেনিং পড়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় এবিষয়ে অনুমতি দিয়াছেন। ইহাতে অবশ্য কতকটা অভাব দূর হইবে; কিন্তু মেয়েদের ট্রেনিং পড়ার ব্যবস্থা আরো বেশী করার প্রয়োজন হইয়াছে।

মিউনিসিপ্যালিটির পদপ্রার্থী মুসলমান মহিলা

যশোহরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মৌলবী আবদুল সমাদারের পত্নী শ্রীযুক্তা আয়েষা খাতুন পৌরসভার সদস্য পদপ্রার্থী হইয়াছেন। তিনি উক্ত সহরের দুই নম্বর ওয়ার্ড হইতে নির্ব্বাচন প্রার্থীরূপে

দণ্ডায়মান হইয়াছেন; জনৈক উকীল তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। বাংলাদেশে এই মুসলমান মহিলাই সর্ব্ব প্রথম ভোটপ্রার্থীরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। আশা করি শ্রীযুক্তা খাতুন সফলকাম হইবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধি।

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৩ হাজার। গত বৎসর ছিল ২০,৮০০ জন ছাত্র। গত বৎসর ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৮৪৭ জন। এবার সহস্রাধিক বালিকা ম্যাট্রিক দিবে। এবার আই-এ, আই-এস-সি পরীক্ষার্থী ছিল ৯,২০০ জন। গত বৎসর ছিল ৮ হাজার। এবার আই-এ, আই-এ-সি পরীক্ষার ছাত্রী সংখ্যা ৩৫০ জন।

শ্বশুরগৃহে নির্য্যাতিতা সাবিত্রীরাণীর মামলার রায়

গত বুধবার আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি আমেদ সাবিত্রী রাণীর মামলায় রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

আসামী উপেন্দ্র ঘোষ দস্তিদারের প্রতি দণ্ডবিধির ৩২৫ ধারা অনুসারে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩৫৪ ধারা অনুসারে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০৲ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। উভয় দণ্ড পরপর চলিবে, অর্থাৎ সাড়ে তিন বৎসর কারাদণ্ড হইবে। দণ্ডবিধির ৩৪২ ধারা অনুসারেও আসামী অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই ধারায় তাহাকে পৃথক দণ্ড দেওয়া হয় নাই। জরিমানার টাকা আদায় হইলে উহা সাবিত্রীর জন্য এডমিনিষ্টেটর জেনারেলের নিকট থাকিবে।

উপেন্দ্র ঘোষ দস্তিদারের মাতা মনোরমা অন্যতম আসামী ছিলেন। তাঁহার প্রতি ৩২৫ ধারা ও ৩৫৪ ধারা অনুসারে শ্লীলতাহানি ও প্রহারের প্ররোচনার জন্য ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

কুলবধূ সাবিত্রীরাণী দেবর উপেনকর্ত্তৃক কি অকথ্য নির্ম্মমভাবে নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন এবং উপেন্দ্রের মাতা এ জঘন্য কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন—এ সমস্ত ঘটনা সংবাদপত্রের মারফতে সকলেই অবগত আছেন।

আন্দামানে ৬২৭৬ জন বন্দী।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক প্রশ্নোত্তর জানা যায় বর্ত্তমানে আন্দামানে বন্দীসংখ্যা ৬২৭৬ জন। তন্মধ্যে ব্রহ্মদেশের—২১১৪ জন, যুক্তপ্রদেশের ১০৯০. মান্দ্রাজের ৪৯৪, বাংলাদেশের ৪১৯ জন, উত্তরসীমান্ত প্রদেশের ২৪৭ এবং মধ্য-প্রদেশের ২০৩ জন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল।

ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল পাশ হইয়াছিল। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কাউন্সিল অব ষ্টেটের সভায়ও প্রায় দুই ঘণ্টা আলোচনার পর অধিকাংশ সদস্যের ভোটে এই বিল পাশ হইয়াছে। মিঃ হোসেন ইমাম, মিঃ কালিকার ও মেহরোত্রা এই তিন জন সদস্য বিরোধিতা করিয়া ছলেন। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, ১৯২৮ সালের রিপোর্টে ব্যাঙ্ক বিল হইতেও বর্ত্তমান বিলটি অধিকতর প্রগতি বিরোধী। যাহাই হউক, বহু সংখ্যক সদস্য ইহা সমর্থন করাতে বিলটি পাশ হইয়াছে। অতঃপর বড়লাট এই বিলে স্বাক্ষর করিবেন।

সুভাসচন্দ্র বসুর বিবৃতি।

জেনাভা হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বিভিন্ন সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমার কয়েকটি বিবৃতি ইতিমধ্যে বৃটিশ ও ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। সুভাষবাবু

বলেন যে, ভারতের জন্য নূতন কর্ম্মপন্থা স্থির করিবার সময় আসিয়াছে। ভারতবর্ষ এখন আর বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া চলিতে পারে না। বর্ত্তমানে একটি শক্তিশালী দল গঠনের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। সমগ্র জাতিকে এই দলের অধীন হইয়া চলিতে হইবে। এই দল প্রধানতঃ নিজেদের স্বার্থ না দেখিয়া সমগ্র জাতির স্বার্থরক্ষায় অবহিত হইবে। সর্ব্বপ্রকারে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি পরিহার করিয়া রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক এবং সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করিবে।

সুভাস বাবু মনে করেন, এখন আর কংগ্রেস সকল দলের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে না। তাঁহার পরিকল্পিত নূতন দল কংগ্রেসকে সর্ব্বপ্রকারে জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবে।

কারাগারে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

যে সময় পণ্ডিত জহরলাল বিহারের ভূকম্পপীড়িত জনগণের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সে সময় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। রোগশয্যায় শায়িতা জননী অশ্রুপূর্ণ নয়নে পুত্রকে বিদায় দিয়াছিলেন। পণ্ডিত জহরলাল কলিকাতায় ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারী আলবার্ট হলে এবং ১৮ই তারিখ মহেশ্বরীভবনে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতাবলি রাজদ্রোহমূলক এই অপরাধে তিনি অভিযুক্ত হন এবং দুই বৎসর অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

পণ্ডিতজী আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই, কেবল একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতার সমর্থন সম্বন্ধে তিনি বলেন, তাঁহার চিরজীবনের কর্ম্মধারা রাজদ্রোহ করা, অতঃপর পণ্ডিজী বলেন, "আমার বিরুদ্ধে এই মামলা রুজু করিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট যে আমাকে বাংলার অধিবাসীদের অতীত ও বর্ত্তমান অদৃষ্টের অংশভাগ হইবার সুযোগ দিয়াছেন তজ্জন্য আমি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই সৌভাগ্যের কথা আমি চিরদিন আনন্দের সহিত স্মরণ করিব।"

রিভলবার ছবি রাখায় বিপদ

রিভলবার-ছবি রাখাও কি আইনে দণ্ডনীয়? বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের মতে দণ্ডনীয় নহে। কিন্তু নোয়াখালির স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর মুস্তাফার রহমন খাঁর মতে দণ্ডনীয়। প্রকাশ নোয়াখালির রাফিকপুর গ্রামে এক বাঙ্গালী যুবকের গৃহে পুলিশ খানাতল্লাসী করিয়া একটি রিভলবারের ছবি পায়। ইহার ফলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং স্থানীয় স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট বিপ্লব দমন আইন অনুসারে তাঁহাকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আসামী পক্ষ হইতে বলা হয়, রিভলবার ছবি রাখা উক্ত আইনে পড়ে না।

বেতিয়া রাজের সহৃদয়তা

সংবাদপত্রের প্রকাশ, বিহারের ভূকম্পপীড়িত রায়তদের বেতিয়ারাজ ৫ লক্ষ টাকা বিনাসুদে ঋণ দিবেন। ঐ টাকা রায়তেরা ১০ বৎসরের মধ্যে শোধ করিতে পারিবে।

বেতিয়ারাজ এই যথোপযুক্ত কার্য্যের জন্য দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট যদি ভূকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ এই নীতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে জনসাধারণ এ দুর্ব্বিপাকে যথার্থ সাহায্য লাভ করিবে এবং দেশবাসীও উপকৃত হইবে।

লবণ শিল্প কমিটির রিপোর্ট

লবণের উপর যে অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য হইয়াছে, তাহা আরও পাঁচ বৎসর বলবৎ থাকুক, লবণ ব্যবসায়ীগণ দাবী করিয়াছেন। এবিষয়ে আলোচনার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে এক কমিটি গঠণ করা হয়। এই কমিটির রিপোর্ট হইতে জানা যায়, ১৯৩৫ সালে ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান লবণ শুল্ক বলবৎ রাখা উচিত, সদস্যগণ ইহা জানাইয়াছেন। বর্ত্তমানে ৫৪৮০ আনায় ১০০ মন লবণ পাওয়া যায়। কমিটির রিপোর্টে আরও জানা যায় যে লবণ শুল্ক হইতে প্রাপ্ত আয়ের ৮ ভাগের ৭ ভাগই বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে দেওয়া হয়। বাকী একভাগ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রাপ্ত হন। খরচবাদে এবৎসর ভারত গবর্ণমেণ্টের লবণ শুল্ক হইতে আয় হইয়াছে ৩॥ লক্ষ টাকা। কথা ছিল, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে যে টাকা দেওয়া হয় তদ্বারা তাঁহারা স্ব স্ব প্রদেশের লবণ কারখানার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবেন। কমিটি বলেন, প্রদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি তাহা করে নাই, বাংলা গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, তদন্ত করিয়া দেখা গিয়াছে, ব্যবসা হিসাবে এপ্রদেশে লবণের কারখানা দ্বারা লাভ হইবেনা। অপর কোন কোন প্রদেশ হইতেও এ আপত্তি উঠিয়াছে। বাংলাদেশে লবণ ব্যবসা চলিতে পারে কিনা সে বিষয়ে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই। কিন্তু আমাদের মতে ভারত গবর্ণমেণ্ট লবণশিল্প প্রতিষ্ঠার কারখানা প্রতিষ্ঠার অজুহাতে ভারতবাসীর নিকট হইতে যে লবণ অতিরিক্ত লবণ ট্যাক্স আদায় করেন তাহা মোটেই বাঞ্চনীয় নহে। দরিদ্র ভারতবাসীর আহারের একমাত্র উপকরণ লবণ। সুতরাং অতিরিক্ত লবণ শুল্ক রহিত করার দাবী দেশবাসী করে।

যুদ্ধ বিদ্যায় বাঙ্গালী

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বানার্জ্জী প্রস্তাব করেন,—

"বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা মনে করেন, ভারতীয় সেনা বাহিনীর অংশরূপে একটি স্থায়ী বাঙ্গালী পল্টন গঠন করা আবশ্যক। তাই এই সভা বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন, এই অভিমতটি যেন যথারীতি ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দেওয়া হয়।"

রায় বাহাদুর বানার্জ্জী বক্তৃতায় বলেন, বাঙ্গালী যুবকদিগকে সৈন্য বিভাগে ভর্তি করিলে রাজনৈতিক অশান্তি বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইবে। এবিষয়ে যুবকদিগকে বিশ্বাস করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। কালের গতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি প্রবল হইতেছে, নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার দায়িত্ব অধিকতর পরিমাণে বাঙ্গালীদের গ্রহণ করা উচিত। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবেই বাঙ্গালীরা সামরিক কার্য্যের জন্য অনুপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছে, একমাত্র শারীরিক দুর্ব্বলতাকে তজ্জন্য দায়ী করা চলে না। বাঙ্গালী যুবকদিগকে সেনা বাহিনীতে গ্রহণ করিলে এই প্রদেশের অনেক সমস্যারই মীমাংসা হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গালীর বীরত্বের যে সকল ইতিহাস আছে, তাহাতে একথা বলা যায় না যে, বাঙ্গালীরা একান্ত অনুপযুক্ত। সেনা বিভাগে নিযুক্ত হইলে বাঙ্গালীরা মাতৃভূমির কল্যাণকল্পে নূতন প্রেরণায় উবুদ্ধ হইবে।

মোলবী আজিজ উদ্দীন খাঁ প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। তিনি বলেন, বাঙ্গালীরা সেনা বাহিনীর অনুপযুক্ত, এই কলঙ্ক কালিমা দুর করিবার সময় আসিয়াছে। বৃটিশের আগমনের পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা দেশের

সৈন্য দলের শক্তি সরবরাহ করিয়াছে, ইহা অতি সত্য কথা। এখনও বাঙ্গালার স্থানবিশেষে শক্তিসম্পন্ন এবং স্বাস্থ্যবান্ বাঙ্গালী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করিবার অনুপযুক্ত নহে।

মৌলবী আব্দস সামাদ বলেন, বিপ্লব দমনের জন্য অনেক জরুরী বিধি-ব্যবস্থা করা হইতেছে। আমার মনে হল, বাঙ্গালী যুবকদিগকে সেনা বাহিনীতে গ্রহণ করিলে তদপেক্ষা অনেক বেশী কাজ হইবে।

রেওয়া রাজ্যে শাসন সংস্কার

রেওয়া রাজ্যে এরূপ নিয়ম ছিল যে, রাজ পরিবারের রাজকুমারীদের বিবাহ সময় যৌতুক হিসাবে এবং অন্য অন্য ব্যয়ের জন্য প্রজাদের নিকট হইতে একটা কর আদায় করা হইত। রাজ্যের কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে এক মাসের বেতনের অর্দ্ধ গ্রহণ করা হইত। দীর্ঘ দিন যাবৎ এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি এই প্রথা রহিত করা হইয়াছে।

ভারতে দৈন্য

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ রামকৃষ্ণ রেড্ডি বলেন যে, ভারতে ৪ কোটি লোক এক বেলা খায়। অন্যান্য দেশে কয়েক লক্ষ লোক মাত্র বেকার।

দরিদ্রতম দেশে বেতন হ্রাস

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবদুল মতিন চৌধুরী বলেন যে, বৃটেনে শতকরা ৫ টাকা, জাপানে ১৩ টাকা কিন্তু ভারতে শতকরা ২৫৲ টাকা বেতন কমান হইয়াছে।

৫৬ বৎসর বয়সে আই-এ পরীক্ষা

আলফ্রেড হীরালাল চাটার্জ্জীর বয়স ৫৬ বৎসর। তিনি কলিকাতার কোন এক ফার্ম্মের ষ্টেনোগ্রাফার লেখাপড়া শিখিবার জন্য তাহার বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। দুই বার অকৃতকার্য্য হইবার পর ১৯৩২ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন। এবার তিনি আই-এ পরীক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার এ উদ্যম প্রশংসনীয়।

বড়লাট হইলে মিঃ আণে কি করিতেন

কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি মিঃ এম এস আণে অধুনা কারামুক্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি অমরাবতীর এক জনসভায় বলিয়াছেন, আমি যদি এক সপ্তাহের জন্যও বড়লাট হইতাম তাহা হইলে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতনের ১২ আনা হ্রাস করিয়া দুর্গত বিহারের সেবাকার্য্যে নিয়োজিত করিতাম। আমি ২৫ কোটি টাকার ঋণ সংগ্রহ করিয়া বিহারের পুনর্গঠন কার্য্যে ব্যয় করিতাম।

অনাবশ্যক বিদেশী পণ্য

নিম্নে যে সকল পণ্যদ্রব্যের তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহার অধিকাংশ সাধারণ ভারতবাসীর প্রাত্যহিক জীবন যাপনের পক্ষে অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় নহে; অথচ এই শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের অধিকাংশই ভারতের নানাস্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্য

লক্ষ টাকা।

নাম	১৯২৯-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	১৯৩১-৩২	১৯৩২-৩৩
সাবান—	১৫৮	১৬৭	১১২	৮৯	৮৩
খাদ্য-সামগ্রী ইত্যাদি—	৫৮৪	৪২৪	৪৫৭	৩২৭	২১৬
মদ্য—	৩৫৭	৩৭৭	৩৩১	২২৬	২২৫
তামাক ও চুরুট—	২৭৪	২৭০	১৫০	৯৫	৯৭
পরিচ্ছদ—	২	১৭১	১১১	৮২	৮৩
জুতা—	৬৯	৮৭	৮৮	৬৫	৫২
সুপারি—	২২৩	২৪৭	১৮৯	১৪৫	১১৯
লবঙ্গ—	৩৫	৪৮	৩৭	৪২	৩৫
অন্যান্য মশলা—	৩৬	৩০	২৮	২১	১৯
মাছ—	৪৮	৫২	৪২	২১	২৩
প্রসাধন দ্রব্য—	১০৯	১১২	৮১	৭১	৯৩
খেলনা, ঠেলাগাড়ী—	৭০	৬৭	৫০	৩৮	৪৮
বালা ও চুড়ী—	৭৭	৮৫	৫০	৩৫	৪০
মালা ও ঝুঁটামুক্তা—	৩০	৩১	১৬	৯	১২
টেবিল সজ্জার উপকরণ—	১১	১৩	৭	৬	৫
কর্পূর ও জাফ্রান—	৪১	৪১	৩৬	৩৮	৩[illegible]
মোমবাতি, বেত, ব্রাশ ইত্যাদি—	২২	২৫	২১	১৭	১৪
বাজী—	১৮	১৬	৮	৫	৮
মোট	২৫২৬	২৫৬০	১৯৭৭	১৪৭৩	১১৯১

বাংলায় লাইনোটাইপ

ছাপাখানায় বাংলা অক্ষর সংযোজন হয় হাতে। এজন্য ভাল বাংলা টাইপ বিশেষতঃ প্রয়োজনে তাড়াতাড়িতে কোন জিনিষ বাংলায় ছাপান অত্যন্ত কষ্টকর ও একরকম অসম্ভব। বাংলা অক্ষরের সংখ্যা প্রায় ৫৫০। সেজন্য লাইনোটাইপ নামক অক্ষর সংযোজনায় যন্ত্রের সাহায্য লওয়া যায় না। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু ও গৌরাঙ্গ প্রেসের শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার বাংলায় লাইনোটাইপ তৈয়ার করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এসংবাদে আমরা অত্যন্ত সুখী হইলাম। তাঁহারা বাংলা অক্ষর ৫৫০ স্থলে ১২৪টী করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইলে বাংলা ছাপার অনেক অসুবিধা দূর হইবে।

জেলে শাস্তি

প্রেসিডেন্শী জেলের যে সমস্ত রাজবন্দী সূর্য্য সেনের ফাঁসীর দিনে অনশন করিয়াছিল, কর্তৃপক্ষ তাহাদের চিঠিপত্র লিখা আত্মীয়স্বজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা এক মাসের জন্য বন্ধ

করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ঐ এক মাস কাল তাহাদের খোরপোষ বাবদে চৌদ্দ আনা স্থলে দশ আনা করিয়া দেওয়া হইবে।

বাঙ্গলায় যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতার ওভারটুন হলে শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতায় মিঃ পি কে সরকার বলিয়াছেন যে, "এক দিন ভারতবাসীকে স্বদেশ রক্ষা করিবার জন্য আহ্বান করা হইতে পারে তজ্জন্য সামরিক ড্রিল তৎসহ ডাল ও বাঁশী সহ কুচকাওয়াজ শিক্ষা দিলে যুবকদিগের ইহা শিক্ষা করিতে উৎসাহ বাড়িতে পারে এবং এইরূপ ভবিষ্যতে ভারত রক্ষার জন্য যে সৈন্যদল হইবে তাহার ভিত্তি স্থাপিত হইবে।'

গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ আর এন রীড বলেন, এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নহে। সেনা বিভাগ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা করার অধিকারী প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট নহেন। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব এবং এতৎসংশ্লিষ্ট আলোচনার বিবরণ ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন। তবে আমার একটু বক্তব্য আছে। বাঙ্গালীদের সামরিক শিক্ষার কোনই বন্দোবস্ত নাই, এমন কথা বলা চলে না। এদেশে তিনটি সেনাবাহিনী আছে, এই তিনটিতেই বাঙ্গালীরা প্রবেশ করিতে পারেন। এই তিনটি বাহিনী হইতেছে :—

(১) ইউনিভারসিটি ট্রেনিং কোরের কলিকাতা বাহিনী।

(২) ১৯নং হায়দ্রাবাদ রেজিমেণ্টের টেরি টোরিয়াল বাহিনী।

(৩) ইউনিভারসিটি ট্রেনিং কোরের ঢাকা বাহিনী।

আমার মনে হয়, বাঙ্গালী যুবকগণ এই সমস্ত সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়া সমালোচকদের সমালোচনার প্রান্তি প্রদর্শন করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ বিষয়ে বাঙ্গালী যুবকগণের বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না। কলিকাতা ট্রেনিং কোরের মধ্যে যতজন সৈন্য থাকা উচিত, তদপেক্ষা কম রহিয়াছে। ১৯৩৩ সালে এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ৬৬ জন হইতে কমিয়া ৪৪ জন হইয়াছে। যুবকগন যাহাতে দলে দলে এই সমস্ত বাহিনীতে যোগদান করেন, তজ্জন্য প্রচারকার্য্য চালান কর্ত্তব্য।

খা বাহাদুর আবদুল মোমেন বলেন, দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, স্বরাষ্ট্র সচিবের বক্তৃতায় বিশেষ কোন উৎসাহ বোধ করিলাম না। তিনি যে সকল সৈন্যবাহিনীর কথা বলিলেন, তাহা স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী। সম্পূর্ণরূপে সৈন্যবাহিনী বলিয়া পরিগণিত যে সকল বাহিনী আছে, তাহার মধ্যে যোগদান করাই বাঙ্গালী যুবকগণের উদ্দেশ্য। এইরূপ একটি সর্ব্বাঙ্গীন সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বাঙ্গালী পল্টন গঠন করাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। তাহাতে বেকার সমস্যারও সমাধান হইবে। আমি আশা করি, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কেবল এই আলোচনার বিবরণ ভারতসরকারের নিকট পাঠাইয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না; এই সঙ্গে তাঁহারা সুপারিশ করিবেন যে, একটি পুরাদস্তুর বাঙ্গালী পল্টন গঠন করা একান্ত প্রয়োজন।

আরও কয়েক জনের বক্তৃতার পরে বিনা বাধায় প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে।

প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সংঘর্ষ

কালাসেন রাজকুমার নামক এক মণিপুরী যুবক নরসিংহ পুরের (কাছাড়) হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার। কিছুকাল পূর্ব্বে সে বিদায় লইয়া লক্ষ্মীপুরে নিজবাড়ীতে গিয়াছিল। সে হঠাৎ সেখানে নিউমোনিয়া রোগে

আক্রান্ত হয়। সিভিল সার্জ্জেন পরীক্ষা করিয়া তাহাকে এক মাসের বিদায় মঞ্জুর করেন এবং লক্ষ্মীপুরের সাব এ্যাসিষ্টেন্ট সার্জ্জেনকে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়া যান। কিন্তু ডাক্তারি দোয়াইকে ব্যর্থ করিয়া রোগী একদিন অচৈতন্য হইয়া পড়ে। তাহার বৃদ্ধ মাতা ও আত্মীয়স্বজনরা ভীত হইয়া এক মণিপুরী কবিরাজের শরণাপন্ন হয় এবং কবিরাজী ঔষধ খাইয়া ক্রমে সে সুস্থ হইয়া উঠে। লক্ষ্মীপুরের সাব এ্যাসিষ্টেন্ট সার্জ্জেনের মারফৎ সিভিল সার্জ্জেন মহাশয় যখন শুনিলেন যে, লোকটা অবশেষে কবিরাজি ওষুধ খা য়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে, তখন তাহাকে অবিলম্বে যাহাতে পদচ্যুত করা হয় এই মর্ম্মে তিনি লোকেল বোর্ডের চেয়ারমেনকে অনুরোধ করেন। চেয়ারম্যান মহোদয় বোর্ডের এক সভা ডাকান এবং তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। সিভিল সার্জ্জেন এক মন্তব্যে বলিয়াছেন, পাশ্চাত্য চিকিৎসায় এইরূপ আস্থাহীন লোক হাসপাতালে চাকুরী পাইবার উপযুক্ত নয়। কারণ তাহার এই কুদৃষ্টান্তে ডাক্তারী চিকিৎসার প্রতি লোকের ভক্তি কমিয়া যাইতে পারে।

—জনশক্তি

আগামী বৈশাখ হইতে আশালতা দেবীর
সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইবে।

প্রস্তাবনী

শ্রীঅনিন্দিতা দেবী

লোকে এখন বিলাসী হইতেছে, বাজে রংদার জিনিষ কিনিয়া অর্থের অপব্যয় করিতেছে, সর্ব্বদাই এই অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায় আর বস্ত্রালঙ্কারের খরচ ও বিলাসিতার গালিটা মেয়েদের উপরই অবশ্য বেশী পড়ে।

কিন্তু একেত সুন্দর জিনিষের প্রতি আকর্ষণ মানুষের স্বাভাবিক, মেয়ের হয়ত তাহা আরোই একটু বেশী হওয়ার সম্ভব। তারপর রূপের দাবীই তাহার কাছে সব চেয়ে বেশী বলিয়াও ঐ রূপ বা সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির নানা উপকরণই তাহার দরকার হয়। ইহাও দেখা উচিত যে, চটকদার জিনিষগুলি যত বেশী লোকের সম্মুখে আনিয়া ধরা হয়, ভাল জিনিষ কি তাই হইয়া থাকে? হরেক রকম সাড়ী, জামা, লেস, ফিতা, চুড়ী, মালা, ব্রোচ, খেলনা, টুকীটাকী দর্শনধারী বস্তুগুলি অতি লোভনীয় ভাবে সাজাইয়া ফিরিওয়ালা, দোকানী পশারী সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই গৃহে গৃহে মেয়েদের হাতের কাছে, চোখের সম্মুখে আনিয়া ধরিতেছে। কিন্তু ভাল বই, মাসিকপত্র, ছেলেদের গল্পের বই, ছবির বই, ভূচিত্রাদি, অথবা কারু ও চারু শিল্পকলার যথার্থ পরিচায়ক সুন্দর বস্তু, চিত্র কিম্বা ঐ সকল শিল্পচর্চ্চা, জ্ঞান চর্চ্চার বিবিধ উপকরণ, শিশুদের খেলার সহিত শিক্ষা দানের নানা উপাদান ইত্যাদি কখন কি সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ মেয়েদের চোখে এইভাবে পড়িতে পায়? না, তাঁহাদের নিকট এইরূপে আনিয়া উপস্থিত করা হয়?

এসকলের অস্তিত্বই ত তাঁহারা প্রায় জানিতে পান না। কিন্তু সহরের কথা ছাড়িয়াই দেওয়া যাক্, পাড়াগায়েও বাজে রংদার জিনিষের ২।১টী দোকান প্রায় সর্ব্বত্রই আছে, আর ওসকল জিনিষ কিছু না কিছু পাওয়াই যায়। স্থায়ী দোকান সেখানে নাই বা উহাতে যাহা মিলে না, এমন সৌখীন দ্রব্যও সর্ব্বত্রই ফেরীওয়ালারা সময়ে সময়ে আনিয়া সকলের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দেয়; অথবা হাটে, মেলায় আসিয়া থাকে। কিন্তু বইয়ের দোকানের অস্তিত্ব প্রাদেশিক রাজধানী ভিন্ন অন্য বড় সহরেও প্রায়ই নাই। এমন কি কলিকাতা, বম্বে ইত্যাদি ২।৪টী প্রকাণ্ড সহর ছাড়া অন্য প্রাদেশিক রাজধানীগুলিতেও তাহা বিশেষ সুপ্রতুল নয়। স্থায়ী দোকান ভিন্ন ফেরী করিয়া পুস্তকাদি সাধারণের হাতের কাছেও কখন আনা হয় না, কিম্বা হাটে, মেলায়ও এভাবে সকলের সমক্ষে উপস্থিত করা হয় না।

প্রাথমিক শিক্ষা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত না হইলে পাড়াগাঁয়ে বা হাট বাজারে বই বিক্রীর সম্ভাবনা নাই কথা হইতে পারে। কিন্তু এই সব আয়োজনের দ্বারাই যে শিক্ষায় প্রেরণা আসে। এখনও পাড়াগাঁয়ে কতক লোকের অক্ষর পরিচয় থাকেই। কিন্তু

পুরাতন ২।৪ খানি জীর্ণপুঁথি পত্রই মাত্র তাহাদের সম্বল হইয়া আছে। জ্ঞানের বৃদ্ধি, পরিমার্জ্জনের কোন সুবিধাই তাহারা পায় না। দেশে যে গতানুগতিকতার রাজত্ব এখনও এত দৃঢ়, বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারার কিছুই যে লোকের কাছে পৌঁছে না, ইহাও তাহার একটী বড় কারণ। এভাবে জ্ঞান বিস্তার করিতে হইলে অবশ্য জ্ঞানের সর্ববিভাগের বর্ত্তমান চিন্তাদর্শমূলক নানাবিধ গ্রন্থ রচিত হওয়া আবশ্যক। এখন সেরকম বই বাঙ্গলায় কমই আছে। কিন্তু বই যাহাও বা আছে, কি হইতেছে তাহাও সকলের কাছে পৌঁছিতেছে কই? বিদ্যার চর্চ্চা ও পরিমার্জ্জনার সুবিধা হাতের কাছে না পাওয়াতেই ত কিছুদূর অবধি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াও অনেকেই আবার নিরক্ষরতায় ডুবিয়া যায়।

এই সব সুবিধা নহিলে গালি যতই দেওয়া হউক, পাড়াগাঁয়ে ভদ্র, শিক্ষিত লোকের বাসের আরোই বাধা থাকিবে। তবে কেবল পাড়াগাঁয়েই নয়, সহরেও খুব কমস্থলেই যে পুস্তক, পত্রিকাদি শিক্ষার উপকরণ ঠিকমত পাওয়া যায়, তাহা আগেই বলা হইয়াছে। বলাবাহুল্য সে সব জায়গায় বহু শিক্ষিত স্বচ্ছল অবস্থার লোকেরই বাস। কিন্তু এই সব সুযোগ, সুবিধার অভাবে রাজধানী ভিন্ন অন্যত্র শিক্ষিত লোকেরও বুদ্ধি ও বিদ্যায় মরিচা ধরিয়া উঠে, এবং কূপমণ্ডুকতায় গ্রাস করে।

বইও যে কিনিবার বস্তু, কেবল অন্যের কাছ হইতে চাহিয়া লইবার জিনিষ নয়, সে ধারণাও তাই এত কম। অথচ উপযুক্ত ব্যবস্থা হইলে এই সব স্থানই বরং আসলে জ্ঞানানুশীলনের বেশী অনুকূল। কারণ রাজধানীর গোলমাল স্বভাবতঃই চিত্তবিক্ষেপকর। ইহার মধ্যে আবার পুরুষদের তবু সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র গতিবিধি থাকায় আপনাদের আবশ্যক মত পুস্তকাদি তাঁহারা সহর হইতেই লইয়া আসেন। ডাকে, পারসেলে আনানও তাঁহাদের কঠিন নয়। কিন্তু বাড়ীর উপর আনিয়া না দিলে বড় সহরেই ত এসব প্রায় মেয়েদের আয়ত্তের বাহিরে পড়ে। সুযোগ অনুশীলনের একান্ত অভাবে তাঁহাদের স্বল্পতর বিদ্যা তাই আরো শীঘ্রই চাপা পড়িয়া যায়। তারপর বাইরের পৃথিবীর সহিত সর্ব্বদা যোগাযোগে পুরুষেরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন, জীবিকার্জ্জন সূত্রেও কিছু না কিছু বিদ্যার চালনা, নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা তাঁহাদের হইয়া থাকে।

মেয়েদের এসব কোন সুবিধাই না থাকায় বই পড়ার দরকার তাঁহাদেরই বরং বেশী। মূলধন ভারী থাকিলেও মানুষে শীঘ্র নিঃস্ব হয় না, বিদ্যার সেই সঞ্চয়ই কম বলিয়া মেয়েদের ক্ষুদ্র পুঁজি আরো শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া তাঁহাদের একেবারেই ফতুর করিয়া ফেলে।

এই সব চেষ্টা করিতে গেলেই সাধারণের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের অভাব আবশ্যকতাদিও ঠিকমত জানা যায়, সুতরাং যথোপযুক্ত পুস্তক প্রণয়নও যেমন সহজ হয়, উহার ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনাও কমে। তবে সাধারণকে খুসী করিয়া গেলেই অবশ্য চলিবে না, এই রকম হীন ব্যবসায় বুদ্ধিতেই ত পাশ্চাত্যদেশে সাহিত্যশিল্পকলার কতকাংশ বিশেষতঃ

সিনেমা ইত্যাদি আমোদ আহ্লাদের সাধারণ উপকরণগুলি, আসলে যাহা বিশুদ্ধ আমোদের সহিত শিক্ষা ও চিত্ত-প্রকর্ষের খুবই বড় অবলম্বন হইবার কথা ; তাহা খেলো ও দূষিত জিনিষে ভর্ত্তি হইয়া আমাদের দেশে ও বিষোদ্গার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

স্বাস্থ্য লাভের সহিত তাই সাধারণকে ভাল জিনিষ চাহিতে শেখানই এ সকল প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। জ্ঞানের দিক, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য্যতার দিক ও সদ্বিষয়ে আনন্দ লাভের দিকে দেখিয়াই এই অভাব পূরণ করিতে হইবে।

এখন যে লাইব্রের প্রচেষ্টা হইতেছে, তাহাতেও এ অভাব কতক মিটিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার সহিত এই ভাবে পুস্তক, পত্রিকাদি কিনিবার সুবিধার আবশ্যকতাও যথেষ্টই আছে। লাইব্রেরীতে সমষ্টিগতভাবে জ্ঞানার্জ্জনের যে সুযোগ দিয়া থাকে ইহাতে ব্যক্তিগত ভাবে নিজস্ব করিয়া তাহা পাওয়া যায়। লাইব্রেরীতে যে পুস্তক খানি ভাল লাগিল, ইহাতে তাহা ইচ্ছামত আপনার সম্পত্তিরূপে মিলে। পাঁচজনার মধ্যে সময় মত কোন বিশেষ পুস্তক, পত্রিকাদি পড়িবার সুযোগ অনেক সময়ই হয় না। নিজের যে বই বা কাগজ খানি দেখিতে ইচ্ছা বা আবশ্যক হয়, স্থানীয় লাইব্রেরীতে তাহা নাও পাওয়া যাইতে পারে। কারণ পাঁচজনার বা অধিকাংশের রুচি অনুযায়ীই উহাতে গ্রন্থাদি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। এই রকম বহু কারণেই লাইব্রেরীর সঙ্গে সঙ্গেই পুস্তকাদি কিনিবার সুবিধাও না থাকিলে লোকের কোন পিপাসার পূর্ণ তৃপ্তি সম্ভব নয়।

আত্মীয় বন্ধুজনকে উপহারও নানা উপলক্ষ্যে সকলেরই দিতে হয়, হাতের কাছে পাইলে অন্য বাজে জিনিষের পরিবর্ত্তে গ্রন্থের ব্যবহার তাহাতেও হইতে পারে। তারপর সাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি এবং বাজে জিনিষে অর্থের অপচয় নিবারণও কেবল নয়, এইভাবে গ্রন্থ ব্যবসায়ের দিকে শিক্ষিত লোকের মনোযোগ আসিলে বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট ও কর্ম্ম হীনতার দিনে বই ছাপা, বিতরণ, ক্রয় বিক্রয় রচনাদিতে বহু লোকের জীবিকার্জ্জনের পথও যেমন খোলে, দেশের গ্রন্থশিল্প, সাহিত্যেরও তেমনি অনেক উন্নতি সাধিত হয়।

খেলার সহিত শিক্ষাদানের নূতন আদর্শানুযায়ী শিশু-বিদ্যালয় (nursury school), ক্রীড়াগৃহ ইত্যাদি স্থাপনের কথাও আজকাল হইয়া থাকে। ইহা খুবই আবশ্যক সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাতে ব্যবহার্য্য খেলনা, যন্ত্রপাতি সমস্তই এখনও বিদেশী রহিইয়া গিয়াছে। শিশুর আবশ্যকীয় এবং কিণ্ডার গার্টেন ও মণ্টেসরি প্রণালীর সব জিনিষই এখন দেশে তৈরী হওয়া দরকার। তাহা হইলে ঐরূপ বিশেষ বিদ্যালয় ব্যতীতও ঘরে ঘরে তাহার সাহায্যে শিশুশিক্ষা সহজ ও আনন্দের হইতে পারে।

ছেলেদের সর্ব্বদা ব্যবহারের খেলনা, পুতুলাদিও দেশী সামান্যই পাওয়া যায়। যাহাও বা মিলে, তাহারও বেশীর ভাগই শুধু সাজাইয়া রাখিবারই উপযুক্ত। ছেলে-মেয়েদের তাহা লইয়া খেলা করিবার উপযোগী নয়, তাহাদের তেমন পছন্দও হয় না।

এদিকেও নবনবোন্মেষশালিনী, প্রতিভা ও ব্যবসায় বুদ্ধি দুইয়েরই ক্ষেত্র যথেষ্টই আছে। শিক্ষামূলক সাধারণ খেলনাদিতেও তাহা খুবই নিযুক্ত হইতে পারে। যেমন শব্দ রচনার খেলার (word-making-word-taking) নানাবিধ সরঞ্জাম, বর্ণ পরিপরিচয়ের জন্য নানারকম সচিত্র অক্ষরের ব্লক, কাঠের বা কার্ডবোর্ডের ছবির টুকরা মিলাইয়া ছবি তৈরীর বাক্স, ছুতারের কাজ, বাগানের কাজের ছোট যন্ত্র পাতির বাক্স, সমুদ্রের ধারে বালি খোঁড়া, বালি লইয়া খেলার জিনিষ, নানারংয়ের খড়ি, মোম (crayons) পেন্‌সিল, গালার শিল মোহরাদির সরঞ্জাম, রংয়ের বাক্স, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাণীবৃত্তান্ত, উদ্ভিদ বিদ্যা ইত্যাদি শিখাইবারও নানা রকম খেলনা ও উপকরণই তৈরী হইতে পারে।

পরিচিত ও প্রচলিত বিদেশী জিনিষগুলি ছাড়াও আরো কতরকম নূতন পরিকল্পনাও যে এদিকে খাটান যায় বলা যায় না। ইহার অনেকগুলি তৈরী ত এতই সহজ, যে কেন যে তাহা এতদিন হয় নাই ইহাতেই আশ্চর্য্য বোধ হয়। অথচ এসব শিল্পে কত লোক জীবিকার্জ্জনের এবং আপনাদের বিশিষ্ট প্রতিভা ও নৈপুণ্য প্রকাশের ক্ষেত্র পাইতে পারেন। জিনিষগুলিও তাহা হইলে আরো দেশোপযোগী আর আমাদের ছেলেমেয়েদের আরোই বেশী আগ্রহজনক হইতে পারে। মূল্যও কতকগুলির অন্ততঃ আরো সস্তাই হওয়া সম্ভব। পুতুলের পরিচ্ছদ প্রস্তুত ইত্যাদি অনেক জিনিষ ত মেয়েরাও সহজেই করিতে পারেন। সাধারণ খেলনাদিতেও কিরকম জিনিষ ছেলেমেয়েরা বেশী ভালবাসে, তাঁহাদেরই বেশী জানিবার সম্ভাবনা। নানা রকমের চিঠির কাগজ, লেখার কাগজ, খাতা, ছুরি, কাঁচি, কাগজপত্র রাখিবার বাক্স, আধার (attache-case, writing case, dressing case, blotter, suit-case etc.) ইত্যাদিও মফঃস্বলে সুলভ বা সুপ্রাপ্য কিছুই নয়। এদিকেও শিক্ষিত লোকের মনোযোগ আসিলে ভাল হয়।

সাড়ী, গহনা, সৌখীন জিনিষ লোকে বিশেষতঃ মেয়েরা যত ভালবাসে, সুতরাং কিনিয়া থাকে, এবং তাহার জন্য খরচ করিতে প্রস্তুত হয়, সুবিধা থাকিলেও পুস্তকাদি শিল্পমূলক জিনিষে হয়ত তাহা হইবে না। কিন্তু মনোমত ও সহজপ্রাপ্য হইলে এবং উপকারিতা বুঝাইয়া আগ্রহের সঞ্চার করিতে পারিলে তবু কতকটা ব্যয় অন্ততঃ সেদিক হইতে এসবদিকে আসিতে পারে। ওসকল জিনিষে ব্যয়ও সবখানিই কিছু অপচয় নয়। তাহাতে যে সৌন্দর্য্যচর্চ্চা ও মনের আনন্দ বিধান হয়, তাহাও বৃথা নয়।

ঐ সকল প্রস্তুত ও তাহার ব্যবসায়েও অনেকের অন্ন সংস্থান হইয়া থাকে। তবে অপ্রয়োজনীয় বা স্বল্প প্রয়োজনীয় বস্তু অপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও শিক্ষামূলক বিষয়েই শ্রম ও অর্থব্যয় আগে আসা ও অধিকতর প্রযুক্ত হওয়া অবশ্য বেশী বাঞ্ছনীয়। বিশেষতঃ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিও যেমন ঐ দিকে, ঐ সকল জিনিষ সরবরাহের ব্যবস্থাও হইয়াই আছে। তবে ওদিকেও কুশ্রী, বাজে, বিদেশী বা সন্দিগ্ধ-বিদেশী জিনিষের স্থলে খাঁটি দেশী ভাল জিনিষগুলি সাধারণের গোচরে

যত বেশী আনা যায় ও তাহার উন্নতি ও বৈচিত্র্য সাধিত হয় ততই মঙ্গল। বিশেষতঃ নূতনত্বের জন্য এক স্থানের জিনিষ অন্যত্রই সকলের বেশী পছন্দ হয় বলিয়া সেই ভাবে তাহা জোগাইতে পারিলে লাভ জনক হইবার সম্ভাবনা। যে স্থানের জিনিষ সেখান হইতে অল্প মুল্যে আনিয়া অন্যত্র কিছু বেশী দামে বিক্রয় চলিতে পারে। তবে স্থানীয় বিশেষত্ব বা প্রয়োজনের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যেমন দক্ষিণ ভারতে দীর্ঘসাড়ী নহিলে চলিবে না। বাঙ্গলায় আবার অতি দৈর্ঘ্য অসুবিধা-জনক। কোন খানের সাড়ী আবার বর্ণ ও কারুকার্য্যে লোভনীয় হইলেও প্রস্থের অপ্রসরতায় অন্যস্থানের মেয়েরা ব্যবহার করিতে পারেন না। বস্ত্রের সূক্ষ্মতার দাবীও তেমনি সর্ব্বত্র সমান নয়। সেইজন্য অনেক স্থানের সুন্দর শিল্পকর্ম্ম স্থুলবস্ত্রের উপর হওয়ায় খুবই পছন্দ হইলেও অন্যস্থানের মেয়েদের অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। ইহার প্রতিকার হইয়া দেশী বস্ত্রের বৈচিত্র্য যতই বৃদ্ধি পায়, বিদেশীর প্রলোভনও ততই কম কমে। অলঙ্কারেও তেমনি যে সকল সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্য কোনস্থানে হয়ত নাকের গহনা বা অমনি কোন আজ কালকার বা অন্যস্থানের অপছন্দ কি অনাবশ্যক অলঙ্কারেই আবদ্ধ রহিয়াছে, সেগুলি এখনকার ব্যবহার্য্য ও পছন্দমত গহনার মধ্যে আনিতে পারিলে খুবই লাভকর হওয়া সম্ভব আর বলা বাহুল্য মেয়েরাও সঙ্গে সঙ্গেই খুসী হন। একস্থানে প্রচলিত সাধারণ বিশেষ নক্সার জিনিষও অন্যত্র মেয়েদের সম্মুখে আনিয়া ধরিতে পারিলেও এই একই কথা। এসবই অবশ্য এখন হইতেছে, আর সব স্থানের শিল্পই সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া বস্ত্রালঙ্কারে বৈচিত্র্যও যথেষ্টই আসিয়াছে সন্দেহ নাই। তবু সমগ্র ভারতে দেখিতে গেলে কতস্থানে কত শিল্প এখনও লুকাইয়া আছে। তাহার আবিষ্কার আর যেখানে যাহা মিলে না। তাহা স্থানেও কালোপযোগী ভাবে সরবরাহ করিবার ক্ষেত্র এখনও সুপ্রচুর।

বিদেশী শিল্প, নক্সাদিও বাছিয়া দেশকালোপযোগী জিনিষে প্রয়োগ করিতে পারিলে দেশের শিল্পকলার সমৃদ্ধি বৃদ্ধিই পায়। যেমন কাছের পারস্য দেশের কথা এই সূত্রে মনে আসিল। মুসলমান শিল্পের নমুনা আমাদের দেশে বিরল না হইলেও অনেক নূতন শিল্প ও নক্সার আদর্শ সেখান হইতেও শিখিবার আছে।

ঘরকন্নার সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য আবশ্যকীয় জিনিষ গুলির দিকেও এই ভাবে শিক্ষিত রুচিও ব্যবসায় বুদ্ধির স্থান খুবই রহিয়াছে। আমাদের দেশের অনেক শিল্প দ্রব্যেই কার্য্যকরত্বের দিকে দৃষ্টি না থাকায় ব্যবহারের পক্ষে অসুবিধা জনক। মাটির, পাথরের পিতল কাঁসার সব জিনিষ গুলিতেই সুবিধা ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির সহিত বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য্যও যথেষ্টই বৃদ্ধি পাইতে পারে। যেমন মাটির হাঁড়ি ও বৈয়ম গুলির ঢাকনিটী ঠিক না বসিয়া তাহা ইঁদুর আরসোলার প্রিয় বাসস্থান হইবার কারণ নাই। খাদ্যদ্রব্য রাখিবার যোগ্যতা বৃদ্ধির সহিতও ওগুলিতে কারুকার্য্য ও বর্ণ বৈচিত্র্য ফলাইবার অবসরও যথেষ্টই আছে। তেমনি আসামে এক প্রকার সুন্দর গাড়ু ও ঘটি পাওয়া যায়, কিন্তু উহার তলা প্রায়ই খোলা, অথবা এমন খারাপ ভাবে প্রস্তুত হয় যে, জলপাত্র

নামের সার্থকতা তাহাতে অল্পই থাকে। ইহাও কিছু অবশ্যম্ভাবী হইবার কথা নয়। সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য বা কারুকার্য্যপূর্ণ অনেক বাসন পত্রের সম্বন্ধেই ইহা খাটে। কোন জিনিষ হয় এত পাতলা যে অতি শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া বা তোবড়াইয়া যায়, নিয়ত অত্যন্ত ভারী বলিয়া অসুবিধাজনক। আর মূল্যও তাহাতে প্রয়োজনীয়তার অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়ে।

কিছু বুদ্ধি ও বিবেচনা ব্যয় করিয়া ইহার প্রতিকার করিলে এবং একস্থানের বা এক রকমের জিনিষের নক্সা ও গঠন অন্যস্থানে ও অন্যরকমের জিনিষে প্রয়োগ করিতে পারিলে মাটীর পাথরের, কাঁসার ও পিতলের সব জিনিষ গুলিরই বৈচিত্র্যের সঙ্গে ব্যবহার্য্যতাও এক ভাবেই বাড়ান যাইতে পারে। এখনকার পছন্দ ও প্রয়োজনের উপযোগী নূতন নূতন গঠনের জিনিষও যথেষ্টই প্রস্তুত হইতে পারে। ইহারও কিছু কিছু অবশ্য এখন হইতেছে, কিন্তু আরো মনোযোগের অবসরও তবু প্রচুরই রহিয়াছে। আমাদের ঘরকন্নার প্রয়োজন বুঝিয়া গৃহকর্ম্মের সুবিধা এবং শ্রম লাঘবেরও নানা দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি তৈরী হওয়া আর সেগুলি মেয়েদের হাতের কাছে আনিয়া ধরা আবশ্যক।

আর একটী কথাও অনেক সময়ই মনে হইয়াছে। মেলায় পূজা পার্ব্বণে কৃষক, শ্রমজীবি শ্রেণীকে যে সব সৌখীন জিনিষ কিনিতে দেখা যায়, সেগুলি প্রায়ই যেমন অসুন্দর, তেমনি ক্ষণস্থায়ী। মনে হয়, সস্তার তিন অবস্থা কথাটী সার্থক করিবার জন্যই যেন সেগুলির সৃষ্টি। কিন্তু গরীবদের কষ্টার্জ্জিত অর্থের একটা অপচয় নিবারণের দিকেও কি কিছু করা যায় না? অর্থাৎ সস্তার মধ্যেও সুন্দরও ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি তাহাদের সম্মুখে আনিবার আয়োজন হওয়া চাই। শিক্ষিত শ্রেণী তবু নিজেদের পছন্দ নিজেরা অনেকটা করিতে পারেন। কিন্তু ইহাদের ঠকান আরোই সহজ; কাজেই শিক্ষিত ব্যবসায়ীর ইহাদের হইয়া পছন্দ ও নির্ব্বাচন বেশীই দরকার। অথচ ইহাদের দিকে মনোযোগ দিলেই যেমন দেশের সত্য অবস্থা জানা এবং প্রকৃত দেশসেবা হয়, ব্যবসায়ের বড় স্থল পাইয়া লাভেরও বিস্তৃত ক্ষেত্র খুলিয়া যায়।

এই রকম নানাবিধ প্রয়োজন ও অভাবের আবিষ্কারে অনেকে কর্ম্ম ও উপার্জ্জনের ক্ষেত্র পাইতে পারেন বলিয়া বোধ হয়। গরীবদের জন্য পরিকল্পিত হইলেই খাদ্যদ্রব্য-গুলিকেই বা কেন যে বাসি, ভেজাল মিশ্রিত, দূষিত তেল ঘিয়ে প্রস্তুত কিম্বা মাছি ও ধূলায় পরিবৃত হইতেই হইবে, তাহারও অবশ্য কোন সঙ্গত কারণ নাই। ইদানীং চায়ের দোকানও সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া অপরিচ্ছন্নতা ও রোগের বীজ ছড়াইবার আর একটী নূতন আশ্রয় হইয়াছে। এসব কথা হইলেই অনেকে বাজারের জিনিষ ও চা বর্জ্জন করিতেই উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু খাবার ও চায়ের দোকান যদি আইন করিয়া বন্ধ না হয়, তাহা হইলে অনেকে অবশ্য উহা ব্যবহার করিবেই, আর তাহারাও যখন মানুষই তখন তাহাদেরও রক্ষার ব্যবস্থা করাই কি উচিত নয়? অর্থাৎ দোকানে বাজারেও মানুষের খাদ্য বলিয়া যাহা উপস্থিত হয়, সেগুলি যাহাতে সত্যই সে নামের যোগ্য হয়, তাই দেখিবার বিষয় নয় কি? দোকানে উহার

ক্রয় বিক্রয়েই ওগুলির আবশ্যকতাও কি প্রতিপন্ন হয় না? সর্ব্বত্রই আমাদের এই মানুষের মন ও আবশ্যকের দিকে না দেখার প্রবণতার তথাকথিত বস্তুতন্ত্রতা এতটুকুও না কমিয়া জীবন যাত্রার সবদিকের উন্নতিই শুধু প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে। আর উদ্যোগী বিদেশীরা এই সুযোগে প্রয়োজন ও অভাব মিটাইয়া আমাদের কিনিয়া রাখিতেছে।

প্রয়োজনের নামে যাহা চলে, তাহার সবই অবশ্য প্রয়োজন নয়। কিন্তু দুর্নীতি, দুর্গ্রহগুলি প্রতিসিদ্ধ করিতে হইলে মানুষের স্বাভাবিক আমোদ আহ্লাদ, আবশ্যকের দিকে দৃষ্টি বরং বেশীই দিতে হয়। খাদ্যদ্রব্যের বিশুদ্ধির জন্য মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি কর্ত্তৃপক্ষের ভাল রকম মনোযোগ দেওয়া অবশ্য খুবই দরকার। তবে শিক্ষিত ব্যবসায়ীরা দৃষ্টান্ত দ্বারাও এবিষয়ে লোকমত ও লোকবোধ উদ্বুদ্ধ করার সহিত নিজেদেরও অন্নসংস্থান করিতে পারেন।

ইয়োরোপীয় প্রণালীতে পরিবেশিত ইউরোপীয় খাদ্যের প্রতিও যে শিক্ষিত (ও অভিজাত) শ্রেণীর রুচি আসিয়াছে, ইহাও অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। কিন্তু ঐরূপ খাদ্য পাইতে হইলে কি ঐ ভাবে বন্ধুজনের আতিথ্য করিতে হইলে তাঁহাদের বিদেশী হোটেল ভিন্ন গতি নাই। উহার অন্য অবাঞ্ছনীয়তা ব্যতীতও দেশীয় পরিচ্ছদ ইত্যাদি লইয়া অপমানও তাঁহাদের না সহিতে হয় এমন নয়। এ অবস্থায় ইউরোপীয় পরিচ্ছন্নতার আদর্শের উৎকৃষ্ট হোটেল বা আহারালয় স্থাপনও কি আমাদের উচিত নয়? উহার সহিত উৎকৃষ্ট দেশী ভোজ্যের সংমিশ্রণ হইলে জাতীয় ভাব রক্ষার সহিত সকলের আরোই সুবিধাজনকও হয়। এমন কি বিদেশীরা বিশেষতঃ যাঁহারা এদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান-সঞ্চয়ের জন্য এখানে আসিয়া থাকেন, তাঁহারাও এগুলির প্রতিই আকৃষ্ট হইবেন বলিয়া মনে হয়। এভিন্ন যাঁহারা ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, সেখানকার সান্ধ্য ভোজনালয়ে বন্ধু সমাগমের আনন্দের অভাব তাঁহারা বিশেষরূপেই অনুভব করিয়া থাকেন। সে অভাবও ইহাতে পুরণ হইতে পারে। কিন্তু দেশী Army & Navy Stores বা Whiteway Laidlaw কোম্পানীর দোকানের স্থল যেমন মাড়োয়ারী Bengal Stores অধিকার করিয়াছেন, তেমনি আবার ভিন্ন প্রদেশীর উদ্যম যখন এই পরিকল্পনাটীকেও মূর্ত্ত করিয়া তুলিবে আর আমাদের সন্তানেরা তাহাতে কেরাণীগিরির জন্য দৌড়িবে তাহার আগে আর আমরা ইহাতে কখনই নামিব না। এখনই অন্য প্রদেশীয় ব্যবসায়ীকে কলিকাতা হইতে মফঃস্বলে আসিয়া এই ভাবের অতিথি সৎকার বা ভোজের আয়োজনের ভার লইতে দেখা যাইতেছে।

এই দেশব্যাপী অন্নসমস্যা ও কর্ম্মহীনতার দিনে শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ঘরের নরনারী মিলিয়া এই রকম অনেক দিকে কাজে আসিতে পারেন বলিয়া মনে হয়। ইহার অনেকগুলি ঠিকমত ভাবে করিতে হইলে অবশ্য প্রথমে মূলধন দরকার। অনেকে মিলিয়া করিতে পারিলে, সে বাধার কিছু প্রতিকারের সম্ভাবনা। আর এখনও ত দেশে স্বচ্ছল অবস্থার লোক একেবারে লোপ পান নাই, তাঁহারা এসবে মন দিলে ত অনেক অন্নহীনের অন্ন ও দেশহিত এক সঙ্গেই হয়। এছাড়া কতকগুলি

কাজ শিক্ষিত লোকেরা প্রথমে সামান্যভাবে আরম্ভ করিয়া ক্রমে প্রসার বাড়াইয়াও লইতে পারেন। কতকগুলি অভাব ও কার্য্যক্ষেত্রের বিষয়ে যাহা মনে আসিল, এখানে তাহার উল্লেখ মাত্রই মোটামুটি করা হইল। কি উপায়ে কার্য্যতঃ ইহার সামান্য সম্ভব, রুচিবোধের সহিত লোকসেবার আকাঙ্ক্ষা ও ব্যবসায়বুদ্ধি যাঁহাদের একসঙ্গেই আছে, এমন শিক্ষিত কর্ম্মীদেরই তাহা চিন্তনীয়।

এই পর্য্যন্ত লেখার পর এই মাসের (ফাল্গুন) প্রবাসীতে গত প্রবাসী-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্রের অভিভাষণ হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে চোখে পড়িল। আমাদের ক্ষুদ্র আলোচনায় যাহা বাস্তবিক হইয়াছে, অধ্যাপক মহাশয়ও তাহাই অনেকটা বলিয়াছেন। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের তিনি কৃষি ও শিল্পজাত নিজেরা প্রস্তুত করিতেই শুধু ব্যাপৃত না হইয়া কৃষক ও শিল্পীর নিকট হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মধ্যে বণ্টনের কাজে আসিতে বলিয়াছেন। আমাদের প্রসঙ্গেও মুখ্যতঃ সেই বণ্টনের বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে।

বাস্তবিক কৃষি ও শিল্পকর্ম্ম ভাল হইলেও ভদ্র সন্তানেরাও উহাতেই নিযুক্ত হইলে বর্ত্তমান কৃষক, শিল্পীদের অন্নেই যেমন ভাগ বসান হইবে, তেমনি ঐ ক্ষেত্রেও ভিড় হইয়া তাহারও মূল্য কমিয়া যাওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং এখন যেমন চাষী ও শিল্পী বিদেশী ও ভিন্ন প্রদেশীর বলি হইয়া আছে, তাঁহারাও তাই হইয়া তাহাদের আপনাদের ও দেশের দুর্দ্দশা বৃদ্ধিই বরং করিবেন। কিন্তু ব্যবসায় বা পণ্য দ্রব্যের বিভাগ, বিতরণের ভার ভদ্রসন্তানেরা লইলে তাহা যেমন তাঁহাদের শক্তি, অভ্যাস ও ঐতিহ্যের উপযোগী হয়, তেমনি তাহা হইলেই বিদেশী বা অন্য প্রদেশীর শোষণ হইতে দেশ কিছু রক্ষা পাইতে পারে। অর্থাৎ তাহা হইলে দেশের দরিদ্রের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহাদের ও দেশের নিরন্নতা আরো বৃদ্ধি না করিয়া তাঁহাদের প্রতিযোগিতা বিদেশী বা ভিন্ন প্রদেশীর শোষণ হইতে দেশ কিছু রক্ষা পাইতে পারে। অর্থাৎ তাহা হইলে দেশের দরিদ্রদের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহাদের ও দেশের নিরন্নতা আরো বৃদ্ধি না করিয়া তাঁহাদের প্রতিযোগিতা বিদেশী বা ভিন্ন দেশীদের সহিতই হইবে। ইহাতে দাঁড়ান অবশ্য সহজ হয়। অর্থ বলের স্বল্পতায় প্রথমেই বড় বড় কারবারে বাঙ্গালী ইহাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না।

তারপর Standard of living বা জীবন যাত্রার প্রণালীর উচ্চতার বাধার কথা মিত্র মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ছাড়িয়া তাঁহাদের পশ্চিমা, মাড়োয়ারীর ধারা ধরিতে অনেকেই পরামর্শ দিবেন সন্দেহ নাই; কারণ একটু পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ও সংস্কৃতির চর্চ্চাই আমাদের দেশে বিলাসিতা নামে অভিহিত অনেক স্থলেই হইয়া থাকে। এ বিলাসিতা ছাড়িবার জিনিষ নয়। তবে 'Sweated labour' এ রাজি না হইলেও শ্রমবিমুখতা দূর হওয়া উচিত। বিলাসিতা বর্জ্জন অর্থে ইহাই বুঝিতে হইবে। ইহা ছাড়া নৈপুণ্য, কোনখানে কিসের চাহিদা, অভাব বোঝা, খবর রাখার সহিত লোককে নূতন নূতন সুবিধা ও ভাল জিনিষ, ভাল কাজ

দিতে পারাই প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার প্রধান বিষয়। ইহাতে বুদ্ধিমান বাঙ্গালীর বুদ্ধির চালনা হইয়া উৎসাহ এবং সফলতা, লাভের সম্ভাবনা।

বর্ত্তমানে একটী নূতন অভাবও খুবই বেশী অনুভূত হইতেছে মনে পড়িয়া গেল। পর্দ্দাপ্রথা দূর হওয়ার সহিত এখন মেয়েরা নিজেরাই সব রকম জিনিষপত্র দেখিয়া শুনিয়া কিনিতে আরম্ভ করিতেছেন। বস্তুতঃ স্বাভাবিক প্রধান ক্রেতাও তাঁহারাই। কারণ জীবন যাত্রার সব বিষয়ের এবং সকলের জন্যই আবশ্যকীয় দ্রব্য সরবরাহ করিবার ভার তাঁহাদেরই উপর। নিতান্ত অস্বাভাবিকভাবে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াই এই অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্যসাধনের জন্যও এতদিন তাঁহার্দের পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু অন্য-প্রদেশী যে শ্রেণীর লোকের দোকান হইতে সাধারণতঃ দ্রব্যজাত ক্রয় করিতে হয়, পর্দ্দাহীন নারী দেখিতে তাঁহারা অভ্যস্ত না থাকায় এবং মার্জ্জিত শিক্ষাদীক্ষারও অভাবে মহিলাদের সহিত যথোপযুক্ত ব্যবহার তাঁহারা অনেক সময়েই করিতে পারেন না। এইরকম অনেক দোকানদারকেই প্রায় যেরকম নির্লজ্জ, উদ্ধত, অমার্জ্জিত, শঠ ইত্যাদি হইতে দেখা যায়, তাহাতে পর্দ্দা না মানিলেও মেয়েদের এই অতি স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয় বিষয়, নিজেরা পছন্দ করিয়া জিনিষ কেনা দুর্ঘট হইয়া পড়ে। শিক্ষিত বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা যদি এদিকে অগ্রসর হন, তাহা হইলে মহিলাদের সুবিধা, সম্ভ্রমরক্ষার সহিত নিজেরাও লাভবান্ হইয়া প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার সুবিধা পাইতে পারেন। কারণ ইহাও একটি বড় অভাব। সুতরাং ব্যবসায়ে ভদ্রতা, রুচি, নপুণ্য ও সততার সমবায় সাধন করিতে পারিলে তাঁহাদের সাধারণকে আকৃষ্ট করার খুবই সম্ভাবনা।

ভদ্রের এই সুবিধা ও অভাব মোচনের কাজ ছাড়া তথাকথিত অভদ্র বা দরিদ্রদেরও তাঁহারা একটী খুবই বড় কাজে লাগিতে পারেন। কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি দরিদ্রদের টাকা ধার ও ধারে আবশ্যকীয় জিনিষ দেওয়ার কাজেও যে বহু অবাঙ্গালী বাঙ্গলায় এবং সর্ব্বত্রই (যথা এই পুরীধামেও) গরীবের শোষণ ও নির্য্যাতন করিতেছে। সমবায় প্রচেষ্টা (co-operative movement) দ্বারা তাহার প্রতিকারের যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা অবশ্য প্রশংসনীয়ই; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ভদ্র ও শিক্ষিতেরা এই কাজে নামিলে তাহারা তাঁহাদের কাছেই বেশী আসিবে, কারণ আফিস, সরকার ইত্যাদি তাহারা একটু ভয়ের চক্ষেই দেখে, ওসব কায়দা-কারণ তাঁহারা ভাল বোঝেও না। কাবুলীদের কাছে অত্যধিক সুদে নির্য্যাতনের ভয় সত্ত্বেও টাকা ও জিনিষপত্র কেন লয়, ইহার উত্তরে তাহারা বলিয়া থাকে যে, তাহাদের কাছেই টাকা ও জিনিষ সবচেয়ে সহজে পাওয়া যায়। ভদ্রলোকদের কাছ হইতে আর একটু সুবিধায় দয়াদাক্ষিণ্যের সহিত ঐরকম "সহজে" সব পাইলে তাহারা তাঁহাদের দিকেই ঝুঁকিবে মনে হয়। এই সূত্রে তাহাদের সহিত অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হইয়া, তাঁহাদের ও দেশের অনেক

উপকার, উন্নতি করিবার ক্ষেত্র ও সুবিধাও তাঁহারা পাইতে পারেন। বেশী ঢিল দিলে অবশ্য ব্যবসায়ে লোকসান হইবে কথা হইতে পারে; আর তাহার কিছুই সম্ভাবনা যে নাই এমনও বলা যায় না। তবে সত্যই তাহাদের হৃদয় জয় ও আকৃষ্ট করিতে পারিলে ক্ষতি যে হইবেই ইহাও মনে হয় না। কিন্তু এই রকম বিশেষ কিছু দিতে ও করিতে না পারিলে কোন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই তাঁহারা দাঁড়াইতে পারিবেন না, এদিকে এইসব দিক দিয়া এখনও যে পথ খোলা আছে ও যে অভাব রহিয়াছে পরে তাহাও অন্যের দ্বারাই মিটিয়া এগুলিও রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

নূতন গ্রাহিকার সুবিধা

আগামী বৎসর যাঁহারা জয়শ্রীর নূতন গ্রাহিকা হইবেন, তাঁহারা বৈশাখ মাসের মধ্যে ডাক মাশুল পাঠাইলে ১৩৩৮ ও ১৩৩৯ সনের যে কোন বৎসরের এক সেট পত্রিকা তাঁহাদের বিনামূল্যে ও ১৩৪০ সনের একসেট অর্দ্ধমূল্যে উপহার দেওয়া হইবে। সেট অল্পই আছে, বিলম্বে আবেদন করিলে নিরাশ হইতে হইবে।

অওরৎ ও হাতিয়ার

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

লেখাটার ওপরকার নাম দেখে বলা বাহুল্য বোঝা যাবে এদেশী নাম নয়।

কিন্তু নারী বা অওরৎ সকল দেশেই আছে, যতবারই (বলতে গেলে প্রত্যহই) নারীহরণ, নিগ্রহ, অত্যাচারের কথা পড়ি, মনে পড়ে যায়, ঐ অওরৎদের দেশের কথা।

এই অভিনব আশ্চর্য্য কাহিনীর মত সত্য ঘটনা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর হয়ে চলেইছে, আর শাস্তি, আন্দোলন, আশ্রমবাস, পরিত্যাগও সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ছে, অথচ বন্ধও হয় না, বন্ধ হবার কোন গতিকও দেখা যায় না। এর মূলে যে কি কারণ, এর নির্ণয় কর্‌লে তবে এর প্রতিকার হয়তো হয়, তার সময় হয়ত সরকারী মতে আসেনি; কিন্তু অর্থাৎ এই নিতান্ত নির্জ্জীব নিরীহ ভীরু মেয়েদের মতকে জনমতে নিয়ে চলা উচিত, আর এই ঘটনা হওয়া সম্বন্ধে চুপকরে থাকা উচিত নয়। যারা হৃত হয়, অপমানিত হয়, 'বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা' হয়ে জাত, মান, স্বাস্থ্য, আশ্রয়, ভবিষ্যৎ সব হারিয়ে বসে রইল—এককথায় সব হারিয়ে—(কেন না ছোঁয়া গেলেই তো গেল!) ঐ ঘায়ের মতই অস্পৃশ্য ঘৃণ্য অবস্থায় আমরণ বেঁচে থাকবে, তার মধ্যে আমাদের দু'দশজনের সহরবাসিনীদের, ঐশ্বর্য্যশালিনীদের আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই বলে তো নিশ্চিন্ত থাকা যায়না। দিনে দিনে পতিতার সংখ্যা, আর অনাচারের সংখ্যা আরও বেড়েই চল্‌বে তাতে।

বাঙ্গলায়, বিহারে, যুক্তপ্রদেশে, পাঞ্জাবে, রাজপুতনায় পর্দ্দানসীন হিন্দু-মুসলমান মেয়েও আছে, আবার গরীব অরক্ষিত কায়িক পরিশ্রমে দিনাতিপাত করে এমন মেয়েও আছে। হিন্দু-মুসলমান সংখ্যা কোথায়ও কম-বেশী সংখ্যা, কোথায়ও সমান সংখ্যা তাও আছে। কিন্তু বাঙ্গলাদেশের মেয়েদের মত এমন লাঞ্ছনার কথা হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সব মেয়ে—আর কোথাকার কাগজে বেরোয় না। আমার মনে আছে, বছর কয়েক আগে রাজপুতানায় বাড়ীর এক চাকর লোকের বসতি পল্লী থেকে বেশ খানিক দূরে তার বাড়ী করেছিল। কাছাকাছি তার বাড়ীর থেকে ছিল ষ্টেশন, আর একদিকে ছিল সুতোর কল, জলের কল (Water Works)। তার কুলীমজুরের সংখ্যা কম নয়। মাঝখানে মাঝখানে ছোট খাটো বস্তি। তারমাঝে একটু ঘনগোছের ঝোপে ঝাড়ে কাঁটাবনে ভরা বনও আছে। রাত্রের পথে ছোটবাঘ, চিতাবাঘেরও দর্শন দুর্লভ নয়।

বাড়ী যায় সে অনেক রাতে। তার চার পাঁচটী মেয়ে আর স্ত্রী, আর পুরুষ নেই বাড়ীতে

বাঙ্গলাদেশের বাসি কাগজে পুরানো খবর পৌঁছায়, তবু দেশের কথা পড়ে পড়ে আশ্চর্য্য হই। একদিন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তার ঘরের মেয়েদের যে সে একলা ফেলে রেখে সেই ভোরে চলে আসে, আর রাত্রি ১০টা ১২টায় যায়, তারা কেমন করে একলা থাকে ?'

সে দুঃখিতভাবে বল্লে—'কি আর করব, চাকরী করতে হবে তো!'

তাদের বিপদের কথা, ভয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। বাঙ্গলা দেশে স্বামীর পাশ থেকে, বাপের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তো!

এবার সে বল্লে—'হাতিয়ার আছে ঘরে। প্রতিবেশী আছে পাশে, তাদেরও হাতিয়ারশূন্য ঘর নয়!' (হাতিয়ার অর্থে অস্ত্র)।

এমন নিশ্চিন্ত আশ্বস্তির সুরে সে বল্ল, 'হাতিয়ার আছে ঘরে'—যে আশ্চর্য্যও লাগ্‌ল, আনন্দও হ'ল।

তাকে দেখে খুব মহাবীর বলে মনে হ'ত না। নিতান্ত জীর্ণশীর্ণ ৪৫ বছরের প্রৌঢ়। তার মেয়েদেরও রাজপুত মেয়েদের মত বীরাঙ্গনা ভাবার অবকাশ ছিল না, কেননা দেখেছিলাম তাদের চেহারা, ক্ষীণাঙ্গী বালিকা মাত্র। জাতে নাপিত, নরুণধরা জাত। ওখানে বাসনমাজা জাত; ক্ষত্রিয়োচিত কাজও নয়, নিতান্ত অবীরাদের মত কাজ। অতি নম্র গরীব স্বভাব। কিন্তু তার আত্মরক্ষা কর্‌বার, আত্মসম্মান রক্ষা কর্‌বার উপায় আছে ঘরে। ক্ষমতা তার আছে কিনা সেও জানে না, আমরাও জানি না, কিন্তু সে জানে উপায় আছে। প্রতিপক্ষ কেউ থাক্‌লে সেও জানে উপায় আছে।

সবচেয়ে বড় কথা এই প্রতিপক্ষের সেটা জানা। যা হোক, আমরা জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'কি হাতিয়ার আছে তোদের ? বল্লে, 'বর্শা, তলোয়ার, ছোরা, বন্দুক, লাঠি এই সব।' ভাই হাস্‌লেন, বল্লেন, 'সেকেলে দেড়মণি বন্দুক তুলতে পারিস ?'

আমরাও হাস্‌লাম, বল্লাম, 'চালাতে পারিস্ ?' 'হাঁ- সকতা!' অর্থাৎ পারি। নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে সে বললে, পারি।

এই পারার কথাই হচ্ছে গোড়ার কথা। শুধু গোড়ার নয়—মাঝের শেষের সবই। প্রতিকার করবার যার ক্ষমতা আছে, তাকে প্রতিপক্ষ ঘাঁটায় না, এ যুদ্ধলিপ্সুদের মধ্যেও দেখা যায়—কাপুরুষদের মধ্যেও আছে।

তাই ঐ 'সকতা' কথাটার অত মূল্য।

অনেকেই হয়ত জানেন না, রাজপুতানায় অস্ত্র আইন নেই। তলোয়ার, কিরীচ, ছোরা, বন্দুক, বর্শা—যা'ই হোক, সেকেলেই হোক, আর একেলেই 'হাতিয়ার' হোক, ও দের ঘরে ওরা রাখ্‌তে পারে এবং ব্যবহার কর্‌তে পারে। নিরীহ মালীর ঘরে, তাঁতি, তেলী, নাপিতের ঘরে, কুমারের ঘরে—নিতান্ত নিরীহ গরীব চাষী কৃষাণদের ঘরেও হাতিয়ার থাকে। মরিচাপড়া তলোয়ার, বর্শা, ছোরা মাটীর দেওয়ালে, ঘরের কোণে, ময়লা কাপড়ের সঙ্গে, ঝুড়ির সঙ্গে, কাস্তে কোদাল খুরপের সঙ্গে আছে। আর খড়ের চাল বাঁশের আগল দেওয়া ঘরে স্ত্রী কন্যা নিয়ে হয়ত আরও সব পরিজনদের নিয়ে দীন গৃহস্বামী নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

যদি কেউ আক্রমণ করে, হাতিয়ারে আত্মরক্ষা করবে, প্রতিপক্ষকে ঠেকাবে, না পার্‌লে মেয়ের হাতিয়ার দিয়েই মরে সম্মান মর্য্যাদা রক্ষা করবে। পাট ক্ষেতে, ধান ক্ষেতে, নৌকোর পরে নৌকো করে দিনের পর দিন একটি মাত্র নারীর ধর্ম্ম, মান, দেহ, মন, আত্মাকে অসংখ্য দুর্ব্বৃত্ত দুরাচারের হাতে ছিন্ন ভিন্ন হতে দেবার সুযোগ নেই। সে কিছু না পারুক, মরতে পারবে ওদের হাতে পড়্‌বার আগে।

কাগজে দেখলাম, সেদিন পার্লামেণ্টে এইকথা উঠেছে, সহকারী ভারতসচিব মহাশয়ের জবাব—"না, কোথায় বেশী! প্রতি বৎসরেই যেমন হয়, তা'ই!"

এই প্রসঙ্গে "দেশ" লিখছেন, ১৯৩২ সালের বাঙ্গলা পুলিশের যে কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে, তাহাতে নারীহরণ ও নারীনির্য্যাতন সম্পর্কে লেখা হয়েছে—"নারীহরণ ও নারীর উপর অত্যাচারমূলক অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখা যাইতেছে। ১৯৩২ সালে ঐ দুই শ্রেণীর অপরাধে ২৩৪ ও ৪৫৭টী মোকদ্দমা সত্য বলিয়া রিপোর্ট করা হয়েছে। (১৯৩১ সালে উহাদের সংখ্যা ছিল ২১২ ও ৩৮৭)।... বর্দ্ধমান, নদীয়া ও হুগলী জেলায় যথাক্রমে ২১, ২০, ১৭টী এই শ্রেণীর অপরাধ বাড়িয়াছে।"

বাঙ্গলা সরকার এর ওপর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—"এই অপরাধ ৯৪টী বেড়েছে, এর প্রতিকার জন্য জোর তদন্ত করা হবে।" এবং অন্যত্র বলেছেন "পুলিশকে এবিষয়ে অবহিত হতে।"

ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকার, আর বাঙ্গলার লোকের এ বিষয়ে মতামত ও প্রতিকার চেষ্টা যেমন গদাইলস্করিভাবে চিরকাল হয়, তাই হচ্ছে এবং আমরাও কাগজে একটি করে ঘটনা পড়ছি এবং শিউরে উঠছি। কিন্তু সত্যিকার প্রতিকার যে কবে হবে, আর কাকে বলে, আর কেনই বা হয় না—এর কারণ কোন্‌খানে তাই ভাববার।

যদি দেশ দেশান্তরে চেয়ে দেখি, যদি যুগান্তরের ইতিহাসের পাতা খুলি, যদি স্বাধীন দেশের নারীকে দেখি, তাহলে আমাদের ঐ চোখে পড়ে, আত্মরক্ষা এবং আততায়ীকে তখনি প্রতিরোধ করবার জন্য তাদের ঘরে উপায় ছিল এবং আছে। তাদের 'হাতিয়ার' ছিল বা আছে এবং তাই পুরুষের শৌর্য্য আছে এবং নারীর মান আছে। এদেশেরও এক এক সময়ে কেউ কেউ (চপলাসুন্দরীরা দু'জন) বঁটী দা'য়ে আত্মরক্ষা করেছেন। অথচ বিছানার নীচে, হাতের কাছে, পুকুর ঘাটে, ক্ষেতের পথে তো মানুষ আঁশ বঁটী বা তরকারী বঁটী কিম্বা দা' কাটারী নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না এবং দা' ও বঁটী কিছু এমন অস্ত্র বা হাতিয়ার জাতীয় জিনিষ নয় যে, ইচ্ছামত চালনা করতে মানুষ অভ্যস্ত থাকবে, অথবা অনেককে ঠেকাবে এবং আরও এককথা, সেটী প্রতিপক্ষের হাতেও থাকাতে পারে। সে ক্ষেত্রে যদি গ্রামবাসীর ঘরে শাসন করবার মত অস্ত্র থাকে, তাহলে হয়ত এই অতিশয় কলঙ্ককর, রাষ্ট্রের—সমাজের—মানুষের—নিবীর্য্য অখ্যাতিকর, নিন্দার্হ, ঘৃণিত, কলঙ্কের কাহিনী আর পড়ে জেনে শিউরে উঠতে হয় না। দুর্বৃত্তের দণ্ডও হয়, ভয়ও হয়। ও-শ্রেণীর দুর্বৃত্তেরা কাপুরুষ হয় স্বভাবতঃই।

এই নিরস্ত্র, নিবীর্য্য, বহুদিন নির্ব্বল জাতের স্বভাবতঃই অস্ত্রশালী কিম্বা একাধিক প্রতিপক্ষের কবলে গিয়ে পড়তে ভয় হয়। সেখানে অস্ত্র থাকলে নিবীর্য্য লোকেরও 'মরি বাঁচি' মনোভাব একটা জাগে। প্রতিরোধ করতে গিয়ে মৃত্যুও হয়। সেদিনও কাগজে পড়লাম, একজন মেয়ের আত্মীয়ের মৃত্যু-কাহিনী। অন্যদেশী মুসলমান মেয়ে, কাশ্মীরী মেয়ে, শিখ মেয়ে, পাঞ্জাবী, বেহারী রাজপুত মেয়ে, গরীব সকলের খুব পর্দ্দা নেই, সুশ্রী সুন্দরী বাঙ্গলা দেশের চেয়ে অনেক বেশী, অনুপাতে, হিন্দু মুসলমান, দুশ্চরিত্র পুরুষও নিশ্চয়ই ও দেশে আছে; কিন্তু আশ্চর্য্য তাদের দুশ্চরিত্রতা এবং দুষ্টবৃত্তি বাঙ্গলার মত এমন হীন চরম পৈশাচিক নয়। একে পাশব বলাও যায় না, কেননা পশুরাও প্রাকৃতিক নীতি মানে, পশু জগতেও এত হীনতা দেখা যায় না। এখানকার ঘটনা পশু জগতের সীমাও অনেকদিন অতিক্রম করেছে।

বাঙ্গলা দেশের মেয়ে অরক্ষিত, পুরুষ নিবীর্য্য, সরকার উদাসীন, গ্রামবাসী নিরস্ত্র, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান আত্মকলহ কখন জাগে, তার ভয়ে আড়ষ্ট, তারপর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঐ ঘটনা চলছে। কারু কন্যা, স্ত্রী, বোন নিয়ে দিন কাটানো শক্ত।

শিখদের আছে কৃপাণ, রাজপুতদের 'হাতিয়ার' থাকেই, নেপালীদের আছে কুকরী, অন্য জাতিদের লাঠি আছে; পাঞ্জাব যুক্তপ্রদেশ বেহারের গ্রামের মেয়েদের ছেলেদের সকলেরই দূর পথের সম্বল লাঠি। শুধু বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমানের হাতেও কিছু নেই, ঘরেও কিছু নেই এবং অন্তরে দিন দিন পশুবৃত্তি জেগে উঠছে। নারী দেহ এদের কাছে কি, তার সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া যায় না। এর প্রতিকার অবলাশ্রম এবং আশ্রয়চ্যুতাদের রক্ষাগারই শুদ্ধ নেই; সেতো পরের কথা, যা করবার তার জন্য।

এর জন্য জিজ্ঞাস্য এই, দিনের পর দিন এই রকম আর কতদিন ধরে চলবে? সমস্ত ভারতবর্ষের মেয়েদের নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের দিক থেকে এই প্রশ্ন ওঠা দরকার।

এর জন্য শাস্তি, পুলিশ, বিশেষ ধারা, বিশেষ পুলিশ, বিশেষ শাস্তি, বিশেষ নিয়ম কেন হবে না? যে নারীর উপর একদল ইতর ঘৃণ্য অত্যাচার করবে, তার দেহ মন সমাজ আশ্রয় থেকে টেনে নিয়ে তাকে ছিন্নভিন্ন করে, তাদের সেই সুযোগ না হওয়ার জন্য, ভবিষ্যতে আবার না হয় তার জন্য, সেই সব গ্রামে কি ব্যবস্থা হয়েছে? শুধু ঐ শ্রেণীর অত্যাচারের দমনের জন্য বিশেষ পুলিশ সেই সব গ্রামে কেন থাকবে না? এবং তাদের কঠোর দণ্ডই বা কেন হবে না সকলেরই? কিছুদিন আগে শ্রীযুত আমীর আলী মহাশয়ও এই অপরাধের জন্য গুরুদণ্ডের কথা বলেছিলেন মনে হচ্ছে।

এছাড়া ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে এমন ইতর অত্যাচার হয়, নৃশংস নারী-লোলুপতা আছে, এ আলোচনা প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে হওয়া উচিত। সেই সব ক্ষেত্রে কি উপায় নেওয়া হয় দমনের, অথবা সেই সব ক্ষেত্রে যদি এরকম ব্যাপার না হয়, তারই বা কি কারণ, এও দেখা দরকার।

(মনে হয়, আরও একদিক এর আছে, দেশে কর্ম্মশিক্ষা নেই, ধর্ম্মশিক্ষা নেই, বীরধর্ম্ম চর্চ্চার সুযোগ নেই, লোকশিক্ষার প্রতিষ্ঠান নেই, আনন্দের চর্চ্চার কেন্দ্র নেই, সমাজের ভদ্র-আবেষ্টন নেই, তাই এরা একমাত্র হীনবৃত্তি নিয়ে কাপুরুষের মত নারীর উপর—দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে।)

ডিসেম্বর মাসের 'মডার্ণ রিভিউতে' দেখলাম, সরকার এই শ্রেণীর অপরাধের শাস্তি ও দণ্ডের বিষয়ে দেশবাসীর মত চেয়েছেন। তাতে খুলনাবাসীদের মত বেত্রদণ্ডের সপক্ষে। 'মডার্ণ রিভিউ' বলেন, "বেতমারা বর্ব্বরোচিত দণ্ড হলেও এক্ষেত্রে বিশেষ করে দলবদ্ধভাবে যখন এই অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তখন হওয়া উচিত।" এ ছাড়াও "মডার্ণ রিভিউ" বলেন, "যে ক্ষেত্রে অত্যাচারিতা মেয়েটিকে না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তাদের সাহায্যকারীদের সম্পত্তি যা' থাকে, তা' বাজেয়াপ্ত করা উচিত শাস্তির সঙ্গেই এবং প্রয়োজন হলে, দলবদ্ধ অত্যাচারের ক্ষেত্রে 'ষ্টেরিলাইজেশনের'ও আমরা বিশেষভাবে ও একান্তভাবে পক্ষপাতী।

আমাদের বক্তব্য, যদি গ্রামবাসীর নিরস্ত্রতার সুযোগ ওরা দলবদ্ধভাবে নেয়, তাহলে সশস্ত্রতার সুযোগ দায়িত্বসম্পন্ন গ্রামবাসীদের পাওয়া উচিত। অথবা বিশেষ পুলিশ বা চৌকীদার বন্দোবস্ত করা দরকার এবং এও হতে পারে, যে শ্রেণীর দ্বারা এই অত্যাচার হয়, সন্দেহ হয়, তাদেরই ঐ গ্রামের নারীরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া এবং অত্যাচার হলে তাদেরই গুরু দণ্ডদান, "মডার্ণ রিভিউ"র উল্লিখিত শাস্তি বিধান করা উচিত।

গবর্ণমেণ্টের এটা সবসময়ে মনে থাকা দরকার, নারী তার নিরুপায় নিরীহ প্রজা, তার নিজের ঘরে সে স্বচ্ছন্দে বাস করতে যদি সে নির্য্যাতিত ও অসম্মানিত হয়, থাকতে না পায়, সেটা সেই শাসনতন্ত্রের প্রকাণ্ড কলঙ্ক।

কোন সভ্য দেশে এই কলঙ্ক এত বড় আছে, আমরা জানি না। *

* এই লেখা শেষ করার পর এই পৌষের প্রবাসীতে দেখলাম, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশসমূহে এইরূপ যে অত্যাচার হয়ে থাকে, তার পুলিশ রিপোর্ট দেখা গেছে।

প্রদেশ	লোক সংখ্যা	১৯৩২ সালের নারী হরণাদি অপরাধ
পাঞ্জাব	২৩৫৮০৮৫২	৫০৪
আগ্রা অযোধ্যা	৪-৪০৮১৮৩	৭১১
বাঙ্গালা	৫০১১৪০০২	৬৯৩

দেখা যাচ্ছে এই জিনিষ অন্যত্রও আছে। তাতে অবশ্য প্রবাসীর অভিমত অনুসারেই বলতে হয়—"বাঙ্গলার স্থান অধমতম হয় না" এবং আমাদের বক্তব্য যদি কমই হয়, তা' হলেও অপরাধ একটী দু'টী কমে যায় আসে না, তাতে অপরাধের ক্ষালণ হয় না, দোষ লঘু হয় না।

সবচেয়ে আশ্চর্য্য হয়েছি এই শ্রেণীর নির্লজ্জ অনাচারের বিরুদ্ধে বা উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে নিখিল মহিলা সম্মিলনী একটী কথাও উত্থাপন না করাতে! ঐ প্রদেশীয়া প্রতিনিধি মহিলা সকল দেশেরই ছিলেন তাতে, শুধু রাজপুতনা বাদ ছিল দেখিলাম।—দেশ

জাপানী নারী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত

প্রাচ্য জগতে জাপান আজ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহাদের নিজ গুণাবলীর সহিত ভারতবর্ষ ও চীনের প্রশংসনীয় সৎকার্য্যের সংমিশ্রণে তাহারা আরও সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে। কি রাষ্ট্রীয় জীবন কি সামাজিক জীবন সকল দিক হইতেই তাহারা উন্নততর পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

রাজভক্তিও তাহাদের জাতীয় জীবনের একটী প্রধান অঙ্গ। রাজা ও প্রজাবর্গের ভিতর আন্তরিক ভালবাসা ও প্রীতিই অদ্যাবধি একই বংশের লোক স্বাধীন হওয়া তাহাদের চতুর্দ্দিক হইতে আরও শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। পূর্ব্বপুরুষ, মনীষিগণ ও সম্রাটের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের পূজ্যাসনে প্রতিষ্ঠিত করাই তাহাদের ধর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য। আর, সম্রাটের পূর্ব্বপুরুষেরাই তাহাদের প্রধান পূজ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

সভ্য জগতে জাপান আজ পৃথিবীতে যে স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নয়। অসভ্য বলিয়া যে জাতি একদিন পৃথিবীতে পরিচিত ছিল আজ সেই জাপানই প্রাচ্য জগতে সভ্যতার চরম পরিচয় দিতেছে। তাহাদের জাতীয় জীবনের প্রতি দিকেই সভ্যতার আলো ছড়াইয়া চলিয়াছে। সামরিক সংক্রান্ত ব্যাপার হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দ উৎসব প্রতি দিকেই তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সিনেমা ও থিয়েটারে জাপান ছাইয়া ফেলিয়াছে। প্রায় ১৩৮৫ হাজার সিনেমা ও ৫৮৯ শত থিয়েটারের মঞ্চ জাপানের বুকে দণ্ডায়মান।

শিক্ষা বিভাগের প্রতিও একটু দৃষ্টিপাত করিলে, জাপানের শিক্ষাসম্বন্ধে আমাদের অনতিবিলম্বেই একটা সুন্দর ধারণা হইয়া যাইবে। শিক্ষার প্রসারতা দিন দিন দ্রুত গতিতে চলিয়াছে। জাপানী ইউনিভারসিটিগুলিতে প্রায় ১০৬৯০০ ছাত্র রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী স্কুল সমূহে ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা যে কত তাহার ইয়ত্তা নাই।

জাপানের যে নারী জাতি একদিন গৃহের অভ্যন্তরে থাকিয়া পারিবারিক কার্য্যকলাপে আপনাদের লিপ্ত রাখিতেন আজ তাঁহারাই মাভৈঃ রবে পুরুষের সঙ্গে একই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গৃহের পর্দ্দা, বাহ্যিক অবগুণ্ঠন হইতে তাঁহাদের আর আড়াল করিয়া রাখিতে পারিল না। তাঁহারা,—মুক্ত স্বাধীন, শক্তিশালী পুরুষের সঙ্গে আসিয়া প্রত্যেক কার্য্যের অংশী হইয়া দাঁড়াইলেন। চাকুরী ও ব্যবসা-ক্ষেত্রে অনতিবিলম্বেই নিজেদের স্থান করিয়া লইলেন—এমন কি আইন ব্যবসায়েও আজ তাঁহারা পুরুষের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই অল্প কালের মধ্যে তাঁহারা পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে সফলকাম হইয়াছেন তাহা চিন্তা করিলে বাস্তবিকই আশ্চর্য্যে অভিভূত হইতে হয়। ইহা ব্যতীত ফ্যাক্টরী, ওয়ারক্ সপ প্রভৃতিতেও তাঁহারা নিজেদের স্থান করিয়া লইয়াছেন।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে কন্যার বিবাহের জন্য অভিভাবককে পূর্ব্ব হইতেই চিন্তায় ভাবনায় নিজেকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইত। বিবাহ সমস্যা অর্থাৎ কন্যাদায় সমস্যা তখন 'বজ্রাদপি কঠোরাণি' বলিলেই চলিত। কন্যাদায় হইতে পরিত্রাণ পাইতে সে সময় অভিভাবককে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত। টাকা পয়সা, যৌতুক প্রভৃতি দিতে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তিটুকুই এক প্রকার বিক্রয় করিতে হইত। ভারতের প্রতি একটু লক্ষ্য করিলেই এ বিষয় জনসাধারণের সহজগম্য হইবে বলিয়া মনে হয়! কিন্তু আজ জাপানে সে প্রথার অবসান হইয়াছে—কন্যাদায়ের কঠিন সমস্যার হস্ত হইতে অভিভাবকেরা মুক্ত হইয়াছেন। আজ জাপানে এইরূপ ঘটনা শুনিতে পাইলে লোকে হাসিয়া আকুল হয়। বিবাহে উৎসব, ভোজ, শোভাযাত্রা প্রভৃতির রীতি দিন দিন অন্তর্হিত হইতেছে।

জাপানে নারীর মধ্যে যে চঞ্চলতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা তাঁহাদের যাত্রা পথে মাঙ্গল্য রচনা করিয়া সৎসাহসের উৎপাদন করিয়া দিতেছে—আজ তাঁহারা ঘরের একান্ত কোণ হইতে বাহির হইয়া স্বচ্ছ আলোকে আসিয়া পুরুষের সঙ্গে একই পথের যাত্রী হইয়াছেন।

নারী শিক্ষার প্রসারতাও ক্ষান্ত হইয়া যায় নাই। জাপানের বালিকাবিদ্যালয়গুলির প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই ইউরোপীয় ধরণের পোষাক ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু গ্রাজুয়েট ক্লাশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহ পর্য্যন্ত অনেক মেয়েই নিজস্ব জাপানী পোষাকই ব্যবহার করিয়া থাকেন—কারণ উহাই তাঁহাদের গার্হস্থ্য জীবনের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

প্রাইমারী স্কুল সমূহে প্রায় শিক্ষার্থীরাই নিজেদের প্রতিদিকেই সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার শিক্ষা পাইয়া থাকে। যদিও তাহাদের সামরিক সংক্রান্ত কিছুই শিক্ষা দিবার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই তথাপি তৎসম্বন্ধীয় যৎসামান্য তাহাদের আভাষ দেওয়া হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

'সকলের তরে সকলে আমরা'—এই সুর আজ জাপানী নারীদের অন্তরে অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক নারীই প্রত্যেকের উন্নতির জন্য নিজেদের সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। পরের অসুখে সেবা শুশ্রূষা করিতে তাঁহারা বিশেষ তৎপর হইয়াছেন। এমন কি কাহারও সন্তান প্রসবকালীন যদি তাঁহাদের কোন

প্রয়োজন হইয়া পড়ে তবুও তাঁহারা পশ্চাৎপদ হন না। এখনও জাপানে শিশুমৃত্যুর হার বিশেষরূপে হ্রাস পায় নাই—তবু জাপানী মহিলাদের ভিতর ইহার প্রতিকারের জন্য খুবই উৎসাহের সহিত যথাসাধ্য চেষ্টা চলিতেছে।

জাপানে ধাত্রীর সংখ্যা আজ প্রায় ৩৫,০০০ হাজারে পরিণত হইয়াছে। দেশের তথা স্বীয় নারী জাতির মঙ্গল কামনায় তাঁহারা অতিশয় উৎসাহের সহিত নিজেদের লিপ্ত করিয়াছেন!

শিল্পক্ষেত্রেও তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। চিত্র, সেলাই ও অন্যান্য গৃহ-শিল্পে তাঁহারা আশাতীত উন্নতি করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐ সব কার্য্যনিপুণতায় জনসাধারণ বাস্তবিকই চমৎকৃত হইয়া যায়।

খেলাধূলা ব্যায়াম প্রভৃতিও তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সাঁতার, হকি, টেনিস, বাস্কেট ও অন্যান্য খেলায় তাঁহারা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতেছেন। গত অলিমপিকে মিস্ মাচাতা সাঁতার প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন তাহা হয়তো কাহারও অজ্ঞাত নয়।

ধনুর্ব্বিদ্যা তাঁহাদের নিকট খুবই প্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বিদ্যায় তাঁহারা বাস্তবিকই প্রশংসাযোগ্য।

চতুর্দ্দিক হইতেই জাপানী নারী স্বীয় দেশ ও দশের মঙ্গল কামনায় নিজেদের নিয়োজিত করিয়াছেন। তাঁহারা পুরুষের সঙ্গে সমতালে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। বহুদিন গত প্রাচ্যের নারী প্রতিভার পরিচয় যেন আজ তাঁহারাই পৃথিবীর সম্মুখে ধরিতে উদ্যত। আজ প্রাচ্য জগতে নারী জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। হয়তো ভারতেও এ সুদিন শীঘ্রই আসিবে, যেদিন ভারতের মাতৃজাতি নিজ স্বরূপকে বিশ্বের দরবারে প্রকটিত করিয়া পাশ্চাত্য জগতকে মোহিত করিয়া দিবেন। 'নবশক্তি'

"বন্দে মাতরম"

সাম্যবাদী বিবেকানন্দ

শ্রীসুহাস দেবী

স্বামী বিবেকানন্দ সাম্যবাদী ছিলেন কিনা এবিষয়ে তাঁহার জীবনীলেখকগণ সকলেই নীরব। এমনকি তৎসম্বন্ধে বহুতর প্রবন্ধ লেখকদের কেহ কখনও স্বামীজির জীবনখানি এদিক্ দিয়া আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। হয়তো বা এবিষয়ে জ্ঞানের অভাব অথবা অপ্রিয় আশঙ্কাই তাহাদিগকে এ আলোচনা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে। থাক্ সে কথা।

যা বলিতে ছিলাম। স্বামী বিবেকানন্দ সাম্যবাদী ছিলেন না বটে, কিন্তু সাম্যবাদ তাঁহাতে ছিল। একথাটি নূতনও নয়, আকস্মিকও নয়। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি। "বর্ত্তমান ভারত" বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ বাংলা পুঁথি। কিন্তু উহা আগাগোড়া নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে পাঠকের মনে স্বতঃই কিসের ইঙ্গিত ও আভাস ভাসিয়া ওঠে, একবার কেহ খেয়াল করিয়াছেন কি? একবার নয় বহুবার পড়ুন। শুধু কি ইঙ্গিত? বিবেকানন্দ স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন, "তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্ব-সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে", অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য্য প্রকাশ করিতেছে, তাহা নহে শূদ্র ধর্ম্ম কর্ম্ম সহিত সর্ব্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্ব্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল।

সোস্যালিজ্ন্, এনার্কিজ্ম্, নাইহিলিজ্ম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।"

ইহার চেয়ে স্পষ্ট উক্তি বিবেকানন্দ অন্য কোথাও করেন নাই। অন্য সমস্ত উক্তি সাধু ইচ্ছা, অনুকম্পা, কারুণ্য প্রভৃতির নামান্তর বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে, কিন্তু "বর্ত্তমান ভারতের" প্রতিপাদ্য বিষয় এবং উহার ক্রমবিকাশ যে ভাবে সুস্পষ্টীকৃত হইয়াছে, তাহাতে ব্যাখ্যান্তরের স্থান কোথায়?

আর একটি কথা। সাম্যবাদ বলিতে অধুনা কম্যুনিজম শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আমরা উহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক অর্থেই প্রয়োগ করিলাম। মোটকথা সাম্যবাদ যে স্থূলতঃ অর্থনৈতিক অসাম্যের ও বৈষম্যের ভিত্তির ওপর গড়িয়া উঠিয়াছে, বিবেকানন্দে সেই গোড়ার কথাই সুস্পষ্ট দেখিতে পাই।

বিবেকানন্দকে এদিক্ দিয়া কেহ আলোচনা করেন নাই বলিয়াই আমাদের এ প্রস্তাবনা বস্তুতঃ ইহা আমাদের প্রারম্ভিক প্রস্তাবনাই মাত্র।

ধর্ম্ম ও সমাজের যে ঘৃণিত বৈষম্যের ওপর বিবেকানন্দ তীব্র কষাঘাত করিয়াছেন, তাহার মূল এইখানেই। আমরা আসল চাবিকাঠিটি হারাইয়া, অন্ধকারে ঘুরিয়া মরিতেছি।

বিবেকানন্দের এই সকল জ্বলন্ত ও অগ্নিগর্ভ উক্তি বুঝিতে হইলে উহার পিছনের পট ভূমিকার কথা সর্ব্বাগ্রে জানিতে হইবে। তাহা সাম্য বাদেরই মূলনীতি।

জাতির যারা প্রাণশক্তি সে-জনগণের জাগরণের মাঝেই এজাতির বাঁচিবার পথ, জাতির মুক্তি, ইহা স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করিয়া ছিলেন। জগতে উচ্চনীচ, ধনী দরিদ্রের মাঝে বিচ্ছেদের প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছে সভ্যতার প্রথম যুগ হইতে। "এজগৎ কত সহজেই না বুজরুকদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে থাকে। সভ্যতার প্রথম উন্মেষ থেকে বেচারা মানব জাতিকে ভাল মানুষ পেয়ে তার উপর কত প্রবঞ্চনাই না চল্‌ছে।" দরিদ্র জনগণের কথায় স্বামীজী বলিলেন—"ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। রাক্ষসবৎ নৃশংসসমাজ তাহাদের যে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে, তাহারা জানে না, কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারাও যে মানুষ উহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব।" দরিদ্র জনগণের উন্নয়নে তরুণ সম্প্রদায়কে স্বামীজি আহ্বান করিলেন, "দরিদ্র জনসাধারণই জাতির প্রাণ। মনে রাখিবে, দরিদ্রের কুটীরেই আমাদের জাতির জীবন। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পার? তাহাদের স্বাভাবিক, আধ্যাত্মিক প্রকৃতি বিনষ্ট না করিয়া তাহাদিগকে আপনার পায়ে দাঁড়াইতে শিখাইতে পার? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য ও ধর্ম্মবিশ্বাস সাধনে ঘোর হিন্দু হইতে পার? ইহাই করিতে হইবে। দরিদ্রের উন্নয়নেই জাতীয় জীবন গঠিত হইবে।"

বিবেকানন্দ ইহাও উপলব্ধি করিয়া ছিলেন যে জনগণকে তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য চাই শিক্ষা প্রচার। এ শিক্ষা দ্বারা তারাও যে মানুষ এজ্ঞান তাদের জাগিবে এবং তাদের উন্নতি তারা নিজেরা করিবে। ধর্ম্মাধিকার দান অপেক্ষা সর্ব্ব প্রথম প্রয়োজন তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি। স্বামীজী বলিলেন—'এ পথ ধর্ম্মে নয় অন্নে। খালিপেটে ধর্ম্ম হয় না। ইহাদের স্বাবলম্বী করার শিক্ষাই এখন প্রয়োজন প্রাণ পাইলে ধর্ম্মলাভ সহজেই হইবে।'

আর্থিক দুরবস্থা মানুষকে সকল প্রকার অধিকার হতে বঞ্চিত করিয়া রাখে এবং দারিদ্র্য শুধু তাকে নিঃস্বম্বল ও নিঃসহায় করে না, তার অন্তরের সকল সম্পদই হরণ করিয়া নেয়। তাকে সকল দিক থেকেই পঙ্গু করে রাখে। তার ভিতরের আসল মানুষ যায় মরে। মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলার জন্য চাই—শিক্ষা।

"আমাদের দেখিতে হইবে অন্যান্য দেশের সমাজযন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে। আমাদিগকে যদি যথার্থই এক জাতিরূপে গঠিত হইতে হয় তবে অপর জাতির চিন্তার সহিত আমাদের অবাধ সংমিশ্রণ রাখিতে হইবে। সর্ব্বোপরি আমাদিগকে দরিদ্রের উপর অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে।"

"যে দেশের কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফলখেয়ে থাকে আর দশ বিশ লাখ সাধু আর

ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্তচুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোন চেষ্টা করে না। সে কি দেশ না নরক ?...এই সব দেখে বিশেষতঃ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না।

এই যে আমরা একজন সন্নাসী আছি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি।"

আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য চাই জনগণের উত্থান। এ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ লিখেছেন—

"We as a nation have lost our individuality and what is the cause of all mischief in India, we have to give back to the nation its lost individuality and raise the masses. The Hindu, the Muhammaden, the Christian, all have trampled them under foot. Again the force to raise them must come from inside. In every country the evils exist not with but against religion. Religion therefore is not to be blamed but men. বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার জন্য দায়ী ধর্ম্ম নহে, দায়ী মানুষ।

এরূপ সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য চাই জনগণের মধ্যে শিক্ষা প্রচার।

"লোকগুলোকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শিখান না যায় তবে জগতের যত ঐশ্বর্য্য আছে, সব ঢাল্‌লেও ভারতের একটা গ্রামেরও যথার্থ সাহায্য কর্‌তে পারা যায় না। আমাদের কাজ হওয়া চাই প্রধানতঃ শিক্ষাদান—চরিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তি উভয়েরই উৎকর্ষ সাধনের জন্য শিক্ষা বিস্তার। ভারতের সমুদয় দুর্দ্দশার মুল জনসাধারণের দারিদ্র্য। সুতরাং আমাদের পক্ষে নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্ত্তব্য তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া। তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যে, এই সংসারে তোমরাও মানুষ, তোমরাও চেষ্টা করিলে আপনাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি বিধান করিতে পার। এখন তাহারা এই ভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে। পুরোহিতগণ, বিদেশীরাজগণ তাহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া পদদলিত করিয়াছে, অবশেষে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারাও মানুষ। তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা জগতের কোথায় কি হইতেছে জানিতে পারে। তাহা হইলে তাহারা আপনাদের উদ্ধার আপনারাই সাধন করিবে। প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক নর নারী আপনাদের উদ্ধার আপনারাই সাধন করিয়া লইবে। আমাদের কেবল উপাদান জোগান দরকার।

"ভারতের দারিদ্র্য এত অধিক যে দরিদ্র বালকেরা বিদ্যালয়ে না গিয়া বরং মাঠে গিয়া পিতাকে তাহার কৃষিকার্য্যে সহায়তা করিবে অথবা অন্যকোন উপায়ে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিবে। সুতরাং পর্ব্বত যেমন মহম্মদের নিকট না যাওয়ায় মহম্মদই পর্ব্বতের নিকট গিয়াছিলেন, সেইরূপ দরিদ্র বালকগণ যদি শিক্ষা লইতে আসিতে না পারে তবে তাহাদিগের নিকট গিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে।"

স্বামীজির মতে মানুষকে তাহার অধিকার সম্ভোগ করিতে দেওয়া উচিত।

যাহারা মনে করেন জন সাধারণকে স্বাধীনতা দেওয়া হইলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইবে, তাহাদের সেই উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বামীজি বলিয়াছেন—"সমাজ যে গঠিত হয় তাহা কি সামাজিক সাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত? অনেকে বলেন হাঁ, আবার কেহ কেহ বলিতে পারেন তাহা নহে। কতকগুলো লোক শক্তিমান হইয়া ধীরে ধীরে অপর সকলকে আপনার অধীন করিয়া ফেলে এবং ছলে বলে বা কৌশলে স্বকামনা পূর্ণ করে। ইহাই যদি সত্য হয় তবে অজ্ঞলোক দিগকে স্বাধীনতা দেওয়ায় ভয় আছে, একথার মানে কি? স্বাধীনতার মানেই বা কি?

আমার তোমার ধনাদি অপহরণের কোনও বাধা না থাকার নাম কিছু স্বাধীনতা নহে কিন্তু আমার নিজের শরীর বা বুদ্ধি সাধন অপরের অনিষ্ট না করিয়া যে প্রকার ইচ্ছা সে প্রকার ব্যবহার করিতে পাইব, ইহাই আমার স্বাভাবিক অধিকার এবং উক্ত ধন বা বিদ্যা বা জ্ঞানার্জ্জনের, সকল ব্যক্তির সমান অধিকার যাহাতে থাকে তাহাও হওয়া উচিত। দ্বিতীয় কথা এই যে, যাহারা বলেন যে, অজ্ঞ বা গরীবদিগকে স্বাধীনতা দিলে অর্থাৎ তাহাদের শরীর, নিষ্ঠা ইত্যাদিতে তাহাদের পূর্ণ অধিকার দিলে এবং তাহাদের সন্তানদের ধনী এবং উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের সন্তানদের ন্যায় জ্ঞানার্জ্জনের এবং আপনার অবস্থার উন্নতি করিবার সমান সুবিধা হইলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে, তাহারা কি এ কথা সমাজের কল্যাণের জন্য বলেন অথবা স্বার্থে অন্ধ হইয়া বলেন? ইংলণ্ডে একথাও শুনিয়াছি, 'ছোট লোকেরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদের চাকরী কে করিবে?'

মুষ্টিমেয় ধনীদের বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নারী-নর অজ্ঞতার অন্ধকারে ও অভাবের নরকে ডুবিয়া থাকুক তাহাদের ধন হইলে বা তাহারা বিদ্যা শিখিলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইবে!!! সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা না, এই তুমি, আমি দশজন বড় জাত!!!" ধর্ম্ম শাস্ত্র বলে, আত্মাতে আত্মাতে কোন বিভেদ নাই। সাম্যবাদী বিবেকানন্দও বলিলেন, 'আমাদের বিশ্বাস আত্মাতে আত্মাতে কোন লিঙ্গভেদ বা জাতিভেদ বা তাহাতে অপূর্ণতা নাই। যদি একথা বলা হয় বৈষম্যের ভিতর দিয়ে গিয়ে আমরা চরম সমত্ব ও একত্ব লাভ করিব, তাহাতে আমার উত্তর এই, যাহারা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিতেছেন, সেই ধর্ম্মেই পুনঃ পুনঃ বলেছে, পাঁক দিয়ে পাঁক ধোওয়া যায় না।'

সমাজদেহ নরনারী লইয়া গঠিত। দেহের এক অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্থ থাকিলে সে সমাজ দেহ চলিতে পারেনা। তাহা নিশ্চল ও পঙ্গু হয়ে থাকে। এদেশের নারীসমাজের উন্নয়ন যে একান্ত প্রয়োজন ইহাও স্বামীজি উপলব্ধি করেন। 'জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এপক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।' নারীজাতির উন্নয়নও চাই—শিক্ষা বিস্তার। প্রত্যেক আত্মাতে যে অনন্ত শক্তি আছে তাহার বিকাশেই জাতির জীবন গড়িয়া উঠিবে।

দেশের চাষীমজুরের দুঃখবেদনা স্বামীজিকে নিরন্তর আঘাত করিয়াছে। ইহাদের সচেতন

ও উন্নয়ন করিবার আকাঙ্ক্ষা যে তাঁহার কত প্রবল ছিল তাহা তাঁহার প্রবন্ধ, পত্রাবলীর মাঝে অত্যন্ত পরিস্ফুট। নির্ম্মম সমাজের চাষী মজুরের প্রতি ব্যবহার দেখে বলেছেন,—'আহা দেশের গরীব দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে নারে। সারা জাতির মেরুদণ্ড যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে—যে মেথর মুর্দ্দাফরাস একদিন কাজবন্ধ করলে সহরে হাহাকার উঠে যায়, তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয় দেশে এমন কেউ নাইরে।' একি শুধু ভাল মানুষী দয়া প্রকাশ? দরিদ্রজনগণের উত্থান ব্যতীত জাতি বাঁচিতে পারেনা। এজাতিকে বাঁচিতে হইলে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন চাই। এ পরিবর্ত্তন আসিবেই। নূতন ভারত গড়িয়া তুলিবে জনগণ। স্বামীজি বলিলেন, 'শূদ্রযুগ আসিবেই আসিবে। উহাকে কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।'

স্বামীজি বজ্র কণ্ঠে যে সাম্যবাণী প্রচার করিলেন তাহা আজও দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

স্বামীজির কর্ম্মাদর্শ রামকৃষ্ণ মিশনও প্রকৃতপক্ষে অনুসরণ করেন নাই। স্বামীজির মতে দরিদ্র নারায়ণ সেবা অর্থ শুধু কোন বিশেষ দিনে অন্ন বিতরণ নহে। তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন, তাদের শিক্ষালোকে সচেতন করা। বিবেকানন্দের এ আদর্শ কর্ম্মপন্থা রামকৃষ্ণ মিশনে স্থান পায় নাই।

সাম্যবাদী বিবেকানন্দ যে নূতন ভারতের নবসংহিতা রচনা করিলেন—তাহাই সফল করিয়া তুলিবার জন্য চাহিয়াছিলেন সহস্র সহস্র সর্ব্বত্যাগী তরুণ কর্ম্মী। স্বামীজীর সাম্যবাণী আজও বাংলার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছে কিন্তু সে-বাণী বাঙ্গালী কবে সার্থক করিয়া তুলিবে, আজও অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত স্বার্থত্যাগী শত শত নরনারী গড়িয়া উঠে নাই যারা বঞ্চিত সর্ব্বহারা মুক জনগণের মুখে ভাষা দিবে, তাদের আশাহত নিরাশ প্রাণে আশার বাণী শুনাইবে, অন্তরের সুপ্ত প্রাণ শক্তিকে জাগাইয়া তুলিবে, তাদের বাঁচিবার পথের সন্ধান বলিয়া দিবে। স্বামীজির এ চাওয়া শেষ হয় নাই। আজও দেশের তরুণ শক্তির কাছে ইহাই বড় চাহিদা। সিংহ বীর্য্য স্বামীজির কণ্ঠের সেই সাম্যবাদের হুঙ্কার আজও রহিয়া রহিয়া আমাদের মর্ম্মকুঠুরীতে ঘা দিতেছে।

'তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর বেরুক নূতন ভারত। বেরুক লাঙ্গল ধরে চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালী মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, হাট থেকে বাজার থেকে।'

'এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্ন পেটিকা, তোমার মাণিকের আংটি ফেলে দাও আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো, তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে, কোটি কোটি জীমুতস্যন্দী ত্রৈলোক্য-কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি—'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে।'

প্রবন্ধে একটি গুরুতর বিষয়ের অবতারণা মাত্র। অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে ইহা যথোচিত পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয় নাই। এ বিষয়ে কেহ সচেতন হইয়া আলোচনায় অগ্রসর হইলেই আমার লেখার সার্থকতা, বস্তুতঃ ইহাই আমার এই প্রবন্ধ লেখায় প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল।

রাষ্ট্রের রূপ

শ্রীসুসভা কর

রাষ্ট্রের রূপ নিয়ে জগতে চলেছে এক তুমুল আন্দোলন। রাষ্ট্রের রূপ কেমন হওয়া উচিত? এর চেয়ে সমস্যাপূর্ণ প্রশ্ন আর নাই। এ প্রশ্নটার এত বেশী মূল্য কেন? এর উত্তরে বলা যায় যে বর্ত্তমান জগতে 'রাষ্ট্র' এই শব্দটার অর্থ হচ্ছে 'জীবন'। সমগ্র মানব সমাজের প্রাণ-শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে রাষ্ট্র শক্তির অন্তরে। রাষ্ট্র বল্‌তে এখন আর স্বতন্ত্র একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বোঝায় না। ধর্ম্মনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে, রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

অতীতে 'রাষ্ট্রের আদর্শ রূপ কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হ'ত যে রাষ্ট্র হচ্ছে একটা বৃহৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক ব্যক্তি জাতি, ধর্ম্ম ইত্যাদি সব কিছুর বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে, কেবলমাত্র 'রাষ্ট্রের প্রজা' এই সংজ্ঞা দিয়া পরিচিত হ'তে পারে। সমগ্র সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন করাই হ'ল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। 'সমগ্র সমাজের মঙ্গল সাধন করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য'—এই মতটাও অতীতের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দ্বারা গ্রাহ্য হয় নাই। এমন অনেকে ছিলেন যাঁহারা বলিতেন যে, সমাজের একাংশের মঙ্গল সাধন করাই রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। অর্থাৎ অল্প কয়েকজনের উন্নতির জন্য অধিকাংশের আত্মত্যাগ করাই উচিত।

বর্ত্তমান জগতে রাষ্ট্রের রূপ ও আদর্শ কি? ধনবাদ ও সাম্যবাদ এই দুইটী নীতি, বর্ত্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রনীতিগুলিকেই চালিত করছে। যদিও সমগ্র জগতের মধ্যে রাশিয়াই একমাত্র সাম্যবাদী রাষ্ট্র, এবং অপর সকল রাষ্ট্রশক্তিই এর বিপক্ষে কিন্তু তবুও সাম্যবাদের নীতি আজ এত বহু বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তি সত্যই শঙ্কিত ও হয়ে উঠেছে।

'সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের রূপ কি?' সাম্যবাদীরা বলে যে এটা মুষ্টিমেয় ধনীদের প্রতিষ্ঠান, এর উদ্দেশ্য জনসাধারণকে আর্থিক দিক্ দিয়া শোষণ করা ও সেই শোষণের পদ্ধতিটা রাষ্ট্ররূপের অন্তরালে বাঁচিয়ে রাখা।

এই মুষ্টিমেয় ধনীর দল সমাজের অগণিত নরনারীকে এমন সুকৌশল পদ্ধতিতে শোষণ কর্‌ছে, যার ফলে সমাজের একপ্রান্তে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠ্‌ছে ধন, এবং অন্যপ্রান্তে তারই অনুরূপ জমা হচ্ছে দারিদ্র্য।

মুষ্টিমেয় ধনী ও অগণিত দরিদ্র, শোষক ও শোষিত এই দিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের সমাজ উঠ্‌ছে গড়ে। সমাজের যা মূলধন সেটাকে হাত করেছে ধনীর দল, সমগ্র সমাজের ব্যবসা বাণিজ্যের একমাত্র অধিকারী হয়েছে তারা। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে বড় বড় ফ্যাক্টরীর

মালিকরা একমুহূর্ত্ত ও পরিশ্রম করে না, অগণিত শ্রমিক নিজেদের রক্তবিন্দু' জল করে চালায় এই বিশাল ফ্যাক্টরীগুলো অথচ লাভের অংশ যায় ওই মুষ্টিমেয় ধনীর কবলে আর এই অন্নহারা বস্ত্রহারার দল ঘুরিয়ে চলে তাদের কলের চাকা। সাম্যবাদীরা বলে এই হ'ল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের আসল রূপ।

এখন কেমন করে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রকে সাম্যবাদী রাষ্ট্রে পরিবর্ত্তিত করা যায়? সাম্যবাদীরা বলে এই যে অসংখ্য বঞ্চিত বুভুক্ষু জনগণ সর্ব্বহারার দল, এরাই পারবে এই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রকে সমূলে উৎখাত করে সাম্যবাদী রাষ্ট্র গড়ে তুলতে। এই সর্ব্বহারা দলের কিছুই হারাবার ভয় নাই, কেন না তাদের কিছুই নাই, দিনান্তে অন্নমুষ্টি ও তাদের ভাগ্যে জোটে না। সুতরাং যে মুহূর্ত্তে তাদের শ্রেণী চেতনা ও শ্রেণী স্বার্থ বোধ জাগবে, সেই মুহূর্ত্তে তারা বুঝবে যে ধনী ও দরিদ্র, শোষক ও শোষিত এ দুয়ের মধ্যে কোনদিন সদ্ভাব হয় নাই এবং ভবিষ্যতে ও হ'তে পারে না, কেন না এই দুই শ্রেণীর শ্রেণীগত স্বার্থই আলাদা, সেই মুহূর্ত্তে বিপ্লব আসবে ঘনিয়ে, যার অনলে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তি হবে নিঃশেষ।

সর্ব্বহারার দল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তিকে অধিকার করে তার রূপ দেবে পরিবর্ত্তিত করে, সাম্যবাদী রাষ্ট্রে।

সাম্যবাদী রাষ্ট্রের রূপ কি?—সাম্যবাদীরা বলছে, (আমাদের রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব থাকিবে শ্রমিক শ্রেণীর অধিকারে। শ্রম না করে যারা তার ফল ভোগ করে সেই ধনীর দলকে আমরা করব সমূলে বিনাশ। শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণীবিভাগ যাহাতে লোপ পায়, সেই হবে আমাদের রাষ্ট্রের লক্ষ্য।

সমগ্র সমাজের ধন ও কর্ম্ম আমরা সমগ্র সমাজের মধ্যে দেব সমভাবে বণ্টন করে। কতিপয় উৎপাদনের যন্ত্রগুলি যেমন ব্যবসা বাণিজ্যের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, ইলেকট্রিসিটি, রেলওয়ে, ইত্যাদিকে আমরা পরিবর্ত্তিত করে দেব জাতীয় সম্পত্তিতে। এই সম্পত্তির মালিক হবে সমগ্র জাতি, তারা এই সম্পত্তির জন্য পরিশ্রম করবে। আমাদের রাষ্ট্রে নরনারী প্রত্যেকে রাষ্ট্রের জন্য কিছু না কিছু কাজ করতে থাকবে বাধ্য। বিনা পরিশ্রমে খাদ্য আমরা কাকেও দেব না, এবং প্রয়োজনের অধিক দ্রব্য কেহই পাবে না। আমাদের রাষ্ট্রের এই যে পদ্ধতি, এরই ফলে সমগ্র সমাজ বাঁচবে অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে, অর্থাৎ সমগ্র সমাজকে আমরা দান করব পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব।"

এই হ'ল আদর্শ সাম্যবাদী রাষ্ট্রের রূপ। কিন্তু সাম্যবাদীরা বলে যে শক্তি হাতে পাওয়া মাত্র রাষ্ট্রকে এই রূপদান করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। মধ্যে থাকবে, একটা পরিবর্ত্তনের যুগ। এই যুগে রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব থাকিবে সাম্যবাদী দল বা কমিউনিষ্ট পার্টীর হাতে। জনগণ সম্পূর্ণ বাধ্য থাকবে তাদের মেনে চলতে, এই দলের বিরুদ্ধে চলবে না কারও

কোনও মত প্রকাশ করা। এর কারণ কি? সাম্যবাদী দল বল্‌ছে এর কারণ জনসাধারণ অশিক্ষিত। সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত না তারা রাষ্ট্র চালনার উপযুক্ত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এই সাম্যবাদী দল তাদেরই মঙ্গলের জন্য তাদের প্রতিনিধি হয়ে রাষ্ট্র চালনা কর্‌বে।

আমরা দেখ্‌লাম, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের রূপ, এবং সাম্যবাদী রাষ্ট্রের রূপ। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের যে রূপ সাম্যবাদীরা জগতের সাম্‌নে ধরেছে তাহা সত্যই নিখুঁত। কিন্তু সাম্যবাদী রাষ্ট্রের রূপই কি আদর্শ রূপ?

সাম্যবাদীরা যথার্থই ধরেছে, সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত স্বার্থপরতা কিন্তু ভুল করেছে মীমাংসার পথ স্থির কর্‌তে। সাম্যবাদী রাষ্ট্রনীতির যে নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, তার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদের ভুলভ্রান্তি সংশোধিত হতে ত পারেই না, এমন কি এই পদ্ধতির চাপে হয়ত বা মানুষ পরিণত হয়ে যাবে যন্ত্রে।

সাম্যবাদী রাষ্ট্রে সমগ্র জনগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে একটা দল, কমিউনিষ্ট পার্টী। সামান্য কয়েক জন ব্যক্তি একটা বিশাল জনতার মুখপাত্র হয়ে, অধিকার কর্‌বে রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব। জনসাধারণের এই দলের বিরুদ্ধে একটী প্রতিবাদ বাক্য পর্য্যন্ত উত্থাপন কর্‌বার থাক্‌বে না ক্ষমতা। সাম্যবাদী দল তাদের মঙ্গলের জন্য যে বিধিব্যবস্থা কর্‌বে নির্ব্বিচারে তারা বাধ্য থাক্‌বে তাহা মেনে নিতে।

এই যে রাষ্ট্রপদ্ধতি এর দ্বারা কি জনসাধারণের সাম্য, স্বাধীনতা বা কল্যাণ আসিতে পারে?

ইতিহাস প্রমাণ দিচ্ছে যে তাহা হয় না। যখনই কোন একটা দল দমনশক্তির সাহায্যে সমগ্র সমাজের উপর একচ্ছত্র কর্ত্তৃত্ব চালিয়েছে, তখনই সে রাষ্ট্রের হয়েছে পতন। অল্পকয়েক ব্যক্তির হাতে প্রচুর শক্তি জমা হলেই, সে শক্তির হয় অসংব্যবহার। সুতরাং সাম্যবাদী দলের আদর্শ যতই মহৎ হোক সে যদি জনগণকে রাষ্ট্রের সর্ব্ববিধ শক্তি থেকে বঞ্চিত করে রাখে, তবে তার উদ্দেশ্য হবে ব্যর্থ। শক্তির অহমিকায় মত্ত হয়ে সে কর্‌বে জনগণেরই সর্ব্বনাশ। দমনশক্তির সাহায্যে জনগণকে স্তব্ধ করার অর্থ নয় তাদের সাম্য স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত করা।

সাম্যবাদীদের সমাজ গড়্‌বার আর একটী মূলনীতি এই যে প্রত্যেকে আর যোগ্যতা অনুসারে পরিশ্রম করিবে ও প্রত্যেকে তার অভাব অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে।

কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির অভাব ও যোগ্যতার সীমা কোথায়? মানুষ মাত্রেরই আছে বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্টের জন্যই প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে প্রভেদ। সুতরাং যদি সমগ্র সমাজে অভাব ও যোগ্যতার মাপকাঠী প্রস্তুত কর্‌তে হয়, তবে লোপ কর্‌তে হবে প্রত্যেক ব্যক্তির এই নিজস্ব ব্যক্তিত্বটুকু। অর্থাৎ মানুষকে পরিণত কর্‌তে হবে যন্ত্রে, যার ফলে সমগ্র সমাজের মধ্য হতে প্রাণশক্তি যাবে চলে, পড়ে থাক্‌বে একটা যান্ত্রিক সমাজ যার দ্বারা জগতের কোন মঙ্গলই হতে পারে না।

সুতরাং আমরা দেখ্‌ছি সাম্যবাদী রাষ্ট্ররূপ ও আদর্শরূপ নয়। আর আদর্শ সত্য, কিন্তু রূপ ভ্রান্ত।

'আদর্শ রাষ্ট্রের রূপ কি?' এ প্রশ্নের উত্তর আজ অমীমাংসিতই রয়ে গেল।

আসাম মহিলাসমিতির বাল্য বিবাহে বাধা প্রদান

গৌহাটীর উকিল শ্রীযুক্ত অম্বিকা প্রসাদ গোস্বামীর বার বৎসরের নূন্যবয়স্কা কন্যার বিবাহের দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহার দুইদিন পূর্ব্বে বরপক্ষ আসিলে 'জুরোন পিন্ধাবর' হওয়ার তারিখ ছিল, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহারা কেহ আসেন নাই। সংবাদ লইয়া জানা যায় যে আসাম মহিলা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা রাজবালা দাস বি, এ, এই বিবাহ বন্ধ করার উদ্দেশ্য বরের নিকট একখানা পত্র দিয়াছে, ফলে বর বিবাহ করিতে অসম্মত হওয়ায় বিবাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

আসাম মহিলা সমিতির সমাজ সংস্কারে এই প্রকার আগ্রহ সবিশেষ প্রশংসনীয়। সর্দা আইনের প্রণনয় পরেও বাল্য বিবাহ সংখ্যা হ্রাস পায় নাই। তাহার কারণ অনেকাংশে লোকের উদাসীনতা, ও আংশত স্বার একশত টাকা জমা দিয়া নালিশ করিতে হয় বলিয়াও। ইতিপূর্ব্বে কোন মহিলা বা মহিলা সমিতি বাল্য বিবাহে বাধা প্রদানের নিমিত্ত এইরূপ দৃঢ় চিত্ততার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। আসামের মহিলা সমিতি এই বিষয়ে অগ্রণী, তাহার দৃষ্টান্তে বাংলা দেশের ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মহিলাগণ সবিশেষ অনুপ্রাণিত হইবেন সন্দেহ নাই।

আমরা এই স্থলে সম্পাদিকার পত্রখানি তুলিয়া দিলাম—

শ্রীদুর্গেশ্বর বুজর বরুয়া বি, এ গৌহাটী।

মহাশয়,

আপনাকে আমি এই অনুরোধ করিতেছি, আপনি যেন শ্রীযুত অম্বিকা গোস্বামীর ১২ বৎসরের কন্যা শ্রীমতী মিনি গোস্বামীকে "বিবাহ বন্ধ করা" (marraige restraint act) অমান্য করিয়া বিবাহ করিবেন না। এই আইন অমান্য করিয়া বিবাহ করিলে আইনতঃ যথা বিহিত করিতে আসাম মহিলা সমিতি আমাকে নির্দ্দেশ দিয়াছে। ইতি—

নিবেদিকা
শ্রীমতী রাজবালা দাস, সম্পাদিকা,
আসাম মহিলা সমিতি।

গৌহাটী
২৭শে ফেব্রুয়ারী.

স্যার ষ্ট্যানলী জ্যাক্‌সন ও ভারতীয়গণের দায়িত্ব জ্ঞান

লণ্ডন মিশন সোসাইটীর একটী সভায় স্যার ষ্ট্যানলী জ্যাকসন বলিয়াছেন যে, বাংলা দেশ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম দিয়াছে, এবং উচ্চতম শাসক পদের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন, এমন লোকেরও বাংলায় অভাব নাই। তিনি ভারতীয়গণের স্বায়ত্বশাসনের দাবীও সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু সে পথে ভারতীয়গণ যেন দ্রুত না যায় এই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন।

বাংলাদেশের অধিবাসীদের প্রতি তাঁহার এই সুধারণাতে আমরা আশান্বিত হইয়াছি, বাঙ্গালী দায়িত্ব বোধের পুরস্কারস্বরূপ উচ্চপদ ও সম্মান লাভ করিতে পারে, আমরা ভাবিতে যাইতেছিলাম কিন্তু তাহার শেষের কথাতেই গোলমালে ফেলিয়াছে। 'দ্রুত' ও 'ধীর' এইগুলি আপেক্ষিক, ইহা নিয়াই তো যত মতভেদ, দুইশত বৎসর ইংরেজ শাসনে শিক্ষানবিশী করিয়াও যারা স্বায়ত্ব-শাসনের কথা মুখ ফুটিয়া বলিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিলনা, তাহাদের দ্রুততার কথা বলিয়া কি কাহারো অভিযোগ করিবার থাকে। আরও ধীরে—অতি ধীরে তাহা হইলে বাঙ্গালীর চলিতে হইবে। ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত কত শতাব্দীতে যেন হইয়া থাকে।

স্বামী শিবানন্দের মহাপ্রস্থান

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম ছিলেন এবং জগৎবিখ্যাত ধর্ম্ম প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দের সহকর্ম্মী ছিলেন। পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ সংশ্লিষ্ট যে শিষ্যদল আশ্রমের সেবা করিতেছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে আশ্রম সেই সংস্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইলেন। পরলোকগত এই ঋষির আত্মার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। তাঁহার মহা-সমাধিলাভে আমাদের শোকের কিছু নাই, তিনি দেশবাসীকে ধর্ম্মে প্রেরণা দিয়া, নিষ্কামকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিয়া দীর্ঘকাল ব্যাপী সাধনার পরে চির বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে পরমহংসদেবের আশ্রমের গুরুতর ক্ষতি হইল, এই ক্ষতি কবে পূরণ হইবে কে জানে? তাঁহার তিরোধানে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"দেশে যে সকল মহৎ প্রতিষ্ঠানে মানুষই মুখ্য, কর্ম্ম ব্যবস্থা গৌণ, মানুষের অভাব ঘটিলে তাহাদের প্রাণশক্তিতে আঘাত লাগে। শিবানন্দ স্বামীর মৃত্যুতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আশ্রমে সেই দুর্যোগ ঘটিল। এখন যাঁরা বর্ত্তমান আছেন, প্রাণ দিয়া মৃত্যুর ক্ষতি পূরণের দায়িত্ব তাঁহাদেরই। অহমিকা বর্জ্জিত পরস্পর ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন এখন আরও বাড়িয়া উঠিল নহিলে শূন্য পূর্ণ হইবে না এবং সেই ছিদ্র পথে বিশ্লিষ্টতার আক্রমণ আশ্রমের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে সেই আশঙ্কা অনুভব করিতেছি। মহাপুরুষের কীর্ত্তি ও স্মৃতি রক্ষার মহত্তার যাঁহাদের উপরে তাঁহারা নিজেদেরকে ভুলিয়া সাধনাকে অক্ষুন্ন রাখিবার এক লক্ষ্যে সকলে সম্মিলিত হইবেন, শিবানন্দ স্বামী তাঁহার মৃত্যুর এই বাণী রাখিয়া গিয়াছেন।"

সাবিত্রীরাণীর মামলা

কুলবধূ সাবিত্রীরাণীর প্রতি তাহার দেবর, শাশুড়ী প্রভৃতি কি অমানুষিক ও অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা সংবাদ পত্র পাঠকমাত্রেরই অবিদিত নাই, দীর্ঘকাল ধরিয়া মামলার পর রায় প্রকাশ হইয়াছে, আসামী উপেন্দ্র ঘোষ সাড়ে তিন বৎসর কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড ও মনোরমার প্রতি দেড়বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

এই ভদ্রবেশধারী নরপিশাচগণের উপযুক্ত শাস্তি কিছুতেই হইতে পারে না। ইহাদের হেয়তম কর্ম্মের উপযুক্ত বিশেষণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দেশে নারীহরণকারী, নারীনির্য্যাতনকারীর শাস্তি-বিধান সম্বন্ধে আলোচনা ও আন্দোলন চলিতেছে, কিন্তু এই যে একশ্রেণীর লোক নারীর প্রতি ঘৃণিত, লজ্জাকর ব্যবহার করে, তাহার প্রতিবিধানের জন্য সমুচিত ব্যবস্থার আজও আরম্ভ হয় নাই, ইহারা আপন আত্মীয়-স্বজনের উপরেই মনুষ্য-বিগর্হিত আচরণ করিতে দ্বিধা করে না, যাহাদের লইয়া মানব পরিবার গঠন করে, যাহাদের সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব, সেই দুর্ব্বল, অসহায়া আত্মীয়াদের উপর এরূপ নৃশংশ আচরণের জঘণ্যতার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। আবার ইহাদের পাশবিক কার্য্যের সহায়কারী নারী—ভাবিতেও ঘৃণায়, ধিক্কারে মন সঙ্কুচিত হইয়া ওঠে।

আইনের কবলে ইহাদের কতজনই বা পড়ে, বহু লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকে। আমাদের মনে হয়, সমষ্টিগতভাবে ইহাদের শাস্তি বিধানের চেষ্টা করিলে একটা সুফল হইতে পারে। সমাজে যদি এরূপ নারী নির্য্যাতনকারীকে 'একঘরে' করা যায়, তাহাদের জীবিকা-অর্জ্জনে, পুত্রকন্যার বিবাহে তাহারা যদি বিশেষ ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পরোক্ষে তাহারা কিছু সাবধান হইতে পারে। আমাদের ঠিক মনে পড়িতেছে না সম্ভবতঃ 'ভারতবর্ষে'ই এই সাবিত্রীরাণীর মামলা আরম্ভ হইবার পরে শিল্পী উপেন্দ্র ঘোষের একখানা চিত্র প্রকাশ হইয়াছিল, তৎকালে আমরা একাধিক মহিলার মুখে শুনিয়াছি, 'এরূপ পশু-প্রকৃতির লোকের আঁকা ছবি ছাপিয়া আবার ইহাকে উৎসাহ দেওয়া হয়, তাহার কুৎসিৎ স্বভাবের জন্য তাহার আঁকা ছবি সুন্দর হইলেও অগ্রাহ্য বলিয়া ফেরৎ পাঠানো উচিত ছিল,' ইহাতে কোন যুক্তি হয় তো নাই, আর এরূপ হইলে নীতির খাতিরে আর্ট হয় তো লোপ পাইবে, কিন্তু চাকুরীতে ব্যবসায়ে লোক নিযুক্ত করিলে, তাহার স্বভাবের সার্টিফিকেট আনিতে হয়, সেই সময়ে কি এদিকে লক্ষ্য রাখা যায় না, যাহার বিষয়ে নারী নির্য্যাতনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাকে কর্ম্মে নিয়োগের সময় একটু দৃঢ়তার পরিচয় দিলে বোধ হয় এই পাপ সমাজব্যাধি কিয়ৎ পরিমাণে দুরীভূত হয়।

এদেশ ও ওদেশ

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ডের পর রাষ্ট্র সচিব সার জন সাইমন গ্লাসগোর বণিকসভায় ইউরোপের অন্যান্য দেশের প্রতি কটাক্ষ করিয়া নিজেদের দেশ যে কিরূপ সুপরিচালিত ভাবে পৃথিবীব্যাপী সামাজিক ও আর্থিক সমস্যার মধ্য দিয়া চলিতেছে দেখাইয়া গৌরবের সহিত বলিয়াছেন; তাঁহাদের অন্যান্য প্রতিবেশীরা গত যুদ্ধের পর হইতেই নিজ নিজ দেশে যাহা কিছু করিতেছেন বা করিতে সমর্থ হইয়াছেন সমস্তই প্রাচীনকে ধ্বংস করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পুনর্গঠন করিতেছেন; নূতন মতবাদী গভর্মেণ্ট নূতন ক্ষমতা লইয়া জন সাধারণের উপর প্রভুত্ব করিতেছে, সর্ব্বত্র বিপ্লব ও অশান্তি। ইহার মধ্যে ইংলণ্ড আপনার পূর্ব্ব নীতি অক্ষুন্ন রাখিয়া জন সাধারণের ব্যক্তি গত স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের ক্ষমতা, ও সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা অর্থাৎ স্বাধীনতা বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহার প্রতি কোন রূপ হস্তক্ষেপ না করিয়াই একই উদ্দেশ্যে যখন যে সঙ্কট সময় উপস্থিত হইতেছে তাহার সমাধান করিয়া অগ্রসর হইতেছেন।

ভারতবর্ষ ও এই সারজন সাইমনদেরই সুপরিচালিত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শাসিত দেশ, তাঁহারা এদেশের পূর্ব্বার্জ্জিত শিক্ষা ও সভ্যতা দেখিয়া স্বীকার করেন যে এদেশের লোকরা বন্য বা বর্ব্বর নহে, অতি প্রাচীন

কাল হইতেই এ দেশ সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন আছে, ইহারা মনুষ্যত্ব কি তাহা জানে ও বোঝে। কিন্তু এখন এ দেশে ল এবং অর্ডারের জন্য চাই 'পাওয়ার' 'মোর পাওয়ার' (more power) এবং 'মোর পাওয়ার' দেখিলে ভুল হইয়া যায় যে এদেশ বাসীরা মানুষ কি না ?

এই যে সেদিন নূতন টেরোরিষ্ট বিল (যাহা পাশ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাক্) সেদিন বঙ্গীয় কাউন্সিল সভায় পেশ হইয়া, বাঙ্গলার ইউরোপীয় বণিক সভার প্রেসিডেণ্ট তাঁহাদের বাৎসরিক সভায় বলিলেন; "গভর্ণমেণ্ট সত্য সত্যই শাসন আরম্ভ করিয়াছেন" অথচ দেশ ব্যাপী ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে। আমাদের এরূপ আন্দোলন করাই অনুচিত; যে দেশের গভর্ণমেণ্ট জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত সে দেশে এসব করা সাজে, আমরা নিষ্ফল বাক্ বিতণ্ডা করিয়া মরি কেন? গভর্ণমেণ্ট আপনি বুঝিয়া এ নীতির পরিবর্ত্তন না করিলে আমাদের যুক্তি তর্কে কিছুই হইবেনা।

আমাদের দেশের পুলিস বাড়ী খানা তল্লাসী করিয়া তাহাদের যাহা ইচ্ছা জিনিস পত্র লইয়া যাওয়া এবং যত দিন ইচ্ছা আটক করিয়া রাখা, ইহা তো স্বাভাবিক ব্যাপারের মধ্যেই দাঁড়াইয়াছে—কিন্তু বিলাতে কি হয় দেখুন, সে দিন দেখিলাম, পুলিস সার্চ্চ ওয়ারেণ্টের সাহায্যে জাতীয় বেকার শ্রমজীবি সঙ্ঘের বাড়ী খানা তল্লাসী করিয়া কতকগুলি কাগজ পত্র লইয়া যায়, সঙ্ঘের কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে একজন ধৃত হন। বিচারের সময় এই নকল কাগজপত্র কতক কতক প্রমাণের জন্য ব্যবহার হইয়াছিল। এবং একজন রাজদ্রোহ সম্পর্কিত আইন দণ্ডাভিযোগে দণ্ডিত ও হয়। এই বিচার শেষ হওয়ার পরেও পুলিস ঐ সকল কাগজ অন্যায় ভাবে আটকাইয়া রাখায়, উক্ত সঙ্ঘের কর্ত্তৃপক্ষ (তাহার মধ্যে দণ্ডিত ব্যক্তিও ছিল) লণ্ডনের যে পুলিস কর্ম্মচারীরা ঐ কাগজ লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে এবং বিচার শেষ হওয়ার পরেও কাগজ পত্র আবদ্ধ রাখিবার জন্য পুলিস কমিশনারের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের দাবীতে নালিশ করে বিচারে পুলিসের কার্য্য সমর্থিত হয় নাই এবং জজ ঐ সকল কাগজ প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ করেন এবং ঐ কাগজ আবদ্ধ রাখিবার জন্য ক্ষতি পূরণ পাইবার ডিক্রী দেন। পুলিস কমিশনারকে তাঁহার ভুল বা ত্রুটির জন্য ৩০ পাউণ্ড ক্ষতি পূরণ প্রদান করিতে হয়।

গ্লাসগোর সভায় সারজন সাইমন এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে আর কোন দেশে কি এমন ঘটনা সম্ভব হইতে পারিত যে একজন লোক, যে শাসনতন্ত্রে বিরোধী এবং সেই অপরাধে দণ্ডিতও হইয়াছে তাহারও এমন একজন পদস্থ কর্ম্মচারীর নামে মামলা আনিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, উক্ত কর্ম্মচারীর অপরাধ এই যে তাঁর অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা ঈর্ষা বা বিদ্বেষ পরবশে যে কিছু করিয়াছিল এমন নহে, শুধু ভুল করিয়াছিল মাত্র তবু তাঁহাকে সেজন্য ক্ষতি পূরণ দিতে হইল। এমন নিরপেক্ষ বিচার এবং আইনের মর্য্যাদা এ দেশে !

কিন্তু সারজন সাইমনের মত আমাদের ভারত সচিব কি সভা সমাজে মুখ উঁচু করিয়া ভারত সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারেন ?

বাজেট

আয় ও ব্যয়ের বিবরণী ইহা একটা বাৎসরিক ব্যাপার এ মাসটাকেই বাজেটের মাস বলা চলে, ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার সকলেই আগামী বৎসরের আয়ব্যয়ের আনুমানিক এবং অতীত বৎসরের আয় ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণ নিজ নিজ কাউন্সিলে পেশ করেন, এবং ইহা লইয়া আইন পরিষদে মাসব্যাপী লিখিত এবং অলিখিত বক্তৃতায় কাউন্সিল গৃহ সরগরম থাকে। আর আমরা শুধু সন্ত্রস্তভাবে সংবাদ

পত্রের স্তম্ভে দেখি কোন্ কোন্ জিনিষের উপর ট্যাক্স বসিল; আবার গরীব গৃহস্থের কোন্ নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া আর যাহা তাহাতে আমাদের অধিকার কি? বাজেটে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়াই চলিয়াছে, কিন্তু এ ব্যয় বৃদ্ধির অংশ দেশকে সবল সুস্থ ও উন্নত করে নাই, দেশের কৃষি, শিল্প, বেকার প্রভৃতি কোন সমস্যারই কিছুমাত্র পূরণ হয় নাই। ভারত সরকারের বুকে সামরিক ব্যয়ের গুরুভার চাপিয়া আছে; তেমনি বাংলা সরকারের বুকে পুলিসের ক্রম বর্দ্ধমান চাপ। এই আলোচ্যবর্ষে বাংলা সরকারের ঘাটতি প্রায় সোয়া দুই কোটি টাকা হইবে।

বাংলা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মত কৃষিজীবি; কিন্তু বাংলায় এ পর্য্যন্ত একটিও কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কৃষির উন্নতির জন্য এই গরীব দেশের বিপুল অর্থ ব্যয়ে সেদিনও এক কমিশন বসিয়া গেল, কিন্তু আমাদের কৃষক যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেল। ভূমির উর্ব্বরতা বাড়াইবার জ্ঞান, অথবা নূতনতর উপায়ে ফসল উৎপাদনের কৌশল, কিছুরই কোন ব্যবস্থা হইল না। কাগজে পড়ি সভ্য দেশে ফসলের পরিমাণ নানারূপে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বহুগুণ বাড়াইয়াছে ও আরও বাড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে।

মেষ্টনী ব্যবস্থায় বাংলার প্রধান কৃষিজাত ও ধরিতে গেলে বাংলার নিজস্ব পাট, সেই পাটের আয় হইতে তাহাকে বঞ্চিত করায় বাংলা সরকারকে হীনবল করা হইয়াছে। এই অবিচার কতক পরিমাণে দূর করিবার জন্য হোয়াইট পেপার পাট করের অর্দ্ধাংশ বাংলাকে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সপক্ষে ভারত সরকার এ বৎসর ঐ বাবদ বাংলাকে এককোটি সপ্তাশী লক্ষ টাকা দেওয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু ঐ টাকা সংগৃহীত হইবে দেশলাই এবং চিনির উপর শুল্ক বসাইয়া। অর্থাৎ ভারত গভর্ণমেণ্ট বাংলা গভর্ণমেণ্টের আর্থিক দুরবস্থায় যে সাহায্য করিবেন তাহা আদায় হইবে আমাদের নিকট হইতেই।

বিদেশী চিনি আমাদের বাজার অধিকার করিয়াছিল; গভর্ণমেণ্ট আয়ের জন্য বিদেশী চিনির উপর শুল্ক বসানের সুযোগে, দেশে চিনির কল বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং বাংলায় ও চিনির কল স্থাপনা সুরু হইয়াছিল। এককালে পাটের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাষা ইক্ষুর চাষ ছাড়িয়া খেজুর গাছ তুলিয়া ফেলিয়া পাটের চাষে দেহ প্রাণ অর্পণ করিয়াছিল; আবার পাটের বাজার একেবারে মন্দা হওয়ায় লোকের মন অন্য যে সব উপায়ে অর্থাগমের পথ খুঁজিতেছিল, চিনির কল বসাইয়া ইক্ষুর চাষ করিয়া চিনি গুড়ের কারবার তাহার মধ্যে প্রধান; এই শুল্কে সে কারবারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লোকে সন্দিহান হইয়া পড়িবে। কলে চিনি উৎপাদন শিল্পের এখনও নূতন অবস্থা; এখনও এমন লাভজনক অবস্থায় দাঁড়ায় নাই যাহাতে ব্যয় বাহুল্য করিয়া নূতন নূতন কল কিনিয়া বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারে। চিনি কিম্বা দেশলাইয়ের কারবারে সরকার কোন অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাহা আমরা জানিনা অথচ লোকের এই আর্থিক দুরবস্থার সময়ে নিত্য ব্যবহার্য্য, অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের উপর এইরূপ ট্যাক্স বসানতে লোকে আরও প্রপীড়িত হইবে মাত্র। চিনির উপর যে শুল্ক তাহা কলে প্রস্তুত চিনির উপর আর দিয়াশলাইয়ের বেলায় সে পার্থক্যও রাখা হয় নাই সে ট্যাক্সের হার হইতেছে, এক একটি দেশলাইয়ের উপর এক এক পয়সা। ফলে দেড় পয়সার কমে একটি দেশলাইও পাওয়া যাইবেনা। এরূপ অসম্ভব ট্যাক্স কোন দিন শোনা গিয়াছে বলিয়া জানিনা।

পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে যে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতে যে লোকে বিশেষ কিছু হাল্কা বোধ করিবে তাহা মনে হয়না। এনভেলাপের দাম একপাই কম হইবে, এবং আধ তোলা পর্য্যন্ত চিঠি চার

পয়সার টিকেটেই যাইবে। কিন্তু পোষ্টকার্ড তিন পয়সাই থাকিল ও বুক পোষ্ট যাহা দুই পয়সায় যাইত, তাহা তিন পয়সা হইল। আট কথায় অর্ডিনারী টেলিগ্রাম নয় আনা, আর আর্জেন্ট টেলিগ্রাম আঠার আনায় করা যাইবে। কিন্তু যাহাদের সংক্ষেপ নাম রেজেষ্ট্রী করা আছে তাহারা ছাড়া, সাধারণে ইহার ফল বিশেষ কিছু পাইবে বলিয়া মনে হয়না। বরং পোষ্ট কার্ডের দাম কমিলে লোকে কিছু আরাম পাইত।

বাংলা সরকার পল্লীর শোচনীয় দুরবস্থা দূর করার জন্য পল্লী সংগঠনের দিকে একটু একটু করিয়া দৃষ্টি পাত করিতেছেন; দীর্ঘ কালের অবহেলায়—বাংলার পল্লী ধ্বংসের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অভাব পর্ব্বত পরিমাণ, বাজেটে এই বাবদে যে ব্যয় ধরা হইয়াছে, তাহা নগণ্য হইলেও উদ্দেশ্য শুভ দেখিয়া সুখী হইয়াছি।

ভূমিকম্প বিধ্বস্ত বেহার

বেহারের সাহায্যের জন্য চারিদিক হইতেই অর্থ সংগ্রহ চলিতেছে, বর্ত্তমান কালে যে রূপ অর্থ সঙ্কটের মধ্যদিয়া চলিতেছে তাহাতে এই সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ মন্দ বলা যায় না তাহা হইলেও প্রয়োজনের তুলনায় তাহা সামান্য মাত্র। ভারতগভর্ণমেন্ট তাঁহাদের বাজেটের উদ্বৃত্ত পৌণে দুইকোটীর কিছুবেশী, বেহার গভর্ণমেণ্টকে প্রদানের যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বেহারে পুনর্গঠন যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার একদিকে যেমন অর্থ অপর দিকে ইঞ্জিনীয়ারের নৈপুণ্য, ও ভূমি চাষ বিষয়ক জ্ঞান সমান প্রয়োজনীয়, সহর নূতন করিয়া গঠন করিতে হইবে. আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে. যাহাতে ভূমিকম্পসহ হয় এমনি করিয়া গ্রামের প্রশ্ন ও শস্যক্ষেত্রের প্রশ্ন আরও কঠিন; ত্রিহুতের বহু বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে যাহা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে. কতকাংশ বালিতে ঢাকা পড়িয়াছে,—ইহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়া কৃষকের মুখের অন্ন সংস্থান করিতে হইবে। যে সকল বালুকা ভূমিতে পূর্ব্বে যে শস্য জন্মিত তাহার অনুপযুক্ত হইয়া গিয়াছে; এখন এমন বিশেষজ্ঞগণের গবেষণার প্রয়োজন যে এই ভূমিতে অন্য কোন ফসল জন্মিতে পারে কি না। কতকাংশ জলপূর্ণ হইয়া আছে, তাহাতে মাছের চাষ অথবা কোনও জলজ শস্য হয় কিনা তৎবিষয়ে চিন্তাপূর্ব্বক স্থির করিতে হইবে। বাংলায় কোন কৃষিকলেজ নাই, কিন্তু বিহারে ভারত গভর্ণমেণ্টের বহু ব্যয়ে স্থাপিত সাবোর ও পুষা আছে; সেখানকার বিশেষজ্ঞগণের তাঁহাদের এতোদিনের গবেষণালব্ধ জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিয়া দেশের কাযে লাগাইবার সুযোগ আসিয়াছে।

কারাগারে জহরলাল

বিধ্বস্ত বেহারের কথা উঠিলেই স্বতঃ জহরলালের নাম মনে পড়ে, তিনি যে কয়দিন কারাগারের বাহিরে ছিলেন. ভূমিকম্প আক্রান্ত স্থলে ঘুরিয়া দেখিলেন, মুঙ্গেরে নিজহাতে ঝুড়িও কোদাল লইয়া ধ্বংসস্তূপ সরাইয়া মুহ্যমান স্থানীয় লোকদের স্বহস্তে নিজেদের কাজ করিবার জন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগাইয়া গেলেন, তিনি এই সময় মুক্ত থাকিলে রাজেন্দ্র প্রসাদ একজন বড় সহায় ও সহকর্ম্মী পাইতেন, তাঁহার অফুরন্ত অদম্য উৎসাহ ও প্রাণশক্তি সকলকে অনুপ্রাণিত করিত কিন্তু আজ জহরলাল আবার কারাগারে। তিনি শেষবার যে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সেই সময় তিনটি বক্তৃতার সম্পর্কে তাঁহার বিদ্রোহ[illegible]নের অভিযোগ আনীত হয়, তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই, ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাঁহার দুইবৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। জহরলালের রাষ্ট্রিক আদর্শ যাহাই থাকনা কেন, তিনি যে অহিংস নীতিঅবলম্বী তাহা তাঁহার অনেক বক্তৃতাতেই আমরা পড়িয়া থাকি। তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছেন, আইনের ধারানুযায়ী দোষার্হ মনে করিয়াই বিচারক দণ্ড দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার

নাই, তবে আমরা ইহাই বলিতে চাই এসব অভিযোগ উপস্থিত করা গভর্ণমেন্টের অনুমোদিত আবশ্যক করে, তিনি যে ভাবে বেঙ্গলের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে এসময় তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ স্থগিত রাখিলে, কিছু বিলম্বিত করিলে বিশেষ কিছু অনিষ্ট হইত না বরং দূর উদার দৃষ্টির পরিচায়ক হইত।

হত্যা ও প্রাণদণ্ড

যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তপাত, নরহত্যা, ইত্যাদির প্রতি মেয়েদের একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আছে, সেটা সাহসের অভাবেই হোক্ বা স্নেহশীল প্রাণ-সম্পদের জন্যই হোক্, দু' চারিটী ক্ষেত্রেই ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, নতুবা ইহাই সাধারণ। পশুপক্ষীর দুঃখ দেখিলেও তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, ইতিহাসের পাতা খুলিলে দেখা যায়, আহত শত্রুর সেবাও নারী প্রাণপণে করিয়াছে। মানুষকে বাঁচাইবার দায়িত্বই সে সর্ব্বদা নিতে চায়, মারিবার নয়। বিপ্লববাদীদের কার্য্যেও তাই মহিলা সমাজ সমর্থন করে নাই, বরং তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে, তেমনি আবার বিচারে প্রাণদণ্ড, ফাঁসি ইহাও মহিলা-মাত্রেরই মনোভাবের বিরোধী। সমস্ত সভ্যজগত হইতেও এই প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে আলোচনা চলিতেছে, মায়ের জাতির সহানুভূতিও এই দিকে। ক্রমে ক্রমে প্রাণদণ্ডের হ্রাস হইবে আমরা কামনা করি, কিন্তু সেদিনের ফৌজদারী আইনের শেষে গৃহীত হইল—"এই আইনে আর যাহাই থাকুক না কেন, ১৩ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া পিস্তল, রিভলবার, রাইফেল বা অন্য কোন আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া কেহ চলাফেরা করিলে বা ১৪ অথবা ১৫ ধারার নির্দ্দেশের ব্যতিক্রম করিয়া কেহ নিজের নিকট ঐরূপ কোন আগ্নেয়াস্ত্র রাখিলে এবং তাহার সম্পর্কে পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে যদি মনে করা যায় যে, নরহত্যার মতলবেই সে তাহার নিকট উক্ত আগ্নেয়াস্ত্র রাখিয়াছিল, তাহা হইলে ১৯২৫ সালের বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুযায়ী নিযুক্ত কমিশনারদের দ্বারা উহার বিচার হইলে, বিচারে উহার প্রাণদণ্ড, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড বা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মেয়াদে দ্বীপান্তর দণ্ড অথবা ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও তৎসহ অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।"

ইহাতে প্রাণদণ্ডের পরিধি আরও বাড়িয়া যাইবে, বিচারে দোষী প্রমাণিত হইলে অন্যশাস্তি দেওয়া যায়, দ্বীপান্তর বাস ও কম শাস্তি নহে, বরং প্রাণদণ্ডের অপেক্ষা কঠোরই বলিয়া অনেকের মত। এদিকে আমরা গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

আর 'বিশ্বাস', 'অনুমান' ইহার উপর বড় অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। ইহাতে অনেক ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়া গেল।

বর্ষ-বিদায়

বৎসরের শেষ বিনীত নমস্কার জানাইয়া আজ আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম, এই একবৎসর ধরিয়া জয়শ্রীর কল্যাণকল্পে যাঁহাদের সহযোগিতা পাইয়াছি তাঁহাদের আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। গ্রাহক হইয়া, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিয়া, লেখা দিয়া, প্রচার করিয়া যিনি যে ভাবেই আমাদের সহায়তা করিয়াছেন, আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। যাঁহাদের অপরিসীম সহৃদয়তায় জয়শ্রী তিনবছরের জীবনের সমস্ত বাধাবিঘ্ন কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছে, চিরদিন বড় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে, বড় আনন্দের সঙ্গে ও তাঁহাদের কথা স্মরণ করিব। জয়শ্রী তাঁহাদের কতটুকু প্রতিদান দিতে পারিয়াছে, সে বিচারের ভার আমাদের উপর নাই। আমরা ভবিষ্যতের আশারাখি, দুর্দ্দিনের কালমেঘ দেখিয়াও হতাশ হই না, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা আমাদের সম্বল, সেই ভরসা করিয়া বলি, 'জয়শ্রী' নারীর চিন্তা শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছে, নারীরচিন্তাধারাকে রূপ, রস, ও প্রাণ দিতে চেষ্টা করিতেছে। সমগ্র মহিলা সমাজের সহায়তায় তাহার সেবাও সার্থক হইবে।

নূতন বছরের জন্য সকলের আশীর্ব্বাদ ও শুভ-কামনা প্রার্থনা করিয়া আমরা বর্ষ শেষের বিদায় লইলাম।

১৩২২

Printed & Published by Bibhabati Sen, 23 Wyer Street, Wari, from Wari Printing Works, Dacca.